বর্ষ ২৯ · সংখ্যা ১

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৩

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক

শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ

বিজ্ঞপ্তি

বিশ্বভারতী পত্রিকার ২৯ বর্ষের ১ম সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৩ রূপে প্রকাশিত হল। অতঃপর এই ধারাবাহিকতাই রক্ষিত হবে।

ছাপাখানার বিভ্রাট ও অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থার জন্য পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটে এবং ২৮ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যাটি (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০) চৈত্র ১৩৮২-তে প্রকাশিত হয়।

মুদ্রণব্যয় এবং কাগজের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ঊনত্রিংশ বর্ষ থেকে পত্রিকার মূল্য প্রতিসংখ্যা তিন টাকা ধার্য হল।

পত্রিকার বর্ষ ২৯ সংখ্যা ২-৩ অবনীন্দ্রসংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে।

রণজিৎ রায়
প্রকাশক। বিশ্বভারতী পত্রিকা

ভারতে এসে টমাস বাটা অসংখ্য ক্ষত ও সংক্রমণে বিধ্বস্ত ওই পাগুলি দেখলেন।..দেখলেন 'লক্ষ লক্ষ লোক খালি পায়ে চলাফেরা করে।'

এঁদের জুতো পরাতে চাই

আমাদের কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা টমাস বাটা
প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে লক্ষ্য করেছিলেন
আমাদের দেশে অসংখ্য খালি পা
ঢাকার জন্য দরকার যান্ত্রিক উপায়ে
তৈরী প্রচুর জুতোর।
আজ টমাস বাটার জন্ম শতবার্ষিকী
আমরা পালন করছি।
সেই সঙ্গে বানিয়ে চলেছি
এমন দামে জুতো
লক্ষ-লক্ষ মানুষ যা কিনতে পারে।

ভালো জুতোর চেয়েও ভালো

পুরাকীর্তি ও প্রত্নবস্তু সংরক্ষণের জন্য
জনগণের প্রতি আবেদন

ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ডাক দিয়েছেন দেশের সব মানুষকে— বিশ দফা কর্মসূচীর রূপায়ণে। এসেছে সর্বস্তরে কর্মচাঞ্চল্য—অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোয়ার। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক এই বিশ দফা কর্মসূচী। জাতীয় স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে যখন আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি, সেই মুহূর্তে বিশেষভাবে প্রয়োজন অতীত ইতিহাসকে অতন্দ্র প্রহরীর মত রক্ষণাবেক্ষণ করা—এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেশের প্রতিটি মানুষকে শাণিত সজাগ চেতনা নিয়ে অতীত ইতিহাসের প্রাচীন স্থাপত্যকলার স্বাক্ষরবাহী দেবদেউল, গীর্জা, মসজিদ, মঠ প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য আবেদন করেছেন।

অনেক ভাঙাগড়ার সাক্ষী এই গঙ্গা-যমুনাবিধৌত বাংলাদেশে যুগ থেকে যুগান্তরে কত অসংখ্য মানুষ তার স্বপ্নসাধনা দিয়ে গড়ে তুলেছে সৃজনধর্মী শিল্পকর্ম। বিবর্তনের ধারায় একদিন দেখা দিল এই মাটিতে মদগর্বী ক্ষমতালোলুপ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। শত চেষ্টায় তারা মুছে ফেলতে পারে নি জাতীয় ঐতিহ্যসমন্বিত পুরাকীর্তি ও প্রত্নবস্তু। মহাকালের অবক্ষয়কে উপেক্ষা করে, অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ অগ্রাহ্য করে আজও দাঁড়িয়ে আছে শতসহস্র পুরাকীর্তি। এদের দেখলে মনে হয়—"হে স্তব্ধ অতীত, কথা কও, কথা কও"।

বর্তমান দিনে জাতীয় সরকার ঐতিহ্যবাহী পুরাকীর্তি ও প্রত্নবস্তু সংরক্ষণে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টার সাফল্য ও শক্তির মূল উৎস হল দেশের আপামর জনসাধারণ। এই মুহূর্তে বিশেষভাবে প্রয়োজন জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা। তাই এই ক্ষেত্রে জনগণের কর্তব্য কি তা নীচে সন্নিবেশিত হল :—

১। পুরাকীর্তির অলংকরণ কাজসমূহ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ— এই নীতি সবাইকে অবহিত করা প্রয়োজন।

২। পুরাকীর্তি বা উহার অলংকরণের উপরে নাম লেখা, দাগ কাটা বা অন্য কোন উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা নিষিদ্ধ। এই নিষেধের অমান্যকারীকে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত করা উচিত।

৩। পুরাকীর্তির উপরে বা আশেপাশে গাছ জন্মালে জনসাধারণ যেন যৌথ প্রচেষ্টায় সেগুলি নির্মূল করেন এবং স্থানটি যথাসম্ভব আবর্জনামুক্ত রাখেন।

৪। জনসাধারণের নজর রাখা উচিত যে পুরাকীর্তির অভ্যন্তরে বা প্রাঙ্গণে যেন কেউ আগুন না জ্বালায় কেননা ধোঁয়ায় পুরাকীর্তির ঔজ্জ্বল্য নষ্ট ও অন্যান্য ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং পুরাকীর্তির স্থলে সাধুসন্তদের ধুনি জ্বালানো বা বনভোজনের জন্য রান্না করা থেকে নিবৃত্ত করা উচিত।

৫। ইদানীং নানারকম প্রত্নসম্পদ বা পুরাকীর্তির গাত্র থেকে অলংকরণাদি অপহরণের জন্য সমাজ-বিরোধী দুষ্টচক্র সক্রিয় আছে। এদের উপর কড়া নজর রাখা উচিত এবং ঐ জাতীয় কোন ঘটনার আভাস পাওয়ামাত্র স্থানীয় বি ডি ও, এস ডি ও এবং পুলিসের গোচরে আনা প্রয়োজন। ইতি—

সুব্রত মুখোপাধ্যায়
রাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) ১১৭৪ / ৭৬

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৯ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৩ · ১৮৯৮ শক
সম্পাদক শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ • সহযোগী সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মূল্য তিন টাকা

শ্যামলী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৯ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৩ · ১৮৯৮ শক

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

১

কল্যাণীয়েষু

সিঙাপুরের পালা আজ শেষ হোলো। আজ বিকেলে জাহাজে করে মলক্কা বলে আর এক জায়গায় যেতে হবে। প্রথম যে দু তিন দিন গবর্ণরের বাড়ি ছিলুম অনেকটা নিরিবিলি কেটেছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে অবধি প্রাণ বেরোবার জো হোলো। বক্তৃতার তো অন্ত নেই— তার উপর পার্টি। একটুও বিশ্রাম করতে পারচিনে। যার তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়াটা আমার পক্ষে সব চেয়ে কষ্টকর হয়েচে।

আমার প্রথম লেকচারে গবর্ণর সভাপতি হয়েছিলেন— সে লেকচারটা এদের বিশেষ ভালো লেগেছিল। কিন্তু এখানকার খবরের কাগজগুলো লক্ষ্মীছাড়া— কোনোটাতেই ঠিক রিপোর্ট নিতে পারে নি। গবর্ণর বার বার আক্ষেপ করে বলেছেন They have made a mess of your lecture। Cuttings থেকে তোরা কিছুই পাবিনে।

আর যাই হোক, মাস খানেক এখানে ঘুরে ঘুরে আরিয়াম ভালোরকম ভূমিকা করে রেখেছিল। ওকে বিষম খাটতে হয়েচে। এখানে আমাদের দিশি লোকদের মধ্যে দলাদলির অন্ত নেই— তা নিয়ে ওকে কম ভুগতে হয় নি— খুব ওর ধৈর্য্য আছে বলে সামলিয়ে চল্‌তে পেরেচে। টাকা আদায়ের পালা শেষ না হলে ঠিক বোঝা যাবে না এখানে আসার ফল কি হল।

ফিলিপাইন থেকে একটা নিমন্ত্রণ আসবে বলে বোধ হচ্চে। সেখানকার লোকেরা বিশেষ ব্যগ্র— সেখানে গেলে কিছু পাবার প্রত্যাশা আছে।

১৭ই অগস্ট পর্য্যন্ত আমাদের এখানকার প্রোগ্রাম। তারপরে পিনাঙ থেকে শ্যামে যাবার কথা আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে রাজার মা কিম্বা মাসি কিম্বা ঐরকম কেউ সম্প্রতি মারা গেছে— এখন ওদের court mourning চলচে— তিনমাসের উপর এর মেয়াদ। আশা করচি তাতে আমাদের বিশেষ কিছু বাধা হবেনা। সেখান থেকে ফ্রেঞ্চ কাম্বোডিয়া শেষ করে জাভায় গেলে আবার সিঙাপুরে আসবার দরকার হবেনা।

বক্তৃতা ইত্যাদির দ্বারা এখানে খুব কষে আসর জমিয়ে নেওয়া গেছে— আমরা দেরি করে আসাতে সুবিধা বই অসুবিধা হয় নি। কিন্তু আমরা এখান থেকে সরে গেলেই হয় ত উৎসাহ নিবে যেতে পারে।

তাই মনে করচি আমরা যতদিন শ্যাম প্রভৃতি জায়গায় ঘুরব, আরিয়ামকে টাকা সংগ্রহের জন্যে এখানে রেখে যাব। ওর খুব ইচ্ছে আমার সঙ্গে জাভায় যায়। নিয়ে যাব ঠিক করেছি। খুব কাজের লোক— বিদেশ ভ্রমণের সময় উপযুক্ত সহচর। ইতিমধ্যে লাল যদি শিশু বিভাগের শেখানোর কাজে সাহায্য করে তাহলে ভালো হয়। সেই সিংহলী কি রকম কাজ করচে। সেই যে Bactay সিম্‌লা থেকে চিঠি লিখেছিল, তাকে যা হয় একটা উত্তর দিতে ভুলিস্‌ নে।

এখানে এসে দেখচি Kali Phos 6 ওষুধটা একদিনও বন্ধ রাখ্‌লে আমার চলে না। ক্লান্তিতে পিঠের দাঁড়া ভেঙে পড়ে। ঐ ওষুধ একটা বড়ো বোতল আমাকে পাঠিয়ে দিস— নইলে শেষ পর্য্যন্ত কুলোবে না।

এখানে এসে অবধি বৃষ্টি প্রায় নেই বল্লেই হয়। গরম যে অত্যন্ত বেশি তা নয়— আমাদের দেশের চেয়ে মোটের উপর গরম কম। দেশটা দেখতে সুন্দর।

এখান থেকে দেড় লাখ টাকা পাওয়া অসম্ভব হবেনা এমন আশা পাওয়া যাচ্চে। যদি রবরের বাজার চড়া থাকত তাহলে পাঁচলাখ পাওয়া দুঃসাধ্য হত না।

আমার দলবল বেশ আনন্দে দেখে শুনে খেয়ে দেয়ে লোকজনদের সঙ্গে ভাব করে বেড়াচ্চে। যত দুঃখের বোঝা সমস্ত আমারই উপরে। ইতি ২৬ জুলাই ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

ওঁ

[জানুয়ারি ১৯২৮]

কল্যাণীয়েষু

রথী ক্ষিতির চিঠি পাঠাই— কি করা স্থির করে রাখিস্‌।

Dame Clara Butt খুসি হয়ে গেছেন, তাঁর Secretary স্কুল দেখে বিশেষ impressed। জর্ম্মান ছাত্রের দল ১৫ জন কাল থেকে আছে— আজ অভিনয় করে কাল সকালে যাবে।

আমি ৩রা তারিখে সকালের গাড়িতে কলকাতায় রওনা হব। Lady Smithকে বলতে পারিস ৪ঠা থেকে যে কোনো দিন সুবিধা, দেখা করতে পারেন।

Science Congress-ওয়ালাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে খবর নেওয়া চাই— যদি সেক্রেটারি আশ্রমে এসে আগে থাকৃতে দেখে শুনে আলোচনা করে যান তো ভালো হয়। আমি থাকবনা— এণ্ড্রুজ তখন আশ্রমে এসে এঁদের তদারক করতে রাজি আছেন।

শীঘ্র অভিনয় করবার কি সম্ভাবনা আছে Mrs. Tateকে লিখে দিয়েছি য়ুরোপে যাবার আগে অভিনয় অসম্ভব। আমার ইচ্ছে কিছু দিন কোথাও পালিয়ে গিয়ে আমার লেখাটা এগিয়ে নিই— এখানে থাকতে কোনো আশা দেখি নে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

আরিয়াম : আরিয়াম উইলিয়মস্ (পরে আর্যনায়কম্)। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক, সিংহলদেশীয় জাফনার তামিল খৃস্টান ; রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা আদর্শ তাঁহাকে শান্তিনিকেতনে আকর্ষণ করিয়া আনে।

লাল : প্রেমচাঁদ লাল। এককালীন শ্রীনিকেতন-সচিব ; *Reconstruction and Education in Rural India* পুস্তকের লেখক।

Bactay : Ervin Bactay। হাঙ্গেরিয়ান লেখক ; ১৯২২ সালে হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি পুস্তক লিখিয়া কবিকে উৎসর্গ করেন।

Clara Butt : (১৮৭৩-১৯৩৬) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না গায়িকা। শান্তিনিকেতনে সংগীত পরিবেশন করে কবিকে মুগ্ধ করেন। তাঁর আত্মজীবনী *My Life of Song* গ্রন্থে তিনি কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন।

রবীন্দ্র-নাটকের পূর্বসূত্র

শ্রীভবতোষ দত্ত

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে কিছুতেই যেন বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ধারায় ফেলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার আগে, তাঁর সমকালে কিংবা তাঁর পরে বাংলা নাটক যেভাবে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের নাটকের সঙ্গে তার মিল অল্পই। তাঁর নাটক পড়লে মনে হয়, তিনি যেন প্রচলিত নাট্যরূপের কথা চিন্তা না করেই সম্পূর্ণ নিজস্ব আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই নাটক রচনা করে চলেছেন। তাঁর আগে এসেছেন মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তাঁর সমসাময়িক কালে এসেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদ-প্রসাদ, তাঁর নাট্যরচনাধারার অবসানকালে এসেছেন যোগেশ চৌধুরী ও শচীন সেনগুপ্ত এবং আরো অনেকে, কিন্তু আশ্চর্য এই যে রবীন্দ্রনাথ নিজে নাটকরচনায় যেমন এঁদের কাউকে অনুসরণ করেন নি, এঁরাও তেমনি কেউ রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের নাটক বাংলা সাহিত্যে যেন বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ এবং অনন্য।

সেইজন্য স্বভাবতই আমরা সমান্তরাল দৃষ্টান্ত আনবার চেষ্টা করি পশ্চিম থেকে। সে-দেশে রূপক নাটকের সমৃদ্ধ দৃষ্টান্ত সহজলভ্য। মেটারলিংক ইয়েটস স্ট্রীণ্ডবার্গ প্রভৃতি বহু নাট্যকারের নাটক আমাদের দেশে সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথ যেন স্বদেশের নাট্যধারার সঙ্গে যোগ রক্ষা না করে বিদেশের আদর্শ দিয়েই নিজের নাট্যরীতি নির্মাণ করে নিয়েছেন। এই কথা যখন আমরা বলি, তখন দু-একটা বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত হওয়া দরকার। প্রথমত, প্রচলিত নাটক এবং তার রীতি সম্বন্ধে তিনি কী ধারণা পোষণ করতেন? সত্যি কি এই রীতিকে তিনি অনুসরণযোগ্য মনে করতে পারেন নি? নাটকে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্যের সঙ্গে এই রীতির কি সহজ যোগ ছিল না? দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নাট্যরীতি বলতে যা বুঝি, সে কি সম্পূর্ণই অন্যপ্রভাববর্জিত নিজস্ব রীতি? রবীন্দ্রনাথের সেই নিজস্বতাটি কি? প্রচলিত আদর্শ থেকে এই রীতি বক্তব্য এবং প্রয়োগে পৃথক কোন্ দিক দিয়ে? তৃতীয়ত, যদি অন্য কোনো নাট্যাদর্শ রবীন্দ্রনাথের নাট্যরীতিকে প্রভাবিত করে থাকে, তবে সে কোন্ রীতি?

রবীন্দ্রনাথের নাটকের ভাববস্তু বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র লঘু না করে বলা উচিত যে তাঁর নাটকের এই রীতিগত বৈশিষ্ট্য নির্ণয়টাই সমালোচনার প্রধান সমস্যা। তারই যথোপযুক্ত বিশ্লেষণ ও মীমাংসা হওয়া দরকার। এতে রবীন্দ্রকবিচিত্তের নানা দিকেই আলোক বর্ষিত হয়ে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের একটি ব্যক্তিরূপ ফুটে উঠবার সম্ভাবনা। এ কথা বলার তাৎপর্য এই যে বাংলা নাটকের অন্যান্য প্রণেতারা কেউই তাঁদের রচনায় এতখানি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁদের নাটকে হয় নাট্যবস্তু প্রধান হয়ে উঠেছে, না হয় একটা সহজসিদ্ধ প্রথা রক্ষা করবার প্রয়াসই বড়ো হয়ে উঠেছে। নাটকের বস্তুনিষ্ঠতা প্রভৃতি যে-সব লক্ষণের কথা আমরা এতকাল জেনে এসেছি, সেই বস্তুনিষ্ঠতা যে রবীন্দ্রনাথের নাটকে নেই, এ কথা সর্বজনবিদিত। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সৃষ্টির মতো নাটক-প্রসঙ্গে এ কথাটাই সত্য যে তাঁর ব্যক্তিরূপ তাঁর বিষয়কে আচ্ছন্ন করেও দীপ্যমান। রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিচার সেই দিকেই আমাদের সমগ্র মনোযোগ আকর্ষণ করে।

১

দেখা যাক রবীন্দ্রনাথ নাটক রচনা আরম্ভ করবার সময়ে কী আদর্শ তাঁর সম্মুখে পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটক লেখার আগে বাংলা নাটকের ইতিহাস চল্লিশ বৎসরের বেশি নয়। এই চল্লিশ বৎসরের নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য যথেষ্ট অর্থপূর্ণ। রচনাবলী-সংস্করণ 'মালিনী' নাটকের ভূমিকায় তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন,

'শেক্‌সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।'

এই শেক্‌সপীয়রীয় নাট্যরীতি কিভাবে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তার ইতিহাস পর্যালোচনাযোগ্য। এই ইতিহাসের পশ্চাৎপটে আছে আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার। নতুন শিক্ষায় শেক্‌সপীয়রের নাটক তরুণ চিত্তের মনোহরণ করেছিল। যাঁরা নাটক রচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন হরচন্দ্র ঘোষ মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র— এঁরা সকলেই ইংরেজি শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত। সাহসের সঙ্গে তাঁরা ইংরেজি নাট্যকলা অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। দ্বিধাদ্বন্দ্বের যুগ ছিল না, তা নয়। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি সংস্কৃত নাট্যকলাকেই অনুসরণ করেছিলেন যদিও বিষয়নির্বাচন ছিল তাঁর নিজস্ব। সংস্কৃত ও ইংরেজি নাট্যকলার মধ্যে সংশয় ও দোলাচলতার একটি সুন্দর নিদর্শন আছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে।

রামনারায়ণের নবনাটক (১৮৬৬) ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর অভিনয়-সাফল্যের উল্লেখ করে বলেছেন :

'প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া— "যা— রা পলাট্ (plot) নাই, পলাট্ নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক্"— সমালোচকদিগের উপর এইরূপ মধুবর্ষণ করিতে করিতে তিনি আপনার আনন্দ-সাফল্যে গর্বিত হইয়া খুব আস্ফালন করিয়াছিলেন।'[১]

যে-সব সমালোচক রামনারায়ণের নাটকে প্লট নেই বলতেন তাঁরা কে? রামনারায়ণের 'পলাট্' কথাটির দ্বারাই ইংরেজি রুচির সমালোচকদের প্রতি কটাক্ষ আছে বলে মনে হয়। নবনাটকের আগে মধুসূদন, দীনবন্ধুর নাটকগুলি বেরিয়ে গিয়েছে। এ-সব নাটকের দ্বারা ইংরেজি নাটকের আদর্শ বাংলা নাটকে ক্রমপ্রতিষ্ঠা লাভ করছে।

মধুসূদনের পর বাংলা নাটক প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে— বাস্তবধর্মী ও পৌরাণিক। বাস্তবধর্মী নাটকে সমসাময়িক সমাজসমস্যা এবং ঐতিহাসিক দুই বিষয়ই পড়ে। কেননা ঐতিহাসিক হলেও চরিত্রে ও ঘটনাক্রমে ব্যবহারিক জগতের নীতিনিয়মই এতে রক্ষিত। পৌরাণিক নাটক বস্তুটাই একটা ভিন্নতর স্বাদ ও প্রেরণার ফল, যা শেক্‌সপীয়রীয় নাটকে কখনোই ছিল না। এতে থাকত নানা অতিলৌকিক ঘটনার অবতারণা। উদ্দেশ্য ছিল ভক্তিরসের উদ্‌বোধন। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের মতো দেবতার নানা অলৌকিক লীলা বর্ণনাদ্বারাই ভক্তি আকর্ষণ করা সম্ভব, তাই এতে এমন সব ঘটনার

---

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ১১২

সমাবেশ থাকত যা মানবিক যুক্তিবোধকে তিরস্কৃত করে। কিন্তু এই যুক্তিবোধ ও বাস্তবতাবোধ না থাকলে যেমন নাট্যকলার প্রতিষ্ঠিত আদর্শ (অর্থাৎ শেক্‌সপীয়রীয় রীতি) রক্ষিত হয় না, তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর জাগ্রত যুক্তিবোধও তৃপ্ত হয় না।

পৌরাণিক নাটক তাই এক ভিন্নতর পন্থা অবলম্বন করল। এই নাটক শেক্‌সপীয়রীয় রীতি বর্জন করেছে, সম্পূর্ণ না হলেও অন্তত অনেকখানি। মধ্যযুগের যাত্রারীতি মূলত এতে অবলম্বিত হলেও দৃশ্যপরম্পরা এবং কার্যকারণের এক ধরনের ধারাবাহিকতা এতে মেনে চলা হয়। একে যে দর্শকদের গ্রহণ করে নিতে বাধা হয় নি, তার কারণ এর জগৎ আমাদের নিত্যকার জগৎ নয়, তার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার কথা কখনো ওঠে নি। পৌরাণিক জগতের নীতিনিয়ম আমাদের এই সামাজিক বা বাস্তব নীতিনিয়মের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলবে না। সেখানকার নাট্যসমস্যা চিরন্তন চরিত্রনীতির সমস্যা নয়, কিংবা কোনো সামাজিক অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সমস্যা নয়। সেখানকার সমস্যা ভারতীয় মনের চিরন্তন সমস্যা— কর্মফল ও দৈবনিয়তির প্রতিষ্ঠা এবং তার দ্বারা ভক্তি ও সম্ভ্রমের উদ্রেক। শেক্‌সপীয়রীয় নাটকের নায়কচরিত্রের বিশিষ্ট রূপ ফুটে ওঠে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির দ্বন্দ্বে। সেই দ্বন্দ্ব এই নাটকে থাকে না। তাই এই নাটকের ঘটনাবিন্যাস এবং পরিস্থিতি রচনা শেক্‌সপীয়রীয় নাটকের মতো সুশৃঙ্খল সুবিন্যস্ত এবং বিশিষ্ট নয়। শেক্‌সপীয়রের নাট্যরীতি একটা বিশিষ্ট জীবনচেতনা থেকেই গড়ে উঠেছে। সেই জীবনচেতনার সঙ্গে আমাদের জীবনচেতনার তুলনা হয় না। ভোগ আকাঙ্ক্ষা পার্থিব সাফল্য— এক কথায় প্রকৃতিসাধনা এ সবই যেন সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে বিশিষ্ট প্রকাশপদ্ধতির উদ্‌ভাবন করে পঞ্চাঙ্ক নাটক সৃষ্টি করে তুলেছে।

সংস্কৃত নাটকে ঘটনার প্রবলতা থাকে না। এর নিয়ামক হচ্ছে ভাব বা মুড। সেজন্য এর নাট্যকাহিনীর পরিকল্পনা পাশ্চাত্য নাট্যকাহিনীর পরিকল্পনা থেকে মূলতই আলাদা হয়ে থাকে। জনৈক বিদেশী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলেছেন :

The divisions of a play as laid down by the theatrical handbooks, the so-called stages (*avasthx*) and joints (*sandhi*), are rather the divisions of a modal panorama than the dramatic divisions of Aristotle.[১]

পাশ্চাত্য নাটকের কাহিনী কেবল মানসিক ভাবমাত্র দিয়ে গঠিত নয়, জীবনের মর্মনিহিত প্রবৃত্তির প্রচণ্ডতা ও আলোড়ন দিয়ে কাহিনীর দ্বন্দ্বসংকুল রূপ গড়ে ওঠে। এতে যেন অস্তিত্বের মূল ভিত্তিটাই নড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

‘য়ুরোপীয় চিত্তের এই চাঞ্চল্য, এই নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেখানকার ইতিহাস হইতেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার অন্তরে বাহিরে একটা মিল ছিল। সেখানে সত্যই ঝড় উঠিয়াছিল বলিয়াই ঝড়ের গর্জন শুনা গিয়াছিল। আমাদের সমাজে যে অল্প একটু হাওয়া দিয়াছিল তাহার সত্য সুরটি মর্মরধ্বনির উপরে চড়িতে চায় না— কিন্তু সেটুকুতে তো আমাদের মন তৃপ্তি

১. Daniel H. H. Ingalls, *An Anthology of Sanskrit Court Poetry*, Harvard University Press, 1965, p 88

মানিতেছিল না, এইজন্যই আমরা ঝড়ের ডাকের নকল করিতে গিয়া নিজের প্রতি জবরদস্তি করিয়া অতিশয়োক্তির দিকে যাইতেছিলাম।'[১]

রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলেছেন নতুন যুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে। এই মন্তব্য বলা বাহুল্য দীনবন্ধু গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি যাঁরা শেক্‌সপীয়রকে অনুকরণ করেছিলেন তাঁদের নাট্যরীতির প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। সেইসঙ্গে এ কথাও স্মরণীয় যে এ-মন্তব্য পৌরাণিক নাটকে প্রযোজ্য নয়। 'হৃদয়াবেগের উদ্দামতা' 'নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' 'দুর্দাম উদ্দীপনা' 'ঈর্ষানলের প্রলয়দাবদাহ' 'স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধ লীলা' (জীবনস্মৃতি, 'ভগ্নহৃদয়') 'দুরন্ত প্রবৃত্তির দাবদাহ', 'দুর্বাধ্য প্রবৃত্তির এইরূপ ঝড়' (প্রাচীন সাহিত্য, 'শকুন্তলা') 'পুষ্পশরের মোহবর্ষণ' 'য়ুরোপীয় সাহিত্যে এই পাক-খাওয়া প্রবৃত্তির ঘূর্ণিনৃত্যের প্রলয়োৎসব' 'বিধাতার সঙ্গে বিরোধ' (সাহিত্য, 'সৌন্দর্যবোধ')— যে-সব বস্তুকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের কল্যাণাদর্শের পরিপন্থী বলে মনে করেন অথচ শেক্‌সপীয়রীয় নাটকে যার বাণীরূপরচনা দেখতে পাই, আমাদের পৌরাণিক নাটকে তা থাকে না। পৌরাণিক নাটকে হৃদয়াবেগের উদ্দামতা যেমন তিরস্কৃত স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধ লীলা তেমনি অর্থহীন। এতে ব্যক্তিচরিত্রের বস্তুতই কোনো মহিমা নেই, দৈববিধানের অমোঘতা এবং শুভংকরতাই এতে প্রতিষ্ঠিত। অশুভ দ্বারা কিছুকালের জন্য নায়ক চালিত হতে পারে বটে— তাতে পাপের একটা ভূমিকা দেখি, কিন্তু পাপ ইয়াগো বা রিচার্ড দি থার্ডের মতো প্রবল বিশ্ববিধানের প্রতিস্পর্ধী শক্তি নয়। পাপ একটা সাময়িক ভ্রান্তি মাত্র যা পরিণামে ঈশ্বরের কল্যাণময়ত্বে নায়ককে (এবং আমাদের) প্রবুদ্ধ হতে সহায়তা করে।

বস্তুত পৌরাণিক নাটকের ঘটনাধারায় ক্রমপরিণাম ছলনা মাত্র। কারণ আধ্যাত্মিক কল্যাণ এবং ধ্রুব বিশ্বাসকে প্রমাণিত করা ও প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্যই এর কাহিনীর পরিকল্পনা। ঈশ্বরের বা কোনো দেবতার এক অপার্থিব লীলা বা ইচ্ছার কথা নাটকের প্রস্তাবনাতেই বলে দেওয়া থাকে। এর নায়ক-নায়িকা দেবতা বা দেবতার অবতার। মানবলীলাতে এদের যা ভূমিকা আমাদের ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মসংস্কার দিয়ে তার স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করে নিই, যাত্রায় যেমন বিবেকের উক্তি স্পষ্টভাবেই সেই ব্যাখ্যা করে দেয়। তাই পৌরাণিক নাটকে যথার্থ নাটকীয় ঔৎসুক্য-সৃষ্টি বা অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিস্ময় নেই, যেমন নায়কের কচিৎ বিদ্রোহ ও স্বাধীনচেতনাও শেষ পর্যন্ত ছলনা বলেই আমাদের মনকে তেমন উদ্‌বেজিত করে না। এই নাটকের যা-কিছু বিরোধ ও দ্বন্দ্ব সবই আপাতক মাত্র— এ দ্বন্দ্ব জীবনের অন্তর্নিহিত শাশ্বত ধর্ম নয়।

পৌরাণিক নাটক রচনার মূলে যে জীবনদৃষ্টি বা মন রয়েছে, তার জন্ম ভারতবর্ষের জলহাওয়ায়। এই মনই সৃষ্টি করেছে বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকগুলি। আবার এই মনই সৃষ্টি করেছে মধ্যবাংলার লোকযাত্রা। উনিশ শতকে যাঁরা সংস্কৃত নাটকের রীতিপদ্ধতি বাংলায় প্রচলিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁরা বস্তুত নাটকের বহিরঙ্গ নিয়েই অনাবশ্যকভাবে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলেন। সংস্কৃত নাটকের এই বহিরঙ্গ রীতি-অনুসরণ স্থায়ী হল না, কিন্তু খাঁটি ভারতীয় মন এক নতুন নাট্যধারা রচনা করে তুলল। ঊনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাটকগুলি অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত নাটকগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়, কিংবা তার থেকে উদ্‌ভূত নয়। সজ্ঞান অনুসরণ-যে সার্থক হয় না,

---

১ জীবনস্মৃতি, ভগ্নহৃদয়, পৃ ১০১

তার দৃষ্টান্ত— পুরাণ থেকে এই নাটকের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হলেও প্রাচীন ভারতীয় পরিমণ্ডলকে কাহিনীতে নাট্যকারেরা একেবারেই জীবন্ত করে তুলতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের নাটকের সঙ্গে তুলনা করলেই এ কথার সারবত্তা বোঝা সহজ হয়। পৌরাণিক নাটকের যোগ বরং বাংলা যাত্রার সঙ্গেই। যাত্রাকেই মার্জিত ও যথাসম্ভব আধুনিক নাট্যরীতির সঙ্গে মিলিয়ে পৌরাণিক রূপ দেওয়া হয়েছে।[১]

সংস্কৃত নাটক এবং বাংলা যাত্রার পশ্চাৎপটে একই ভারতীয় আদর্শবাদ থাকলেও দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য অতি সহজগোচর তা হচ্ছে নাট্যরীতির বিশিষ্টতার দিক দিয়ে। সংস্কৃত নাটক প্রভূত পরিমাণে শিল্পগুণসমৃদ্ধ। সে-নাটক রসিক বিদগ্ধ নাগরিকদের জন্য। শিল্পকলা এবং রঙ্গমঞ্চের আলোচনায় সংস্কৃতে বিস্তৃত নাট্যশাস্ত্র গড়ে উঠেছিল। নাট্যরসবোধ নাগরিক বৈদগ্ধ্য লাভের পক্ষে অপরিহার্য। নাট্যশিল্পে যেমন দশটি শ্রেণী গড়ে উঠেছিল তেমনি এর সংজ্ঞা-নির্দেশে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবনা ভারতীয় মনীষার বৈশিষ্ট্যবাচক হয়ে আছে। নাটকের কাহিনীতেও মুখ প্রতিমুখ গর্ভ বিমর্শ নির্বহণ এই পাঁচটি পর্যায় কল্পনা করা হয়েছে, তাতে নাটকীয় কাহিনীরচনারও একটা সুনির্দিষ্টতা এসেছে। সংস্কৃত নাটকে রাজা থেকে ধূর্ত পর্যন্ত বিচিত্র চরিত্রের অবতারণা করা যেত। শুধু যে দেবতারাই থাকতেন তা নয় রাজা রানী মন্ত্রী বয়স্য রানীর সহচরী এবং অন্যান্য চরিত্রের সাহায্যে নাটকে যে পরিবেশ গড়ে উঠত, তা যথেষ্ট পার্থিব। হাস্যে পরিহাসে প্রণয়ক্ষুধায় বিরহে মিলনে উদ্‌বেগে শঙ্কায় আনন্দে ও বেদনায় নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনেরই চিত্র যদিও আধুনিক দৃষ্টিতে এ জীবন বৈচিত্র্যময় জীবনের সমগ্র রূপ নয়। এর পরিবেশ একান্তই রাজসভার পরিবেশ। সেজন্য এতে যেন স্থূল বাস্তব জীবনের সুখদুঃখের প্রচণ্ডতা স্থান পায় নি। মূল ভারতীয় সংস্কার জীবনকে যে ভাবে দেখেছে, এ সেই জীবন। এখানে পাপ নেই, মৃত্যু নেই, শক্তির অপচয় নেই, উদ্ধত বিদ্রোহী নায়ক নেই। কিন্তু সবশেষে আছে মিলন এবং শান্ত পরিণাম যে পরিণাম নিশ্চিত, যে পরিণাম ধ্রুব। নাটকের ঘটনাধারার কুটিলতা এবং বিরোধ সমঞ্জসীভূত হয়ে যায় বিশ্বনিয়মের কল্যাণময় প্রতিষ্ঠায়। জনৈক বিদেশী গবেষক এই বৈশিষ্ট্যের একটা তত্ত্ব নির্দেশ করেছেন এইভাবে :

This is best described as "equilibrium", a balance achieved by opposing forces found to the aesthetic imagination to be in harmony and not in collision. This signifies in the general scheme of the play that the action is neither progression nor montage nor marked by either the rise or fall of excitement but by a paradoxical poise that customarily takes the form of circular motion ending close to the point of its beginning.[২]

---

১ এই পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)। Mano Mohan may be regarded as the first Bengali dramatist to show how the Puranic stories could be effectively utilized for playwriting and what a rich mine lay waiting for the dramatist in the old folklore & mythology.—P. Guha-Thakurata, *The Bengali Drama*. 1930, p 94

২ Henry W. Wells, "Sanskrit Drama and Indian Thought", *The Classical Drama of India*, Asia Publishing House, 1963, p 42

শকুন্তলার নাটকশেষে ভরতবাক্যটি তাই চমৎকার—

প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতমহতাং মহীয়্যতাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ॥

২

রবীন্দ্রনাথ যখন নাটক রচনায় ব্রতী হলেন তখন তাঁর সামনে ছিল নাট্যরচনার তিনটি আদর্শ: শেক্‌সপীয়রীয় প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত এবং পৌরাণিক।

শেক্‌সপীয়রীয় নাট্যাদর্শকে রবীন্দ্রনাথ কতখানি অনুসরণ করতে পেরেছিলেন বা চেয়েছিলেন, সে-সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি।[১] প্রচলিত প্রথা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ শেক্‌সপীয়রকে প্রথম দিকের নাটক রাজা ও রানী, বিসর্জন এবং প্রায়শ্চিত্তে অনুসরণ করেছেন। এই নাটকগুলিতে প্রথাগত উপাদানই ব্যবহৃত। ইতিহাস থেকে আখ্যান সংগ্রহ করে উপন্যাস ও নাটক রচনার রীতি হয়েছিল। এই নাট্যরীতিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে যে নায়কের প্রয়োজন আছে, এবং এই চরিত্রেরই ক্রমোন্মোচন-সূত্রে যে ধারাবাহিক দ্রুত ঘটনার কার্যকারণবিন্যাস প্রয়োজন, নাটকের ভাববস্তু যে হবে মানবঅন্তরের। প্রবৃত্তি ও তার সংঘাত, এ-সব নীতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যুগের নাটক তিনটিতেই পালন করেছেন। তা ছাড়া শেক্‌সপীয়রীয় রীতিতে নাটকীয় ঔৎসুক্যের মধ্যবিন্দু (climax) হিসাবে রাজা ও রানীতে সুমিত্রার গৃহত্যাগ, বিসর্জনে জয়সিংহের আত্মবিসর্জন কিংবা ট্র্যাজিক রিলিফ হিসাবে জনতার দৃশ্য, প্রায়শ্চিত্তে রমাই ভাঁড়, ভিলেন-চরিত্র হিসাবে রাজা ও রানীতে জয়সেন-যুধাজিৎ, প্রায়শ্চিত্তে রামচন্দ্র রায়কে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। মালিনীর ক্ষেমংকর কিংবা বিসর্জনের রঘুপতিকে ম্যাকবেথের ম[illegible] ভিলেন-ই[illegible] বললে অসংগত হয় না।

কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি এই রীতিতে একান্ত লগ্ন থাকতে পারেন নি। প্রথম দিকের নাটকগুলিতেই তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচয় রয়েছে। এক দিকে আত্মনিরপেক্ষ ঘটনাবহুল কাহিনীর পঞ্চাঙ্ক নাটকীয় রূপ আর-এক দিকে কবির আত্মচেতনার প্রকাশব্যাকুলতা দুই বিরোধী প্রবৃত্তিই নাটকে স্পষ্ট। এ-সব নাটকে নায়ক-পদবাচ্যতা নিয়েও দ্বিধা আছে। বিসর্জনে রঘুপতি এবং জয়সিংহ, রাজা ও রানীতে বিক্রমদেব ও সুমিত্রা, মালিনীতে মালিনী ও ক্ষেমংকর স্পষ্টতই এই দ্বিধার চিহ্ন বহন করছে। ঘটনার ঝটিকায় যখন অন্যান্য চরিত্রেরা অন্ধ, বিসর্জনে অপর্ণার অবতারণা করে তিনি এক ভিন্ন সুর যোজনা করেছেন। রাজা ও রানীতে ইলার ভূমিকাকে বলেছেন লিরিকের জলাভূমি, কিন্তু পরিমার্জিত তপতীতে বিপাশা-নরেশের ভূমিকা জলাভূমি না হলেও আর্দ্রতা তাতে কম নেই। প্রায়শ্চিত্তে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় রবীন্দ্রবাণী যে স্পষ্টতর, তাতে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের শেক্‌সপীয়র-অনুসরণ এই পর্যন্তই। পরের নাটক থেকে শেক্‌সপীয়র-নাট্যরীতির চিহ্ন যে

---

১ দ্র. Rabindranath Tagore on Shakespeare প্রবন্ধ, *Calcutta Essays on Shakespeare* edited by Dr. Amalendu Bose of Calcutta University, 1966

একেবারে মুছে গিয়েছিল, সুনিশ্চিতভাবে সে-কথা বলা না গেলেও শারদোৎসব অচলায়তন মুক্তধারা রক্ত-করবীতে সেই রীতি প্রায় অদৃশ্য।[১] এই রীতি তিনি স্বীকার করে নিলেন— সে কি অন্য কোনো প্রবলতর নাট্যাদর্শের প্রভাবে? রবীন্দ্রনাথ এক সময় বলেছিলেন আমাদের জীবনসত্যের সঙ্গে শেক্‌সপীয়রীয় রীতির মিল ছিল না বলে এই রীতি আমাদের সাহিত্যে অস্বাভাবিক ও ব্যর্থ। তেমনি আমরা কি এ-কথা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের রূপকরীতিও পাশ্চাত্য রূপকনাট্যরীতির থেকে ধার-করা বলেই অস্বাভাবিক ও ব্যর্থ? সেইজন্যই কি আমাদের সাহিত্যে তার স্থায়ী প্রভাব পড়ল না?

রবীন্দ্রনাথের যুক্তি আমরা মেনে নিই আর না নিই, এই ঐতিহাসিক সত্যকে তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে শেক্‌সপীয়রীয় রীতি আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যে সম্পূর্ণ অভিনব। বরং ঐতিহ্য আছে রূপকের। সংস্কৃতে অভিনেয় বস্তুরই অন্য নাম ছিল রূপক। আজকাল রূপক কথাটি আমরা বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করি। যাকে আমরা এখন বলি রূপক, সংস্কৃতে তাকে কি বলত? এ-প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। সংস্কৃতে কিন্তু এর কোনো আলাদা নাম নির্দিষ্ট নেই এবং এই ধরনের রচনাও সংস্কৃতে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন।[২] একে নাটকেরই অন্তর্গত করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকটিকেই (একাদশ শতাব্দী) এই শ্রেণীর প্রাচীন রচনা ধরা যায় যদিও সংস্কৃত নাটকে ও সাহিত্যে অশরীরী গুণকে শরীরী করে দেখানো কিছুই নতুন ছিল না। মধ্যযুগে এই শ্রেণীর নাটক আরো কিছু রচিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনেকগুলি অনুবাদ হয়েছে।

আধুনিক কালে যাকে রূপকনাটক বলি সংস্কৃতে তা না থাকলেও রূপক এবং বস্তুধর্মের মেশামেশি সর্বদাই হয়েছে। এ বিষয়ে ভারতীয় কবি যেন কোনো স্পষ্ট সীমারেখা মানেন নি। বস্তুর যে স্বয়ংসিদ্ধ মূল্য কিছু থাকতে পারে, ভারতবর্ষের কবি বা ঋষি সে-কথা ভাবেন নি বলেই বস্তুজগৎ এবং ভাবজগৎ তাঁদের কাছে এক। বস্তুর আপাতদৃশ্যমান রূপ তাঁদের কাছে ভাবেরই প্রতিমা মাত্র। এইজন্য শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটকে চরিত্রগুলিও প্রধানত ভাবেরই প্রতীক, ব্যক্তিত্ববর্জিত, শ্রেণীসূচক। এ বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ে দেশী-বিদেশী পণ্ডিতেরা সকলেই একমত। অধ্যাপক সুশীলকুমার দে-র মন্তব্য স্মরণ করি:

… it cannot be denied there is a tendency to large generalisation and a reluctance to deviate from the type. It means an indifference to individuality, and consequently to the realities of characterisation, plot and action, as well as corresponding inclination towards the purely ideal and emoticnal

---

১ পঞ্চাঙ্ক-রীতিতে কবি যে নাটকের বিন্যাস করেন নি তার স্থূল প্রমাণস্বরূপ পরবর্তী নাটকের অধ্যায়-ভাগগুলির দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। শারদোৎসবে দৃশ্য ২, রাজায় ২০, পরবর্তী অরূপরতনে ৪, ডাকঘরে ৩, অচলায়তনে ৬, মুক্তধারা ও রক্তকরবীতে কোনো ভাগ নেই (চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনা বলে দ্রুতগতি), রাজা ও রানীর পরিবর্তিত নাট্যরূপ তপতীতে ৪টি অধ্যায়। এই ভাগগুলি সর্বথা ঘটনার ক্রমাগ্রগতি ধরে হয় নি, ভাবের পরিবর্তন ধরে হয়েছে।

২ কীথ বলছেন, We cannot say whether Krishnamisra's *Prabodhacandrodaya* was a revival of a form of drama, which had been practised regularly if on a small scale since Asvaghosa or whether it was a new creation, as may easily have been the case. —*The Sanskrit Drama*, 1924, p 251

aspects of theme.[১]

ভেবে দেখতে গেলে তাই নাট্যশাস্ত্রকার দ্বারা অভিহিত বলেই যে নাটক রূপক তা নয়, আধুনিক অর্থেও ভারতীয় নাটক রূপক ছাড়া কিছুই নয়। এবং সেই অর্থে যাত্রাও রূপক। সেকালে নাট্যকারের যেমন কখনোই মনে হয় নি যে কোনো নির্বস্তুক ভাব বা তত্ত্বকে তিনি রূপ দিচ্ছেন (যদিও আসলে তাই করছিলেন)' কেননা নির্বস্তুকও তাঁদের কাছে বস্তুর মতোই সত্য, তেমনি শ্রোতারাও অভিনয় দেখতে দেখতে কখনো মনে করে নি যে কোনো অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাধারারই তারা দর্শক। আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথও তাঁর রূপকনাটক সম্বন্ধেও এই একই কথা উচ্চারণ করেছেন :

'আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়।' তাঁর কাছে নাট্যঘটনা বাস্তব— চিরন্তন বাস্তব। এ এমন কোনো ভাব বা ঘটনা নয় যার জন্যে একে রূপক নামে আলাদা শ্রেণীভুক্ত করার প্রয়োজন আছে।[২]

উনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাটক সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়। এই নাটক যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা একালের মানুষ, তবু তাঁরা প্রত্যয় সংগ্রহ করেছেন সাধারণ ভারতীয় চেতনার বিশেষ প্রবণতা থেকে। রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক নাটক সম্বন্ধে কোথাও কোনো মন্তব্য করেছেন বলে মনে পড়ে না। নিশ্চয়ই এই নাট্যধারার প্রতি তিনি কোনো আকর্ষণ অনুভব করেন নি। বিশেষত পৌরাণিক নাটক রচনার পশ্চাৎপটে যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান ছিল তার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগই ছিল না। বিসর্জন নাটকের কালীপ্রতিমা-বিসর্জন এবং মালিনীর ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের অভিভবে তারই অব্যর্থ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে সাহিত্য বা নাটককে তিনি সম্পূর্ণরূপে ধর্মমুক্ত করেছেন। হিন্দু অথবা অন্য কোনো সঙ্ঘধর্ম হয়তো নয়, কিন্তু তাঁর নিজস্ব একটি ধর্মবোধকে তিনি নাটকে রূপ দিয়েছেন, এ-কথাও তিনি মালিনীর ভূমিকাতেই বলেছেন :

'আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশংকরের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে, মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসে নি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করে নি। সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে।'

---

১ Surendranath Das Gupta and Sushil Kumar De, *History of Sanskrit Literature*, Calcutta University, 1947, Pp 57-58 ; অনুরূপ অভিমতের জন্য দ্রষ্টব্য কীথের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৮২। Wells, *Sanskrit Drama and Indian Thought*, p ৪ ; Ingalls, *An Anthology of Sanskrit Court Poetry*, 1965, p 25

২ টমসন কবির সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত কথোপকথনের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলছেন, We rejected the notion that these later dramas, all of which were done for his boys at Santiniketan, were 'what you call allegorical. I am very fond of them and to me they are just like other plays'. To me they are very concrete' —E. Thomson. *Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist*. 1948, p 212

একে আমরা ধর্মই বলি আর কবির ব্যক্তিগত জীবনদর্শনই বলি, এ ক্ষেত্রে উভয়ই বস্তুত এক। সাধারণত অবশ্য ধর্ম বলতে বোঝায় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ধর্মকে। সেই ধর্মচিন্তা থেকেই সব দেশে ধর্মসাহিত্য গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগে যাত্রা এবং উনিশ শতকের পৌরাণিক নাটকও এই গোষ্ঠীগত ধর্মচিন্তা থেকেই সৃষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাও ধর্মেরই প্রেরণা, যদিও সে-ধর্ম কবিরই ধর্ম ; রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'আমার ধর্ম'। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি এই ধর্মের প্রেরণাতেই রচিত। সেই দিক বিবেচনা করলে এ-সব নাটক কেবল মানবচরিত্র-উদ্‌ঘাটনের জন্য অথবা অন্য কোনো প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে রচিত নয়। পূর্ববর্তী পৌরাণিক নাটকের মতো ধর্মনীতিই রবীন্দ্রনাট্যের মুখ্য প্রেরণা। অধ্যাত্মসত্যকে রূপ দেওয়ার জন্য যেমন পৌরাণিক নাটকের সৃষ্টি, তেমনি মানবধর্মকে রূপ দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাটকের সৃষ্টি। বলা প্রয়োজন রক্তকরবী বা মুক্তধারার গূঢ় প্রেরণাও মানবধর্মেরই প্রেরণা।

রীতির দিক দিয়ে না হলেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাট্যের সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের মিল নেই, এ কথা বলা যায় না।

৩

রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক নাটকগুলির কোনো প্রসঙ্গ কখনো উল্লেখ করেন নি, কিন্তু যাত্রার কথা তিনি বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে বাল্যকালে যাত্রার অভিনয় উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে হত। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যাত্রার স্মৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁর জীবনস্মৃতিতে বিস্তৃত উল্লেখ করেছেন :

'...ছেলেদিগকে লইয়া যাত্রা দেখাইবার ভার ছিল দীনুঘোষালের উপর। দীনুঘোষাল জ্যোতিবাবুর পিতৃব্যমহাশয়দের একজন মোসাহেব— সে ছেলেদেরও খুব প্রিয়পাত্র ছিল। দীনু ছেলেদের লইয়া ঠাকুরদালানের রোয়াকে মজ্‌লিশ্‌ করিয়া বসিত এবং মধ্যে মধ্যে রুমালে টাকা বাঁধিয়া ছেলেদের হাত দিয়া "পেলা" দেওয়াইত। তখনকার শ্রেষ্ঠ যাত্রাওয়ালা নিমাইদাস এবং নিতাইদাসের যাত্রাই এ বাড়ীতে হইত।...'[১]

বাল্যকালের এই যাত্রানুষ্ঠানের ছাপ রবীন্দ্রনাথের মনে স্থায়িভাবে পড়েছিল। পরেও উচ্চভাবপূর্ণ মার্জিত উচ্চাঙ্গশিল্পসম্পন্ন নাটক রচনা করতে থাকলেও যাত্রাকে কোনো কোনো দিক দিয়ে অনুসরণ করার প্রয়োজন যে ফুরিয়ে যায় নি এ-কথা তিনি মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যাত্রা থেকে পাওয়া বলে টমসন প্রভৃতি সমালোচকেরা মনে করেছেন। ঠাকুরদা, গানের দল— এ-সব যাত্রার দলের বিবেক বা জুড়ির দলের সঙ্গেই তুলনীয়। গান গেয়ে গেয়ে নাটকের অগ্রগতি রচনা করাও সম্ভবত যাত্রারই পদ্ধতি থেকে নেওয়া। রবীন্দ্রনাথের নাটকের একটি প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— পথের পটভূমি। খোলা আকাশের নীচে, দেয়াল-ঘেরা স্থানের বাইরে কাহিনীকে নিয়ে আসাও যাত্রার উন্মুক্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করা যায় বলে মনে করি। যাত্রার প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে বর্ণিত একটি কৌতূহলজনক ঘটনা স্মরণীয় :

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ৩৪

'আমাদের যাত্রাপালার সাফল্য দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক হইল যাত্রা লিখিবেন। একদিন আমাকে বলিলেন, "দেখ্, এবার যাত্রাপালা লিখব ভাবছি।" আমি বলিলাম, "সাহিত্যের সব পথই তো আপনার পদচিহ্নিত; এক-আধটা গলিপথও কি আমাদের মতো আনাড়িদের জন্য রাখবেন না?" আমার কথা শুনিয়া তিনি কী ভাবিলেন জানি না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যা।" ভাবটা এই, 'ও পথটা তোদেরই ছাড়িয়া দিলাম'।[১]

এই ঘটনাটির তাৎপর্য এবং রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় বোঝবার চেষ্টা করা যাক। তিনি যদি যাত্রা লিখতে যেতেন, তা হলে তিনি যে আমাদের প্রাচীন যাত্রারীতির যথাযথ অনুসরণ করতেন, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য নয়। তাঁর হাতে যাত্রা অভিনব শিল্পরূপে পরিণত হত। যাত্রার কাহিনীবিন্যাস তিনি গ্রহণ করতেন বলে মনে করি না। অথচ যাত্রার মধ্যেও তিনি অনুসরণযোগ্যতা কিছু পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই। যাত্রার রঙ্গমঞ্চহীন দৃশ্যপটশূন্য মুক্ত অভিনয়কে রবীন্দ্রনাথ আগে থেকেই বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন। রঙ্গমঞ্চ (১৩০৯) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

'আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।'[২]

অভিনয়ের ক্ষেত্রে দৃশ্যপটের যে প্রয়োজন নাই, সে কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত নাটক ও নাট্যশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে কিন্তু দৃশ্যপটের কোনো উল্লেখ নেই। দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেছেন, শকুন্তলায় রাজার রথ-ছোটানো প্রভৃতি ব্যাপার সম্ভব হত না যদি সত্যি সত্যি তাতে দৃশ্যপটের ব্যবহার আবশ্যক হত। অনুকৃতিতে যা ঘটানো যায় না কল্পনায় তা সহজেই সম্ভব।[৩]

যে নাট্যসাহিত্য অনুকরণতত্ত্বের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে, অথবা যে বাস্তবানুকরণপ্রিয়তার জন্য পাশ্চাত্যের নাট্যসাহিত্য ভারতীয় নাট্যসাহিত্য থেকে আলাদা তাতেই নাটকে দৃশ্যপট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নিহিত। বাস্তবের ভ্রম সৃষ্টি করাই সে-সব নাট্যকারের উদ্দেশ্য। কিন্তু যে আদর্শে বাস্তবানুকরণের প্রশ্ন নেই সেখানে কল্পনা বা ভাবের অনুভূতিসঞ্চারটাই নাট্যকারের লক্ষ্য।[৪] তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'আমরা অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, য়ুরোপীয়ের বাস্তব সত্য নহিলে নয়। কল্পনা যে কেবল তাহাদের

---

১ প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, ১৩৮২, পৃ ১৮৭

২ দ্র. বিচিত্র প্রবন্ধ

৩ রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টান্ত এবং ঠিক এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন কীথ তাঁর *The Sanskrit Drama*, 1924 বইতে। পৃ ৩৬৫

৪ The doctrine that the drama is an imitation (anukriti) does not differ from the doctrine of Mimesis, but there is an essential distinction in what is imitated or represented; in the Sastra it is a state or condition, in Aristotle it is action, a distinction absolutely in accord with the different geniuses of the two peoples.—Keith, *The Sanskrit Drama*, p 355

চিত্তরঞ্জন করিবে তাহা নয়, কাল্পনিককে অবিকল বাস্তবিকের মতো করিয়া বালকের মতো তাহাদিগকে ভুলাইবে।... বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য; তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে।'[১]

সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে যাত্রার যে এই দিক দিয়া মিল দেখা যায় তার কারণ কোনোটাতেই বাস্তবকে নকল করার চেষ্টা নেই। উনিশ শতকের ঠাকুরবাড়িতেও মঞ্চসজ্জায় য়ুরোপীয় অনুকরণ প্রচলিত ছিল। ইন্দিরা দেবী বলেছেন, "আমাদের রূপসজ্জা মঞ্চসজ্জা অনেকটা বিলিতী অনুকরণে হত। হ. চ. হ— হরিশচন্দ্র হালদার আমাদের দৃশ্যপটগুলি অতি নিকৃষ্ট বিলিতী অনুকরণে আঁকতেন। বাস্তবের যথাসাধ্য অনুকরণ করাই ছিল তখনকার আদর্শ। বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয়ে দিনুর ঘোড়া নিয়ে স্টেজে ঢোকা আর রিমঝিম গানের সঙ্গে অরুদাদার টিনের নল ফুটো করে বৃষ্টি নামানোর কথা অবনদাদা তো বলেইছেন।"[২] 'রাজা ও রানী' 'বিসর্জন' এবং 'প্রায়শ্চিত্তে' শেক্‌সপীয়রীয় রীতির বাস্তবানুসরণ আছে, তাতে দৃশ্যপটের ব্যবহারও ছিল। কিন্তু তার পরে রঙ্গমঞ্চসজ্জা অত্যন্ত সরল হয়ে এসেছে। সংস্কৃত নাটকেও মঞ্চসজ্জা ছিল অত্যন্ত সরল। পেছনে একটি যবনিকা এবং তার সামনে চারটি স্তম্ভ মাত্র যার আড়াল থেকে নট নটী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করত। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাটকের মঞ্চসজ্জা প্রধানত এ রকমই।[৩] 'রাজা ও রানী'তে দৃশ্যপট ও রঙ্গমঞ্চের ব্যবহার থাকলেও রাজা ও রানীর পরিবর্তিত রূপ তপতীর (১৩৩৬) ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

"আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত।... অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান্ প্রাণবান্ গতিশীল। দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক মূঢ় স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।"

'বাস্তব সত্যকে বিদ্রূপ করে' কথাটা সত্য কিন্তু 'ভাবসত্যকে বাধা দেয়'— রবীন্দ্রনাথের কাছে সেটাই বিশেষ ভাববার কথা। দর্শক ও অভিনয়ের মধ্যে কোনো ব্যবধান তিনি রাখতে চান নি। কারণ অভিনেয় কাহিনীর জগৎ দর্শকের স্থূল জগতের সঙ্গে এক হয়ে গেলেই রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় সিদ্ধ

---

১ দ্র. বিচিত্র প্রবন্ধ, 'রঙ্গমঞ্চ'

২ রবীন্দ্রস্মৃতি, পৃ ৩৭

৩ "অবনদাদার মঞ্চসজ্জার কথাও উল্লেখযোগ্য। আগেকার কালের সেই বিসদৃশ বিদেশী নকল তুলে দিয়ে তার জায়গায় পিছনে একটি নীল পশ্চাৎপট দিয়েছিলেন সেটি এখনও দেওয়া হয়।" এই বিবরণ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী দিয়েছেন 'ফাল্গুনী'-প্রসঙ্গে দ্র. রবীন্দ্রস্মৃতি, পৃ ৪০। বলা বাহুল্য মঞ্চসজ্জার এই সরল রীতি পরবর্তী অন্যান্য নাটকেও অনুসৃত হয়েছে।

হয়। দর্শক যদি অভিনয়-দর্শনান্তে এমন ধারণা নিয়ে ফেরেন যে যা-কিছু ঘটতে দেখা গেল সে-সবই ভিন্নতর জগতের এক অলৌকিক ও অবাস্তব জগতের বিষয়, আমাদের ক্ষণস্থায়ী উপভোগের রসাস্বাদনের বস্তু মাত্র, তবে কবির সত্যবোধ বস্তুতই হয়ে দাঁড়ায় অসত্য। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই তা চান নি। নাটক বা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের কাছে খেয়ালী শিল্প নয়। এ একটা গভীর জীবনবোধের বাণীবাহক। সেই সত্যবোধকে সঞ্চারিত করতে অভিনয় ও দর্শকের মধ্যে ব্যবধান থাকলে চলবে না। এখানে বিশেষ ভাবে মনে আসে ফাল্গুনী নাটকটির কথা। এর নাট্যরীতি রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের নাটক তিনটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা— ভিন্ন জাতের। ফাল্গুনীর (১৯১৬) আগে এবং প্রায়শ্চিত্তের (১৯০৯) পর রচিত রাজা (১৯১০) ডাকঘর (১৯১২) অচলায়তন (১৯১২)। প্রায়শ্চিত্ত-পরবর্তী তিনটি নাটকেই রীতির ক্রমপরিবর্তন চোখে পড়ে, ফাল্গুনীতে সেটা স্পষ্টতই নতুন এবং স্বতন্ত্র।

প্রায়শ্চিত্ত থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিমানস ও নাট্যরীতির পরিবর্তন আভাসিত হতে থাকে। ঘটনাধারার নাটকীয় জটিলতা থাকা সত্ত্বেও এতে একটা ভাব বা আইডিয়ার প্রবলতা অনুভব করা গেল। ধনঞ্জয় বৈরাগীর সঙ্গে নাট্যঘটনার যোগ অচ্ছেদ্য নয়; তার উপস্থিতি তার উক্তি এবং আচরণ নাটকে নতুন স্বাদ এবং অনুভূতির সঞ্চার করল। এই অনুভূতি সঞ্চারের সবচেয়ে বড়ো সহায়ক হল গানগুলি। গানের সুরে একটা নতুন ভাবের জগতে প্রবেশের পথ পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, নাটকে গান এই প্রথম নয়। রবীন্দ্রনাথের আগে যাঁরা নাটক লিখেছিলেন, তাঁদের নাটকে গান ছিল, রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানী বিসর্জনেও গান ছিল। সে-সব গান নাটকীয় মুহূর্তের গান, নাটকের সামগ্রিক ও মূল ভাবের দ্যোতনা তাতে থাকত না। কিন্তু এখনকার নাটকে গান একটি অত্যাজ্য লক্ষণে পরিণত হল। গানের চাবি দিয়ে এর এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে— ফাল্গুনীতে এই ছিল কবির অভিপ্রায়। গীতিনাট্য বলে নয়, প্রায়শ্চিত্তের পরে সব নাটকেই গান নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে প্রকাশ করে বলেছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে নিছক প্রমোদের প্রয়োজনে গান পরে ঢুকিয়ে দেন নি, তা নয়। কখনো গায়কের উপযুক্ততা মনে করেও গান রচনা করেছেন। কিন্তু নাটকে গান রচনা করবার সময় রবীন্দ্রনাথ সব সময়েই নাটকের কেন্দ্রীয় মর্মনিহিত ভাবটিকে স্মরণে রেখেই রচনা করেছেন। আবার এটাও লক্ষ্য করবার বিষয়, বেশ কয়েকটি গান তিনি একাধিক নাটকে ব্যবহার করেছেন— কোথাও অনাবশ্যক বা অতিরিক্ত মনে হয় নি। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'রূপে তোমায় ভোলাব না' গানটি স্মরণীয়। রাজা এবং শ্যামা দুই নাটকেই গানটি আছে। এতে এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে নাটকের ঘটনাগত পরিস্থিতি অনুসরণে যে অনিবার্যরূপেই গানটি এসেছে তা নয়, বরং অন্তর্নিহিত কবিভাবনার পুনরাবর্তনে গানেরও পুনরাবির্ভাব ঘটে থাকে।

রবীন্দ্রনাটকে গানের প্রচুর ব্যবহার বাংলাদেশের যাত্রারই অনুপ্রাণনা, এ-মতবাদ প্রচলিত ও স্বীকৃত।[১] পাশ্চাত্য নাটকে গানের ব্যবহার থাকলেও রবীন্দ্রনাটকে গানে অতিনির্ভরতা এবং তার প্রাচুর্য তাতে দেখা যায় না বলেই এরকম অনুমান ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কেউ কেউ গ্রীক নাটকের

১ উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে সংগীতচর্চার নিবিড় পরিবেশে অপেরা ও গীতিনাট্যের রচনা ও অভিনয় হয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর বসন্তোৎসব দীর্ঘকাল স্মরণীয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের নাটক— বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া ছিল গীতিনাট্য।

কোরাসের সঙ্গে এর তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন গ্রীক নাটক তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে। তথাপি সাদৃশ্য একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। দুই মতবাদেই সত্যতা আছে বলে মনে হয়।[১] বাংলার যাত্রা এবং প্রাচীন গ্রীসের নাটক দুইই গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির সৃষ্টি, একই অনুকূল পরিবেশে দুয়ের জন্ম। সংস্কৃত নাটকেও গান ছিল, কিন্তু সে-গান কোরাসের মতো নয়, কিংবা যাত্রার গানের সঙ্গেও তুলনীয় নয়। তবে এ-কথা অস্বীকার্য নয় যে রবীন্দ্রনাথ নাটকে গান যে-উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন, সেই উদ্দেশ্য তিনি প্রত্যক্ষত দেখতে পেয়েছিলেন যাত্রার মধ্যেই। গানের দ্বারাই যাত্রার অন্তর্নিহিত মর্ম শ্রোতাদের গোচর হত, তবে কারণে অকারণে গানের আধিক্য কখনো কখনো অভিনয়ের শিল্পগুণ ক্ষুণ্ণও করত। রবীন্দ্রনাথ গানকে অধিকতর সংযমের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। অচলায়তনের গানগুলি ধারাবাহিকক্রমে পড়ে গেলেই নাটকের মর্মবাণী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অথচ তারা ঘটনার গতিকে কোনো দিক দিয়েও ব্যাহত করে না। রক্তকরবী সম্বন্ধে সেই কথাই বলা যায়। ফাল্গুনী গীতিনাট্য, সুতরাং তাকে বাদ দিলেও এই মন্তব্য অন্য সব নাটক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলে মনে করি।

যে-শিল্পে শিল্পীর মন মুখর হয়ে উঠতে চায়, সেই শিল্পের পদ্ধতিতে অভিনবত্ব থাকাই স্বাভাবিক। যাত্রায় গানের ভিতর দিয়েই অভিনয়ের মর্ম ব্যক্ত হত। রবীন্দ্রনাট্যে কাহিনী ও চরিত্রের পরিকল্পনা এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে লেখকের একটি বিশেষ বক্তব্য ফুটে ওঠে। গান সেই বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করলেও কাহিনীর বিন্যাসে এবং চরিত্রকল্পনার অভিনবত্বে, তাদের নানা উক্তিতে সহজেই লেখকের চিন্তাটি প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। লেখকের বক্তব্য শোনাতে গান যথেষ্ট হয় নি বলেই নাটকে দীর্ঘ সংলাপের প্রয়োজন হয়েছে। এই সংলাপের রীতিটিও সংস্কৃত নাটকের চাতুর্যপূর্ণ বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত অলংকৃত অতিমার্জিত সংলাপভঙ্গির সঙ্গেই তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপ সাধারণ মানুষের বাস্তবগন্ধী ভাষার সংলাপ নয়। এদের ভাষা অত্যন্ত সাজানো—উপমায় শ্লেষে শব্দমাধুর্যে ভাষাসরস্বতী অতিপ্রসাধিতা গৌরবিণী। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক ইংরাজিতে চমৎকার বলেছেন :

He weaves his words into a most delicate pattern of poetic prose. He can hold up the action with talk that makes action superfluous and the merely objective relation between one character and another seem unnecessary.[২]

নাটকের অসামান্য বক্তব্যটি অসামান্য উক্তি-প্রত্যুক্তিতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো মুহূর্তে মুহূর্তে প্রভা বিকীর্ণ করতে থাকে। এই বক্তব্য অসামান্য, কেননা স্থূল জীবনের স্থূলতর সমস্যার জন্য এ ভাষার সৃষ্টি হয় নি।

বক্তব্য অসামান্য বলেই নাটকের প্লট সর্বদাই পরিকল্পিত হয়েছে সমসাময়িক জীবনযাত্রায় নয়, প্রাচীন

---

১ অজিতকুমার চক্রবর্তী ঠাকুর্দাকে কোরাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন, দ্র. কাব্যপরিক্রমা, 'রাজা', অপিচ প্রমথনাথ বিশী বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের গানের দল ও ঠাকুর্দার মূলে মেলার প্রভাব ও যাত্রার প্রভাব দুই-ই আছে বলিয়া বিশ্বাস'।—রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ২য় খণ্ড ১৯৫১, পৃ ২২

২ P. Guha Thakurata, *The Bengali Drama*, London, 1930, p 216

ভারতীয় জীবনযাত্রা থেকে, গুপ্ত বা মৌর্য যুগের রাজকীয় পরিবেশে। মনে হয় যেন রঘুবংশের রাজন্য-সমারোহে, অথবা বাণভট্টের 'মেরুরিব সকলোপজীব্যমান প্রবর্তয়িতা গোষ্ঠীবন্ধানাম আশ্রয়ো রসিকানাম্' সেই অসাধারণ রাজাদের কাহিনী দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের কথাবস্তু চয়ন করেছেন। তাঁর নাটকে এই বিশেষ কাল বা সমাজের প্রতি অনুকূলতার কারণ কি? প্রায়শ্চিত্ত পর্যন্ত নাটকের কাহিনী সম্বন্ধে এমন কথা হয়তো বলা যাবে যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটক রচনার চলতি আদর্শের সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায়। বিসর্জনের কাহিনী রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস থেকে,[১] রাজা ও রানীর কাহিনী অবশ্য কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে নেই, কিন্তু ষড়যন্ত্র ও অন্তঃপুর-বিপ্লবের ইঙ্গিত এবং সুমিত্রার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী রানী দিদ্দার কাহিনীতে পেয়ে থাকবেন। তেমনি প্রায়শ্চিত্ত (বউঠাকুরানীর হাট) নাটকের প্লট তিনি চন্দ্রদ্বীপের কাহিনীতে পেয়েছেন[২]। কিন্তু সত্য সত্যই তিনি ঐতিহাসিক নাটক লেখেন নি; ইতিহাসের সামান্য ইঙ্গিত অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব বক্তব্যকেই বড়ো করে তুলেছেন। এই নাটক তিনটিকে কেউ ঐতিহাসিক নাটক বলবেন না। তবু রাজকীয় পরিবেশে তিনি তাঁর বক্তব্যের উপস্থাপনা করেছেন। পরবর্তী নাটকে রবীন্দ্রনাথ আরো যেন কয়েক শো বছর পিছিয়ে গেলেন।

ডাকঘর ছাড়া সব গুরু-নাটকেই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় জীবনের পটভূমিতেই কাহিনীর পরিকল্পনা করেছেন। এমন-কি, মুক্তধারা বা রক্তকরবীর মতো আধুনিক সমস্যামূলক নাটকেও রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন প্রাচীন ভারতের কালপরিবেশ। রাজা সেনাপতি মন্ত্রীরাই এর চরিত্র। অচলায়তনের প্লট সংগৃহীত হয়েছে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বই থেকে[৩]। ফাল্গুনীর কাহিনীও এক রাজসভারই। শারদোৎসব নাটকটিতেও আছেন রাজা বিজয়াদিত্য, তাঁর সেনাপতি প্রভৃতি। রাজা নাটকের কথাবস্তু বৌদ্ধ সাহিত্যের।[৪] এতে কাঞ্চী কোশল প্রভৃতি দেশের রাজা রাজানুচর ও সেনাপতি মন্ত্রী প্রভৃতির অবতারণা রয়েছে। সহজেই লক্ষ্য করা যায়, কোনো গভীর বক্তব্যকে উপস্থাপন করতে গিয়ে কবি প্রাচীন ভারতীয় পটভূমি ব্যবহার করেছেন এবং জীবনের লঘু পরিহাসের চিন্তাহীন রূপ রচনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর সমকালের নাগরিক জীবনকেই কাহিনীর কাঠামোরূপে বেছে নিয়েছেন তাঁর প্রহসন ও কৌতুকনাট্যে। এর থেকে অনুমান করা সম্ভব রবীন্দ্রনাথের গভীর জীবনবোধের সঙ্গে এই নাট্যবাহনের যোগ আছে। সে-যোগ কী?

এ-কথা বলাই যথেষ্ট নয় যে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মনের বাসনা মেটাবার জন্যেই এই নাট্যবস্তু

---

১ ত্রিপুরার 'রাজমালা' (১৩০৩) গ্রন্থের লেখক কৈলাসচন্দ্র সিংহের থেকে রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি'র প্লট সংগ্রহ করেন। পরে ত্রিপুরারাজকে পত্র লিখে আরো তথ্য সংগ্রহ করেন। ১২৯৩ সালে মহারাজ বীরচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ পত্র দেন। দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা', আগরতলা, ১৩৬৮, পৃ ১০। মহারাজ বীরচন্দ্র 'রাজরত্নাকর' নামে সংস্কৃত ইতিহাস থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ লিখে পাঠান। তাতে অবশ্য পশুবলি বা কালীপূজা সম্পর্কিত কোনো প্রসঙ্গ নেই।

২ বৃন্দাবন পুতিতুণ্ড, 'চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

৩ Rajendra Lal Mitra, *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, 1882, p 311। দিব্যাবদান-মালার অন্তর্গত 'পঞ্চকাবদান' দ্রষ্টব্য।

৪ Rajendra Lal Mitra, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১১০। 'কুশজাতক'-এর কাহিনী দ্রষ্টব্য।

পরিকল্পিত হয়েছিল। একালের কঠিন বাস্তবতা থেকে দূরান্তরে স্থাপিত হয়ে পাঠকমনের কল্পনা জাগ্রত হয়— এইটুকুই কি এই যোগাযোগের একমাত্র যুক্তি? কিন্তু এ-সব নাটকে কবির মনের রসের বিলাস মাত্র নেই। এই নাটকগুলি কবির গভীর জীবনভাবনার প্রকাশক। সুতরাং এ-কথা বলা যায় প্রাচীন ভারতীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ নাটকে তাঁর জীবনসত্যকে ঠিক রূপ দিতে পারেন নি বা চান নি। বাংলা নাটকের ইতিহাসের সঙ্গে তুলনায় এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। বাংলার সামাজিক নাটকের বিষয়ও গুরু কিন্তু সে সবই সাময়িক সমস্যামূলক। কখনো কখনো মধ্যযুগের ইতিহাস-অবলম্বনে সাময়িক ভাবাবেগ পরিতৃপ্তি লাভ করেছে। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে যে-সব তত্ত্ব বা সত্যের অবতারণা করেছেন, তার কোনোটাই সাময়িক কালের নয়। রক্তকরবীতে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সমালোচনা থাকলেও মানবসভ্যতার সংকটকে তিনি মার্কসীয় দর্শনের মতো কোনো এক কালের বলে মনে করেন নি। তাই রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে তিনি এর মিল দেখিয়েছেন কিন্তু কবির মূল বক্তব্যটি নিত্যকালীন। অচলায়তনেও তেমনি একালের জাতিভেদের চিন্তা থাকলেও সে-সমস্যা এবং তার সমাধানকে তিনি সাময়িক বলে ভাবেন নি। এই নিত্যকালীন সত্যকে প্রকাশ করতে খণ্ডিত কালের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার কাঠামো উপযুক্ত হয় না। প্রাচীন ভারতীয় বা সংস্কৃত নাটকের সমাজ যেন খণ্ডকালকে অতিক্রম করে নিত্যকালে বিরাজিত। বস্তুতই সংস্কৃত নাটকের রাজা-মহারাজারা কোনো বিশিষ্ট সমাজের নয়। সুদূর অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞতার বাইরের পটে স্থাপিত হয়ে অশরীরী হয়ে গিয়েছে। এদের মধ্যে কোনো বিশেষের চিহ্ন নেই। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও প্রাচীন ভারতবর্ষের পরিমণ্ডল থাকলেও তা এতখানি সীমায়ত নয় যে নাটকের মানুষগুলি নেহাতই যুগবদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। ঐতিহাসিক বোধ রচনা করা কবির উদ্দেশ্য নয়, কবির অভিপ্রায় বাস্তব এবং পরিবর্তনশীল জীবনের স্থূলতা থেকে উদ্ধার করে কাহিনী এবং চরিত্রকে চিরদিনের অপরিবর্তনীয় সৌন্দর্যে এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, উনিশ শতকের পৌরাণিক নাটকে সংস্কৃত কাব্য-নাটকের আবহাওয়া রচনা যত স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ছিল ততখানি সাফল্য লাভ করে নি। সমগ্র নাটকে এই দিক দিয়ে রসের সমগ্রতা এবং নিবিড়তা আসে নি। তাতে এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, মাঝে মাঝে এমন চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে এবং এমন পরিস্থিতির কল্পনা করা হয়েছে, যা সেই রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাতই জন্মায়। এর কারণ মনে হয়, পৌরাণিক নাটকের রচয়িতাদের সংস্কৃত সাহিত্যের জগতে প্রবেশ রবীন্দ্রনাথের মতো এত সহজ স্বাভাবিক ছিল না। সংস্কৃত কাব্যনাটকের রস তারা এমন করে আত্মস্থ করে নিতে পারেন নি। কালিদাস-বাণভট্ট-পড়া রবীন্দ্রনাথ ভাষায় শিল্পসমৃদ্ধিতে কল্পনায় সম্পূর্ণ নতুন এক জগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। Court-poetry বলতে যা বোঝায় রবীন্দ্রনাথের মতো এমন দক্ষতার সঙ্গে সেই বস্তুকে নবরূপ দান করতে আর কেউ পারেন নি। প্রথম যুগের নাটক অপেক্ষাও পরের যুগের নাটক 'রাজা' 'ফাল্গুনী' 'মুক্তধারা' 'শ্যামা' 'তপতী'তে রাজসভার অনুপম কাব্যসৌন্দর্য সার্থক ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'তপতী'র মদনপূজা উপবনপথ ভৈরবমন্দির, 'রাজা' নাটকের কাঞ্চী কোশল প্রভৃতির উল্লেখ, পারিষদদল পথ বসন্তপূর্ণিমার উৎসব, প্রাসাদ বনভূমি অশ্বারোহণে রাজন্যবর্গ পতাকাবাহী অনুচরেরা, রানীর সহচরী, মুক্তধারায় রাজা রণজিৎ যুবরাজ অভিজিৎ, পাহাড় ঝরনাতলা উত্তরকূট

শিবতরাই— এ সবই কাদম্বরী কর্পূরমঞ্জরী রত্নাবলী বিক্রমোর্বশীয় প্রভৃতি সংস্কৃত প্রাকৃত নাটকের কাব্যময় সৌন্দর্যরসাতুর রমণীয় জগৎকে যেন ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। এমন-কি, রত্নাবলীর মায়াময় অগ্নিদহনের ঘটনাটিও 'রাজা'য় পুনরাবৃত্ত।[১] বিশেষ করে সংলাপে অগ্রাম্যপরিহাসকুশল মার্জিত বাগ্‌ভঙ্গি ধ্বনিময় অলংকারোজ্জ্বল ভাষা নাটকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রসের ঐক্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এ-নাটক বিশেষ করে তাদেরই উপভোগ্য রসের শিক্ষায় যারা শিক্ষিত, যারা সহৃদয় এবং বিদগ্ধ। কাব্যপাঠের অধিকারও সংস্কৃত আলংকারিকরাও সেই রসিকদেরই দিয়েছিলেন।

তাই রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য অচঞ্চল রসের প্রদীপশিখার মতো। নিত্যকালে তার অভিনয়। তার দেশকালের সংবাদ নেওয়ার প্রয়োজন তাই আমরা অনুভব করি না। দেশাতীত ও কালাতীত সৌন্দর্যের মধ্যে স্থাপন করে চিরন্তন সমস্যা ও চিরন্তন ভাবনাকে কবি পরিবেশন করেছেন। স্থূল জীবনধারণের আধিভৌতিক সমস্যায় যারা পীড়িত নয় এমন চরিত্র দিয়েই কবি মানবাত্মার আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠার বাণীরূপ রচনা করেছেন। যে-সমস্যা বা তত্ত্বকে পরিস্ফুট করা তাঁর বাসনা, তার অসাধারণত্ব বোঝানো যায় না হাটে-বাজারের দৈনন্দিন সংসারভারে প্রপীড়িত সাধারণ মানুষগুলিকে দিয়ে। সমস্যার গভীরতাকে বোঝাবার জন্য চাই অ-সাধারণ চরিত্র। দেবতা নয়, রাজা ও রাজসহচরদের। রক্তকরবীর রাজা শক্তিতে অসাধারণ, মুক্তধারার রাজা রাজদন্তে অসাধারণ, শারদোৎসবের রাজা সৌন্দর্যবেদনার আকুল আহ্বানে অসাধারণ। আর ফাল্গুনীর রাজা তো দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাদের আধিভৌতিক দুঃখকে অকিঞ্চিৎকর করে তোলবার জন্যেই কবির কাছে রসের দীক্ষায় দীক্ষিত। অরূপরতনের ('রাজা') রাজা মানবাত্মার নিত্য-আকাঙ্ক্ষার ধন ভগবান।

১ রত্নাবলী, চতুর্থ অঙ্ক

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৃক্ষনামের তালিকা

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবনখণ্ডে গাছ-ফুলের নামের একটি তালিকা আছে। মূল তালিকায় সম্ভবত কবির জ্ঞাত এবং শ্রুত গাছ-ফুলের নামই ছিল। তবে প্রাপ্ত পুথির তালিকায় লিপিকর-গায়কদের সংযোজন আছে মনে হয়। তাই একই নামের একাধিক বানান (যেমন, 'ভাণ্টি' ও 'ভাঁটি', 'ছাতীঅণ' ও 'ছাঞিঁয়ণ', 'আম্রই' ও 'আসন', 'আম্ব', 'আম্বু' ও 'আঁব') এবং একই নামের একই বানানে একাধিকবার উল্লেখ (যেমন, 'মহুল' ও 'ডালিম্ব')। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তালিকার সঙ্গে তুলনীয় মুকুন্দরামের তালিকা; সে তালিকাও যে নূতন নাম সংযোজনে ক্রমশ দীর্ঘতর হয়েছে তার স্পষ্ট প্রমাণ বিভিন্ন সংস্করণে তালিকার হ্রাস-বৃদ্ধি। একাধিক পুথি পাওয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তালিকারও ছোটো-বড়ো আকার ভেদ হত। তাতে অবশ্য ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই; একজন কবির নির্ভেজাল রচনা বলেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গুরুত্ব নয়। তাই কবির নিজের হোক বা একাধিক ব্যক্তির হোক, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির অংশ বলেই তালিকাটি মূল্যবান। এবং সেই কারণেই তালিকাটির পাঠোদ্ধার করে নামগুলির ইতিহাস অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায়[১] যথাসম্ভব তা করেছেন। যোগেশচন্দ্র রায়ও অনেকগুলি নামের উৎস নির্ণয় করেছেন।[২] তথাপি কয়েকটি জায়গায় এখনও সংশয় আছে। সংশয় প্রধানত পাঠ সম্পর্কে। অন্তত একটি জায়গায় পুথির লিপি স্পষ্টতই বসন্তবাবুকে বিভ্রান্ত করেছিল, আরও কয়েকটি জায়গায় বসন্তবাবুর শব্দ-বিভাগ সমর্থন করা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় পুথির অভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাঠ-সমস্যার সমাধান দুরূহ। তবে বৃক্ষনামের পাঠ স্থির করতে মুকুন্দরামের সাক্ষ্য কোনো কোনো জায়গায় মূল্যবান। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তালিকার একটি নাম 'মথুর' সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে বসন্তবাবু লিখেছিলেন, 'মথন হইবে কি?', যোগেশবাবুও লিখেছিলেন, 'বোধহয় নামটি 'মধুর'।' মুকুন্দরামের তালিকায় পাওয়া গেল 'মথুরি'। 'মথুর' এবং 'মথুরি'-র অর্থ যা-ই হোক, উৎপত্তি যেখান থেকেই হোক, শব্দটি যে 'মথন' বা 'মধুর' নয় মুকুন্দরামের সাক্ষ্যই তার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'চাম্পাতী' সম্বন্ধে বসন্তবাবুর মন্তব্য, 'বুঝা গেল না'; যোগেশবাবুও 'চাম্পাতী' পাঠে সংশয় জানিয়েছিলেন। মুকুন্দরামের তালিকায় পাওয়া গেল 'চাঁপাতী', তাতে 'চাম্পাতী' এবং 'চাঁপাতী'-র পাঠে সংশয় দূর হল। বৃক্ষনামের পাঠে এখনও যে কয়েকটি ব্যাসকূট আছে সেগুলির সমাধান অসম্ভব মনে করি না। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বৃক্ষনামের পাঠের সংশয়স্থলগুলি পুনর্বিবেচনা করে নামাবলীর যথার্থ পাঠ এবং নামের উৎস নির্দেশ করা। উদ্দেশ্য দুটি; তবে প্রধান উদ্দেশ্য যথার্থ পাঠ নির্ণয়। পাঠ স্থির হলে অর্থ ও উৎস নির্ণয়ের দায়িত্ব ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে।

---

১ সম্পাদক অর্থে এই প্রবন্ধে সর্বত্রই বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভকে লক্ষ্য করা হয়েছে।

২ 'চণ্ডীদাস', সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৪২।২, ৭২-৭৮

২

তালিকার একটি জায়গার পাঠ বসন্তবাবু এইভাবে স্থির করেছেন

আকোরল জিঙ্গালরু দ্রাক্ষ[া] সুদর্শন

এখানে 'জিঙ্গালরু দ্রাক্ষ [া]' শব্দ দুটি লক্ষণীয়। টীকায় সম্পাদক জানিয়েছেন, 'জিঙ্গালরু' হল 'জিঙ্গিনী' অর্থাৎ 'জিগের গাছ'। বসন্তবাবুর পাঠ এবং অর্থের উপর নির্ভর করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'জিঙ্গালরু'-কে '-অরু' প্রত্যয়ের উদাহরণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।[১] যোগেশবাবু অবশ্য 'জিঙ্গালরু'-র পর একটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে সঙ্গতভাবেই বসন্তবাবুর পাঠ ও অর্থে সংশয় প্রকাশ করেছেন।[২] সম্পাদক পুথির 'দ্রাক্ষ' পাঠকে লিপিকর-প্রমাদ মনে করে 'দ্রাক্ষ[া]'-য় পরিণত করেছেন, যদিও লক্ষ্য করলে কয়েকটি ছত্র পরেই তিনি 'পাকিল দ্রাক্ষা আপার' দেখতে পেতেন। পুথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল আরও বহু জায়গার মত এখানেও বসন্তবাবু পুথির 'ণ', 'ল' এবং া-কার, ি-কারের লিপিগত পার্থক্য ধরতে ভুল করেছেন। এ পার্থক্য যে তিনি কোথাও ধরতে পারেন নি তা নয়, অধিকাংশ জায়গায়ই ধরতে পেরেছেন তবে কোনো কোনো জায়গায় পার্থক্যটি একজোড়া চোখের অতি সতর্ক দৃষ্টিকেও এড়িয়ে গেছে। অন্যত্র পুথির অক্ষরের সাহায্যে 'ণ', 'ল', া-কার, ি-কারের লিপিগত পার্থক্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে[৩]; এখানে পুনরুক্তি বাহুল্য। এখানে পুথির তিনটি শব্দের ছবি দেওয়া হল, 'পাণিআল', 'তমাল' ও 'জিঙ্গালরু'।

'পাণিআল' 'তমাল' 'জিঙ্গালরু'

'পাণিআল'-এর '-ণি' এবং 'তমাল'-এর '-ল' অক্ষর দুটির আকার মনে রেখে তথাকথিত 'জিঙ্গালরু'-র ছবি দেখলে আর সন্দেহ থাকে না যে, যে-অক্ষরটিকে বসন্তবাবু া-কার মনে করেছিলেন সেটি ি-কার এবং তার পরের অক্ষরটি 'ল' নয়, 'ণ'। সুতরাং শব্দটি 'জিঙ্গালরু' নয়, শব্দটি 'জিঙ্গণি'। 'রু' অক্ষরটিকে পরবর্তী শব্দ 'দ্রাক্ষ'-র সঙ্গে যুক্ত করলে লিপিকর-প্রমাদও অনুমান করতে হয় না, আসল পাঠেরও সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং পুথির পাঠ এবং যথার্থ পাঠ হল :

আকোরল জিঙ্গণি রুদ্রাক্ষ সুদর্শন

'জিঙ্গণি' হল সংস্কৃত 'জিঙ্গিনী' Odina wodier ; 'রুদ্রাক্ষ' পরিচিত শব্দ।

৩

আর-একটি জায়গায় মুদ্রিত পাঠ এই :

রবি লোধ ছাতীঅন ভাণ্টি দুধিআকন

কসাল পিআল ডগরে

১ *The Origin and Development of the Bengali Language* (সংক্ষেপে *ODBL 697*, গ্রন্থনামের শেষে অঙ্কটি পৃষ্ঠা সংখ্যা)।

২ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৪২।২, ৭৫

৩ তারাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ১৯৭১, ২২-৭১

এই মুদ্রিত পাঠ কবি বা লিপিকরের উদ্দিষ্ট পাঠ নয় বলেই আমার ধারণা। সম্পাদকের পাঠোদ্ধারে গোলমাল হয়েছে 'দুধিআকন', 'কসাল' এবং 'ডগরে' এই শব্দ কয়টিতে। তাই শব্দ কয়টি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে গোলমালের কারণ বোঝা যাবে। 'দুধিআকন'-এর সম্পাদক প্রদত্ত অর্থ 'শ্বেত আকন্দ'। এই অর্থ দেখে বুঝতে পারি 'দুধিআকন' দুটি শব্দ। 'দুধি' বিশেষণ, অর্থ 'সাদা', 'আকন' বিশেষ্য, অর্থ 'আকন্দ'। তাই 'দুধি', 'আকন', 'কসাল' এবং 'ডগর' এই চারটি শব্দের পরীক্ষা প্রয়োজন।

প্রথমে 'দুধি' শব্দটি লক্ষ্য করা যাক। 'সাদা' অর্থে 'দুধি' শব্দটির বিশেষণ প্রয়োগের সমর্থন অন্যত্র না পেলে বুঝতে হবে অর্থটি আনুমানিক। সম্পাদক এই অর্থের সমর্থন অনুসন্ধান করে পান নি ; পেলে উদ্ধৃত করতেন, যেমন করেছেন অন্য বহু শব্দ সম্পর্কে। তাই এই আনুমানিক অর্থ সঙ্গত কিনা তা আলোচনা-সাপেক্ষ। 'দুধ' শব্দটিতে -ই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে অবশ্যই 'দুধি'-র উৎপত্তি। এই -ই প্রত্যয়ের বৈশিষ্ট্য কি, উৎপত্তি কোথা থেকে, জানা দরকার (দ্র. *ODBL* 671-75)। 'দুধি'-র -ই প্রত্যয় নিঃসন্দেহে সংস্কৃত -ইন্ থেকে এসেছে। তাই -ই (-ঈ) বিপর্যয়ে সং. দুগ্ধ -ইন্ বাঙ্গালায় 'দুধি' হয়েছে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সং. -ইন্ > বা. -ঈ (-ই) প্রত্যয়যুক্ত শব্দ কেবলমাত্র প্রাণীবাচক বিশেষ্য (কদাচিৎ বিশেষণ) রূপেই ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, সং. বল-ইন্ > বা. বলী, সং. পাপ-ইন্ > বা. পাপী, সং. গুণ-ইন্ > বা. গুণী, সং. ধন-ইন্ > বা. ধনী, সং. মাল-ইন্ > বা. মালী। তাই সং. দুগ্ধ-ইন্ > বা. *দুধী (দুধি) শব্দের একমাত্র অর্থ হতে পারে 'দুগ্ধবতী প্রাণী'। বসন্তবাবু সম্ভবত অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বেগুন-ই = বেগুনি, গোলাপ-ঈ = গোলাপী, হিসাব-ঈ = হিসাবী, দরদ-ঈ = দরদী প্রভৃতি শব্দে -ঈ (-ই) প্রত্যয়কে সাক্ষ্য মেনে 'দুধি'-র 'শ্বেত' অর্থ সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই অর্থে ইতিহাসের সমর্থন নেই। আশ্চর্যের বিষয়, যোগেশ-চন্দ্র রায়ও 'দুধি' শব্দের বসন্তবাবু প্রদত্ত অর্থ মেনে নিয়েছেন। 'দুধিআকন' পাঠ ধরলে পাঠের সঙ্গে অর্থ এমন সহজে মিলে যায় যে যোগেশবাবু বা বসন্তবাবু এই পাঠে আপত্তিজনক কিছু দেখতে পান নি। আসলে 'দুধি'ও যেমন আনুমানিক 'আকন'ও তেমনি আনুমানিক।

'আকন' শব্দটিকে বসন্তবাবু 'আকন্দ' বলে সনাক্ত করেছেন ; কিন্তু কি উপায়ে শব্দ দুটির মধ্যে এই সম্পর্ক স্থির হল তিনি তা ব্যক্ত করেন নি। মধ্য বাঙ্গালায় 'আকন' নেই, আছে 'আকন্দ'। সংস্কৃতে যদি 'আকন্দ' থাকত তা হলে বাঙ্গালায় 'আকন' আপত্তিজনক বোধ হত না। কিন্তু 'আকন্দ' শব্দটির ইতিহাস লুপ্ত। শব্দটি সংস্কৃতে নেই, আছে বাঙ্গালা, উড়িয়া এবং হিন্দীতে। শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধেও একাধিক মত। সং. অর্কপর্ণ ([১]*CDIAL* 28) এবং সং. *অর্কমন্দার (*ODBL* 456) 'আকন্দ'-র মূল বলে অনুমান করা হয়েছে। অনুমিত দুটি মূলের কোনোটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম অনুসারে সং. অর্কপর্ণ বাঙ্গালায় 'আকোন' হওয়াই স্বাভাবিক, তা ছাড়া 'আকন্দ'র অন্ত্যস্থিত '-ন্দ'-কে সং. অর্কপর্ণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আবার, ধ্বনি পরিবর্তনের পরও সংস্কৃত *অর্কমন্দার-এর '-ন্দ-' বাঙ্গালা-উড়িয়া-হিন্দীতে অটুট থাকবে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এরকম অস্বাভাবিক ব্যাপার কোনো একটি শব্দেও ঘটতে

---

১ R. L. Turner, *A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages*, (সংক্ষেপে *CDIAL*), 1966

দেখা যায় নি। মনে হয়, 'আকন্দ'-র উৎপত্তি তদ্ভব শব্দ 'আক' (<সং. অর্ক 'Calotropis gigantia') -র সঙ্গে তৎসম শব্দ 'কন্দ' শব্দের যোগে। সংস্কৃত 'অর্ক' শব্দের একাধিক অর্থ ছিল, একটি অর্থ ছিল 'সূর্য' অপরটি 'আকন্দ'। তাই সম্ভবত বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়াতে 'সূর্য' থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে উদ্ভিদ বোঝাবার জন্য 'আক'-র সঙ্গে 'কন্দ' যুক্ত হয়ে হিন্দীতে 'অকৃকন্দ' এবং বাঙ্গালা-উড়িয়ায় 'আকন্দ' হয়েছিল। বাঙ্গালা 'আকন্দ'-র অন্ত্যে স্থিত যুক্তব্যঞ্জনের '-দ' লুপ্ত হয়ে আসামী ভাষায় 'আকন' হয়েছে ।

'কসাল' শব্দটি খুবই সন্দেহজনক। সংস্কৃত 'কাষায়' থেকে প্রাকৃতে 'কাসায়', এই 'কাসায়' আধুনিক ভাষায় রূপান্তরিত হলে -স- অবশ্যই -হ-তে পরিণত হবে।· তা যখন হয় নি তখন 'কাসায়' এবং 'কসাল' বানানের প্রকারভেদ মাত্র। কিন্তু বানানের এরকম প্রকারভেদ কি সম্ভব ? তা ছাড়া, 'কসাল'-এর সম্পাদক প্রদত্ত অর্থ 'অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণ' থেকে জানছি শব্দটি 'পিআল'-এর বিশেষণ। 'পিআল'-এর বিশেষণরূপে 'কসাল'-এর ব্যবহার খুবই অস্বাভাবিক। অবশ্য 'পিআল' গাছের ফুল যদি 'কসাল' বর্ণের হয় তা হলে অনুমান করতে হয় কবির লক্ষ্য ছিল পুষ্পিত পিআল গাছ। সে অর্থ ঠিক কিনা জানি না, সে অর্থ কবির ঈপ্সিত কিনা তাও জানি না। শব্দের অর্থ নিরূপণে অনুমানের অংশটাই যদি প্রধান হয়ে ওঠে তা হলে প্রয়োজন পাঠের পুনর্বিবেচনা। বসন্তবাবুর মুদ্রিত পাঠের পুনর্বিচার করে দেখা যাচ্ছে বসন্তবাবু যে পাঠ স্থির করেছিলেন তার তুলনায় পুনর্বিবেচিত পাঠ উন্নত। 'ডুধি', 'আকন' এবং 'কসাল' শব্দগুলির অনুপযুক্ততার দিকে লক্ষ্য করে বলা যায়, বসন্তবাবুর মুদ্রিত পাঠ 'ডুধিআকন' 'কসাল' 'পিআল'-এর বিশুদ্ধ রূপ হল 'ডুধিআ কনক সাল পিআল' 'ডুধিআ'-র মূল সং. 'ডুগ্ধিকা' Asclepias rosea ; এই 'ডুধিআ' মুকুন্দরামের তালিকায় হয়েছে 'ডুদ্ধা'। সং. 'কনক' একাধিক গাছের নাম। 'সাল পিআল' শুধু পরিচিত শব্দই নয়, বাঙ্গালা কাব্য ভাষার যমজ শব্দ।

এবার 'ডগরে' শব্দটি লক্ষ্য করতে হবে। তালিকার মুদ্রিত পাঠে 'গন্ধ টগর' এবং 'ডগর' এই দুটি নাম আছে। বসন্তবাবুর ধারণা, 'টগর' এবং 'ডগর' উভয়ই 'তগরাদি বর্গের পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ'। যোগেশবাবুও 'গন্ধ টগর'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য 'ডগর'-কে 'সামান্য গন্ধহীন টগর' মনে করেছেন। সুতরাং 'ডগর' যে 'টগর'-এর প্রকারভেদ সে সম্বন্ধে বসন্তবাবু এবং যোগেশবাবু সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন। পুথিতে একই শব্দের একাধিক বানান আছে। সেই দৃষ্টান্তে 'ডগর'-কে 'টগর'-এর বিকল্প বানান মনে করলে সমস্যার একটা সহজ সমাধান হয় বটে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের অন্য উপায়ও আছে, সে উপায়ের কথা চিন্তা না করেই বসন্তবাবু এবং যোগেশবাবু 'ডগর'-কে 'টগর'-এর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে 'ড', 'ড়' এবং 'উ' এই অক্ষর তিনটিতে লিপিগত পার্থক্য নেই। আধুনিক বাঙ্গালা বর্ণমালার 'ড' অক্ষরটি পুথিতে প্রসঙ্গানুসারে কোথাও 'ড', কোথাও 'ড়' আবার কোথাও 'উ'। বসন্তবাবু এখানে অক্ষরটিকে 'ড' পড়ে 'ডগর' পাঠ স্থির করেছেন ; কিন্তু অক্ষরটিকে 'উ' মনে করে 'উগর' পাঠ স্থির করতেও বাধা নেই, যদি অর্থে না আটকায় (অক্ষরটিকে 'ড়' পড়া সম্ভব নয়, কারণ অক্ষরটি শব্দের আদিতে)। অর্থে আটকালেও 'উগর' পাঠ যে সম্ভব সে কথাটি আমাদের জানা দরকার ; কারণ, 'ডগর' পাঠ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয় হওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য 'উগর' পাঠ অর্থের দিক দিয়ে অধিকতর সঙ্গত। 'উগর' সংস্কৃতে 'উগ্র' 'Hyperanthera moringa' ; বাঙ্গালা ভাষার অভিধানকারদের মতে এই 'উগ্র' গাছ হল

'শোভাঞ্জন বৃক্ষ' অর্থাৎ 'শজনে'। তা হলে ছত্র দুটির সংশোধিত এবং সম্ভবত শুদ্ধ পাঠ হল :

রবি লোধ ছাতীঅন ভাণ্টি দুধিআ কনক
সাল পিআল উগরে

৪

প্রকারভেদ বোঝাবার জন্য অনেকগুলি গাছ-ফুলের নামের আগে বিশেষণের মত কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ; যেমন, 'আমৃত কাঙ্কড়ী', 'বিষ করঞ্জ' ইত্যাদি। এই শব্দগুলির প্রায় সব কয়টি চেনা যায় এবং বিশেষণ বলে সনাক্ত করা যায়। তবে কয়েকটি কিছু গোলমাল সৃষ্টি করেছে।

আ শ্ন ই আ ষা ঢ়ি আ

'আশ্নই আসাঢ়িআ' সম্বন্ধে বসন্তবাবুর মন্তব্য হল, 'আশ্নই' 'আশন' এবং 'আসাঢ়িআ' 'আষাঢ়িআ' এতে কিছুই স্পষ্ট হল না। যোগেশবাবু জানালেন, 'আশ্নই' হল 'আসন' এবং 'আসাঢ়িআ' তার বিশেষণ। অর্থাৎ 'আসাঢ়িআ' প্রচলিত বাঙ্গালায় 'আষাঢ়ে' (যেমন, 'আষাঢ়ে মেঘ')। যোগেশবাবুর এই অর্থ সঙ্গত মনে হয় না। 'আসাঢ়িআ' যদি 'আশ্নই'-এর বিশেষণ হয় তা হলে অর্থ হয় কি ? 'আশ্নই' আষাঢ় মাসে জন্মে এ কথা অর্থহীন। তা ছাড়া, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় বিশেষণ প্রধানত বিশেষ্যের আগে বসে। পরে যে একেবারেই বসে না, এমন নয়[১] ; এই তালিকার ভাষায় বিশেষণের এরকম বিধেয়রূপ ব্যবহার একেবারে অসম্ভব বলে বোধ হয়[২]। এই তালিকার যতগুলি শব্দ বিশেষণের মত ব্যবহৃত হয়েছে সবগুলিই বিশেষ্যের আগে বসেছে। যেমন, 'ভূমি চম্পক', 'পাকিল দ্রাক্ষা', 'ঘাটা পারলী', 'গন্ধ পিপ্পলী', 'মাহা সুন্ধী', 'পিণ্ড খাজুর', 'বন অগথ', 'সুগন্ধ চন্দন', 'গন্ধ টগর', 'বন মাহ্লী', 'কাল কাসুন্দা', 'খিরী খাজুর', 'রকত চন্দন', 'লতা আম্ব', 'লতা জাম্বু', 'বন কেন্দু' ইত্যাদি। এর মধ্যে একমাত্র 'আসাঢ়িআ' বিশেষণটি বিশেষ্যের পরে বসবে এমন মনে করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। সেই কারণে স্বীকার করতেই হবে 'আসাঢ়িআ' বিশেষণ নয়, বিশেষ্য এবং বৃক্ষনাম। শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'আষাঢ়ৗকা' থেকে। দরদীয় গোষ্ঠীর অনেকগুলি ভাষায় 'আষাঢ়ী', 'আষঢ়ী', 'আষাড়' হল Apricot গাছের নাম[৩]। বাঙ্গালা এবং সংস্কৃতে 'আষাঢ়' অর্থে 'পলাশ'।[৪]

---

১ তু. 'ভারগরুঅ', 'কংশ মাহাবীর' ইত্যাদি

২ বিশেষণের দুরকম প্রয়োগ আছে— উদ্দেশ্য প্রয়োগ এবং বিধেয় প্রয়োগ। এই দ্বিবিধ প্রয়োগের উদাহরণ 'মিষ্টি আম' ও 'আম মিষ্টি'। বিশেষণের প্রকারভেদ অসংখ্য এবং প্রকাশরীতি অনুসারে বিশেষণের ব্যবহারও বিবিধ প্রকার। মনে করা যাক, বাজার থেকে কেনা জিনিসের তালিকা দেওয়া হচ্ছে— 'তাজা মাছ, টাটকা শবজি, সরু চাল, গাওয়া ঘি, পাকা কলা আর আম মিষ্টি'। যেহেতু 'মিষ্টি'-র উদ্দেশ্য এবং বিধেয় প্রয়োগ সম্ভব তথাপি বলা চলে না তালিকার 'আম মিষ্টি' সম্ভব। 'আশ্নই আসাঢ়িআ' বাজারের তালিকার 'আম মিষ্টি'-র মত।

৩ *CDIAL* 66 67

৪ সংস্কৃত, বাঙ্গালা এবং যাবতীয় ভারতীয় আর্যভাষার অভিধানে 'আষাঢ় দণ্ড'-র অর্থ 'পলাশ কাঠের দণ্ড'। এই অর্থের মূল পৌঁছয় পাণিনি-তে ৫. ১. ১১০-১৪। সেখানে 'আষাঢ় দণ্ড' অর্থে 'পলাশ কাঠের দণ্ড' বা 'আষাঢ় ব্রত উপলক্ষে ব্রতভীর ধারণীয় দণ্ড' নির্দেশ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া শক্ত। 'প্রয়োজনম্' শব্দটিকে 'ব্রত' ব্যাখ্যা না করে সকলে 'কাষ্ঠ' ব্যাখ্যা করেছেন, এ ক্ষেত্রে 'পলাশ কাষ্ঠ'।

বন সোনাকড়ী

'বন সোনাকড়ী'-কে বসন্তবাবু বলেছেন 'বন্য অতসী'। অর্থাৎ 'বন' বিশেষণ এবং 'সোনাকড়ী' বিশেষ্য, অর্থ 'অতসী'। কিন্তু বসন্তবাবু বলেন নি, 'সোনাকড়ী'-র উৎপত্তি কোথা থেকে এবং 'অতসী'-র সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থির হল কোন্ উপায়ে। এ সম্পর্কে যোগেশবাবুর মন্তব্য অস্পষ্ট। তিনি 'বন কড়ী' এবং 'সোনা কড়ী'-কে 'বন্য লতা বিশেষ' মনে করেছেন। বলা বাহুল্য, 'বন কড়ী' তালিকায় নেই, আছে 'সোনাকড়ী'। সম্ভবত যোগেশবাবুর বক্তব্য ছিল, 'কড়ী'-র অর্থ 'লতা' এবং এখানে 'বন [কড়ী]' এবং 'সোনাকড়ী' নামে দুটি বন্য লতার নাম করা হয়েছে। যোগেশবাবু এবং বসন্তবাবুর মতে 'বন সোনাকড়ী' দুটি শব্দ। আসলে এখানে শব্দ দুটি নয়, তিনটি। শব্দ তিনটি হল, 'বন' বিশেষণ, অর্থ 'বন্য', আধুনিক বাঙলায় 'বুনো'। এই তালিকায় বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত 'বন'-এর অর্থ 'বুনো' (তু. 'বন অগথ', 'বন কেন্দু' ইত্যাদি)। 'সোনা' যে নিঃসন্দেহে বৃক্ষনাম তার সমর্থন পাওয়া যায় মুকুন্দরামের তালিকার 'দেবছাট বীরছাট জয়ন্তী সোনা' থেকে এবং মাণিকরামের তালিকা 'কাঞ্চন কেতকী চাঁপা করবীর সোনা' থেকে। 'সোনা'-র মূল— ১. তদ্ভব 'শোণক'[১] Bigonfa indica, ২. সং. 'স্বর্ণক' Cassia fistula। 'কড়ী'-র মূল সং. 'কটভী' Clitoria ternatea।

কাপাসি আসন

তালিকায় তিনবার 'আসন' গাছের উল্লেখ আছে। একবার 'আসই', দুবার 'আসন'। একবার 'আসন'-এর আগে 'কাপাসি'-র উল্লেখ আছে 'পিপ্পলী কাপাসি আসনে'। যোগেশবাবু 'কাপাসি'-কে 'আসন'-এর বিশেষণ মনে করেছেন। তাঁর ধারণা 'আসন' দুই জাতের— 'কালী আসন ইহার কাঠ কালো, আর কাপাসি আসন, কাঠ প্রায় সাদা।' যোগেশবাবুর অনুমান সত্য হতে পারে; কিন্তু তালিকায় 'কালী আসন' নেই, সেই কারণে 'কাপাসি'-কেও বিশেষণ মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। দুই জাতের 'আসন'-কে স্বতন্ত্রভাবে তালিকাভুক্ত করাই যদি কবি-লিপিকরের লক্ষ্য হত তা হলে তিন জায়গায় 'আসন'-এর উল্লেখ পাওয়া যেত না। 'কালী আসন' এবং 'কাপাসি আসন'-এর উল্লেখ একসঙ্গে না পাওয়া পর্যন্ত 'কাপাসি'-কে বিশেষণরূপে গণ্য করা অন্যায়। এই তালিকার 'কাপাসি' সংস্কৃত 'কার্পাসী' থেকে উৎপন্ন বৃক্ষনাম মনে না করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই।

করঞ্জ করণে

এই শব্দ দুটি নিয়ে বসন্তবাবু খুবই সমস্যায় পড়েছিলেন। সমস্যা 'করণে' নিয়ে। তাই শব্দ সূচিতে 'করণে'-র পর একটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল। 'করঞ্জ' এবং 'করঞ্জক' দুটিই যে সংস্কৃত শব্দ সে কথা বসন্তবাবু অবশ্যই জানতেন। কিন্তু তালিকার অন্যত্র 'বিষ করঞ্জ' আছে বলে বোধ হয় সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য তিনি এ জায়গায়ও 'করঞ্জ' পাঠের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে পরবর্তী সংস্করণগুলিতে কোন্ যুক্তিতে 'করঞ্জক বরণে' পাঠ তিনি সমর্থন করতে পেরেছিলেন তা অনুমান করা শক্ত। পুথির পাঠ 'করঞ্জক রণে'

১ **Sukumar Sen, *An Etymological Dictionary of Bengali*, 1971.** (সংক্ষেপে *EDB*)।

যথার্থ পাঠ নয় এমন মনে করবার হেতু নেই। সংস্কৃত 'রণ-' ধাতুর একটি অর্থ 'আনন্দদায়ী'। সেই অর্থে শব্দটি এখানে প্রযুক্ত হয়েছে মনে করা অসঙ্গত নয়।[১]

৫

তালিকার দুটি জায়গায় পাঠের সমস্যার সমাধান বোধ হয় অসম্ভব, অন্তত দ্বিতীয় পুথি না পাওয়া পর্যন্ত। প্রাপ্ত পুথির পাঠ অর্থহীন। লিপিকর-প্রমাদ অনুমান করে বসন্তবাবু যে পাঠ স্থির করেছেন তাও সঙ্গত মনে হয় না। পুথির এক জায়গায় আছে

আতভড়িআতজিআআপূতবণে

এই শব্দ পরম্পরার মধ্যে পরিচিত শব্দ একটি-'বণে'। শব্দটি আসলে 'বণ' (তু. 'রকত চন্দন বন'), 'লোচনে'-র সঙ্গে অন্ত্য মিল রক্ষার জন্য 'বণে' হয়েছে। অন্য শব্দগুলি সম্পূর্ণ অপরিচিত। বসন্তবাবুর অনুমান লিপিকরের প্রথম ভুলে দুইবার 'আত' লেখা হয়েছে, দ্বিতীয় ভুলে 'পূত'-এর পরিবর্তে 'আপূত' লেখা হয়েছে। লিপিকর-প্রমাদ অনুমান করলে ছত্রটির মাত্রাসংখ্যা দাঁড়ায় ১০, অন্যথায় ১৩। গানটি ত্রিপদী, মাত্রাসংখ্যা মোটামুটি ৮+৮+১০। এটুকু বলা চলে, এই গানের তৃতীয় ছত্রের কোনোটিই ১৩ মাত্রার নয়, অধিকাংশগুলিই ১০ মাত্রার। সুতরাং লিপিকর-প্রমাদ অনুমানের সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু জানা দরকার লিপিকর ভুল করেছেন কোথায়। লিপিকর যদি প্রকৃতই ভুল করে থাকেন এবং সে ভুল যদি বসন্তবাবু সনাক্ত করে থাকেন তা হলে আশা করব ভুল সংশোধন করলেই পাঠের অর্থ স্পষ্ট হবে। লিপিকরের ভুল সংশোধন করে বসন্তবাবু স্থির করলেন পাঠ হবে 'আতভড়ি জিআপূত বণে'। এতেও সমস্যার সমাধান হল না। বসন্তবাবু বলেছেন, 'আতভড়ি'-র অর্থ 'আতমোড়ি', তাতে শব্দটির দুর্বোধ্যতা দূর হল না। বসন্তবাবুর লক্ষ্য সম্ভবত মুকুন্দরামের তালিকার[২] 'আতমোড়ি' (বা 'আঁতমোড়া)। মুকুন্দরামের তালিকার পাঠ এখনও আনুমানিক। তবে একথা ঠিক যে মুকুন্দরামের কোনো কোনো সংস্করণে 'আতমোড়ি'-র উল্লেখ আছে। এই 'আতমোড়ি' খুব সম্ভব সংস্কৃত 'আত্মমূলী' Alhagi maurorum থেকে উৎপন্ন। কিন্তু শব্দটির সঙ্গে 'আতভড়ি'-র সম্পর্ক কল্পনা করা যায় না। 'জিআপূত' সম্পর্কে বসন্তবাবুর বক্তব্য, শব্দটি '১২শ শতকের রূপ 'পূতাজিআ' এবং সংস্কৃত রূপ 'পুত্রঞ্জীব'-এর আধুনিক রূপান্তর। 'পুত্রঞ্জীব'-এর সঙ্গে 'পূতাজিআ'-র সম্পর্ক স্পষ্ট। কিন্তু একথা অবিশ্বাস্য যে 'পূতজিআ' লিপিকর প্রমাদে 'জিআআপূত' হয়েছে ('জিআপূত' বসন্তবাবুর সংশোধনের ফলে, পুথির অর্থাৎ লিপিকরের পাঠ 'জিআআপূত')। পুথির পাঠে তিন দফা পরিবর্তনের পর বসন্তবাবুর আকাঙ্ক্ষিত 'পূতজিআ'-য় পৌছোন

১ তালিকার প্রত্যেকটি শব্দই যে গাছ বা ফুলের নাম, এমন মনে করার কারণ নেই। তালিকায় ক্রিয়া, সর্বনাম, বিশেষণ প্রভৃতি পদও আছে। সেগুলি নাম নয়; যেমন, 'যত তরু মিষ্ট ফলে', 'পাকিল দ্রাক্ষা আপার', 'শোভে চারিপাশে', 'টাভাগণে'। এখানে 'যত', 'তরু', 'মিষ্ট', 'আপার' '-গণ' ইত্যাদি যে নাম নয় তা বিশেষ করে বলবার প্রয়োজন ছিল না, যদি-না 'সাজে' ও 'রা[]জে' অর্থাৎ 'শোভা পায়' যোগেশবাবুর তালিকায় বৃক্ষনামে পরিণত হত। এখানে 'রণে', 'সাজে' ও 'রা[]য়' জাতীয় ক্রিয়াপদ।

২ যোগেশবাবুও 'আতভড়ি' (যোগেশবাবুর উদ্ধৃতিতে এক জায়গায় 'আতভোড়ি') কে 'আঁত-মোড়ি'-র লিপিকর প্রমাদ মনে করেছিলেন। দ্র. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৪২।২, ৭১।

যায়। পুথির পাঠে এরকম গুরুতর হস্তক্ষেপ করার অধিকার সম্পাদকের নেই। তাই এ জায়গার পাঠের সমস্যা আপাতত সমাধানের অতীত, একথা বললে সম্পাদকের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না। তবে নিতান্তই যদি কৌতূহল নিবৃত্ত করতেই হয় তা হলে অনুমানের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রমাণ অভাবে অনুমানে ক্ষতি নেই, কিন্তু অনুমান অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো হলেই ক্ষতিকর। অনুমান করা যেতে পারে মূল পাঠ ছিল :

আত ভড়ি জিআ পূত বণে

বসন্তবাবুও এই পাঠ অনুমান করেছিলেন কিন্তু তাঁর শব্দ বিভাগ ও ব্যাখ্যা ছিল অন্যরকম। এখানে 'আত'—১. সং. 'অন্ত্র' Convolvolus Argenteus, ২. তামিল 'অত' Ficus glomerata ; 'ভড়ি'—সং. 'ভণ্ডীর', প্রা. 'ভংডী' Acacia sirissa ; 'জিআ'— সং. 'জীবক' বৃক্ষনাম ; 'পূত'— সং. 'পূত' Flacaurita Sapida। লিপিকর ভুল করেছিলেন এই অনুমানকে সত্য বলে মেনে নিয়ে এই পাঠ স্থির করা হয়েছে। কিন্তু ভুলের বোঝা লিপিকরের স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়ার আগে একথাও মনে রাখা দরকার যে পুথির এই পাতার উপর সংশোধক চোখ বুলিয়েছিলেন এবং যে একটি মাত্র ভুল তাঁর চোখে পড়েছিল সেটি তিনি সংশোধনও করে দিয়েছিলেন।

৬

তালিকার আর-একটি জায়গায় পুথিতে আছে

চেরুবেরুঅফেরুস জলপায়ি

প্রথম সংস্করণে এই শব্দ-পরম্পরার মুদ্রিত পাঠ ছিল, 'চেরু বেরু অফেরুস জলপায়ি'। এই পাঠ সম্পর্কে সম্পাদকের মন্তব্য ছিল, 'অফেরু' বোধহয় 'সফরি' লিপিকর প্রমাদে 'স' স্থানে 'অ'। 'চেরু' পাঠ সম্বন্ধে গুরুতর সংশয় না থাকলেও 'চেরু'-র অর্থ বসন্তবাবু স্থির করতে পারেন নি। 'বেরু'-কে তিনি মনে করেছিলেন 'বদর' এবং 'অফেরু'-কে 'সফরি' অর্থাৎ 'পেয়ারা'[১]। তবে 'জলপায়ি'-র আগে ত্রিশঙ্কুর মতো যে 'স'-টি আছে সেটি কি এবং সেটি কোনো শব্দের আদি বা অন্ত্য কিনা সে সম্বন্ধে বসন্তবাবু সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। প্রথম সংস্করণের এই পাঠ দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধিত হয়ে দাঁড়াল— 'চেরু বিরুঅ সফেরু[১] জলপায়ি'। পাদটীকায় জানিয়ে দেওয়া হল পুথিতে 'ফেরুস', যদিও সংবাদটি ষোলো আনা সত্য নয়। সে কথা বাদ দিলেও একটা বিষয় লক্ষ্য করতে পারছি, বসন্তবাবু নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছেন এখানে লিপিকর প্রমাদ আছে। কিন্তু প্রমাদটা কোথায় ধরতে না পেরে প্রথম সংস্করণে এক জায়গায় দ্বিতীয় সংস্করণে আর এক জায়গায় তা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। চতুর্থ এবং পরবর্তী সংস্করণগুলিতে আর এক দফা সংশোধনের পর পাঠ দাঁড়াল —'চেরু বেরু সফেরু[২] জলপায়ি'। ততদিনে 'চেরু'-র অর্থের সন্ধান বসন্তবাবু পেয়ে গেছেন মলয়লম চেরু নারিঙ্গা অর্থে নেবু, সংক্ষেপে চেরু। এই অর্থ ঠিক হোক বা না হোক, 'চেরু' পাঠ সম্পর্কে কোনো গোলমাল নেই মনে করা যেতে পারে। সুতরাং আদিতে 'চেরু' এবং অন্ত্যে 'জলপায়ি' ছেড়ে দিলে গোলোযোগ থেকে যায় 'বেরু অফেরুস' শব্দ পরম্পরায়। টেনেবুনে

---

১ এই অর্থে যোগেশবাবু তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, 'ষোড়শ খ্রীস্ট শতাব্দেও পেয়ারা উত্তর-ভারতে অজ্ঞাত ছিল।'

২ দ্বিতীয় সংস্করণের মূল পাঠে 'সফেরু' কিন্তু শব্দটি যখন টীকায় উদ্ধৃত হয়েছে তখন 'অফেরু'।

'বেরুঅ'-র একটা অর্থ করা যায়[১] ; কিন্তু 'ফেরুস' দুর্বোধ্য। এই দুর্বোধ্যতা দূর করার কোনো উপায় এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি। বসন্তবাবু লিপিকর-প্রমাদ অনুমান করে দুর্বোধ্যতা দূর করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পুথির পাঠ যেখানে দুর্বোধ্য সেখানেই যদি লিপিকর-প্রমাদ অনুমান করে সম্পাদক একটি পাঠ দাঁড় করিয়ে দেন তা হলে পুথির একটা বৃহৎ অংশের পাঠ হয় আনুমানিক। এই প্রবন্ধের অন্যত্র দেখা গেছে লিপিকর-প্রমাদ অনুমান করে পুথির বিশুদ্ধ পাঠকে সম্পাদক বিকৃত করেছেন (দ্র. 'আকোরল জিঙ্গালরু দ্রাক্ষ [।] সুদর্শন')। একথা যেমন ঠিক, তেমনি আবার লিপিকর যে অসংখ্য জায়গায় ভুল করেছেন তার প্রমাণও ছড়ানো আছে পুথির পাতায়। এ ক্ষেত্রে সম্পাদকের কর্তব্য কি ? কর্তব্য অতিশয় সহজ। পাঠের দুর্বোধ্যতাকে সুবোধ্য করার অন্য উপায় না পেয়ে লিপিকর-প্রমাদের আশ্রয় নেওয়া সম্পাদকের অক্ষমতার পরিচায়ক ; যা আজ দুর্বোধ্য তা কাল নতুন কোনো প্রমাণের জোরে সুবোধ্য হতে পারে। যোগেশবাবুর কাছে 'সাতকড়া' দুর্বোধ্য ছিল, মাধবাচার্যের সাক্ষ্যে সুকুমার সেন সে দুর্বোধ্যতা কাটিয়ে দিয়েছেন। এখানে পুথির পাঠ 'বেরুঅ ফেরুস' অবিকৃত রেখে দিলে বসন্তবাবুর কৃতিত্ব খর্ব হত না ; লিপিকর-প্রমাদ হাতড়াতে গিয়ে তিনি নিজেকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং জটিল ব্যাপারকে জটিলতর করে তুলেছেন। বসন্তবাবুর অনুমিত 'অফেরু' 'সফেরু'-কে অগ্রাহ্য করে বলতে দ্বিধা নেই 'চেরু বেরু অফেরুস' শব্দ-পরম্পরার পাঠ-সমস্যার সমাধান হয় নি, সমাধানের চাবি খুব সম্ভব 'ফেরুস' শব্দটিতে আছে।

৭

বর্ণানুক্রমিক যে তালিকা এখানে মুদ্রিত হল তাতে বৃন্দাবন খণ্ডের ৮-সংখ্যক গানে উল্লিখিত গাছ-ফুলের নামগুলিই পাওয়া যাবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আরও বহু গানে গাছ-ফুলের উল্লেখ আছে সেগুলি এই তালিকায় ধরা হয় নি। তালিকায় গাছ-ফুলের বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয় নি ; যোগেশবাবু সে চেষ্টা করে সফল হয়েছিলেন, বলা যায় না। স্থান ও কাল-ভেদে গাছের নামের ভেদ হয়। এই তালিকার লক্ষ্য নামের উৎস-নির্ণয়, সে লক্ষ্যেও সব ক্ষেত্রে পৌছোন যায় নি। মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে গাছের নাম সংগ্রহের ব্যাপক চেষ্টা করা হয় নি (কোনো উৎসাহী গবেষক এই কাজে অগ্রসর হলে আমরা লাভবান হবো), প্রসঙ্গক্রমে দু-চারজনের রচনায় যে কয়েকটি নাম পাওয়া গেছে সেগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তালিকার পাশে উদ্ধৃত হয়েছে।

অগথ— সং. অগস্তি, প্রা. অগথি, Agasti grandiflorum ; তালিকায় 'বন অগথ'।

---

১ ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের 'বেড়্'র উৎপত্তি *বেণুক থেকে (*EDB* 688) মনে করা হয়। সেই দৃষ্টান্তে 'বেরুঅ'-র উৎপত্তি *বেণুক থেকে সহজতর হয়, -ড়- | -র- গোলযোগ অসাধারণ ব্যাপার নয়। আবার 'বেরঅ-'কে যদি 'বিরুঅ'-র বিকৃতি বলে মনে করি (স্বরধ্বনির এরকম বিকৃতিও অসাধারণ ব্যাপার নয়) তাহলে শব্দটির উৎপত্তি হতে পারে সং. 'বীরুধ', প্রা. 'বিরুহ', অর্থ 'একপ্রকার লতা' (*CDIAL* 698)। বসন্তবাবুর পাঠ 'বেরু'ই যদি যথার্থ পাঠ হয় তা হলে শব্দটির উৎপত্তি সং. 'বদর', প্র. 'বঅর থেকে ; সিন্ধীতে Zizyphus Jujuba হল 'বেরু' (*CDIAL*)। এই প্রসঙ্গে (*ODBL* 421) দ্রষ্টব্য। তু. 'বেউর মন্দার', সুকুমার সেন সম্পাদিত বিষ্ণু পাল-এর 'মনসা মঙ্গল', ১৯৬৮, পৃ ৫৭। এখানে 'বেউর' অর্থে 'বাঁশ'।

আকোরল— সং. অক্ষোট, প্রা. অক্‌খোড়, অকখুল, Aleurites triloba। আগরু— সং. অগরু, Aquilaria agallocha। আড়য়ি— সং. আঢ়কী, প্রা. আঢ়ঈ, Cajanus indicus; বসন্তবাবু, 'পীচজাতীয় তরু'; যোগেশবাবু, 'কোন বন্য গাছ হইবে।' আত— ১. সং. অন্ত্র, Convolvulus, ২. তামিল. অত, Ficus glomerata। আমুলিঅ— সং. আমলিকা, তেঁতুল গাছ। আম্ব— সং. আম্র, প্রা. আংব, আধুনিক বাঙ্গালায় 'আম'। আম্ব—আম্ব দ্রষ্টব্য; তালিকায় আমের উল্লেখ আছে চার বার। একবার 'চালনি আঁব', আর একবার 'লতা আম্ব'। 'চালনি' এবং 'লতা' হয়ত আমের প্রকার ভেদ। যোগেশবাবুর ধারণা, 'লতা আম্ব' হল 'লতানিয়া আমগাছ' আর 'চালনি আঁব' 'কলমের আম'। বসন্তবাবু অবশ্য 'চালনি'-কে 'পুন্নাগ' মনে করেছিলেন। আম্বড়া—স'. আম্রাতক, প্রা. আংবাড়য়, উড়িখা. আম্বড়া, মুকুন্দরাম, আমড়া, Spondias mangifera। আর্জুন—সং. অর্জুন, Terminalia Arjuna; মুকুন্দরাম, অর্জুন। আশোক—সং. অশোক, মালাধর বসু, অসোক, Jonesia As´oka Roxburghii। আসন—সং. অশন, Terminalia tomentosa। আসাঢ়িআ- সং. আষাঢ়ীকা (দ্র, *CDIAL*,), Apricot; তু.উড়িয়া আসাঢ়ুআ 'এক প্রকার শবজি'। আসই—সং. অশন, প্রা. অসণ, নেপালী. অসা; দ্র. আসন। তালিকায় 'আসই'-এর উল্লেখ একবার, তবে 'আসন'-এর উল্লেখ দুবার—'পিপলী কাপাসি আসনে' ও 'কাল কাসুন্দা আসনে'। এখানে 'আসনে/আসনে' অন্ত্যমিল হয়েছে। শব্দটি যদি 'আসন'-ই হয় তাহলে কোন্ উদ্দেশ্যে 'আসনে' করা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না, অন্তত মিলের উদ্দেশ্যে নয়। আঁওল—সং. আমলক, মালাধর বসু 'আওলা,' মুকুন্দরাম 'আমলা', Phyllanthus emblica। আঁকোড়—সং. অঙ্কোট, মুকুন্দরাম 'আকড়', ঘনরাম 'আঁকোড়', Alangium hexapetalum।

উগর—সং. উগ্র, Hyperanthera moringa।

ওড়—সং. ওড্র, মুকুন্দরাম 'ওড়', ঘনরাম 'ওড়জবা', Hibiscus rosa sinensis।

কটুজ—সং. কুটজ, Wrightia antidysenterica। কড়ী—সং. কটভী, Clitoria ternatia। কড়ুম—সং. *কুত্ম? কড়য়ি—১. সং. কটভী, Cardiospermum halicacabum, ২. সং. কলায়, Pisum sativum, ড়/ঢ়/ল বিপর্যয় অসাধারণ নয়; বসন্তবাবু, 'কড়য়ি=কড়ুই', অর্থ 'শ্বেত শিরীষ'। কদম্ব—সং. কদম্ব, Nauclea cadamba। কদলক—সং. কদলক, Musa sapientum, মুকুন্দরাম 'কড়লি'। কনক—সং. কনক, Mesua ferrea, মুকুন্দরাম 'কনক'। কপিথ—সং. কপিথ, মাধবাচার্য 'কপিত্থ', Feronia elephantum। কমলা—দ্র. '*EDB*'। করবীর—সং. করবীর, মুকুন্দরাম 'করবীর', মাণিকরাম 'করবির', Nerium odorum। করঞ্জক—সং. করঞ্জক, মুকুন্দরাম 'করঞ্জী, করঞ্জা, করঞ্জ', তালিকার অন্য জায়গায় আছে 'করঞ্জ', Pongamia glabra।

কাঙ্কড়ী—সং. কর্কটী, প্রা. কক্‌কডী; তালিকায় আর এক প্রকার 'কাঙ্কড়ী' আছে, নাম 'অমৃত কাঙ্কড়ী', Cucumber। কাণ্ঠোআল—সং. কণ্ঠফল, Jack fruit। কাঞ্চন—সং. কাঞ্চন, মুকুন্দরাম 'কাঞ্চন', ঘনরাম 'কাঞ্চন', Bauhinia Variegta। কাপাসি—সং. কার্পাসী, Gossypium herbaceum। কামরঙ্গ—সং. কর্মরঙ্গ, মুকুন্দরাম 'কামরঙ্গ', মালাধর বসু 'কামবাঙ্গা', Averrho

Carambola। কাশিমল—সং. কা-শাল্মলী, মুকুন্দরাম 'কাসীমালা', Bombax heptaphyllum। কাসুন্দা—সং. কাশমর্দক, প্রা. কাসমদ্দগ, মুকুন্দরাম 'কাসুন্দা', তালিকায় 'কাল কাসুন্দা', Cassia sophora। কিংশুক—সং. কিংশুক, Butea frondosa। কুজা—সং. কুব্জক, Trapa bispinosa। কুন্দ—সং. কুন্দ, Jasminum mulliforum। কুশিআর—সং. কোশকার, মৈথিলী. 'কুসিআর', অর্থ 'ইক্ষু' বা 'আখ'। কুসুম্ভ—সং. কুসুম্ভ, মুকুন্দরাম 'কুষুম', Carthamus linctorius। কুহয়—সং. ককুভ, Terminalia arjuna। কেন্দু—সং. কেন্দু, Diospyros tomentosa। কেশর—তু. নাগেশর, মুকুন্দরাম 'কেশর', মালাধর বসু 'কেসর'।

খঞ্চী—? বসন্তবাবু, 'লতা ভেদ, খাঞ্চ নামে পরিচিত'। খদির—সং. খদির, Acia catechu। খরমুজা—ফার্সী. খরবুজ। খিরি খাজুর—সং. ক্ষীর খর্জুর, মালাধর বসু 'খর্জুর খিরি'; অর্থ, 'খেজুর'।

গম্ভারী—সং. গম্ভারী, মুকুন্দরাম 'গাম্ভারী', মাধবাচার্য 'গাম্ভারী', Gmelina arborea। গর্জ্জন—? গুআ—সং. গুবাক, মুকুন্দরাম 'গুয়া', মালাধর বসু 'রাম গুয়া', Arca catechu।

ঘন—সং. ঘন, Cyperus hexastychus Communis।

চন্দন—সং. চন্দন। চাকলি—সং. চক্রকুল্যা, উড়িয়া, 'চাকুলিআ', মুকুন্দরাম 'চাকুল্যা', Hermionitis Cardifolia। চাম্পাতী—সং. চম্পকাবতী, Bread fruit tree, মুকুন্দরাম 'চাঁপাতী'। চাম্ভলী—সং,* চম্পবল্লী, উড়িয়া 'চম্বেলী', Jasminum grandiflorum (দ্র, *CDIAL.*)। চালিতা—সং. চারিত্রা Dillen Speciosa, মুকুন্দরাম 'চালিতা'। চিতা—সং. চিত্রক, রামকমল বিদ্যালঙ্কার, 'সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান' (১২৯৫) অনুসারে 'চিত্রক' এর নামান্তর 'তিলক' Sesamum indicum। চুআঁ—সং. চূতক Celosia argentia, মালাধর বসু 'চুআ'। চেরু—? ১. সং. ছেলু, Veronica authelmintica, ২. 'চেঁউর' ফল বিশেষ।

ছাতিঁয়ণ সং. ছত্রপর্ণ, Alstonia Scholaris। ছাতীঅন—ছাতিঁয়ণ দ্রষ্টব্য। ছোলঙ্গ—সং. ছোলঙ্গ, Citron, মুকুন্দরাম, 'ছোলঙ্গ'।

জয়ন্তী—সং. জয়ন্তী, Sesbania aegyptica; মুকুন্দরাম 'জয়স্তি'। জলপায়ি—? জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস-এর অভিধান অনুসারে সং. জম্বুপাদপ, Olive। জাম্বীর—সং. জম্বীর, উড়িয়া, 'জম্বীর'. Lemon, মুকুন্দরাম, 'জাম্বির'। জাম্বু—সং. জম্বু, প্রা. জংবু, Eugenia jamblana, মুকুন্দরাম 'জাম'। জিঙ্গণি—সং. জিঙ্গিণী, Odina Wodier।

টগর—সং. তগর, Tabernae montana coronaria। টাভা—? মুকুন্দরাম 'টাবা' (দ্র. *EDB*)

ডালিম্ব—সং. দাড়িম্ব, Pomegranate, মুকুন্দরাম 'দাড়িম্ব'। ডোহাকু—সং ডহু, প্রা. ডাউ Artocarpus lakuca, মুকুন্দরাম 'ডে'।

তমাল—সং. তমাল, Xanthochymus pictorius। তাল—সং. তাল, Palmyra। তিণিশ—(পুথিতে 'তিলিশ') সং. 'তিনিশ, Delberiga ougeineusis। তেজপাত—? সং. ত্বচ-এর একটি

অর্থ 'গাছের ছাল'। 'ত্বচ' থেকে 'তেজ'? তেন্তলি—সং. তিন্তিড়ী, তিন্তিলীকা, Tamarindus indica।

থেকর— ? জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে 'থৈকোল' Gareiria penduculta ; জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এই তথ্য পেয়েছিলেন উইলিয়াম কেরীর অভিধান থেকে। কেরী 'থৈকর' বা 'থৈকোল' শব্দের উৎপত্তি নির্দেশ করতে পারেন নি বা চেষ্টাও করেন নি।

ছুধিআ—সং. ছুঞ্চিকা, উড়িয়া. 'ছুধি আ', Oxystema esculentum ; মুকুন্দরাম, 'ছুদ্ধে'।
দেবদারু—সং. দেবদারু, Himalayan Cedar। দ্রাক্ষা—সং. দ্রাক্ষ, Vine ; মুকুন্দরাম, 'দ্রাক্ষা'।

ধব—সং. ধব, Anogeissus Latifolia, মুকুন্দরাম, ধব। ধাতকী—সং. ধাতকী, Grislea tomentosa, মুকুন্দরাম, 'ধাতকী'। ধুতুর—সং. ধুস্তুরা, Thorn apple ; মুকুন্দরাম, 'ধুতুরা'।
নব—সং. নব='রক্ত-পুনর্‌-নবা', বৃক্ষনাম। নাকড়ী—*সং. নর্কটিক (দ্র. *EDB 477*)। নাগরঙ্গ—সং. নাগ, Rottleria tinctoria, +রঙ্গ=বর্ণ, লাল। নাগেশর—সং. নাগ কেশর, Mesua roxburghii ; মুকুন্দরাম, নাগেশ্বর ; তু. 'কেশর'। নারিকেল—সং. নারিকেল, মালাধর, নারিকেল।

পদ্মকাষ্ঠ—সং. পদ্মকাষ্ঠ, ওষুধের জন্য ব্যবহৃত সুগন্ধি কাঠ। পাকড়ী—সং. পর্কটী, Ficus infectoria ; মুকুন্দরাম, 'পাকড়ি' ; মালাধর, 'পাকুড়ি' ; মাধবাচার্য 'পাকড়ি'। পাণিআল—সং. পানীয়ামলক, Falcaurita cataphracta ; হিন্দী. 'পানিয়ালা/পাণিষারা'। পারলী—সং.পাটলী, Bignonia Suaveolens, মুকুন্দরাম, 'পারলী/পারুলী'। পিআল—সং. প্রিয়াল, Buchanania litifolia। পিণ্ডার—সং. পিণ্ডার, Flacaurita sapida ; মুকুন্দরাম, 'পিড়িরা'। পিপলী—সং. পিপ্পল, Ficus religiosa ; মুকুন্দরাম, 'গজ পিপ্পলি', তালিকায় 'গন্ধ পিপ্পলী'ও আছে। পূত—সং. পূত, Flacaurita sapida (তু. 'পিণ্ডার')। পেহুটী— ?

বদরী—সং. বদরিক, Zizyphus jujuba। বন্ধুলী—সং. বন্ধুলী, Pentapetes phoencea। বর—সং. বর, Coccus cardifolius। বহড়া—সং. বিভীদক, Terminal bellerica ; মুকুন্দরাম,'বহেড়া' ; মাধবাচার্য 'বহেড়া'। বহুল—সং. বহুফল, Solanum indicum ; মাধবাচার্য, 'বহুলা'। বসন্তবাবু এবং যোগেশবাবুর ধারণা 'বকুল' থেকে 'বহুল'-র্‌ উৎপত্তি। বাঙ্গী— ? 'কাঁকুড়'। বাজবারণ—যোগেশবাবুর ধারণা সং. 'বজ্রবৃক্ষ' থেকে উৎপন্ন। 'বজ্র' থেকে 'বাজ' অবশ্যই, কিন্তু 'বৃক্ষ' থেকে 'বারণ' অসম্ভব। বাড়িআল—সং. *বাটিয়াল, বাট্যালক ; উড়িয়া. 'বাড়িআঁল', হিন্দী. 'বারিআরী', Sida Cordifolia। বাসক—সং. বাসক, Justicia ganderussa। বেরুঅ—পূর্বে দ্রষ্টব্য। বোহারী —সং. বহুকারী, প্রা. বউহারী, Salvinia Cucullata ; মুকুন্দরাম, 'বোহারি', মালাধর বসু, 'বোহারি'।

ভাণ্টি—জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের মতে সং. 'ভাণ্ডীর' থেকে উৎপন্ন। এই উৎপত্তি অসম্ভব বোধ হয়। ভালা—সং. ভল্লাতক, Semecarpus anacardum ; মুকুন্দরাম, ভালা ; মাণিকরাম, 'ভেলাই'। ভিলোল—সং. ভিল্লোটক (=ভিল্লতরু), Symplocos racemosa। ভূমি চম্পক—সং. ভূমি-চম্পক, Kemferia rofunda। ভোজপাত—সং. ভূর্জপত্র, Betula bhojapatra।

মথুর— ? মুকুন্দরাম, 'মথুরি'। মধুকর—সং. মধুকর (=ভৃঙ্গরাজ), Eclipta prostrata। মন্দার—সং. মন্দার, Calotropis giganta। মহুকুত— ? মহুল—সং. মধুক+ল, Bassia latifolia। মাহ্লী— ?

রবি—বসন্তবাবু এবং যোগেশবাবু 'রবি'-কে 'রক্ত আকন্দ' মনে করেছেন। মনিয়র উইলিয়ামস-এর অভিধানে 'রবি'-র অর্থ 'রক্ত আকন্দ' নেই ; তবে অধিকাংশ বাঙ্গালা অভিধানে আছে। শব্দটি ঐ অর্থে এখানে প্রযুক্ত হয়েছে কিনা বিচার সাপেক্ষ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে 'রবি লোধ', কবিকঙ্কণে আছে 'ভানু লোধ'। 'লোধ' নিয়ে গোলমাল নেই। 'রবি' এবং 'ভানু'-র সঙ্গে যদি 'লোধ'-র সম্পর্ক না থাকত তাহলে দুই কবির রচনায় পারম্পর্যের এমন সমতা অপ্রত্যাশিত হত। সেই কারণে বিশ্বাস করা শক্ত এখানে 'রবি'-র অর্থ 'রক্ত আকন্দ'। রাঙ্গ নাগর—সম্ভবত 'রাঙ্গন' বা 'রঙ্গণ'-র প্রাচীন রূপ ; বসন্তবাবুর মতে বিহারী 'অগর', Dellenia pentagyna। রুদ্রাক্ষ –সং. রুদ্রাক্ষ, Elaecarpus ganitrus ; মুকুন্দরাম, 'রুদ্রাক্ষ'। রেবতী—সং. ঐরাবত, Artocarpus lacucha।

লবলী—সং. নব মালিকা, প্রা. নোমালিআ ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যত্র 'নেআলী' ; সুতরাং 'নব মালিকা'-র সঙ্গে সম্পর্ক একটু সন্দেহজনক। লেম্বু—সং. নিম্বু, Citron। লোধ—সং. লোধ্র, Symplocos racemosa।

শিরীষ—সং. শিরীষ, Acacia lebbec। শ্রীফল—

সরল—সং. সরল, Pinus longifolia। সাড়র—তু. সাহড় ; সং. শাকটাখ্য (=ধব) ? সাতকড়া —ফার্সী. সঙ্গ-তর, লেবুর প্রকার ভেদ ; মাধবাচার্য, 'সাতকরা' (*EDB* 856, 870)। সাল—সং. শাল, Vatica robusta। সাহড়—তু. সাড়র ; ঘনরাম, 'সাড়া'।

সিঅলি—সং. শীপাল, শীপালিল, the Waterweed Blyxa octandra ; মুকুন্দরাম, 'সিয়লী', মালাধর, 'সিয়লিতে সোভে সরবর'। যোগেশবাবু ভুল করে 'সিঅলি'-কে 'শেফালী'-র নামান্তর মনে করেছেন। মনে হয়, 'সিঅলি' 'পাণিআল' জাতীয় ; তু. সং. 'শৃঙ্খলী'। সিন্ধুবার—সং. সিন্ধুবার, Vitex negundo ; মুকুন্দরাম, 'সিন্দুবার'। সুকল লোচন— ? সুগন্ধেশ্বরী— ?

সুদর্শন—সং. সুদর্শন, Eugenia jambu। সুন্দরী—সং. সুন্দরী, Heritiera minor। সেআলী— সং. শেফালিকা, Vitex negundo। সৈনাহুল— ? বসন্তবাবুর মতে হিন্দী. শঙ্খাহুলী, Xanthium Strumarium। 'কেহ কেহ সোণালু বলেন।' সোআশ— ? সোনা—সং. সুবর্ণক, Cassia fistula।

হরিড়া—সং. হরীতক, প্রা. হরিটক, উড়িয়া. হরিড়া, Terminalia chebula ; মুকুন্দরাম, 'হরিড়া'। হিঙ্গী—সং. হিলমোচি, Hingtsha repeus। হেন্তাল—সং. হিন্তাল, Phoenix paludosa ; মুকুন্দরাম, হেন্তাল ; মালাধর, 'হেতাল'।

রবীন্দ্র-উপন্যাস, তার আধুনিকতা

অশ্রুকুমার সিকদার

বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার ঐতিহ্য সন্ধান করতে গেলে শুরু করতে হয় রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ শুধু আধুনিক বাংলা কবিতারই 'পিতৃপদবাচ্য' নন, বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার সূত্রপাতও তাঁরই হাতে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির কাছে পৌঁছতে গেলে রবীন্দ্রনাথকেই যাত্রারম্ভের চিহ্ন হিসাবে ধরে নিতে হয়।

আধুনিক মনের লক্ষণ যাঁরা বিচার করেছেন, তাঁরা মোটামুটি একমত যে আত্মসচেতনতাই আধুনিক মনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানবতাবাদ থেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম; ঐতিহাসিক কারণে মানুষের ব্যক্তিসত্তা যতই সমাজাতিরিক্ত বা সমাজবিরোধী হয়ে উঠেছে ততই তার মধ্যে দেখা দিয়েছে আত্ম-সচেতনতার প্রগতি। এই আত্মসচেতনতাবোধ রবীন্দ্র-উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা। বঙ্কিমচন্দ্রও নিশ্চয়ই আত্মসচেতন শিল্পী, কিন্তু বঙ্কিমের চরিত্রেরা আত্মচেতন মানুষ নয়। রবীন্দ্র-উপন্যাসে সৃষ্টি এবং স্রষ্টা দুইপক্ষই পূর্ণমাত্রায় সচেতন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আধুনিকতা কোথায় তা নির্ণয় করতে গেলে আগে চোখে পড়ে তাঁর উপন্যাস ঘটনা-প্রধান নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো। তাঁর উপন্যাসের প্রধান সমস্যা, সমাজনীতির নয়, মানুষের ব্যক্তিত্বের। উপন্যাসে ঘটনা যখন ঘটে, তখনো সেই-সব ঘটনার উৎস মানুষের ব্যক্তিত্বের রহস্যের মধ্যে নিহিত। আর এই কারণেই বঙ্কিমী-উপন্যাসের প্লট-প্রাধান্য ধীরে-ধীরে খসিয়ে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ক্রমেই হয়ে উঠেছে থীম্-প্রধান। 'প্লটের উগ্রতাকে তিনি ক্রমশ আপন মানসরসায়নে নমনীয় করে' এনেছেন। ভাব, যা প্রধান লক্ষ্য, তাকে উপস্থিত করার অপরিহার্য বাহনের চেয়ে বেশি দাম তিনি প্লটকে দিতে চাইলেন না। ঘটনানির্মাণের দায় চলে গিয়ে উপন্যাস যেমন হয়ে উঠল ভাবকেন্দ্রিক, তেমনি ঘটনার পিছনে চরিত্রের যে ইচ্ছা অভিপ্রায় উদ্দেশ্য কাজ করছে তার নিপুণ তন্নতন্ন বিশ্লেষণে তিনি দেখালেন অসামান্য পারদর্শিতা। অথচ এ কথাও তিনি ভুললেন না যে, ব্যক্তির উন্মেষ সম্পূর্ণ হয় অথবা খণ্ডিত হয় সামাজিক পরিস্থিতির ফলে। অর্থাৎ উনিশ শতকী শিক্ষাকে ভুললেন না, বিশ শতকী দৃষ্টি-নিক্ষেপের মুহূর্তেও। আর বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনি বিচারকও নন, তাঁর ভূমিকাকে বলা চলে সহানুভূতিশীল সাক্ষীর ভূমিকা। অথচ সহানুভূতি কখনো নেমে এল না ভাবালুতাময় আবেশে। যে মোহাচ্ছন্নতা পূর্বাপর বাংলা উপন্যাসের প্রধান দুর্বলতা, সেই দুর্গ্রহ থেকে তাঁর উপন্যাস একেবারেই মুক্ত। অবশেষে, ব্যক্তিত্বের সমস্যাই যেহেতু তাঁর উপন্যাসের প্রধান সমস্যা, সেইজন্যে ক্রমে-ক্রমে গল্প-বলার দায়ও তিনি দিয়ে দিলেন চরিত্রের হাতে। এইরকম, এবং আরো অনেকরকম কথাশিল্পের কলাকৌশল নিয়ে তিনি সচেতন পরীক্ষার বিচিত্র প্রমাণ দিলেন। সাধারণ এই-সব ইশারার পর, কয়েকটি উপন্যাসের অনুপুঙ্খ বিচার করে আমি রবীন্দ্র-উপন্যাসে আধুনিকতার প্রসঙ্গটি আরো তলিয়ে দেখতে চাই।

'গোরা' উনিশ শতকী উপন্যাসের গড়নে লেখা। 'গোরা'-য় নয়, বরং তার আগে লেখা 'চোখের বালি'-তে উপন্যাসে আধুনিকতার প্রথম ইঙ্গিত মিলল। স্পষ্ট ইঙ্গিত। স্বকীয় মূল্যের বাইরে 'চোখের

বালি'-র এই ঐতিহাসিক মূল্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ আছে। 'চোখের বালি'-র 'সূচনা'য় তিনি পরে লিখেছেন, 'আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করলে ধরা পড়বে যে চোখের বালি উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে।··· শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত এখনো হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জায় অলঙ্কারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট।··· মানব বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলাভাষায় আর প্রকাশ পায় নি।··· যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্রঘটনাগুলো অসংযত হয়ে। সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।' 'পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল' কথাটা হয়তো খানিকটা বাড়িয়ে বলা হল, হিংস্রতার 'অসংযত' আত্মপ্রকাশও আজকের চোখে দেখা যায় না— যদিও বর্ণনার মধ্যে এখনো যেন প্রায় শারীরিকভাবে অনুভব করা যায়, বিনোদিনীর কামনার তাপ। সে কথা যাক, এই বইয়ে যে আছে 'আধুনিক স্বভাব' এখানে যে 'নবপর্যায়ের পদ্ধতি' প্রথম দেখা দিয়েছে ভাবালুতাহীন 'নির্মমতা'র সঙ্গে সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞান ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে আধুনিকতার দুটো লক্ষণের কথা বললেন, যা 'চোখের বালি'-তে উপস্থিত— স্পষ্টতা অর্থাৎ অকাপট্য, আর ঘটনাপরম্পরায় শৃঙ্খলিত কার্যকারণসূত্রের বদলে চরিত্রের অন্তর্জগতের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ— ঘটনার তল থেকে নেমে অবচেতনের যে অন্তরালে মানুষের মন বেশির ভাগ কাজ করে সেই মনোজগৎকে তুলে ধরা। কোনো নীতি বা আদর্শ বা ঔচিত্যবোধ, কী-হয় তার বিবরণকে এখানে আড়াল করে রাখে নি। এখানে নিদারুণ অন্তঃক্ষোভ, লালসা, ঈর্ষা সমস্ত সূক্ষ্ম অথচ ভাবালুতাবর্জিত নির্মোহ সততার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে।

সমাজনীতির বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহ নিজেই একটা আধুনিক থীম্। সেই বিদ্রোহের বিস্ফোরক প্রকাশ 'চোখের বালি'-তে রূপায়িত। 'চোখের বালি'-র আধুনিকতা বোঝা যাবে 'বিষবৃক্ষে'র সঙ্গে তুলনা করলে। 'বিষবৃক্ষে'-র কেন্দ্রস্থানে নগেন্দ্রনাথ, 'চোখের বালি'-তে কেন্দ্র পুরুষ থেকে নারীতে, বিনোদিনীতে সরে এসেছে। এ তো শুধু একজন রমণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার গল্প নয়, ভিতরে-ভিতরে অন্তঃশীল রয়েছে সামাজিক শক্তির সংঘাতও, ব্যক্তিগত আত্মবিকাশের পিছনে রয়েছে মহেন্দ্রের ফিউডালবোধের সঙ্গে বিনোদিনীর গণতান্ত্রিক আত্মপ্রতিষ্ঠার বিরোধ। অর্থাৎ উনিশ শতকী বাস্তবপন্থী উপন্যাসের সমাজবোধের ভিত্তির উপর তিনি গড়ে তুলেছেন আধুনিক উপন্যাসের ইমারত। বাস্তবপন্থী ? না, পুরোপুরি বাস্তবপন্থীও নয়। কেননা, উনিশ শতকী বাস্তবপন্থী উপন্যাসের বড়ো লক্ষণ যে ঘটনাপরম্পরার প্রাধান্য তা এখানে নেই। ঘটনা-পরম্পরা আছে, কিন্তু তার প্রাধান্য নেই। এখানে ঘটনার পারম্পর্য যেন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য মাত্র প্রয়োজনীয় অজুহাত— বুদ্ধদেব বসু যাকে বলেছেন 'অপরিহার্য ছল'। আর আধুনিকতার বড়ো লক্ষণ যে আত্মসচেতনতা তা পূর্ণমাত্রায় এই উপন্যাসে আছে। লেখক-কর্তৃক চরিত্রসমূহের ইচ্ছা অভিপ্রায় উদ্দেশ্য নির্ণয়ে শুধু আমরা সচেতন বিশ্লেষণ পাই না— সেই আত্মসচেতনতা আছে চরিত্রগুলোর মধ্যেও। বিশেষ করে নায়িকা বিনোদিনীর মধ্যে। বিনোদিনীর জেগে ওঠা, সে যেন এতদিনের আত্মবিস্মৃত নারীত্বের মধ্যে আত্মবোধের উন্মেষ। বিনোদিনীর প্রধান ধর্ম যে সে চেতন মনের অধিকারিণী। সে মহেন্দ্রকে যে

চিঠি লিখেছে তা থেকে বোঝা যায় নিজের মানসিক গঠন সম্বন্ধে সে যেমন সচেতন, তেমনি অন্যের মনের গতিও তার নখদর্পণে। 'এক সময় মনে করিতে তুমি আশাকে ভালোবাসিতেছ, সেও মিথ্যা। এখন মনে করিতেছ তুমি আমাকে ভালোবাসিতেছ, এ-ও মিথ্যা। তুমি কেবল নিজেকে ভালোবাসো।' 'বিষবৃক্ষে'র 'কুন্দ অনেকটা অজ্ঞাতসারে অগাধজলে ঝাঁপ দিয়াছে,— বিনোদিনীর প্রত্যেক পদক্ষেপ সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত।' বিনোদিনী সূক্ষ্ম কৌশলী, 'পৈশাচিক ইন্দ্রজাল' তার আয়ত্তাধীন। কুন্দনন্দিনী ঘটনার সৃজন, কিন্তু বিনোদিনী, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'ঘটনাপ্রবাহের স্রষ্টা'। কুন্দনন্দিনী আত্মবিলোপে উৎসুক, বিনোদিনী আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় উত্তেজিত। কুন্দনন্দিনীর প্রেম, কুন্দনন্দিনীর স্রষ্টার কাছে নিন্দনীয় ; বিনোদিনীর স্রষ্টা মনে করেন, বিনোদিনীর প্রেম নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয় সেই প্রশ্নই অবান্তর। সেই প্রেম আছে, তার সেই অস্তিত্বটাই সব চেয়ে বড়ো কথা।

এবং সেই প্রেম আকর্ষণে-বিকর্ষণে, বিদ্বেষ আসক্তিতে মেশানো। মহেন্দ্র অন্য বাড়িতে চলে গেলে 'বাড়ি হইতে তাহার সমস্ত নেশা চলিয়া গেল। মহেন্দ্রবর্জিত আশা তাহার কাছে নিতান্তই স্বাদহীন। আশার প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ-যত্ন বিনোদিনীর প্রণয়বঞ্চিত চিত্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত— তাহাতে বিনোদিনীর বিরহিণী কল্পনাকে যে বেদনায় জাগরূক করিয়া রাখিত তাহার মধ্যে উগ্র উত্তেজনা ছিল। যে-মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে, যে-মহেন্দ্র তাহার মতো স্ত্রীরত্নকে উপেক্ষা করিয়া আশার মতো ক্ষীণবুদ্ধি দীনপ্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভালোবাসে কি বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে, না, তাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই। একটা জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বালাইয়াছে ; তাহা হিংসার না প্রেমের, না, দুইয়েরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না। মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া বলে, 'কোনো নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।' কিন্তু যে কারণেই বল, দগ্ধ হইতেই হউক বা দগ্ধ করিতেই হউক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার বিষদিগ্ধ অগ্নিবাণ জগতে কোথায় মোচন করিবে।' বিহারী যখন অনুরোধ করে বলে সরলা আশাকে বিনোদিনী যেন দেখাশুনা করে তখন বিনোদিনীর 'মুখে হিংসার বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল।' বিহারী আশাকে ভালোবাসে সকলের সামনে বিহারীর মুখের উপর মহেন্দ্র এ কথা যখন বলে বসল, 'আশা যদি তখন চোখ তুলিয়া চাহিত, তাহা হইলে সে ভয় পাইত। সমস্ত সংসারের উপর বিনোদিনীর যেন খুন চাপিয়া গেছে। মিথ্যা কথা বটে! বিনোদিনীকে কেহই ভালোবাসে না বটে! সকলেই ভালোবাসে ঐ লজ্জাবতী ননির পুতুলটিকে।' নিজের জীবনের শূন্যতার যে ব্যর্থতার জ্বালায় সে জর্জরিত হয় সেই জ্বালাপ্রসূত হিংসা নীতি বা সমাজনীতির চোখে গর্হিত কিনা 'চোখের বালি'-তে সে প্রশ্ন প্রশ্নই নয়। রূপগুণের পরিপূর্ণ অধিকারিণী, পাওয়ায় যার স্বাভাবিক অধিকার, নিতান্ত বৈধব্যের দুর্ঘটনায় প্রবঞ্চিত সেই নারীর এই হিংসা, যা তার প্রাণের প্রতি জীবনের প্রতি আসক্তির নামান্তর, সেই হিংসা স্বাভাবিক কিনা সত্য কিনা তাই এখানে প্রশ্ন। সেই প্রশ্নই মাত্র এখানে ঔপন্যাসিকের বিবেচনার বিষয়।

মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনোদিনী পশ্চিমে গেল। এই খবর বিহারী জানল, যার যৌবন এতদিন নিশ্চলভাবে সুপ্ত থাকার পর বিনোদিনীর সোনার কাঠিতে জেগে উঠেছিল। তখন 'বিহারীর চক্ষে তৎক্ষণাৎ জলস্থল-

আকাশের সমস্ত রং বদলাইয়া গেল, তাহার কল্পনাভাণ্ডারের সমস্ত সঞ্চিত রস মুহূর্তে তিক্ত হইয়া উঠিল।' এদিকে বিনোদিনী পশ্চিমে মহেন্দ্রের সহচরী হলেও তার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রইল। যে উপন্যাসের মধ্যে আধুনিকতার লক্ষণ প্রথম সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেল, সেই উপন্যাস এখান থেকেই হয়ে গেল কনভেনশনাল, প্রথানুগত। মাতাল মহেন্দ্রের উদ্দামতা থেকে অদৃশ্য বিহারী বিনোদিনীকে রক্ষা করে চলল। অনুকূল সময়ের সমর্থনের অভাবে রবীন্দ্রনাথ সমাজনীতির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বাধ্য হলেন। এলাহাবাদে তার পুষ্পশোভিত ঘর দেখিয়ে বিনোদিনী বিহারীকে বলে 'এ ঘরে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। তুমি এই ঘরে একদিন শয়ন করিয়াছিলে— এ-ঘর তোমার জন্য উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি— ওই ফুলগুলা তোমারই পূজা করিয়া আজ শুকাইয়া পড়িয়া আছে।' বাসনা-আবিষ্ট বিনোদিনীর প্রেম উত্তীর্ণ হয়ে গেল পূজায়। শুধু তাই নয়, বিহারী বিয়ে করতে চাইলে, যে বিনোদিনীর শিরায় শিরায় আগুন জ্বলত, চোখে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হত, যে ছিল কামনার উন্মাদনায় তপ্ত, সেই বিনোদিনী বলল— 'আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতেই পারে না।' বিনোদিনীর এই পরিণতির জন্যে রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে অনেকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অত বেশি দুঃখ করার কোনো কারণ ছিল না। ঔচিত্যবোধ তো এই উপন্যাসের নিয়ন্তা নয়। তাই বঙ্কিমী ঔচিত্যবোধের প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে বিষবৃক্ষ বলেন নি। অথচ যদি ঔপন্যাসিক বিহারীর সঙ্গে বিনোদিনীর বিবাহ ঘটাতেন তা হলে সে হত বিপরীত ঔচিত্যবোধকে প্রশ্রয় দেওয়া— যেন লেখক বলতে চান এমনটিই হওয়া উচিত। কিন্তু কী হওয়া উচিত তার বিবরণ তো এই উপন্যাস নয়— না সনাতনপন্থীর দৃষ্টি দিয়ে, না প্রগতিপন্থীর দৃষ্টি দিয়ে। নারী আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহ করে, কিন্তু সমাজের বাধায় সেই বিদ্রোহ খণ্ডিত হয়। ফলে বিনোদিনীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সার্থক হবার সম্ভাবনা ছিল না, খণ্ডিত ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল তখনকার সমাজ-পরিবেশে। ফলে বিনোদিনীর অন্য কী পরিণতি হতে পারত! শুধু দুঃখ হয় অনার্দ্র মোহশূন্যতা যখন উপন্যাসের পরিণামে চোখের জলে ভিজে যায়, ভাবালুতায় আর্দ্র হয়; যখন বিনোদিনীর জন্যে কাশীবাসের ব্যবস্থা করতে হয়!

চতুরঙ্গ উপন্যাস চার অংশে বিভক্ত— জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাস। চার অংশেরই কথক কিন্তু একা শ্রীবিলাস। এই অংশ বা পর্যায়গুলোর মধ্যে ঘটনাপ্রবাহকে রবীন্দ্রনাথ একেবারেই প্রশ্রয় দেন নি। অংশগুলোর আভ্যন্তরীণ কার্যকারণগত সম্বন্ধ অনুমান করে নিতে হয়— তার বাস্তবতার দলিল পেশ করার কোনো চেষ্টা এখানে নেই। আগের স্তরের প্রতিক্রিয়া পরের স্তর— কিন্তু ক্রিয়া থেকে প্রতিক্রিয়া কেমনভাবে জন্মাল উনিশ শতকী ধরনে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ নেই। এইজন্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চতুরঙ্গে আংশিকতার দোষ দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে, 'যেন একটা পাগলা হাওয়া যদৃচ্ছাক্রমে চরিত্রগুলিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও তাহাদের পরস্পর-সম্পর্কটিকে অস্থির পরিবর্তনের ঘূর্ণাবর্তে সর্বদা বিবর্তিত করিতেছে।' বুদ্ধদেব বসুকে তো সনাতনপন্থী বলা চলে না, তাঁরও মনে হয়েছে 'চতুরঙ্গ পড়তে-পড়তে সূক্ষ্ম একটা অস্বস্তি কি অনুভব করি না আমরা, কেমন হাঁপ-ধরা ভাব, যেন বড়ো বেশি পাতলা হাওয়ার বই?' 'কত নদী পার হইলাম, মাঠ ভাঙিলাম, মুদির দোকানে রাত কাটাইলাম…।'— যখন শ্রীবিলাস বলে, মনে হয় যেন রূপকথার গল্প, বাস্তবানুগত্যের দায় এখানে নেই। লীলানন্দের কাছে

থেকে 'ক্রমে ক্রমে নেশায় আমাকেও পাইল'— কিন্তু শ্রীবিলাস সেই পর্যায়ক্রমের বিস্তৃত বিবরণ দেয় নি। 'আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না – লেখাও কঠিন'— দামিনীর গুরুবিদ্রোহ কী ভাবে শচীশের প্রতি 'আত্মোৎসর্গের ফুলে' রূপান্তরিত হল তারও কোনো পরম্পরা দেখানো হয় নি। তার সূক্ষ্ম বিবর্তনসূত্র অনুকম্পায়ী পাঠকের কল্পনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চতুরঙ্গে যে-সব আশ্চর্য চিত্রকল্পনা পাই তাও কোনো বিষয়বহির্ভূত কবিত্ব নয়। বাস্তববর্ণনার দায় ও যুক্তিক্রমের পরম্পরা তিনি এখানে ত্যাগ করেছেন বলেই ভাষা কখনো হয়ে উঠেছে রূপকাভাসে দ্যোতিত; তার ভূদৃশ্যগুলি – গুহা ও বালুচরের বর্ণনা – পেয়েছে প্রতীকের পরমার্থতা। নিসর্গপ্রকৃতিও স্বাবলম্বী নয়, তার কোনো নিরপেক্ষ সৌন্দর্য নেই— মূল থীমের দিকে ইশারা করায় সেই-সব দৃশ্য প্রতীকী মূল্যে মূল্যবান।

তাই চতুরঙ্গ প্রসঙ্গে Anatomy of Criticism বইতে Frye-র কথা স্মরণ করছি। তিনি বলেছেন 'romancer'-এর উদ্দেশ্য 'real people' সৃষ্টি করা নয়; তিনি সৃষ্টি করতে চান 'stylized figures', যারা 'psychological archetypes'-এর ব্যাপ্তি পাবে। 'That is why the romance so often radiates a glow of subjective intensity that the novel lacks, and why a suggestion of allegory is constantly creeping in around its fringes…' রবীন্দ্রনাথ তো বাস্তবপন্থী উপন্যাস লিখতে চান নি – তা চাইলে তিনি চরিত্রগুলোর চারপাশে 'framework of a stable society' গড়ে তুলতেন, তাঁর বিষয় 'আইডিয়া জিনিসটা'। যে উপন্যাসের বিষয় চরিত্রের বিবর্তন-বিকাশ বা ত্রিভুজসমস্যার জটিলতা দেখানো নয়, রেনেসাঁসের যুক্তিবাদের সারবত্তাহীনতা দেখানো— সেই উপন্যাসে, বিষয়ের অনুরোধেই বাস্তবপরিবর্তনের ন্যায়যুক্তিসংগত সোপানগুলো যে স্বেচ্ছায় গোপন করা হয়েছে এ কথা বুঝলে চতুরঙ্গের বিরুদ্ধে আংশিকতার অভিযোগ উঠত না, উঠত না পাগলা হাওয়া বা পাতলা হাওয়ার কথা।

শচীশের চতুর্ধারে সাজানো মঞ্চসজ্জা যেন বিধ্বস্ত হয়ে ভেঙে পড়ল। যে-যুক্তিবাদের উপর সে দাঁড়িয়ে ছিল প্রথম ধাক্কায় ঘটল তার বিনাশ। 'সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো' —সেই রাত্রে শচীশ জানল যুক্তিহীন অ-সভ্য বর্বরতার শক্তি। 'কেবল তাহার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে', 'এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা', 'সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ!' তার থেকে মুক্তির জন্যে করল সে রসের সাধনা, তাও যখন তাকে তৃপ্তি দিতে পারল না, তখন তাকেও ছেড়ে সে চলে গেল সর্বোত্তীর্ণ অবস্থার খোঁজে, সমস্ত দ্বৈততার বাইরে। এই আউটসাইডার, আত্ম-খণ্ডিত মানুষ— তার সাধনার লক্ষ্য এই আত্ম-খণ্ডিত অবস্থাকে উত্তীর্ণ হয়ে ঐক্যময় সুষমায় পৌছনো। একদিকে যুক্তি, অন্যদিকে ভক্তি – জ্যাঠামশাই আর লীলানন্দ— এই দ্বন্দ্বকে উত্তীর্ণ হয়ে শচীশ পৌছতে চাইল মিস্টিক কবিত্বে, যেখানে সব দ্বন্দ্বের অবসান, যেখানে সুষমা। জ্যাঠামশাইয়ের যুক্তিবাদের হিতবাদের প্রথম পরাজয় ঘটল যখন শচীশ তার আশ্রয় ছেড়ে মেসে ওঠায় তার চোখ সজল হল। দ্বিতীয় পরাজয় ননিবালার আত্মহত্যায়। যে-জ্যাঠামশাই 'না-ঈশ্বরে' বিশ্বাস করতেন, তাঁর মৃত্যুর পর শচীশের মনে হল 'এক ভাবে যাহা 'না', আর-একভাবে তাহা যদি 'হাঁ' না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।' সেই হাঁ, সেই সদর্থকের সন্ধানে শচীশ পৌছল লীলানন্দের কীর্তনের আসরে। কিন্তু সেই আপাত সদর্থককেও সে বুঝতে পারল নঙর্থক বলে, যখন দামিনী এল— 'অনাবৃষ্টির মধ্যে যেন ঝরঝর্

করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল।' এখন সে চলল আত্মোপলব্ধির পথে। 'একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে না মানিত জাত, না মানিত ধর্ম, তার পরে আর-একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে খাওয়া-ছোঁওয়া স্নানতর্পণ যোগযাগ দেবদেবী কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না; তার পরে আর-একদিন এ-সমস্তই মানিয়া লওয়ার ঝুড়িঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল— কী মানিল আর কী না মানিল তাহা বোঝা গেল না।' শ্রীবিলাসের সাক্ষ্য পাই—'এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে··· লড়াই চলিতেছে···।' সার সত্যে পৌছিয়ে শচীশ বলল,— 'থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।' না এবং হাঁ-এর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সে অন্তঃসুষমাময় এই সিনথেসিসে পৌছল। পৌছল বোধির স্তরে, মিস্টিক উপলব্ধির স্তরে; বলল, 'আমি কবি'।

বিষয়ের মৌলিক কথা যে হাঁ এবং না-এর ডায়ালেকটিক, উপন্যাসটি খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যাবে সর্বত্র সেই দ্বান্দ্বিক নকশা অত্যন্ত সচেতন নৈপুণ্যে রচনা করা হয়েছে— ভাষায়, উপমায়, নিসর্গবর্ণনায়। মনে পড়ে যায় ডস্টয়েফস্কির ব্রাদার্স কারামাজফ মহাউপন্যাসের Pro and Contra পরিচ্ছেদের কথা। এক দিকে রুশী মংক্ হাঁ-এর প্রতিনিধি, অন্যদিকে গ্র্যাণ্ড ইনক্যুজিটর না-এর প্রতিনিধি। চতুরঙ্গে সেই ইতি-নেতির দ্বন্দ্ব আরো শুদ্ধ ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে, আরো নগ্নতায়। ঝরিয়ে দেওয়া হয়েছে সমাজপরিবেশ তথা চরিত্রবাহুল্য। যেন সমস্তটাকে তুলে আনা হয়েছে বীক্ষণাগারের নি-খাদ পরিস্থিতিতে। জ্যাঠামশাই কিছু মানতেন না, শচীশের বাবা হরিমোহন সব মানে। লীলানন্দ বলে 'আমি সন্ন্যাসী', দামিনী বলে 'আমি সন্ন্যাসী নই'। ননিবালা ও দামিনী 'দুই বিপরীত চরিত্র দুই নারী'— একজন পাপিষ্ঠের জন্য জীবন দিয়ে ফেলল, অন্যজন 'মৃত্যুর কেহ নয়··· সে জীবনরসের রসিক।' নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যার পর দামিনী শচীশকে বলেছিল, 'রস যে কী সে তো আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই।' লক্ষণীয় নেতিবাচক শব্দের পুনরুক্তি। বলে দেওয়া হল, শচীশ যাকে ভেবেছিল 'হাঁ,' তা আসলে 'না'। গুহায় অন্ধকারে দামিনী বর্ণিত হয়েছে নঙর্থকের মধ্য দিয়ে— 'তার চোখ নাই, কান নাই··· তার মন নাই— সে কিছুই জানে না··· তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম লেজ কিছুই জানা নাই —তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম না।' একই ব্যাপার লক্ষ্য করি নদীর চরের বর্ণনায়— ভূদৃশ্য যেখানে অন্তর্জগতের অবজেকটিভ কোরিলেটিভ হয়ে উঠেছে— 'পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটি 'না'। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি; তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া।' প্রাক্তন নাস্তিক খুঁজে ফিরছে কাকে বলে আস্তিকতা। ইতি-নেতির ডায়ালেকটিকের মধ্য দিয়ে এই বোধির সিনথেসিসে উত্তীর্ণ হওয়াটাই চতুরঙ্গের থীম্। সেই থীম্কে আশ্রয় দেবার জন্যে নিতান্ত যে কয়টি চরিত্র, যে যৎসামান্য বাস্তবপরিবেশ না আনলে নয়, মাত্র ততটুকুকেই রবীন্দ্রনাথ চতুরঙ্গে জায়গা দিয়েছেন।

চতুরঙ্গে উনিশ শতকী প্লটের মোহ ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, উপন্যাস হয়ে উঠল বক্তব্যপ্রধান, ভাবনির্ভর। বলার ধরনে যে পরীক্ষা তিনি করেছিলেন চতুরঙ্গে, তার থেকে অন্যপথে সরে গেলেন তিনি 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে। প্রমাণ দিলেন সদাসতর্ক আঙ্গিক চেতনার, একের পর এক কথাশিল্পের

কলাকৌশল নিয়ে বিচিত্ররকমের পরীক্ষার। দুই উপন্যাসই এক বছরে, ১৯১৬ সালে লেখা বা সবুজপত্রে প্রকাশিত, এ তো আকস্মিক মিল। বড়ো মিল, দুটোই থীম্‌প্রধান, 'আমি'-র মুখ দিয়ে বলানো। মূলত, 'ঘরে-বাইরে'ও এক বিষবৃক্ষ। বঙ্কিমে সেই বিষবৃক্ষের বীজ— ছিল রমণী, এখানে পুরুষ সন্দীপ। কিন্তু এখানে নামকরণ থেকে সর্বশরীরে নৈতিক শিক্ষার দায় নেই। পরে যোগাযোগ উপন্যাস বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বিষবৃক্ষ নামটাতে আমি আপত্তি করি।' আপত্তির কারণ আছে ঘরে-বাইরে সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব আলোচনায়। সেখানে বলেছেন, 'আমাদের দেশের আধুনিককাল গোপনে লেখকের মনে যে-সব রেখাপাত করেছে ঘরে-বাইরে গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়েছে। কিন্তু এই ছাপার কাজ শিল্প কাজ। এর ভেতর থেকে যদি কোনো সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়।' অবশ্য উপন্যাস থেকে নীতিশিক্ষার বোঝা তিনি নামিয়ে দিয়েছিলেন চোখের বালিতেই। তা হলে এদিক থেকে ঘরেবাইরে-তে অগ্রগতি কোথায়? বলা হবে, চোখের বালি-তে সমাজনীতির সঙ্গে যে বোঝাপড়া করা হয়েছিল, ঘরেবাইরে-তে তা নেই। তার চেয়ে বড়ো অগ্রগতি গল্প বলার রীতিতে। এই রীতিরও অবশ্য পূর্বাভাস আছে— বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী উপন্যাসে। প্রেমের ত্রিভুজের তিন কোণ বিমলা নিখিলেশ সন্দীপ— তিনজনই এখানে কথক। এই তিনজনের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ইতিহাস চোখের বালির ধরনে সর্বজ্ঞ লেখক বলেন না, অথবা চতুরঙ্গের মতো একজন মানুষের পক্ষপাতী চোখ দিয়ে দেখা হয় নি— সংশ্লিষ্ট তিনজনই এখানে বক্তা। কী ভাবে সন্দীপের 'দুর্দান্ত ইচ্ছার প্রলয়মূর্তি' আর 'কৌতূহল' বিমলাকে সন্দীপের প্রতি আকৃষ্ট করল, আর কী ভাবে অমূল্যর প্রতি জাগৃত মাতৃত্ব তাকে ফিরিয়ে আনল নিখিলেশের কাছে — এই তো কাহিনী। কিন্তু ঘটনা নয়, ঘটনার উত্তর-প্রতিক্রিয়া যা চরিত্রের মনে তাই এই উপন্যাসে আসল। একটা ঘটনা ঘটে, আর তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া পাই একাধিক চরিত্রের কথায়। রুদ্যমানা বিমলার মাথায় হাত রাখে নিখিলেশ— সেই ঘটনা দুজনকে কেমনভাবে ভাবায় দুজনের মুখে দুরকম ভাবে তা জানতে পারি। সন্দীপ যে লোলুপতার সঙ্গে আলিঙ্গন করতে ছুটে এসেছিল সেই ঘটনার দুইরকমের বিবরণ পাই বিমলা ও সন্দীপের পরবর্তী চিন্তনের ভিতর দিয়ে।

আর এই চিন্তাগুলো কখন? ঘটনার পরে-পরেই কি লেখা বা বলা হয়েছে এই-সব চিন্তা, সমীক্ষা, আত্মবিশ্লেষণ? বিমলার প্রথমবারের উক্তিতে অন্তত সংশয় জাগে। 'মা গো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, সেই লাল-পেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ— শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই-যে উষাসতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?' এই কথা তখনই বলতে পারে বিমলা যখন মায়ের পুণ্য-প্রভাবে জীবনের দুর্যোগ সে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে— অর্থাৎ উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার রমণীয় পরিণামের পরে। আবার অনেক জায়গা আছে যেখানে আমরা বক্তাকে ঘটনার অব্যবহিত পরেই আত্মবিশ্লেষণ করতে দেখি। চতুরঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কার্যকারণপরম্পরা বজায় রাখার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন, এখন ঘরে-বাইরে উপন্যাসে তিনি কালের মাত্রা বজায় রাখার দায়িত্বও ত্যাগ করলেন। সময়ের অঙ্করেখা ধরে তিনি দরকার মতো উঠে গেছেন, নেমে এসেছেন। ইতিহাসের কাছ থেকে উপন্যাস পেয়েছিল যে সময়পরম্পরাগত বিন্যাস,

তাকেও ভেঙে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। কোথাও কোথাও কথকের কথা ঘটনার তাৎক্ষণিক বিবরণ, কখনো বা সময়ের ঈষৎ ব্যবধানে বলা, আবার কোথায়ও সমস্ত গ্রন্থিলতা খুলে যাবার পরে পিছনে ফিরে তাকানো। আর যে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছিল চোখের বালি-তে সর্বজ্ঞ লেখকের, ঘরে বাইরে-তে তাই হয়েছে চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণ।

বিমলার শ্বশুরবাড়ি সনাতনী হলেও, 'স্বামী একেবারে একেলে'। সেই সেকেলে সামন্ততান্ত্রিকতা যা নারীকে ভোগদাসী বলে জানে, তার মধ্যে নিখিলেশ আনতে চেয়েছে সেই স্বাধীনতা, যা প্রেমের ভিত্তি। 'আমার স্বামী বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।' স্বাধীনতা বলেই সমস্যা ; নিখিলেশ সামন্ততান্ত্রিক অধিকার খাটালে সমস্যার অচির-মূলোচ্ছেদ ঘটে যেত। নারীস্বাধীনতা, প্রেমের স্বাধিকারের এই সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চমৎকার-ভাবে জাতীয় স্বাধীনতার সমস্যাকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন— ঘরের কথা এবং বাইরের কথা। দেখিয়েছেন, স্বাধীনতা অবিভাজ্য— এমন-কি, সন্দীপও বলে, 'দেশেও স্বাধীনতা চাই, মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধেও স্বাধীনতা চাই।' দাম্পত্যসম্পর্কের আলোয় দেশের মুক্তির সমস্যাকে দেখা, রাজনৈতিক আদর্শের আলোয় দাম্পত্য-জীবনকে দেখা— এই ব্যাপার সম্ভব হয়েছে শিল্পপ্রতিভার আশ্চর্য নিপুণতায়। আর আছে সমস্ত উপন্যাস জুড়ে আদর্শগত বিতর্ক— বিশেষ করে নিখিলেশ আর সন্দীপের মধ্যে। রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে— সন্ত্রাসবাদ ও গঠনমূলক পদ্ধতি নিয়ে, নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে নিখিলেশ- সন্দীপের মধ্যে যে তর্ক হয়, সে কোনো শৌখিন তার্কিকতার কথা-চালাচালি নয়। সেই-সব তর্কের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের জীবন-সংকটের সব কয়টি সুতো। গোরা উপন্যাসেও তর্ক আছে, আদর্শগত দীর্ঘ-দীর্ঘ আলোচনা আছে— কিন্তু সেই-সব আলোচনা-তর্ক যে প্রত্যক্ষভাবে চরিত্রের ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে তেমন অনুভূতি সেখানে হয় না। কিন্তু ঘরে-বাইরে উপন্যাসে আদর্শগত আলোচনার পিছনে ব্যক্তিজীবনের উপস্থিতি অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে, আমরা অনুভব করি। রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক আদর্শ আর ব্যক্তিগত জীবনাচরণকে এখানে আর আলাদা করা যায় না। যেমন ডস্টয়েফস্কির মহাউপন্যাসগুলিতে, যেমন মান্- এর ম্যাজিক মাউণ্টেনে অনুভব করি, তর্কের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে চরিত্রের নিয়তি, তেমন অনুভূতি ঘরে-বাইরে পড়তে গেলেও হয়। তত্ত্ব এখানে নিরাশ্রয় নয়, তত্ত্ব এখানে মানুষের জীবনসমস্যার অংশ। তত্ত্ব যে আধুনিক মানুষের জীবনের বহিরঙ্গ খোলস নয়, সে যে তার অস্তিত্বের অন্তরঙ্গ ব্যাপার— তত্ত্বতাড়িত হওয়াই যে আধুনিকতার একটা বড়ো লক্ষণ, ঘরে বাইরে উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিলেন।

সন্দীপের প্রতি রবীন্দ্রনাথ অনুকম্পায়ী নন, বরং অনেকটাই বিরূপ। অথচ এই চরিত্রের মুখ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত আধুনিকতার কয়েকটা কথা উচ্চারণ করিয়েছেন। হয়তো দেখাতে চেয়েছেন উচ্চৈঃস্বরে যা নিজেকে আধুনিক বলে প্রমাণ করতে চায়, তা যদি সত্যের বিরুদ্ধ হয় তা হলে যথার্থ আধুনিক হতে পারে না। নীট্‌শের শক্তিবাদের বাণী সন্দীপের মুখে রবীন্দ্রনাথ বসিয়েছেন। দিব্যদর্শী কবি যেন মাত্র এক দশক আগে সন্দীপের মুখে শক্তির বন্দনা বসিয়ে জানিয়েছেন শক্তিবন্দনার দিন আসন্ন। সে বলে 'এ হচ্ছে রিয়ালিটির পৃথিবী'। লুকোচুরিকে সে কাপুরুষতা বলে জানে ; যে অকাপট্য আধুনিকতার লক্ষণ, এবং যে অকাপট্য চোখের বালির প্রধান প্রসঙ্গ— সেই অকাপট্যের দোহাই দিয়ে সে বিমলার প্রতি জৈব আকর্ষণের কথা খোলাখুলি বলে। 'জোড়া মিলিয়ে মিলিয়ে বিধাতা বিশেষভাবে এক-একটি মেয়ে এক-

একটি পুরুষ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাদের মিলই মন্ত্রের মিলের চেয়ে খাঁটি।' সন্দীপ যৌনবিষয়ে একানুগত্যেও বিশ্বাসী নয়— 'অ্যাফিনিটি একটা কেন ? অ্যাফিনিটি হাজারটা।' সে মনে করে সামাজিক শাস্ত্রীয় অনুশাসন মানুষের স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিকে বাধা দিয়ে বিকৃত করে— যথার্থ বিকাশ সম্ভব হবে সব অনুশাসন তুলে নেওয়ায়। 'প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড়ো জানাটা মডার্ন নয়।' এই তথাকথিত মডার্নের প্রতিনিধি হিসেবে এই মেফিস্টোফেলিস, সন্দীপ চরিত্র রচনা করে রবীন্দ্রনাথ সেই আধুনিকতার মিথ্যার দিক সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছেন। দিয়েছেন ঘরে-বাইরে গ্রন্থে, এই আধুনিক উপন্যাসে।

যোগাযোগে আপাতত মনে হবে রবীন্দ্রনাথ পিছিয়ে গেলেন, রূপকল্পের দিক থেকে এবং বিষয়ের দিক থেকে। কিন্তু আসলে এই উপন্যাস উনিশ শতকী বাস্তবতাবাদের অনুবর্তন নয়, এখানে আছে লুকাচ্-কথিত সেই 'critical realism', যার নিদর্শন লুকাচ্ পেয়েছিলেন টোমাস মান্-এর উপন্যাসে। যোগাযোগে আর-একটা কৌতূহলপ্রদ দিক আছে। আগের উপন্যাসে যে সমস্যাকে যেভাবে দেখেছেন যোগাযোগে তাকেই তিনি দেখলেন বিপরীত বিন্যাসে। নিজের বাড়ির ফিউডালতন্ত্র থেকে বিমলাকে মুক্তি দিয়েছিল নিখিলেশ। সেখানে সেই মুক্তিকেই দেখানো হয়েছে আদর্শ হিসেবে। কিন্তু যোগাযোগে ক্ষয়িষ্ণু ফিউডালতন্ত্রের প্রতিনিধি বিপ্রদাসই আদর্শ— অবশ্য মানতেই হবে নিখিলেশের মতো বিপ্রদাস অনেকটাই ফিউডালতন্ত্রের সংস্কার থেকে মুক্ত ও আধুনিক ভাবনায় প্রভাবিত। কিন্তু যোগাযোগে দেখানো হল, ঘরে-বাইরে থেকে এক পদক্ষেপ এগিয়ে, যে ঐ সামন্ততন্ত্র থেকে মুক্তিই শেষ কথা নয়, পরিণাম যদি হয় আর এক তন্ত্রের বন্দীত্ব। কুমু ধরা পড়ল ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি মধুসূদনের হাতে। সামন্ততন্ত্রের পতন আর বুর্জোয়াতন্ত্রের এই উত্থানের কথাই বিপ্রদাস বলেছিল – 'পশ্চিমের মেঘ যায় পুবে, পুবের মেঘ যায় পশ্চিমে এ-সব হাওয়ার হুকুম। সংসারে সেই হাওয়া বইছে।' যে মধুসূদনের 'ভাগ্যচক্রের সব গ্রহনক্ষত্রই বৈশ্যবর্ণ' সেই মধুসূদনের সঙ্গে বিয়ে হল কুমুর— বোঝা গেল সামন্ততন্ত্র থেকে মুক্তিই শেষ কথা নয়। মুক্তি আরো দূরে।

আর চতুরঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন যুক্তিই শেষ কথা নয়— শচীশ যুক্তিবাদী জ্যাঠামশাই আর ভক্তিবাদী লীলানন্দকে অতিক্রম করে পৌঁচেছিল স্বজ্ঞার জগতে, বলেছিল, 'আমি কবি।' যুক্তির সীমাবদ্ধতা দেখানোই ছিল রচনার অভিপ্রায়। কিন্তু যোগাযোগে উলটোভাবে দেখালেন অ-যুক্তি (unreason) কী মারাত্মক! দাম্পত্যসংঘর্ষের জন্যে দায়ী তো একা মধুসূদন নয়, দায়ী কুমুও 'পুরোনো নতুন দুই কালের আলো-আঁধারে' যার বাস। নানা প্রথা-সংস্কারে তার মন তৈরি। 'স্বপ্নের জগতে বিচার চলে না, একমাত্র চলে মেনে-চলা'। কুমুর চিত্তের অন্ধকার মহলে তার যুক্তিবাদী দাদার এতটুকুও কর্তৃত্ব নেই। মধুসূদনের সঙ্গে তার বিবাহকে বিধির বিধান বলে যখন মেনে নেয় কুমু তখন বিস্মিত হয় বিপ্রদাস, কারণ 'অমাবস্যার সঙ্গে কুস্তি করা চলে না।' ভবানীর পায়ে বিল্বপত্র রেখে কপালকুণ্ডলার মতো দৈব-অভিপ্রায় জানতে চাওয়ার মতো কাণ্ড করল কুমু— 'আজই সকালে ঠাকুরকে উদ্দেশ করে মনে মনে বলেছিল, এই বেজোড় সংখ্যার ফুলে জোড় মিলিয়ে সব-শেষে যেটি বাকি থাকে, তার রঙ যদি ঠাকুরের মতো নীল হয় তবে বুঝব তাঁরই ইচ্ছা। সব-শেষের ফুলটি হল নীল অপরাজিতা।' অ-যুক্তির নির্বন্ধে চলার পরিণামও হল কপালকুণ্ডলার মতো মারাত্মক। বিয়ের আগে মধুসূদনের কোনো-কোনো ব্যবহারে খটকা লাগলেও কুমু

ভেবেছিল, 'মধুসূদন-ব্যক্তিটিতে দোষ থাকতে পারে, কিন্তু স্বামীনামক ভাবপদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন।' তাই বলতে চাই, রবীন্দ্রনাথ চতুরঙ্গে দেখিয়েছেন যুক্তিবাদের সীমাবদ্ধতা, আর যোগাযোগে দেখালেন অ-যুক্তির উৎকট পরিণাম। শেষে কুমুর স্বীকারোক্তি পাচ্ছি, 'দেবতার চেয়ে দাদার বিচারের উপর ভর করলে এত বিপদ ঘটত না।' যুক্তিবাদী দাদার বিচার আর যুক্তিবাদ তো একই কথা।

উনিশ শতকী উপন্যাসের বাস্তবতন্ত্র যে যোগাযোগের নয়, তার মধ্যে বাস্তবতা আসে অন্য প্রণালীতে তার আরো প্রমাণ আছে। যেমন আয়রনির ব্যবহারে। বিবরণের ঘনত্ব যেখানে নিরেট উনিশ শতকী মনে হয়, সেখানে আয়রনির তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে ঔপন্যাসিক আত্মসন্তুষ্টভাব ঘুচিয়ে দেন। যেমন আর্থিক সচ্ছলতা সত্ত্বেও মধুসূদনের বিলম্বিত বিবাহের কারণ নির্দেশে— 'গৃহপালিত বাংলাদেশে এমন অবস্থায় সহজ মানুষে বিবাহের চিন্তা করে,··· । কন্যাদায়িকেরা মধুকে উৎসাহ দিতে ত্রুটি করে না; মধুসূদন বলে, "প্রথমে একটা পেট সম্পূর্ণ ভরলে, তার পরে অন্য পেটের দায় নেওয়া চলে।" এর থেকে বোঝা যায়, মধুসূদনের হৃদয়টা যাই হোক, পেটটা ছোটো নয়।' ঘটক বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসে বলে, 'আজ্ঞে কর্তারা আমাকে খুবই চিনতেন··· ।' তখন লেখক বন্ধনীর মধ্যে মন্তব্য করেন 'মিথ্যে কথা'। দ্বিতীয়ত তিনি এনে ফেলেন বর্ণনার মধ্যে রূপকের ব্যঞ্জনা, প্রতীকের দ্যুতি। মধুসূদনের সঙ্গে যখন বিয়ের কথা চলছে তখন একটা উপমায় ধরা পড়ে সম্পর্কের পূর্বাভাস। কুমু দেখছে— 'সামনের ইঁটের কলেবরওয়ালা কলকাতা আদিমকালের বর্মকঠিন একটা অতিকায় জন্তুর মতো, জলধারার মধ্য দিয়ে ঝাপ্‌সা দেখা যাচ্ছে।' মোতির মা ফুলশয্যার আগের রাত্রে 'যেন একটা বিভীষিকার ছবি দেখতে পেলে— যেখানে একটা অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে বসে আছে, সেই অন্ধকার গুহার মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে ডাকছে।' আর ফুলশয্যার রাতে কুমুদিনীর নিজের মনে হল, 'আকাশ থেকে বাজপাখির ছায়া দেখতে পেয়ে কপোতীর যেমন করে, কুমুর বুকটা তেমনি কাঁপতে লাগল।' অন্য একদিন মধুসূদন যখন কুমুকে শয্যাসঙ্গিনী হতে ডাকল তখন মনে হল তার কুমু যেন 'একটা অদৃশ্য আড়ালের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে', তার সেই দীপ্যমান শুচিশুভ্রতা 'যেন নির্জন তুষারশিখরের উপরে নির্মল উষা দেখা দিয়েছে।' যখন মধুসূদন জোর দিয়ে তৈরি হয়ে আসতে বলল, তৎক্ষণাৎ পোশাক পাল্টে চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে তৈরি হয়ে এল কুমু; তখন মনে হল, 'এ যেন বিধবার মূর্তি— ওর স্বামী আর ওর মাঝখানে যেন একটা নিস্তব্ধ মৃত্যুর সমুদ্র।'

ক্রিটিকাল রিয়ালিস্ট হিসেবে রবীন্দ্রনাথ শুধু কুমুর বাবার আত্মঘাতের বর্ণনা দেন নি, সেই আত্মঘাতের কারণ যে অপরাধবোধ ও অভিমান সেই মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতার দিকেও নজর দিয়েছেন। কার্যকলাপের ভিতর থেকে পরোক্ষে মানসক্রিয়া জেনে নিতে হয় না, মানসক্রিয়াই এখানে সামনে সরে এসেছে। যখন ঔপন্যাসিক মধুসূদনের বৈঠকখানা আর অন্তঃপুরের বিপরীত স্বভাবের বর্ণনা দেন— একদিকে অজস্র নানা দেশী অসংগত সামগ্রীর সমাবেশ, অন্যদিকে পুঞ্জীভূত শ্রীহীনতা— তখন তিনি আসলে কোনো আসবাবের তালিকা তৈরি করেন না। তখন তিনি মালিকের মনের উপর আলো ফেলছেন— বাইরের বহুমূল্য অসমঞ্জস সামগ্রী তার ধনগরিমা প্রচারের প্রমাণ, আর অন্দরের শ্রীহীনতা তার স্বভাবের বাস্তবপ্রক্ষেপ। আর লেখকই শুধু চরিত্রের কার্যকলাপ বা মানসিকতা বিষয়ে সচেতন নন, তাঁর চরিত্ররা সজ্ঞান আত্মসচেতন মানুষ। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সুনিয়ন্ত্রিত। কুমুর প্রতি সহানুভূতির ছলে কী সচেতন সূক্ষ্ম কৌশলে শ্যামা মধুসূদনের মনকে আরো বিষিয়ে দিচ্ছে! কুমুর উপর রাগ করে, বিপ্রদাসের প্রতি

ঈর্ষান্বিত হয়ে মারাত্মক সচেতন বুর্জোয়া-মানসিকতায় মধুসূদন সিদ্ধান্ত নেয়, 'কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটি মাত্র রাস্তা আছে, সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা।' আগুলফ লম্বিত কেশরাজিকে সংসারে বসবাস করে যে এতদিনে বেণীবদ্ধ করতে শিখেছে, রূপান্ধ প্রেমিক বেচারা নবকুমার জানত না, সেই কপালকুণ্ডলাকে আষ্টেপৃষ্ঠে সংসারে জড়ানোর একমাত্র ও সহজতম উপায় তার কোলে 'সোনার পুতলি' তুলে দেওয়া!

এই উপন্যাসে আছে আধুনিক মননের তির্যকতার প্রমাণ, যার প্রেরণায় এই উপন্যাসের বাস্তব-পন্থার ধাত আলাদা। যখন বিয়ের পর পরস্পরের আঁচলে-চাদরে বাঁধা মধুসূদন আর কুমু চলে যাচ্ছে তখন বিপ্রদাসের মনে এক গ্রোটেস্ক 'কেমনতরো ভাবনা' জাগল। 'সেই দৃশ্যটা আজ, কেন কী জানি, বিপ্রদাসের কাছে বীভৎস লাগল। প্রাচীন ইতিহাসে তৈমুর জঙ্গিস অসংখ্য মানুষের কঙ্কালস্তম্ভ রচনা করেছিল। কিন্তু ওই-যে চাদরে-আঁচলের গ্রন্থি, ওর সৃষ্ট জীবন-মৃত্যুর জয়তোরণ যদি মাপা যায় তবে তার চূড়া কোন্ নরকে গিয়ে ঠেকবে!' চাদর-আঁচলের আনুষ্ঠানিক গিঁটটা যখন গর্ভস্থ সন্তানের মধ্য দিয়ে ভীষণ বাস্তব হয়ে উঠল তখন কুমুর কাছেও প্রকট হয়ে গেল তাদের দাম্পত্য সম্বন্ধের উৎকট কুৎসিত চেহারা— 'মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তার বীভৎসতা ওকে বিষম পীড়া দিলে।' যাকে সমাজনীতি এবং প্রথা শোভন স্বাভাবিক বলে জানে তার মধ্যে রচয়িতার আধুনিক মন খুঁজে পেল এক উৎকট বীভৎসতা। গৃহদাহের অচলা আর সুরেশ স্বামীস্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছিল। লোকলজ্জার প্রবর্তনায় তারা একত্র রাত্রিবাস করেছিল। পরপুরুষের সঙ্গে সহবাসের গ্লানিতে, পরদিন ভোরে রামবাবু দেখলেন, অচলার 'মুখ মড়ার মতো সাদা, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা, এবং কালো পাথরের গা দিয়া যেমন ঝরনার ধারা নামিয়া আসে, ঠিক তেমনি দুই চোখের কোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।' অপর পক্ষে যোগাযোগে দেখি, স্বামীর সঙ্গে অশুচি সহবাসের 'পরদিন সকালে মোতির মা যখন কুমুর জন্যে এক বাটি দুধ নিয়ে এল দেখল কুমুর দুই চোখ লাল, ফুলে আছে, রঙ হয়েছে পাঁশের মতো।' শরৎচন্দ্র নয়, রবীন্দ্রনাথই যে যথার্থ আধুনিক এখানেই তার প্রমাণ। পরপুরুষ-ভুক্ত হওয়ায় অচলার সর্বাঙ্গে গ্লানির ছাপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কুমুর ঐ বর্ণনার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন, অনেক সময় স্বামীসহবাসও পরপুরুষ-সহবাসের মতো মর্মান্তিক গ্লানিকর হতে পারে; স্বামী সহবাসও হতে পারে অশুচি, তার পরিণাম হতে পারে 'আন্তরিক অসতীত্ব'। লোকাপবাদকে উপেক্ষা করার সাহস অচলার ছিল না, তাই সে সুরেশের ঘরে ঢুকেছিল। কুমু কিন্তু স্বামীর শয্যায় গিয়েছিল দৈব-অনুজ্ঞায়। কিন্তু সেই কলুষিত সম্ভোগের গ্লানি দিয়ে বুঝল প্রথার চেয়ে, দৈবনির্দেশের চেয়েও বড়ো নিজত্ব, স্বকীয়তা, প্রাতিস্বিকতা। যখন বিপ্রদাস বলেছিল, 'যত-সব ইচ্ছাকৃত অন্ধ দাসত্বকে বড়ো নাম দিয়ে মানুষ দীর্ঘকাল পোষণ করেছে, তারই বাসা ভাঙবার দিন এল।' তখনো প্রতিবাদ করেছিল কুমু, বলেছিল, 'তুমি যাকে মুক্তি বলো, যা জ্ঞানের দ্বারা হয়, আমাদের রক্তের মধ্যে তার বাধা। আমরা মানুষকেও জড়িয়ে থাকি, বিশ্বাসকেও; কিছুতেই তার জট ছাড়াতে পারি নে।' এই কুমুই পরে অন্য কথা বলেছিল। অন্তঃসত্ত্বা কুমুকে যখন বিপ্রদাস বলে, 'তোর সন্তানকে তার নিজের ঘরছাড়া করব কোন্ স্পর্ধায়।' তখন কুমু জবাব দেয়, 'এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোয়ানো যায় না।' কুমু চরম মূল্য দিয়ে বুঝল ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশ যাতে ব্যাহত হয় তা কোনোদিন শুভ হতে পারে না।

অ-যুক্তি থেকে যুক্তিতে, সামাজিক প্রথানুগত্য থেকে প্রাতিস্বিকতায় কুমুর উত্তরণই যোগাযোগের আসল কথা। কুমুকে অবশ্য ফিরে যেতে হয়েছিল মধুসূদনের সংসারে— সময়ের বিবেচনায় অন্য উপসংহারই অবাস্তব হত। উপলব্ধি অনুযায়ী সে বাস্তবে এগোতে পারে নি, বাস্তবই বাধা ছিল। কিন্তু দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কুমু এক আধুনিক উপলব্ধি অর্জন করল, 'এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোয়ানো যায় না।'

সব শেষে আর একটা উপন্যাসের কথা— নাম, দুই বোন। এই উপন্যাসে যেন বিজ্ঞানের পদ্ধতি ব্যবহৃত হল সাহিত্যসৃষ্টির কাজে। বাইরের অপ্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ বর্জন করে একটা মডেল নিয়ে বিজ্ঞানী বীক্ষণাগারে পরীক্ষা করেন। এই মডেল বাস্তবেরই একটা শুদ্ধতর প্রতিরূপ। দুই বোন উপন্যাসও সেই বিজ্ঞানীর মডেলের মতো। অবান্তর সব প্রসঙ্গ বর্জন করে এখানে একটি সমস্যাকে বিবেচনা করা হয়েছে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কাহিনী ও চরিত্রের সাহায্যে। চরিত্রের 'সংখ্যা অতি অল্প, তিনটিমাত্র প্রাণী'— শর্মিলা, ঊর্মিমালা এবং শশাঙ্ক। আরো কয়েকটি চরিত্রের খবর আমরা শুনি অবশ্য— মথুরদাদা, হেমন্ত, বিশেষ করে নীরদ মুখুজ্জে— কিন্তু তারা সামনে আসে না। তিনটি আসল চরিত্রের মুখে অথবা বক্তার বিবরণে মাত্র আমরা তাদের কথা জানতে পাই। পুরুষ-নারীর সম্পর্কের যে সমস্যাটা উপন্যাসের বিবেচ্য তার জন্যে অন্দরের বাইরে যাবার বেশি দরকার হয় নি। তাই বহির্জগতের অনুপুঙ্খ এখানে অনেকটাই অবান্তর। আর সেই কারণে বাস্তবপটভূমিকে অনুপুঙ্খের দ্বারা ঘনত্ব দেবার কোনো চেষ্টা করেন নি রবীন্দ্রনাথ।

বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে যে এই আধুনিক উপন্যাসটি লেখা তার প্রমাণ উপন্যাসের আরম্ভেই। বিজ্ঞানী একটা হাইপথেসিস বা প্রকল্প ধরে নিয়ে কাজ শুরু করেন, যাচাই করে দেখেন প্রকল্পটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে কিনা। দুই বোন উপন্যাসের শুরুতেই সেইরকম একটা হাইপথেসিস বা প্রকল্প উপস্থিত করেছেন লেখক— 'মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি। এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।' পণ্ডিতের কাছে শোনা এই কথা খাঁটি কিনা যেন তাই পরীক্ষা করার জন্যে ঔপন্যাসিক তাঁর বীক্ষণাগারে মা-জাতের মেয়ে শর্মিলা, প্রিয়া-জাতের মেয়ে ঊর্মিমালা এবং তাদের মাঝখানে একজন পুরুষ শশাঙ্ককে উপস্থিত করলেন। নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে, যেন বিবর্ধনকারী কাচের তলায় ফেলে, তিনি দেখতে চাইলেন তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য পুরোনো ধরনে নীতিসুধা বিতরণ নয়, গল্প বলা নয়, চরিত্রের বিকাশ নয়। এখানে উদ্দেশ্য কয়েকটি কল্পিত নরনারীর মাধ্যমে একটি তত্ত্বকে যাচাই করা। উপন্যাসের প্রথম দুটি বাক্যে সেই তত্ত্বের কথা লেখক বলে নিয়েছেন। কোন্ সমস্যা তাঁর বিবেচনার বিষয় তা রবীন্দ্রনাথ পরে ব্যাখ্যা করেছিলেন— 'বাংলা দেশে অনেক পুরুষ আছে যারা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তই মাতৃ-অঙ্কের আবহাওয়ায় সুরক্ষিত। তারা স্ত্রীর কাছে মায়ের লালনটাই উপভোগ্য বলে জানে।... অর্থাৎ স্ত্রী আসে মায়ের পরিশিষ্ট হয়ে...।... আবার এমন পুরুষ নিশ্চয়ই আছে যারা আর্দ্র আদরের আবেশে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন থাকতে ভালোই বাসে না। তারা স্ত্রীকে চায় স্ত্রীরূপেই, তারা চায় যুগলের অনুষঙ্গ।... অপর পক্ষে অতিনির্ভরলোলুপ মেয়ে সংসারে অনেক আছে। তারা এমন পুরুষকে চায় যারা হবে তাদের প্রাণযাত্রার মোটররথের শোফার। তারা

চায় পতিগুরুকে, পদধূলির কাঙালিনী তারা। কিন্তু তার বিপরীত জাতীয় মেয়েও নিশ্চয়ই আছে যারা অতিলালন-অসহিষ্ণু প্রকৃত পুরুষকেই চায়, যাকে পেলে তার নারীত্ব পরিপূর্ণ হয়।'

স্ত্রী শর্মিলার দ্বারা প্রায়-অপত্যস্নেহে লালিত হতে অভ্যস্ত ছিল শশাঙ্ক, ভিতরে ভিতরে যদিও ছিল অধীর। অসুস্থ দিদিকে সেবার জন্যে প্রিয়ার জাতের মেয়ে ঊর্মিমালা সেখানে আসায় 'শশাঙ্ক যখন বাড়িতে আসে তখন সেখানকার হাওয়ায় খেলানো একটা ছুটির হিল্লোল অনুভব করে।' এই হিল্লোল এতদিন ছিল শশাঙ্কর অভিজ্ঞতার বাইরে। শর্মিলা শুয়ে-শুয়ে দেখে, 'আরামটা সামান্য হয়ে গেছে, স্বামী হয়েছে খুশি।' দোল উৎসবের দিন 'ঊর্মির উচ্চহাসির স্বরোচ্ছ্বাসে সমস্ত বাড়ি মুখরিত'— সেদিন খেলাচ্ছলে হয়ে গেল মনোবিনিময়। নীরদকে এতটাই ইন্‌দাফারেব্‌ল্ করার উদ্দেশ্য ঊর্মিকে শশাঙ্কর প্রতি প্রবণ করা। নীরদ আকর্ষক চরিত্র হলে রবীন্দ্রনাথের বীক্ষণাগারে নরনারীর এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিপাটি পরীক্ষাটি যে জমত না! নীরদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে দুজনে বেরল যুগল মোটর-যাত্রায়। 'সংসারের সমস্ত দাবি ভয় লজ্জা এই বেগের কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেল।' শর্মিলার মনে সন্দেহের অবকাশ রইল না। রবীন্দ্রনাথ প্রথাসিদ্ধ উপন্যাসের পথে উপসংহার টানতে পারতেন— অসুস্থ শর্মিলার মৃত্যু ঘটিয়ে। কিন্তু সেই সহজ সমাধান অশ্রদ্ধেয় মনে হয়েছিল তাঁর। বাবাজির ওষুধে তাই ভালো করিয়ে দিলেন শর্মিলাকে। শর্মিলার পক্ষে এ হল এক মর্মান্তিক বিপত্তি— 'শেষকালে বেঁচে ওঠাই কি মরার বাড়া হয়ে দাঁড়াবে।' অন্য সমাধান খুঁজল শর্মিলা। তখনো হিন্দু পুরুষের এক স্ত্রী বর্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ আইনত নিষিদ্ধ ছিল না। শর্মিলা বোনকেই করতে চাইল সতিন। কিন্তু এই সমাধান রবীন্দ্রনাথের পছন্দসই হতে পারে না। আধুনিকা ঊর্মিমালাই বা মেনে নেয় কী করে এই আত্মগ্লানিকর সমাধান!

কারণ 'তোমার দিদি, তিনি তো দেবী', কিন্তু ঊর্মি সেইরকম দেবী হতে চায় না। আধুনিকা সে, সে দেবী হয়ে বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত হতে চায় না, সে দাসী হয়ে পিছনে পড়ে থাকতে চায় না, সে চায় পুরুষের পার্শ্বে সমকক্ষের স্থান। 'শশাঙ্ক ভারি খুশি হয়ে উঠে ওকে প্রশ্রয় দেয়, ও কষে নিয়ে আসে। জুট-কোম্পানির স্টীমলঞ্চে শশাঙ্ক কাজ তদন্ত করতে যায়, ও ধরে বসে 'আমিও যাব'। শুধু যায় তা নয়, মাপজোখের হিসাব নিয়ে তর্ক করে, শশাঙ্ক পুলকিত হয়ে ওঠে। ভরপুর কবিত্বের চেয়ে এর রস বেশি।··· এইখানটাতে শর্মিলাকে রীতিমত ধাক্কা দেয়।···[ব্যাবসার ক্ষেত্রে] ঊর্মির অবাধে গতিবিধি ওর একটুও ভালো লাগে না। ওটা নিতান্তই স্পর্ধা। আপন আপন সীমা মেনে চলাকেই গীতা বলেন স্বধর্ম।' মানতে রাজি নয় ঊর্মি এই তথাকথিত 'স্বধর্ম', এই 'সীমা'। আবার সে বিয়ে করতেও রাজি হতে পারে না শশাঙ্ককে। রবীন্দ্রনাথ তার আচরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন—'ভূমিকাম্পনিক কেন্দ্রের উপরে কাঁচা মাল-মসলায় তৈরি নড়নড়ে বাসায় আশ্রয় নিতে সে নারাজ। তাই সে দিলে দৌড়।' চলে গেল বিলেতে। চিঠিতে লিখল, 'তোমাদের সংসারে এসে যা ভাঙচুর করে গেলুম ইতিমধ্যে কালের হাতে আপনিই তা জোড়া লাগবে।' কালের সুচিকিৎসায় সব নিরাময় হয় কিনা সে প্রশ্ন থাক, কিন্তু যে কালের উপর ঊর্মির এত আস্থা, সেই কাল কত বদলে গেছে। দাম্পত্যসংসারে একদিন ভাঙচুর ঘটিয়েছিল নষ্টনীড়ের দেবর অমল, পরে সে পরিস্থিতি বুঝে চলে গিয়েছিল বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে। দুই বোনে শ্যালিকা ঊর্মিমালা সরে গেল দাম্পত্যসংসারে ভাঙচুর ঘটিয়ে, চলে গেল বিলেতে ডাক্তারি পড়তে। মধ্যবর্তী

সময়ের ব্যবধানে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রগতি হয়েছে নারীর। চোখের বালি-র বিনোদিনীকে কাশীবাসী হতে হয়েছিল, অন্তঃসত্ত্বা কুমুদিনী ফিরে গিয়েছিল স্বামীর সংসারে, আন্তরিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও। তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আয়োজন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বারবার খণ্ডিত হয়েছে। ঊর্মি তাদের চেয়ে এগিয়েছে অনেক দূর, তার সিদ্ধান্ত সে নিজেই নেয়। ডাক্তারি পাস করে সে আজ নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম। প্রতিকূল বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধ করে-করে নারীর এই যে আত্মপ্রতিষ্ঠা আদায়ের সংগ্রাম, তার ইতিহাসকে সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেও রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করেছেন, ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি আধুনিক মনের অধিকারী।

সেই উত্তরাধিকার উত্তরসূরিরা সব সময় বজায় রাখতে পারেন নি। কিন্তু সেই পশ্চাদপসরণের ইতিহাস ভিন্ন আলোচনার সামগ্রী।

মেঘনাদ বধ কাব্যের পাঠান্তর

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

মধুস্থদন রাজনারায়ণ বস্থকে একটি চিঠিতে লিখেছেন :

"I find there are many metrical blemishes in the earlier Books of Meghanad. They must be removed in a future edition, if the work should live to run through one and I to do the needful."

এই পত্রাংশটি যোগীন্দ্রনাথ বস্থর 'মাইকেল মধুস্থদন দত্তের জীবন-চরিত' গ্রন্থে সংকলিত ৪৪-সংখ্যক পত্র থেকে গৃহীত।[১] এই চিঠিতে কোনো তারিখ উল্লিখিত নেই। তার পরের ৪৫-সংখ্যক চিঠির, রাজনারায়ণ বস্থকেই লেখা, তারিখ : খিদিরপুর ২৯ আগস্ট ১৮৬১। যোগীন্দ্রনাথ বস্থর গ্রন্থে যেভাবে ৩৫-সংখ্যক থেকে ৪৪-সংখ্যক পত্রগুলি মুদ্রিত হয়েছে, তাতে দেখা যায়, এই চিঠিগুলিতে কোন তারিখ উল্লেখ করা হয় নি। ৩৪-সংখ্যক চিঠিতে অবশ্য তারিখ আছে : ১৬ জানুয়ারি ১৮৬১। ৩৪-সংখ্যক ও ৪৫-সংখ্যক চিঠির তারিখের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায়, এই চিঠিগুলি ১৬ জানুয়ারির পর থেকে ২৯ আগস্টের মধ্যে লেখা এবং উদ্‌ধৃত পত্রাংশটি অর্থাৎ ৪৪-সংখ্যক চিঠিখানি এই পত্রধারার শেষে রচিত ব'লে অনুমান করা চলে, ১৮৬১-এর আগস্টের কোনো এক সময় লিখিত।

এর পরে, ৪৮-সংখ্যক চিঠিতে, ৪ জুন ১৮৬২ তারিখে মধুস্থদন রাজনারায়ণ বস্থকে আবার লিখছেন :

"Meghanad is going through a second edition with notes, and a real B. A. has written a long critical preface, echoing your verdict— namely, that it is the first poem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months."

এই দুটি চিঠির অর্থাৎ ৪৪-সংখ্যক ও ৪৮-সংখ্যক চিঠির মধ্যে ন'মাসের মতো ব্যবধান রয়েছে। প্রথম চিঠিতেই ইঙ্গিত রয়েছে, পরের সংস্করণে ত্রুটিগুলি দূর করা হবে। এবং সম্ভবত তার পরেই, প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হবার পরে, তিনি কাব্যটির সংস্কারে হাত দেন। দ্বিতীয় সংস্করণেই যাতে কাব্যটি একটা সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে কবির যে কী পরিমাণ আগ্রহ ছিল, তা ৪৮-সংখ্যক চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে।

বস্তুত, ৪৪-সংখ্যক চিঠিতে মধুস্থদন যে কথা বলেছেন, পরবর্তী সংস্করণগুলির সংস্কারের ভিতর দিয়ে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন। তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত মেঘনাদবধ কাব্যের ছ'টি সংস্করণে তিনি যে সংস্কার করেন, সেই সংস্কারগুলিকেই পাঠান্তর আখ্যা দেওয়া যায়।

ঠিক কোন্ তারিখে মধুস্থদন মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় বৃত হন, তা বলা শক্ত। যোগীন্দ্রনাথ বস্থর গ্রন্থে সংকলিত ১৭-সংখ্যক চিঠির তারিখ ২৪ এপ্রিল ১৮৬০। এই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, কবি লিখেছেন,

---

১ চতুর্থ সংস্করণ ১৯০৭, পৃ. ৪৯২ দ্রষ্টব্য।

তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য প্রায় প্রকাশিত হতে চলেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি তাঁর প্রিয় ইন্দ্রজিতের মৃত্যু-কাহিনী 'celebrate' করতে চলেছেন। ১৮৬১ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি কাব্যটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য রচনার আট মাসের মতো সময়ের ব্যবধানে মেঘনাদবধ কাব্য রচিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৬১ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। খণ্ড দুটির পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ১৩১ ও ১০৭।

অতঃপর 'a real B. A.' অর্থাৎ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে। মধুসূদন তার আগেই য়ুরোপ রওনা হয়ে যান। ১৮৬৭-র ফেব্রুয়ারির প্রথমে প্রায় পাঁচ বছর পরে য়ুরোপ থেকে ফেরার পর ২১ আগস্ট ১৮৬৭-তে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় প্রথম খণ্ডের। এর মধ্যে অন্য কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি। ১৮৬৭, ৩ ডিসেম্বরে চতুর্থ সংস্করণ, পঞ্চম সংস্করণ ১৬ মার্চ, ১৮৬৯ এবং ২০ জুলাই ১৮৬৯ ষষ্ঠ সংস্করণের প্রকাশকাল। চতুর্থ সংস্করণ থেকে হেমচন্দ্রের 'মুখবন্ধ'র পরিবর্তে 'ভূমিকা' অংশ সংযোজিত হয়। মধুসূদনের জীবিতকালে ষষ্ঠ সংস্করণই মেঘনাদবধ কাব্যের সর্বশেষ সংস্করণ।

এই তথ্যগুলি অনেকেরই জানা। কিন্তু অনেকেই লক্ষ্য করেন নি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ ও দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ একই সঙ্গে একত্রে একই বছরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। স্ট্যানহোপ যন্ত্রে ১২৭৪ সালে এই দুটি সংস্করণ 'যন্ত্রিত'।

এই ৬টি সংস্করণের পাঠ অনুসরণে পাঠান্তরের আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে, প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণের গ্রন্থটি দেখবার সুযোগ পাই নি, অনেক অন্বেষণ সত্ত্বেও। এক্ষেত্রে, প্রথম খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণের পাঠ তৃতীয় সংস্করণের অনুরূপ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে। অন্যান্য সংস্করণগুলির পাঠান্তর পূর্বাপরতা সূত্রে উল্লিখিত।

২॥ সর্গ অনুসারে পাঠান্তরগুলি উল্লেখ করা গেল :

প্রথম সর্গ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৯	বন্দি ও চরণ অরবিন্দ, মন্দমতি	১ম, ২য়
	বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৪	ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চবধূ বিঁধিলা নিষাদ,	১ম
	ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,	২য়
	ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৭-১৮	দস্যুবৃত্তি-প্রবৃত্ত পাষণ্ড নরাধম আছিল যে নর, এবে তোমার প্রসাদে,—	১ম
	নরকুলে নরাধম আছিল যে নর, দস্যুবৃত্তি-রত, এবে তোমার প্রসাদে,—	২য়
	নরাধম আছিল যে নর নরকুলে চৌর্য্যে রত, হইল যে তোমার প্রসাদে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২২	বিষবৃক্ষ চন্দন-বৃক্ষের শোভা ধরে !—	১ম
	সুচন্দন বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে !	২য়
	সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে !	৩য়-৬ষ্ঠ
২৩	হায়, মা, এ হেন পুণ্য কি আছে আমার ?	১ম,২য়
	হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে ?	৩য়-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
২৪	কিন্তু গুণহীন যে সন্তানগণ মাঝে	১ম, ২য়
	কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৭	স্ফটিক গঠিত ;	১ম, ২য়
	স্ফটিকে গঠিত ;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৩	বসুধা। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,	১ম, ২য়
	ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৬	স্বয়ম্বর গেহে। ক্ষণপ্রভা সম হাসে—	১ম, ২য়
	রত্নালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৭	রতনসম্ভবা-বিভা — ঝলসি নয়ন !—	১ম
	রতনসম্ভবা বিভা— নয়ন ঝলসি,—	২য়
	রতনসম্ভবা বিভা— ঝলসি নয়নে !	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৮	ঢুলায় চামর চারুলোচনা কিঙ্করী।	
-৫০	ধরে ছত্র ছত্রধর, হর কোপানলে	
	না পুড়ে মদন যেন দাঁড়ান সেখানে !	১ম
	সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী	
	ঢুলায় ; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি	
	চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা !	
	হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি	২য়
	... ... আহা !	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫২	দাঁড়ান সুসভাতলে ছত্রধর-রূপে ![1]	২য়
	দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে !	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৫	শূলপাণি ! মন্দ মন্দ বহে গন্ধবহ,	১ম, ২য়
	শূলপাণি ! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৬	পরিমলময় বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি	১ম, ২য়
	অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৭	কাকলী লহরী, আহা, মনোহর যথা	১ম
	কাকলী লহরী, মরি ! মনোহর, যথা	২য়-৬ষ্ঠ
৬৩	পুত্রশোকে বাক্যহীন !	১ম
	বাক্যহীন পুত্রশোকে !	২য়-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৬৪	বসন ;	১ম, ২য়
	বসনে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৬৫	যথা তরু, সরস শরীরে তীক্ষ্ণশর	১ম
	যথা তরু, তীক্ষ্ণশর সরস শরীরে	২য়-৬ষ্ঠ
৮৬	তোমা হেন ধন ?	১ম
	তোমা হেন ধনে ?	২য়-৬ষ্ঠ
৯৩	বৃক্ষ,	১ম
	বৃক্ষে,	২য়-৬ষ্ঠ
৯৫	নিরন্তর ! সমূলে নির্ম্মূল হব আমি	১ম
	নিরন্তর ! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে	২য়-৬ষ্ঠ
১০২	এ ভুজগ ?	১ম, ২য়
	এ ভুজগে ?	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১১৭	শুনি, গদাধর ভীমসেন গদাঘাতে	১ম
	শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে	২য়-৬ষ্ঠ
১২৩	তোমারে বুঝায় হেন সাধ্য কার আছে	১ম
	হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে	২য়-৬ষ্ঠ
১২৪	এ জগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ মনে মনে—	১ম
	এ জগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে ;—	২য়-৬ষ্ঠ
১২৬	বজ্রাঘাতে, ভূধর অধীর কভু নহে	১ম
	বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর	২য়-৬ষ্ঠ
১৪৯	হুঙ্কার !	১ম, ২য়
	হুঙ্কারে !	৩য়-৬ষ্ঠ
১৫০	গর্জ্জন ;	১ম, ২য়
	গর্জ্জনে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৫১	সিংহনাদ ; জলধির কল্লোল ; দেখেছি	১ম, ২য়
	সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি	৪র্থ-৬ষ্ঠ

১ প্রথম সংস্করণে পঙ্‌ক্তিটি ছিল না, দ্বিতীয় সংস্করণে নবসংযোজন।

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
১৬০	গগন ;	১ম, ২য়
	গগনে ;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৬৪	"এই রূপে যুঝিলা শম্বর রিপুরূপী—	১ম
	"এই রূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে	২য়-৬ষ্ঠ
১৬৬	যুদ্ধে প্রবেশিলা	১ম
	প্রবেশিলা যুদ্ধে	২য়-৬ষ্ঠ
১৭১	সভাজন কাঁদিল সকলে।	১ম
	সভাজন কাঁদিলা নীরবে।	২য়-৬ষ্ঠ
১৭৯	যথা অগ্নিময় চক্ষু হর্যক্ষ দুর্জ্জয়,	১ম
	অগ্নিময়-চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে	২য়-৬ষ্ঠ
১৮০	কড়মড়ি ভীষণ দশন, পড়ে লাফি	১ম
	কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া	২য়
১৮১	বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রোষে—	১ম
	বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে	২য়-৬ষ্ঠ
১৯৬	মনস্তাপে। হরষে বিষাদে লঙ্কাপতি	১ম
	মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে	২য়-৬ষ্ঠ
২০৪	নয়ন!	১ম, ২য়
	নয়নে!	৩য়-৬ষ্ঠ
২০৬	কনক উদয়াচলে যেন দিনমণি	১ম
	কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন	২য়-৬ষ্ঠ
২১৩	দেব গৃহ ; বিপণি রঞ্জিত নানা রাগে,	১ম
	দেবগৃহ, নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,	২য়-৬ষ্ঠ
২১৬	রে চারুলঙ্কা,	১ম, ২য়
	রে চারুলঙ্কে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২২৬	কিম্বা নক্ষত্র মণ্ডল	১ম
	নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা	২য়-৬ষ্ঠ
২৩৭	শশী। সঙ্গে লক্ষ্মণ, পবনপুত্র হনূ,	১ম
	শশাঙ্ক! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনূ,	২য়-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
২৪০	যথা ঘোর কাননে, কিরাত-দল মিলি,	১ম
	গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,	২য়-৬ষ্ঠ
২৪৪	রণক্ষেত্র। শকুনি, গৃধিনী, শিবাকুল,	১ম
	রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনী,	২য়-৬ষ্ঠ
২৪৮	সমলোভী জীব ;	১ম, ২য়
	সমলোভী জীবে ;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৪৯	রক্তস্রোতঃ!	১ম, ২য়
	রক্তস্রোতে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৫৪	ধনু,	১ম, ২য়
	ধনুঃ,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৫৫	তূণ, শর, পরশু, মুদ্গর, ভিন্দিপাল	১ম
	ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,	২য়-৬ষ্ঠ
২৬১	স্বর্ণচূড় শষ্য কৃষীদলবলে ক্ষত,	১ম
	স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষীদল বলে,	২য়-৬ষ্ঠ
২৭৫	তবু, বৎস, মোহমদে মুগ্ধ যে হৃদয়,	১ম
	তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে	২য়-৬ষ্ঠ
২৭৮	যিনি অন্তর্যামী ;	১ম
	অন্তর্যামী যিনি ;	২য়-৬ষ্ঠ
২৮০	কিন্তু, দেব, পরের যাতনা দেখি তুমি	১ম
	পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি	২য়-৬ষ্ঠ
২৮১	হও কি হে সুখী? পিতা পুত্রদুঃখে দুঃখী—	১ম
	হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—	২য়-৬ষ্ঠ
২৯৩	প্রশস্ত ; বহিছে জনস্রোত কলরবে	১ম
	প্রশস্তে ; বহিছে জনস্রোতঃ কলরবে	২য়-৬ষ্ঠ
৩০৪	ভীম-পরাক্রম!	১ম, ২য়
	ভীমপরাক্রমে!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩১০	মাধব উরসে,	১ম
	মাধবের বুকে	২য়-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৩১২	উঠ, বলি ; বীরবলে ভাঙি এ জাঙাল,[১]	১ম
	উঠ, বলি ; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,	২য়-৬ষ্ঠ
৩১৯	সভাতলে ; নীরবে বসিলা মহামতি	
-২০	শোকাকুল ; পাত্রমিত্র, সভাসদ্‌ আদি	১ম
	সভাতলে ; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে	
	মহামতি ; পাত্রমিত্র, সভাসদ্‌ আদি	২য়-৬ষ্ঠ
৩২৩	বসিল সকলে, হায়, বিষণ্ণবদনে।	
	হেনকালে সহসা ভাসিল চারিদিকে	
	মৃদু রোদন নিনাদ ; তা সহ মিশিয়া	১ম
	বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে !	
	হেনকালে চারিদিকে সহসা ভাসিল	
	রোদন-নিনাদ মৃদু ; তা সহ মিশিয়া	২য়-৬ষ্ঠ
৩২৬	দেবী চিত্রাঙ্গদা।	১ম, ২য়
	চিত্রাঙ্গদা দেবী।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৩৪	শাবক। শোকের ঝড় বহিল সভায় !—	১ম
	শাবক। শোকের ঝড় বহিল সভাতে !	২য়
	শাবকে ! শোকের ঝড় বহিল সভাতে !	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৫০	শাবক	১ম, ২য়
	শাবকে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৫২	অমূলরতন ?	১ম-৪র্থ
	অমূল্যরতন ?	৫ম-৬ষ্ঠ
৩৫৫	সে ধন ?	১ম, ২য়
	সে ধনে ?”	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৬৩	বারুইর বরদে সজারু পশি যথা	১ম, ২য়
	বরদে সজারু পশি বারুইর যথা	৪র্থ-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৩৬৬	পরেছে শৃঙ্খল পায়ে	১ম
	পরেন শৃঙ্খল পায়ে	২য়-৬ষ্ঠ
৩৬৮	বুক ফাটিছে আমার	১ম
	বুক আমার ফাটিছে	২য়-৬ষ্ঠ
৩৮৩	ক্রন্দন ? উজ্জ্বল আজি এ বংশ আমার	১ম
	ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি	২য়-৬ষ্ঠ
৩৮৫	কাঁদ, হে বিধুবদনে,	১ম
	কাঁদ, ইন্দুনিভাননে,	২য়-৬ষ্ঠ
৩৯৫	শোভে জলনিধি।	১ম
	শোভেন জলধি।	২য়-৬ষ্ঠ
৪০১	রাক্ষসকুল	১ম, ২য়
	রাক্ষসকুলে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪০৭	সঙ্গীদল লয়ে,	১ম
	সঙ্গীদলে লয়ে,	২য়-৬ষ্ঠ
৪০৮	চলি গেলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,	১ম
	প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে,অভিমানে,	২য়-৬ষ্ঠ
৪০৯	ত্যজিয়া কনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া	১ম
	ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া	২য়-৬ষ্ঠ
৪৩৯	অম্বরে। বাজিল চারিদিকে ঘোর রোলে	১ম
	অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে	২য়-৬ষ্ঠ
৪৪৩	ভয়ঙ্কর। রাজাদেশে সাজিল রাক্ষস।—	১ম
	রোধিল শ্রবণপথ মহা কোলাহলে !	২য়
	রোধিল শ্রবণ-পথ মহা-কোলহলে[২] !	৪র্থ
	রোধিল শ্রবণ-পথ মহা-কোলাহলে !	৫ম-৬ষ্ঠ

১ এই পঙ্‌ক্তিটির 'বলি' শব্দটি নিঃসন্দেহে ক্রিয়াপদ নয়, এবং বিরামচিহ্নও প্রমাদজনক। 'বলিন্‌' শব্দের সম্বোধনে 'বলিন্‌', ছন্দের জন্য কবি ব্যবহার করেছেন'বলি'। বাংলায় বলী শব্দের সম্বোধনে 'বলী' হওয়া উচিত। এই কাব্যে বলী শব্দটি আরো কয়েকবার অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

২ 'কোলহলে !' অবশ্যই ছাপার ভুল।

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৪৬০	বায়ুবৃন্দ ;	১ম
	বায়ুবৃন্দে ;	২য়-৬ষ্ঠ
৪৮২	গিয়াছেন চলি।"	১ম
	গিয়াছেন গৃহে।"	২য়-৬ষ্ঠ
৪৮৪	জলতল হ'তে,	১ম
	জলতল ত্যজি,	২য়-৬ষ্ঠ
৪৮৫	সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা[১]	
৪৯৭	দেউল।	১ম
	দেউলে।	২য়-৬ষ্ঠ
৪৯৮	শত স্বর্ণ-পাত্রে সারি সারি উপহার—	১ম
	স্বর্ণ পাত্রে সারি-সারি উপহার নানা,	২য়-৬ষ্ঠ
৪৯৯	বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণ দীপ শত	১ম
	বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী	২য়-ষষ্ঠ
৫০১	শশীকলা করে!	১ম
	পূর্ণশশীতেজে!	২য়
	পূর্ণ-শশী-তেজে!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫১৯	মাধব-উরসে ;	১ম
	হরির উরসে ;—	২য়-৬ষ্ঠ
৫৫৩	করে সুবর্ণ কঙ্কণ,	১ম, ২য়
	করে শোভিল কঙ্কণ,—	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৬২	গভীর নিক্কণে।	১ম
	গম্ভীর নিক্কণে।	২য়-৬ষ্ঠ
৫৬৩	উড়ে কেতু, রতনে খচিত, শত শত	১ম
	রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত	২য়-৬ষ্ঠ
৫৮৭	মুর-অরি! রণ-মদে মত্ত, ওই দেখ	১ম
	মুরারি! সমরমদে মত্ত, ওই দেখ,	২য়
	মুরারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ,	৪র্থ-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৫৯৬	ইন্দ্রজিত্‌	১ম, ২য়
	ইন্দ্রজিতে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৯৯	ভ্রমিছে কুমার.	১ম
	ভ্রমিছে আমোদে,	২য়-৬ষ্ঠ
৬০০	না জানি বাহু বলেন্দ্র বীরবাহু বলী	
-০১	হত রণে। যাও তুমি বারুণীর পাশে,	১ম
	যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে	
	বীরবাহু। যাও তুমি বারুণীর পাশে,	২য়-৬ষ্ঠ
৬৩২	নিঝ'র। প্রবেশ দেবী করিয়া প্রাসাদে,—	১ম
	নিঝ'র। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ প্রাসাদে,	২য়
	নিঝ'র। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৬৪১	শর আয়ত লোচনে!	১ম
	আয়ত লোচনে শর!	২য়-৬ষ্ঠ
৬৫১	ভানুসুতে, যথা রাসবিহারী রাখাল,	১ম
	ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি,	২য়-৬ষ্ঠ
৬৫২	দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,	
-৫৩	গোপিনী কামিনী সনে, তোর চারুকূলে!	১ম
	নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,	
	গোপবধূসঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে!	২য়-৬ষ্ঠ
৬৬৫	রাক্ষস-ঈশ্বর	১ম
	রাক্ষসাধিপতি	২য়-৬ষ্ঠ
৬৬৮	কে বধিল বলী	
-৬৯	বীরবাহু?	১ম
	কে বধিল কবে	
	প্রিয়ানুজে?	২য়-৬ষ্ঠ
৬৭১	প্রচণ্ড শর বর্ষণে বৈরীদল ; তবে	১ম
	বরষি প্রচণ্ড শর বৈরীদলে ; তবে	২য়-৬ষ্ঠ

১ দীননাথ সান্যাল বলেছেন, কোনো সংস্করণে 'রজৎ-কান্তি-ছটা' করা হয়েছিল ; তা কবিকৃত নয়।

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৬৮৩	কহিলা গভীরে	১ম
	কহিলা গম্ভীরে	২য়-৬ষ্ঠ
৬৮৯	সাজিলা বীর-ঋষভ	১ম
	সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ	২য়-৬ষ্ঠ
৭০৬	পদাশ্রমে	১ম, ২য়
	পদাশ্রয়ে	৩য়-৬ষ্ঠ
৭১১	সে বাঁধ ?	১ম, ২য়
	সে বাঁধে ?	৩য় ৬ষ্ঠ
৭১৬	উজ্জ্বলি অম্বর।	১ম
	অম্বর উজলি !	২য়-৬ষ্ঠ
৭৩৬	তবে নিকষা নন্দন ;—	১ম
	তবে স্বর্ণলঙ্কাপতি ;—	২য়-৬ষ্ঠ
৭৪১	জলে শিলা ভাসে ?	১ম
	ভাসে শিলা জলে ?	২য়-৬ষ্ঠ
৭৪৩	উত্তর করিলা তবে অসুরারি রিপু ;—	১ম
	উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি রিপু ;—	২য়
	উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু ;—	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৭৫৪	তরুবর কিম্বা তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ যথা	১ম
	ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা	২য়-৬ষ্ঠ
৭৬০	প্রভাতে যুঝিও, পুত্র, রাঘবের সাথে।	১ম
	প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"	২য়-৬ষ্ঠ

দ্বিতীয় সর্গ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
২	ললাটে তারা রতন। ফুটিল কুমুদ ;	১ম
	ললাটে একটি রত্ন। ফুটিল কুমুদ ;	২য়
	একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী ;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৬	আইলা তারাকুন্তলা, শশীসহ হাসি,[১]	১ম
	আইলা সুচারু তারা শশীসহ হাসি	২য়-৬ষ্ঠ
৭	শর্ব্বরী ; বহিল চারিদিকে গন্ধবহ,	১ম
	শর্ব্বরী, সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে	২য়-৬ষ্ঠ
১২	বিরাম, জলদদল, খেচর, ভূচর,	১ম, ২য়
	বিরাম, ভূচরসহ জলচর-আদি	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৯	ঢুলায় কিঙ্করী	১ম, ২য়
	ঢুলায় চামরী,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২০	আইলেন সমীরণ, নন্দন কানন	১ম
	আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন—	২য়-৬ষ্ঠ
২৭	সুধারস।	১ম, ২য়
	সুধারসে।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৩	আলো করি সুর পুর,	১ম, ২য়
	আলো করি সুর-পুরী,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪০	উত্তরিলা বাসব ;—"হে বারীন্দ্র-নন্দিনি,	১ম, ২য়
	উত্তর করিলা ইন্দ্র ; "হে বারীন্দ্র-সুতে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪১	রাঙা পদযুগ	১ম, ২য়
	রাঙা পা দুখানি	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪২	সকলেরি বাঞ্ছা, মাতঃ ! যার প্রতি তুমি,	১ম, ২য়
	বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো ! যার প্রতি তুমি,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৪	জনম তার !—	১ম, ২য়
	জনম তারি !	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৭	স্বর্ণ লঙ্কাপুরে।	১ম, ২য়
	স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।	৪র্থ-৬ষ্ঠ

---

১ যোগীন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থে সংকলিত রাজনারায়ণ বসুকে লেখা ৪৪-সংখ্যক চিঠি দ্রষ্টব্য। এই চিঠিতে মধুসূদন এই পঙ্‌ক্তি দুটির (৬ ও ৭-সংখ্যক) পাঠান্তরের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। এই চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠান্তরের আলোচনায় আগে উদ্‌ধৃত হয়েছে।

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৯৩	সমূলে নির্মূল না হইলে	১ম
	না হইলে নির্মূল সমূলে	২য়-৬ষ্ঠ
৯৪	রসাতলে যায় ভবতল !	১ম
	ভবতল যায় রসাতলে !	২য়
	ভবতল রসাতলে যাবে !	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৯৯	কি দোষ দেখিয়া তায়, না ভাবেন মনে ?	১ম, ২য়
	কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে ?	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১০১	জিজ্ঞাসিও, অদিতি নন্দন ?	১ম, ২য়
	জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে !	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১০৬	গেলা নীচগামী,	১ম, ২য়
	গেলা অধোদেশে।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১০৭	সোনার প্রতিমা, মরি, পড়িলে বিমল	
-০৮	সলিলে, উজলি জল, ডুবে যথা তলে !	১ম, ২য়
	সোনার প্রতিমা, যথা ! বিমল সলিলে	
	ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে !	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১১০	শচীকান্ত নিতান্ত মধুর	১ম, ২য়
	শচীকান্ত মধুর বচনে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১১১	বচনে ; "চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি।	১ম, ২য়
	একান্তে ; "চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১১২	সহ বহিলে পবন,	১ম, ২য়
	সহ পবন বহিলে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১১৫	শুনিয়া পত্রির বাণী,	১ম, ২য়
	শুনি প্রণয়ীর বাণী,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২০	দেবযান ; চমকিয়া জাগিল জগত্,	১ম
	দেবযান ; চমকিয়া জগত জাগিল,	২য়
	দেবযান ; সচকিতে জগত জাগিলা,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২৩	কূজনে ; ফুটিল পদ্ম ; মুদিল কুমুদ।	১ম, ২য়
	পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে !	৪র্থ-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
১২৪	বাসরে কুসুমশয্যা ত্যজি ফুলবধূ,	১ম, ২য়
	বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২৫	লজ্জাশীলা, আবরিলা কমলবদন !	১ম, ২য়
	কুলবধূ গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে !	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২৬	কৈলাস শিখর,	১ম, ২য়
	কৈলাসশিখরী,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৩০	পীতধড়া যথা।	১ম
	পীতধড়া যেন !	২য়-৬ষ্ঠ
১৩৯	তোমা দুই জন ?"	১ম, ২য়
	তোমা দুই জনে ?"	৩য়-৬ষ্ঠ
১৬২	রণভূমে মেঘনাদ সাথে ?	১ম
	রণ-ভূমে রাবণির সাথে ?	২য়-৬ষ্ঠ
১৭৩	কহিলা বাসব ;—	১ম, ২য়
	বাসব কহিলা ;—	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৮১	আছিল তাহার	১ম, ২য়
	তাহার আছিল	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৮২	অমূল	১ম, ২য়
	অমূল্য	৩য়-৬ষ্ঠ
২২৫	হেনকালে সহসা পূরিল গন্ধামোদে	১ম
	হেনকালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল	২য়-৬ষ্ঠ
২৩৩	খড়ি পাতি, করিয়া গণনা,	১ম
	খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,	২য়-৬ষ্ঠ
২৩৪	হাসিয়া বিজয়া কহে ;	১ম
	নিবেদিলা হাসি সখী ;	২য়-৬ষ্ঠ
২৩৬	সিন্দুরে আঁকিয়া	১ম, ২য়
	সুসিন্দুরে আঁকি	৩য়-৬ষ্ঠ
২৬৬	ভাবিলা কিরূপে আজি ভেটিব মহেশে ?	১ম, ২য়
	ভাবিলা "কিভাবে আজি ভেটিব ভবেশে ?"	৪র্থ-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
২৬৭	স্মরিলা রতিরে—	১ম
	চিন্তিলা রতিরে।	২য়-৬ষ্ঠ
২৬৯	বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারেন সুখে,	১ম, ২য়
	বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৭৩	অঙ্গুলি পরশে! চলি গেলা কামবধূ,—	১ম, ২য়
	অঙ্গুলির পরশনে! গেলা কামবধূ,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৭৪	দ্রুতগতি মধুমতী, কৈলাস শিখরে।	১ম, ২য়
	দ্রুতগতি বায়ু-পথে, কৈলাস-শিখরে।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৭৫	হায়রে, নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী	১ম, ২য়
	সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৮৯	বিবিধ ভূষণ	১ম, ২য়
	বিবিধ ভূষণে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৯০	হীরা, মণি, মুকুতা-খচিত ; আনি দিলা	১ম
	হীরক, মুকুতা, মণি খচিত ; আনিলা	২য়-৬ষ্ঠ
২৯২	কৌষেয় বসন, রত্ন-সঙ্কলিত আভা	১ম, ২য়
	রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৯৩	আঁকিলা হরষে	১ম, ২য়
	চিত্রিলা হরষে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৯৪	শশীমুখী। ভুবন-মোহিনী মূর্ত্তি ধরি।	১ম
	শশীমুখী, ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী	২য়
	চারুনেত্রা। ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৯৭	ও চন্দ্র আনন,	১ম
	ও চন্দ্র-আনন ;	২য়
	ও চন্দ্র-আননে ;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩০৫	শুনিয়া উল্লাসে!	১ম
	শুনি রে উল্লাসে!	২য়-৬ষ্ঠ
৩০৮	যোগে মগ্ন এবে দেব ;	১ম, ২য়
	যোগে মগ্ন এবে, বাছা ;	৪র্থ-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৩১৫	ত্যজি বিশ্বভার	১ম
	বিশ্ব-ভার ত্যজি,	২য়-৬ষ্ঠ
৩২৯	এ মম মিনতি”	১ম
	এ মিনতি পদে।”	২য়-৬ষ্ঠ
৩৩৫	জীবন নাশক	১ম
	প্রাণনাশকারী	২য়
	প্রাণ-নাশ-কারী	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৩৬	বিষ যথা বাঁচায় জীবন বিদ্যাবলে।”	১ম
	বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে!”	২য়-৬ষ্ঠ
৩৪২	বাহির হইবা, কহ, এ মোহিনী বেশে ?	১ম
	বাহিরিবা,কহ দাসে,এ মোহিনী-বেশে?	২য়-৬ষ্ঠ
৩৪৩	জগত, হেরিয়া	১ম, ২য়
	জগত, হেরিলে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৪৬	যবে মথিয়া সিন্ধুরে,	১ম, ২য়
	যবে মথি জলনাথে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৪৯	আইলা কেশব।	১ম
	আইলা শ্রীপতি।	২য়-৬ষ্ঠ
৩৫০	হেরি ত্রিভুবন,	১ম
	ত্রিভুবন হেরি,	২য়-৬ষ্ঠ
৩৫১	কামাকুল, চাহিয়া রহিলা তাঁর পানে!	১ম
	হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!	২য়-৬ষ্ঠ
৩৫৫	কুচ যুগ	১ম, ২য়
	কুচ-যুগে!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৬১	চারু অবয়ব	১ম, ২য়
	চারু অবয়বে।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৭৮	পালাইল	১ম
	পলাইল	২য়-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৩৮২	নিমগ্ন তপঃ সাগরে,	১ম, ২য়
	তপের সাগরে মগ্ন,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪২১	হানিলা কুসুমধনুঃ টঙ্কারি, কুসুম—	১ম, ২য়
	হানিলা কুসুমধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৩৩	দেব কি মানব,	১ম, ২য়
	দেবে কি মানবে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৩৪	কার হেন সাধ্য	১ম, ২য়
	কোথা হেন সাধ্য	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৩৬	আদেশো,	১ম
	আদেশ,	২য়-৬ষ্ঠ
৪৪৩	কুমুদ, কমল,	১ম, ২য়
	কমল, কুমুদী,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৪৬	দেবদেব মহাদেব সহ মহাদেবী।	১ম
	দেবদেব মহাদেব মহাদেবী সহ।	২য়-৬ষ্ঠ
৪৪৮	দাঁড়াইয়া বিধুমুখী	১ম
	দাঁড়াইলা বিধুমুখী	২য়-৬ষ্ঠ
৪৫৫	উদয়-অচলে ভানু দিলে দরশন।	১ম
	দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।	২য়-৬ষ্ঠ
৪৫৮	কহিলেন প্রিয়ম্বদা ;—	১ম
	কহিলেন প্রিয়ভাষে ;	২য়-৬ষ্ঠ
৪৬৪	হাসিয়া, হাসিয়া	১ম, ২য়
	সুমধুর হাসে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৭০	বার্ত্তা। আরোহিয়া রথে দেবরথীবর	১ম
	বার্ত্তা। আরোহিয়া রথে দেবরাজরথী	২য়
	বারতা। আরোহি রথে, দেবরাজ রথী	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৭৩	অকম্প শির চামর ;—	১ম
	অকম্পচামর শিরে ;	২য়-৬ষ্ঠ
৪৭৬	ত্যজি রথবর	১ম, ২য়
	ত্যজি রথ-বরে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৮০	আভাময় আসনে বসেন কুহকিনী	১ম
	আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী	২য়-৬ষ্ঠ
৪৮১	করযোড়ে প্রণমি বাসব	১ম
	করযোড়ে বাসব প্রণমি	২য়
	কর-যোড়ে বাসব প্রণমি	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৮৫	মহেশ আদেশে,	১ম, ২য়
	শিবের আদেশে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৯৮	অস্ত্র।	১ম, ২য়
	অস্ত্রে।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫০১	তূণীর,	১ম, ২য়
	তূণীরে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫০৭	নয়ন!	১ম, ২য়
	নয়নে!	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫১৬	প্রেয়ো	১ম
	প্রেয়	২য়-৬ষ্ঠ
৫২১	হৈমদ্বার	১ম, ২য়
	হৈমদ্বারে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৪৪	গগন	১ম, ২য়
	গগনে ;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৪৫	আজ্ঞা দিব	১ম
	দিব আজ্ঞা	২য়-৬ষ্ঠ
৫৪৬	বায়ুকুল ;	১ম
	বায়ু কুলে ;	২য়-৬ষ্ঠ
৫৪৭	জগৎ পূরিব	১ম, ২য়
	পূরিব জগতে।”	৪র্থ-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৫৪৮	প্রণমি, দেবেন্দ্রপদে, যতনে লইয়া	১ম, ২য়
	প্রণমি, দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৪৯	অস্ত্র,	১ম, ২য়
	অস্ত্রে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৫৩	বায়ুদল—	১ম, ২য়
	বায়ুদলে ;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৫৪	বৈরী তব সিন্ধুসনে	১ম
	বৈরী সিন্ধু তার সনে	২য়
	বৈরী বারি-নাথ সনে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৫৭	তিমির গহ্বরে যথা রুদ্ধ বায়ু যত	
-৫৮	ভীমাকৃতি। কতদূরে শুনিলা পবন	১ম
	ভাঙিলে শৃঙ্খল লম্ফী কেশরী যেমতি,[1]	
	যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত	
	গিরি-গর্ভে। কতদূরে শুনিলা পবন	২য়-৬ষ্ঠ
৫৫৯	ঘোর কোলাহল ;	১ম, ২য়
	ঘোর কোলাহলে ;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৬৬	তরঙ্গ নিকর	১ম
	তরঙ্গনিকর	২য়
	তরঙ্গ-আবলী	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৮৫	নয়ন,	১ম, ২য়
	নয়নে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৬২২	শান্তিল জলধি ;	১ম
	শান্তিলা জলধি ;	২য়-৬ষ্ঠ

তৃতীয় সর্গ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৩৮	সে দাম	১ম, ২য়
	সে দামে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৯	ঝরিল শিশির নীর,	১ম, ২য়
	মুক্তিল শিশির-নীরে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৬	এ পরাণো	১ম
	এ পরাণ	২য়-৬ষ্ঠ
৬১	ফুলচয়	১ম, ২য়
	ফুল-চয়ে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৭৬	জলধি উদ্দেশে,	১ম, ২য়
	সিন্ধুর উদ্দেশে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৯২	আস্ফালি ফলকপুঞ্জ	১ম, ২য়
	আস্ফালি ফলকপুঞ্জে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২১	কটিদেশ	১ম, ২য়
	কটিদেশে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২৩	তুলিল ফলক,	১ম, ২য়
	ফলক তুলিল,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২৪	নয়ন !	১ম, ২য়
	নয়নে !	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২৮	ঝলমলি জলে অঙ্গে	১ম, ২য়
	ঝলমলি ঝলে অঙ্গে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৫২	মাতিলা	১ম, ২য়
	মাতিল	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৫৪	বিভীষণ—	১ম, ২য়
	বিভীষণে—	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৫৫	বিপক্ষদল,	১ম, ২য়
	বিপক্ষ-দলে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৫৬	বিদ্যুত আকৃতি	১ম, ২য়
	বিদ্যুৎ-আকৃতি	৪র্থ-৬ষ্ঠ

---

১ বর্তমানে পঙ্‌ক্তিটির সংখ্যা ৫৫৬, দ্বিতীয় সংস্করণে নব সংযোজন।

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
২০২	পবন-নন্দন	১ম, ২য়
	বলীন্দ্র পাবণি	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২১২	মন্দোদরীসহ যত	১ম
	মন্দোদরী-আদি	২য়-৬ষ্ঠ
২১৮	রঘুকুলকমলিনী ;	১ম, ২য়
	রঘু-কুল-কমলেরে ;—	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২২৩	কহিলা গভীরে ;—	১ম, ২য়
	কহিলা গম্ভীরে ;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৯৩	উতরিল	১ম
	উতরিলা	২য়-৬ষ্ঠ
৩১১	ধীর দাশরথি	১ম
	বীর দাশরথি	২য়-৬ষ্ঠ
৩৩৯	বীরেশ্বর ; বীর পত্নী তোমার ভর্ত্রিণী।	
-৪০	কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি ললনে,	১ম, ২য়
	বীরেশ্বর ; বীর পত্নী, হে স্থনেত্রা দূতি,	
	তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।[১]	
	কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি ললনে,	৩য়-৬ষ্ঠ
৩৬৬	বারিদ পুঞ্জ !	১ম
	বারিদ-পুঞ্জে !	২য়-৬ষ্ঠ
৩৭৫	অটল ; চলিছে বামাদল মধ্যপথে,	১ম
	অটল ; চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দলে !	২য়-৬ষ্ঠ
৩৯০	কুসুম শর !	১ম, ২য়
	কুসুম-শরে !	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৯৮	শূল কেহ	১ম, ২য়
	শূলে কেহ ;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪১৮	মহাশক্তি সম তেজঃ !	১ম
	মহাশক্তি-সম তেজে !	২য়-৬ষ্ঠ
৪২৪	এ নিগড়,	১ম, ২য়
	এ নিগড়ে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৩৬	সম অটল সমরে !	১ম
	সদৃশ অটল যুদ্ধে !	২য়-৬ষ্ঠ
৪৪৩	নিস্তারিলে ভবে,	১ম, ২য়
	নিস্তারিলা ভবে	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৪৮	এ দম্ভ,	১ম, ২য়
	এ দম্ভে,	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৪৯	সাগর বাঁধিয়া	১ম, ২য়
	সাগরে বাঁধিয়া	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৫৯	মেঘনাদ ; পিতৃপাপে পুত্রের মরণ।	১ম
	মেঘনাদ ; মরে পুত্র জনকের পাপে।	২য়-৬ষ্ঠ
৪৭৮	কোথায় কে জাগে ? মহাক্লান্ত আজি সবে	১ম
	কোথায় কে জাগে আজি ? মহাক্লান্ত সবে	২য়-৬ষ্ঠ
৪৯৫	কুম্ভ আস্ফালিল ;	১ম, ২য়
	কুম্ভে আস্ফালিল ;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫০৮	পতঙ্গনিকর	১ম, ২য়
	পতঙ্গ-আবলী	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫০৯	আইলা ধাইয়া	১ম, ২য়
	আইল ধাইয়া	৩য়-৬ষ্ঠ
৫১১	কুসুমাসার ;	১ম, ২য়
	কুসুমাসারে ;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৩৫	ত্যজিলা বীরভূষণ ; পরিলা দুকূলে	১ম, ২য়
	ত্যজিলা বীর-ভূষণে ; পরিলা দুকূলে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৫৩৯	উরসে, কামের বাসা ; ভালে তারা গাঁথা	১ম, ২য়
	উরসে ; জ্বলিল ভালে তারা গাঁথা সিঁথি	৪র্থ-৬ষ্ঠ

১ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে পঙ্‌ক্তিটি ছিল না, পরবর্তী সংস্করণে নব সংযোজন। স্বভাবতই 'কহ তাঁরে শত মুখে' পঙ্‌ক্তিটি সংখ্যা তৃতীয় সংস্করণে হয়েছে ৩৪১।

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৫৪০	সিঁথি ; কর্ণে কুণ্ডল ; অলকে মণি-আভা	১ম, ২য়
	অলকে মণির আভা কুণ্ডল শ্রবণে।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৬০২	রবিচ্ছবিকরস্পর্শে	১ম, ২য়
	রবিচ্ছবি-করস্পর্শে	৩য়-৬ষ্ঠ

চতুর্থ সর্গ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
১৩	বঙ্গভূমি অলঙ্কার !—	১ম, ২য়
	এ বঙ্গের অলঙ্কার !—	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৪	কবিতা রস সরসে রাজ-হংস-কুল	১ম, ২য়
	কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৫	সহ কেলি করি আমি, তুমি না শিখালে ?	১ম,২য়
	মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি ?	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৬	গাঁথিব নূতন মালা, তুলিয়া যতনে	১ম, ২য়
	গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৭	তব কাব্যোদ্যান-ফুল ;	১ম, ২য়
	তব কাব্যোদ্যানে ফুল ;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৩৯	বৈরীদল সিন্ধুপারে ;	১ম, ২য়
	বৈরী-দলে সিন্ধু-পারে ;	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৩	পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে	১ম, ২য়
	পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, কাননে[1]	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৮	নীরব !	২ম
	নীরবে !	২য়-৬ষ্ঠ
৫৬	রহিয়া রহিয়া দূরে স্বনিছে পবন,	১ম
	স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া	২য়-৬ষ্ঠ
৫৭	নিশ্বাসে বিলাপী যথা !	১ম
	উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা !	২য়-৬ষ্ঠ
৬৩	এ দুঃখ বারতা	১ম, ২য়
	এ দুখ-কাহিনী !	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৭৯	সরসীর তীরে বসি দেখিতাম কভু[2]	১ম
৯২	মৈথেলী ;	১ম
	মৈথিলী ;—	২য়-৬ষ্ঠ
১০৫	তোমা রক্ষোরাজ, সতি ?	১ম, ২য়
	তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি ?	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১১০	এ চোর ? কি মায়া করি,	১ম
	এ চোর ? কি মায়াবলে	২য়
	এ চোর ? কি মায়া-বলে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১১১	পশিয়া, করিল চুরি অমূল রতনে ?	১ম, ২য়
	প্রবেশি, করিল চুরি এহেন রতনে ?”	২য়-৬ষ্ঠ
২৩৮	ঘটাইল পরে !	১ম
	ঘটাইল শেষে !	২য়-৬ষ্ঠ
২৪৮	দেবতা যত	১ম, ২য়
	দেবতা-কুলে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৭৬	মাগিনু কুরঙ্গ আমি	১ম, ২য়
	মাগিনু কুরঙ্গে আমি !	৪র্থ-৬ষ্ঠ
২৯৩	রাক্ষস ভ্রমরে হেথা,	১ম, ২য়
	রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা,	৪র্থ-৬ষ্ঠ

---

১ চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণে 'দেউলে শব্দটি বাদ পড়েছিল এবং এই ভুল চলে আসছিল। সম্ভবত দ্বিতীয় সংস্করণের পরেই এই ত্রুটি ঘটেছিল।

২ সম্ভবত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে পঙ্‌ক্তিটি বর্জিত হয়ে এসেছে। দীননাথ সান্যালের মন্তব্য : “ইহার অভাবে পরবর্ত্তী পংক্তির কোন অর্থ হয় না।”

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৩০৭	দেখিব করুণা স্বরে	১ম
	দেখিব করুণ-স্বরে	২য়-৬ষ্ঠ
৩৪২	কি গৌরবে ব্রহ্মশাপে কর অবহেলা ?	১ম
	কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে ?	২য়-৬ষ্ঠ
৩৮৩	আভরণ। দশাননে বৃথা গঞ্জ তুমি।"	১ম
	আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।"	২য়-৬ষ্ঠ
৪১৫	স্বর্ণরথ হইল অস্থির !	১ম
	স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে !	২য়-৬ষ্ঠ
৪১৮	কহিলা গভীরে	১ম
	কহিলা গম্ভীরে	২য়-৬ষ্ঠ
৪২২	প্রেমদীপ ? জানি আমি এই ধর্ম্ম তোর	১ম
	প্রেমদীপ ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জানি।	২য়-৬ষ্ঠ
৪২৬	নাহি আর তোর্ সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে !"	১ম
	আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে ?	২য়-৬ষ্ঠ
৪৩৩	সে রণ ? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন !	১ম, ২য়
	সে রণে ? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন !	৪র্থ-৬ষ্ঠ
৪৯৭	অলঙ্ঘ্য সাগর	১ম
	অলঙ্ঘ্য সাগরে	২য়-৬ষ্ঠ
৫৯৬	মেলি আঁখি	১ম
	মিলি আঁখি,	২য়-৬ষ্ঠ
৬০০	উন্মীলিয়া, দেখ চেয়ে, ইন্দু নিভাননে,	১ম
	উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে, ইন্দু-নিভাননে	২য়-৬ষ্ঠ
৬৪৯	জন্তুকুল	১ম
	জন্তু-পুঞ্জ	২য়-৬ষ্ঠ
৬৫২	এ তব দুঃখ শর্ব্বরীর !	১ম
	এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব !	২য়-৬ষ্ঠ
৬৫৬	যথা ঋতুকুলেশ্বরে !	১ম
	যথা ভেটেন মধুরে !	২য়-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৬৬৮	মূর্ত্তিমতী তুমি দয়া	১ম, ২য়
	মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি	৪র্থ-৬ষ্ঠ

পঞ্চম সর্গ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৪৯	নীরবে মুদিত পদ্ম।	১ম, ২য়
	নীরবে মুদিত পদ্মে।	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১২৯	বিরাজে সৌমিত্রি শূর, সুমিত্রার বেশে	১ম
	বিরাজেন রামানুজ সুমিত্রার বেশে	২য়-৬ষ্ঠ
১৯২	বীরবরদলে	১ম, ২য়
	বীর-বল-দলে	৪র্থ-৬ষ্ঠ
১৯৯	রাঘবের চিরদাস আমি অগ্রসরি	১ম
	রাঘবের দাস আমি। আশু অগ্রসরি	২য়-৬ষ্ঠ
২০৮	জাহ্নবী কলতরঙ্গা, শারদ নিশাতে	১ম
	জাহ্নবীর ফেন-লেখা শারদনিশাতে	২য়-৬ষ্ঠ
২০৯	কৌমুদীর রজঃপ্রভা মেঘপুঞ্জে যেন	১ম
	কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন।	২য়-৬ষ্ঠ
২২০	বিরূপাক্ষ, আইস, বৃথা বিলম্ব না সহে !	১ম
	বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে !	২য়-৬ষ্ঠ
২২৪	কহিলা গভীরে ;	১ম
	কহিলা গম্ভীরে !	২য়-৬ষ্ঠ
২০৩	শুনিলা চমকি বীর ঘোর সিংহনাদ !	১ম
	ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি !	২য়-৬ষ্ঠ
২৩৭	আবরিল শশী	১ম
	আবরিল চাঁদে	২য়-৬ষ্ঠ
২৪২	উপড়িলা তরু	১ম, ২য়
	উপাড়িলা তরু	৩য়-৬ষ্ঠ
২৮৭	অমৃত সতত,	১ম
	অমৃত উল্লাসে ;	২য়-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
২৮৮	অমরী, স্থিরযৌবনা! বরিনু তোমারে	১ম
	অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে ; উরদ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত ; না শুখায় সুধারস অধর-সরসে ; অমরী আমরা, দেব! বরিনু তোমারে[১]	২য়-৬ষ্ঠ
৩০৪	রাক্ষস	১ম
	রাক্ষসে,	২য়-৬ষ্ঠ
৩০৭	এতেক কহিয়া মহাবাহু	১ম
	মহাবাহু এতেক কহিয়া	২য়-৬ষ্ঠ
৩৩৬	সিংহাসনে মহামায়া!	১ম
	সিংহাসনে মহামায়ে।	২য়-৬ষ্ঠ
৩৪৬	সাধিতে তোর এ কার্য্য	১ম
	সাধিতে এ কার্য্য তোর	২য়-৬ষ্ঠ
৩৬১	গর্ব্বে তোরে ধরিল, লক্ষ্মণ,	১ম
	গর্ব্বে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল	২য়-৬ষ্ঠ
৩৮১	তুমি রবিছবি	১ম
	তুমি রবিচ্ছবি ;—	২য়-৬ষ্ঠ
৪০৪	(ফুলদলে শিশির অমৃত ভোগ ছাড়ি)	১ম
	(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)	২য়-৬ষ্ঠ
৫২২-২৩	পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।” জলদ প্রতিমস্বনে স্বনিলা কেশরী।	১ম
	পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি। কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে?”	২য়-৬ষ্ঠ
৫৩৫	জননীর পদে	১ম
	জননীর পদ	২য়-৬ষ্ঠ
৫৫৪	মুকুতাহার উরসে নয়ন বর্ষিল	১ম, ২য়
	মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল	৪র্থ-৬ষ্ঠ

ষষ্ঠ সর্গ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৩	রাঘব-পঙ্কজ-রবি ; কিরাত যেমনি,	১ম, ২য়
	রঘু-রাজ ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি।	৩য়-৬ষ্ঠ
৪	হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় বায়ুগতি	১ম, ২য়
	হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা	৩য়-৬ষ্ঠ
৩৬	সাধিতে তোর এ কার্য্য, শিবের আদেশে	১ম
	সাধিতে এ কার্য্য তোর, শিবের আদেশে	২য়-৬ষ্ঠ
৫৮	স্ববন্ধুবান্ধব—	১ম, ২য়
	স্ববন্ধুবান্ধবে—	
৫৯	হারাইনু ভাগ্যদোষে সকলে ; আছিল	১ম, ২য়
	হারাইনু ভাগ্যদোষে ; কেবল আছিল	৩য়-৬ষ্ঠ
৬২	দুর-অদৃষ্ট!	১ম
	দুর-দৃষ্ট!	২য়
	দুরদৃষ্ট!	৩য়-৬ষ্ঠ
১০৭	স্বর্গীয় বাদিত্র, আহা, শুনিনু গগনে	১ম, ২য়
	স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে	৩য়-৬ষ্ঠ
১৩৪	কত যে সাধিলা সবে,	১ম, ২য়
	কত যে সাধিল সবে,	৩য়-৬ষ্ঠ
১৫৬	এ অরক্ষপুরে	১ম, ২য়
	এ রাক্ষস-পুরে,	৩য়-৬ষ্ঠ
১৮৭	ফলক ; দ্বিরদ রদ নির্ম্মিত, কাঞ্চনে	১ম
	দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত ফলক,—কাঞ্চনে	২য়
	ফলক ; দ্বিরদরদ নির্ম্মিত, কাঞ্চনে	৩য়-৬ষ্ঠ
১৮৯	শরময়।	১ম, ২য়
	শরপূর্ণ	৩য়-৬ষ্ঠ
১৯৩	সুচূড়া, কেশরী-পৃষ্ঠে হায়রে, যেমতি	১ম, ২য়
	সুচূড়া, কেশরীপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি	৩য়-৬ষ্ঠ

১ ‘অনন্ত বসন্ত জাগে… অধর-সরসে’ : দ্বিতীয় সংস্করণে নব সংযোজন।

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
২১৪	নিস্তারিনি, দেবদলে !	১ম
	দেবদলে, নিস্তারিণি !	২য়-৬ষ্ঠ
২৩৩	অমূল রতন	১ম, ২য়
	অমূল রতনে	৩য়-৬ষ্ঠ
২৩৪	ভিখারী রামের, রাম অর্পিছে তোমারে,	১ম, ২য়
	রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,	৩য়-৬ষ্ঠ
২৯৫ -৯৬	মেঘনাদে ? এতদিনে মজিলি, দুর্মতি রাবণ ! গহন বনে, হেরি দূরে যথা মৃগবরে, চলে হরি, গুল্ম-আবরণে	১ম
	রাবণ ! গহন বনে, হেরি দূরে যথা মৃগবরে, চলে হরি, গুল্ম-আবরণে,	২য়
	রাবণিরে ! ঘন বনে হেরি দূরে যথা মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র, গুল্ম-আবরণে।	৩য়-৬ষ্ঠ
৩০০	অদৃশ্য,	১ম, ২য়
	অদৃশ্যে,	৩য়-৬ষ্ঠ
৩০৫	শুক্তি শুষে যথা ২২	১ম
	শুষে শুক্তি যথা	২য়-৬ষ্ঠ
৩২০	ভীমমূর্ত্তি, ভীমবীর্য্য, বিগ্রহপ্রয়াসী !	১ম
	ভীমমূর্ত্তি, ভীমবীর্য্য ; দুর্জ্জয় সংগ্রামে।	২য়
	ভীমমূর্ত্তি, ভীমবীর্য্য ; অজেয় সংগ্রামে।	৩য়-৬ষ্ঠ
৩৩৭	মণ্ডিত রতনে, আহা, যথা সুরপুরে !—	১ম, ২য়
	মণ্ডিত রতনে, মরি ! যথা সুরপুরে !—	৩য়-৬ষ্ঠ
৩৪৭	তুষার রাশিতে, মরি, প্রভাতে যেমতি	১ম, ২য়
	তুষার রাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি	৩য়-৬ষ্ঠ
৩৫৫	এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে ?	১ম
	এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে ?	২য়-৬ষ্ঠ
৩৭৯	কোথাও, আমোদি পথ সৌরভে রূপসী,	১ম, ২য়
	কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে	৩য়-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৪০৪	গলে ফুলমালা।	১ম, ২য়
	ফুলমালা গলে।	৩য়-৬ষ্ঠ
৪১২	যোগীন্দ্র-কৈলাস, আহা ! তোর উচ্চ চূড়ে !	১ম, ২য়
	যোগীন্দ্র-কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চূড়ে !	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৩৪	সহসা হেরিয়া	১ম, ২য়
	সহসা হেরিলে	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৪৪	এ অররুপুরে আজি ?	১ম, ২য়
	রক্ষোরাজপুরে আজি ?	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৪৭	উচ্চ এ পুর প্রাচীর ;	১ম, ২য়
	এ পুর-প্রাচীর উচ্চ ;	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৫০	দেবকুলোদ্ভব	১ম, ২য়
	দেবকুলোদ্ভবে	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৫১	কে আছে রথী এ ভবে,	১ম, ২য়
	কে আছে রথী এ বিশ্বে	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৮০	রক্ষোরিপু তুমি, কিন্তু অতিথি হে এবে।	১ম, ২য়
	রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৩৪	রক্ষিয়া	১ম, ২য়
	রক্ষিতে	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৪৭	হে বীরকেশরী, কবে সম্ভাষে শৃগালে	১ম, ২য়
	কবে, হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৭৭	রাঘবপদ আশ্রয়ে	১ম
	রাঘবপদ-আশ্রয়ে	২য়
	রাঘবের পদাশ্রয়ে	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৭৮	পরোদোষে	১ম
	পর-দোষে	২য়
	পরদোষে	৩য়-৬ষ্ঠ

পঙ্ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৫৯৮	বহে বরষার কালে	১ম
	বহে বরিষার কালে	২য়-৬ষ্ঠ
৬১২	যথা প্রহারকে হেরি, সম্মুখে কেশরী !	১ম, ২য়
	প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী !	৩য়-৬ষ্ঠ
৬৩৯	আঃ মরি, যেমতি	১ম, ২য়
	কাঁদিল যেমতি	৩য়-৬ষ্ঠ
৬৪৯	দৈত্যকুলদম ইন্দ্রে	১ম, ২য়
	দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে	৩য়-৬ষ্ঠ
৬৯২	উঠ, অরিন্দম !	১ম, ২য়, ষষ্ঠ
	উঠ, অরিন্দমি !	৩য়-৫ম
৭৩১	এ অররুপুরে ।	১ম, ২য়
	এ রাক্ষসপুরে ।	৩য়-৬ষ্ঠ

সপ্তম সর্গ

পঙ্ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
২	পদ্মপর্ণে সুপ্ত, আহা, পদ্মযোনি যেন,	১ম, ২য়
	পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,	৩য়-৬ষ্ঠ
৩	উন্মীলি নয়ন দেব সুপ্রসন্ন ভাবে,	১ম, ২য়
	উন্মীলি নয়ন পদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে	৩য়-৬ষ্ঠ
৬৮	প্রণমিলা পদে	১ম
	প্রণমিলে পদে	২য়-৬ষ্ঠ
১২৬	ব্যজনিল কেহ ।	১ম
	কেহ বিউনিল ।	২য়
	বিউনিল কেহ ।	৩য়-৬ষ্ঠ
১৪৮	ভাগ্যহীন ভৃত্য	১ম
	ভাগ্যহীন ভৃত্যে	২য়-৬ষ্ঠ
১৮৮	জনমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে ![1]	২য় ৬ষ্ঠ
২৯০	মহৎ যে জন, সদা উদ্ধারে বিপদে !	১ম, ২য়
	মহত্ যে প্রাণ-পণে উদ্ধারে বিপদে !	৩য়-৬ষ্ঠ
৩০৭	সেনানী, সুবর্ণরথে চিত্ররথ রথী ।	১ম-২য়
	সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী ।	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৪৩	চলিছে প্রতাপ অগ্রে, শব্দ তার পরে ।	১ম, ২য়
	চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে ;	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৪৪	পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি ;	
-৪৫	চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টি পথ রোধি[2]	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৪৬	তদনু পরাগরাশি ! টলিছে সঘনে	১ম, ২য়
	ঘন ঘনাকাররূপে ! টলিছে সঘনে	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৪৯	চির-অরি প্রভঞ্জন মিলিলে আসিয়া ।	১ম
	চির-অরি প্রভঞ্জন মিলিলে সমরে ।	২য়
	চির-অরি প্রভঞ্জনে দেখা দিলে দূরে	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৫৫	কাঁদিছে জননী কোলে করি শিশুকুল	১ম
	কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী,	২য়-৬ষ্ঠ
৪৫৬	ভয়াকুল ;	১ম, ২য়
	ভয়াকুলা ;	৩য়-৬ষ্ঠ
৫১৫	বসিবেন আর রমা, এ বিশ্ব আঁধারি !"	১ম, ২য়
	বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে ?"	৩য়-৬ষ্ঠ
৫১৬	দেবরক্ষঃনরে	১ম
	দেব রক্ষোনরে	২য়
	দেবরক্ষোনরে	৩য়-৬ষ্ঠ
৫২৯	যথা হেরিয়া বারণে ।	১ম, ২য়
	যথা হেরি সে বারণে ।	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৩২	শতজলস্রোতঃনাদে ।	১ম
	শতজলস্রোতোনাদে !	২য়-৬ষ্ঠ

১ পঙ্ক্তিটি প্রথম সংস্করণে ছিল না।

২ পঙ্ক্তিটি প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল না।

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৫৪১ -৪২	রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, বাসব যেমতি স্বরীশ্বর! শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি,	১ম, ২য়
	রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা বজ্রধর! শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি,	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৭৬	কহিলা গভীরে,—	১ম, ২য়
	কহিলা গম্ভীরে,—	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৮৯	হানিলা	১ম
	হানিল	২য়-৬ষ্ঠ
৫৯২	দেখ লো	১ম, ২য়
	দেখ্‌ লো	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৯৪	দেখ	১ম, ২য়
	দেখ্‌	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৯৫	যাও তুমি সৌদামিনীগতি,	১ম, ২য়
	যা লো তুই সৌদামিনীগতি,	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৯৬	নিবার	১ম, ২য়
	নিবার্‌	৩য়-৬ষ্ঠ
৬৩৩	লাড়িতে দম্ভোলি,হায়,দভোলি-নিক্ষেপী!	১ম,২য়
	লাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলিনিক্ষেপী!	৩য়-৬ষ্ঠ
৬৬৫	পালাইল রড়ে	১ম
	পালাইলা রড়ে	২য়-৬ষ্ঠ
৬৮৪	আবার তারার, মূঢ়? দেবর কে আছে	১ম-৫ম
	আবার তাহার, মূঢ়? দেবর কে আছে	৬ষ্ঠ
৭২০	চুরিলি রাক্ষস-রত্ন— অমূল জগতে।"	১ম
	হরিলি রাক্ষসরত্ন— অমূল জগতে।"	২য়-৬ষ্ঠ
৭৫৬	চন্দ্রচূড়, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহ!"	১ম, ২য়
	বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহে!"	৩য়-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
অষ্টম সর্গ		
২	রাজেন্দ্র, রাখেন দেব খুলি সযতনে	১ম, ২য়
	প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে	৩য়-৬ষ্ঠ
৪	দিনান্তে দিনরতন তমোহা মিহিরে	১ম, ২য়
	দিনান্তে শিবের রত্ন, তমোহা মিহিরে,	৩য়-৬ষ্ঠ
২০	লক্ষ্মণ, কুটীর-দ্বারে নিত্য নিশাকালে,	১ম, ২য়
	লক্ষ্মণ, কুটীর দ্বারে, আইলে যামিনী,	৩য়, ৬ষ্ঠ
২৩	তুমি! আজি রক্ষঃ-পুরে অরি-মাঝে আমি।	১ম, ২য়
	আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,	৩য়-৬ষ্ঠ
১০৬ -০৮	আপনি কৃতান্তদেব দিবেন কহিয়া কি উপায়ে রামানুজ জীবন লভিবে, পূজায় সন্তুষ্ট তাঁরে করিলে নৃমণি।	১ম, ২য়
	পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে, আবার; এ নিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে!	৩য়-৬ষ্ঠ
১১৯	লহ সঙ্গে প্রেতপুরে; কৃতান্ত আপনি	১ম, ২য়
	লহ সঙ্গে প্রেতপুরে; দশরথ পিতা	৩য়-৬ষ্ঠ
১২৩	ত্রিশূলী ত্রিশূল, সতি।	১ম
	ত্রিশূলীর শূল, সতি।	২য়-৬ষ্ঠ
১২৪	যমদেশ	১ম
	যমদেশে	২য়-৬ষ্ঠ
১৪০	আপনি কৃতান্তদেব দিবেন কহিয়া	১ম, ২য়
	পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া	৩য়-৬ষ্ঠ
২১৬	ঘোরে অবিরাম গতি দ্বারের চৌদিকে!	১ম, ২য়
	ঘোরে অবিরাম গতি চৌদিক উজলি!	৩য়-৬ষ্ঠ
২৩৪	পচা সর্ব্ব দেহ	১ম
	বিগলিত দেহ	২য়-৬ষ্ঠ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
২৬৪	রণ	১ম, ২য়
	রণে !	৩য়-৬ষ্ঠ
৩২৩	চিরোজ্জ্বল ! চল, রথি, চল, দেখাইব	১ম, ২য়
	জলে নিত্য ! চল, রথি, চল দেখাইব	৩য়-৬ষ্ঠ
৩৪৫	হে ধন্বি, বিরত তুমি, চল এই পথে !"	১ম, ২য়
	হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে !"	৩য়-৬ষ্ঠ
৩৬৭	কর্ম্মদোষে ! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব	১ম
	ভাগ্য-দোষে ! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব	২য়-৬ষ্ঠ
৩৬৮	ধর্ম্মরাজে, তেঁই আজি এ কৃতান্তপুরে।"	১ম, ২য়
	পিতায়, তেঁই গো আজি এ কৃতান্তপুরে।"	৩য়-৬ষ্ঠ
৪১৩	গরিমার পুরস্কার এই অবশেষে ?	১ম, ২য়
	গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে ?	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৩১	আবার কহিলা মায়া ··	
-৯৩	··· পুরস্কার শেষে ?"[১]	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৯৭	কিন্তু কোথা ধর্ম্মরাজ ? লইব মাগিয়া	১ম, ২য়
	কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি ? লইব মাগিয়া	৩য়-৬ষ্ঠ
৪৯৯	লহ দাসে দেব-ধামে, এ মম মিনতি।"	১ম, ২য়
	লহ দাসে সে স্বধামে, এ মম মিনতি।"	৩য়-৬ষ্ঠ
৫০২	সহস্র বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি	১ম, ২য়
	দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি	৩য়-৬ষ্ঠ
৫০৫	করে বাস পতি-সহ পতিপরায়ণা	১ম, ২য়
	পতিসহ করে বাস পতিপরায়ণা	৩য়-৬ষ্ঠ
৫১৬	চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় যে কিছু যা চাহে,	১ম
	চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় যা কিছু যে চাহে,	২য়-৬ষ্ঠ
৫২১	অবিলম্বে ধর্ম্মরাজে পাইবে, নৃমণি !"	১ম, ২য়
	অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি !"	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৪৪	লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ দক্ষিণ দ্বারে !	১ম, ২য়
	লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে !	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৫৫	কণক প্রসূন প্রসূ ;—	১ম, ২য়
	কণক-প্রসূন-পূর্ণ ;	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৬৫	উজ্জ্বল।"	১ম, ২য়
	উজ্জ্বলে !"	৩য়-৬ষ্ঠ
৫৭৩	স্থরথে স্থরথীবৃন্দ টঙ্কারিছে ধনুঃ[২]	১ম
৫৭৬	বীরকুল সংকীর্ত্তন।	১ম, ২য়
	বীরকুলসংকীর্ত্তনে।	৩য়-৬ষ্ঠ
৬৫৫	বিনাশিনু বহুরক্ষঃ ;	১ম, ২য়
	বিনাশিনু বহু রক্ষে ;	৩য়-৬ষ্ঠ
৭৩৯	ফল, হায়, কে পারে বর্ণিতে ফলছটা ?	১ম
	ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বর্ণিতে ?	২য়-৬ষ্ঠ

নবম সর্গ

পঙ্‌ক্তি	মূল পাঠ : পাঠান্তর	সংস্করণ
৭০	বহিল	১ম
	কহিল	২য়-৬ষ্ঠ
৩৮৮	কর্ব্বুর-গৌরব-রবি	১ম, ৫ম
	কর্ব্বরি-গৌরব-রবি[৩]	৬ষ্ঠ
৩২৭	কি বলে বুঝাব তারে ? বুঝিতে না পারি !	১ম
	কি কয়ে বুঝাব তারে ? বুঝিতে না পারি !	২য়
	কি কয়ে বুঝাব তারে ? হায় রে, কি কয়ে ?	৩য়-৬ষ্ঠ

১ ৯৩. পঙ্‌ক্তির এই অংশটুকু তৃতীয় সংস্করণের নব সংযোজন।

২ এই পঙ্‌ক্তিটি দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত। দীননাথ সান্যাল প্রসঙ্গক্রমে মন্তব্য করেছেন যে এই পঙ্‌ক্তিটির অভাবে পরবর্তী পঙ্‌ক্তির 'পতাকাচয়' অর্থহীন (অর্থাৎ কিসের পতাকাচয়) হয়ে পড়েছে।

৩ সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠ রক্ষিত হয়েছে।

৩

মেঘনাদবধ কাব্যের এই পাঠান্তরগুলির দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে, মধুসূদন মূলত প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণেই মূল কাব্যের সংস্কার করেন। সম্ভবত, প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণেও বহুল পরিবর্তন করা হয়, অন্তত দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণের পাঠান্তরের দিকে তাকালে তাই মনে হয়। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণের পাঠান্তর খুব বেশি নেই, মূলত বিরাম-চিহ্নের, ক্বচিৎ শব্দগত। ষষ্ঠ সংস্করণের পাঠই পরবর্তীকালে গৃহীত হয়ে এসেছে।

এই পাঠান্তরগুলির পর্যালোচনা বা প্রকৃতি-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় এগুলির সংখ্যা। সর্গ অনুসারে পঙ্‌ক্তির পাঠান্তরের সংখ্যা এইরকম :

প্রথম সর্গ	:	১১৫	ষষ্ঠ সর্গ	:	৪৩
দ্বিতীয় সর্গ	:	১০২	সপ্তম সর্গ	:	৩১
তৃতীয় সর্গ	:	৩৯	অষ্টম সর্গ[১]	:	৩২
চতুর্থ সর্গ	:	৩৭	নবম সর্গ	:	৩
পঞ্চম সর্গ	:	২৪	মোট সংখ্যা	:	৪২৭

দেখা যাচ্ছে, প্রথম সর্গের পাঠান্তরের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। দ্বিতীয় সর্গ থেকে পাঠান্তরের সংখ্যা কমতে কমতে নবম সর্গে তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন। প্রথম সর্গ রচনার সময় মধুসূদনের মনে ছিল দ্বিধা, সংশয়; ভাষার উপর হয়ত তেমন দখলও ছিল না। এক কথায় ছিল যথেষ্ট আস্থার অভাব। তারই প্রভাব পড়েছে প্রথম সর্গে। আর সেইজন্যই এই সর্গটির ভাষাগত শৈথিল্য সব চেয়ে বেশি। তার পর তিনি ক্রমশ সেই দ্বিধা, সংকোচ কাটিয়ে উঠে উপযুক্ত আস্থা ফিরে পেয়েছেন। ফলে শৈথিল্যও ঘুচে গেছে অনেক পরিমাণে। কাব্যটির প্রথম প্রকাশের অব্যবহিত পরে মধুসূদন নিজের কাব্যের পাঠক বা সমালোচক হিসেবে যখন তাঁর কাব্যকে দেখবার সুযোগ পেলেন, স্বভাবতই এই শৈথিল্য তাঁর চোখে পড়েছিল। যদিচ চিঠিতে তিনি 'earlier books'-এর 'metrical blemishes'-এর পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন, আসলে তা ভাষাগত। এবং পূর্বে উল্লিখিত পাঠান্তরগুলির দিকে মনোযোগী দৃষ্টিপাত করলেই এ কথার যাথার্থ্য অনুভব করা যাবে। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষাগত কোনো আলোচনাই, বস্তুত, পাঠান্তর-প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে চলতে পারে না। এবং এখানেই আলোচনার দিক থেকে পাঠান্তরগুলির তাৎপর্য ও গুরুত্ব। মধুসূদন আত্মমনস্ক কবি, তাঁর আত্মমনস্কতার পরিচয় সব চেয়ে বেশি পাওয়া যাবে এই সব পাঠান্তরে।

অতঃপর পাঠান্তরগুলির প্রকৃতি-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য :

১ বিরামচিহ্নের পরিবর্তন

২ বাক্যগঠনপ্রণালীর পরিবর্তন

৩ শব্দগত পরিবর্তন

---

১ এখানে অষ্টম সর্গের ৪৩১-৪৯৩ সংখ্যক পাঠান্তর বা সংযোজনকে একটি পাঠান্তর হিসেবে ধরা হয়েছে, যদিও এই নব সংযোজিত অংশে ৬৩টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে।

৪ শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশের পরিবর্তন

৫ পঙ্‌ক্তি বা চরণের পরিবর্তন

৬ নব সংযোজন

মধুসূদন যদিও নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা ভাষা চর্চা করবার অবকাশ পান নি, তবু, বিদ্যাসাগরের মতো সেকালে বুঝেছিলেন, গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, ভাষার নিজস্ব একটা ছন্দ আছে এবং সেটা মূলত সৃষ্টি হয় লেখকের বা কবির অনুভূতি অনুসারে। অনুভূতির গাঢ়তা, তারল্য, আবেগময়তা বা আবেগ-হীনতার সঙ্গে ভাষার একটা নিবিড় আত্মীয়তা থেকে যায়। বলা চলে, লেখকের অনুভূতি ভাষায় অনূদিত হয়েই আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং অনুভূতির প্রকাশে ভাষা যেমন একদিকে সহায়ক, অন্যদিকে তেমনি বিরামচিহ্নগুলি প্রতীক রূপে অনুভূতির আরো সূক্ষ্ম দায়িত্ব বহন করে। মধুসূদন বিরামচিহ্নের এই প্রতীকধর্মিতার ও গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন, ছিলেন বলেই দেখতে পাচ্ছি তিনি মেঘনাদবধ কাব্যে এ বিষয়ে যে কোনো বৈয়াকরণের বা ভাষাবিদের চেয়ে বেশি মনোযোগী।

ধরা যাক্‌, হাইফেন বা সংযোজক-চিহ্নের কথা। তিনি দুটি শব্দকে সমাসবদ্ধ বা সন্ধি-যুক্ত করবার সুযোগ না পেয়ে প্রায়শই এই চিহ্নটি ব্যবহার করেছেন। যেমন, চরণ-অরবিন্দ, স্ফটিক-গঠিত, দস্যুবৃত্তি-রত, সুচন্দন-বৃক্ষশোভা, রাক্ষস-ঈশ্বর, স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে, অঙ্গুলি-পরশে, নক্ষত্র-মণ্ডল ইত্যাদি।

এগুলির বেশির ভাগ প্রথম সংস্করণের দৃষ্টান্ত, পরের সংস্করণে তিনি যতদূর সম্ভব এই চিহ্ন বর্জন করে শব্দগুলি একত্র গেঁথে যুগ্ম শব্দে পরিণত করেছেন। যেখানে সন্ধির সুযোগ আছে, অথবা বিভক্তিযোগে শব্দকে সুষমা দেবার সুযোগ আছে, সেখানেই অবশ্য তিনি এই চিহ্ন বর্জন করেছেন। যেমন :

চরণ অরবিন্দ > চরণারবিন্দ

স্ফটিক গঠিত > স্ফটিকে গঠিত

মাধব উরসে > মাধবের বুকে। ইত্যাদি।

এছাড়া, তিনি অন্যান্য বিরাম-চিহ্নের ব্যবহারেও যথেষ্ট সতর্ক। প্রথম সংস্করণের পরবর্তী সংস্করণে এই ধরনের পরিবর্তন প্রায়শই চোখে পড়ে :

ছত্রধর, (১ম/১ম/২১) > ছত্রধর ; (১ম/২য়) ; হায় ; মা, (১ম/১ম, ২য়/২৩) > হায়, মা, (১ম/৩য়) ; ত্রিভুবনে ! (৬ষ্ঠ/১ম, ২য়/৭১) > ত্রিভুবনে ? (৬ষ্ঠ/৩য়), ইত্যাদি।

সমগ্র কাব্য জুড়ে বিরাম-চিহ্নের বহুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন সংস্করণে। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্তনগুলি অর্থবোধের ক্ষেত্রে বা বাক্যগঠনের সুষমার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে।

'এ' বিভক্তি যোগে, সম্ভবত, ব্যাকরণ-শুদ্ধির দিকে প্রবণতা :

বসন ; (১/১ম/৬৪) > বসনে,

বৃক্ষ, (১/১ম/৯৩) > বৃক্ষে,

ভুজগ (১/১ম/১০২) > ভুজগে

বিবিধ ভূষণ (২/১ম/২৮৯) > বিবিধ ভূষণে

বিভীষণ (৩/১ম/১৫৪) > বিভীষণে

সে রণ ? (৪/১ম, ২য়/৪৩৩) > সে রণে ?

সিংহাসনে মহামায়া (৫/১ম/৩৩৬) > সিংহাসনে মহামায়ে (৫/২য়)

দেবকুলোদ্ভব (৬/১ম/৪৫০) > দেবকুলোদ্ভবে

ভাগ্যহীন ভৃত্য (৭/১ম/১৪৮) >ভাগ্যহীন ভৃত্যে

ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, অনেক ক্ষেত্রে বিভক্তি যোগ না করলেও চলত। ব্যাকরণগত শুদ্ধির দিকে মধুসূদনের সতর্কতার এমনি আরো বিচিত্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। সপ্তম সর্গের ৪৫৬-সংখ্যক পঙ্‌ক্তির 'ভয়াকুলা' বিশেষণটি 'জননী'র সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে শব্দটি ছিল 'ভয়াকুল'। প্রথম সংস্করণে কোথাও কোথাও সংস্কৃতের অনুসরণে বিসর্গ ব্যবহৃত হয়েছিল, পরে তা বর্জিত হয়েছে। যেমন, রক্তস্রোতঃ। (১/১ম, ২য়/২৪৯) > রক্তস্রোতে! পূর্ণচ্ছেদের পরিবর্তে বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহারের পরিবর্তনও লক্ষণীয়। অবশ্য, কোথাও কোথাও আবার বিসর্গ রক্ষিত হয়েছে, যেমন, দ্বিতীয় সর্গের ৪২১ -সংখ্যক পঙ্‌ক্তির 'ধনুঃ' শব্দটি। প্রথম সংস্করণে কতকগুলি শব্দ বিসর্গহীন ছিল, পরে সেগুলি বিসর্গযুক্ত হয়েছে। যেমন, তেজ, শির, মন, অহরহ, নভ, বক্ষ, চক্ষু প্রভৃতি। তবে, যতদূর সম্ভব, সংস্কৃতের অনুশাসন থেকে তিনি তাঁর কাব্যের ভাষাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। পঞ্চম সর্গের ২০৯-সংখ্যক পঙ্‌ক্তির 'রজঃপ্রভা' শব্দটিকে সম্ভবত এই কারণেই পরিবর্তিত করে 'রজোরেখা' করা হয়েছে। এইভাবে মধুসূদন, মূল পাঠের বহুল পরিবর্তন করেছেন, মূলত ব্যাকরণ-শুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে।

মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠান্তরের আলোচনায় বিরাম-চিহ্ন পরিবর্তনের বা ব্যাকরণ-শুদ্ধির পরিবর্তনের ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে বাক্যবিন্যাসের বা বাক্যগঠন প্রণালীর পরিবর্তনও উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে :

ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চবধূ বিঁধিলা নিষাদ, (১/৭ম/১৪)

ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা, (১/২য়/১৪)

ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা, (১/৪র্থ/১৪)

এখানে বাক্যবিন্যাসের পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে পঙ্‌ক্তিটিকে উত্তরোত্তর সুগঠিত পরিণতি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠান্তরে বা পরিবর্তিত পাঠে একটি অক্ষর কম রয়েছে, বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তৃতীয় রূপান্তরে পঙ্‌ক্তিটির অর্থগত অস্পষ্টতা দূর হয়েছে, ছন্দের সুষমাও এসেছে। বস্তুত, পাঠান্তরের বহুলাংশ এই বাক্যবিন্যাসগত পরিবর্তন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য বাক্যবিন্যাসের ভিতরেই নব সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

ঢুলায় চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ধরে ছত্র ছত্রধর, হর কোপানলে
না পুড়ে মদন যেন দাঁড়ান সেখানে। (১/১ম/৪৮-৫০)

সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায় ; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা!

হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সুসভাতলে ছত্রধর-রূপে! (১/২য়)

সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা!
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে! (১/৩য়)

লক্ষণীয়, প্রথম সংস্করণে বর্ণনীয় বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। দ্বিতীয় সংস্করণে দৃশ্যটিকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্য নতুন ভাবে পঙ্‌ক্তিগুলি সাজাতে হয়েছে। এই প্রয়োজনে, প্রথম সংস্করণের পঙ্‌ক্তিগুলির উপর নির্ভর করেই পঙ্‌ক্তিগুলি পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে ৪৮-সংখ্যক পঙ্‌ক্তিটির শুরু 'ঢুলায়' ক্রিয়াপদ দিয়ে এবং এটি বস্তুত একটি চরণ। কিন্তু বর্ণনামূলক পঙ্‌ক্তি হিসেবে কারুকার্যহীন। দ্বিতীয় সংস্করণে 'চামরে'র বিশেষণ রূপে 'সুচারু' শব্দটি প্রযুক্ত হওয়ায় পঙ্‌ক্তিটির/চরণটির বিস্তার ঘটেছে এবং পরবর্তী 'মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি'-এর পরিপূরক পঙ্‌ক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় বর্ণনাটি পূর্ণতর রূপ নিয়েছে। এবং পরের পঙ্‌ক্তিগুলিতে বর্ণনাটি সম্পূর্ণতা পেয়েছে।

অবশ্য, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই, শব্দগত পরিবর্তনই মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠান্তরের মুখ্য উপাদান। বাহ্যত ৪২৮টি পঙ্‌ক্তির পাঠান্তর হলেও, তার অন্তর্গত শব্দগত পরিবর্তনের সংখ্যা বিপুল। যথাস্থানে সেগুলি উল্লিখিত। এই পাঠান্তর বা পরিবর্তন ঘটেছে কখনো একটি শব্দের ক্ষেত্রে, কখনো শব্দগুচ্ছে, কখনো আবার পঙ্‌ক্তি এমন-কি, স্তবকের ক্ষেত্রে। শব্দগত পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত:

বসুধা (১/১ম/৯)>ধরারে (১/৪র্থ)
স্বয়ম্বর গেহে (১/১ম/৪৩)>ব্রতালয়ে (১/৪র্থ)
সভাজন কাঁদিল সকলে, (১/১ম/১৭১)>সভাজন কাঁদিল নীরবে। (১/২য়)
গভীর নিক্কনে। (১/১ম/৫৬২)>গম্ভীর নিক্কনে। (১/২য়)
রাক্ষস-ঈশ্বর (১/১ম/৬৬৫)>রাক্ষসাধিপতি (১/২য়)
নিকষা-নন্দন; (১/১ম/৭৩৬)>স্বর্ণলঙ্কাপতি; (১/২য়)
আইলা তারা-কুন্তলা (২/১ম/৬)>আইলা সুচারু তারা (২/২য়)
জিজ্ঞাসিও, অদিতি-নন্দন (২/১ম/১০১)>জিজ্ঞাসিও বিজ্ঞ জটাধরে! (২/৪র্থ)
গেলা নীচগামী (২/১ম/১০৬)>গেলা অধোদেশে (২/৪র্থ)
শুনিয়া পতির বাণী (২/১ম/১১৫)>শুনি প্রণয়ীর বাণী (২/৪র্থ)
হায়রে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী (২/১ম/২৭৫)>সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী (২/৪র্থ)
মৈথেলী (৪/১ম/৯২)> মৈথিলী (৪/২য়)
এ অররুপুরে (৬/১ম/১৫৬)>এ রাক্ষসপুরে (৬/৩য়)
চুরিলি রাক্ষসরত্ন (১/৭ম/৭২০)>হরিলি রাক্ষসরত্ন (৭/২য়)

হে ধন্বি, (৮/১ম/৩৪৫)>হে রথি, (৮/৩য়)
কর্ম্মদোষে ! (৮/১ম/৩৬৭)>ভাগ্য-দোষে ! (৮/২য়)
কিন্তু কোথা ধর্ম্মরাজ ? (৮/১ম/৪৯৭)>কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি ? (৮/৩য়)
সহস্র বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি (৮/১ম/৫০২)>দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি (৮/৩য়)
কি বলে বুঝাব তারে ? (৯/১ম/৩৯৭)>কি করে বুঝাব তারে ? (৯/৩য়)

মেঘনাদবধ কাব্যের শব্দগত পাঠান্তরের কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু এর ভিতর দিয়ে মধুসূদনের শব্দচেতনার একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রথমেই বলা দরকার শব্দগত পাঠান্তরের বিশ্লেষণের আগে, ৭-সংখ্যক দৃষ্টান্তের অন্তর্গত পঙ্‌ক্তিটির শাব্দিক পরিবর্তনের ফলে পঙ্‌ক্তিটির 'music' কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, কবি তা নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন।

বস্তুত, মধুসূদন যাকে বলেছেন 'improve the music of the line', সেই সংগীতময়তার বা ধ্বনিঝংকারের দিকে লক্ষ্য রেখেই শাব্দিক পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে পাঠান্তরগুলির এইটেই মূল কথা। অর্থাৎ মেঘনাদবধ কাব্যে যা কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে বা সংস্কার করা হয়েছে— শব্দের, শব্দগুচ্ছের, পঙ্‌ক্তির অথবা স্তবকের, সংগীতময়তা বা ধ্বনিঝংকার সৃষ্টিই তার মৌল উদ্দেশ্য।

এই সংগীতময়তা বা ধ্বনিঝংকার, শব্দের অথবা পঙ্‌ক্তির/চরণের, সুষম অক্ষর-বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। অক্ষরের সামান্যতম বিচ্যুতির ফলে যেমন শব্দের সুষমা নষ্ট হয়, তেমনি সুমিত বিন্যাসের ভিতর দিয়ে শব্দ হয়ে ওঠে প্রাণময়, সংগীতময়। এবং এই সুমিত অক্ষর-বিন্যাসের উপরেই ছন্দের প্রতিষ্ঠা। অক্ষরের অন্তর্নিহিত ধ্বনির উত্থান-পতন, গুরুত্ব-লঘুত্ব, সংগীতময়তা— এ-সবই আসলে ধ্বনিগত। সুতরাং কবিকে শেষপর্যন্ত অক্ষরের বা অক্ষরের অন্তর্নিহিত ধ্বনি-ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন হতে হয়।

কবিতার ভাষার এই মৌল প্রকৃতির কথা মধুসূদন জানতেন। জানতেন বলেই, মূলত এদিকে লক্ষ্য রেখেই শব্দগত পরিবর্তন করেছেন। ধরা যাক্ প্রথম দৃষ্টান্তটির কথা : 'বন্দি ও চরণ-অরবিন্দ মন্দমতি'। এখানে বাহ্যত ছন্দের ত্রুটি নেই, পয়ারের কাঠামোয় ৮+৬ মাত্রার বিন্যাসেও ব্যতিক্রম ঘটে নি। কিন্তু 'ও চরণ-অরবিন্দ' অংশটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলি সুপ্রযুক্ত নয়। অন্তত ধ্বনিগত দিক থেকে। তাই পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছে। পরিবর্তিত রূপ : 'বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দমতি'। একদিকে যেমন দুটি শব্দের সন্ধি করে 'চরণারবিন্দ' শব্দটিকে সুষম করা হল, অন্যদিকে তেমনি 'অতি' শব্দটির বিশেষণের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করে কবি-স্বভাবেরও পরিচয় পাওয়া গেল। মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের দ্বৈতরূপ। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে উদ্ধত, রূঢ়। কিন্তু অন্তরে তিনি নম্র, কমনীয়। ভারতীয় কবিদের মতো তাই তিনি বাগ্‌দেবীর কাছে দীন সেবকের হৃদয় নিয়ে প্রণাম জানিয়েছেন। 'মন্দমতি' শব্দটির সঙ্গে কালিদাসের অনুসরণে, 'অতি' শব্দ-যোজনার ফলে পঙ্‌ক্তিটি পরিবর্তিত রূপে হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের প্রকাশক। এমন আরো দৃষ্টান্ত এই কাব্যের পাঠান্তরে রয়েছে। আপনি কৃতান্তদেব (৮/১ম/১০৬)> পিতা রাজা দশরথ (৮/৩য়), ধর্ম্মরাজে (৮/১ম/৩৬৮)>পিতায় (৮/৩য়), ইত্যাদি পাঠান্তরের সঙ্গে কবির বিশেষ একটি মানসিকতা বিজড়িত।

ব্যাকরণ-শুদ্ধির জন্য বিভক্তি-যোগে শব্দান্তরের দৃষ্টান্ত আগে দিয়েছি। কিন্তু যেখানে নিছক বিভক্তি-

যোগে ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ নেই, সেখানে তিনি মূল শব্দটি বদলে দিয়েছেন। প্রথম সর্গের অষ্টম দৃষ্টান্তের 'বসুধা' শব্দটি এই ধরনের পরিবর্তন। প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত শব্দটি ব্যাকরণের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু শব্দটিকে বিভক্তি-যোগে ত্রুটিমুক্ত করতে গেলে এক মাত্রা বেড়ে যায়। তাতে ছন্দপতন ঘটে। সুতরাং, মূল অর্থ বজায় রেখে শব্দটিকে রূপান্তরিত করা হল : 'ধরারে'। প্রথম সর্গের ১৭১ -সংখ্যক পঙ্‌ক্তির সভাজন শব্দটি সমষ্টিবাচক ; তাই পুনরুক্তিজনিত শৈথিল্য দূর করে 'সকলে'র পরিবর্তে ব্যবহৃত হল 'নীরবে', যা পঙ্‌ক্তির বাচ্যার্থ নিবিড়ভাবে বাড়িয়েছে। এই কাব্যের বিভিন্ন সর্গে প্রথম সংস্করণে প্রায়শই 'গভীর' শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখি। যেমন, গভীর নিকনে (১/১ম/৫৬২), কহিলা গভীরে (১/১ম/৬৮৩), কহিলা গভীরে (৩/১ম/২২৩), কহিলা গভীরে (৭/১ম/৫৭৬), ইত্যাদি। শব্দটির রূপান্তর 'গম্ভীর'। শুধু অর্থের দিক থেকেই নয়, ধ্বনির দিক থেকেও এই পরিবর্তন যে কতখানি সার্থক আশা করি তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

সিসেরো বলেছেন, কবি-ব্যবহৃত শব্দগুলি সচেতন ভাবে আসে। শুধু যে সচেতন ভাবে আসে তা'ই নয়, তার সঙ্গে কবির মানসিকতাও যুক্ত হয়। শব্দব্যবহারের সঙ্গে কবির মানসিকতার যে কী নিবিড় যোগ রয়েছে, তার উদাহরণ : তবে নিকষা নন্দন (১/১ম/৭৪১)>তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি। ঐশ্বর্যের প্রতি মধুসূদনের ছিল ঐকান্তিক আকর্ষণ ও মোহ। রাবণের প্রতি তাঁর অনুরাগের অন্যতম কারণ তাঁর অমিত ঐশ্বর্য ; রাবণ যে স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর। মধুসূদন নিজে এই স্বর্ণ-মৃগের পিছনে ছুটেছেন সারাজীবন। তাঁর অবচেতন মনে নিহিত ছিল এই স্বর্ণস্বপ্ন, ঐশ্বর্যের বাসনা। এই বাসনাই তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। তারই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে ৭৪১-সংখ্যক পঙ্‌ক্তির পাঠান্তরে। ২/১ম/৬৬৫-সংখ্যক পঙ্‌ক্তির ক্ষেত্রেও এ মন্তব্য প্রযোজ্য।

সাহিত্যদর্পণের সপ্তম পরিচ্ছেদে রসের অপকর্ষের আলোচনা প্রসঙ্গে শব্দগত দুঃশ্রবতা, অশ্লীলতা, অনুচিতার্থতা, অপ্রযুক্ততা, গ্রাম্যতা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। সাহিত্যদর্পণের এই বিধি অনুসরণ ক'রে হয়ত নয়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, শব্দ ব্যবহারের এই আদর্শ পরোক্ষভাবে মধুসূদনের মধ্যে এসে গেছে। যেমন, 'গেলা নীচগামী,' (২/১ম/১০৬)>'গেলা অধোদেশে।' (২/৪র্থ/১০৬) : এই দৃষ্টান্তটির কথা ধরা যাক্। অনেক সমালোচক একদা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুসরণে তাঁর ভাষার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়নে অতদূর পিছিয়ে যাবার দরকার নেই, কেননা, এ যুগের কবিরা শাস্ত্র সাক্ষী রেখে লিখতে বসেন নি, অন্তত মধুসূদন নন। সেক্ষেত্রে তাঁর রুচি, কাব্যবোধই শব্দব্যবহারে সাহায্য করেছে। মধুসূদন নিশ্চিতভাবে জানতেন মহাকাব্যের 'Grand Style' বা 'Heroic Style' সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত ভাষা বা শব্দসমবায় প্রয়োজন। এই বোধ কোনো মুহূর্তের জন্যই তিনি হারান নি। 'নীচগামী'র পরিবর্তে 'অধোদেশে'র ব্যবহার তার মূর্ত উদাহরণ। কথ্য ভাষায় বলা হয় 'নীচে গেল'। কিন্তু 'নীচ' ও 'নীচে' সমার্থক নয়। তা ছাড়া, নীচগামী শব্দটি অস্পষ্টও বটে। এমসন্-কথিত ambiguity বা অস্পষ্টতার দৃষ্টান্ত হিসেবে এই শব্দটিকে দাঁড় করানো যায়। 'কেশব বাসনা দেবী গেলা নীচগামী>কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে : এই পাঠান্তর মধুসূদনের শব্দসচেতনতার উজ্জ্বল পরিচায়ক। 'চুরিলি রাক্ষসরত্ন' থেকে 'হরিলি রাক্ষসরত্ন' পরিবর্তনও এমনি তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় সর্গের ২৯৪-সংখ্যক পঙ্‌ক্তিতে ব্যবহৃত 'শশীমুখী'র বদলে 'চারুনেত্রা' শব্দটি ব্যবহৃত। বঙ্গে

দিতে হবে না, কীভাবে কবির দৃষ্টি মুখের সমগ্র অংশ থেকে বিশেষ এক অংশের সৌন্দর্যে মগ্ন হতে চেয়েছে পাঠান্তরে। এমন দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখেছি মাঝে মাঝে। যেমন, আপাতত মনে পড়ছে সোনার তরী কাব্যের মানস সুন্দরী কবিতার শিরীষকেশরসম>শিরীষ কুসুমসম পাঠান্তরটির কথা। কবির দৃষ্টি কখনো সমগ্র থেকে অংশে, অথবা অংশ থেকে সমগ্রের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে থাকে। 'কর্ম্মদোষে' (৮/১ম/৩৬৭)>ভাগ্য-দোষে (৮/৩য়) : পাঠান্তরটির পিছনে অজ্ঞাতসারে কবি যেন নিজের বিড়ম্বিত জীবনের কথা ব্যক্ত করেছেন।

শব্দগত দুর্বোধ্যতার প্রশ্ন উঠেছে বারবার, মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে। সমালোচকরা যা'ই বলুন, মধুসূদন নিজে কিন্তু অহেতুকভাবে অপ্রচলিত শব্দব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। যেমন, প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত 'অররুপুরে' শব্দটি পরবর্তী সংস্করণে সর্বত্র 'রাক্ষসপুরে' করা হয়েছে। এমন আরো দৃষ্টান্ত আছে।

অষ্টম সর্গের ৫০২-সংখ্যক পঙ্‌ক্তির 'সহস্র বৎসর' থেকে 'দ্বাদশ বৎসর'-এ পরিবর্তনের পিছনে কী কারণ নিহিত, তা ব্যাখ্যা না করলেও চলে। শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রে মধুসূদন ছিলেন এমনি সতর্ক প্রহরী। ৫৪৪-সংখ্যক পঙ্‌ক্তিটির 'এ দক্ষিণ দ্বারে! (৮/১ম, ২য়/৫৪৪)>এ উত্তর দ্বারে! (৮/৩য়) : এই পাঠান্তর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালিদাসের কুমারসম্ভবে মহাদেবের অনুচরদের উত্তর দিকের দ্বার-রক্ষার কথা বর্ণিত। এই পাঠান্তরটির পিছনে সম্ভবত এই ধরনের কোনো প্রভাব রয়েছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠান্তরের/শব্দগত পরিবর্তনের আর-একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য : 'সু' উপসর্গ যোগে শব্দগঠনের দিকে ঝোঁক। যেমন :

বিষবৃক্ষ চন্দনবৃক্ষের শোভা ধরে (১/১ম/২২)
সুচন্দন বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে (১/২য়/২২)

অথবা,

ঢুলায় চামর চারুলোচনা কিঙ্করী (১/১ম/৪৮)
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী (১/২য়/৪৮)

অন্যান্য দৃষ্টান্ত :

. আইলেন সমীরণ (২/১ম/২০)>আইলা সুসমীরণ (২/২য়)
সিন্দূরে আঁকিয়া (২/১ম/২৩৬)>সুসিন্দূরে আঁকি (২/২য়)

এই ধরনের 'সু' উপসর্গযোগে শব্দ তৈরির দিকে মধুসূদনের আত্যন্তিক ঝোঁক রয়েছে, আরো অনেক ক্ষেত্রে।

কাব্য-ভাষার পরিবর্তনে কবির দৃষ্টি কখনো নিবদ্ধ থাকে শব্দ-বিন্দুতে, কখনো আবার সমগ্রতায়। সমগ্র একটি পঙ্‌ক্তিতে বা পঙ্‌ক্তি-সমষ্টিতে। দুয়ের অন্বিষ্ট একই : ভাষার সংস্কার। মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠান্তর ঘটেছে দুদিক থেকেই। শাব্দিক পাঠান্তর যেমন মধুসূদনের শব্দসচেতনতার পরিচায়ক, পঙ্‌ক্তিগত পাঠান্তর তেমনি ভাষাশিল্পী হিসেবে তাঁর পরিচয় বহন করছে।

পঙ্‌ক্তির পরিবর্তন মেঘনাদবধ কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরিবর্জন চোখে পড়ে :

ভয়ঙ্কর। রাজাদেশে সাজিল রাক্ষস (১/১ম/৪৪৩)
রোধিল শ্রবণপথ মহা কোলাহলে (১/২য়/৪৪৩)

অথবা,

কামাকুল, চাহিয়া রহিল তাঁর পানে ! (২/১ম/৩৫১)
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে। (২/২য়/৩৫১)

ইত্যাদি।

অনেক ক্ষেত্রে ভাবগত শৈথিল্য দূর করার জন্য পাঠান্তর ঘটেছে :

উরসে, কামের বাসা, ভালে তারা গাঁথা
সিঁথি ; কর্ণে কুণ্ডল ; অলকে মণি-আভা (৩য়/১ম, ২য়/৫৩৯-৪০)
উরসে ; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা-সিঁথি ;
অলকে মণির আভা, কুণ্ডল শ্রবণে। (৩য়/৪র্থ/৫৩৯-৪০)

মধুসূদনের বিরুদ্ধে একসময় অভিযোগ উঠেছিল, তিনি আদিরসাত্মক বর্ণনার ভিতর দিয়ে দেবমহিমা ক্ষুন্ন করেছেন। পরোক্ষভাবে এ অভিযোগের মূল লক্ষ্য ছিল মধুসূদনের অসংযমী চিত্তবৃত্তির প্রতি ইঙ্গিত করা। মধুসূদনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ যে কত বিভ্রান্তিকর, এই পাঠান্তর তার দৃষ্টান্ত। সর্বোপরি, কাব্যভাষার ক্ষেত্রে মধুসূদনের সংহতিবোধের পরিচয়ও এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

ভাবগত অস্পষ্টতা বা অসম্পূর্ণতা দূর করার প্রয়োজনেও অনেক সময় পাঠান্তর ঘটেছে। যেমন, পঞ্চম সর্গের প্রথম সংস্করণে ২৮৭ ও ২৮৮ -সংখ্যক পঙ্‌ক্তি দুটি ছিল এইরকম :

করি বাস ; করি পান অমৃত সতত,
অমরী, স্থিরযৌবনা ! বরিনু তোমারে

পরবর্তী, অর্থাৎ দ্বিতীয় সংস্করণে এই পঙ্‌ক্তি দুটির পাঠান্তর :

করি বাস ; করি পান অমৃত উল্লাসে ;
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে ;
উরজ-কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত ;
না শুখায় সুধারস অধর-সরসে ;—
অমরী আমরা, দেব ! বরিনু তোমারে

এই সর্গেরই ৫২২-সংখ্যক পঙ্‌ক্তিটি : "পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।" প্রথম সংস্করণে এই পঙ্‌ক্তিতেই মেঘনাদের উক্তি শেষ হয়েছে। কিন্তু, মধুসূদন দেখলেন, মেঘনাদের মাতৃভক্তির (না কি কবির নিজের !) প্রকাশে কোথায় যেন অস্পষ্টতা বা অসম্পূর্ণতা থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয় সংস্করণে তাই সংযোজিত হল : "কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে !" এই একটি পঙ্‌ক্তির সংযোজনে শুধু যে মেঘনাদের চরিত্র-মহিমা উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে তা'ই নয়, পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির সম্পূরক হিসেবে এই সংযোজন, প্রকারান্তরে পাঠান্তর, প্রথম সংস্করণের ৫২২-সংখ্যক পঙ্‌ক্তিটির পূর্ণতা এনে দিয়েছে।

বক্তব্যের পরিস্ফুটনে অপরিমিত রূপায়ণের পরিমিত বিকাশে ও ভাবের অস্পষ্টতা দূর করতে গিয়ে

তিনি সম্পূর্ণ একটি নতুন অংশ সংযোজন করেছেন, এমন দৃষ্টান্তও চোখে পড়ে। যেমন, অষ্টম সর্গের ৪৩১-সংখ্যক পঙ্‌ক্তি থেকে ৪৯৩-সংখ্যক পঙ্‌ক্তি-সমষ্টি/স্তবকটি প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল না, তৃতীয় সংস্করণের সংযোজন। বস্তুত, এই নব সংযোজিত অংশটি রামচন্দ্রের নরক-দর্শনের অর্থাৎ নরক-বর্ণনার অংশ বিশেষ যেখানে "বেশভূষাসক্তা" "বামাদলের" নরক-জীবন-যন্ত্রণার ছবি আঁকা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে এই চিত্রটি রূপায়িত হয়েছিল ৩৯৮-সংখ্যক পঙ্‌ক্তি থেকে ৪১৩-সংখ্যক পঙ্‌ক্তির মধ্যে। ৪১৩-সংখ্যক পঙ্‌ক্তিটি এই রকম: "গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে?" এই নারীদের পরিণতি দেখাতে গিয়ে ১৬টি পঙ্‌ক্তিতে যে বর্ণনা করেছেন, তা যে অস্পষ্ট থেকে গেছে, মধুসূদনের তা মনে হয়েছিল। এবং বাস্তবিকই তাই। সুতরাং এর পাঠান্তরের প্রয়োজন ঘটল এবং তারই ফলে ৪৩১-সংখ্যক পঙ্‌ক্তি থেকে ৪৯৩-সংখ্যক পঙ্‌ক্তিটির অর্থাৎ ৬৩টি পঙ্‌ক্তির আবির্ভাব ঘটল। এই নব সংযোজিত অংশটি শুধু-মাত্র পরিপূরকই নয়, অথবা শুধু যে বর্ণনীয় বিষয়কে পূর্ণতা দিয়েছে, তা'ই নয়, অংশটি তার অতিরিক্ত তাৎপর্য বহন করছে। এ শুধু নরক-যন্ত্রণা নয়, মনে হয় রামচন্দ্রের মাধ্যমে কবির অবচেতন ভাবনা-বেদনারও প্রকাশ এর মধ্যে ঘটেছে।

শেলী তাঁর A Defence of Poetry গ্রন্থে বলেছেন, কবিমনের মূল অনুভূতির অতি অল্প অংশই কবিতায় ধরা পড়ে। তাঁর বক্তব্য এই রকম: যখন কবির মনে কোনো অনুভূতির আবির্ভাব হয় এবং তার পর যখন তিনি সেই অনুভূতিকে কাব্যে রূপ দেন, তখন দেখা যায়, মূল ভাবটির অতি সামান্য অংশ তিনি কবিতায় ধরতে পেরেছেন। বলা উচিত, যা ব্যক্ত হয়েছে, তার চেয়ে অব্যক্ত থেকে গেছে অনেক বেশি। ফলে কবিরা আসল যা বলেন, তার চেয়ে না-বলেন অনেক বেশি।

শেলীর এই কথার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত নিহিত। তা হচ্ছে এই: যে কোনো কবির লিখিত কাব্যের চেয়ে অলিখিত কাব্যের মাত্রা অনেক গভীর। তাই ছোটো-বড়ো সব কবির মধ্যেই একটা চিরন্তন দ্বন্দ্ব থাকে, অতৃপ্তি ও অস্বস্তি থেকে যায়। কিন্তু, শেলী যেমন বলেছেন, কবির এই আত্মজিজ্ঞাসা শুধু ভাবগত নয়, বক্তব্য বা অনুভূতিকে রূপ দিতে গিয়ে কবির যা সবচেয়ে বড়ো সমস্যা, তা কাব্যের ভাষাগত সমস্যা। রূপকার হিসেবে অনুভূতির রূপায়ণের জন্য চাই উপযুক্ত ভাষা ও আঙ্গিক। কবিতার শিল্প, আঙ্গিক বা প্রযুক্তি: সব কিছুরই ভিত্তি ভাষা। সেইজন্য কবিতার ভাষাই কাব্যের চাবিকাঠি, যা দিয়ে কাব্যের দরজা খুলতে হয়।

বলা বাহুল্য, শিল্পে যেখানে ভাষাই হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম, সেখানে এমনিতেই তার আধিপত্য থাকে। কবির অনুভূতি ভাষায় অনূদিত হয়ে উৎসারিত হলেও, সেই ভাষা যে সবসময় স্বভাবজ হবে, এমন কোনো কথা নেই। বিশেষত, আধুনিক কালে কবিতার নির্মাণকার্যের মধ্যে একটা সচেতন প্রযত্ন লক্ষ করা যায়। তাই, লিখতে বসে প্রায়শই কবিকে উপযুক্ত ভাষা ও ভঙ্গি নির্বাচন করতে হয়। অনুভূতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কবি যখন ভাষা নির্বাচন করতে বসেন, তখন তাঁর মানসিক অবস্থার কথা সহজেই অনুমেয়। অনুভূতি-প্রবাহের সঙ্গে সমতা রেখে ভাষাপ্রবাহ যখন লিখিত রূপে উৎসারিত হয়, তখন অনেক কিছু অনুচ্চারিত থেকে যায়।

এবং এই কারণেই, কবি তাঁর নিজের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করেন। অপুষ্ট ভাব, অপরিণত শিথিল ভাষা বাক্য ও শব্দব্যবহার, এমন-কি, প্রকাশভঙ্গির দুর্বলতা তাঁর চোখে পড়ে। পড়বেই, কেননা কবিতাসৃষ্টির ইতিবৃত্ত কবির কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। তখন, কবিতারচনার পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর কাজ হয় কাব্যের সংস্কার করা, সর্বতোভাবে এই-সব ত্রুটি দূর করা। এইরকম একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থেকেই

সৃষ্টি হয় পাঠান্তর। এইজন্যই, কবিমনের স্বরূপ ও কবিতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে পাঠান্তরের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, কবিতা-হয়ে-ওঠার নেপথ্যবর্তী বিচিত্র অধ্যায়গুলি নিহিত থাকে এই-সব পাঠান্তরে।

শুধু তাই নয়, কবিতার পাঠান্তর আসলে কবির শিল্পসৃষ্টির আত্মসমালোচনা। প্রত্যেক কবির মধ্যেই একটা সহজাত সমালোচক-সত্তা থাকে। এই প্রবৃত্তির জন্যই তিনি তাঁর সৃষ্টিকে খুঁটিয়ে দেখতে চান; দেখতে গিয়ে সমালোচকের মতোই তাঁর চোখে ত্রুটিগুলি ধরা পড়ে। এবং তখন, সেই-সব ত্রুটি, বলা উচিত, কবিতা-হ'য়ে-ওঠার বাধাগুলি অপসারণে যত্নবান হতে হয়। কবির এই চিত্তবৃত্তি নিরন্তর না হোক নিরলসভাবে ক্রিয়াশীল থাকে, যতক্ষণ না তাঁর সৃষ্টি প্রতিমায় পরিণত হয়। সুতরাং, পাঠান্তর বস্তুত, গভীরতর অর্থে শিল্পরূপের সমালোচনা। এদিক থেকেও পাঠান্তরের মধ্যে এক নিভৃত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

আর, যে কবি যত বড়ো, মহৎ, তাঁর দ্বন্দ্ব, সংশয়, দ্বিধা তত বেশি। দ্বিধা সংশয় যত বাড়ে, তত বেশি তিনি অস্থিরতা বোধ করেন। যত বেশি অস্থির হন, তত বেশি ঘনিষ্ঠভাবে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে নেড়ে চেড়ে ঘষে মেজে শিল্পরূপের শিখরে পৌছতে ইচ্ছে করেন। ফলে সংস্কার বা পরিবর্তন চলে রূপ থেকে রূপান্তরে, এক সংস্করণ থেকে অন্য সংস্করণে, মূল পাঠ থেকে পাঠান্তরে: কাব্য-হয়ে-ওঠার দিকে। বলা বাহুল্য, এটা আদৌ কোনো বাহ্যিক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, এর সঙ্গে জড়িত থাকে একটা মানসিকতা, যাকে বলা যায় স্বর্ণকারী চিত্তবৃত্তি। তাই, কবি ও কাব্যকে জানার পক্ষে পাঠান্তর অন্যতম অপরিহার্য উপাদান।

বস্তুত, মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠান্তর এই-সব কারণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, এর ভিতর দিয়ে তার ভাঙাগড়ার ইতিহাস একদিকে যেমন পাওয়া যাবে, অন্যদিকে তেমনি মধুসূদনের ভাষাচর্যা, শিল্পবোধ ও তাঁর কবিসত্তার একটি অন্তরঙ্গ চিত্রও পাওয়া যায়। ভাষাশিল্পী হিসেবে তাঁর দৃষ্টি যে কী পরিমাণে আনুবীক্ষণিক, তার পরিচয় মেলে সর্বত্র; বিরামচিহ্নের পরিবর্তনে, বাক্যগঠনরীতির সংস্কারে, শব্দ ও পঙ্ক্তির পরিবর্জন ও সংযোজনে। এবং এর ভিতর দিয়ে মূল পাঠের ক্রমবিকাশের ছবিটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মেঘনাদবধ কাব্যকে যদি মধুসূদনের কাব্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা বলা যায়, তা হলে কবি হিসেবে তাঁর ভাষাশিল্পেরও পরিণত নিদর্শন এই কাব্য। কিন্তু, কিভাবে মধুসূদন সেই পরিণতিতে পৌচেছেন, এই পাঠান্তরগুলি তার নীরব সাক্ষী।

কিন্তু, পাঠান্তরের বিবর্তনের ভিতর দিয়ে কাব্যটি শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ সংস্করণে যে রূপ নিয়েছে, শিল্পের বিচারে তা কতখানি সার্থক, এমন একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক এইজন্য, পাঠান্তরের লক্ষ্য সার্থক শিল্পসৃষ্টি। অন্তত নিজের দিক থেকে কবি যতক্ষণ এ বিষয়ে তৃপ্ত না হতে পারছেন, ততক্ষণ ভাঙাগড়ার কাজ চলে। শেষপর্যন্ত অবশ্য একজায়গায় থামতে হয়। ধরা যেতে পারে, সেইটেই চূড়ান্ত রূপ। সেই চূড়ান্ত রূপের মূল্যায়ণে সমালোচক যা'ই বলুন না কেন, শিল্পবিচারে তা যেভাবেই প্রতিভাত হোক না কেন, কবির দিক থেকে সেইটেই সার্থক শিল্পরূপায়ণ।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পরে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকালে কবি য়ুরোপ যাবার জন্য ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি কাব্যটির সংস্কারে মনোযোগী হয়েছেন। মনোযোগী, কিন্তু দ্রুত ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে। তবু যেভাবে তিনি পরিবর্তন করেছেন, তাতে শব্দ ও পঙ্ক্তিগত শিথিলতা দূর হয়েছে অনেক পরিমাণে, শিথিল

বাক্যবন্ধও সংহতি পেয়েছে। তৃতীয় সংস্করণে আরো পরিবর্তন করা হয়েছে, য়ুরোপ থেকে ফিরে। তবে, এই সংস্করণের পরিবর্তন মূলত পঙ্‌ক্তিবিন্যাস ও নব সংযোজনের। এই পরিবর্তন কাব্যটির ভাষা আরো সুমিত করেছে। চতুর্থ সংস্করণেও সংস্কারের চিহ্ন চোখে পড়ে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণ দুটি মোটামুটি চতুর্থ সংস্করণেরই অনুরূপ। এ দুটি সংস্করণে বিরামচিহ্ন ও শব্দের সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম সর্গের অনুপাতে পরবর্তী সর্গগুলির পাঠান্তর ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে এই ভাবে। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত কবি ভাষাগত শৈথিল্য কাটিয়ে উঠেছেন বহুল পরিমাণে। এইভাবে কাব্যটিকে মধুসূদন একটি সার্থক শিল্পরূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার, মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠান্তর মূলত বাক্‌শৈলীর, আঙ্গিকের নয়। অর্থাৎ পাঠান্তরের ভিতর দিয়ে মধুসূদন বাক্‌শৈলীর পরিবর্তন করেছেন, আঙ্গিকের পরিবর্তন তাঁর অন্বিষ্ট ছিল না। রবীন্দ্রকাব্যের পাঠান্তর বাক্‌শৈলী ছাড়াও আঙ্গিকের পরিবর্তন, অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু মধুসূদনের এই কাব্যের পাঠান্তর সর্বতোভাবে বাক্‌শৈলীর। বস্তুত, বাক্‌শৈলীর পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই তিনি তাঁর কাব্যকে একটা সার্থক শিল্পরূপ দিয়েছেন।

এবং এমন যে হয়েছে, মধুসূদনের পক্ষে শেষপর্যন্ত এমন একটি সুমিত শিল্পায়নে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে, ভাবতে গেলে তা বিস্ময়কর ব্যাপার। বিস্ময়কর, কেননা, সত্যের খাতিরে মেনে নেওয়া ভালো, মধুসূদনের পক্ষে বাংলায় কবিতারচনার ব্যাপারটি স্বাভাবিক নয়, নিদেনপক্ষে এমন একটি মহাকাব্য তো নয়ই। কারণ, বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য তাঁর অনায়াত্ত ছিল, সমকালের কাব্যজগতেও তিনি ছিলেন অপরিচিত পথিক। তথাপি তাঁকে লিখতে হল এমন একটি মহাকাব্য। শুধু লিখেই নিরস্ত হলেন না, নিরন্তর নিরলস অধ্যবসায়ে নিজের সৃষ্টিকে সার্থক শিল্পরূপায়ণের কাজে নিমগ্ন থাকতে হল। এটা যে আদৌ সম্ভব হয়েছে, পাঠ থেকে পাঠান্তরে পৌঁচেছেন, তার পিছনে একটিই কারণ নিহিত: সদা সতর্ক শ্রবণেন্দ্রিয়। এই শ্রবণেন্দ্রিয়ই ধ্বনিতরঙ্গের জাদুকরী মায়ায় তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে শব্দ থেকে শব্দান্তরে, রূপ থেকে রূপান্তরে, পাঠ থেকে পাঠান্তরে। ধ্বনিতরঙ্গই শব্দের প্রধান সত্তা। মধুসূদন এই সত্তার সন্ধান পেয়েছিলেন শেষপর্যন্ত। বস্তুত, এক অনুপম ধ্বনিবোধের উপর সমগ্র কাব্যটি দাঁড়িয়ে আছে।

প্রবন্ধের পাঠভেদ-তালিকায় উল্লিখিত ১ম সংস্করণে প্রথম সর্গের পঙ্‌ক্তি ২৬১ শস্য স্থানে 'শস্প', ১ম-৬ষ্ঠ সংস্করণে অষ্টম সর্গের পঙ্‌ক্তি ৫৫৫ কনক স্থানে 'কণক' ও ১ম সংস্করণে নবম সর্গের পঙ্‌ক্তি ৭০ কহিল স্থানে 'বহিল' এগুলি পাঠান্তর না হয়ে মুদ্রাকর প্রমাদও হতে পারে। —সম্পাদক

রবীন্দ্ররচনার বিবর্তন

পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনা

কানাই সামন্ত

বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে আর অধুনাপ্রচারিত রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন সংস্করণে তথা সঞ্চয়িতায় বিশেষ উল্লেখ এবং/অথবা উদাহরণ-যোগে, রবীন্দ্ররচনার বিশেষতঃ কবিতা-গানের নানা বিবর্তন সম্পর্কে নানারূপ আলোচনা ইতঃপূর্বে মুদ্রিত। পূর্বপ্রচারিত রচনার আধারে এরূপ আলোচনা হইতে পারে আর হইয়াছেও দীর্ঘকাল কিন্তু পাণ্ডুলিপির সাহায্যে বা তুলনামূলক নিরীক্ষায় ইহার প্রকার, প্রসার, গভীরতা ও তাৎপর্য বহুগুণে বাড়িয়া যায় সন্দেহ নাই। বিশ্বভারতী প্রণালীবদ্ধভাবে এ কাজের সূত্রপাত করিয়াছেন; তাহার ফলে— পুষ্পাঞ্জলি, নলিনী, শিশু, খেয়া ও পূরবীর সবিশেষ পরিচয় কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশ্বভারতী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত।[১] বর্তমানে নানা পাণ্ডুলিপির আধারে কেবল একটি রচনা (কবিতা) সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংকলন করা যাইতেছে; পরিণামে ঐ এক রচনা হইতেই রবীন্দ্রনাথের দুইটি কাব্যে ভিন্ন দুইটি কবিতার উদ্ভব।[২]

ছড়ার ছবি কাব্যে : 'খেলা'

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনসংগ্রহে ছড়ার ছবি কাব্যের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় ৬ দফায়; তন্মধ্যে ৫ দফা হইল মূল পাণ্ডুলিপি (রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পুনঃপুনঃ লিখিত/রূপান্তরিত) আর ষষ্ঠ মুখ্যতঃ শ্রীসুধীরচন্দ্র কর-কৃত প্রেস-কপি: তাহাতে কবির নানাবিধ সংশোধন-সম্পাদন যেমন আছে তেমনি 'যোগীনদা' কবিতার শেষাংশ তাহা ছাড়া তিনটি কবিতা আদ্যন্ত ('আতার বিচি' 'বুধু' 'মাধো') কবি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

উপস্থিত ছড়ার ছবির একটি মাত্র কবিতার নানা বিস্ময়কর পরিবর্তন বা ক্রমিক বিবর্তন দেখানো যাইতেছে; ইহার আধার হইল— পাণ্ডুলিপি ১৭৮ক, ১৭৮খ, ১৭৮গ এবং পূর্বোক্ত প্রেস-কপি। ছড়ার ছবি কাব্যে এই কবিতা ২৭-সংখ্যক, ইহার শিরোনাম 'খেলা' এবং প্রথম ছত্র: এই জগতের শক্ত মনিব সয় না একটু ত্রুটি, / নবজাতক কাব্যের 'প্রবীণ' (প্রথম ছত্র: বিশ্বজগৎ যখন করে কাজ) কবিতার

---

১ ইহা ছাড়া শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'কবি ও কবিতা'র চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ক্ষণিকা কাব্যের বিস্তারিত পাণ্ডুলিপি-পরিচয়।

২ অনুরূপ বিবর্তনের অর্থাৎ এক হইতে দুই কবিতায় পরিণতির অপর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মানসী কাব্যে: 'বিরহানন্দ' ও 'ক্ষণিক মিলন' / কল্পনা কাব্যে: 'দুঃসময়' ও 'অসময়'। প্রচল সঞ্চয়িতায় যথাক্রমে 'বিরহানন্দ' ও 'দুঃসময়' কবিতা সম্পর্কে গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য। শেষোক্তের 'স্বর্গপথে' শীর্ষক-পাণ্ডুলিপিচ্ছবিও দেখিতে হইবে সঞ্চয়িতায় বা রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডে।

সহিত ইহার যে বিশেষ সম্পর্ক আছে তাহা স্পষ্ট হইবে বর্তমান পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনায়। যে স্বয়ংপূর্ণ পরিণত রূপ লইয়া 'প্রবীণ' নবজাতক কাব্যে উত্তীর্ণ তাহার আধার-পাণ্ডুলিপি অবশ্য ভিন্ন; রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে উহার অভিজ্ঞানসংখ্যা ১৫৯। 'প্রবীণ'এর পরিণত রূপ -রচনার তারিখ ঐ পাণ্ডুলিপিতে নাই, প্রথম প্রচার-কালে প্রবাসীতে (পৌষ ১৩৪৫) দেওয়া হয় নাই আর নবজাতক কাব্যেও পাওয়া যায় না। ছড়ার ছবির মূল পাণ্ডুলিপি (১৭৮ক) দেখিয়া এইমাত্র বলা যায় 'খেলা'র রচনা (প্রাথমিক রূপ) আলমোড়া শৈলাবাসে ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ তারিখে (৯ জুন ১৯৩৭) আর ১৫৯-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ১৯৩৮ সনের একখানি ডায়ারি, যে দুই পৃষ্ঠায় 'প্রবীণ' লেখা হয় তাহার শীর্ষমুদ্রিত তারিখ: ৩০-৩১ জানুয়ারি / বাংলায় ১৬-১৭ মাঘ ১৩৪৪।[১] মুদ্রিত তারিখ আর রচনার কাল এক বলা যায় না; প্রবাসী পত্রে প্রকাশ ১৩৪৫ পৌষে।

---

১ আলোচ্য পাণ্ডুলিপি-সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

১৭৮ ক॥ কাগজের মলাটে মোড়া রুল-টানা ৪৮ পাতা। সূচনায় ১ পাতা রচনারিক্ত, পরের পাতা ছিন্ন, সব শেষে ১ পাতা রচনাশূন্য; অতএব হিসাবমত ৯০ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় এবং সেই ভাবে (রচনার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত) প্রত্যেক জোড়-পৃষ্ঠার বামোর্ধ্ব কোণে বর্তমানে পেন্সিলের লেখায় বাংলা অঙ্ক বসিয়াছে। (অন্য সময়ে অন্য ইংরেজি অঙ্ক বসিলেও, পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনায় তাহা কাজে আসিবে না।) পাতার মাপ: ২০ × ১৬·৭ সেন্টিমিটার। তারের সেলাই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিতার প্রাথমিক রচনা বিজোড় পৃষ্ঠায়, প্রয়োজনমত সংযোজন সংশোধন বা পরিবর্তন আসিয়াছে জোড় পৃষ্ঠায়। রচনার স্থান কাল: আলমোড়া বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪।

১৭৮ খ॥ অবিকল ১৭৮ ক'এর অনুরূপ খাতা। সংযোজনের বা পরিবর্তনের প্রয়োজন না হইলে জোড়-পৃষ্ঠায় সাধারণতঃ লেখা হয় নাই।

পূর্ববৎ পেন্সিলে বাংলা পৃষ্ঠা বসানো হইয়াছে জোড়-পৃষ্ঠায়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৬। ১৩৪৪ বর্ষামঙ্গলের একটি গান ব্যতীত (গানটি এ খাতায় 'প্রক্ষিপ্ত' বলা যায় যদিও কবির হস্তে) অন্যান্য কবিতা-রচনার স্থান কাল: আলমোড়া/জ্যৈষ্ঠ - ৬ আষাঢ় ১৩৪৪।

ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, খাতা উল্টা ধরিয়া সব রচনা (পূর্বোক্ত গান বাদে) লেখা হইয়াছে এবং মলাটে (ছাপার হিসাবে শেষ পৃষ্ঠা) পরিকল্পিত কাব্যের দ্বিবিধ নামকরণও দেখা যায়: জলতরঙ্গ/ছন্দে ছবি। পূর্বনামটি পরে বাতিল করা হয়।

১৭৮ গ॥ কালো মলাটের বোর্ড্-বাঁধাই খাতা, দাঁড়ায় ঘি-রঙের রেক্সিন। রুল-টানা পাতার মাপ: ১৯.৮ × ১৫.৯ সে. মি.। রবীন্দ্র-রচনাধার পৃষ্ঠাগুলিতে পেন্সিলে আনুপূর্বিক অঙ্ক বসিয়াছে বামোর্ধ্ব কোণে ১ হইতে ১৩৯ অবধি। পরপৃষ্ঠা হইতে খাতার অবশিষ্টাংশ (মোট ৪২ পৃষ্ঠা) রচনারিক্ত, কেবল পুস্তানি-সংলগ্ন পৃষ্ঠার আগের পৃষ্ঠায় খানিকটা ইংরেজি লেখা 'বিধিমতে' লাঞ্ছিত বা বর্জনচিহ্নিত। হিসাব-মত এইটি খাতার প্রথম পৃষ্ঠা ছিল; কবিতা লেখা হইয়াছে খাতা উল্টাইয়া, তাহা লাল রঙে ছাপা জুড়ি-রেখা দেখিলেই বলা যায়— পাণ্ডুলিপির গ্রাহ্য কবিতাংশে উহার স্থান হইয়াছে রচনার নীচে। এ খাতায় ২টি 'ফর্মা' থাকিলেও সেলাই তারের। রচনাবলির স্থান-কাল যতদূর জানা যায়: আলমোড়া-শান্তিনিকেতন-পতিসর/বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৪৪

আলোচ্য 'খেলা' কবিতার মূলাধার পাণ্ডুলিপি হইল ১৭৮ক। পৃ ৫৩ ও ৫৫। পূর্বোক্ত পৃষ্ঠায় ১০ ছত্রে লেখা হয় প্রথম স্তবক[১] আর ১২ ছত্রে দ্বিতীয় তথা শেষ স্তবক— ইহার কেবল ৪ ছত্র '৫৩' পৃষ্ঠায় এবং অবশিষ্ট '৫৫' পৃষ্ঠায় লিখিয়া রচনাশেষে তারিখ দেওয়া হয় ৯।৬।[১৯]৩৭। সংরক্ষিত পাঠগুলির মধ্যে ইহা **প্রথম**। ১৭৮খ খাতায় (পৃ ৬১ ও ৬৩) ইহার নকল করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ যৎসামান্য পরিবর্তন করিতে থাকেন সন্দেহ নাই ; এই পাঠ **দ্বিতীয়**। অতঃপর, ৯ জুন (২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪) তারিখে অথবা পরদিন অথবা আরও পরে নিশ্চিত বলা যায় না, রবীন্দ্রনাথ প্রথম খাতার 'খেলা'-আধার প্রথম পাতায় (১৭৮ক। পৃ ৫৩) প্রথম স্তবকের সবটা (১০ ছত্র) বর্জন করিয়া সম্মুখীন '৫২' পৃষ্ঠায়

প্রেস-কপি। সব-যুক্ত আলগা ৫৩ পাতায় বা পৃষ্ঠায় (এক পিঠ সব সময়েই 'সাদা') এই পরিচ্ছন্ন রূপ ; তন্মধ্যে ৩৩ পাতার প্রত্যেকটির মাপ মোটের উপর : ৩৩.৬ × ২১ সে. মি. (১২খানি পুরু কাগজ সূক্ষ্ম-রুল-টানা। অবশিষ্ট অপেক্ষাকৃত নিরেশ কাগজে প্রকটভাবে রেখাঙ্কিত), ২০খানি ছোটো পাতার সাধারণ মাপ : ২০.২ × ১৬.১ সে. মি. (রুল-টানা/উপরে ও বামে লম্বভাবে লাল রঙের 'জুড়ি') গ্রন্থে মুদ্রিত ৩২টি কবিতার মধ্যে কেবল ২৭টির নকল আছে ; সর্বশেষ নকলে '৩২' সংখ্যাই দাগিয়া দেওয়া নীল পেন্সিলে। যে ৫টি কবিতার নকল হারাইয়াছে, সে হইল— কাঠের সিঙ্গি / পিছু-ডাকা / পিস্‌নি / ভজহরি / ভ্রমণী। সংরক্ষিত কবিতাগুলিতে নীল পেন্সিলে যে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, মুদ্রিত গ্রন্থে তাহার ওলোট-পালোট দেখা যায়।

১৫৯॥ Narayan's Diary / 1938 / লাল কাপড়ে বাঁধাই। এক-এক পৃষ্ঠায় এক-এক তারিখ। শিয়রের ছাপা অংশ বাদে অধিকাংশ পৃষ্ঠায় পরিষ্কার ১৯টি রুল টানা। পাতার বহির্মুখ দুই 'কোণ' গোল-ভাবে কাটা, পাতার মাপ : ১৬.৩ × ১০.৪ সে. মি.। মেমোরাণ্ডা ও ডায়ারি মিলাইয়া মুদ্রিত পৃষ্ঠা-সংখ্যা 1—376। তাহারও পরে ১৯৩৯ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির বাড়তি অংশে পৃষ্ঠাঙ্ক I—XXX এবং সবশেষে মেমোরাণ্ডা ও পুস্তানি মিলাইয়া আরও ১৪ পাতা বা ২৮ পৃষ্ঠা। উল্লিখিত অধিকাংশ পৃষ্ঠায়, এমন-কি আলগা ও মলাট-সংলগ্ন পুস্তানিরও ৫ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ কিছু না কিছু লিখিয়াছেন বা নোট করিয়াছেন। ডায়ারি উল্টা ধরিয়া অনেক লেখা দেখা যায় ; আমাদের আলোচ্য 'প্রবীণ' কবিতা (নবজাতক-ধৃত পাঠ) সেইভাবে লেখা '38' ও '39' পৃষ্ঠায়। এই পাণ্ডুলিপি যথার্থই খসড়া খাতা , ইহার বিষয়বৈচিত্র্য (লেখা অথবা কেবল 'নোট') বহুব্যাপক— গান, কবিতা, নৃত্যনাট্য ('শ্যামা'), প্রবন্ধভাবনা ('মহাভারত' সম্পর্কে ও ভাষা সম্পর্কে), কাহিনী ('ছেলেবেলা'র পূর্বাভাস), সবেরই আধার বা উৎস-স্বরূপ।

১ এই পৃষ্ঠায় ইহার শিয়রে আছে বর্জনচিহ্নিত আর ২ ছত্র :

আমি যেন বসে আছি কালের নৌকা পরে,
দেখচি চেয়ে যে খেলা হয় যুগে যুগান্তরে॥

ইহার সহিত 'খেলা'র সম্পর্ক নাই, পূর্বগামী পৃষ্ঠায় ('৫১' ও '৫০') সেঁজুতি কাব্যের 'পালের নৌকা' কবিতার যে দুই রূপ (যথাক্রমে লাঞ্ছিত ও পুনর্লিখিত) আছে তাহারই অঙ্গীভূত। '৫৩' পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ছত্র দুইটি ঐ কবিতায় লিখিত বা পুনর্লিখিত হইয়াছে আরও দুইবার দুইরূপে। 'পালের নৌকা' রচনার স্থান কাল : আলমোড়া, ৮।৬।৩৭।

(রচনারিক্ত ছিল) ইহার রূপান্তর/জন্মান্তর সাধনে প্রবৃত্ত হন— ছত্রগুলি রুল ধরিয়া সুনির্দিষ্ট পারম্পর্যে লেখার ইচ্ছা অথবা অবকাশ ছিল না, কেননা রুল তো ১৯টি অথচ নূতন রচনাংশের ছত্রসংখ্যা ত্রিশের কম মনে হয় না। সোজাভাবে অথবা ঈষৎ আড়ভাবে লেখা কতক কতক ছত্র লইয়া এক এক গুচ্ছ হইয়াছে, তাহাতে আরও কতকগুলি ছত্র কে কোথায় প্রবেশ বা অনুপ্রবেশ করিয়াছে বলা যায় না; ইহারও পরে '৫৩' পৃষ্ঠার দুই দিকের মার্জিনে (বামে দক্ষিণে) যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ছত্রগুলি লেখা হয় তাহার কিয়দংশ তিরস্কৃত করিয়া ঐ পৃষ্ঠার বাম দিকে এক অভিজাত পুরুষের সাচীকৃত মুখ, মাথায় জটা অথবা মুকুট, খড়্গনাসা, ওষ্ঠাধরে ও চক্ষে কৌতুক আর গাম্ভীর্য যেন এককালেই ফুটিয়া উঠিয়াছে— ইহাতে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয় অথবা আত্মপ্রতিকৃতি (কল্পরূপ) প্রকাশিত। যাহা হউক পূর্বরচিত প্রথম স্তবকের পরিবর্তে অন্যূন ৩০ ছত্রে নিবদ্ধ নূতন এই কয়েক স্তবকের সঙ্গে প্রথম পাঠের অন্তিম ১২ ছত্র যোগ করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই আলোচ্য কবিতার **তৃতীয়** পাঠ সন্দেহ নাই — ইহার নূতন রচনাংশের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার অথবা ছত্রপারম্পর্যনির্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ হইত, ১৭৮খ খাতাখানির '৬০' '৬২' ও '৬৩' পৃষ্ঠায় স্বয়ং কবি ইহার অনুলিপি না লিখিয়া দিলে। ইহাই **চতুর্থ** পাঠ। অবশ্য, কবি স্বয়ং যখন অনুলেখক, নকল করিতে করিতে নানা ছত্রে নানারূপ পরিবর্তন না হইয়া পারে না। আর-একটি কথা বলা আবশ্যক, ১৭৮খ খাতায় আলোচ্য কবিতার 'দ্বিতীয়' পাঠে কেবল প্রথম স্তবক (১০ ছত্র) কাটিয়া দিলেই একরূপ কাজ চলিত কিন্তু কবি '৬১' ও '৬৩' পৃষ্ঠায় বাকি অংশও ভালো করিয়া কাটিয়া দিয়াছেন এবং '৬০' ও '৬২' পৃষ্ঠায় নূতন রচনার নকল সমাধা হইলে তাহারই অনুবৃত্তিতে (যথাক্রমে '৬২' ও '৬৩' পৃষ্ঠার নীচের দিকে) মনোমত পরিবর্তনে পুনশ্চ লিখিয়াছেন।

পাঠপর্যালোচনার পক্ষে ১৭৮খ পাণ্ডুলিপি বিশেষ নির্ভরস্থল। কেননা ১৭৮ক পাণ্ডুলিপি -ধৃত কোনো পাঠই আদ্যন্ত পড়িবার উপায় নাই, পক্ষান্তরে ১৭৮খ -ধৃত দ্বিতীয় পাঠ একরূপ প্রথমের (১৭৮ক। পৃ ৫৩ ও ৫৫) এবং চতুর্থ অনুরূপভাবে তৃতীয়ের (১৭৮ক। পৃ ৫২-৫৩ ও ৫৫) পরিচ্ছন্ন অনুলিপি; কবি স্বয়ং অনুলেখক হওয়াতেই যাহা-কিছু আংশিক (কয়েকটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ লইয়া) পরিবর্তন এবং কালক্রমে 'দ্বিতীয়' ও 'চতুর্থ' পাঠ বলার সার্থকতা। অতএব ১৭৮খ পাণ্ডুলিপির আধারে অতঃপর লাঞ্ছিত (বর্জনচিহ্নিত) দ্বিতীয় ও গ্রাহ্য চতুর্থ পাঠ আনুপূর্বিক ভাবে সংকলন করা যাইতেছে। সংকলন হইতে স্পষ্ট দেখা যাইবে শেষোক্তের (অর্থাৎ ১৭৮ ক-ধৃত গ্রাহ্য তৃতীয় পাঠেরও) অঙ্গীভূত হইয়া আছে যেমন ছড়ার ছবি কাব্যের 'খেলা' তেমনি আর-এক কবিতার অপরিণত সত্তা, পরে যেটি পৃথগ্‌ভাবে 'প্রবীণ' নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে নবজাতক কাব্যে। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি মনে পড়ে; তফাত এই যে, এ ক্ষেত্রে মুখ্যগৌণের বিচার সহজ নয়, কেননা সে বিচার পরিমাণে নয়, গুণে। তথ্য হিসাবে এটুকুই উল্লেখ করা যায়, পরিণামে 'খেলা' ২০ ছত্রে (পাণ্ডু. ১৭৮গ) আর 'প্রবীণ' ৩০ ছত্রে (পাণ্ডু. ১৫৯) সীমিত।

পরবর্তী সংকলনে বামে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা ও ছত্র-অঙ্ক আর ডাহিনে একটি 'দাঁড়ি'র আগে পিছে যথাক্রমে 'খেলা' ও 'প্রবীণ' কবিতার ছত্রাঙ্ক নির্দেশ করা হইল— ঐ অঙ্ক বিন্দুযুক্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে, মুদ্রিত ছত্রে ও পাণ্ডু. -ধৃত ছত্রে অল্প কিম্বা অধিক পাঠভেদ আছে, কখনো বা বলা চলে ভাব ঠিক থাকিলেও ভাষার আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়াছে।—

পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ১৭৮ক / পৃ ৫৩ । রবীন্দ্রসদন সংগ্রহ

'খেলা' কবিতার পাণ্ডুলিপিচিত্র

১৭৮ খ ॥ পৃ । ছ	[ছড়ার ছবি / নবজাতক]	তুলনীয় ছত্র : খেলা : প্রবীণ
৬১ । ১	হাসির দ্বারে আগল দিয়ে বসে আছ স্থির,	।২৯.
২	বাইরে এসো, বাইরে এসো, পরম গম্ভীর।	।৩০
৩	কেবলি কি প্রবীণ তুমি, নবীন কি নও তাও,	।৩১
৪	দিনে দিনে দিনরাত্তির বুড়ো হয়েই যাও!	।৩২.
৫	এই পুরাতন আকাশতলে জগৎ জুড়ে খেলা,	
৬	তোমার বয়স কতই হবে, তারে করবে হেলা।	
৭	পাঁচশো বছর পেরিয়ে গেছে ঐ যে পিপুল গাছ	·৭।৩৩.
৮	চৈত্র মাসের তপ্ত রোদে দেখলে কি ওর নাচ ?	।৩৪.
৯	পাতায় পাতায় আবোল তাবোল, শাখায় দোলাদুলি	।৩৫
১০	ক্ষ্যাপা হাওয়ার সঙ্গে ও চায় করতে কোলাকুলি।	।৩৬.
১১	কাজ ক'রে মন অসাড় যখন, মাথা যাচ্ছে ঘুরে,	১৩।
১২	হিমালয়ের খেলা দেখতে এলেম এত দূরে।	.১৪।
১৩	এসে দেখি আগাগোড়াই ঝাপসা হয়ে আছে,	.১৫।
১৪	কাছেই আছে তবু গিরিরাজ[১] রয় না যেন কাছে।	.১৬।
৬৩।১৫	রাত্তিরে যেই বৃষ্টি হোলো দেখি সকাল বেলায়	১৭।
১৬	চাদরটা ওর উপলক্ষ্য খুলে ফেলার খেলায়।	.১৮।
১৭	ঢাকার মধ্যে চাপা ছিল কৌতুক এক রাশি	১৯।
১৮	প্রকাণ্ড এক হাসি।	২০।
১৯	ও গো পরম ধীর	}
২০	ওগো সুগম্ভীর	} ।৩৭.
২১	সময় থাকতে সুরু তুমি করো তো এই বেলা	}
২২	চাপা ঢাকা যা কিছু সব খুলে ফেলার খেলা ॥	।৩৮.

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ।

—লাঞ্ছিত পাঠ ॥ দ্বিতীয় ॥

---

১ বদল করিতে ও নকল করিতে গিয়া লিপিপ্রমাদ হইয়াছে ? 'গিরিরাজ' স্থলে 'গিরি' হইলেই ছত্রের স্বরসংখ্যা যথোচিত হইত ও ছন্দের প্রবাহ বাধা পাইত না। লাঞ্ছিত-বর্জিত প্রথম খসড়ায় (১৭৮ক। পৃ ৫৩) পুরা ছত্রটি আদৌ ছিল : কাছে এলে গিরিরাজ সে রয় না যেন কাছে।

১৭৮ খ ॥ পৃ । ছ	[ছড়ার ছবি / নবজাতক]	তুলনীয় ছত্র : খেলা : প্রবীণ
৬০।১	এই জগতের এক নিমেষো কাজের তো নেই ক্রটি	.১।
২	সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে তার খেলার বিপুল ছুটি,	.২।
৩	×চঞ্চলতার নিত্য আঘাত লেগে	
৪	হাস্যে অধীর নবীন আছে জেগে।×	
৫	বাতাসব্যাপী ছেলেমানুষ, আকাশব্যাপী হাসি,	.৩।
৬	সাগর ব্যেপে কলপ্রলাপ ফেনিয়ে ওঠে ভাসি'।	.৪।
৭	ঝর্না ঝরে দূরের ডাকে পাথরগুলো ঠেলে	.৫।
৮	কাজের সঙ্গে নাচের খেয়াল কোথায় থেকে পেলে।	৬।
৯	পাঁচ শো বছর চাপ্‌ল বয়স ঐ যে শালের গাছে,	.৭।৩৩.
১০	অস্থিরতার অন্ত কি তার আছে।	.৮।
১১	মজ্জাতে ওর অটল শক্তি, বকুনি ওর পাতায়,	.৯।
১২	ঝড়ের দিনে কী পাগ্‌লামি চাপে যে ওর মাথায়।	১০।
১৩	ফুলের দিনে গন্ধের ভোজ অবাধ সারাক্ষণ	১১।
১৪	ডালে ডালে দখিন হাওয়ার বাঁধা নিমন্ত্রণ।	১২।
১৫	বিলাসী নয় মেঘগুলো তো জলের ভারে ভরা,	।১১
১৬	চেহারা তার বিলাসিতার রঙীন ভূষণ পরা।	।১২
১৭	ওগো তুমি কী করছ ভাই, মনে আগল ঝেঁপে,	।২৩.
১৮	বুদ্ধি তোমার বোঝা যেন মাথায় রইল চেপে।	।২৪.
১৯	মুখে তোমার চেহারাটা মরা নদীর সোঁতা	
২০	আপন মনের শেষতলাতে তলিয়ে গেছ কোথা।	।২৮.
৬২।২১	স্বয়ং বিধির খেলাঘরে আবার ভর্তি হও,	
২২	চঞ্চলতার নতুন দীক্ষা লও।	
২৩	দীক্ষা যেথায় লয়েছে ঐ গ্রহ সূর্য্য তারা,	
২৪	দীক্ষা যেথায় নিল হাওয়া দিগন্তে পথহারা।	
২৫	মেঘ যেখানে বলে আমি অকর্ম্মণ্য মেঘ,	
২৬	পাগলা ঝোরা বলে আমার অকর্ম্মণ্য বেগ ;	
২৭	কাজের নিপুণতা যেথায় নিজেরে কয় মিছে,	} ।৪.
২৮	লুকিয়ে থাকে রং-করা কার উত্তরীয়ের পিছে।	}

তুলনীয়

১৭৮ খ ॥ পৃ। ছ [ছড়ার ছবি / নবজাতক] ছত্র : খেলা : প্রবীণ

২৯ ওগো প্রবীণ গম্ভীরতার খ্যাতির লোভে কি এ
৩০ রইলে বসে জবার ভস্মে আগুন চাপা দিয়ে।

৩১ কাজ ক'রে মন অসাড় যখন, মাথা যাচ্ছে ঘুরে, ১৩।
৩২ হিমালয়ের খেলা দেখতে এলেম এত দূরে। .১৪।
৩৩ চক্ষে যেন নিষেধ লাগল কুহেলিকার স্তূপে, .১৫।
৩৪ গিরি আছেন মুখঢাকা কোন্ সুগম্ভীরের রূপে। .১৬।
৩৫ রাত্তিরে যেই বৃষ্টি হোলো, দেখি সকালবেলায় ১৭।
৩৬ চাদরটা ওর উপলক্ষ্য খুলে ফেলার খেলায়। .১৮।
৩৭ ঢাকার মধ্যে চাপা ছিল কৌতুক এক রাশি ১৯।
৩৮ প্রকাণ্ড এক হাসি। ২০।

৬৩।৩৯ ওগো প্রবীণ, ওগো পরম ধীর,
৪০ ওগো সুগম্ভীর, ।৩৭.
৪১ সময় থাকতে সুরু করো তুমিও এই বেলা
৪২ চাপা ঢাকা যা-কিছু সব খুলে ফেলার খেলা ।৩৮.

—গ্রাহ্য পাঠ ॥ চতুর্থ ॥

পাণ্ডু.-লাঞ্ছিত 'দ্বিতীয়' এবং পাণ্ডু -ধৃত/গ্রাহ্য 'চতুর্থ', যে দুইটি পাঠ এ স্থলে আদ্যন্ত সংকলন করা গেল, অদ্যাবধি মুদ্রিত 'খেলা' ও 'প্রবীণ' কবিতার সহিত ইহাদের মিল বা অমিল কতটা তাহার ধারণা করিতে হইলে ছড়ার ছবি ও নবজাতক খুলিয়া দুটি কবিতাতেই আনুপূর্বিক ছত্রাঙ্ক বসাইলে ভালো হয়। 'দ্বিতীয়' পাঠ আদ্যন্ত বর্জনচিহ্নিত বা লাঞ্ছিত তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে; চতুর্থ পাঠেও কিছুমাত্র 'লাঞ্ছনা' (কাটাকুটি) নাই এমন হইতে পারে না, তন্মধ্যে কেবল দুই ছত্র (ছ ৩-৪) লাঞ্ছিত বলিয়া আগে পরে × চিহ্ন দিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। পুরা ছত্র আর কাটা হয় নাই, কতকগুলি শব্দ বা শব্দগোষ্ঠী লাঞ্ছিত হইয়াছে বিভিন্ন ছত্রে; পাণ্ডুলিপির ছত্রাঙ্ক উল্লেখপূর্বক সেগুলি নির্দেশ করা যায়। প্রাসঙ্গিক পূর্বপাঠ ও উত্তরপাঠ পর পর উদ্‌ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে ঐ ছত্রের ঐ স্থলে কোথায় পরিবর্তন, কোথায় নূতন পদ-সংযোজন, কোথায় বা কেবলই বর্জন।

(ক স্থলে খ বুঝাইতে লেখা হইবে ক>খ।)—

উত্তর পাঠ

ছত্র ১৭ আগল-বাঁধা মন, > মনে আগল ঝেঁপে,

২২	চঞ্চলতার বীর্য্যমন্ত্রে	>	চঞ্চলতার
২৩ ও ২৪	যেমন দীক্ষা	>	দীক্ষা যেথায়
২৭	কৃতিত্বেরি রূপ যেখানে	>	কাজের নিপুণতা যেথায়
২৮	রসরূপের	>	রং-করা কার
৩৩	এসে দেখি	>	চক্ষে যেন নিষেধ লাগল
			('লাগল'র পূর্বপাঠ : এলো)
৩৯ ও ৪০	'সুগভীর' ও 'পরম ধীর' ঠাঁই বদল করিয়া বর্তমান পাঠ হইয়াছে।		
৪১	তুমি করো তো	>	করো তুমিও

অতঃপর সংকলিত 'দ্বিতীয়' ও 'চতুর্থ' পাঠের আধারে অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে বা গ্রন্থে যে পাঠবৈচিত্র্য তাহাও আলোচনার যোগ্য। এই পাঠপঞ্জীতে মুদ্রিত গ্রন্থের স্তবকভাগ উপেক্ষা করা হইবে; 'প্রবীণ 'নির্দেশে ঐ কবিতার গ্রন্থে বা ১৩৪৫ পৌষের প্রবাসীতে (পৃ ৩৪৫-৪৬) মুদ্রিত রূপ বুঝিতে হইবে।

॥ পাঠপঞ্জী ॥ লাঞ্ছিত 'দ্বিতীয়' পাঠের তুলনা॥

ছত্র	পাণ্ডু. ১৭৮খ		নবজাতক এবং পাণ্ডু.। পৃষ্ঠাঙ্কসহ
১	হাসির দ্বারে	স্থলে	চলার পথে / প্রবীণ
৪	দিনে দিনে দিনরাত্তির	>	দিন যত যায় দিন রাত্তির / ১৭৮ক। ৫৩ দিনে দিনে ছিছি কেবল/প্রবীণ
৫	এই পুরাতন	>	পুরাতন এই / ১৭৮ক। ৫৩
৬	তোমার বয়স কতই হবে	>	এত [বয়স গে] ছে তোমার / ১৭৮ক। ৫৩
৭	পাঁচশো বছর পেরিয়ে গেছে	>	পাঁচশো বছর বয়স হবে / ১৭৮ক। ৫৩ আশি বছর বয়স হবে / প্রবীণ
৮	চৈত্রমাসের তপ্ত রোদে	>	এ আশ্বিনের রোদ্দুরে ওর / প্রবীণ
৯	পাতায় পাতায়	>	পাতায় বকে / ১৭৮ক। ৫৩
১০	ক্ষ্যাপা হাওয়ার	>	পান্থ হাওয়ার / প্রবীণ
১১	অসাড়	>	ক্লান্ত / ১৭৮ক। ৫৩
১২	এত	>	অনেক / ১৭৮গ। ৮১
১৪	পূর্ণ ছত্রের	>	×কাছে এলে গিরিরাজ সে রয় না যেন কাছে / × গিরিরাজ সে কাছে থেকে রয়না তবু কাছে / ১৭৮ক।৫৩[১]

---

১ পঞ্চম টীকা দ্রষ্টব্য। এ স্থলে উদ্‌ধৃত×—×পাঠ বর্জনচিহ্নিত। পাণ্ডুলিপিতে ইহার পরের ছত্র: এসে দেখি আগাগোড়াই ঝাপসা হয়ে আছে, / যে ছত্রের পরে আসিয়া স্থান লয় পূর্বোক্ত লাঞ্ছিত ছত্র নূতন রূপ লইয়া -- 'গিরিরাজ সে···কাছে।'

ছত্র পাণ্ডু. ১৭৮ খ নবজাতক এবং পাণ্ডু. । পৃষ্ঠাঙ্কসহ

১৬ উপলক্ষ্য খুলে ফেলার > কাজে লাগে চাদর খোলার / ১৭৮গ । ৮১
১৮ প্রকাণ্ড এক > মস্ত একটা / ১৭৮ক । ৫৫

॥ গ্রাহ্য 'চতুর্থ' পাঠের তুলনা ॥

১ এক নিমেষো কাজের তো নেই > শক্ত মনিব সয় না একটু / ১৭৮গ । ৮১
২ সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে তার খেলার > নিত্য কাজের সঙ্গে তবু নিত্য কালের / ১৭৮গ । ৮১
৫ বাতাসব্যাপী ছেলেমানুষ, আকাশব্যাপী > বাতাসে তার ছেলেখেলা আকাশে তার / ১৭৮গ । ৮১
৬ ব্যেপে কলপ্রলাপ ফেনিয়ে ওঠে > জুড়ে গদ্‌গদ ভাষ বুদ্‌বুদে যায় / ১৭৮গ । ৮১
৭ ঝরে > ছোটে / ১৭৮গ । ৮১
৯ পূর্ণ ছত্রের > ঐ হোথা শাল, পাঁচ শো বছর মজ্জাতে ওর ঢাকা, / ১৭৮গ । ৮১
আশি বছর বয়স হবে ওই-যে পিপুল গাছ / প্রবীণ
১১ অটল > কঠোর / ১৭৮গ । ৮১
১৬ রঙীন > রঙের / প্রবীণ
১৭ মনে আগল ঝেঁপে > স্তব্ধ সারাক্ষণ / প্রবীণ
১৮ বোঝা যেন মাথায় রইল চেপে > আড়ষ্ট যে, ঝিমিয়ে-পড়া মন / প্রবীণ
২০ শেষ তলাতে তলিয়ে গেছে > তলায় তুমি তলিয়ে গেলে / প্রবীণ
৩২ এত > অনেক / ১৭৮গ । ৮১
৩৩ চক্ষে যেন নিষেধ লাগল > এসেই দেখি নিষেধ জাগে / ১৭৮গ । ৮১
৩৪ গিরি আছেন > গিরিরাজের / ১৭৮গ । ৮১
৩৬ উপলক্ষ্য খুলে ফেলার > কাজে লাগে চাদর খোলার / ১৭৮গ । ৮১

'চতুর্থ' পাঠের ছত্র ১-৩০'এর "বিশৃঙ্খল" খসড়ারূপ ১৭৮ক পাণ্ডুলিপিতে (পৃ ৫২-৫৩) আছে, পূর্বে বলা হইয়াছে। উক্ত খসড়ার সংকলনের কোন্ কোন্ ছত্র কোন্ রূপে আছে, অতিরিক্ত ছত্রই বা কী আছে, অতঃপর সাধ্যমত তাহারই নির্দেশ—

১৭৮ খ ১৭৮ ক । পৃ ৫২-৫৩

১ পাঠভেদ নাই। পৃ ৫২
২ রয়েছে তার খেলার > আছে / ৫২
৩ পাঠভেদ নাই। পৃ ৫২
৪ হাস্যে অধীর নবীন > জলে স্থলে চির নবীন সদাই / ৫২
৫ বাতাসব্যাপী/আকাশব্যাপী > বাতাসে ঐ / আকাশে তার / ৫২
৬ সাগর ব্যেপে > সমুদ্রে তার / ৫২

১৭৮ খ ১৭৮ ক। পৃ ৫২-৫৩

৭-৮ পাঠভেদ নাই। পৃ ৫২

৯ চাপ্‌ল বয়স > বয়স-বহা / ৫২

১০ তার > ওর / ৫২

১১-১২ পাঠভেদ নাই। পৃ ৫২

১৩ অবাধ > চলচে / ৫২

১৪ পাঠভেদ নাই। ৫২

[অন্তর্বর্তী অংশ :

বাহির হতে কে জানতে পায় শান্ত আকাশতলে
প্রাণ বাঁচাবার কঠিন কর্ম্মে নিত্য লড়াই চলে।
সে চেষ্টা তার ভালে পালায় পড়ে যখন ধরা
তখন খেলার রূপ চলে যায় তখন আসে জরা। ৫২

—তুলনীয় : প্রবীণ। ছত্র ৭-১০]

১৫ পাঠভেদ নাই।

১৬ রঙীন > রঙের/৫২

[অন্তর্বর্তী অংশ :

বাইরে ওরা বুড়োমিকে দেয় না তো প্রশ্রয়
অন্তরেতে প্রবীণতার ক্ষমতা তাই রয়।
প্রাণলোকের হাজার কাজে ছুটচে কেবল বায়ু
কাজে খেলায় এক হয়ে যায় অক্ষয় তাই আয়ু।
যখন ওদের ঘুচবে খেলা কানে কলম গোঁজা
তখনি কাজ অচল হবে বয়স হবে বোঝা।/৫২

—যথাক্রমে তুলনীয় : প্রবীণ। ছত্র ১৩-১৪, ১৭-১৮, ২১-২২]

১৭ মনে আগল ঝেঁপে > আগল বাঁধা মন/৫২

১৮ পূর্ণ ছত্র > বুদ্ধি যেন বোঝা তোমার শুদ্ধ সারাক্ষণ/৫২

[অন্তর্বর্তী অংশ :

প্রথম বয়স যেই পেরোল খেলা ঘরের দ্বারে
মরচেপড়া লাগল তালা বন্ধ একেবারে।/৫২

—তুলনীয় : প্রবীণ। ছত্র ২৫-২৬]

১৯ স্থলে অসম্পূর্ণ বাক্য : আগুপিছু চিন্তা কেবল/৫২

—তুলনীয় : প্রবীণ। ছত্র ২৭ : ভালোমন্দ বিচারগুলো

২০ শেষ তলাতে > তলায় তুমি/৫২

২১-২২ খসড়ায় দেখা যায় না।

২৩-২৪ > হাসির দীক্ষা, জয়ের দীক্ষা, দীক্ষা আগুন জলা/৫৩

২৫ পাঠভেদ নাই। পৃ ৫৩

২৬ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রেখাজালে আচ্ছন্ন। 'আমার' 'বেগ' পড়া যায়। পৃ ৫৩

২৭ > ক্ষতিস্থেরে লুকিয়ে রাখে পরিহাসের [তলে][1]/৫৩

—তুলনীয় : প্রবীণ। ছত্র ৪ (রাখ>রাখে তলে>ছলে)

২৮ > ঝাঁপিয়ে পড়ো কাজের গভীর জলে

সাঁতার খেলার ছলে।/৫৩ ঝাঁপ দিয়ে>ঝাঁপিয়ে / 'পড়ো' ও 'গভীর'

যথাস্থানে পরে যুক্ত।

২৯ পাঠভেদ নাই। পৃ ৫৩

৩০ চাপা > ঢাকা/৫৩

আলোচ্য রচনার ব্যাপারে পরবর্তী "পদক্ষেপ" বা করক্ষেপ যেমন ১৭৮গ পাণ্ডুলিপিতে ('খেলা' শিরোনাম-যুক্ত ২০ ছত্র/পৃ ৮১) তেমনি ১৫৯-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতেও (শিরোনামহীন কিন্তু নবজাতক-ভুক্ত 'প্রবীণ' কবিতার আদর্শ-স্বরূপ ৩৮ ছত্র/পৃ '38' ও '39')। এখান হইতেই পরিষ্কার-পরিচ্ছিন্ন-ভাবে 'এক' দুই হইল।[2] 'প্রবীণ'-সম্পর্কিত আলোচনা বা তুলনায় আলোচনা স্থগিত রাখিয়া এখানে 'খেলা' কবিতারই ঐ পরিণত রূপ, পঞ্চম পাঠ, আনুপূর্বিক সংকলন করা যায়। এই সংকলনে ১৭৮গ পাণ্ডুলিপির লাঞ্ছিত পূর্বপাঠ যাহা যাহা পড়িতে বা অনুমান করিতে পারা যায় পরে তাহারও উল্লেখ থাকিবে।[3]

---

১ শেষ পদটির পাঠ কতকটা আনুমানিক। পাণ্ডুলিপিতে দুর্লক্ষ্য।

২ কেন হইল তাহা এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করার একান্ত প্রয়োজন নাই, উল্লেখ করাই যথেষ্ট। আলমোড়ায় বসিয়া শিল্পী নন্দলালের কতক চিত্রপত্রী উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ শিশু বা কিশোর -মনোহারী কবিতা রচনার সংকল্প লইয়াছিলেন ছড়ার ছন্দে, যাহার পদে পদে সংগীত বাজিয়া উঠে, ছবিও ফুটে। লিখিতে লিখিতে যেখানেই রচনা আত্মমুখী বা বিশেষভাবে আত্মকেন্দ্রিক ও ভাবগম্ভীর হইবার উপক্রম করিয়াছে, কবি ঐ অংশ বর্জন না করিয়া পারেন নাই। সমগ্র ছড়ার ছবির নানা পাণ্ডুলিপিতে তাহার নানা নিদর্শন পরিকীর্ণ। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার গৃহিণীপনা অদ্ভুত। 'ছড়ার ছবি'র নানা কবিতা হইতে যাহা যাহা লাঞ্ছিত/বর্জিত তাহা যে চিরতরে হারাইয়াছে, এমন নয়। প্রায়শঃ কবির অন্য কাব্যে অন্য কবিতার রূপ লইয়া পরে তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে ব্যাপারে কখনো ছিন্ন ৪ ছত্র ঈষদ্রূপান্তরিত ৪ ছত্রেই সীমাবদ্ধ থাকিয়াছে (যেমন সেঁজুতি কাব্যের শেষ কবিতা 'ছুটি') কখনো বা (যেমন 'প্রবীণ'এর ক্ষেত্রে) বহু পরিবর্তনে সমৃদ্ধতর দীর্ঘতর কবিতার রূপ লইয়াছে।

৩ আলোচ্য কবিতার পূর্বের পাঠগুলির সংকলনে লাঞ্ছিত প্রত্যেকটি শব্দ বা শব্দগোষ্ঠী উল্লিখিত বা উদাহৃত হয় নাই। সেরূপ করিতে গেলে আলোচনা বহুগুণে দীর্ঘ ও দুরধিগম্য হইত, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়-উপকরণের অসদ্ভাবে হয়তো সম্ভবও হইত না। —পাণ্ডুলিপি-গ্রাহ্য পঞ্চম পাঠ।

১৭৮ গ ॥ পৃ ৮১

খেলা

১ এই জগতের শক্ত মনিব সয় না একটু ত্রুটি,
২ নিত্য কাজের সঙ্গে তবু নিত্যকালের ছুটি।
৩ বাতাসে তার ছেলেখেলা, আকাশে তার হাসি,
৪ সাগর জুড়ে গদ্‌গদভাষ বুদ্‌বুদে যায় ভাসি।
৫ ঝরনা ছোটে দূরের ডাকে পাথরগুলো ঠেলে
৬ কাজের সঙ্গে নাচের খেয়াল কোথায় থেকে পেলে।
৭ ঐ হোথা শাল, পাঁচশো বছর মজ্জাতে ওর ঢাকা,
৮ গাম্ভীর্য্যেও অটল যেমন, চাঞ্চল্যেও পাকা।[১]
৯ মজ্জাতে ওর কঠোর শক্তি, বকুনি ওর পাতায়,
১০ ঝড়ের দিনে কী পাগ্‌লামি চাপে যে ওর মাথায়।
১১ ফুলের দিনে গন্ধের ভোজ অবাধ সারাক্ষণ,
১২ ডালে ডালে দখিন হাওয়ার বাঁধা নিমন্ত্রণ।

১৩ কাজ ক'রে মন অসাড় যখন মাথা যাচ্ছে ঘুরে
১৪ হিমালয়ের খেলা দেখতে এলেম অনেক দূরে।
১৫ এসেই দেখি নিষেধ জাগে কুহেলিকার স্তূপে,
১৬ গিরিরাজের মুখ ঢাকা কোন্ সুগম্ভীরের রূপে।
১৭ রাত্তিরে যেই বৃষ্টি হোলো, দেখি সকাল বেলায়
১৮ চাদরটা ওর কাজে লাগে চাদর খোলার খেলায়।
১৯ ঢাকার মধ্যে চাপা ছিল কৌতুক এক রাশি,
২০ প্রকাণ্ড এক হাসি।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

—পাণ্ডুলিপি-গ্রাহ্য পঞ্চম পাঠ।

সংকলনের বামে আরোপিত ছত্রাঙ্ক-ক্রমে এই পাণ্ডুলিপির এই পৃষ্ঠার লাঞ্ছিত/বর্জিত পাঠগুলি উল্লেখ করা যায়—

ছত্র		লাঞ্ছিত পাঠ
১ শক্ত··· ত্রুটি	>	চলেইচে কাজ, মুহূর্ত্ত নেই ছুটি,
২ নিত্য কাজের···কালের	>	কাজের সঙ্গে রয়েছে তার খেলার বিপুল

১ একাধারে গম্ভীর ও কৌতুকী রূপের বাক্‌চিত্র যেমন এখানে শালগাছে ও হিমালয়ে তেমনি প্রথম পাণ্ডুলিপি ১৭৮ ক'এর পৃ ৫৩-ধৃত অপূর্ব রেখাচিত্রে, তাহাতে স্বয়ং কবির স্বরূপচ্ছবি আভাসিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ছত্র			লাঞ্ছিত পাঠ
৪	গদ্‌গদভাষ···যায়	>	বকুনি তার ফেনিয়ে ওঠে
৬-৭	সংকলিত দুই ছত্র	>	পাঁচশো বছর চাপ্‌ল বয়স ঐ যে শালের গাছে, অস্থিরতায় অন্ত কি তার আছে।
৮	কঠোর	>	অটল
১৪	বহু দূরে	>	অনেক দূরে
১৫	স্তূপে (১৭৮খ-ধৃত)	>	রূপে [slip মনে হয়
১৮	কাজে···খোলার	>	উপলক্ষ্য খুলে ফেলার

১৯ 'ছিল' slip হওয়াতেই মনে হয় তোলা পাঠে বসানো।

কবির স্বহস্তের পঞ্চম পাঠ হইতে প্রায় হুবহু অনুলিপি প্রস্তুত করেন শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। উহাই ছড়ার ছবির ১৯-সংখ্যক কবিতার প্রেস-কপি (মুদ্রিত গ্রন্থে ২৭-সংখ্যক)। ইহার শিয়রে আবশ্যকীয় চিত্রের ঠিক-ঠিকানা নির্দেশ করেন কবি এই কটি কথায় : বৌমার পোস্টকার্ডের মধ্যে আছে / তাহা ছাড়া প্রথম স্তবকে কয়েকটি পরিবর্তনও করেন, যথা—

ছত্র			গ্রাহ্য নূতন পাঠ
২	নিত্য কাজের···কালের	>	যেমন নিত্য কাজের পালা তেমনি নিত্য
৮	গাম্ভীর্যেও··· চাঞ্চল্যেও	>	গম্ভীরতায়···চঞ্চলতায়

বলা আবশ্যক, অনুলিপিতে 'গাম্ভীর্যে ও' 'চাঞ্চল্যে ও' এই ভ্রান্ত পাঠ লেখা হইয়াছিল। যাহা হউক কবিকর্তৃক সংশোধিত/পরিবর্তিত প্রেস-কপির আদর্শে কবিতাটি ছড়ার ছবি কাব্যে ছাপা হয়।

বর্তমান আলোচনার শেষে একরূপ বাহুল্য হইলেও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 'খেলা' কবিতার লাঞ্ছিত প্রথম পাঠই সামান্য পরিবর্তনে গ্রাহ্য অন্তিমপাঠ রূপে ফিরিয়া আসিয়াছে— উভয়ের মিল কেবল ছত্রসংখ্যা (যথাক্রমে ২২ ও ২০) দিয়া নয়। পরিবর্তন এইটুকু যে, প্রথম স্তবকে আত্মকথা বা আত্মভাবনার যে মিশাল স্বতই আসিয়াছিল, যে ভাবনাই এই কবিতার মূল প্রেরণা বলা যায়, তাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে বা অন্তরালে রাখা হইয়াছে। (পরবর্তী স্তবকের সূচনায় সে কথার উল্লেখমাত্র আছে অত্যন্ত বস্তুতন্ত্রভাবে : কাজ করে মন অসাড় যখন মাথা যাচ্ছে ঘুরে /) অথচ কথাটা ফেলনা তো নয়। নয় বলিয়াই প্রথম স্তবকের বিস্তারিত রূপান্তরে তাহা ভালো করিয়া বলা হয় আর তাহা 'ছড়ার ছবি'তে অনাবশ্যক/অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় (বর্তমান আলোচনার ৮৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা ৩ দ্রষ্টব্য) নবজাতক কাব্যে স্থান পায় সুসম্পূর্ণ 'প্রবীণ' কবিতারূপে।

প্রবীণ

১ বিশ্বজগৎ যখন করে কাজ

২ স্পর্ধা ক'রে পরে ছুটির সাজ।

৩ আকাশে তার আলোর ঘোড়া চলে,

৪ কৃতিত্বেরে লুকিয়ে রাখে পরিহাসের ছলে।
৫ বনের তলে[১] গাছে গাছে শ্যামল রূপের মেলা,
৬ ফুলে ফলে নানান রঙে নিত্য নতুন খেলা।
৭ বাহির হতে কে জানতে পায়, শান্ত আকাশতলে
৮ প্রাণ বাঁচাবার কঠিন কর্মে নিত্য লড়াই চলে।
৯ চেষ্টা যখন নগ্ন হয়ে শাখায় পড়ে ধরা,
১০ তখন খেলার রূপ চলে যায়, তখন আসে জরা॥

১১ বিলাসী নয় মেঘগুলো তো জলের ভারে ভরা,
১২ চেহারা তার বিলাসিতার রঙের ভূষণ পরা।
১৩ বাইরে ওরা বুড়োমিকে দেয় না তো প্রশ্রয়
১৪ অন্তরে তাই চিরন্তনের বজ্রমন্দ্র রয়।
১৫ জল-ঝরানো ছেলেখেলা যেমনি বন্ধ করে
১৬ ফ্যাকাশে হয় চেহারা তার, বয়স তাকে ধরে।
১৭ দেহের মাঝে হাজার কাজে বহে প্রাণের বায়ু—
১৮ পালের তরীর মতন যেন ছুটিয়ে চলে আয়ু,
১৯ বুকের মধ্যে জাগায় নাচন, কণ্ঠে লাগায় সুর,
২০ সকল অঙ্গ অকারণে উৎসাহে ভরপুর।
২১ রক্তে যখন ফুরোবে ওর খেলার[২] নেশাখোঁজা
২২ তখনি কাজ অচল হবে, বয়স হবে বোঝা॥
২৩ ওগো তুমি কী করছ ভাই, স্তব্ধ সারাক্ষণ—
২৪ বুদ্ধি তোমার আড়ষ্ট যে, ঝিমিয়ে-পড়া মন।
২৫ নবীন বয়স যেই পেরোল খেলাঘরের দ্বারে,
২৬ মরচে-পড়া লাগল তালা, বন্ধ একেবারে।
২৭ ভালোমন্দ বিচারগুলো খোঁটায় যেন পোঁতা।
২৮ আপন মনের তলায় তুমি তলিয়ে গেলে কোথা।
২৯ চলার পথে আগল দিয়ে বসে আছ স্থির—
৩০ বাইরে এসো, বাইরে এসো, পরম গম্ভীর।
৩১ কেবলই কি প্রবীণ তুমি, নবীন নও কি তাও।
৩২ দিনে দিনে ছি ছি কেবল বুড়ো হয়েই যাও!

পাঠভেদ ১ মাঝে } প্রবাসী। পৌষ ১৩৪৫, পৃ ৩৪৫।৪৬
মুদ্রণপ্রমাদ ২ খেলায়

৩৩ আশি বছর বয়স হবে ওই-যে পিপুল গাছ,
৩৪ এ আশ্বিনের রোদ্‌দুরে ওর দেখলে বিপুল নাচ ?
৩৫ পাতায় পাতায় আবোল-তাবোল, শাখায় দোলাদুলি,
৩৬ পান্থ হাওয়ার সঙ্গে ও চায় করতে কোলাকুলি।
৩৭ গো প্রবীণ, চলো এবার সকল কাজের শেষে
৩৮ নবীন হাসি মুখে নিয়ে চরম খেলার বেশে ॥

—নবজাতক। বৈশাখ ১৩৪৭

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর · শতবার্ষিক সংকলন। গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ চৌধুরী -সম্পাদিত। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবার্ষিক সমিতি। কলিকাতা। ১৩৭৯। পৃষ্ঠা ১৫২

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে রবীন্দ্র-প্রজন্মের বেশ কয়েকটি নাম শিক্ষিত বাঙালী সমাজে আজ সুপরিচিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যার মধ্যে অনেকেই তাঁদের আপন সুকৃতিতে এ দেশে খ্যাতির আসন অর্জন করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-পরবর্তী প্রজন্মে অর্থাৎ এঁদের পুত্র পর্যায়ে তেমন কীর্তিমানের সংখ্যা বেশি নয়। যে-কয়জন স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ অকালমৃত, যদিও তাঁর রচনাবলী সু-সংকলিত ও সুলভ। অপরজন অনতিস্বল্পায়ু হয়েও প্রায় বিস্মৃত ব্যক্তি— তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ। এই প্রজন্মেরই অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন পাঁচ নম্বর বাড়ির বাসিন্দা।

ভাবতে অবাক লাগে সুরেন্দ্রনাথ আটষট্টি বছর সক্ষম সক্রিয় জীবনযাপন করেছেন— প্রথম যৌবনে বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, পরবর্তীকালে হিন্দুস্থান জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম স্থাপয়িতা, বিশ্বভারতীর উপাচার্য, বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলির সম্পাদক হয়েছিলেন —কোনো ভূমিকাই বিস্মরণযোগ্য নয়, বরং প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে তিনি আপন যোগ্যতা ও চরিত্রের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তথাপি যে-বিচিত্র কর্মপ্রবাহে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন, এমন-কি, যে-সব ক্ষেত্রে তিনি পুরোযায়ীর কৃতিত্বও দাবি করতে পারেন, সে-সব কর্মকাণ্ডের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা যথাযথ স্বীকৃত হয় না। কেবল রবীন্দ্র-রচনার স্থানে স্থানে তাঁর উল্লেখ রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠককে সচকিত করে মাত্র। যদিও রবীন্দ্ররচনায় সুরেন্দ্রনাথের উল্লেখ-সমূহ যথেষ্ট বিশিষ্টতামণ্ডিত ও তাৎপর্যময়— বিসর্জনের উৎসর্গ কবিতা, 'নাসিক হইতে খুড়ার পত্র' ভাঙা হিন্দিতে রবীন্দ্রনাথের কৌতুক কবিতা বা নানা চিঠিপত্রে সুরেন্দ্রনাথের উল্লেখ কিছুতেই পাঠকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। তবু রবীন্দ্ররচনায় বিশেষভাবে উল্লিখিত পুরুষ বা রবীন্দ্রনাথের পরম নির্ভর হিসেবেই সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র পরিচয় নয়, সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আপন কীর্তি ও রচনার মহিমাতেই আপন প্রতিষ্ঠা দাবি করতে পারেন। অথচ রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ থেকে শতবার্ষিকের যে প্লাবন এ দেশে শুরু হয়েছে সুরেন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ তার মাঝে অতি মৃদু তরঙ্গ-অভিঘাতে কেটে গেল। আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত না হলে বোধ করি তাঁর জন্মশতবর্ষ বিনা অনুষ্ঠানে ও বিনা স্মরণে উদ্‌যাপিত হত। এবং সে কারণেই এই গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয় ও জন্মশতবার্ষিক সমিতি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

এই ১৫২ পৃষ্ঠার বইখানি বিষয়সম্ভার ও বিষয়বিন্যাস দুই কারণেই উল্লেখযোগ্য। বিষয়-সূচীকে কয়েকটি প্রসঙ্গে বিন্যস্ত করা হয়েছে। জীবনকথা অংশে আছে স্ত্রী, ভগ্নী ও দৌহিত্রের রচনা। প্রসঙ্গ-কথা অংশে রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ এবং সুরেন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী দুটি সুচিন্তিত প্রসঙ্গ এবং রচনা দুটিও সুলিখিত। এ ছাড়া সুরেন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা ও অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হয়েছে, আর আছে পরিচিতিসহ কয়েকটি হেঁয়ালি চিত্রের প্রতিলিপি। অধিকাংশ প্রবন্ধেই গবেষণার প্রয়াস দেখা যায়। তার ফলে বইখানি দলিলধর্মী হয়ে উঠেছে। তবে এ দেশে জীবনতথ্য সংকলনে অধিকাংশক্ষেত্রে সংকলয়িতারা উচ্ছ্বাস বর্জন করতে পারেন না। তাতে উদ্দিষ্ট জীবনের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না, উপরন্তু

যথার্থ মূল্যায়নে বাধা সৃষ্টি হয়। বর্তমান গ্রন্থের অন্তত একটি রচনা পড়তে গিয়ে সে কথা মনে হল। গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ সুরেন্দ্র-রচনাপঞ্জী। এর স্থায়ী মূল্য গবেষকমাত্রেই জানেন। মাত্র তিনখানি গ্রন্থের রচয়িতা সুরেন্দ্রনাথ। তিনখানি গ্রন্থের বিশদ পঞ্জী সংকলনে বিশেষ নিষ্ঠার পরিচয় আছে। গ্রন্থাকারে অসংকলিত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি রচনাবলীর পঞ্জী কোনো যোগ্য সম্পাদককে ভবিষ্যতে গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহিত করবে আশা করা যায়।

সুরেন্দ্রনাথের 'মহাভারত'খানির মূল আখ্যানভাগ রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত কুরু-পাণ্ডব বর্তমানে পাঠক-মহলে প্রচারিত। 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভের' ভাষা ও বিষয়বস্তু আধুনিক পাঠককে মুগ্ধ করতে বাধ্য। এ ভাষা বা বিষয় কোনোটিই সুরেন্দ্রনাথ তাঁর রবিকাকার কাছ থেকে পান নি। বিষয়বস্তু আজকের জীবনে সবচেয়ে আলোচিত আর ভাষার ভঙ্গি বা মেজাজ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' বা অবনীন্দ্রনাথের যে-কোনো বৈঠকী রচনার কথা মনে করিয়ে দেয়।

বইখানিতে আর্টপ্লেট ব্যবহারের ব্যাপারে কার্পণ্য করা হয় নি। বেশ কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি রয়েছে। মুদ্রণ পারিপাট্যে স্বভাবতই সুরুচির পরিচয় আছে, তবে কয়েকটি মুদ্রণচ্যুতি চোখে লাগে।

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর রচনাটি সম্পাদনান্তর প্রকাশিত হয়েছে। বোধ হয় সম্পাদনায় আর-একটু যত্নশীল হওয়ার দরকার ছিল।

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

স্বরলিপি

সন্ন্যাসী যে জাগিল ওই, জাগিল ওই, জাগিল।
হাস্য-ভরা দখিন-বায়ে অঙ্গ হতে দিল উড়ায়ে
শ্মশানচিতাভস্মরাশি— ভাগিল কোথা ভাগিল।
মানসলোকে শুভ্র আলো চূর্ণ হয়ে রঙ জাগালো,
মদির রাগ লাগিল তারে— হৃদয়ে তার লাগিল।
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে—
রঙের ধারা ওই-যে বহে যায় রে।

রঙের ঝড় উচ্ছ্বসিল গগনে,
রঙের ঢেউ রসের স্রোতে মাতিয়া ওঠে সঘনে—
ডাকিল বান আজি সে কোন্ কোটালে।
নাকাড়া বাজে কানাড়া বাজে বাঁশিতে—
কান্নাধারা মিলিয়া গেছে হাসিতে—
প্রাণের মাঝে ফোয়ারা তারি ছোটালে॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II ধর্সা -া র্সা | র্সা -া | র্সা -া I র্সনা -া র্রা | র্সা -া | না -া I
স ন্ ন্যা সী ॰ যে ॰ জা॰ ॰ গি ল ॰ ও ই

॥
I ধা -া র্সা | না -া | ধা -পা I পা -হ্মা ধা | পা -া | -া -া I
জা ॰ গি ল ॰ ও ই জা ॰ গি ল ॰ ॰ ॰

I পা -া পা | পা -া | পা -া I পা হ্মা পা | ধা -া | পা -া I
হা ॰ স্য ভ ॰ রা ॰ দ খি ন বা ॰ য়ে ॰

I পা -না ধনা | ধা -া | পা -া I পা পা হ্মা | ধা -া | পা -া I
অ ঙ্ গ হ ॰ তে ॰ দি ল উ ড়া ॰ য়ে ॰

I সা সা রা | গা -া | গা -া I সা -া রা | গা -া | গা -র্গা I
শ্ম শা ন চি ॰ তা ॰ ভ ॰ স্ম রা ॰ শি ॰

I র্গা র্গা র্গা | র্রা -া | র্সা -া I র্সা -না র্রা | র্সা -া | -া -া I
ভা গি ল কো ॰ থা ॰ ভা ॰ গি ল ॰ ॰ ॰

I পা পা গা | পা -হ্মা | ধা -পা I ধা -র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা -া I
মা ন স লো ॰ কে ॰ শু ॰ ভ্র আ ॰ লো ॰

I র্সা -র্গা র্রা | র্গা -া | র্গা -র্পা I র্গা -া র্গা | র্রা -া | র্সা -া I
চূ র্ ণ হ ॰ য়ে ॰ র ঙ্ জা গা ॰ লো ॰

I র্সা র্গা র্রা | র্গা -া | -া -র্রর্গর্রা I র্রা র্রা র্রা | র্সা -া | না -া I
ম দি র রা ॰ ॰ ॰গ্ লা গি ল তা ॰ রে ॰

I ধা র্সা র্সা | না -া | ধা -া I পা -হ্মা ধা | পা -া | -র্সা -া I
হৃ দ য়ে তা ॰ র ॰ লা ॰ গি ল ॰ ॰ ॰

I ধর্সা -া র্সা | র্সা -া | র্সা -া I র্সনা -া র্রা | র্সা -া | না -া I
স ন্ ন্যা সী ॰ যে ॰ জা॰ ॰ গি ল ॰ ও ই

I ধা -া র্সা | না -া | ধা -পা I পা -হ্মা ধা | পা -া | -া -া I
জা ॰ গি ল ॰ ও ই জা ॰ গি ল ॰ ॰ ॰

I পা -র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা -া I র্সনা -র্রা র্রা | র্রা -র্সা | ধা -া I
আ য়্ রে তো ॰ রা ॰ আ॰ য়্ রে তো ॰ রা ॰

I পা -ধা -না | -র্সা -র্রা | -র্গা -র্রা I র্সা -া -া | -া -া | -া -া I
আ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ য়্ রে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I ধা র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা -া I র্সা -না র্রা | র্সা -া | না -া I
র ঙে র ধা ॰ রা ॰ ও ই যে ব ॰ হে ॰

স্বরলিপি

I ক্ষা -পা -ধা | -না -র্সা | -নর্সা -া I ধপা -া -া | -া -া | -া -া
ষা ০ • ০ ০ • • য় রে০ • ০ ০ ০ • •

I র্গা র্গা র্গা | র্গা -র্পা | -া -া I র্গা -া র্গা | র্রা -া | র্রা -া
র ঙে র ঝ • • ড় উ চ্ ছ্ব সি • ল •

I র্সা -না র্রা | র্সা -া | -া -া I র্সা র্সা র্সা | র্সা -া | -া -া
গ ০ গ নে • • • র ঙে র ঢে • • উ

I না র্রা র্রা | র্সা -া | না -া I ধা র্সা র্সা | না -া | ধা -া
র সে র স্রো ০ তে • মা তি য়া ও • ঠে •

I পা -ক্ষা ধা | পা -া | -া -া I পা পা পা | না -া | ধা পা
স ০ ঘ নে • ০ • ডা কি ল বা ন্ আ জি

I পা ক্ষা -গা | গা -রা | রগা -রা I সা -া -া | -া -া | -া -া
সে কো ন্ কো • টা ০ লে • • ০ • ০ •

*I পা পা গা | পা -ক্ষা | ধা -পা I ধর্সা র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা -া
না কা ড়া বা • জে • কা না ড়া বা ০ জে •

I র্সা -না র্রা | র্সা -া | -া -া I সা -া রা | গা -া | গা -া
বাঁ • শি তে • • • কা ন্ না ধা ০ রা •

I সা সা রা | গা -া | গা -মা I রগা -া রা | সা -া | -া -া
মি লি য়া গে ০ ছে • হা • সি তে • ০ •

I র্সা র্গা র্গা | র্গা -া | র্গর্পা -া I র্পর্গা র্গা র্গা | র্রা -া | র্সা -া
প্রা ণে র মা ০ ঝে০ • ফো০ য়া রা তা • রি •

I র্সা -না র্রা | র্সা -া | -পা -া II II
ছো • টা লে • • •

* কবিগুরু "নাকাড়া বাজে কানাড়া বাজে··· ছোটালে" এই অংশের সুরান্তর প্রথমে এইরূপ দিয়াছিলেন—

```
   [মা   মা   মা]
I {সা   সা   সা | রা  -া | রা  -সা I সপা  পা  পা | মপা  -া | মা  -জ্ঞা I
   না   কা   ড়া   বা  •   জে  •    কা•  না  ড়া   বা•  •   জে   •

I মা  -া  রা | সা  -া | -া  -া} I মা  -া  মা | পা  -া | পা  -মা I
  বাঁ  •  শি   তে  •   •   •    কা  ন্  না   ধা  •   রা   •

I মণা  ণা  ণা | ধা  -ণা | পা  -মা I মা  -পধা  মপা | মা  -জ্ঞা | -া  -া I
  মি   লি  য়া   গে  •    ছে  •    হা  ••    সি•   তে  •     •   •

I র্জ্ঞা  র্জ্ঞা  র্জ্ঞা | র্জ্ঞা  -া | র্জ্ঞা  -র্মা I র্রা  র্রা  র্রা | র্সা  -া | র্সা  -না I
  প্রা   ণে   র    মা   •   ঝে   •     ফো  য়া  রা   তা  •   রি   •

I র্সা  -না  র্রা | র্সা  -া | -পা  -া II II
  ছো   •   টা    লে   •    •   •
```

বর্ষ ২৯ · সংখ্যা ২-৩

কার্তিক-চৈত্র ১৩৮৩

সম্পাদক

শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৯ সংখ্যা ২-৩ · কার্তিক-চৈত্র ১৩৮৩ · ১৮৯৮-৯৯ শক

সম্পাদক শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ • সহযোগী সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়

বিষয়সূচী

মূল্য ছয় টাকা

চিত্রসূচী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত

স্বীকৃতি

‘বালিকা’, ‘বিক্রমবাহু’, ‘প্রতিকৃতি’ ও ‘পুত্তলিকাপুরের দেশের ছাড়পত্র’ চিত্রগুলি শ্রীমতী পূর্ণিমা গঙ্গোপাধ্যায়-সংগ্রহভুক্ত ও শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

‘সাহাজাদপুর’ চিত্রের ব্লক রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

‘ছড়া’ ব্যতীত অবনীন্দ্রনাথের অন্যান্য সমস্ত অপ্রকাশিত রচনা শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

আত্মপ্রতিকৃতি

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৯ সংখ্যা ২-৩ · কার্তিক-চৈত্র ১৩৮৩ · ১৮৯৮-৯৯ শক

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

১

ওঁ

C/o Messrs Thomas Cook & Son
Ludgate Circus.
London.
[জুন ১৯১৩]

কল্যাণীয়েষু

অবন তোমাদের ছবি[১] তিনটি পেয়ে খুসি হলুম। কাজ শেষ হলেই তোমরা ফিরে পাবে। মুস্কিল হচ্চে শিশুর কবিতাগুলো কবে ছাপতে দেব এখনো ঠিক হয়নি। হাতে অনেকগুলো ভাবী গ্রন্থ জমা হয়েছে সেগুলো পরে পরে একে একে বের করতে হবে। আপাতত এখানকার বন্ধুরা ঠিক করেছেন আমার সোনার তরী ক্ষণিকা চিত্রা প্রভৃতি বইয়ের কবিতাগুলো এইবার সব প্রথমে বের করতে হবে[২] তার পরে অন্যগুলো প্রকাশ করা যাবে। শিশুর কবিতার পালা ওর মধ্যে এক সময়ে আসবে। তোমার এবং নন্দলালের এ দুটো ছবিই আমার ভাল লেগেছে। অসিতের যে একটি ছবি আছে, মা ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্চে[৩] সেটা যদি পাঠাতে পার তাহলে ওটাও ব্যবহার করা যেতে পারে।

এখানকার লোক-তরঙ্গিনীর ঘূর্ণীর মধ্যে পড়ে অত্যন্ত হয়রান হয়ে পড়া গেছে। কতকগুলো বক্তৃতা[৪] পাঠ করা যাচ্ছিল— তার শেষেরটা আজ রাত্রে পড়তে হবে— সেটা হলেই এখান থেকে পালাবার মত অবকাশ পাওয়া যাবে— কিছুদিন লণ্ডনের বাইরে যদি কাটাতে পারি তাহলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। কিন্তু একটা দায় যদি কাটে আর একটা এসে পড়ে। সুরেনরা[৫] চেপে ধরেছে অর্শের জন্য অস্ত্র চিকিৎসা[৬] করতেই হবে তাহলে এখন শয্যা আশ্রয় করে পড়ে থাকতে হবে। এমনি করে গোলেমালে এ দেশের সব চেয়ে ভাল সময়টা সহরে-মারা গেল। জীবনটা সঙ্কীর্ণ— তার মধ্যেও কতটা বাদ পড়ে যায়! সুরেন আসচে সপ্তাহে দেশে রওনা হবে। তার কাছ থেকে এখানকার খবরের কতকটা আভাস পাবে— কিন্তু যাকে বলে বিস্তারিত বিবরণ সেটা সুরেনের মুখ থেকে আদায় করা বড় শক্ত।

কাগজে দেখলুম তুমি তিন অক্ষরের খেতাব[৭] পেয়েছ। ভেবেছিলুম একটা অভিনন্দন টেলিগ্রাফ করব। কিন্তু কুঁড়েমি এবং কৃপণতায় এক জোট হয়ে সেটা ঘটতে দিলে না।

রবিকাকা

২

ওঁ

16, More's Garden
Cheyne Walk, S. W.
[আগস্ট ১৯১৩]

কল্যাণীয়েষু

চিত্রাঙ্গদার ছবি[১] পেয়ে খুসি হয়েছি। এখানে দুই একজন আর্টিষ্টকে দেখিয়েছি তারা ত প্রশংসা করলে। রোটেনস্টাইন এখন লণ্ডনের বাইরে তাই তাঁকে দেখাতে পারিনি। যা হোক এ বেশ ভালই হয়েছে।

আমি সম্প্রতি দুই ভাস্করের হাতে পড়েছি। একদিকে জেনিঙ্‌স্‌ আর একদিকে Davidson নামে একজন "উদীয়মান" গুণী। প্রথমোক্তটিকে তোমরা চেন, শেষোক্তটি রুশীয় যুবক— লোকে বলাবলি করচে ইনি অনতিবিলম্বে কলাবিদ্যায় ষোল-কলা পূর্ণ করে যশের পূর্ণিমা প্রভা বিস্তার করবেন। এঁরা দুইজনে আমার দুই মূর্তি খাড়া করচেন। আমার শ্রীকৃষ্ণের দশা হয়েছে— রাধা এবং চন্দ্রাবলী দুইজনেরই নিকুঞ্জ ভবনে অভিসার করতে হয়। ডেভিডসনের হাতের কীর্তি কিছু বেদস্তুর গোছের— কতকটা Rodin-র ধরনের— অর্থাৎ অত্যন্ত মাজা ঘষা পরিপাটি নয়। জেনিংসের ঠিক তার উল্টো— যেন আমার সম্বন্ধে বিধাতার কাজ একেবারে শেষ হয়ে গেছে— রেঁদা দিয়ে ঘষে পালিশ লাগিয়ে দিয়ে তিনি ছুটি নিয়েছেন। ডেভিডসন তোমার ওমার খৈয়ম্‌[২] ছবির খুব গুণগান করেন। একবার তাঁর ভারতবর্ষ ঘুরে আসবার সখ আছে,— মন্দ হয়না।

প্রবাসীর মলাটে মুকুলের যে ছবি বেরিয়েছে[৩] সেটা দেখে রোটেন্‌স্টাইন খুব মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি বলেন এটা ঠিক আমার "পরশ পাথর"[৪]-এর ছবি— তাঁর ইচ্ছা ওটা এখানকার কোনো একটা কাগজে ঐ কবিতার সঙ্গে বের হয়। শিশুর ছবিগুলি ছাপতে গেছে। শিশুর তর্জ্জমা এখানে বিশেষ খ্যাতি লাভ করবে বলে সকলেই আশ্বাস দিচ্চেন— তাহলে সেইসঙ্গে তোমাদের ছবিগুলিরও প্রচার হতে পারবে।

কি রকম reproduction হয় তা ত জানিনে। Macmillanরা ভালই করবে সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে আমার নিজের দেহতত্ত্বের একটু সংশোধন হয়ে গেছে— আমাকে কেটে ছেঁটে সেরে সুরে দিয়েছে— রোগটাকে সমুদ্র পার করে দেশে ফিরতে পারব।

এখানে সম্প্রতি গগন মেঘাচ্ছন্ন এবং অবনী ধূমাবৃত, তার মাঝখানে পড়ে রবি একেবারে লুপ্তপ্রায়। যেখানে গগন এবং অবনীর দক্ষিণমুখ[৫] চির হাস্যময় সেইখানকার উদ্দেশে মন উৎসুক হয়ে আছে— আমার রথী সারথিকে মাঝে মাঝে রথসজ্জার তাগিদ করচি।

রবিকাকা

৩

ওঁ

BRAHMACHARYA-ASHRAM
Santiniketan
Birbhum
[১৯১৯]

কল্যাণীয়েষু

নন্দলালকে যে চিঠি দিয়েচ সেইটি পড়ে বড় উদ্বিগ্ন হয়েচি। তার জন্যে আমাকে অনেক ব্যবস্থা ও খরচ করতে হয়েচে এবং আশাও অনেক করেছিলুম। আমার আশা নিজের জন্যে নয়— দেশের জন্যে, তোমাদেরও জন্যে। এই আশাতেই আমি আর্থিক অসামর্থ্য সত্ত্বেও বিচিত্রায়[১] অকৃপণভাবে টাকা খরচ করেছিলুম। তোমরা দেশে যে বীজ বপন করেছ সেটাই যাতে অঙ্কুরিত এবং স্থায়ী হয়ে সমস্ত দেশের চিরন্তন জিনিষ হয় এই আমার কামনা ছিল। কেন না আমি জানি যে আমাদের দেশের যা কিছু স্থায়ী ও গভীর মঙ্গল তা স্বদেশের স্বাধীন ইচ্ছা ও চেষ্টার দ্বারাই সম্ভব— কারণ সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি সমস্ত সৃষ্টির জিনিষ স্বাধীনতাপ্রসূত— তার গৌরবই তাই। এই গৌরব যদি আমরা দেশের লোক নিজের চেষ্টায় অর্জ্জন করি তাহলেই সেটা যথার্থ National হয়। যাই হোক্ এই মনে করেই আমি ক্ষতিকে ক্ষতি মনে করি নি— আজও করি নে। কলকাতায় ভাল করে শিকড় লাগল না বলেই এখানে কাজ ফেঁদেচি। সফলতার সমস্ত লক্ষণই দেখা দিয়েচে। ছাত্রেরা উৎসাহিত হয়েচে, শিক্ষকেরাও— একটা atmosphere তৈরি হয়ে উঠচে। নন্দলালের নিজের রচনাও এখানে যেমন অব্যাহত অবকাশ ও আনন্দের মধ্যে অগ্রসর হচ্চে এমন কলকাতায় হওয়া সম্ভবপর নয়— সেইটেই আমার কাছে সবচেয়ে লাভ বলে মনে হয়। নন্দলাল এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন— বাহির থেকে তার উপরে কোনো দায়িত্ব চাপানো হয়নি— তা ছাড়া এখানে তার নিজের কাজের ব্যাঘাত করবার কোনোপ্রকার উপসর্গ নেই। আরও একটি সুবিধা এই, এখানে সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্য চর্চ্চায় নন্দলাল যোগ দেওয়ায় মনের মধ্যে সে যে একটি নিয়ত আনন্দলাভ করচে সেটা কি তার প্রতিভার বিকাশে কাজ করবে না? তোমাদের সোসাইটি[২] প্রধানত চিত্র প্রদর্শনীর জন্যে— এখান থেকে তার ব্যাঘাত না হয়ে বরঞ্চ আনুকূল্যই হবে। তারপরে নন্দলালের লম্বা লম্বা ছুটি আছে। প্রয়োজনমত কখনো কখনো সে ছুটি বাড়াতেও পার। অর্থাৎ আমার বক্তব্য এই যে নন্দলাল এখানে থাকাতে তোমাদেরই কাজের সুবিধা হচ্চে— অথচ এতে আমার আনন্দ। যদি তোমরা এর ব্যাঘাত কর তাহলে আমার যা দুঃখ এবং ক্ষতি তাকে গণ্য না করলেও এটা নিশ্চয় জেনো নন্দলালের এতে ক্ষতি হবে

এবং তোমাদেরও এতে লাভ হবে না। যদি সাংসারিক উন্নতির টানে নন্দলালের এই সুযোগ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় তাহলে কোনো কথাই নেই— কিন্তু আমার একান্ত অনুনয় এই, তুমি তার গুরু হয়ে তাকে এ ক্ষেত্রে ডেকো না— কেন না তোমার ইচ্ছা তাকে বিচলিত করবে— অর্থের প্রয়োজন না থাকলেও করবে। নন্দলালের পরে আমার কোনো জোর নেই— কিন্তু ওর পরে আমার অনেক আশা আছে— নিশ্চয় জেনো, সে আমার কাজের দিক থেকে নয়— দেশের দিক থেকে। গবর্মেণ্টের সঙ্গে আমি অর্থের প্রতিযোগিতা করতে পারব না— কিন্তু অন্য সকল বিষয়েই মঙ্গল কামনা এবং আমাদের সম্মিলিত তপস্যার দ্বারা আমরা ওর যে সাহায্য করতে পারব টাকার দ্বারা তা কখনই হবে না। এখানে আমরা স্বার্থ চিন্তা ত্যাগ করে ঈশ্বরের নাম করে যে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েচি, টাকার চেয়ে তার কি বড় inspiration নেই— আর সেই inspirationই কি সমস্ত সৃষ্টিকার্য্যের সব চেয়ে বড় প্রেরণা নয়? আমার কথাটাকে তোমরা বড় করে এবং মনকে নিরাসক্ত করে চিন্তা কোরো— তবু যদি তোমাদের অন্যরূপ ইচ্ছা হয় তবে তাই আমি ধৈর্য্যের সঙ্গে গ্রহণ করব; এ পর্য্যন্ত যেমন একলাই আমার সব কাজ করেচি এই চেষ্টাতেও আবার সেইরকম একলাই চলতে থাকব। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

ওঁ

দার্জিলিং

কল্যাণীয়েষু

অবন, অবশেষে তোমাতে নন্দলালে কুরুক্ষেত্রের পালা জমিয়ে তোলবার জন্যে এ কোন্ দুর্য্যোধনের দুশ্চেষ্টা— দ্রোণাচার্য্যের সঙ্গে অর্জ্জুনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ? এখানে থাকতেই শুনেছিলুম পৌরসভাগৃহ প্রসাধনের জন্যে নন্দলালকে আমন্ত্রণ করেচে— খুব খুসি হয়েছিলুম। তার প্রধান কারণ, কিছুকাল থেকে ওকে যেন অবসাদগ্রস্ত দেখেচি, সেটা ভালো নয়। এই সময়ে ওর একটা উৎসাহের দরকার হয়েচে।

মুকুল আমাকে একজিবিশনের পাকে[১] টানবার চেষ্টায় আছে। মন স্থির করতে পারচি নে। শেষকালে জাতও যাবে পেটও ভরবে না। একটিমাত্র লোভের কারণ আছে। সব ছবিগুলো ও মাউণ্ট্ করে বাঁধিয়ে দিতে রাজি। বাঁধাতে না পারলে আমাদের জোলো হাওয়ায় ছবিগুলো বিবর্ণ হবে আশঙ্কা হয়। বাঁধাবার খরচ নিজের থেকে জোগাবার সাধ্য নেই— একশো ছবি মাউণ্ট ও বাঁধাই করা সোজা ব্যাপার নয়— এই একটা মস্ত লোভে পড়া গেছে।

এখানে এসে অবধি লেখার উৎসাহ নেই— গোটাকতক ছবি এঁকেচি। তোমাদের পাড়ায় হঠাৎ অভিনয়ের নেশা[২] জেগেছে শুনে খুসি হলুম— কিন্তু প্রশান্তকে[৩] তোমাদের সুরাচার্য্য করেচ শুনে মনটা কিছু দমে গেছে। আমার সঙ্গে রাইভল্‌রি! ফিরে গিয়ে কিছু নমুনা দেখা যাবে। কলকাতায় মন্‌সুন্ না নামলে এখান থেকে নড়তে সাহস হচ্চে না। ইতি ১ আষাঢ় ১৩৩৮

রবিকাকা

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

অবন, তোমার রক্তকরবীর ভূমিকাটির[১] পরে একটু আমার কলম বুলিয়ে দিলুম। ওটাতে নাটকের অর্থ বোঝবার সহায়তা করবে। ফরমাসে কবিতা লিখতে মন বিমুখ হয়ে ওঠে, তবু প্রবোধের[২] বারবার অনুরোধে একটা লিখতে হোলো।[৩]

এই দুটো লেখা রেজেষ্ট্রি ডাকে পাঠাচ্চি।

আমি কলকাতায় যাব না ঠিক করেছিলুম। আজকাল যাতায়াতটা ক্লেশকর, পাথেয় খরচটাও। বৎসর শেষ হয়ে এল, এখন সমস্ত সম্বল সম্বৎসরের ঋণশোধেই লাগবে; সসেক্রেটারি সসেবক আমার যাওয়া আসার খরচ লাগে প্রায় চল্লিশ টাকা। তুমি দলের অধিকারী মানুষ তোমার কাছে দরবার জানিয়ে রাখ্‌লুম তোমাদের পালাগানের আয় থেকে এই টাকাটা আমাকে দিতে হবে। এটা আমার ব্যক্তিগত দাবী, নিঃস্ব বিশ্বভারতীর তরফ থেকেও ভিক্ষে জানিয়ে রাখলুম।

এতকাল শীতেরই উত্তরাকাণ্ড চলছিল আজ থেকে বসন্তের তপ্ত প্রতাপ দেখা দিয়েচে। রঙ্গমঞ্চে বাণীর চেয়ে তোমাদের ঘর্ম্মপ্রবাহ প্রবলতর হবে বলে আশঙ্কা করচি।

আমি ২৬শে তারিখে যাত্রা ক'রে সেইদিন অপরাহ্ণে বরানগরে পৌঁছব— তারপরে তোমাদের পালা আরম্ভের পূর্ব্বে তোমাদের রিহার্শাল একদিন দেখ্‌তে পাব। কিন্তু একেবারে শুভদৃষ্টির সময়েই প্রথম দেখা ভালো মনে করি।

বিচিত্রায় অসিত চিত্রার ছবির প্রশংসা উপলক্ষ্য করে নন্দলালের প্রতি ক্রুর কটাক্ষপাত করেছে। দেখেছ বোধ হয়। আমি বিস্মিত হয়েছি এবং ক্ষুব্ধ হয়েছি। অর্দ্ধেন্দু এবং মুকুল ছাড়া নন্দলালকে আর কেউ বিদ্বেষ করতে পারে বলে মনে করিনি। ইতি ৬ই চৈত্র ১৩৪০

রবিকাকা

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

অবন, এগারই ডিসেম্বরে এখানে হ্যাভেলের স্মৃতিমন্দিরের[১] প্রতিষ্ঠা হবে— তুমি তার দ্বার উদ্ঘাটনের

অনুষ্ঠান করবে— নইলে চলবে না। শরীরের দোহাই দিয়ো না। এইটুকু পরিবর্তনে তোমার শরীর ভালোই থাকবে। ··· ইতি ২৩।১১।৩৮

রবিকাকা

ব্রতীন্দ্রকে[২] সঙ্গে করে এনো।

টীকা

পত্রসংখ্যা ১.

১ শিশু কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ *The Crescent Moon* (নভেম্বর ১৯১৩) গ্রন্থের জন্য অঙ্কিত চিত্র। এই গ্রন্থের চিত্রগুলি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় -কর্তৃক অঙ্কিত হয়েছিল।

২ *The Crescent Moon* প্রকাশিত হবার আগেই *The Gardener* (অক্টোবর ১৯১৩) প্রকাশিত হয়।

৩ 'মা যশোদা' নামে প্রবাসী পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ সংখ্যায় মুদ্রিত।

৪ London-এর Caxton Hall-এ প্রদত্ত ছয়টি বক্তৃতা। *Sadhana* গ্রন্থে (অক্টোবর ১৯১৩) সংকলিত।

৫ রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুরেন্দ্রনাথ ঐ সময়ে লণ্ডনে ছিলেন।

৬ রবীন্দ্রনাথ চিকিৎসার জন্য জুন মাসের শেষের দিকে লণ্ডনে Duchess Nursing Home-এ ভর্তি হন।

৭ C. I. E : Companion of the Indian Empire.

পত্রসংখ্যা ২ :

১ চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যের জন্য অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত ছবিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অলংকৃত চিত্রাঙ্গদার প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১২৯৯। রোটেনস্টাইনকে সম্ভবত এই চিত্রই দেখানো হয়।

২ *The Rubaiyat of Omar Khayyam.* Translated by Edward Fitzgerald. With Coloured Plates from Drawings by Abanindro Nath Tagore. London. "ইহাতে সাতখানি বহুবর্ণ চিত্র আছে। ইহা প্রথমে (ইং ১৯১১ ?) পোর্টফোলিও আকারে প্রচারিত

হইয়াছিল, তাহাতে বারখানি বহুবর্ণ চিত্র এবং স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত ফিট্‌জেরাল্ডের অনুবাদ ছিল।" —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -কর্তৃক সংকলিত শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী, বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ৩, সংখ্যা ৩।

৩ প্রবাসী পত্রিকার ১৩২০ বঙ্গাব্দের ষান্মাসিক চিত্রসূচীতে আষাঢ় ১৩২০ সংখ্যার প্রচ্ছদপট 'শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার কর্তৃক অঙ্কিত'— এইরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

৪ সোনার তরী কাব্যগ্রন্থভুক্ত 'পরশপাথর' নামক কবিতা।

৫ ৫ নম্বর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের উপস্থিতির উল্লেখ।

পত্রসংখ্যা ৩ :

১ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বিচিত্রা ক্লাব

২ Indian Society of Oriental Art.

পত্রসংখ্যা ৪ :

১ কলকাতার Government School of Arts ভবনে শিল্পী শ্রীমুকুলচন্দ্র দে-র উদ্‌যোগে ১৯৩২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনী হয়।

২ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অবনীন্দ্রনাথ-রচিত 'এসপার ওসপার' পালার অভিনয়।

৩ শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র পরলোকগত চিত্রশিল্পী প্রশান্তকুমার রায়।

পত্রসংখ্যা ৫ :

১ 'বিহার ভূকম্প-পীড়িতের সাহায্যার্থে' প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর -প্রযোজিত রক্তকরবী নাটকের 'অভিনয়-সূচী'তে মুদ্রিত অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকা। বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় 'রক্তকরবী' নামে মুদ্রিত।

২ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর।

৩ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর -প্রযোজিত রক্তকরবী নাটকের 'অভিনয় সূচী'তে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে এই কবিতাটি মুদ্রিত হয়। নবজাতক কাব্যগ্রন্থে 'ভূমিকম্প' নামে প্রকাশিত।

পত্রসংখ্যা ৬ :

১ শান্তিনিকেতনে কলাভবনে হ্যাভেল স্মৃতি-মন্দিরের উদ্‌বোধন-অনুষ্ঠানে অবনীন্দ্রনাথ পারিবারিক কারণে উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

এই উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁর এ-যাবৎ অপ্রকাশিত রচনাটি এখানে মুদ্রিত হল :

"যে সব মানুষের উদ্দেশে বলা হয়েছে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা সেই পর্যায়ের মানুষ ছিলেন Havell সাহেব। ভারতশিল্পের পাণ্ডা ও পণ্ডিত বলে তাঁকে বুঝতে চললে ভুল পথে চলা হবে।

যে স্নিগ্ধ চোখে তিনি ভারতশিল্পলক্ষ্মীকে দেখে গেছেন সাধক ও ভক্ত ছাড়া কচিৎ কেউ পায়। পাণ্ডা ও পণ্ডিতের দৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র দৃষ্টি সেটি।

আজ যে আমরা তাবৎ শিল্পের খাঁটিও চিনতে পারছি তার গোড়াপত্তন Havell সাহেবের দ্বারাই হয়েছিল, অন্তত আমার পক্ষে সে কথা খাটে।

বহুদিন তাঁর সঙ্গ পাই নি, এখন বহুকাল হয়তো তাঁর সঙ্গহারা হয়ে কাটাতে হবে। শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন জীবিতকালে যিনি, মৃত্যুর পারেও তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পেয়ে নিজেকে ধন্য বোধ করছি।

জোড়াসাঁকো
মঙ্গলবার

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ চিত্রশিল্পী শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্বেত মদব
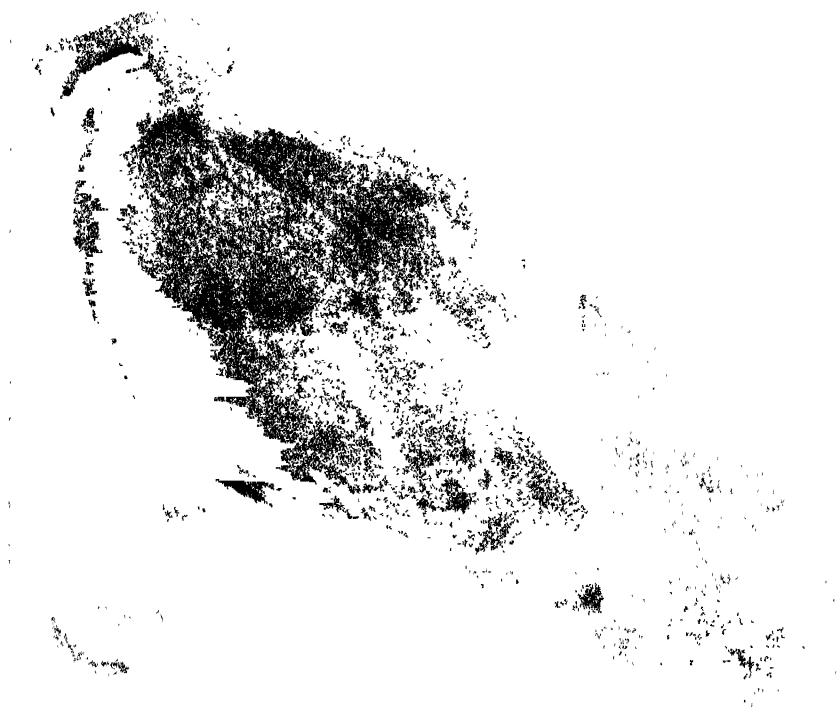
অবনীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা

ছড়া[1]

১ ফুরুৎ ফারুৎ নাচে
শালিক পাখিটা গাছে
কথন বা হেলে দুলে
নেমে আসে তরুমূলে
খুটি খাটি খায়
উড়ি উড়ি যায় ॥

২ হুঁ বাক্ বাক্ খুম বাকুম
তোমায় আমি বকুম
খাবার কেন নাহি দিছম
দুধ কলা আর মিঠম
হুঁ বাক্ বাক্ খুম বাকুম
রাতদিন রেখে দিছ খাঁচার ভিতর
এ আমি পছন্দ না করম
শুধু তোমায় বকুম
হুঁ বাক্ বাক্ খুম বাকুম ॥

১ শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারীর সৌজন্যে

ভারতশিল্পচর্চা

প্রথম প্রস্তাব

ভারতশিল্পচর্চার আরম্ভেই কি হিসেবে কাজ করে যেতে হবে, কোথা থেকে কি কি উপাদান সংগ্রহ করা চাই তাই বলি। আর্যগণ এসে উপস্থিত হলেন ভারতে আর সেইসঙ্গে তাঁদের তৈজসপত্রেরই মতো শিল্পকলা এল এ দেশে এ কথার কথায় আস্থা স্থাপন করে শিল্পচর্চা করা চলে না। পৃথিবীর সকল শিল্পে যেমন তেমনি এখানেও আর্যপূর্ব শিল্প এবং আর্যশিল্প এই দুটো বড়ো বিভাগ বর্তমান। আজকের শিল্পের অনেকখানিই যেমন অতীতের উপর নির্ভর করছে, তেমনি আর্যশিল্পও আর্যপূর্ব শিল্পের কাছেই ঋণী রয়েছে। যদি কেউ বলে গ্রীক জাতির অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে পাথর কাটা ও পাথরে গাঁথা ও গড়া হঠাৎ শুরু হল এবং তার পূর্বে বাঁশের মাচা প্রস্তুত পর্যন্তই দৌড় ছিল এ দেশের বাস্তুবিদ্যার, তবে যেমন সে কথা ধর্তব্য হয় না, এ ক্ষেত্রেও তেমনি আর্যগণের অভিযানের সঙ্গে শিল্পের আবির্ভাব কল্পনা গ্রাহ্যই হতে পারে না। অশোক রাজার আমলের পূর্বে এ দেশে মন্দিরাদির নমুনা পাওয়াই যায় না, অল্পদিন হল এইরূপ মতটা টলেছে— নতুন নতুন নগর ও পত্তনের আবিষ্কার হয়ে চলেছে— যার প্রাচীনত্ব অভ্রান্ত। তেমনি আর্যপূর্ব যুগে আর-একদল অনুব্রত মানুষ তারা নিজেদের অবস্থানুযায়ী শিল্পকলা নিয়ে ভারতবর্ষে বাস করছিল এটা সত্য। আর্যপূর্ব যুগের শিল্পকলা-সমস্তের ইতিহাস একটুখানি নয়, বহু যুগ ধরে মানুষ যে-সমস্ত শিল্পসামগ্রী একটির পর একটি উদ্‌ভাবনা করে চলল তারি হিসেব। আর্যযুগকে শিল্পকলার মধ্যযুগ বলে ধরে নিতে পারি— যখন প্রায় সমস্ত শিল্পকলাই মানুষের দখলে এসে গেছে সেই মধ্যাহ্নের ইতিহাস হল আর্য জাতির শিল্পকলার ইতিহাস। প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের শিল্পকলার নানা আবর্তের মধ্যে একটাতে হল আর্যাবর্তের স্থান, আর্যশিল্প বলতে একটা অংশ বোঝায় শিল্প ইতিহাসের; সুতরাং আর্যগণের অভিযানের সঙ্গে জড়িয়ে শিল্পের উৎপত্তির একটা কেন্দ্র কল্পনাতে খাড়া করে শিল্পচর্চা করতে চলায় ভুল রাস্তায় গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। শিল্পকলা আর্যপূর্বাবস্থার এই কথা মনে রেখে তবে আমাদের শিল্পের নানা তরঙ্গলীলার দিকে নজর করে দেখা চাই। বেদপুরাণের আর্যাবর্ত, সেইটুকুর মধ্যেই ভারতশিল্প ধরা নেই— তার বাইরেও দেখা চাই। আবর্ত, যাকে চলিত কথায় বলি আওড়, তার দুটো চেষ্টা আছে। একটা হল ভিতরজলের বাইরের দিকে প্রসার-চেষ্টা, আর-একটা হল বাহিরের জলের ভিতর দিকে প্রবেশের চেষ্টা। আর্যাবর্তের শিল্প-ইতিহাস এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্ছে দেখি। সুতরাং খালি বৈদিক আমলে, কি বুদ্ধ বা আর কোনো একটা আধুনিক আমলের গণ্ডিতে শিল্পচর্চা বদ্ধ করে রাখা চলবে না— বেদবহির্ভূত বেদপূর্ব শিল্প-সমস্তের বৃত্তরেখাগুলিকে ধরে ধরে যেতে হবে বৃহৎ মানবজাতির শৈশব-অবস্থা পর্যন্ত যেখানে আর্যপূর্ব শিল্পী-সমস্তের দেখা পাব আমরা।

বৈদিক আমলের ইতিহাসই আমাদের কাছে এখনো সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে ওঠে নি— অনেকখানিই ঝাপসা রয়েছে। তারও পূর্বের কথা যে ভীষণ অন্ধকারে নিমগ্ন সেই অন্ধকার ঘেঁটে কিছু পাওয়া সম্ভব হবে কিনা এ কথা অনেকেই ভাবতে পারেন, কিন্তু এই অন্ধকার ভেদ করেছেন বহু ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ও শিল্পাচার্যগণ, সুতরাং আবর্তে পড়ে দিশাহারা হবার ভয় নেই এখন।

আমি যখন বাংলার ব্রত ও আল্পনা সম্বন্ধে লিখি তখন আর্য অনার্য দুই ব্রত নিয়েই আমাকে ব্যাপারটা চর্চা করতে হয়েছিল। সেই সময় নানা অন্ত্যব্রতদের শিল্পকলার সন্ধান পেয়েছিলেম নানা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের গ্রন্থাদি থেকে। চর্চা করে চলার পথটাও খুব অন্ধকার ঠেকে নি, কাজটাও খুব শক্ত ঠেকে নি। সুতরাং আর্যপূর্ব শিল্পের খবর পেতে হলে অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত দেশে অসহায় অবস্থায় পৌঁছতে হবে বা অন্ধকারে ঢিল মেরে চলতে হবে এমন নয়। সেই-সব অন্ধকারের মতো কালো মানুষ যাঁরা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী এবং যাঁদের কথা বেদেতে পাই— অন্ত্যব্রত দাস দস্যু রাক্ষস ইত্যাদি উপাধি-ভেদ ধরে— ভূভারতের ধর্ম শিল্প আচার ব্যবহার সমস্তের অনেকখানিই যে তাঁদের দান এটা না স্বীকার করে ভারতশিল্প চর্চা করতে যাওয়াই ভুল। স্মরণাতীত কালের অন্ত্যব্রত মানুষ তাঁদের শিল্প-ইতিহাস হল ভারতশিল্পের প্রথম অধ্যায়ের বিষয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে পড়ে আর্যশিল্প, তার পরে অন্তর্ভারত বহির্ভারতের মানুষদের যোগাযোগে যে-সব শিল্প-সামগ্রীর রচনা হল তার কথা। ভবিষ্যতে ভারতশিল্প কেমনটা দাঁড়াবে তা জানবার উপায় নেই, কিন্তু ভারতশিল্পের ইতিহাস সম্পূর্ণ হতেই চলবে, সম্পূর্ণ হবে না। এটা জানা কথা, কেবল যে-সব সভ্যতা লুপ্ত হয়েছে, যেমন গ্রীক, যেমন ইজীপ্ত, তারি ইতিহাস কতকটা পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব; কেননা, তার আর ভবিষ্যৎ নাই। ভারতশিল্প কোনো দেবতা বা দানবের কাছ থেকে বা আকাশ থেকে পড়ে-পাওয়া, এ বিশ্বাস ধরে চলা আর চলে না। ময়দানবকে এবং বিশ্বকর্মাকে আর্য এবং অনার্য ভারতবাসীর দুই শিল্পের দুটি প্রতীক বলে ধরা যেতে পারে। দানবের মতো শক্তিমান এবং সৃষ্টি করার কৌশলে নিপুণ এমন যে কর্মী-সমস্ত তাদেরই দিকে ইঙ্গিত করছে এই প্রতীক দুটি, এইটেই মনে হয়।

ব্রহ্মার নাই-কুণ্ড থেকে আর্য জাতি হঠাৎ জন্মে পড়ল এ দেশে এবং মন্ত্রবলে তারা শিল্পতন্ত্র রচনা করে বসল, এমন অদ্ভুত কল্পনার স্থান নেই শিল্পচর্চার বেলাতে। সুতরাং ভারতশিল্পের প্রারম্ভের কথা বৈদিক কালের পূর্ববর্তী কালের কথা, আর্যসভ্যতার প্রাক্‌কালেরও প্রাক্‌কালের কথা এ স্বীকার না করে উপায় নেই। শিল্পের প্রথম বিকাশের ইতিহাস তাবৎ সভ্যতার নিম্নতর স্তরে ধরা রয়েছে, প্রাচীন থেকে প্রাচীন হল এই শিল্পকলার উৎপত্তির ইতিহাস। বেদ-কোরাণের পূর্বেকার সম্পত্তি এই শিল্প। এর ইতিহাস জানতে হলে জগতের আদিম জাতিগণের নিত্যসহচর যে শিল্প তারি দিকে চোখ ফেরাতে হবে, মনকে নিতে হবে, তবেই হবে ঠিক কাজ। সভ্যতা হল নব্যপন্থী, শিল্প হল প্রাচীনপন্থী :

Homer and the great poets appear in barberic Times. Dante, for instance appeared in "the renewed barbarism of Italy"—Croce, *Aesthetic*.

মানুষ যখন থেকে ধর্মমত সমস্তের গণ্ডিতে আপনাকে ধরলে তখন থেকে এ জাতে ও জাতে পার্থক্য সৃষ্টি হল, মানুষের চিন্তারাজ্যেও উচ্চ-নীচ ভিন্নতা দেখা দিলে এবং সেইসঙ্গে শিল্পেও জাতিভেদে দেশভেদে নানা রীতিনীতি ধরে শিল্পরাজ্যে বড়ো বড়ো কয়টা বিভাগ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এই-সব নানা লক্ষণাক্রান্ত শিল্পের ইতিহাসচর্চার পথ নানা দিক থেকে আলোকিত হয়ে অনেকটা সুগম হয়ে উঠেছে বলতে হবে। সুতরাং ভারতশিল্প কী তার মোটামুটি জ্ঞান সহজলভ্য কিন্তু সহজলভ্য বলেই সেটা সাধারণত মোটামুটি জ্ঞান এবং অসম্পূর্ণ আংশিক জ্ঞান তা কে না বলবে ?

আজকের বাংলার আচার-ব্যবহার সাহিত্য ও শিল্পকলার হিসেব নিয়েই এ কথা বলতে পারি নে যে

বাঙালীর সব-কিছুর হিসেব পেয়ে গেলেম। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে নিজের মনেই, পূর্বতন বাংলার অধিবাসীদের কথা এবং তারও পূর্বের কথা। ভারতশিল্পের বেলাতেও তেমনি জানি বৈদিক আমল পর্যন্ত গিয়ে থেমে থাকা কিম্বা, ময়-মত ও বিশ্বকর্মা-শিল্পশাস্ত্র দুখানা উলটে বা গোটাকতক কোষগ্রন্থ ঘেঁটে ভারতশিল্পের কোষাগারে পৌঁছে গেছি এ ধারণা করে বসে থাকা যায় না— সেই-সব পাণ্ডব-বর্জিত অজ্ঞাত দেশবাসী এবং তাদের শিল্পের কথা আপনা হতেই মনে ওঠে, কাজেই বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমান ইত্যাদি নির্বিশেষে আর্যব্রত ভারতের শিল্পকলা এবং অন্যব্রত ভারতের শিল্পকলা, এই দুই বিভাগকে গোড়াতেই মেনে নিয়ে তবে আমাদের শিল্পচর্চা করে চলতে হবে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

সেই-সব অন্যব্রত— গুহাশায়ী বনবাসী দুর্দান্ত নিরক্ষর, নীল অন্ধকারের মতো কালো, মাটির রক্ত-পীত বর্ণের মতো বিচিত্র বর্ণের মানুষ যারা সবরকম সভ্যতা থেকে আজও দূরে রয়েছে, তারাই যে 'গুহায়াং নিহিতং' শিল্পকলার উদ্‌ভাবনের মূলে, এ কথা সহজে মনে নেয় না। কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণ-সমস্তকে অগ্রাহ্য তো করার উপায় নেই।

বেশি দূরে যেতে হবে না— চৌরঙ্গির জাদুঘরে গিয়ে দেখ, ত্রিপুরা আসাম এবং ভারতের নানা স্থানের বন্য ও পার্বত্য জাতিদের শিল্পসংগ্রহ— দেখতে পাবে শুক্রাচার্য প্রভৃতি শিল্পাচার্যগণ যে-সব চতুঃষষ্টিকলার ফর্দ দিয়েছেন, তার অনেকগুলোই এই-সব জাতিরা দখল করে বসে আছে, ইতিহাসের বাইরে সে-কোন্ পুরাকাল থেকে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

আমার মতটার উপরে হয়তো কারু শ্রদ্ধা না থাকতে পারে, সেইজন্যে আমার কথামতো এই-সব অশিক্ষিত এক হিসাবে বর্বর জাতির শিল্পকলাকে খুব একটা বড়ো গোছের কিছু বলে ধরতেই চাইবেন না। সেইজন্যে আরো দু-একজন পণ্ডিতের মতামত আমাকে দিতে হল— ভারত-স্থাপত্যবিদ্যার দিক দিয়ে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম দেশের অনেকের কাছেই সুপরিচিত, তিনি যে-সব ইমারত এপর্যন্ত কলিকাতা ও কলিকাতার বাহিরে নির্মাণ করেছেন, তার পরিকল্পনায় এপর্যন্ত মোগল রাজপুত বৌদ্ধ এমনি নানা জানাশোনা শিল্পের নানা অলংকারের অবতারণা করে চলেছিলেন। এক কথায় বলতে পারি এতদিন ইনি আর্যভারতে নিজেকে বদ্ধ রেখেছিলেন। আজ এইমাত্র তাঁর পত্র পেলেম তাতে তিনি ত্রিপুরা থেকে লিখছেন— 'সর্বজনপ্রিয় মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে আমি আজ কয়েকদিন হইল এখানে আসিয়াছি— মাণিক্যস্মৃতি-মন্দিরের পরিকল্পনা করিবার নিমিত্ত। আমার ইচ্ছা প্রাচীনতম ত্রিপুরার প্রাসাদমন্দিরে স্থাপত্যশিল্পকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রাখিয়া স্মৃতিমন্দির রচনা করি,— তজ্জন্য মহারাজা বাহাদুরের ইচ্ছাক্রমে কাল আমি "বিসর্জ্জনে" বর্ণিত ৵গোবিন্দমাণিক্যের প্রাচীন উদয়পুর প্রাসাদ ও ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির পর্যবেক্ষণ করিতে এবং আলোকচিত্র লইতে যাইব, হাতির পিঠে অনেক দূর পাহাড় জঙ্গলে যাইতে হইবে…।' হাতির পিঠে বন-জঙ্গল ঘুরে প্রাচীন শিল্পের নমুনা সংগ্রহ করে এসে আর-একটি ছত্র চিঠিতে তাঁকে লিখতেই হল, 'কুকিদের অঙ্কিত চিত্র হইতেও মন্দির নির্মাণের উপাদান গ্রহণ করিব।'

এখন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কী বলেন দেখ : "Modern science confronted with a problem like that of the rise of art, no longer casts about to conjecture how art might have arisen, she examines how it actually did arise. Abundant material has

now been collected from among Savage peoples of an art so primitive that we hesitate to call it art at all, and it is in these incohate efforts that we are able to track the secret motive springs that move the artist now as then."— Jane. E. Harrison, *Ancient Art and Ritual*

আজকের দিনের ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আর্টের উৎপত্তির বিষয়ে বৃথা তর্কবিতর্ক জল্পনাকল্পনা না করে প্রাচীনতম জাতিগণের আর্টের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের দ্বারা এ সমস্যার মীমাংসা করতে চলেছেন! গান এল নারদ মুনির কাছ থেকে, নাট্যকলা এল ভরত মুনির ঘর থেকে এমনি হিন্দুয়ানীরকমে হিন্দুস্থানের শিল্প-চর্চা করে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না— বেশি ফলও পাওয়া সম্ভব হয় না। কাজেই ইউরোপের শরণাপন্ন হতে হল। শিল্পের ধারা কোথা থেকে বহে এল আর্যভারতে, সেটার ইতিহাস আর্যপূর্ব এবং আর্য এই দুই যুগের মিলিত ইতিহাস। কিন্তু শিল্পের উৎপত্তি কোন্‌খানে, তার সন্ধান একমাত্র আর্যপূর্ব ও তৎপূর্ব যুগের মানুষের শিল্পকর্ম থেকে পাওয়া সম্ভব হল। এখন এইভাবে অতিপ্রাচীন জাতি-সমস্তের শিল্প-সমস্তের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় করতে চলা মানে কাপ্তেন কুক্‌ মহাপণ্ডিত ডারবিন প্রভৃতির মতো পুনরায় জাহাজ সাজিয়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে অরণ্যে কান্তারে সমুদ্রপারে নানা অসভ্য নৃশংস জাতির মধ্যে পরিভ্রমণ — সে কাজে সহজে এগোতে আমরা রাজি হব না। কাজেই এই-সব ভবঘুরেদের লেখা বই এবং নানা জাতির শিল্পকলার ফোটোগ্রাফ এবং যথাসম্ভব টুকিটাকি সংগ্রহের উপরে আমাদের নির্ভর করতে হবে। পুস্তকাগার এবং কলাভবন সমস্তই হল এ ক্ষেত্রে আমাদের সহায়।

ভৃগুরত্রি র্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বকর্মা ময়স্তথা,
নারদো নগ্নজিশ্চৈব বিশালাক্ষঃ পুরন্দরঃ,
ব্রহ্মা কুমারো নন্দীশঃ শৌনকো গর্গ এবচ,
বাসুদেব অনিরুদ্ধশ্চ তথা শুক্রবৃহস্পতি,
অষ্টাদশৈতে বিখ্যাতা বাস্তু-শাস্ত্রোপদেশকাঃ॥

ময়দানব, বিশ্বকর্মাদেবতা, শুক্র দৈত্যগুরু, বৃহস্পতি [দেবগুরু]— এইভাবে দুই দলের লোক মিলে শিল্পশাস্ত্র লিখে গেল। সেই বৈদিক আমল থেকে এখনকার দিন পর্যন্ত যাগযজ্ঞ ব্রত পূজা উপাসনা সবটার মধ্যেই দুই দলের কথা। রামায়ণ মহাভারত জাতকের গল্প রূপকথা ব্রতকথা ইত্যাদি সবগুলোর মধ্যে এই দুই দলেরই কল্পনার ছাপ। শুধু শিল্পের বেলাতেই অনার্য-শিল্প আর্যশিল্পে সংমিশ্রণ হল না, এমন কথা হতেই পারে না। শিল্পে আদান-প্রদানের ইতিহাসই হল সত্যকার ইতিহাস। রসশাস্ত্র অলংকারশাস্ত্র, যেখানে শিল্পের অন্তর বাহির সম্বন্ধে নানা চিন্তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ দেশের পণ্ডিতেরা করে গেছেন সেই-সব গ্রন্থকেই সম্পূর্ণভাবে আর্য সভ্যতার দান বলে ধরে নিতে পারি; কেননা চিন্তা এবং গ্রন্থরচনা এ-সব অত্যন্ত আধুনিক ব্যাপার— সভ্যতার চরম সোপানে এসে মানুষের মনের বিকাশের ও পরিণতির ব্যাপার নিয়ে রসশাস্ত্র ইত্যাদি। কিন্তু এখানেও একটু কথা রয়েছে— পৃথিবীর প্রাচীনতম আর্যপূর্ব মানুষ-সমস্ত তাদের চিন্তা তাদের শিল্পকর্মে ধরা গেল। কাজেই সেই-সব তাদের অকথিত বাণী সমস্ত পড়ে নিতে হবে আজকের মানুষকে প্রাচীনতম শিল্প-নিদর্শন থেকে, অন্য উপায় নাই। এই-সমস্ত প্রাচীনতম শিল্পসামগ্রী-সকলের গঠন লিখন ও রচনের যুগে শিল্প কী, শিল্প কেন, ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা

করবার মানুষের সময়ই হয় নি, ভাষাও সৃষ্টি হয় নি, পুঁথি লেখার কৌশলও আবিষ্কৃত হয় নি। শুধু সেই-সব যুগের শিল্পীর মনের ছাপ তাদের অজ্ঞাতেই হাতের কাজে পড়ে গেছে। জলের ধারা যেভাবে বালুচরে নিজের গতিবিধির ছাপ রেখে যায়, সেইভাবে কাজ চলেছে দেখি! মানুষের নির্বাক্ অবস্থায় পাষাণ কেটে লেখা হল শিল্পের প্রথম স্তুতি! অলংকারশাস্ত্র রচনার বেলায় আচার্যগণ ধুয়ো ধরলেন যে, শিল্পরচনা-সমস্ত নিয়তিকৃত নিয়ম স্বীকার করলে না ইত্যাদি! মম্মট ভট্ট মুখে উচ্চারণ করলেন যে স্তুতি, শিল্পের ঠিক সেই স্তুতিবাক্য পুরোপুরি গঠন ক'রে, আলপনা দিয়ে কি সূচে বুনে, ধরে গেল আর্যেতর মানুষ তারা!

বিচিত্র স্বর বিচিত্র বর্ণের মণ্ডুকদের উদ্দেশে আর্য ঋষি বিচিত্র ছন্দে স্তোত্র রচনা করে গেলেন। আর দেখতে পাই, আর্যাবর্ত ছাড়িয়ে সে কত দূরে তথাকথিত অনার্য শিল্পী চিত্র দিয়ে দেওয়ালে মণ্ডূক দেবতার স্তোত্র লিখে গেল: এইরূপে— "Beneath the cloud symbols are Plumed Serpents, while a Sacred frog shooting forth lightnings stands on their protruding Tonguls."— *Mythology of all races, Vol. X. Plate XXVI., Boston, Marshallgones Co.*

এই পুস্তকেই ৭১ পৃষ্ঠায় একখানি গরুড়ের চিত্র দেওয়া হয়েছে, এই চিত্রটি তামার পাতে লেখা। এ দেশে এখানা কুড়িয়ে পেলে কোনো-এক হিন্দুরাজার তাম্রশাসন বলে আর্যশিল্পের কোঠায় পড়ে যেত।

এই উত্তর আমেরিকায় আর-একটি প্রস্তরমূর্তি এই গ্রন্থে ৬২, ৬৩ পৃষ্ঠার মাঝে দেওয়া রয়েছে, এটি হুবহু বুদ্ধ মূর্তি বলে চলে যেত যদি এ দেশে খুঁড়ে পেতেম যথা—"Human figure in stone probably representing a deity, height 21½ inches found in Baratow country, Georgia."—Plate XIII. মুদ্রা আসন সবই এ মূর্তির একটি বুদ্ধমূর্তি-সমতুল্য। কান দুটি খালি ছোটো এই তফাত। হয়তো কালে উত্তর আমেরিকার উপরে আর্যশিল্পের প্রভাব অভ্রান্তরূপে সুনিশ্চিত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ তা হয় নি ততক্ষণ আর্যেতর স্বতন্ত্র শিল্পের সত্তা না স্বীকার করে শিল্পচর্চার উপায় নেই এইটুকুই আমার বলবার কথা। এটা নিশ্চয় করে বলা যায় যে, ভারতে আর্যগণের দেখা দেবার বহু পূর্বে আর্যপূর্ব বহুতর জাতি এ দেশে বাস করছিল এবং শিল্পশাস্ত্রকারগণ যে চতুঃষষ্টিকলার ফর্দ দিয়েছেন তার মধ্যে অনেকগুলো শিল্পকলাই অন্ত্যজগণের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিল। ভারতশিল্পের অনেকখানিই বেদপূর্ব জাতিগণের তা শিল্পকলার ফর্দ থেকেই পাই, যেমন— নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাট্য, আলেখ্য, বিশেষকচ্ছেদ্য অর্থাৎ নানাপ্রকার তিলক ও উল্কি রচনা, তণ্ডুল কুসুমবলিবিকার দশনবসনাঙ্গরাগ, শয়নরচন অর্থাৎ পালঙ্কাদি নির্মাণ, উদকাঘাত, কর্ণপত্রভঙ্গ, গন্ধযুক্তি, ভূষণযোজন, কৌচুমার যোগ অর্থাৎ বহুরূপীর কার্য, চিত্রশাকপূপভক্ষ্যবিকার বা পাকপ্রণালী, পানকরসরাগাসব-যোজন, সূচীকর্ম, সূত্রক্রীড়া বা পুতুলনাচ, প্রতিমালা বা নানা বস্তুর প্রতিকৃতি নির্মাণ, পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্প, তুর্ক্‌কর্ম, তক্ষণ বা ছুতোরের কার্য, বাস্তুবিদ্যা, ধাতুবাদ, কেশমার্জন কৌশল, সম্পাট্য বা মণিকাটা, বালকক্রীড়নক-বৈজয়িকী বিদ্যা, বৈতালিকী বিদ্যা ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভারতশিল্পকে ধর্মের বা কোনো বিশেষ যুগের সভ্যতার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধভাবে দেখলেই আর্যশিল্পের মহত্ত্বকে ক্ষুণ্ন করে দেব আমরা। ধর্মবিশেষ কি শাস্ত্রবিশেষের সম্পত্তি নয় ভারতের শিল্প; বৃহৎ মানবসমাজের শিল্পের সঙ্গে তার আদান-প্রদান কিভাবে হয়ে চলল সেই দেখাই হল ভারতশিল্পকে বড়ো

করে দেখা। আর্যব্রত ও অন্যব্রতগণ -সেবিত সুবৃহৎ হিমাচলের অরণ্যানী, সেখান থেকে অপার সিন্ধুপারে বিস্তৃত দেশবিদেশের যোগাযোগের ইতিহাস নিয়ে ভারতশিল্পের ইতিহাস-চর্চার সূত্রপাত না করলে ভারতশিল্পের স্বরূপটি আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যাবে। ভারতশিল্পের যে বিরাট রূপটি আমি দেখতে পাচ্ছি সেটি এক প্রবন্ধে এক দিনে কিম্বা আমার একার দ্বারায় পরিষ্কার করে ধরা সম্ভব নয়। এখানে গুরু শিষ্য সবাই না কাজে লাগলে উপায় নেই। জহ্নুমুনির মতো এক গঙ্গা এক গণ্ডূষে ধরার দিকেও যাওয়া নয়। 'ধীরে পগ ধরো মুসাফির', ধীরে অগ্রসর হও— অল্পে অল্পে ভারতশিল্পের পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে চলো। উড়িষ্যার একটি বালক-শিল্পীর উপাখ্যান থেকে দেখাই যে, কেমন করে কিভাবে ভারতশিল্পের পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হবে।

পাকা পাকা শিল্পী সকলে কোণার্ক মন্দির ওঠাচ্ছে— বালির উপরে তুলছে তারা অটুট পাথরের দেউল, গড়া শেষ হয়, চূড়া ভেঙে পড়ে মন্দিরের, সমুদ্রের বালি গ্রাস করে বহু শিল্পীর বহু বৎসরের চেষ্টার ফল। বালক এক শিল্পী সে চলেছে মন্দিরের কাজে যোগ দিতে— মরু পার হয়ে, রৌদ্রতপ্ত পথশ্রান্ত ক্ষুধাতুর বালক গ্রামীণের ঘরে ভোজনে বসল, সামনে তপ্ত পায়সান্ন, জুড়িয়ে নেবার অবসর নেই। পাত্রের মধ্যে থেকে পায়স তুলে নিতে চায় বালক, এতে করে হাত পোড়ে। অন্নপূর্ণা গৃহিণী তাকে উপদেশ করেন, পাত্রের কিনারা থেকে অল্পে অল্পে পাত্রের মধ্যের দিকে অগ্রসর হও।*

এই রীতিতে ভারতশিল্প চর্চা করতে বলি। ঝুপ করে ভারতশিল্পের আধ্যাত্মিক অংশ ছোঁ দিয়ে তুলে ফেললেম, এতে ভয় আছে, বাধাও আছে— ধীরে অগ্রসর হওয়ায় বাধাও নেই, ভয়ও নেই। অবশ্য এভাবে চললে ভারতশিল্পের মর্মে পৌছতে সময় লাগবে, কিন্তু নারিকেলের শাঁস জলে পৌছতেও একটু সময় লাগে। একটা সামান্য বাড়ি তুলতে সময় লাগে। এটা নিশ্চিত যে, না অজন্তা গুহা না কৈলাসের দেউল কোনো কিছুই এক দিনে প্রস্তুত হয়ে উঠল। জাদুকরের আমগাছ ফুঁয়ে প্রস্তুত হয়, আর ভারতশিল্প সম্বন্ধে অব্যবসায়ীদের কতকগুলো মত ফস্ করে গড়ে ওঠে দেখেছি। কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো, যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষের চেষ্টার ফল শিল্প, কতদিন যে লাগবে তাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে তার ঠিক নেই। কালে কালে মাটির তলা থেকে প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন সমস্ত বার হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব মত সমস্ত খণ্ডিত হয়ে নতুন মত প্রচারিত হচ্ছে। এইভাবে জ্ঞানচর্চার ধারায় অদল-বদল হয়ে নানা মতগুলোর মধ্যে সিকস্তি-পয়স্তির সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং কাজটা যে সময়-সাপেক্ষ তাতে ভুল নেই। ছবি লেখাতে নিপুণতা থাকলে একটা ছবি এক আঁচড়ে শেষ করা চলে। কিন্তু যে কাজ নানা তোড়জোড়ের অপেক্ষা রাখে বহুল-চিন্তা-সাপেক্ষ যা, সে কাজে তাড়াতাড়ি করলেই নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়ে কর্ম পণ্ড হওয়ারই

---

* কোণার্ক-নির্মাণে গোষ্ঠীবদ্ধ বহু স্থপতি শিল্পী কারিগর বহু বৎসর ধ'রে কাজ করেছিল। মুখ্য স্থপতি গ্রাম ছেড়ে চলে আসার সময় তাঁর পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। ঘটনাক্রমে পুত্র জন্মালে, সে ছেলে বড়ো হলে, পিতার কাছে এল মন্দির নির্মাণের এক সংকট সময়ে। সেই ছেলেটি প্রতিভাধর-বালক-সম্ভব সহজ বুদ্ধিতে যে পরামর্শ দিয়েছিল, তারই ফলে মন্দির রচনা সুষ্ঠুভাবে সমাধা হয়। এরূপ এক গল্প উড়িষ্যায় প্রচলিত আছে। অবনীন্দ্রনাথ সেই কাহিনীরই কথঞ্চিৎ আভাস দিতে চেয়েছিলেন, এরূপ অনুমান করা যায়।

সম্ভাবনা বেশি। আমার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছে ভারতশিল্পের একটা টেক্‌স্ট্‌ বুক্‌ লিখে ফেলি তাড়াতাড়ি কলম চালিয়ে কিন্তু এ কাজের আরম্ভেই যখন দেখি যে ছত্রে ছত্রে নানা বাধা নানা ধাঁধা অতিক্রম করে যেতে হবে তখন মনের আবেগ আপনিই সংযত হয়ে আসে। কাজেই আস্তে চলাই হল আমার মতে সুবুদ্ধির কাজ।

এই একটু আগেই উত্তর আমেরিকার দুই-তিনখানি ছবি ও মূর্তির উল্লেখ করেছি। সেই তিনটির ইতিহাস আর্য অনার্য উভয় জাতির শিল্পের ধর্মের কর্মের তন্ন তন্ন হিসাবের সঙ্গে জড়ানো, উভয় জাতির মধ্যে কোনো-এক অজ্ঞাত যুগে নানা দিক দিয়ে আদান-প্রদান হয়েছিল তারি সাক্ষি দিচ্ছে এই তিনখানি কাজ। কাজেই নানা সাক্ষ্য-সাবুদ নিয়ে তবে আমাদের এই তিনটি শিল্পনিদর্শনকে বুঝে দেখতে হবে। 'ক' পড়েই প্রহ্লাদের যেমন কৃষ্ণজ্ঞান উদয় হয়েছিল তেমনি এ ক্ষেত্রেও রূপে রূপে মিল দেখে উত্তর-আমেরিকাতেও হিন্দু মিশনারির আবির্ভাব কল্পনা করে নিয়ে কাজ চুকিয়ে দিলে কোনো কাজই হবে না। তন্ন তন্ন প্রমাণ নিয়ে বুঝতে হবে এই তিনটি দেবতার রূপকল্পনা তারা পেলে আমাদের কাছ থেকে না আমরা পেলেম তাদের কাছ থেকে! ভারতশিল্পের উপরে বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমান সবাই দাবি জানাচ্ছে। তেমনি অন্ত্যব্রতদেরও একটা প্রকাণ্ড দাবি আছে। তাকে অগ্রাহ্য করা চলবে না। পল্লীশিল্পের একটা দাবি আছে শহরের শিল্পকলার সৃষ্টি রচনার ইতিহাসে, সে কথা ভুললে চলে না। ভূমির দাবি আছে নদীধারার সুনিয়ন্ত্রিত গতি-সৃজনের বেলায়, তেমনি নদীরও দাবি আছে বেলাভূমির সুশ্যাম রূপ-সৃজনের উপর। সাহারার মরুভূমিতে নদীর দাবি অগ্রাহ্য হল, সেখানে ঊষরতার দেখা পেলেম— প্রকাণ্ড শূন্যতা যার শেষ নেই। আর্যব্রত যে-সব মানুষ তাদের প্রভাব ভারতশিল্পে, অন্ত্যব্রতদের ছাপ মোটেই নেই, এমন উল্টো চশমা পরে ভারতশিল্পের তত্ত্ব-উদ্ধার-কাজে অগ্রসর হলে ভুল রাস্তায় গিয়ে পড়ব আমরা। আর্য-অনার্য-নির্বিশেষে নানা জাতির নানা সমাজের শিল্পকলা ও আচার-বিচারের ইতিহাস নিয়ে ভারত-শিল্পের চর্চার পথে চলা যাতে সুগম হয়, তার জন্য নানা দেশের পণ্ডিতগণ যে-সব গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তার একটা ছোটোখাটো ফর্দ দেওয়া দরকার। কেননা ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে বলবার সময় এই-সব গ্রন্থ থেকেই আমাকে নানা প্রমাণ তুলতে হবে :

১. *Ancient Art and Ritual*, Jane Harrison.
২. *Religion and Art in Ancient Greece*, Earnest A. Gardner.
৩. *The Childhood of Art*, Spearing.
৪. *Mythology of All Races*, Published by Marshall Jones & Co. Boston.
৫. *Natural History of Man*, J. G. Wood.
৬. *The History of Mankind*, Ratzel, Friedrich.
৭. প্রাচীন শিল্প পরিচয়— শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।
৮. অলংকার ও শিল্পশাস্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি।

কোনো ব্যক্তিবিশেষের মতামত সমর্থন করে যে-সব আধুনিক শিল্পচর্চার প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে সেগুলো থেকে খুব বেশি কিছু পাওয়া সম্ভব হবে না বলেই তাদের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। চর্চার গোড়াতেই নিজের মতামত ও অপরের মতামত একটা মস্ত বাধা হয়ে দেখা দেয়। সেই বাধাগ্রস্ত মন নিয়ে

কাজ করে চলতে ভয়ও আছে, সুতরাং মতের গণ্ডি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কাজে অগ্রসর হতে অনুরোধ করি আমি।

একটুখানি সময় নয় বহুযুগ ধরে একটির পর একটি জিনিসের উদ্‌ভাবনা পরিকল্পনা এবং নানা কৌশলে সেগুলি নির্মাণ করে তোলার হিসেব ধরে চলা চাই, তবে পাই ভারতশিল্পের সম্পূর্ণ ইতিহাস।

আর্যগণ এসে উপস্থিত হলেন যখন, ভারতে তার পূর্বে শিল্পকলার উদ্‌ভাবনা ও উৎকর্ষের খবর না নিয়ে আর্য সভ্যতার অভিযান থেকে যদি ভারতশিল্পের চর্চা শুরু করা যায়, তবে শিল্প-ইতিহাসের প্রাচীনতম অংশ বাদ পড়ে যায় এবং পঞ্চম অঙ্ক থেকে নাটক দেখতে আরম্ভ করার মতো কাজ হয়।

কলাকৌশল-সমস্তের আবিষ্কার নানা শিল্পসামগ্রীর উদ্‌ভাবনা ও রচনার সূত্রপাত হয়ে গেল। অগ্নি-দেবতার কথা দূরে থাক্‌ অগ্নির সাক্ষাৎই পায় নি যখন মানুষ তখন থেকে এটা প্রমাণ করছে মানবজাতির ইতিহাস; সকল দেশের সকল শিল্পের গোড়ার কথাই এই— কলাকৌশল-সমস্ত উদ্‌ভাবনার যুগ হল প্রাগৈতিহাসিক যুগগুলো— যার এক সীমানায় পাষাণযুগ অন্য সীমানায় আর্যগণের আবির্ভাবের কাল ও তার পরবর্তী যুগ কয়টা রয়েছে দেখি।

মানবজাতির ইতিহাস যতই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠছে ততই দেখতে পাচ্ছি যে নানা কলাকৌশলের উদ্‌ভাবনা পড়ে যায় প্রাগৈতিহাসিক আমলে। ঐতিহাসিক আমলে পড়ে এই-সমস্ত কলাকৌশল দিয়ে উৎপন্ন শিল্পসামগ্রীর পরিষ্কৃতি পরিচ্ছন্নতা এমনি সব ব্যাপার।

সেই স্মরণাতীত কালের মানুষ তারা যে-সব কলাকৌশল আবিষ্কার করলে তাই নিয়েই কারবার চলল আজকের দিনের শিল্পজগতে; সেই পাষাণযুগে যে উপায়ে মানুষ পাথর কেটেছে একটি হাতুড়ি প্রস্তুত করে নিতে— সেই উপায় সেই প্রণালী প্রকরণ ধরে আজও কাজ করছে তাবৎ দেশের মূর্তিকার। সভ্যতায় হয়তো পাষাণযুগকে ছাড়িয়েছে মানুষ, কিন্তু কারুকৌশলের বেলায় পাষাণযুগকেই স্বীকার করছে আজকের মানুষের আর্ট!

দ্বিতীয় প্রস্তাব

আমাদেরই এক কবি বলেছিলেন— "চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান" সে কথা আজ টিকল না, তেমনি যাদের বৈদিক ঋষিরা বলে গেলেন দাস দস্যু বর্বর ইত্যাদি, আর্যসভ্যতা সেই-সব প্রাক্‌-আর্য অবস্থার মানুষের কাছে যে নানা আচার-ব্যবহার ও শিল্পকলা বিষয়ে ঋণী— এই কথাই সপ্রমাণিত হতে চলল নানা পণ্ডিতের মতামত নানা তথ্যানুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে।

"Now-a-days the savage has become meterial···for scientific observation··· in order that by understanding his behaviour we may understand, and it may be better our own."— Jane Harrison, *Ancient Art and Ritual.*

বেদের মধ্যে আর্যপূর্ব ভারতবাসীদের একটু একটু খবর ধরা রয়েছে, আর্যপূর্ব শিল্পের কথা সেই-সঙ্গে অল্পস্বল্প পাই, কিন্তু শিল্পচর্চার পক্ষে সেটুকু খবর যথেষ্ট নয়। তার চেয়ে বেশি পাই আমরা anthropology এবং ethnography (নৃকুলতত্ত্ব, জাতি-বিজ্ঞান) নিয়ে যাঁরা চর্চা করছেন আজকের দিনে তাঁদের কাছ থেকে। মানুষের আদিমতম অবস্থার থেকে আরম্ভ করে নানা শিল্প-কৌশলের উদ্‌ভাবনা

আস্তে আস্তে কেমন করে হল তার খবর বিজ্ঞানের কোঠায় ধরা। বৈদিক ঋষিরা সেকালে আর্যেতর ও আর্যপূর্ব ভারতের বাসিন্দাদের সম্বন্ধে নানা কথা বলে গেছেন এবং আজকের ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্‌গণ নানা বনচর অসভ্য বর্বর জাতিগণের আচার-ব্যবহার ও শিল্পকথা সম্বন্ধে বহু কথা বলছেন— এই দুই দিকের কথা বিচার করে দেখলে দেখি যে, তাবৎ আর্যেতর জাতিগণের সম্বন্ধে বৈদিক ঋষিরা অনেকখানি প্রতিকূল সমালোচনা করে গেছেন— ঋষিরা বললেন এরা দস্যু এরা দাস এদের ধর্ম নেই কর্ম নেই এরা নিপাতের যোগ্য ! "হে বজ্রধারিন্ (আমাদিগের স্তুতি) অবগত হইয়া দস্যুর প্রতি অস্ত্র (নিক্ষেপ কর) ; হে ইন্দ্র। আর্যগণের বল ও যশ বর্ধন কর।

> "হে অগ্নি ! তুমি ঘৃতের দ্বারা আহুত ও দীপ্যমান ; আমাদিগের বিদ্বেষীগণ রাক্ষসের সহিত যুক্ত হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে দহন কর।"— রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋগ্বেদ

কিন্তু আজকের ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই সকল অর্ধসভ্য অসভ্য জাতিগণ সম্বন্ধে আলোচনা কী উদার ও নিরপেক্ষভাবে করে চলেছেন তা দেখব :

Anthropologists who study the primitive peoples of today find that the worship of false gods, bowing 'down to wood and stone' bulks larger in the mind of the hymn-writer than in the mind of the Savage.— J. Harrison, *Ancient Art and Ritual.*

আমার 'বাংলার ব্রত' বলে বইখানাতে ভারত-প্রবাসী আর্যগণের এবং ভারত-নিবাসী আর্যেতর জাতিগণের নানা বার ব্রত নৃত্যনাট্য ও চিত্র-কলাদির যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করেছি ; সুতরাং সে-সব কথার পুনরাবতারণা করা নিষ্প্রয়োজন, শুধু এইটুকু বলতে চাই যে শিল্পের ইতিহাসে আর্য-ভারত ছাড়াও আর্যপূর্ব-ভারতের একটা শিল্পকলার অস্তিত্বের অভ্রান্ত প্রমাণ-সমস্ত যখন পাচ্ছি তখন বৈদিক আমলটাতে শিল্পকলার উদ্‌ভাবনার সূত্রপাত হল ঠাউরে নিয়ে বসে থাকা চলে না। ভারতের সব প্রাচীন মন্দির বিশ্বকর্মার গড়া— এর মূলে যতটা সত্য আর্যসভ্যতার দান হল শিল্পকলা এরও মূলে ততটাই সত্য। জানা ছিল খৃস্টপূর্ব আন্দাজ ৩২৭ বৎসরের ওধারে ভারতশিল্পকলার নমুনা দৃষ্টিগোচর হয় না এবং প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌দের ভারতশিল্পচর্চা এই একটুখানি গণ্ডির মধ্যে নড়াচড়া করছিল বহুদিন ধরে, অল্পদিন হল একটা অতি পুরাতন নগরের পত্তন ভারতের মাটির তলা থেকে খুঁড়ে পাওয়া গেল এবং সেই থেকে এক ধাক্কায় ভারত-শিল্পকলার ইতিহাসের গণ্ডি খৃঃ পূঃ সাড়ে তিন হাজারে গিয়ে পৌঁছল। এমনি গণ্ডির পর গণ্ডি টানতে টানতে যে-সমস্ত বিরাট যুগ ধরে মানুষ চতুঃষষ্টিকলার একটির পর একটির উদ্‌ভাবনা করে চলল শকাব্দ কি খৃস্টাব্দের সন-তারিখের মাপকাটি দিয়ে তাকে মেপে দেখার উপায় নেই। পাথর কাটতে জানলে মানুষ, বেতের বুনুনি করতে পারলে, মাটি দিয়ে গড়ল, সুতো দিয়ে বস্ত্র বুনলে, আগুনকে ধরে লোহা পোড়ালে, ভাত রাঁধলে, পিদুম জ্বালালে, বাঁশ নিয়ে ছৈ বাঁধলে, মনপবনের কাঠ কাকে বলে জানে না, অথচ সেই কাঠের নৌকোতে দ্রুতগতি নৌ-বহর রচনা করে দিগ্‌বিজয়ে বার হয়ে গেল— এই-সব কাণ্ড যখন দেখছি ঘটে গেল সুসভ্য হয়ে ওঠার অনেক আগে, তখন কেমন করে বলি সভ্যতার উৎকর্ষ আর শিল্পের উৎকর্ষ সমসাময়িক ? পণ্ডিত Ruskin এক গ্রীক শিল্প ছাড়া জগতে আর-সব শিল্পকে বর্বরতার ফল বলে নির্দেশ করেছেন, গ্রীকশিল্পের সম্বন্ধে পক্ষপাত করতে গিয়ে পণ্ডিত মস্ত একটা সত্য কথা বলে গেলেন— তাবৎ

কলা-কৌশলের উদ্‌ভাবনার মূলে রয়েছে মানুষের তথাকথিত বর্বর অবস্থা তাতে কোনো ভুল নেই, গ্রীসের বেলাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হল না এই সত্যটুকু কেমন করে রস্কিনের মতো পণ্ডিতের ধারণাতীত রয়ে গেল তা বুঝি নে! আদিম এবং আধুনিক মানুষের অবস্থার তারতম্য দিয়ে শিল্পের ইতিহাস প্রধানত দুই কাণ্ডে ভাগ করা চলল— জিগীষার যুগ আর জিজ্ঞাসার যুগ। শিল্পকলার উৎপত্তি হল এই জিগীষার যুগে। মানব-ইতিহাসের পূর্ব খণ্ড— সেখানে ভাষাহীন নিরগ্নিক গুহাবাসী মানুষকে দেখি প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি নিয়ে নিজের আলস্য অক্ষমতা এই-সবকে জয় করে জলঝড় ইত্যাদির এবং নানা অতিকায় ভীষণ বন্যজন্তুর উপরে জয়লাভ করতে যাচ্ছে— জ্ঞান পিপাসা তখনো জাগে নি শুধু কর্মঠ দেহের প্রচণ্ড স্ফূর্তি নিয়ে মানুষ পাথরকে তার আত্মরক্ষা এবং পরকে হনন করবার উপযুক্ত অস্ত্র-রূপ দিয়ে চলেছে। পাষাণ যুগের প্রথমাবস্থায় মানুষদের হাতে প্রস্তুত কঠিন পাথরে কাটা নানা অস্ত্রগুলো লক্ষ্য করে দেখলে তখনকার দিনের মানুষ সংসার-যাত্রার আরম্ভেই কী প্রচণ্ড বিক্রম আর অদম্য উৎসাহ নিয়ে পাথরকাটার কৌশল দখল করতে চলেছে তা বোঝা যায়।

আজকের মূর্তিকার বিলাত থেকে পাথর কাটা শিখে এসে মোমবাতির মতো সহজে কাটা যায় এমন পাথর নিয়ে ভাস্কর্যবিদ্যার উন্নতির কারবার শুরু করে দেয়, কঠিন থেকে কঠিন চকমকি পাথর সেটা কেটে কিছু গড়ে তোলার দিকেই যেতে চায় না। কিন্তু পাষাণ যুগের মানুষের নরম পাথর নিয়ে কাজ চলে নি, সুকঠিন চকমকি পাথরকে সুতীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র করে নিয়ে নানা অস্ত্রে মূর্তি গড়তে হয়েছিল সেই প্রথম কারিগরদের। ভাস্কর্যবিদ্যার শক্ত অংশ হল পাষাণখণ্ডের প্রকৃতিগত কঠিনতা এবং ভঙ্গুরতা বুঝে তবে তাকে ভেঙে চলা, এই কৌশলটুকু না জেনে পাথর কাটতে চললে পাথর ভাঙাই সার হয়, পাথরে গড়া হয়ে ওঠে না কিছুই। আজকের দিনে রেলের কুলি, জেলখানার কয়েদী যেভাবে পাথর ভাঙে সেভাবে কাজ করে নি পাষাণ যুগের আর্টিস্টরা। তারা পাথরের নানা অস্ত্র গড়েছিল সুকৌশলে শান দিয়ে মাঠাম্ করে। কাজের উপযুক্ত একটুকরো পাথর পাষাণ যুগে হীরার চেয়ে মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য ছিল মানুষের কাছে, বুঝেসুঝে তাকে গঠন দিতে না গেলে চলতই না সেকালে। কাজেই সেকালের মানুষকে প্রথম থেকেই পাকা রকমে কঠিন থেকে কঠিন পাথর কাটার কৌশল-সমস্ত সাবধানচিত্তে দখল করতে হয়েছিল। ভারতবর্ষের ভাস্কর্য-বিদ্যার আরম্ভকাল বড়ো বড়ো ঐতিহাসিকরা গ্রীক অভিযান থেকে আরম্ভ করতে চলেন, কিন্তু মহামানবের ইতিহাস বলে— পাষাণ দিয়ে কিছু রচনা করার প্রধান কৌশলটি পাষাণ যুগের মানুষের কাছ থেকে পূর্ব-পশ্চিমের সব সুসভ্য জাতি পেয়েছে— সুকঠিন পাথরকে পানের আকার, ছুরির ফলার আকার, হাতুড়ির আকার, করাতের আকার, নিষ্কোণ সকোণ আকার সবই দিয়ে চুকল যখন মানুষ, তার অনেক পরে এল গ্রীসের ভাস্কর ভারতের ভাস্কর ইজীপ্তের ভাস্কর অপেক্ষাকৃত নরম পাথরে দেবমূর্তি কাটতে, দেবমন্দির খাড়া করতে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মোটামুটি মানুষের জীবনযাত্রার ইতিহাসকে দুই ভাগে ধরেছেন যথা—Stone age বা পাষাণ যুগ আর Age of metals বা ধাতব যুগ। পাষাণ যুগটার দুটো বিভাগ পণ্ডিতেরা করেন যথা—"Epoch of Extinct species of animals of the Great Bear and Mammoth." আর "Epoch of the Raindeer or the migrated animals."— Louis Figuer, *Primitive Man*. এমনি age of metals তারও দুই বিভাগ— Bronze Epoch মিশ্রধাতু এবং Iron Epoch বা লৌহ যুগ।

দেশকালপাত্র-ভেদে এই যুগ বিভাগে খানিকটা এদিক ওদিক ঘটে, কিন্তু দেখা গেছে যে শৈশব অবস্থায় সব দেশের সব ছেলেমেয়েই যেমন অনেকটা সমভাবাপন্ন থাকে, আদিম অবস্থায়ও সব দেশে মানুষ অনেকটা একভাবে রয়েছে। পাষাণ যুগের শুরুতে মানুষ হল অতিকায় ঋষভ এবং ঐরাবত প্রভৃতির সমসাময়িক। পর্বতগুহায় তখন মানুষ সংকটাপন্ন জীবন যাপন করছে, নোড়ানুড়ি পাথর এই তখন তার হাতের কাছে ধরা, তাই দিয়ে সে নানা প্রহরণ গড়ে চলল আত্মরক্ষার জন্য, শিল্পকর্মের দিক দিয়ে তার প্রথম চেষ্টা হল পাথর কাটার কৌশল অবগত হওয়া। প্রস্তর খণ্ডকে কাজের উপযুক্ত মনোমত রূপ দেওয়া যে শিল্পী নয় তার দ্বারা আজও যেমন সম্ভব নয়, সেদিনেও এ নিয়মের অন্যথা হয় নি। পাষাণ যুগের ওস্তাদ শিল্পী তার শক্তির কাছে কঠিনতম পাথরকেও হার মানতে হল ; এই পাথর কাটার কাজ কিভাবে প্রথম শিল্পীরা সুসম্পন্ন করে চলল তার কথা বলি—"The question is often asked how these primitive men were able to manufacture their weapons implements and utensils on uniform models without the help of metallic hammers."

লোহার হাতুড়ি ছেনি করাত কিছুই নেই অথচ পাথর কাটা হল কেমন করে সম্ভব, এর জবাবে এক ইউরোপীয় পণ্ডিত পাথর দিয়ে পাথর কেটে তর্কের সমাধান করেন—Mr. Evans an English Geologist, replied most successfully to this objection by a very simple experiment. He took a pebble and fixed in wooden handle ; having thus manufactured a stone hammer, he made use of it to chip a flint little by little untill he succeeded in producing an oval hatchet, similar to the ancient one which he had before him. —L. Figuier, *Primitive Man.*

এইভাবে পাথর কাটা থেকে আরম্ভ করে পাথরের ছিল্‌কা থেকে ছুরি চাঁচনি তীরের ফলা হাতুড়ি করাত ইত্যাদি নানা অস্ত্রশস্ত্র গড়ে গেল মানুষ। অবশ্য একদিনে মানুষ এ কাজে পাকা হয়ে ওঠে নি। মোটামুটি রকমে পাথর কাটা থেকে চমৎকার করে পালিশ করা পাথরে করাত ছুরি সমস্ত গড়তে যুগ যুগ কেটে গেছে মানুষের, বললে ভুল হয় না। প্রস্তর যুগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখি মানুষ সুনিপুণ হয়ে উঠেছে পাথর দিয়ে সুতীক্ষ্ণ সুপরিষ্কৃত সুডৌল সমস্ত অস্ত্র করাত, সুচ ইত্যাদি গড়তে। এই-সব অস্ত্র নিয়ে সে চামড়ার কাপড় সেলাই করছে এবং হরিণের শিং ও অপেক্ষাকৃত নরম পাথরে নানা চিত্রকর্ম করছে। বাণের একটা নাম 'শিলীমুখ', পাথর কাটা যন্ত্রাদিকে বলা হয় আজও 'শিলাকুট্টক'। দুই থামের মাথার কাঠের পাড়কে এবং দুয়োরের গোব্‌রাটকে বলে শিলা। আজকের ভারতবাসীর ঘরে ঘরে শিল নোড়া জাঁতা প্রস্তর যুগের গৃহস্থালীর কথা মনে পড়িয়ে দিতে রয়েছে। লর্ড ক্লাইবের আমলেও কামানের গোলা হত নোড়া দিয়ে তৈরি, আজও মার্বেল খেলার সরঞ্জাম পাথরে হয় প্রস্তুত এবং কোল্ ভীল তারা পাথরের গুলতি দিয়ে বাঘ মারে এবং ইস্কুলবয়রা বানর তাড়াতে পাথর ছোঁড়ে। এখন আমরা লৌহ যুগে রয়েছি—কিন্তু পাষাণ যুগকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে দিতে পারি নি। শিল নোড়া এমনি অনেকগুলো জিনিস সেই পাষাণ যুগের মতোই করে গড়ে চলেছি— পাথর কাটছিও সেই অতি পুরাতন কৌশলে। এমনি হাতের শাঁখা আয়তীর লোহা, হাঁড়ি কুঁড়ি কত কী-তে পুরাতন যুগকে স্বীকার করছি আমরা। পাষাণ যুগের প্রহরণ এবং কাজের একটা নোড়ানুড়ি শিল আর্যসভ্যতার যুগে এসে আস্তে আস্তে কীভাবে পূজার্হ হয়ে উঠছে—

যখন দেখি তখন আর্যপূর্ব শিল্প প্রধানত যে কর্মাশ্রয়া আর যাকে বলি আর্যশিল্প তা ধর্মাশ্রয়া, সেটা পরিষ্কার ধরা পড়ে যায়। জিগীষার অবস্থায় প্রথম মানুষ পাথরকে নিজের কর্মের সহায় জেনে তাকে কাজের উপযোগিতা অনুপযোগিতা হিসেবে রাখছে বা পরিত্যাগ করছে সে পাথরে মন্দির মূর্তি গড়ে পাথরকেই পুজো দিতে বসছে না— নিজের কলা-কৌশলের দ্বারায় পাথরকে ছেদন করে বিদ্ধ করে কাজের উপযুক্ত রূপ দিয়েই খুশি হচ্ছে— The Savage is a man of action. জিগীষার উদ্যম তাকে শিল্পকর্মে নিযুক্ত করছে, কর্মাশ্রয়া কলার সৃষ্টি করছে তখনকার মানুষ। এই কর্মী অবস্থায় মানুষ ঘর বাড়ি অশন বসনের সকল ব্যবস্থাই করে চলেছে— দেখা যায়, পাষাণ দেবতার জন্যে মন্দির গড়ছে না তারা, কিন্তু নিজের বসবাস যাতে নিরাপদ হয় তার জন্যে গুহা প্রস্তুত করছে। এখন অজন্তা ইলোরা গুহা রচনার মূলে যে কারণ পাষাণ-যুগের গুহা রচনার বেলাতেও সেই একই কারণ, এ কথা কে বলবে। নোড়া আছে কিছু নিপীড়নের জন্য, নোড়াকে যে স্তুতি করতে হয় পুজো দিতে হয় এটা নেই পাষাণ যুগের গৃহস্থের মনে। কোন্ যুগে মানুষের শিল্পসৃষ্টি কেমন রূপ ধরেছে তার একটা চুম্বক বিবরণ নেওয়া দরকার শিল্পচর্চার গোড়াতেই।

খৃস্টপূর্ব ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার বৎসরে ফেলেছেন পূর্ব পাষাণ যুগ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ। এ সময়ে পাথর কেটে অস্ত্রশস্ত্র এবং মাটির ভাঁড় ইত্যাদি রৌদ্রতাপে শুকিয়ে গড়ছে মানুষ।

খৃস্টপূর্ব ৩৫০০০ পঁয়ত্রিশ হাজার বৎসরে হল উত্তর পাষাণ যুগ, এসময়ে সুপরিষ্কৃত সুমার্জিত পাথরের অস্ত্র, পাথর খোদাই এবং চিত্রকর্ম করতে পাকা হয়েছে মানুষ।

খৃস্টপূর্ব ১৫০০০ পনেরো হাজার বৎসর হল আরণ্যক যুগ— এ সময়ে জলে স্থলে ঘর বেঁধেছে জাল বুনেছে বেত বুনেছে চাষবাসও শুরু করেছে মানুষ।

খৃস্টপূর্ব ১০০০০ দশ হাজার থেকে আরম্ভ করে ১৯২০ বৎসর হল ধাতব যুগ, এই সময়ে মানুষ গ্রাম-নগরাদিতে বসবাস শুরু করেছে। দলে দলে মানুষ এই সময়ে সাম্রাজ্যের স্থাপনে মন দিয়েছে, নানা জাতি নানা ধর্মমত দেখা দিয়েছে, নানা সামাজিক প্রথা নানা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

পাষাণ থেকে ধাতব যুগ অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব আন্দাজ ৫০০০০ থেকে ১২০০০ বারো হাজার বৎসরের মধ্যে দেখা যায় যে কারুশিল্পের নানা কৌশল জ্ঞাত হয়ে শিল্পকর্ম করে চলেছে মানুষ।

H. G. Wells তাঁর *Outline of History*-তে পুরাযুগের বিভাগ দিলেন, যথা—

1. An Early palaeolithic age (পূর্ব পাষাণ যুগ) of vast duration.
2. A Later Palaeolithic age (উত্তর পাষাণ যুগ) that lasted not a tithe of the time.
3. The age of cultivation which began 10,000 or at most 12,000 years ago, of which Neolithic period is the beginning and which is still going on.

যাযাবর বা নিবাসিন্দা অবস্থা ছেড়ে মানুষ যখন গ্রামনগর পত্তনের কাজে লেগেছে সেই সময়ে আমরা ভারতে আর্যগণের দেখা পাই। উত্তরাধিকার হিসেবে বৈদিক আমলের সাগ্নিক মানুষরা পূর্ব যুগ থেকে যেমন অগ্নি-উৎপাদনের কৌশল, যেমন, কর্ষণবিদ্যা এবং ভাষাকে পেয়েছিলেন, তেমনি কলা-কৌশলকেও লাভ করেছিলেন — এটা সহজ সত্য, তর্কের অবসর এখানে নেই। কেননা, প্রাক্-আর্য অবস্থার মানুষদের শিল্পকলার নিদর্শন-সমস্তের নানা সংগ্রহ নিয়ে নানা আলোচনা ও সচিত্র পুস্তক প্রকাশিত হয়ে শিল্পকলার

উৎপত্তির কাল সম্বন্ধে আমরা অনেকখানি নিঃসন্দেহ হয়েছি। কাজেই আর্যপূর্ব এবং তথাকথিত প্রাক্-সভ্যতার শিল্পকলার মোটামুটি একটা তালিকা প্রস্তুত করা এখন সহজ হল।

পাষাণ যুগ পূর্বভাগ: পাথর কাটার কৌশল এবং পাথর থেকে নানা অস্ত্রের নির্মাণ-জ্ঞান এইসময়ে নানা মাটির পাত্র রৌদ্রতাপে শুষ্ক করে নেবার চেষ্টাও করে চলেছে মানুষ দেখি। একদিকে কঠিন পাথর, আর-একদিকে নরম কাদা; একদিকে পুরুষের ব্যবহারের নানা প্রহরণাদি পাষাণে গড়া, আর-একদিকে নারীর হাতে গড়া পাকস্থালি ইত্যাদি— এ-সব আবিষ্কৃত হয়েছে পাষাণ যুগের মানুষের গুহা থেকে :··· in 1835 Mr. Joly found in the cave of Nabrigas (Loze´re) a skull of the great Bear pierced with a Stone arrow-head··· by the side of this Skull were also discovered fragments of Pottery on which might still be seen the imprint of the fingers which moulded it.— L. Figuier, *Primitive Man*.

এই যখন অগ্নিকে সহায় রূপে পায় নি, কেবল সূর্যতাপে মাটির ভাঁড় কোনো রকমে শুকিয়ে নিয়ে কাজ চালিয়ে দিচ্ছে পূর্বতম শিল্পীরা, এই সময় থেকে কুমোরের চাক্ এবং পোড়া মাটির বাসনে গিয়ে পৌছতে সময় লেগেছিল মানুষের। কিন্তু এই অতি পুরাতন যুগে মানুষ প্রতিমা-শিল্পের দুটো মস্ত কৌশলের উদ্‌ভাবন করলে— যে মাটির পিদুম ঘরে জলছে আজও তারি নির্মাণে পূর্ব সূচনা দেখতে পাই, যে পাকস্থালি মানুষের ক্ষুধার অন্ন বণ্টন করবে তার নির্মাণের প্রারম্ভ দেখি এই সময়ে। এমন-কি, যজ্ঞ ও হোমের যে অগ্নি তারও স্থাপনের পূর্ব-সূচনা পাই পাষাণ যুগ আর তার পরবর্তীকালের ইন্ধন নির্মাণের কৌশলে।

এর পরে এল পাষাণ যুগের উত্তর ভাগ— এখানে অতিকায় জন্তু সমস্ত ক্রমে লোপ পেয়ে গেল, রঙ্কু মৃগ যূথ এসে দেখা দিলে মানুষের সহচর জীব হিসেবে, এখানে পৌছে মানুষ অগ্নিকে সহায় রূপে পেয়েছে দেখি— উনুন ধরিয়েছে মানুষ, গুহার এক অংশে রন্ধনশালা বসিয়েছে সে। এই-সব রন্ধনশালায় মাছের কাঁটা জন্তুর হাড় এবং শামুক ইত্যাদি জাতীয় জীবের খোলা পাওয়া গেছে। এই সময়ের শিল্পকলার মোটামুটি তালিকা দিতে পারি— পাথরের উপরে চমৎকার পালিশ দিতে শিখেছে মানুষ হাঁড়িকুঁড়ি পুড়িয়ে নিতে শিখেছে, জাল বুনতে শিখেছে, সূচিকর্ম করে চামড়ার কাপড় করে নিচ্ছে— শিল নোড়া দিয়ে পেষণী প্রস্তুত করেছে, পশু পালন করছে— পাথর গরম করে তাতে তাওয়া দিয়ে রুটি গড়ছে এবং লতা পাতা দিয়ে ধামা চুবড়ি এও কিছু কিছু প্রস্তুত করছে এবং অল্পস্বল্প চাষের কাজও আরম্ভ করেছে! এই সময়ের শিল নোড়া Fig. 124 ও পালিশ করার শিলপাট Fig. 108 দুখানির ছবি Figuier সাহেবের লিখিত *Primitive Man* নামে পুস্তকের ১৫৪ এবং ১৭০ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে— ঠিক এখনকার শিল নোড়া আর শিলপাট খানি! গাছের গুঁড়ি আগুনের সাহায্যে পুড়িয়ে নৌকার খোল প্রস্তুত করে নিচ্ছে মানুষ তারও কথা বলছেন পণ্ডিতেরা এবং এইখানে মানুষ পাথরের উপর মাটির উপর রেখাপাত করে চিত্রকর্ম শুরু করেছে, তারও নিদর্শন পাওয়া গেছে। গুহাবাসী এই-সব মানুষের চিত্রকর্মের নমুনা চোখে না দেখলে চিত্রকলা বিষয়ে তারা কতখানি অগ্রসর হল বোঝা কঠিন, তবে এই সব গুহাবাসী আদিম মানবদের শিল্পকলার চিত্রাদি দিয়ে বই-সমস্ত এখন প্রকাশিত হয়েছে— তার মধ্যে একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ হল "Childhood of Art" by Spearing। এই পুস্তকে প্রাচীনতম অবস্থা থেকে ক্রমে কি ভাবে নানা কলাবিদ্যা আয়ত্ত করতে করতে মানুষ আধুনিক

কালে এসে পৌছল, তার ইতিহাস চমৎকার করে লেখা হয়েছে, এ ছাড়া বিশেষজ্ঞদের লেখা আরো বই সবগুলিই প্রায় সচিত্র, তা থেকে দেখি যে শিল্পকলা বিষয়ে উন্নতির ধারা দেশকালপাত্র-ভেদে কোথাও দ্রুত গতি কোথাও মন্দ গতিতে চলল। হয়তো পশ্চিমের মানুষ এক বিষয়ে অগ্রসর হয়েছে, পুবের মানুষ সেই বিষয়ে তখনো পিছিয়ে আছে। শিল্পজ্ঞান বিষয়ে এই ভাবের তারতম্য বরাবরই মানব-ইতিহাসে দেখা যায়— যে সময়ে এ দেশে অজন্তাগুহার চিত্রাবলী রচিত হল, ইউরোপে শিল্পীরা সেই সময়ের চিত্রকলা বিষয়ে অনেক পিছিয়ে আছে দেখা যায়। আবার দেখি পাষাণ যুগে ইউরোপের প্রাচীন অধিবাসী তারা অদ্ভুত রকমে সুন্দর সমস্ত জীবজন্তুর ছবি কয়লা আর গৈরিক দিয়ে লিখে গেল, কিন্তু ভারতবাসী তৎকালীন মানুষদের লেখা ছবি প্রায় কচি ছেলের আঁকার অবস্থায় রয়েছে কিন্তু। পাথরে গড়ার দিক দিয়ে কেউ অধিকতর পাকা হয়ে উঠেছে কেউ চিত্রকলার দিক দিয়ে, এমনি সব তারতম্য থাকা সত্ত্বেও দেশ-বিদেশ-নির্বিশেষে এক-এককালের আদিম মনুষ্যদের নানা রূপ-কল্পনা রঞ্জন বয়ন নৃত্যগীতাদির ধরন-ধারণে একটা মিল দেখা যায়। কাজেই শিল্পজ্ঞান আদিম মানবের সাধারণ সম্পত্তি বললেও বলা চলে। অগ্নি উৎপাদনের কৌশল আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ পাথর কাটাতে পাকা হয়ে উঠল। যে শিল-নোড়ায় আর্য ঋষিগণ সোমরস নিপীড়ন করতেন, যে শিল-নোড়ায় রাঁধুনী গিন্নি খৃঃ ১৯২৯, ২৭ ফেব্রুয়ারির বাটনা বাটলেন তার গঠন দিয়েছে পাষাণ যুগের শিল্পী। মানবশিল্পীর হাতের প্রথম স্পর্শ পেলে পাথর মাটি কাঠ শৃঙ্গ অস্থি চর্ম এবং এই-সব বস্তু নিয়ে নানা শিল্পকর্ম করে চলল মানুষ এ দেশে সে দেশে, পাষাণ যুগের প্রারম্ভ থেকে রাঙ্কব যুগ পর্যন্ত। এ দেশে সে দেশে এখনো দেখা যায় এক-এক শ্রেণীর কারিগর— কুমোর কামার ভাস্কর কাঁসারী ইত্যাদি— আপন আপন কলাকৌশল পুরুষানুক্রমে ধরে রয়েছে, এইভাবে পাষাণ যুগের পূর্ব অবস্থায় যে-সব কলা কৌশল উদ্ভাবিত হল তার উত্তরাধিকার উত্তর-পাষাণ যুগের মানুষরা পেয়ে গেল এবং এইভাবে পুরুষ পরম্পরা ধরে কলাকৌশলে সুপটু হবার সুযোগ পেয়ে মানুষ ক্রমেই সমৃদ্ধিকে লাভ করতে চলল শিল্পের দিক থেকে। এটা লক্ষ্য করেছেন পণ্ডিতেরা যে পূর্ব-প্রস্তর যুগ আর উত্তর-প্রস্তর যুগ দুটোর মাঝে ভীষণ তুষারপাত হয়ে এমন একটা খণ্ড-প্রলয় ঘটে গেছে পৃথিবীতে যে জল স্থল সমুদ্র ওলট পালট হয়ে জীবজগতে উদ্ভিদ জগতে, এমন-কি, নানা ধাতুর গতিবিধি ও আবহাওয়াতেও বদল ঘটে পৃথিবী নতুন আকার ধারণ করেছে। কিন্তু মানুষ উত্তর-পাষাণ যুগে যখন এসে পড়ল শিল্পকলাকৌশলের প্রয়োগের দিক দিয়ে তাকে আর নতুন করে হাতে-খড়ি দিতে হল না পাথর কাটায়, পূর্ব যুগের মতো সেও পাথরে গড়লে কাঠে কাটলে নানা সামগ্রী কিন্তু আগেকার যুগের চেয়ে অধিকতর নিপুণ ও সুন্দর ভাবে সুপরিষ্কৃত সুপরিচ্ছন্ন করে! একটা খণ্ড-প্রলয় হল অথচ মানুষকে শিল্পকলাবিষয়ে প্রলয়ের পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে শিল্পকর্ম আরম্ভ করতে যাকে বলে কেঁচে পত্তন দিতে হল না— যেখানে পূর্বতন যুগ থামল এসে তার পর থেকে আরম্ভ করলে কাজ পরের মানুষেরা। এ কী আশ্চর্য কাণ্ড মানবশিল্পের ইতিহাসে ঘটল যে একটা খণ্ড-প্রলয় টপ্‌কে পূর্বপুরুষদের শিল্পপ্রকরণ উত্তর পুরুষে এসে বর্তালো এবং সেখান থেকে নতুন নতুন রীতি ধরে ক্রমেই মানবশিল্প উৎকর্ষ লাভ করতে চলল। এটা দেখা গেছে যে মানুষ সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হয়ে স্মৃতি ও দৈহিক শক্তি হারিয়ে আবার নতুন করে কথা বলতে শিখছে, খেতে শিখছে, পরতে শিখছে, কিন্তু একি রহস্য যে পাষাণ-যুগের খণ্ডপ্রলয়ে অতিকায় জন্তু সমস্ত লোপ পেলে জল স্থল উলটে পালটে গেল, পাষাণ যুগের মানুষের চিহ্ন

মাত্র রইল না, তুষারের তলায় চাপা পড়ল মানুষ ও তাদের যা-কিছু সবই কেবল তার কলাকৌশলের ধারাটি অব্যাহত ভাবে উত্তর-পাষাণযুগে মানুষের কাছে এসে পৌছল। উত্তর-পাষাণ যুগের শিল্পীকে আর নতুন করে পাথর কাটার কৌশল আবিষ্কার করতে হল না, সে পাথর কাটায় পাকা হয়েই যেন দেখা দিলে মস্ত একটা খণ্ড-প্রলয়ের পরে।

ভ্রূণাবস্থা অতিক্রম করতে হয় জীব মাত্রকে, বাপ চলে গেল কিন্তু বাপ যেখানে তার শিক্ষা দীক্ষা বা কাজকর্ম অসমাপ্ত রেখে গেল সেখান থেকে যে ছেলে এসে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করে চলল— এমন ঘটনা ঘটতে পারেই না জীব-জগতে। বুড়ো গাছ গেল তারি বীজ চারা-অবস্থা থেকে আবার উদ্‌ভিন্ন হয়ে উঠে চলল আলোর দিকে, কিন্তু মানুষের শিল্প পূর্বাপর অবাধ গতিতে ক্রমে ক্রমে মহোৎকর্ষ লাভ করে চলল খণ্ড-প্রলয়ের বাধা না মেনে! শিল্পের অব্যাহত গতিতে বাধা দিতে পারলে না একটা খণ্ড-প্রলয়, পূর্ব-পাষাণ যুগ শিল্পের আদি পর্ব যেখানে রাখলে ঠিক তার পরের মানুষ এসে আর আদিপর্ব না খুলে পরের পর্ব খুলে বসল শিল্প-ইতিহাসের! কী করে পাথর কাটতে হয়, মাটি দিয়ে গড়তে হয়, মোটামুটি শিল্প-কৌশলের এইটুকুখানি আবিষ্কার করে চুকল পূর্ব-পাষাণ যুগের মানুষ, উত্তর-পাষাণ যুগের মানুষ পাষাণ কাটার কৌশলের পুরাবিষ্কার করতে আর বসে রইল না। কিন্তু কি করে কাটা পাষাণকে সুমার্জিত সুঠাম রূপ দিতে হয়, মাটিকে পুড়িয়ে কি করে শক্ত করে নিতে হয়, কি করে পাথরে আঁচড় মাটিতে আঁচড় দিয়ে এবং রঙ দিয়ে চিত্র-বিচিত্র করে তুলতে হয়, তারি উদ্‌ভাবনাতে নিযুক্ত রইল! কালে কালে মানুষের জীবনযাত্রা নানা-মুখী গতি লাভ করছে, সেইসঙ্গে তার শিল্পকলা বিচিত্র থেকে বিচিত্র বিকাশ লাভ করছে কর্মাশ্রয়াভাবে এইটেই হল জগতে প্রাচীন জাতির শিল্পকলার মূল কথা। কর্মকে আশ্রয় করে রইল বহুযুগ ধরে মানুষের শিল্প তার পর হল ধর্মাশ্রয়া শিল্পের অবতারণা। কি ভাবে পূর্বতন যুগে মানুষের মধ্যে কোন্ কোন্ কর্মাশ্রয়া শিল্প কতখানি বিকাশ লাভ করলে তার সচিত্র ইতিহাস এবং বিবরণ দিয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রণয়ন করছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ ও সুলভ বই হল '*The Story of Primitive Man*, by Edward Clodd। এই বইখানিতে মানুষের উৎপত্তিকাল এবং যুগে যুগে কিভাবে কোন্ কোন্ শিল্পকলার সৃষ্টি করে গেল, তার সচিত্র বিবরণ চমৎকার করে দেওয়া হয়েছে। এই বইখানির পরিশিষ্ট থেকে এইটুকু উদ্‌ধৃত করে এ প্রস্তাব শেষ করি—'We have not altered so much as we vainly think; if the civilised part of us is recent, in structure and inherited tendencies we are each of us hundreds of thousands of years old. And the explanation of this is that the influences of a few generations acting on us from without are slight contrasted with the influences of a dateless past inherited from our ancestors.

কলাকৌশলপ্রকরণ এবং শিল্পসামগ্রী সেই পুরাতন থেকে পুরাতন যুগের, আচার-ব্যবহার নবনবতম যুগে কিভাবে অতি সুসভ্য অবস্থাতেও এ দেশে সে দেশে মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে আজ পর্যন্ত জড়িয়ে আছে, তার বিবরণ ক্রমশ ধরার চেষ্টা করব। নিজের নখদন্ত এবং দৈহিক শক্তিটুকু নিয়ে ইতর জীবের মতো অবস্থাতে মানুষ মহাকালের মধ্যে কতটুকু সময় অতিবাহিত করলে তার পরিমাণ করা চলে না— সে অবস্থা অনুমান করে নিয়েও কোনো লাভ দেখি না। মানবশিল্প-চর্চার দিক থেকে যেখানে

গুহার মধ্যে প্রথম মানুষের কঙ্কাল আর তার হাতে-গড়া অস্ত্র ভূগর্ভে একসঙ্গে ধরা রয়েছে, সেখান থেকে ধাপে-ধাপে শিল্পকলা-বিষয়ে মানব-জাতির ক্রমোন্নতির ইতিহাস জেনে চলাই হল ঠিক রাস্তায় কাজ করে চলা— শক্ত কাজ কিন্তু আমাদেরই পূর্বতন যুগে মানুষ যে শক্ত পাথর থেকে কাজ আদায় করেছিল তার চেয়ে শক্ত কাজ নয়, সেদিনের শিল্পকলার পরিচয় করে নিতে চলার বেলায় Anthropology আর Ethnology আর Geology এই তিন জ্ঞানের প্রদীপ যুগান্তরের অন্ধকারে আমাদের পথ দেখাবার জন্যে রয়েছে, আমরা নিজের আলোতে নিজের পূর্বপুরুষদের রচিত শিল্পসামগ্রী-পরিপূর্ণ বহুকালের পর্বতগুহায় গিয়ে লোকলোচনের বাহিরে ধরা ইতিহাসের পূর্বেকার ভারতের রহস্যভাণ্ডারের চাবি অল্পায়াসেই দখল করতে পারি। ভারতশিল্পের তত্ত্ব প্রাচীনতম প্রাক্-আর্যসভ্যতা প্রাক্-বৈদিক আমলের মানুষের কঙ্কাল ও অস্থির সঙ্গে গুহানিহিত রয়েছিল, তাকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আমাদের জ্ঞানের বিষয় করে তুলেছেন, দুর্গম পথ সুগম করে দিয়েছেন, দুঃসাধ্যকে সুসাধ্য করে তুলেছেন এবং দুর্লভকে সুলভ করেছেন তাঁরা। আর, আমরা এ-বিষয়ে এত উদাসীন যে শিল্পজ্ঞানের সীমানা বেদবহির্ভূত বলে স্বীকার করতেও কিন্তু করে বসি, মনে হয়তো বা ভয় হয় পাছে শিল্পলক্ষ্মীর জাতঃপাত ঘটে এবং বেদকে অমান্য করার দরুন মরণান্তে নরকদর্শন ঘটে। জাতি বর্ণ ধর্ম ও সভ্যতা এ-সব নিয়ে কথা ওঠবার আগে শিল্পধনে ধনী হল মানুষ তবেই না সে নানা সংকট উত্তীর্ণ হল, পৌঁছল নিরাপদ সুসভ্য সুভব্য হয়ে ওঠার দিকে! সেই স্মরণাতীত প্রাক্-বৈদিক আমল সমস্ত সেখানে আদিম মানব তাঁরা গুহাবাস করছেন, শিল্পকলাকৌশলের সনাতন যুগ বা জিগীষার যুগ তখন। আর, যেখানে বৈদিক ঋষিরা দেখি যজ্ঞে নিযুক্ত, সেটাকে বলব শিল্পের ইতিহাসে সেটা জিজ্ঞাসার যুগ, বা অধুনাতন যুগ বলে ধরব।

নাট্যশিল্পের কথা-সমস্যা

শুক-শারির নিজের নিজের একটা একটা ডাক আছে, যেটাকে বলতে পারি তাদের স্বাভাবিক বা চলতি ডাক বা ঘরাও ডাক। বনে যতক্ষণ ছাড়া আছে পাখি দুটো, ততক্ষণ সেই সেই ডাকের সুর দিয়ে টিয়াতে ময়নাতে ভেদ বুঝে নিলেম আমরা। পড়া-পাখির বেলায় আলাদা নিয়ম হল সেখানে, বনের পাখির ডাক ডেকে ভোলাতে পারলে না শ্রোতাকে পাখি দুটো। বদলাতে হল গলার সুর, শিখতে হল কথা ভাল করে বলতে ; কেননা তখন তারা আর বনের পাখি নেই, রূপকথার জগতের সোনার খাঁচার প্রিয় শুক-শারির জায়গায় এসেছে তারা দুটি মানুষ-পাখি !

নট নটীদের, শিক্ষার বেলাতেও এই কথা খাটে— স্টেজে বা যাত্রার আসরে এসে ঘরাও ডাকে নিত্যকার চলতি ও স্বাভাবিক সুরে মুখস্থ করা পাট বলে গেলে চলে না। ধর বাদশার পাট নিলেম, সে সময়ে তোমাদের চির-পরিচিত অবনীবাবুর মতো সুরে কথা কয়ে চলি, তবে ঠিক সেই দোষ করে চলি যে দোষ করে চলে অশিক্ষিত শুকপাখি খাঁচার মধ্যে এসে বনের কিচিমিচি সুর করে দিয়ে !

সাজের দ্বারায় হলেম অসাধারণ বাদশা কিংবা দেবতা কি দৈত্য একটা কিছু, কিন্তু গলার সুরে রইলেম একেবারে ঘরাও অবনীবাবুটি, কি আপিসের বড় বাবু বা হেড মাস্টারটি ! এ হলে সাজ দৃশ্য পট সব মাটি করে বসলেম। নিজের সুপরিচিত অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি সমস্তই যেমন, তেমনি ঘরাও সুরও বদল করা চাই, নয়তো ব্যর্থ হল অভিনয়। বুড়োকে যুবো সাজানো সহজ, কিন্তু বুড়োর গলা বদলানোর কাজ যদি না হলো তবে ছদ্মবেশের সার্থকতা রইলো কোথায়, ছদ্মবেশের আড়াল থেকে যদি সেই একই চির-পরিচিত সাধারণ ঘরাও সুর বেরিয়ে এল, তবে সেই কথামালার নীল-শৃগালের মতো কারখানা হল না কি ?

সেকালের যাত্রায় সখী সাজত ছোকরা, রাজকুমারী সাজত ছোকরা, এমনি বয়সের হিসাবে কেউ মালিনী, কেউ মেথর-মেথরাণী, রাজা মন্ত্রী রাণী দূতী কত কী। এখনো থিয়েটারে এ নিয়ম বজায় রেখে চলা হয় সত্য কিন্তু একটা বিষয়ে থিয়েটারের কর্ত্তাদের সতর্ক দৃষ্টি একটু শিথিল হয়েছে দেখতে পাই। সখীর গলায় রাণীর গলায় সেই নিজের নিজের ঘরাও গলা শুনি। যেটা অমুক গলির অমুক নং বাসা বাড়িতে মানায়, সেটা কেন মানাবে রাজসভায়, বা মজলিসে সখীর পাটে যে গলা মানায় কেন মানাবে সে গলা রাজেশ্বরীর পাটে, রামের পাঠে যে গলা, ভীমের পাঠে সে গলা চলবে কেন ? দৈত্যের মুখোসের ওপার থেকে পিলেরোগার আওয়াজ কি মানায়, না রাণীর সাজের ঘোমটার মধ্যে থেকে চরকী-বালার সুপরিচিত চেরা গলা মানায় ! সাজের তারতম্য, স্বরে তারতম্য এ না হলে অভিনয় হয় বেসুরো, কনসার্ট বাজির মতো বিপর্যয় ব্যাপার হয়ে ওঠে।

সেকালে যাত্রার অধিকারী তাঁরা এই সমস্যার এক ভাবে সমাধান করে গেছেন। তাঁরা সখীর সুর, বালকের সুর, রাজনন্দিনী ইত্যাদি নানা সুর, গলাতে গানের সুর বসানোর মতো করে বসিয়ে দিতেন ছোকরাদের গলাতে শুনেছি দেখেওছি। ছোকরা বললে, 'ওলো সহচরী' একটা বাঁধা সুরে এটা বললে মালিনী সে সেজেছে একটু বড় গোছের ছোকরা, গলা তার একটু মোটা, সেও বাঁধা সুরে বললে 'আঁটকুড়ির মেয়েরা সকল ফুল তুলে নে গেছে গা' প্রতিবেশী আরও বাঁধা সুর, সে বললে—'ও মালিনি, জিজ্ঞাসা কর উনি কে, দেখতে পাচ্ছি ভদ্র লোক বটে।' কুমার দিব্বি ফুট্‌ফুটে ছোকরার সাজ, সেও বাঁধা সুরে কইলে কথা, যথা— 'মালিনী আমায় একান্ত পরিচয় দিতে হবে, তবে পরিচয় দিই শোনো !' [অসমাপ্ত]

॥ দ্বিতীয় চিত্রদর্শন ॥
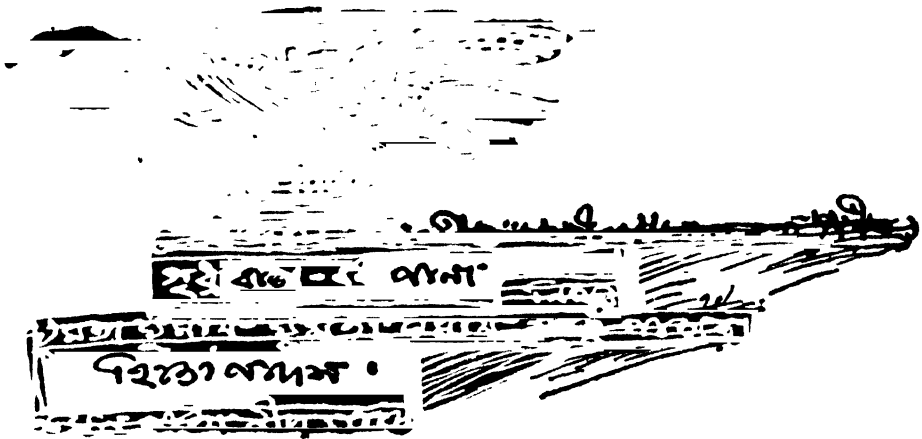
[‘গৃধ্ররাজবধপালা’ রচনাটি অবনীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত একটি বাঁধানো খাতা থেকে পাওয়া গেছে। আখ্যাপত্রে অবনীন্দ্রনাথের স্বহস্তে নিম্নলিখিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ আছে—

সবজী খাতা

যাত্রা পুস্তক

জোড়াসাঁকো যাত্রা পার্টির

‘দ্বিতীয় ভাগ’

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লিখন আরম্ভ ৩১ ভাদ্র ১৩৩৯, কলিকাতা।

অর্থবোধ ও শব্দরূপের সমতারক্ষার প্রয়োজনে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, শব্দের বানান ও রূপ যথাসম্ভব মূলানুগ রাখা হয়েছে।]

ও দেখেন দেখেন বসে আছেন
গৃধ্ররাজ (বৃদ্ধ ধীর) জয়দগব অতি স্থবির
সন্ধ্যাকাশে নয়ন-তারা রেখে স্থির উপবিষ্ট আছেন
গৃধ্রকুট পর্বত-শিরে একা বীর— শুনছেন একমনে
গিরি তলে বনে-বনে

সান্ধ্যক্ষণে ক্ষণে-ক্ষণে ; পাখিরা ফেরে নীড় করে কলকাকলি
আধো ঘুমে আধো জাগরণে,
অন্ধকারে চেয়ে রয়েছেন একা বলী !
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি।

কাটঠোকরার চলন-বলন

টুকটাক্ ছিট্ ছাট্ বাদ যাক্ কড়ি কাট
চৌকাট বরোগা !
ফুটে গাঁট ফিট্ ফাট
মোটমাট্ ঠিক্ ঠাক্ কোটরা
ঢুক্ ঢাক টুপটাপ্
বসে থাক্ মেলে পা
সেকরার ঠুক্ ঠাক্ কামারের এক ঘা।

কাকের তাড়া কাটঠোকরাকে

অ আ কা কা ডালে বসে থাক্ গা
ইটি উটি খুটিনাটি যা পাস্ তাই খা
কোটর দখল যা যা যা না।

শেয়ালের বাহবা

বাহবা বাহবা ক্যাবাত বাহ বা
হোয়া হোয়া বাহোয়া খাওয়া দাওয়া শোয়া হোয়া

কুকুরের বেড়ালের ধমক

কু— রও গোল করো না কেউ
বে— ডাক্ শোনোনা ফেউ
উভয়ে— কেঁউ মেঁউ ভেউ ভেউ
বে— ছানা-পোনা নেই কেউ
বেঙ্গমা-বেঙ্গমী যাও এউ।

হুতুম পেঁচার হুকুম

ঘুম ঘুম্ ঘুম্ ঘুমচি গাছের পাতা
ঘুমায় তরুলতা
আস্ ঘুমা ঘুম্, পাশ ঘুমা ঘুম্

ঘুমতা ঘুমায়
রাতবিরেতে চাঁদটা ঘুমায়
জাগে বাদুড় চাম্‌চিকায়
হুতুম-পেঁচা হুতুম ঘুমায়
হুকুম শুনায়
ঘুমায় ঘুমায় ঘুম্‌তে ঘুমায়
গাঙের বাতাস…
রাতের আকাশ ··
কাউয়া মানুষ…
নেউল ভাম উস্‌ খুস্‌
নড়ে ঘাস্‌ ঢলে পাতা নিঝুম্‌!

পেঁচা পেঁচির ধিক্কার

ছিছি মিছি মিছি খিচি খিচি কিচি মিচি
আছি সুখে নানা পক্ষী একই বৃক্ষে
ঘেঁষা ঘেঁষি ঠেসা ঠেসি পেঁচা পেঁচি
বাবুই-হাটি খিটি মিটি খুটি নাটি
মিছি মিছি চেঁচাচিচি!

মহিষ ষাঁড় গরুর হাম্বারব

ঢেং এং ওম্‌ বা গোঠ্‌ যা গোটে যা
টেং টেং ঢেং ঢেং লম্বা গলঘণ্টা
এং বেং চেং ডুম্বা ঘোড়া গাধা
চামর ঘণ্টা জাবর কাটগা
চর্বিত চর্বণ রংদার এল সন্ধ্যা।

মহিষ— বোম্‌ কালী!

শুক শারি ও টেঞা পাখির পড়া
কৃষ্ণ করোতি কল্যাণং কংস কুঞ্জর কেশরী
গোষ্ঠ পথে চলা দায় শৃঙ্গীদের ভীড়ে
লক্ষ্মী যায় চন্দ্রমায় পক্ষী যায় নীড়ে

দূরে সন্ধিপূজার শাঁখ ঘণ্টা
পশু পক্ষীদের প্রস্থান, আসন্ন অল্প অন্ধকার— যেন প্রদোষ
টুনটুনি মৌচুনি পাখির গীত
মন্দিরা বাদ্য

টুনটুনিয়া ঠুনঠুনিয়া
রুনুঝুনিয়া
গুঞ্জরিয়া মঞ্জরিয়া মঞ্জরী গুঞ্জরী
জুড়ি জুড়ি মৌচুনি টুনটুনি
টুনুটুনিয়া।

চামচিকেদের খেলা

ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম্‌-চিকড়ি চামের ছাতা চামের ঘর
উড়ে পড় নাটাগড় পারাছুট খুলে ধর
ঘুরে পড় ঝুলে পড় শুয়ে পড় নুয়ে পড়
আঁকড়ি জুঁকড়ি কুঁকড়ি সুঁকড়ি—

জরদ্‌গবের প্রবেশ
সঙ্গে
সজারু, কালো বেড়াল

গীত

কালো বেড়াল তিনবার করে গেল চিৎকার
সজারুর বাচ্ছাগুলো খোঁচা দিয়া বলে গেল
তিনবার আর একবার :
ঘরে চল খেলাধুলো কাজ নাই আর।
ঐ শোনো ঐ ঐকে কইছে
সময় হৈছে সময় হৈছে বাইরে বৈসে থেকো না আর।

জরদ্‌গব — প্রদোষে নিহতঃ পন্থা রাত্রৌ চ ভ্রমণম বিষম্— রাতে ভ্রমণ বিষম্ দোষের কথা,— ঘরে যাও ঘরে যাও যে-যার কোটরে উঠে পড়।

টুনটুনি— একটা গল্প বল-না।

জরদ্‌গব— আর গল্প নয়, তল্প নাও গে তল্প নাও গে!

মৌচুনি— একটা ছোট গল্প।

জরদ্‌গব— আগে বেঙ্গমা বেঙ্গমী বন্দনা তারপর গল্প। গাও সবাই একস্বরে!

গীত

এক যে আছেন বেঙ্গমা
এক যে থাকেন বেঙ্গমী
একস্তর দুইজনা সতন্তর রাত দিনই
বেঙ্গমা বেঙ্গমী।
জোড়া পাখি কাথ টানা
সাদাকালো দুই ডানা
খোপে খাপে বসে থাকে
ঝোপে ঝাপে চরে জানি
বেঙ্গমা বেঙ্গমী।
দিন যখন যাচ্ছে না
রাত যখন কাটছে না
গল্প কন বেঙ্গমা
বসে শোনেন বেঙ্গমী।

পাখিরা— এইবার বড় গল্প।

জরদ্গব— শোনো কই—

গীত

মিছরির বনটায় শিল আর বিষ্টি
টুপটাপ্ পড়ে জল মিষ্টি মিষ্টি
চি করিয়ে চিল বলে ইকি অনাছিষ্টি— ই ই ই ই !
বনপথ শিলে-ভাঙা ঝরাফুলে হল রাঙা
রাত পারা দিনটা হিম্ হিম্ বয় বা
বাঁশপাতা শীত পায় শীত পায় কচি কচি শালিকের ছা
হাড়-ভাঙা শীত এল দিয়ে ঝড় বিষ্টি হী হী হী হী
দাঁড়কাক্ ডানা ভারি থালধারে তাড়াতাড়ি
উড়ে বসে ভাঙা ডালে ধাড়ি কালি কিষ্টি ছি ছি ছি ছি
পাকা চাল সাদা বক্ কাদা ভাঙে ছপছপ্
মাছরাঙা করে জপ্ আড়ে আড়ে দৃষ্টি !

পাখিরা— তার পরে ?

জরদ্গব— তার পরে ঐ আসছে কোলা বেঙ ও বলুক।

কোলা বেঙের প্রবেশ

কোলা বেঙ—কড়মড় কড় কৌচি দেবতা দাঁত খামাটি দিউচি হাসি কিড়ি গড়প হউচি গান হউচি বাজনা হউচি—

গীত

মেঘডম্বুর টাই-টম্বুর ভাড় বরিষায় ভাঙা ডোবা একাকার
বড় বড় এণ্ড বেঙ বসি চারিধার
জোড় জোড় গড়া ছাড়ি গোড় মাড়
কড়ি কিড়ি গায় সুমেদুর দাদুড় দাড়ুড়।

পাখিরা— মনিষ্যির গল্প একটা?

গীত

কালো বেড়াল— শোনো— তেমাথার তুঙ্গি বাবা বসে গেছে চিমটে নিয়ে
চুঙ্গি আদায় করতেছে সে
তেলা পোকাটার ঘাড় ভাঙিয়ে
জপতেছে হাড়ের মালা খট্ খটিয়ে
সর্বাঙ্গে বাঘের ছাবা
লম্বা জটা মস্ত থাবা জলে-ভরা লাউয়ের তুম্বি।

পাখিরা— মানুষের গল্প থাক্ হনুমানের গল্প বল, ভয় করছে।

জরদ্গব— ভয় করছে— সীতা রাম কহো।

পাখিরা— রাধে শ্যাম কহো।

জরদ্গব— তবে হল না। হনুমান চলল রেগে বেগে, ধর—

জরদ্গবের গান
পাখিদের নৃত্য

করে ভৃকুটি ভঙ্গি ত্রিকুটী জঙ্গী সাগর লঙ্ঘি যান
লুটোপুটি লেজ্জ্য খান
ঘরপোড়া রেগে তিরিঙ্গি
ক্রোধে উত্তুঙ্গী
গর-গর সাগর পালটি চান
উল্‌টি জলটুঙ্গি!
বঙ্গ-সাগর গরজাল-ভাল-তরঙ্গী লঙ্কাপুরী কম্পমান!
মন্দোদরী জলকুম্ভি ধরি
হতভম্ভি চান,
ছুটোছুটি মা জানকী আম পাড়ান
লঙ্কার রাবণ লঙ্কা পোড়ান, কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যান

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণে করেন তম্বি দাঁত ছিরকুটি
ভস্মলোচন লম্ভ লন মরিচ বুটি
—হাঁচি সামলান জল্‌দি
করে ভ্রূকুটি ভঙ্গি।
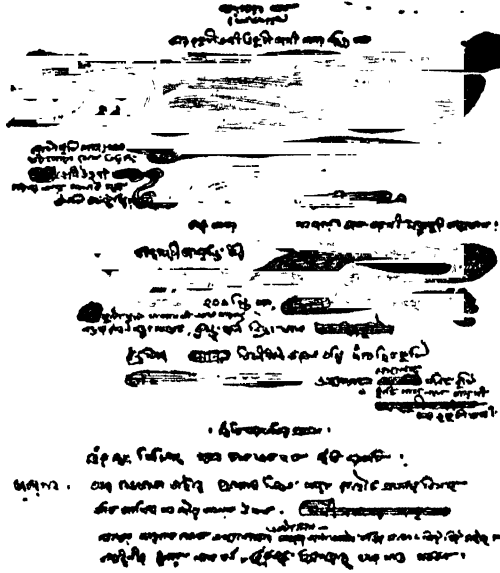
হেঁচি করকচির প্রবেশ

হেঁক্ ছো কিমিদং শুবে চল একদম হেঁচি করকচি!

জরদ্‌গব— আর থেকোনা বাইরে প্রদোষে নিহতঃ পন্থা রাত্রৌচ ভ্রমণম্ বিষম্, কচি পাখিরা সব দৌড় বাসায়, ঐ দেখ— মেঘের আড়াল থেকে ভস্মলোচনের একটা চোখ কানাকড়ির মতো— মিট্ মিট্ চাইছে— গোধুলির ধুলায় লাল বর্ণ— হেঁক্‌ছোঃ— হিম পড়ছে ঘরে যাও সকলে।

পাখিরা— চল-না তোমার ঘরে, সবাই গল্প শুনিগে হেঁকৃছে। হেঁকৃছি।

জরদ্‌গব— সে যে এতটুকু কোটর সেখানে সবাইকে ধরে কখনো? ছাত ফুটো, চালে খড় নেই সেঘরে বসাই কোথায়? আমার নিজেরই কুলোয় না!

গীত জরদ্‌গবের

এখন থাকি জরা ঘরে কি করি? ভয়ে মরি—
কখন পড়ি ঘরচাপা প্রাণে মরি রে বুড়া বয়েসে জরা ঘরেতে।
এ ঘরের ঘরামী ভাল রইবে বলে অনেক দিনই
যতন করে ঘর বাঁধলে!

এমন আমার পোড়া কপাল রে
করল রুয়ে খেয়ে সব ঝুরি !
ভাল বেতে বাঁধা ঘরের চাল
ছয় ইঁদুরে কটর কটর কাটে হামেহাল
যেন ঘরে মালিক ইঁদুর কটাতে—
নাচ নাচিছে ঘরে তুড়ি রে
সময়ের গতিক ভাল নয়
আকাশে মেঘ দেখা দিলো
দারুণ বাতাস বয়
কপাট নাই ঘরের দোরে
হিঁয়াল এসে
লাগায় শীত ভারি থরহরি !

পাখিরা— তুমি হলে গৃধ্ররাজ রাজবাড়িতে থাকলেই হয় পর্বতের চূড়োয় !

জরদ্গব— কে বললে আমি গৃধ্ররাজ ! জরদ্গব ভৃত্যরাজ আমি, বৃদ্ধরাজও বলতে পারো ! জাতে গৃধ্র, কাজে ভৃত্য তোমাদের !

পাখিরা— আমরা দেখেছি এক একদিন রাতে কোটর থেকে উঁকি মেরে বসে আছো পর্বতের চূড়োয় ওখানে তোমার ঘর নয় ?

জরদ্গব— ওটা হল গৃধ্ররাজের ঘর ; দেখেছো যাঁকে, তিনি আমি নয়, আমার বাসা ওরি কাছে—

গীত

অস্তি ভাগীরথী তীরে গৃধ্রকূট নাম্নি পর্বতাস্তিকে
মহান পর্কটী বৃক্ষ তস্য কোটরে—

পাখিরা— আমরাও তো থাকি পাকুড় তলায় তোমাকে দেখিনে তো—

জরদ্গব— সারা রাত রোঁদ ফিরি দেখবে কি প্রকারে, সকালে তোমরা বাসা ছাড়বে আমি গিয়ে বাসায় ঢুকবো, তাই পথে ঘাটে দেখা পাও ঘরে নয়—

সকলে গীত

ওরে আসা-যাওয়ার বাঁকে বাঁকে
থেকে থেকে দেখা পাওয়া
বারে বারে হারিয়ে গিয়ে
কাছে দূরে খুঁজে পাওয়া চলার ফাঁকে !
ভোরের আলো ঝলক্ দিয়ে আসে ঘুরে
ভরা-সাঁঝে ঝিলিক্ দিয়ে চলে দূরে পাখির ডাকে

তোমায় আমায় মিলন ঘটায়
নতুন নতুন পথের বাঁকে।

বেড়াল— কেও! কেও!

গিধিনী-বুড়ির প্রবেশ

পদ্য

আমি গিধিনীবুড়ি গৃধ্ররাজের খুড়ি
নখে গাছ চিরি নাকে পাথর খুঁড়ি
রাঁধি শেয়ালের নাড়িভুঁড়ি দিয়ে বেড়ালের তাজামুড়ি
ভোদড় ভামের চচ্চড়ি
যে ছেলেটা দুধ খায়না তারে পেটাই ধুদ্‌ধুড়ি।

বেড়াল— জ্যেঠী বেরিয়েছে লাঠিহাতে পালাও পালাও কোটরে পাখিরা

পাখিরা— যাচ্ছি যাচ্ছি গিছি গিছি হ্যাঁক্‌ছোঃ হ্যাঁক্‌ছোঃ হেঁচি করকচি

বেড়াল ও পাখিদের প্রস্থান

গিধিনী— বলি জরদ্‌গব— পক্ষহীন চাকরি পেলে পক্ষী-পালনের
নখ নাই নয়ন নাই পাও তবু এঁটো কাঁটা ঢের
নেড়া মাথা বুদ্ধি নাই ওল কামানো তুণ্ডু
কাক ভুশুণ্ডু এবার বুঝি পাত করে মুণ্ডু

জরদ্‌গব— সে কি কথা! আমার অপরাধটা কি হল?— এই বৃদ্ধকে ভৃত্য রেখেছেন ভুশুণ্ডি কাক—
—স্বাহারাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত্য দদাতি, তেনাসৌজীবতি শাবক রক্ষাং চ করোতি।

গিধিনী— পাখিরা দিয়েছে বাচ্ছা পালতে এঁটো কাঁটা যা দেয় তাই খেয়ে সারা রাত পাহারা দাও এতেও খুসি নয়—
ছেলে পিলে নিয়ে যাত্রা গান গল্প হয় রোজ সন্ধ্যাবেলা। এ সব খবর গেছে ভুশুণ্ডির কানে।

জরদ্‌গব— এ খবর তুললে কে তাঁর কানে।

গিধিনী— কেন মার্জার যাকে গরিব বলে ঘরে স্থান দিয়েছে। সেই সেই ঘর শত্তুর পর শত্তুর হয়েছে তোমার—

জরদ্‌গব— কি কি লাগিয়েছে শুনি?

গিধিনী— লাগাবে কি, তোমার কোটরে কাগের ডিমের খোলা পালক না ভরে দেখিয়ে দিয়েছে। বেধে গেছে তুমুল কারখানা। তোমার চাকরি তো গেছেই, ফাঁসি না পড়ে গলায়। এইবেলা সরে পড় কোথাও পালাও এ বন ছেড়ে।

গীত

পালা : এবার শিঙে ফোঁকার পালা স্থরু হয়েছে
বুড়োহাব্ড়া জরদ্গব পাখি পালা :
শিঙে চল্ ফুঁকে রামশিঙে চল্ ফুঁকে
পালিয়ে চল্ শিঙে ফোঁকার তালে তালে
পা ফেলে যাবার পালা স্থরু করে দিয়ে পালা :

জরদ্গব— এই বেদ্ধো বয়েসে চাকরি ছেড়ে যাই কোথা— দৈব দুর্বিপাকাৎ গলিত নখ নয়নো।

গীত

হায় কারে কবো যে দুখ আমার— হলো এবার প্রাণে বাঁচা ভার
দিনে উপবাসী জাগিয়ে যামিনী যায় হলো একি দায় করি কি উপায়।
সুখে থেকে দ্বিগুণ দুখে পড়ি পুনরায়
শেষ বয়েসে দশার দশ ঠেকানো যে ভার।

হঠাৎ চাকরি ছেড়ে যাই কোথা, চল দেখিগে কি ঘটনা ঘটেছে।

গীত

খাটিয়ে সংসারে হদ্দ নেড়ে-চেড়ে দেখলাম
এর কিছুতেই নাই জুত্‌বরাদ্দ
চিনির বলদের মতো বহাই বোঝা বেহদ্দ!
কেবা খাটায় বুঝতে নারি কার খাটুনি খেটে মরি
যে খাটায় দেখলাম না তায় জরাজীর্ণ দীন অন্ধ!

গিধিনী—

গীত

কার বা চাকরি কর
ও তুই বা কে তোর মনিব কে রে
হয়েছিস্ কার নফর
তোর আমদানিতে শূন্য দেখি
মিছে বেগার খেটে মর।

জরদ্গব— পাখির ছানাগুলো আশেপাশে যখন কিল্‌বিল করে তখন সব দুঃখ ভুলে থাকি! চলি—

গীত

চলিয়াছি গৃহপানে, খেলাধুলা অবসান
ডেকে লও, ডেকে লও, বড় শ্রান্ত মনপ্রাণ
ধুলায় মলিনবাস আঁধারে পেয়েছি ত্রাস
চলেছি নিরাশমনে সান্ত্বনা কর গো দান।

গিধিনী— শোনো শোনো— দীর্ঘকর্ণ মার্জার— না-বিড়েল না-শিয়েল দুয়ের বার, তাকে চেনে জগৎ-সংসার— গণেশ স্তৌতি মার্জারং স্ববাহনস্যাভিরক্ষণে বড় বজ্জাৎ সে গণেশ পর্যন্ত ডরান তাকে— বাহন নেংটিরে পাছে ধরে গুটিগুটি মার্জারকে গণেশ তাই করিলেন স্তুতি! দেখ! প্রায়ই পাখিদের ছেলে চুরি যাওয়াতে, তোমারই উপরে ছেলেধরা বলে সন্দেহ পড়েছে— একটু সমুঝে চলা ভালো; যাকে তাকে ঘরে স্থান দিওনা, যার তার সঙ্গে আহার-ব্যেভারও ভালো নয়— অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাস দেয়ো ন কস্যচিৎ— কুল জানা নাই শীল জানা নাই অপরিচিৎ, তারে বাসা নাহি দিবে কদাচিৎ— এসব family matter তোমাকেই চুপি চুপি বল্লেম good night ওল্ড ফ্রেন্ চললেম! প্রস্থান

জরদ্গব— জ্যেটি কথাটা বলেছেন পাকা— মোরে বৃদ্ধ দেখি বল করিতেছে সবে— পাখাহীন সাঁচন কে কাকে পরাভবে— একবার গা-ঝাড়া দিতে হল, না হলে আর চলে না, দেখি গিয়ে! প্রস্থান

জোনাক পরীর নৃত্যগীত

একটু চাঁদের কোলে একটি তারা দোলে
সন্ধ্যা পিদুম ঝলে
ঘর ঝল্‌মল্ করে!
করে ঝিল্-মিল্ করে আলো—
খানিক্ ছায়া খানিক আলো খানিক কালো।
জলছে আর নিভছে আর আঁধার মাণিক্। প্রস্থান

মার্জারের প্রবেশ

গীত— পূরবী সুর

মাহি [মাতি ?] মহোচ্ছবে মজ তবে মন আমার
যথাবিধি মুড়াবধি স্তেজাকর ফলাহার
আঁস্ কাঁটা নয় ছাঁট একস্তরে একাকার
কব সবে বল ত্রাহি, ত্রাহি বার বার!

কোয়মায়াতি : ভিজে বেড়ালের প্রবেশ

তপস্বী— কেন মশয় বইভ্রলোককে গালি পাড়েন; আতি হতে গেলাম কি জন্য বেক্ষচারী গরীব মানষ:

গীত

গাব্ গুবাগুব বগবেড়ালী বেক্ষচারি মহাপণ্ডিত মাছ মারিতে
দেশ কাল ভাবি জলে নাহি নাবি
পায়ে পায়ে চলি কায সাধিতে—গাব্ গুবা গুব্
না ধরি মাছ, না ছুঁই পানি, না পালি গাই দুধ খেতে আমি
গাব্ গুবা গুব্!

গীত

মার্জার — বলি মাছের কাঁটা ফেলে কোথা কার অঙ্গনে
কেন চলে একা এলে কি কারণে মহাবনে
জীবনে এক পলের তরে রান্নাঘরে দোর ভেজালে— প্রাণ বাঁচে না
আজ সেজনা অন্যমনা ছাড়িলে কিজন্যে চিংড়িহাটা
ওহে যাও যাও আপন দেশে সুখেতে রও শেষ বয়েসে
বাড়ায়ো না আর বাড়া ভাতে ভাগিদার এই চাই শ্রীচরণে

ভিজে— কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর্ণ বধির হও, একি পাপ কথা কন আপনি

গীত

শাক পাতা খেয়ে পেট ভরিব নয় মরিব চট্
পোড়া পেটের তরে পরে হানি কেন করিব ঝট্
সাছন্দ বল জাতেন শাকে নাপি প্রপূর্য্যতে
অস্য দগ্ধোদর স্বার্থে কঃকুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ

মার্জার— ভাই হে শাক পাতা খেয়ে গরু ছাগলের চলতে পারে তোমারও নয় আমারও নয়, সাদা বাংলায় বলি শোনো

গীত

বুড়ো হয়ে যদি বাঁচতে চাও সন্ত মাংস মৎস্য খাও
পাঠা খাও সাঁটা খাও ডিম্ব কৈ আর মাগুর
ইহা বই রয়কি কান্তির চকমকানি ঠাকুর
ষষ্ঠির দাস খেয়ে ছটি বস্ত গুষ্টি বাড়াও চিরজীবী রস্ত
বনেতে কেন বস্তিতে যাও।

ভিজে— বলি তবে দুঃখের কথা—

গীত

খুকু কাঁদে খুকি কাঁদে, দুধ দিয় দুধ দিয় মাঁও
পুষু চায় পুষি কাঁদে, মাছ দিয় ভাত দিয় মাঁও
কৃষ্ণ হরে বলে টেঁঞা তৃষ্ণাতুরে দুধ-কলা দিয় দিয় মাঁও
মেনি কাঁদে মিঞা মুড়ো দিয়া কাঁটা নিয়
রন্ধনী অঞ্জনী দাসী বাঞ্ছারামে ভালবাসি
অঙ্গনের কোণে বসি বলে পুরু সর নিয়
তাজা মাছ ভাজা মাছ ন্যেজামুড়া সব নিয়।

ঐ আঞ্জনী বিড়ালী ছিল তাই বাঞ্ছারামও টিকে ছিলেম ঘরে— সে গেল বৃন্দাবন আমিও এলেম মহাবন।

মার্জার—বৃন্দাবন গেলেই পারতে সেখানেও ভাই মাছ দৈ থৈ-থৈ কাদা দৈ! পাকুড়তলায় আসা কেন

অমন দেশ থাকতে ?

ভিজে— সাহস হল না শুনেছি বানরের উৎপাত আছে ; না হলে তো ভাল আস্তানা ছিল— শ্যাম মিস্তিরির ইষ্টকালয়— বেশ আরামের স্থান ; চলেন দুজনে তো রাজি আছি।

গীত

সুখের চরম নরম গরম শ্যাম মিস্ত্রীর ইষ্টকালয়
শীত কালে উষ্ণ থাকে গ্রীষ্টিকালে শীতল রয়
বটের ছায়ায় কুয়ার কানায় দিনরাত হাওয়া বয়
গরমে নরম শীতেতে গরম।

মার্জার— সেখানে আহার মেলে তো তল্পি গোটাই এখানকার। সর্বদা এখানে গৃধ্ররাজ জেগে পাহারা দিচ্ছে।

ভিজে— ওরে বাস্ তাহলে সরাই প্রশস্ত।

গীত

রওয়া যুক্তিযুক্ত একেবারে নয়
বারণ করি শুনহে বিনয়
যখন এস্থানেতে রয়েছে দেখি
শকুনী-সুবল-তনয়
তারে পরাভব অতি অসম্ভব—করি অনুভব
বাধিতে পারে খণ্ড প্রলয়।

মার্জার— চলি তল্পি গোটাই—

উভয়ের গীত

ওরে ভাই পথের সম্বল কিছু নেওয়া চাই
ক্রোশেক্ দুক্রোশ যেতে গেঁটে বেন্ধে লও যেতে
সে বড় দুর্গম পথ হে
গুরু শিষ্যে দেখা নাই
কঠিন ঠাঁই সে
মাথা কুঁড়লে দিবা রাত্রি এক রত্তি পাই কি না পাই।

প্রবেশ

গন্ধগোকুলের গীত

বলি কেবা যায় কেবা যায় পায় পায়
পাঁকাটি তলায়
আঁস্ মাছ গন্ধ করে অন্ধকারে টেঁকা দায়।
দীয়তাং ভুজ্যতাং হলে হয়।

ভিজে— বলি ক্যে তুমি ক্যনে থাহ: আলো চাল আলো চাল গন্ধ পাই যে।

গন্ধ— গন্ধবকুল, বাবা চাউলের মহাজন, মাথা ঘষার গলিটা খুঁজছি।

মার্জার— দূরমপসর। যাও পশ্চিম মুখো মাথাঘষা গলি।

গন্ধ— যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি, বলি তোমার নামটি?

মার্জার— মার্জারোহম্।

গন্ধ— মোহারাজা, আমার নাম দৃষ্টিচরণ গন্ধবকুল, ক্যেশ তৈল বেচি তাই দুটো আম্‌লা আর মাথা-ঘষার দরকার।

মার্জার— উঁ যাও সরো বাপু তিষ্টতে দিলে না। তুমি কে হে সাফ জবাব দাও— ব্রুহি কীদৃশ ব্যাপারবান।

ভিজে— দন্তহীন হয়েছি মশয়— জানেন তো— দন্তের দফায় রফা হলে ভুজো ভাজায় মন থাকে না।

মার্জার— খুব জানি— চালস ধরলে পরে আয়না ধরে কেউ চায় না!

ভিজে— তবেই বোঝেন আমার দশা— দাঁতে বেদনা থেকে নিস্তার পেয়েছি, কিন্তু মশয় নিত্যস্নান নিরামিশ দুগ্ধ আহার সব করেও ঘুমিয়ে এখনো মাছের মুড়ো দেখে ফোগ্‌লা মাড়িতে জিভ কামড়ে ফেলি, তাই চলেছি পক্বক তীর্থে, রাত্রিটা এখানে কাটিয়ে যাবো।

মার্জার— নেয়ে উঠেছো দেখি যে।

ভিজে— দুখের কথা কন কেন, গঙ্গাতীরে একটি আশ্রম বেঁধেছিলেম; মা গঙ্গার তা সইলো না, এক পুকুর মাছ সুদ্ধ নিয়েছেন সেটিকে—কোথায় ভাসিয়ে কে জানে! রোজ তিন বেলা ডুব দিয়ে সিকস্তি পয়স্তি করছি আশ্রমের পুকুরের তল্লাসে।

মার্জার— ভাগ বসাতে এসেছে। আমার মস্তক চর্বণ করতি চাও?

মার্জার ও বিড়েল লড়াই গীতনৃত্য

এই ঝাপট্ মারি ধাঁই কিড়ি ঘাড়ে ধরি গাঁই কিড়ি
ধাঁই কিড়ি গা ঝাড়ি হুৎ কিড়ি পেচ্ মারি নখে চিরি পেট ফাড়ি।
ওরে মেলেরে মেলেরে কোথাকে আছেরে ফেঁচোর ফ্যাঁচ্ গেইচি:

ভিজে— ছাড়ান দেও, লড়াই ছাড়ান দেও, মার্জারা মাংস রুচয় ও ভিজে ছাড়ান দেও, ঝগড়া ক্ষান্ত দেও ছিক্ ধিক্।

মার্জার— এই চটাস্ চাপড়।

ভিজে— এই কটাস্ কামড়।

পুনরায় বেড়াল-কাঁদন, হুটোপাটি

গীত

রও আমি বাঘের মাসি
যাও আমি ঘোগের পিসি
হও যাও হও যাও রও

মাঠের মাঝে শোওড়া গাছের ঝোপ
অন্ধকারে কালো বেড়াল ফুলিয়ে আছে গোঁপ
চোপ ওপ্‌ চোপ ওপ্‌ চোপ রও
দাঁৎ কপাটি করছে ক্যোঁও
দাঁৎ-খামাটি বলতে ম্যেও
গুঁয়াও ক্যোঁও ওঁয়াও খ্যোঁও
ছিক্‌ ধিক্‌ ছিক্‌ ধিক্‌।

পাখদের চিৎকার নেপথ্যে

অপঘাৎ অকস্মাৎ ঝাঘাৎ ঝাঘাৎ

সকলের প্রবেশ— কাঠবেড়ালীর নৃত্য গীত

সটাপটি ঝটাপটি মিছি মিছি
খিচি মিচি খিটিমিটি চটাচটি
দুটি শিষ্টি তিষ্ঠি তিষ্ঠি তিষ্ঠি
অনিষ্টি অনিষ্টি মহানিষ্টি
মার্জারের দল— অবশিষ্টি উদর সাৎ থলি জাৎ
ঝোলে ঝালে ভাতে ভাৎ
মুখমিষ্টি চাটাচাটি। **প্রস্থান**

শালিক ময়না টেঁয়া

গীত

হা অদৃষ্ট তিষ্ঠ তিষ্ঠ হে হে কৃষ্ট
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হল। বিচার কর সয় না সয় না কষ্ট।
শাস্তি দেও শাস্তি দেও।

টেঁয়া— কৃষ্ণ করোতি কল্যাণং কংস কুঞ্জর কেশরী কাক্‌ ভুশুণ্ডু রক্ষে কর ত্বরাত্বরি বল হরি বল হরি।

প্রস্থান

জরদ্‌গবের প্রবেশ

কর্তব্যমিতি যদ্‌ দুঃখং পুরুষস্যোপজায়তে
শক্যস্তেনানুমানেন পরোপি পরিরক্ষিতুম।
হা কষ্টম্‌—দেখিতেছি হেথা এসে কারখানা কী সব
গাছে গাছে পাখিগুলা রয়েছে নীরব

বাগ আর বাগিচা রয়েছে সুন্ সান্
আকাশে চাঁদ যান অতি ম্রিয়মাণ।

কাকের দলের প্রবেশ

আয় আয় আয় হায় হায় হায়
কাকস্য পরিবেদনা দিনেদিনে আয়
রাতারাতি আয় কাল পরশ্ব বিবেচনা
করা সময় নেইরে হায়।

অহহঃ তিষ্ট তিষ্ট ঘটেছে তো বড় অনিষ্ট; কাটঠোকরার ভেঙেছে বাসাটা। তুলো ধুনে গেছে শালিক ছানাটা; পালকের তোষোক ভুঁয়ে বিছিয়েছে, একেবারে ঘাড় মটকিয়ে খেয়েছে! প্রস্থান

গিধিনীর প্রবেশ

গি— দেখ কি আর?— মার্জার তোমার মাথা চিবিয়েছে
জর— চুকোপ না হলে চলল না— এবারে আমায় হাড়ে চটিয়েছে
গি— চটে হবে কি চম্‌পট্ দাও ভুশুণ্ডির কাছে নালিশ ঠেকাও।
জর— মোরে জীর্ণ দেখি বল করিতেছে সবে
পাখাহীন সাঁচন কে কাকে পরাভবে!
গি— পালাই বাপু— সরল পথে তরল গাছ তার উপরে বাসা
ঘুপটি মেরে বসি গিয়ে সঙ্গে ছ'পণ মশা! প্রস্থান গিধিনী

হট্টিমাটিমের প্রবেশ

গীত

হট্টিমাটিম্ টিম্ হাটি হাটি পা পা
ফটিক্ গড়া খড়ি ধরা সকল গাটা হিম্
হট্টিমাটিম্ টিম্ ঘুরচি লাঠিম্!
সোনার দুইটি পাখা আছে লুকিয়ে রাখা
মেলাতে হবে একটি দিন
পেলে সুদিন!

জরদ্‌গব— এ আবার কে, কে বাপু তুমি— এখনো পালক গজায়নি এরি মধ্যে বাসা ছাড়া!
হট্টিম— আমার শীত লাগছে
জরদ্‌গব— মুস্কিল হল, কি করে একে বাসায় তুলি? আয় আমার ডানার মধ্যে গরম হয়ে ঘুমো— এ নিশ্চয় মার্জারের কর্ম বোঝা গেছে মর্ম!
হট্টিম— ও চটের থলিতে ঢুকলে গায়ে আঁচড় লাগবে— আমি ঐ ঘাসে গড়াই

গীত

হট্টিমাটিম টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম, তাদের খাড়া দুটো শিং, হট্টিমাটিম টিম।

জরদ্গব— ও বাগে যেওনাকো ছিটিমের ভয় ল্যেজ মোটা গন্নাকাটা নাকে কথা কয়। গাছের গোড়ায় আমার কোটরেই ঢুকে পড়, খড়কুটোয় গা ঢাকা চুপ করে থাক সাড়া শব্দ দিও না, ভুশুণ্ডি কাক শুনলে মাথায় ঠোকর দেবে। মার্জারটা বড় দুষ্ট, কাচ্ছা বাচ্ছা সবারেই করে নষ্ট।

হট্টিম— যেমন গায়ে চটের কাঁথা, বাসাও তেমনি বটের তলায় ইটের পাঁজা।

জরদ্গব— এটার কথা অনেকটা জেঠির মতন, আমাদেরই কেউ হবে বোধ হচ্ছে।— রং তো নয় কাঁচা সোনা, মুখটি যেন চাঁদের কোণা— দিষ্টিতে খেলে বিজুলি, সুটানা চোখের কোনা আর কারু দেখবো না। সহজ নয় পাওয়া গৃধ্র রাজের পাঞ্জা ছাপ মারা দেহ—

পদ্য

ওই যে দেখা যায় গৃধ্রকুট
থানা দিয়া শিখরে যাহার
বসে আছেন গৃধ্ররাজ বীর ভীষ্মসম দুর্বার সংগ্রামে
ঊর্ধ্বফণা মণিময় ফণীসম ঊর্ধ্বশির ;
অলঙ্ঘ্য পর্বত চূড়া তাহার ভূষণ
হৈম-পক্ষ সুপর্ণ সে গৃধ্ররাজ
তাঁরি কি সন্তান এই কদম্ব সম সুকুমার
মুষ্টিমেয় পালকের সমষ্টি !

চল আজ গরিবের বাসাতেই রাত কাটাও কোনো রকমে।

ভুশুণ্ডি কাকের দল প্রবেশ

ভুশুণ্ডি— জরদ্গব-বেহুঁসিয়ার— কে আছে জগতে তোর সম অবোধ আজ! মার্জারে প্রশ্রয় দিয়ে সবংশে মজিলি দুষ্ট মজালি সবায়। গৃধ্রকুট ছাড়ি কী কুক্ষণে অথর্ব তুই আইলি এ কানন-পুরে— যা চলি স্বদেশে মূঢ়।

দাঁড়কাক— মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে ; পক্ষ-কুলকালি তুই— পক্ষি নয় যক্ষি ! বিস্মরিব আপ্ত শোক বধি আজি তোরে— বিড়ালাক্ষ সংগ্রাম বিমুখি !

জরদ্গব— ভূচর খেচর নয়, রণে যার পরাক্রমে হ'ত কাতর— অতল পাতালে ভয়ে প্রবেশিত নাগ— হায় সেই সে আমি মান হত অন্যায় সমরে মার্জারের চক্রে ! চোর বেশে পশি বনালয়ে— বিড়ালতপস্বী বধিল পক্ষে নিদ্রিত নীড়েতে যবে নিভৃতে।

কাকিনী— হায় প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে প্রবাসী— আসন্ন কালে না হেরি সম্মুখে স্নেহপাত্র তার যত— পিতা মাতা ভ্রাতা দয়িতা ; মরিল আজি তেমতি কাকপক্ষী নীড়ে পর্ককটী বৃক্ষের অলংকার অগণ্য কাক ডিম্বরূপী শিশু।

দাঁড়কাক— কি ফল বিলাপে অবশেষে বংশলোপ দোষে জরদ্গবের !

জরদ্গব— আইল মার্জারপতি ছদ্মবেশে— সংগ্রামে উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়— অভুক্ত অতিথি রূপে ! এ

মায়া কেমনে বুঝিব ; বৃদ্ধ একে তাহে দৃষ্টিক্ষীণ ভাগ্যহীন ভৃত্য এবে ! বহুকালাবধি পালিনু সন্তানসম পক্ষীশিশুগণে সুখ্যাতির সাথে আমি গৃধ্র বংশোদ্ভুত জরদ্গব জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে কোন্ বংশ খ্যাতি গৃধ্রবংশসম, কিন্তু নরে বানরে পরাভবি কীর্তি রোপিনু বৃথা ! নিদারুণ বিধি এতদিনে এবে বামতম মম প্রতি— তেঁই শূন্য হল অকালে এ পর্ককটীর বাসা অকস্মাৎ যেন বজ্রাঘাতে ; কিন্তু না বিলাপি আমি— অশ্রুবারিধারা হায়রে দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া কঠিন ! বৃথা এ কাঁদনা !

ভূশুণ্ডি— কেমনে ঘরেতে আনিলে মার্জারে— ভুলিলে কেমনে কে তুমি ভৃত্যরাজ, জনম তব কোন্ মহাকুলে, কেবা সে অধম বিড়াল ; স্বচ্ছ সরোবরে কেলি করে রাজহংস, যায় সেকি কভু পঙ্কিল সলিলে— শৈবাল দলের ধাম ?

জরদ্গব— অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি, অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে -- তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।

দাঁড়কাক— গৃধ্রকুলগ্লানি ! শতধিক্ তোরে নির্বীর্য তুই, পক্ষীর সমাজ রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায় শুনিলে নাম তোর ! রে বর্বর বৃন্দাবনে তস্কর যেমতি কেমনে পশালি পর্ককটী বনে তুই কপটী মার্জারে ? তস্কর সদৃশ শাস্তিয়া বিনষ্ট তোরে করিব এখনি।

কাকিনী— দুই চক্ষু লইব উপড়ি নখে চিরি ফেলাইব ধুলায় ।

জরদ্গব— হাঃ হাঃ কাকপতি কহ একি কাক-জাতি-প্রথা, অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ! থাকিত যদি পক্ষি শিশু নীড়ে তারাও হাসিত শুনি তোর উপহাস্য কথা ! ছাড়হ পথ, আসি যষ্টি নিয়া কি বলিব ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ এবে নখচঞ্চু ভোতা তথাপি সমর সাধ মিটাবো এখনি ! পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে, ফিরি কিসে যায় কভু আপন বিবরে পামর ! ডেকেছে নিতান্ত কৃতান্ত তোরে ঘটেছে দুর্মতি তাই দূর হ' রে ! গৃধ্রকুলে জন্ম গৃধ্রধর্ম পালি দেখ্ কি হেতু রহিব কাকশিশু উচ্ছিষ্টভোজী, কিসের মায়া কেন বা পালিব কাকশিশু, বিনা দোষে সহিয়া ভর্ৎসনা ! করিব নির্বংশ কাকবংশ আজ, গৃধ্র আমি ভৃত্য নয় কারু অদ্যাবধি। দূর হ'রে অবোধ নচেৎ বধিব এখনি।

ভূশুণ্ডি— কাজ নাই কলহে ! এতক্ষণে জানিনু কেমনে আসি বিড়াল পশিল বিহঙ্গের বাসে ! হায় বৃদ্ধ উচিত হল না এ কাজ ; গরুড়ের বংশ তুমি পক্ষ্যশ্রেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ, নিজগৃহ পথ তুমি দেখাও তস্করে, চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ? কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা বৃদ্ধ জন তুমি ! ছাড়ি ঘর দ্বার চলি মোরা ভিন্ন দেশে, থাক তুমি একা বসি বিশাল এ পর্কটী আরামে, কুরুক্ষেত্র শেষে অন্ধধৃতরাষ্ট্র যথা কুরুপুরে বসে অন্ধকারে একা। নমো সুবৃদ্ধং চিরজীবীনম্ গলিত নখ নয়নম্ !

জরদ্গব— এবমস্তু। প্রস্থান

গীত

সহি গগনবিহারি কল্মষধ্বংসকারি
দশশতকরধারি জ্যোতিষাং মধ্যচারি

বিধুরপি বিধি যোগাৎ প্রস্ততে রাহুনাসৌ
লিখিতমপি ললাটে প্রোজ্‌ঝিতং কঃসমর্থঃ।

পদ্য

নিশার স্বপন সম ঠেকিতেছে সব
যেন পশিলাম আসি কোন মরুস্থলে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম আছিল সুন্দর এস্থান—
মুখর পক্ষিকলরবে, সুসজ্জিত ফুলে ফলে
নবীন পল্লবে শুকায়েছে এবে সবই নিভেছে দেউটি
উল্লাসহীন পক্ষীনীড় নীরবিত দ্রুমরাজি
নিঃসার উজাড় চারিদিক ; পরিত্যক্ত ভূতগ্রস্থ
আলয়, যথা হত বিনষ্ট শ্রী
এই মোর জীর্ণ বহির্বাস
ধূলি ধূসরিত শোণিতে আর্দ্র আড়াল করিয়া থাক
নৃশংসতার সকল চিহ্ন বৃক্ষচ্যুতজীর্ণ পত্ররাজি যথা।

বহির্বাস ত্যাগ
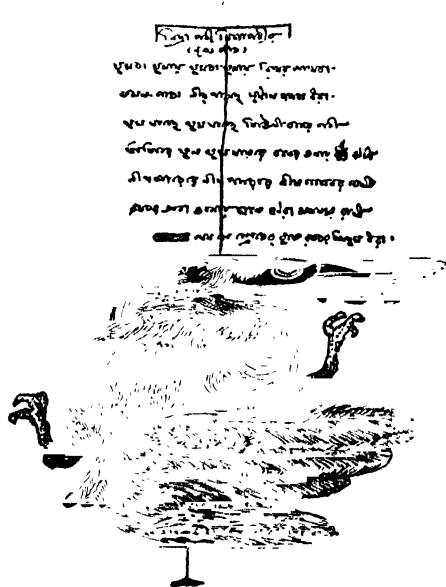
শ্লোক

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা।
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

উজ্জ্বলবেশে হট্টিমের প্রবেশ

আমি খেলা করব!

জরদ্গব— কোয়ং ক্রীড়ন পটু! ন সিদ্ধপুরুষ নপ্যাশুগোমারুতঃকোয়ং?

হট্টিম— খেলব খেলা দাও।

জরদ্গব— আমি যে বুড়ো খেলানা কি থাকে আমার কাছে? এই দেখ লাঠি আছে সাপের মতো বাঁকা।

হট্টিম— থলিতে কি দেখি?

জরদ্গব— থলি খুলে— শাঁখিনী সাপের হাড় সরু সরু; কালো গিরগিটির খোলোস, ওটা আঁকড় গাছের শিকড়-জড়ি, ছুটো তেলোক মাটি, ঝুরো ফুল-বাতাসা, সমুদ্রের রঙীন ঝিনুক, চকচকে গোল নুড়ি, হা কপাল, খেলানা একটিও নেই!

হট্টিম— ঐ তো ঢের রয়েছে, চল পাহাড়ের উপরে খেলিগে।

জরদ্গব— পাহাড়ে ওঠা তো চলবে না এই বয়েসে।

হট্টিম— পাহাড়ের তলায় গুহা কেটে বসাব খেলাঘর এসো-না—

গীত

চলো যাই পাহাড়-দেশে
খেলাঘর বাঁধব না আর নতুন করে
রইব তোমায় আমায় একলা বসে
খেলব এবার ঝরণা-পারে
মেঘ-মালা-হেলা বেলা-শেষে।

জরদ্গব— কোয়ম্ কোয়ম্!

রাত্রির্গমিষ্যতি ভবিষ্যতি সুপ্রভাতম্
ভাস্বাল উদেষ্যতি হসিষ্যতি পদ্মজাতম কোয়ম্!

উষাপরীর গীত

প্রদীপ শিখায় বাতাস নিভায়
স্বপ্নশেষে রাতের দেশে—

শেষ প্রহরের চান্নি মিলায়

স্বপ্নে মিলায় আপ্‌নি, আপনা আপনি আলোতে মেশে

বয় হাওয়া, মধুর, দিন অদূর কয় পাখি --

রাত্রি যায় রাত্রি যায়

বনের সীমায়

সিঁদুর আশা

ডানায় হয় প্রভাত

উদয়তারার দেশে !

'ইতি খতম জরদ্গবের পালা'
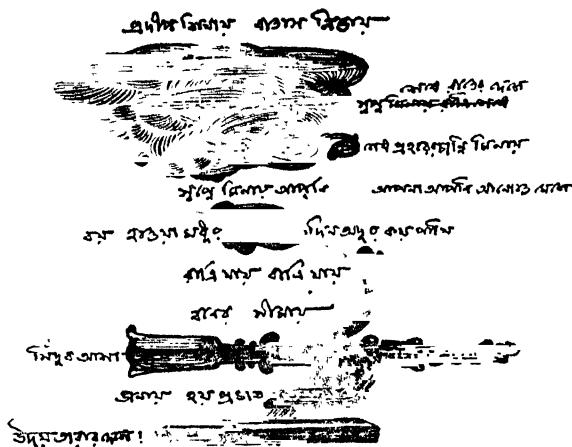
ভারতীয় সভ্যতার গোড়ার কথা বেদের মধ্যে পাই, কিন্তু সে গোড়ারও যে গোড়া বৈদিক যুগের বাহিরে এমন-কি ভারতেরও বাহিরে প্রাক-বৈদিক যুগ-সমস্তের এবং আদিতম মানবগণের ইতিহাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে— তারও আভাস পাই বৈদিক ঋষিদেরই উচ্চারিত মন্ত্র-সমস্ত থেকে। আগুনকে মানুষ জালালে পাথরে-পাথরে কাঠে-কাঠে ঠোকাঠুকি করে, এই অগ্নি-উৎপাদন ও অগ্নিস্থাপনের নানা প্রক্রিয়া বৈদিক আমলের বহু পূর্বের কথা, সেটা বেদ থেকেই পাচ্ছি— "প্রাচীনগণ ও দেবগণ যে অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন,... স্বর্গীয় দীপ্তি দ্বারা সমুজ্জ্বল ... সেই অগ্নি সত্যপ্রতিজ্ঞ" (রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋগ্বেদ, ৪ অষ্টক, ১ অধ্যায়, ৫ মণ্ডল, ২৫ সূক্ত) আবার— "এই লোকে আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ যজ্ঞকরণার্থ অগ্নির অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন ... তাঁহারা পর্বত বিদারণ সময়ে অগ্নির পরিচর্যা করিয়াছিলেন... তাঁহারা কর্মনেতা এবং অগ্নিকাম" (৩ অষ্টক, ৪ অধ্যায়, ৪ মণ্ডল, ১ সূক্ত) প্রাক-বৈদিক কোন্ পাষাণ যুগের অগ্নিকাম কর্মনেতা মানুষদের কথা শুনছি ... এই-সব সূক্তের মধ্যে দিয়ে— "এই মন্থনের উপকরণ, এই অগ্নি-উৎপত্তির উপকরণ। লোকের পালয়িত্রী (অরণিকে) আহরণ কর। আমরা পূর্বকালের ন্যায় অগ্নিকে মন্থন করিব" কিম্বা "হে অগ্নি! তোমা হইতেও পূর্বকালবর্তী ও অধিক যাগকারী যে হোতা। ... তাঁহার ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া বিশেষরূপে যাগ কর, অনন্তর হে অগ্নি! দেবগণের প্রীতির জন্য আমাদের এই যজ্ঞ ধারণ কর," আবার যেমন— "হে অগ্নি! তুমি গুহামধ্যে নিগূঢ় হইয়া এবং বনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছিলে, অঙ্গিরাগণ তোমাকে আবিষ্কৃত করিয়াছেন, হে অঙ্গিরা! তুমি বিশেষ বলের সহিত মথিত হইয়া উৎপন্ন হও বলিয়া লোকে বলের পুত্র কহে।"

এমনি নানা সূক্তের মধ্যে ধরে দেওয়া রয়েছে প্রাচীনতম যুগের নানা পুরাকাহিনী, আবার বেদের মধ্যে যে পুরাতত্ত্বের দিক রয়েছে তার থেকে প্রাক-বৈদিক শিল্প-ইতিহাস খানিকটা পেয়ে থাকি আমরা এবং সেই-সব শিল্পের উৎপত্তির মূলে রয়েছে যে বেদপূর্ব ও আর্যপূর্ব অবস্থার মানুষদের কর্মচেষ্টা, তাও বুঝতে পারি। এই যেমন বেদেতে পাই অগ্নি-উৎপাদনের কৌশলের অতি প্রাচীন বিবরণ, তেমনি আজকের দিনের নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের বই থেকেও পাই এখনো পৃথিবীর কোনো কোনো স্থানে কোনো কোনো আদিম জাতিরা ঠিক বৈদিক অগ্নিহোতৃদেরই মতো কাঠে কাঠে এবং চকমকি দিয়েও অগ্নি-উৎপাদন অগ্নিস্থাপন ও যজ্ঞাদি করে চলেছে। এই-সব অবৈদিক আদিম জাতির মধ্যেও অগ্নিমন্থন ও অগ্নিকে প্রথম পাওয়ার সম্বন্ধে বিচিত্র পুরাকাহিনী সব সংগ্রহ করেছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা। আমাদের দেবতা-সমস্ত— সেকি শুধু আমাদেরই, না অন্যেরও? এ প্রশ্নের উত্তর আজকের দিনের নৃতত্ত্ববিদ্গণের কাছ থেকে পাচ্ছি। সূর্য চন্দ্র অগ্নি বরুণ এঁরা কেবল ভারতবাসী আর্যদের দেবতা নন, আর্য অনার্য নির্বিশেষে জগৎ-জোড়া বৃহৎ মানবজাতির পূজা পাচ্ছেন এঁরা। অতি আদিমকাল থেকে আদিমতম মানুষদের বংশধর— তারাও এখনো বনে জঙ্গলে ভারতের বাহিরে দূর বহুদূর দেশে বসে বৈদিক দেবতাদের সমতুল্য দেবতাদের যাগ ও ব্রত এবং অনুষ্ঠানাদি করে চলেছে— এমন-কি এই-সব দেবতার চেহারা ঘটে পটে প্রতিমাতে ও প্রতীকে ধরে ফেলেছে তারা, এ দেশে হিন্দুধর্মপ্রচার হবার বহুপূর্বেই। নরতত্ত্ব থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় আরো যে, বৈদিক আমলটার পূর্বে বহুযুগ ধরে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ও সমাজের মানুষে

মানুষে একটা অদৃশ্য বন্ধন, কি উচ্চতর চিন্তার দিক দিয়ে, কি শিল্পকলার কি আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির দিক দিয়ে ঘটে গেছে! এই যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছড়ানো নানা আদিম মানুষদের আচার-ব্যবহার-শিল্পকলা ইত্যাদির দিক দিয়ে একটা অতি চমৎকারি মিল দেখা যায় সেই মিলটা কী উপায়ে কেমন করে ঘটা সম্ভব হয়েছিল, নদী সমুদ্র পর্বত মরুভূমি ইত্যাদির বাধা সত্ত্বেও, তার রহস্য আজও স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে নি। এমনি দেখা যায় শুধু বৈদিক ঋষিদের মধ্যে নয়, বৈদিক অবৈদিক নির্বিশেষে পৃথিবীর তাবৎ আদিম মানুষের মধ্যে দেবলোক পিতৃলোক বলে একটা পুরাতন জন্মভূমির স্মৃতি ও কল্পনা রয়েছে। আবার এও একটা রহস্য যে সব মানুষরাই একজন দেবশিল্পীর কল্পনা করছে যিনি তাদের মধ্যে এসে নানা শিল্পকর্মের ও নানা শিল্পসামগ্রীর আবিষ্কারের পথ খুলে দিচ্ছেন! ঋষিদের মত হল মানবশিল্প-সমস্তই— এই হাতি ঘোড়া ইত্যাদি খেলেনা, এই নানারূপ বস্ত্র অলংকার সমস্তই 'দেবশিল্পানাম্ অনুকৃতিহিরিহলোকে' (শিল্পশাস্ত্র)। প্রাচীন আমাদের আবাস হল দেবলোক, সেখান থেকে প্রবাসে এলেম আমরা। নানা শিল্পও এল আমাদের সঙ্গে। এই হল পুরোনো বৈদিক মত। প্রাচীন দেবলোক পিতৃলোক এ-সব চীনের কাছাকাছি কি বিলাতের কাছাকাছি এ নিয়ে বিচার-বিতর্কে লাভ নেই আমাদের। এই ইহলোকে শিল্পকে কী ভাবে কোথায় পাচ্ছি সেইটেই দেখে নিই যতটা পারি প্রাচীন এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের সাহায্য নিয়ে।

যে ভূমির উপরে আজও মানুষ বসবাস, চলাচল করছে, যে জলের উপর দিয়ে পারাপার করছে আজও মানুষ, ভূমিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা সেই জল স্থল থেকে আদিতম মানুষের শিল্পকলার নানা নিদর্শন আবিষ্কার করে তুলছেন এবং ধরে দিচ্ছেন সেই-সব জিনিস আমাদের চোখের সামনে!

যে অতি প্রাচীন যুগে মানুষকে এমন একটা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় যে, সে নর কি বানর এ-বিষয়ে নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে অতি বিচক্ষণ পণ্ডিতদেরও সন্দেহ ঠেকে সেই অবস্থা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। আধুনিক পণ্ডিতগণের সন্ধান এবং সেই অবস্থায় মানুষ নিজের হাতে কী কী গড়ে গেছে নিজের শিল্পকৌশল খাটিয়ে তারও নিদর্শন পেয়েছেন পণ্ডিতেরা— "among the earliest evidences of some creature, either human or at least more man-like than any living ape upon earth, are a number of flints and stones very roughly chipped and shaped so as to be held in the hand"— H. G. Wells, *Outline of History*.

এই প্রথম তুষার যুগের নর-বানরের মাঝামাঝি এক জীবের হাতে-গড়া জিনিসের সঙ্গে যবদ্বীপের ভূগর্ভ থেকে পণ্ডিতেরা এই ধরনের মানুষের একখণ্ড অস্থি পেয়েছেন— কাজেই দেখছি মানুষের নিজের ইতিহাসই দাঁড়াচ্ছে শিল্পশিক্ষয়িতা একজন দেবশিল্পীর কল্পনার বিরুদ্ধে! যা সহজে ভাঙা যায় না, সহজে কাটা যায় না, সুকঠিন এমন প্রস্তর তাকেই গড়ন দেওয়া— এই হল প্রথম শিল্পচেষ্টা মানুষের! যার হাতে ছেনি বাটালি কাটারি কিছুই নেই এমন একজন মানুষ অস্ত্রশস্ত্র গড়ার দিকে মন দিলে জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে; এই ঘটনা দিয়ে সূত্রপাত হল মানুষের শিল্প-ইতিহাস। হননের ইচ্ছা এবং জয়ের ইচ্ছা— শিল্পধারা প্রথম উচ্ছ্বসিত হল এই দুই ইচ্ছার ধাক্কায়, অবশ্য পেটের দায় যে এর মূলে ছিল না তা নয়। কাজেই বলতে পারি দায়ে পড়ে হতে হয়েছিল প্রথম মানুষকে শিল্পী ও কৌশলী। সে সময়ে ইমারত প্রস্তুত, ঘর বাঁধা এ-সব শিল্পের ভাবনাও ওঠে নি, কাপড় বোনার চেষ্টাও জাগে নি হয়তো— বনবাসী গুহাবাসী কি

তরুশাখাবাসী মানুষ তখন চেহারাতে বানরের কাছাকাছি। কেবল এক তার শিল্প-প্রবৃত্তি নিয়ে বানর থেকে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক এক জীব সে। সেই অতি পুরাকালের মানুষের ঘরকন্না যুদ্ধবিগ্রহের নানা নিদর্শন ভূগর্ভ থেকে যা আবিষ্কার করেছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তা থেকে এটুকু বলা চলল যে, সেই প্রথম মানুষেরা নানা প্রহরণ ইত্যাদির যে নির্দিষ্ট রূপ দিলে পাথরকে, এই আজকের দিনে পর্যন্ত— সেই একই ছাঁদে মানুষ গড়ে চলল ছুরির ফলা, বল্লমের খোঁচা, হাতুড়ি করাত। মহাভারতের যুদ্ধের বিবরণে নানা অস্ত্রের নাম পাই। সেই অস্ত্রের নির্মাতা বা বিধাতা যাই বল এই প্রাচীন মানুষরা। তখনকার প্রথা ছিল গুহার মধ্যে নয়তো গাছের উপরে লুকিয়ে রাখা অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। এই অস্ত্র গোপনে রাখার প্রথা— তাও দেখি চলে এসেছে অস্ত্রের প্রথম নির্মাণের কাল থেকে আজ পর্যন্ত— অর্জুন যখন অজ্ঞাতবাসে চললেন তখন শমীবৃক্ষের উপরে অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখে গেলেন। রাবণের মৃত্যুবাণ সে লুকানো রইল অন্ধকার গুহায় অতি নিভৃতে। আজকের কেল্লার অস্ত্রশস্ত্র, সে অতি সুরক্ষিত গোপন স্থানে গোরা-পাহারায়-ধরা!

কি শিল্পকলার দিক দিয়ে কি আচার-অনুষ্ঠানের দিক দিয়ে প্রাচীনতম কালের প্রভাব আশ্চর্যভাবে আজও ধরে রয়েছে মানুষ, আজকের দিনের শিল্প বহন করছে যুগান্তরের অপরিবর্তনীয় ছাঁদ— বড়ো থেকে ছোটোখাটো বিষয়েও শুধু ভারতবর্ষে নয় সুসভ্যতম ইউরোপেও! এই শিল্পকলাকৌশল ইত্যাদির দিক দিয়ে মানবের ইতিহাস যতই চর্চা করা যায় ততই দেখা যায় যে, ধর্ম নিয়ে আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে নানা জিনিসের নির্মাণের প্রথা-প্রকরণ নিয়ে কালে কালে জাতে জাতে দেশে দেশে নূতনে পুরাতনে একটা নৈকট্য ভারি সুস্পষ্ট। নরতত্ত্ব যতই চর্চা করা যায় ততই দেখা যায় যে, কি উচ্চতর চিন্তার দিক দিয়ে, কি আচার-অনুষ্ঠানের দিক দিয়ে, পৃথিবীর সমস্ত আদিম জাতির সঙ্গে কী ভাবে ভারতবর্ষের আমাদের ব্রত-অনুষ্ঠানগুলি এবং তার সঙ্গে নানা শিল্পকলা চিত্র নাট্য ইত্যাদিও এক সূত্রে বাঁধা।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ব্রতপূজা, আচার-অনুষ্ঠান রাজনীতি ও নানা প্রথা-প্রকরণের সঙ্গে আমাদের এ দেশের ভারি মিল লক্ষ্য হয়, সূর্যের মূর্তি, গরুড়, বুদ্ধ এবং নানা দেবতার বাহনের দেখা পাই— সেখানে এবং এখানেও, এ পূর্বেই বলেছি। এখন কথা হচ্ছে, কোনো-এক কালে বৈদিক ভারতের উপনিবেশ ছিল কিনা আমেরিকা! এ তর্কের মীমাংসায় বসে থাকতে হলে চলে না, কেননা দেখতে পাই অনেক বৈদিক অনুষ্ঠানই বেদপূর্ব ও যে-সব আদিম মানব ভারতের সভ্যতা থেকে আজও বহুদূরে তাদের সম্পত্তি।

নাট্য নৃত্য এ-সব ভারতে অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। 'ভারতীয় নাটকের গোড়ার কথা' সম্বন্ধে শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় চমৎকার প্রবন্ধে ১৩৩৬ আষাঢ়ের প্রবাসীতে যা প্রকাশ করেছেন, তাতে তিনি ভারতীয় নৃত্য ও নাট্যকলার ইতিহাস চর্চা সামবেদ পর্যন্ত টেনে ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু এই বৈদিক প্রমাণের পাশে ইউরোপীয় ভ্রমণকারী নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের চাক্ষুষ প্রমাণ ধরে দেখি ঋষিদের সোমযাগটির অনুরূপ অনুষ্ঠান সমস্ত নানা আদিম জাতির মধ্যে প্রচলিত রয়েছে; সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে মদ্য পান একটা রীতিমত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একটা উৎসবের ছাঁদ, একটা যাগযজ্ঞের গাম্ভীর্য পেয়েছে দেখি। সেখানে নৃত্যগীত স্ত্রীপুরুষে মিলে করে চলেছে কিন্তু সুনিয়মে, এখনকার মাতালে-কাণ্ডের মতো একটা বিশ্রী ব্যাপার একেবারেই নয়!

যেমন নানা বৈদিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির সমতুল্য অনুষ্ঠানাদি পাই অবৈদিক জাতিগণের মধ্যে, তেমনি বৈদিক দেবতাদেরও দেখা পাই এবং বৈদিক আমন্ত্রের সমতুল্য ঋক্ সমস্ত পাই বহুতর আদিম জাতিগণের

মধ্যে। বৈদিক আমলে সোমরস প্রস্তুত হত একটা মহামহোৎসবের সঙ্গে কিভাবে, তার একটু আভাস পাই ঋগ্বেদে। নানা দেশে নানা জাতির মধ্যে যে সোমরস প্রস্তুত হয় তার কথাও পাই ঋক্ সমস্ত থেকে। যেমন, "যে-সকল সোমরস অতিদূর দেশে কিম্বা অতি সন্নিহিত দেশে প্রস্তুত হইয়াছে কিম্বা যে-সকল সোম শর্যণাবৎ নামক সরোবরে প্রস্তুত হইয়াছে, কিম্বা যে-সকল সোম আর্জীক দেশে কিম্বা কৃত্বদেশে কিম্বা সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যে কিম্বা পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে— সেই-সমস্ত সোম উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হইতে হইতে নভোমণ্ডল হইতে বৃষ্টি আনয়ন করিয়াছিল··· সোম আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের উপার্জিত বস্তু··· সোম মত্ততার উৎপাদক··· সোম প্রীতি উৎপাদন করেন ·· তিনি (সোম) জন্মমাত্র জলে শোধিত হয়েন, ···প্রস্তরফলকে তাঁহাকে নিষ্পীড়িত করে।" এইবার সোমরস প্রস্তুত হত কিভাবে তারি হিসেব যথা— "ত্রিতের যে দুই প্রস্তরফলক নিভৃত স্থানে সংস্থাপিত ছিল সোম তাহার মধ্যে অর্পিত হইয়া দুই ফলক পৃথক করিলেন— অমনি পুরোহিতগণ সপ্তপ্রকার ছন্দ আবৃত্তি করিয়া প্রেমাস্পদ সোমকে স্তব করিতে লাগিলেন··· যখন সোম জন্মগ্রহণ করিতেছেন সপ্তমাতা সম্পত্তির নিমিত্ত তাঁহাকে স্তব করিতেছে ···হে সোম তোমার সেবকেরা সুমধুর স্বরে তোমার স্তব করিবার অভিলাষে যজ্ঞগৃহ-মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে··· সাতটি স্ত্রীলোক অঙ্গুলিদ্বারা তোমাকে চালনা করিতে করিতে এক স্বরে তোমার বিষয়ে গান করিল··· অঙ্গুলিগুলি যেন কয় ভগিনী, যেন তাহারা পরস্পর স্বসম্পর্কীয় কয়েকটি স্ত্রীলোক, সোম যেন তাহাদিগের স্বামী। এই কয়টি স্ত্রীলোক অতিশয় কার্যকুশল, ইহারা তাহাদিগের বলশালী মাননীয় স্বামীকে চালাইতেছে, ইহাদিগের বাসনা সে সোমরস ক্ষরিত হয়। হে বন্ধুগণ, মত্ততা উৎপাদন করিবার জন্য সোম শোধিত হইতেছে, সেই সোমকে তোমরা গানের দ্বারা সন্তুষ্ট কর যেরূপ বালককে আহারের দ্রব্য দিয়া আহ্লাদিত করে ইত্যাদি···"

এখন এই যে বৈদিক ভারতের সোমপানোৎসবের বর্ণনা এর সঙ্গে ভ্রমণকারীদের চোখে-দেখা ফিজি দ্বীপের একটা পানোৎসবের বর্ণনা মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে উভয় অনুষ্ঠানের মধ্যে কতটা মিল ও অমিল রয়েছে: "Exactly opposite to the king is placed the Kava-bowl and behind him sits the man who is to prepare the drink, on either side of him sits an assistant one of whom carries a fan wherewith to drive away the flies, and another takes charge of the water which is kept in cocoanut shells··· all being ready one of the matabools sends for the Kava root which is then scraped quite clean and cut into small pieces. These are handed to the young men or even to the young women present who masticate the root contriving in some ingenious way to keep it quite dry during the process. It is then wrapped in a leaf and passed to the preparer who places it carefully in the bowl."

বৈদিক সোমলতা দুখানি প্রস্তর ফলকে পিষ্ট হল আর ফিজিদ্বীপের সোমলতা যুবক যুবতীদের দন্তের দ্বারা পিষ্ট হল; এইটুকু মাত্র প্রভেদ। তার পর—"Matabool then calls for water···next comes the order to put in the Fow··· this is a bundle of very narrow strips of bark of a tree belonging to the genus Hibiscus the assistant takes a quantity of this material

and lays it on the water spreading it carefully so that it lies equally on the surface of the liquid." এইবারে দশ অঙ্গুলি ও দুই হস্তের চাপনে কি ভাবে রস প্রস্তুত হচ্ছে তার কথা : "Thus the hands and arms perform a variety of curves of the most graceful description··· a fine and uncommon subject of study for the painter."— এই Kava উৎসবে কখনো রাজা কখনো বা দেবতার সেবক পৌরোহিত্য করেন এটাও বলেছেন ভ্রমণকারী। — Wood, *Natural History of Man*. P. 318-322

এই যেমন দুই বিভিন্ন জাতির মধ্যে একই ধরনের অনুষ্ঠানের দেখা পাচ্ছি— তেমনি একই ভাবের ঋক-সমস্তও পাচ্ছি সম্পূর্ণ দুই বিভিন্ন অংশে পৃথিবীর। উত্তর আমেরিকার মানুষ তারা বৃষ্টি কামনা করে স্তোত্র পাঠ করছে, যথা : "We cling to the rites of our ancestors becuase they have been pronounced good by those who know ; we erect our alters sing our traditional songs and celebrate our sacred dances for rain that our corn may germinate and yield abundant harvest··· all people awake, open your eyes, arise, become children of light, vigorous, active, sprightly. Hasten clouds from the four world quarters, come snow in plenty, that water may be abundant when summer comes ; come ice, cover the fields, that the planting may yield abundance. Let all hearts be glad ! The knowing ones will assemble in four days ; they will circle the village dancing and singing their lays··· That moisture may come in abundance."

এই উত্তর আমেরিকাতে 'নবাহ' নামে একটা অনুষ্ঠান হয় নয় রাত্র ধরে, তারি সম্পাদনে চমৎকার স্তোত্র দিয়ে দেবতার আবাহন হচ্ছে যেটি প্রায় বৈদিক ঋকের সমতুল্য, যথা : 'In Toegihi, in the house made of dawn, in the house made of evening twilight, in the house made of dark cloud, in the house made of rain and mist, of pollen, of grass-hoppers, where the dark mist curtains the doorway, the path to which is on the rainbow, when zigzag lightning stands high on top, where the he-rain stands high on top, oh male divinity ! with your mocasins of dark cloud, come to us."— See *Mythology of All Races*. Vol XP, 169-202

এমনি সব বিভিন্ন দেশের আচার-অনুষ্ঠান-শিল্পকলার মধ্যে একটা চমৎকার মিল দেখে মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে এক সময়ে বৈদিক বা হিন্দু প্রভাব প্রশান্ত সাগরের ওপারে আমেরিকাতেও পৌছে গিয়েছিল ? কিন্তু এরূপ ভেবে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বাধা আছে, তা আজকের মানবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরাই স্বীকার করেছেন : "The idea of independent genesis at various times in various localities as opposed to the monogenesic theory is gaining ground in art as well as in any other subjects. Just as we have given up the belief in a common ancestor of the whole human race, we are being gradually forced to give up the belief that all art work had its origin in a single source."— Spearing, *The Childhood of Art*. P. 126

আমাদের ধুতি চাদরের সঙ্গে রোম্যানদের সাজ-সজ্জার একটা মিল স্পষ্ট দেখা যায় কিন্তু এই মিলটুকুর উপরে নির্ভর করে যেমন বলা যায় না রোম প্রভাবান্বিত হল বাঙালীর দ্বারা কিম্বা বাঙালী প্রভাবান্বিত হল রোম্যানদের দ্বারায়, তেমনি শিল্পবিষয়ে আমাদের দেশ অন্য দেশকে পরিপক্ক করে তুলেছে অতি আদিম কালেই, এও বলা চলে না। হঠাৎ দেখলে মনে হয় আমাদের হোগলা পাতার ছাউনিটাই ইউরোপ থেকে আবিষ্কৃত করগেট্ টিনের চাদরগুলোর পূর্বপুরুষ। এরূপ ভেবে চলায় মজা পেতে পারি, কিন্তু সত্যকে পাই নে। অস্ট্রেলিয়াতে অনেকগুলি বড়ো বড়ো ঠিক অজন্তার মতো চিত্রবিচিত্র গুহা এবং পাথরে-খোদাই-করা দেওয়াল আবিষ্কৃত হয়ে সেগুলোতে যে বৌদ্ধ যুগের প্রভাব আছে এমন ভেবে নেওয়া ভুল, যাঁরা এই-সব গুহা স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁরা কী বলছেন দেখি: "at first we could not bring ourselves to believe that these carvings were the work of savages, and we conjectured that the figure of the Kangaroo might have been the work of some European."— Wood, *Natural History of Man.* Pp. 95-96

রাজ্য বিস্তার, ধর্ম বিস্তার, বাণিজ্য বিস্তারের দিক দিয়ে এদেশে ওদেশে সেদেশে আচার-ব্যবহার শিল্পকলা ইত্যাদির দিক দিয়ে আদান-প্রদানের ছাপ সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এইদিক দিয়ে শিল্পের আদিম উৎপত্তির সবখানি রহস্যের মীমাংসা হয় না। পাষাণযুগে যখন এদেশে ওদেশে কোনো উপায় নেই কোনো পন্থা নেই ভাবের এবং শিল্পের আদান-প্রদানের, তখনো দেখা যায় দুই বিভিন্ন দেশের দুই বিভিন্ন জাতির গড়া সমস্ত জিনিসপত্রে একটা আশ্চর্য রকমের মিল রয়েছে— যা দেখে ভিন্ন জাতির ভিন্ন জাতীয় শিল্প-আচার-অনুষ্ঠানের বিভিন্ন সত্তা স্বীকার না করে উপায় থাকে না।

শিল্পকলা কিম্বা শিল্পকৌশল ও তার প্রকরণাদি কোনো জাতিবিশেষে কি সমাজবিশেষে বদ্ধ নেই, কিম্বা একের কাছ থেকে অন্যে ধার করছে সে-সব এও নয়, উচ্চ-নীচ সভ্য-অসভ্য সকল জাতির সাধারণ সম্পত্তি এ-সব। একে থেকে অন্যে স্বাধীন ভাবে থেকে নানা শিল্পকলার নানা প্রথা-প্রকরণ আবিষ্কার করে একই ছাঁদের ও একই ধরনের রচনা-সমস্ত করে চলেছে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে, মানবজাতির ইতিহাস এইটেই প্রমাণ করছে। সূর্য চন্দ্র বায়ু বরুণ এঁরা যেমন কোনো দেশ-বিশেষের নয়, জাতি-বিশেষেরও নয়, তেমনি আর্টও মানব-সাধারণের। শিল্পের জাতি-বিভাগ করে দেখতে গেলে শিল্পের বৃহত্তর দিক বাদ দিয়ে সামান্য দিক দিয়েই দেখা হয়। মানুষকে মানব হিসেবে দেখা আর মানুষের নাকের উপরে তিলকাদি দেখে সে রামভক্ত কি শ্যামভক্ত কি বিষ্ণুভক্ত দেখে নিয়ে চলার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে এটা তো স্বীকার করতেই হবে। অন্তত শিল্পকে জাতিগত ভাবে দেখার আগে জাতি-কুল-নির্বিশেষে শিল্প যেখানে দেখা যাচ্ছে সেদিকে চোখ দেওয়া চাই। আদিম এবং অকুলীন শিল্পকলা কিভাবে জাতে উঠে গেল তার ইতিহাস মহাভারতের পূর্বেকার আর-একটা মহাভারতের মতো বৃহৎ ব্যাপার এবং অত্যন্ত বিচিত্র ইতিহাস সেটি, তারি একটু আভাস দিতে চাই এইখানে—

জগতের আদি দেবতা সূর্য। সূর্যের গতিবিধি ও তাঁর রূপ বোঝাতে স্বস্তিকাদি প্রায় সতেরোটি চিহ্ন রয়েছে দেখি নানা দেশের মানুষের মধ্যে খুব আদিম কাল থেকেই। এ থেকে দেখা যায় যে এক সময়ে স্বস্তিক চিহ্নাদি সবকটিই অকুলীন অবস্থায় থেকে শিল্পীদের হাতে নানা রেখাচিত্রণের আবিষ্কারের সহায় রূপে রয়েছে।— See, F. Jackson, *Lessons on Decorative Design.* Plate VI.

এই চিহ্ন হিন্দুধর্মের দিনে জাতে উঠল, ঘটে অঙ্কিত হল, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের দিনে বজ্রচিহ্ন হল পদ্মচিহ্ন হল— এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে বদলি হল স্বস্তিক, আবার শৈব ধর্মের সময়ে ত্রিশূল হয়ে হিন্দু ধর্মের সেবায় লাগল। এমনি ধর্ম আর জাত ফেরাতে চলল, এই যেমন সূর্যের প্রতীক, তেমনি অসংখ্য জিনিস জাতের গণ্ডিতে ধরা পড়ে গেল কালে কালে এমন ভাবে যে তাদের আদিম অকুলীনত্বটি আর স্মরণেই রাখলেম না আমরা। হিঁদুর ঘরের বউ, তার হাতের শাঁখা আর নোয়া দুটোই ভয়ংকর রকমের অহিন্দু ছিল। পূর্ব থেকে পূর্বকালে পাষাণযুগের এবং লৌহযুগের নরখাদক এবং বিধর্মীদের মেয়েরা এই দুটি গহনা পরে সাজত। এ দুটি এমন ভাবে বাঙালীর ঘরে জাতে উঠে গেছে যে ভারতবর্ষের অনেক জাতের সঙ্গেও এরা আর সম্পর্ক রাখতেই চাচ্ছে না।

ধান দূর্বা কলাগাছ এ-সব হিন্দু অনুষ্ঠানের জিনিসে দাঁড়িয়েছে এখন, কিন্তু এদের দেখা পাই বহুতর অহিন্দু অনুষ্ঠানে— শঙ্খ বাজায় এখনো লড়ায়ের সময় শ্রীকৃষ্ণের মতোই প্রশান্ত সাগরের নানা দ্বীপের অধিবাসীরা। কাজেই জাতি বিভাগ করে শিল্পকে দেখতে চললেও শিল্পের অকুলীনত্বের দিক দিয়ে শিল্প-চর্চা আরম্ভ করা চাই। ভারতের সঙ্গে বহির্ভারত এবং অভারতও নিয়ে যেমন সম্পূর্ণ হয় ভারত-ইতিহাস, তেমনি ভারত-শিল্পের বেলাতেও ভারত-ছাড়া শিল্পের কথা আপনা হতেই উঠে পড়ে, ঠেকাবার জো নেই।

এখনো দেখা যায় যে এদেশের আদিম অধিবাসী তারা ধনুর্বাণ নিয়ে ঘুরছে মৃগচর্ম পরে কিরাত বেশে শিবের মতো, হরধনু কবে জাতে উঠল তা এদের কাছে পাব না, কিন্তু এরা নিজের পরিচয় দেবার বেলায় বলে— আমি মানুষ বা মানবকুলসম্ভূত, মানবশিল্পও ঠিক এই কথাই বলে — আমি তাবৎ মানবের আত্মীয়। এই যে বৃহৎ মানব তার সঙ্গে যে যোগ রয়েছে আজকের আমাদের ঘরে-ধরা নানা শিল্প-সামগ্রীর, নানা গৃহস্থালীর তৈজস পত্রের, নানা আনন্দ-উৎসবের নানা নাট্যকৌতুকাদির— তার ইতিহাস ছেড়ে দিলে শিল্পচর্চা অসম্পূর্ণ থাকে এটা বলাই বাহুল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে। বেদের ঋক্-সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান সমস্ত তারও একটা গোড়া এবং পূর্বাপর ক্রম আছে ধরা মানবসমাজের ইতিহাসে তা পূর্বেই দেখিয়েছি— এখন আজকের একটা অত্যন্ত ঘরাও অনুষ্ঠানের একটুখানি কি ভাবে মানবজাতির পুরাতন অবস্থার সঙ্গে যুক্ত তাই দেখে নিই—

বিয়ের রাতে স্ত্রীআচারের সময় কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র সবার ঘরেই মেয়েরা একটা ছড়া বলে চলে হাতে সুতো বাঁধার বেলায়—

'কড়ি দিয়ে কিনলেম, দড়ি দিয়ে বাঁধলেম,
হাতে দিলেম মাকু— ভ্যা কর তো বাপু।'

ছড়াটা কালে কালে মুখে মুখে চলতে চলতে একটা বদ্‌চেহারা পেয়ে গেছে— ছাগলের। আসলে ছড়াটা হয়তো এই ছিল—

'কড়ি দিয়ে কিনলে, দড়ি দিয়ে বাঁধলে,
হাতে নিলে মাকু— বিয়া কর গা বাপু।'

অর্থাৎ রোজগারের ব্যবসায়ে কেনাবেচায় পাকা হলে, দড়ি দিয়ে নানা জিনিস ঘর জাল ও গোরু-মোষ বাঁধতে ও বুনতে পাকা হলে, হাতে মাকু নিয়ে কাপড় বুনতে শিখলে, এক কথায় পরিবার-প্রতিপালনে সক্ষম হলে যখন, তখন গিয়ে বিয়ে করো তাতে বাধা নেই। এখনো দেখা যায় গরিব গৃহস্থ চাষা-ভুষো

তারা ঠিক এই অবস্থায় পৌছে তবে বিয়ে করে— প্রায় হয়তো পঞ্চাশও পেরিয়ে। পাস-করা ছেলের পক্ষে এ ছড়া খাটেই না অথচ ঘরে ঘরে সেই কোন্ একটা পূর্বতন কালের গাঁয়ের গৃহস্থালির স্বপ্ন-জাগানো ছড়াটি বলে হাতে সুতো বেঁধে দিচ্ছে— খুব সুশিক্ষিত সুসভ্য বাঙালীর ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত। শিল্পের কুলক্রম একটা আছে— সেটা বৃহৎ মানব-ইতিহাসের ক্রম ধরে আবিষ্কার করতে পারা যায় এবং তাবৎ শিল্পের যথার্থ পরিচয় নিতে হলে এই আজকের ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যেরূপ উদার ভাবে মানবচরিত্র ও মানব-সমাজাদির আলোচনা করে চলেছেন সেই ভাবেই কাজ করে যেতে হবে আমাদের।

বেদই আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ— কি মানব কি মানবগণের শিল্পকলা আচার-অনুষ্ঠানাদির চর্চার বেলায় বৈদিক প্রমাণকে অগ্রাহ্য করা ভুল— কিন্তু একমাত্র পুরাকাহিনী দিয়ে ইতিহাসের কাজ চালানো চলে না, ওর সঙ্গে মানবতত্ত্ব ভূমিতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে আজকের পণ্ডিতেরা আলোচনায় যতটা অগ্রসর হলেন তারও প্রমাণ-সমস্ত তলব করতে হয়, না হলে কাজটা পাকা হয় না। আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই এই আজকের পণ্ডিতেরা মানব-ইতিহাসের বিষয়ে যা বলছেন তার কথা কিম্বা সে-সব কথা উড়িয়ে দিয়ে বৈদিক প্রমাণকে বলবৎ রেখে ভারতকেই সকল বিষয়ে সব দিক দিয়ে আদিভূত কারণ বলে ধরে নিয়ে বসে থাকি এবং সেই একদেশদর্শিতাটুকুর সাহায্যে পৃথিবীর ইতিহাস দেখে চলি। এতে করে কাজ নষ্টই হয় এবং ভারত-সভ্যতা ভারত-শিল্পকলা সমস্তই এমন একটা অযথা রকমের বিরাটত্ব ও বৈরূপ্য পেয়ে বসে যে সত্যই মনে হয় বুঝি— "ভারতবর্ষ— সভ্যতার জ্ঞানের, মনুষ্যত্বের বীরত্বের, সকলেরই আদিভূত।" এইরকম ভুল ধুয়ো ধরে ভারতশিল্পের মস্ত একখানা বই বৈদিক ও নানা পৌরাণিক মতের উপরে দিব্য প্রতিষ্ঠা করা চলে না যে তা নয়, এবং সেই ভাবের একদেশদর্শী ব্যাপারকেও খাড়া করে তোলায় যে বাহাদুরি নেই তাও নয়, কিন্তু সেটা রঙিন কাঁচের চশমার মতো একরঙা পৃথিবীই দেখায়। আমও লাল জামও লাল দেখে ছবি আঁকা চলে না। সেখানে ঠিক দেখতে হলে সাদা চোখ, নয়তো সাদা চশমাই প্রশস্ত। শিল্প বিষয়ে শুধু নয়, সব বিষয়ে অতিরঞ্জন মোটেই হতে পারে না যদি সহজ সাদা চোখে দেখে চলি পৃথিবীর দিকে। এই সাদা চোখ নিয়ে দেখে বৈদিক ঋষিরা একদিন বলেছিলেন "কো দদর্শ প্রথমং জায়মানম্" প্রথম যে জন্মেছিল তাকে কে দেখেছে। কৃষ্টিয়ান য়িহুদী এরা রঙিন চশমায় দেখে নিলে আদম আর হবাকে প্রথম-জায়মান রূপে। এই ভুল ভাঙল যখন ইউরোপীয় আধুনিক পণ্ডিতেরা পুনরায় সাদা চোখে প্রথম-জায়মানকে সন্ধান করতে থাকলেন। সেই বৈদিক ঋষির সহজ দৃষ্টি আর আজকের ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সহজ দৃষ্টি যা সাক্ষী দিলে, তার মধ্যে ভারি চমৎকার একটা মিল দেখা গেল! এই জগতে নানা জীবাদির উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈদিক মত হল, যথা— প্রথম সৃষ্টি হল কৃমি, তার পর মৎস্যাদি, পরে পক্ষী, তৎপরে পশু, তার পরে বানর, সবশেষে নর। ইউরোপের অত্যন্ত আধুনিক মত জীবসৃষ্টির বিষয়ে সেও এই বৈদিক কালের মতটিকে অনেকখানি সমর্থন করে— চাক্ষুষ প্রমাণ-প্রয়োগ দিয়ে আমাদের দেখালে কৃমি থেকে নর পর্যন্ত ধাপে ধাপে সামান্য চেতনাবান জীবাণু থেকে সক্ষম সবল সচেতন জীব-সমস্তের সৃষ্টির ক্রমটি।— See, H. G. Wells, *The Outline of History*, Chapter II.

বৈদিক কালের কথায় আর আজকের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সিদ্ধান্তে একটা মিল দেখে যদি ভেবে নিই আজকেরই মতো সেকালেও ভূমিতত্ত্ব মানবতত্ত্ব ইত্যাদি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আলোচিত হয়ে চলেছে তবে একটু বিশেষ ভুল করা হয়। এইরকম ভুল পুষ্পকরথের আর আজকের উড়োজাহাজের

বেলাতেও করে ফেলি আমরা। যেটার মূলে শ্রুতি স্মৃতি এবং সহজ বুদ্ধি এবং যেটার মূলে সহজবুদ্ধির সঙ্গে মিলেছে সুপরীক্ষিত ও বিজ্ঞানসম্মত অক্লান্ত চেষ্টা ও তার ফল, তাকে এক করে দেখা চলে না। দুই রকমের সিদ্ধান্তে মিলিয়ে দেখা চলে, কিন্তু দুটোকে এক করে দেখলে বিষম ভ্রান্তিজালের মধ্যে পড়ে যাই আমরা।

একটা মস্ত জলপ্লাবনের ইতিহাস কি সুসভ্য কি অসভ্য সব মানুষেরই পুরাকাহিনীতে রয়েছে। আজকের বৈজ্ঞানিকেরাও বলছেন— একটা নয় তিন-চারটে তুষারপ্লাবন ও সঙ্গে সঙ্গে জলপ্লাবনের কথা। এ থেকে বাইবেলের নোয়া কি মুসলমানদের হজরৎ নূহ কি আমাদের মনু বা ফিজি দ্বীপবাসীর কোনো-একজনকে তাবৎ মানবজাতির আদিপুরুষ বলে ধরতে গেলে বৃথা ভুলেরই সৃষ্টি হয় এবং তাতে মানবশিল্পচর্চার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর নানাস্থানে নানা অবস্থার মানুষ ধনুক বাণ বল্লম হাঁড়ি ঘট শিল-নোড়া ইত্যাদি একই ছাঁদে গড়ছে— এ থেকে এবং এই জলপ্লাবনের কাহিনী থেকে মানবের একটা আদি বাসস্থান সহজেই কল্পনায় উদয় হয়— মনে হয় সব মানুষ নানা পক্ষীর মতো কিম্বা এক গোয়ালের জীবের মতো একসময়ে একত্রে ছিল— হঠাৎ জলপ্লাবনে ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। একান্নবর্তী পরিবার কিম্বা ঝড়ে পড়া গাছের পাখির মতো দূর দূর দেশে গিয়ে উঠল মানুষ পূর্বেকার স্মৃতি শ্রুতি আচার অনুষ্ঠান শিল্পকলাদি নিয়ে। এ ধারণার মূলে সত্যের মতো খানিক কিছু পাই, কিন্তু এই সত্যকে স্বীকার করতে হলে সেই আদিতম প্লাবনের কালেও মানুষ 'টাইটানিয়া' জাহাজের মতো জাহাজ প্রস্তুত করে কেউ গিয়ে ঠেকল আরারুট পর্বতে কেউ উঠল সুমেরুচূড়ায় কেউ ঠেকল গিয়ে উত্তরমেরুতে— এমনি একটা কষ্ট-কল্পনা করে চলতে হয়। সহজ রাস্তা হচ্ছে জগৎ-জোড়া জলপ্লাবন স্বীকার করে নিয়ে বলা, যে, সে-সময়ে পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের মানুষরা যার যেমন সাধ্য সাঁতরে বা ভেলায় কিম্বা ওরই মধ্যে একটু মজবুত রকম নৌকায় আত্মরক্ষার জন্য ভেসে পড়ল স্ত্রীপুত্র খাদ্যাদি নিয়ে এবং কতক তারা ডুবল কতক বা উঠল নানাস্থানে নানা উচ্চভূমি বা পাহাড়ে, কতক নিজের দেশের কাছেই কতক বা দেশছাড়া হয়ে অনেকটা দূরে। তার পর তাদের নিজের নিজের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে ঘর বাঁধলে; নানা জিনিস তৈরি করে নিলে পাথরের, কাঠের বেতের, বাঁশের। এই যে বারেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে মানুষ, যতটা সম্ভব নিজের বাসভূমি থেকে দূরে; এই ঘটনাই সম্ভবতঃ একই শিল্পের নানাস্থানে দেখা পাওয়ার মূলে রয়েছে। তার পরে আছে রাজ্যবিস্তার, এক জাতির দ্বারায় আর জাতির শিল্পীদের বন্দী করণ এবং তাদের দ্বারায় নানা সামগ্রী নির্মাণ করিয়ে নেওয়া, বাণিজ্য ব্যাপার এসেছে তার পরে। শিল্পের প্রচার ও প্রসারের মূলে রয়েছে এই-সব। কিন্তু এ সত্ত্বেও, সেই আদিতম প্রস্তরশিল্প তা দেশে দেশে কেন একই ছাঁদের জিনিস দিলে তার রহস্য ভেদ করা দুরূহ হয়। এই বাবুই পাখিগুলো দেশে-বিদেশে কেন যে একই ছাঁদের ঘর বাঁধে, প্রজাপতি কেন একই ছাঁদে গুটি বাঁধে ভারত ও বিলাত দুই স্থানেই, এই রকমের একটা 'কেন' সামনে এসে দাঁড়ায়। যখনি এই অতি প্রাচীন পাষাণযুগের শিল্প-ইতিহাস চর্চা করতে অগ্রসর হই তখনি দেখি দূরদূরান্তরের মানুষ এ দ্বীপে সে দ্বীপে ছড়ানো, কিন্তু একই প্রথা ও প্রকরণ নিয়ে গড়ছে অস্ত্র শস্ত্র তৈজস পত্র ইত্যাদি।
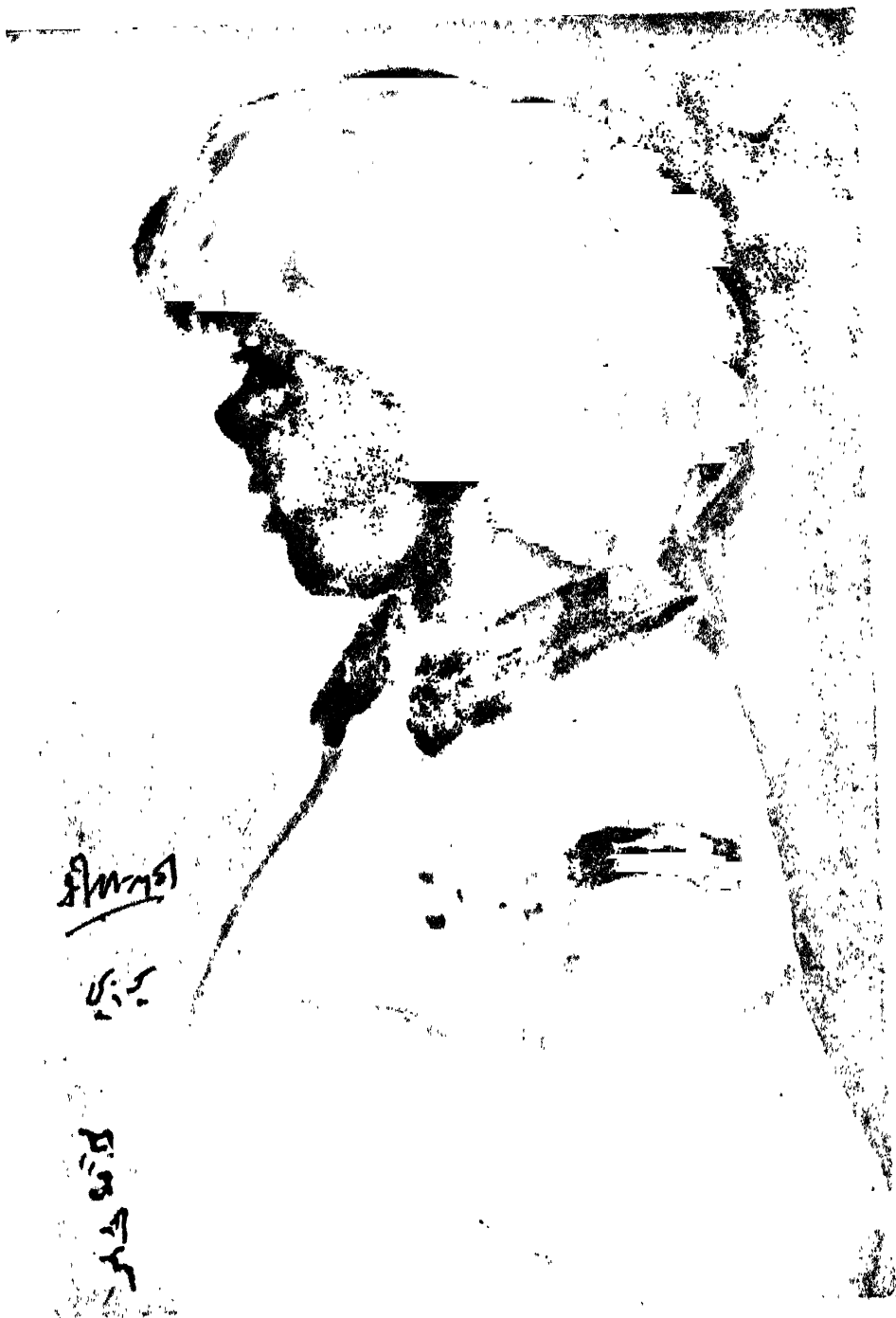
মীরা দেবী

পাহাড়ে

[এই পর্যায়ে ছোটো ছোটো রচনাগুলির সংখ্যা চল্লিশ। এর মধ্যে মাত্র তিনটি নাম 'রেশ', 'ঝরনা', 'দেওয়ালি' অবনীন্দ্রনাথের দেওয়া। বাকিগুলির কোনো নাম নেই। পাহাড় এই রচনাগুলির যোগসূত্র, তাই সমগ্র রচনাগুলির নাম 'পাহাড়ে' দেওয়া হল।

রচনা ১৯২৪ সালে কার্সিয়াং-এ বলে অনুমান।]

আমার সকালেও ঘুম ভাঙে না দেখে আমি নিজে থেকে একটা প্রহরী ঘড়ি (Alarm clock) কিনে মাথার শিয়রে রেখেছিলেম, ঘড়ি রোজই ঠিক সূর্যোদয়ে চেঁচিয়ে ঘুম ভাঙায়, ঠিক যেভাবে নেতা ঘুম ভাঙাতে চলে ঘুমন্ত জাতির! তেমন করে জেগে দেখি সকাল ভাল লাগে না, কাজ ভাল লাগে না, মাথা ধরে। জাগার পরে ঘুম যেন আরো বেশি করে জড়িয়ে আসে দেহে মনে! এমনি ভাবে জেগে আমার কোনো ফল হল না, শরীর মন দুইই খারাপ হয়ে উঠল দেখে প্রহরী ঘড়িকে ঘরে পাহারা দিতে রেখে আমি পাহাড়ে গিয়ে বাসা নিলেম। সেখানে জাগরণ একটি অজানা পাখির ডাকে মধুর হয়ে এলো রাত্রি-শেষে, তেমন করে জেগে আনন্দে ভরল প্রাণ, স্ফূর্তি পেলে দেহ, ফিরে পেলেম অনেকদিনের হারানো স্বচ্ছন্দতা।

রেশ

একটুখানি সুর, মানুষের সঙ্গীতশাস্ত্র যার খোঁজই রাখে না এমন একটি চমৎকারি রাগিণী। পাহাড়ের গায়ে ঘন বন তারি পাশ দিয়ে ঝরনাধারা পাথর ভিজিয়ে দিনরাত ঝরছে, সেই পাথরের উপরটিতে বসে এক অজানা পাখি নতুন এই ভোরাই আলাপ করে। শুনতে শুনতে আকাশের ঘুম ভাঙে, আলো আস্তে আস্তে জাগে,— অজানা পাখির গান থেমে যায় শুধু তার ছোট সুরের রেশ গিয়ে বাজতে থাকে দিগন্তের মেঘস্তরে দূরে দূরে গিরিশ্রেণীর প্রত্যেক পাথরের বুকে! দিনের চোখে লাগে রঙের নেশা, রাত চলে যায় প্রদীপ নিভিয়ে নতুন সকালে নতুনের সন্ধানে অতীতের পুরাতন পথ বেয়ে। এরই রেশ ফুলের বুকে পাতার শিরায় শিরায় লেগে থাকে শিশিরবিন্দুর ছলে বনপথের দুই ধারে। কে জানে সে কত যুগ হল, যেদিন প্রথম সকাল হল এই ঝরনার ধারে এই পাহাড়ে, সেই থেকে একটির পর একটি পাখি আসে এখানটিতে, গায় ওই একটি প্রভাতী, একটির পর একটি রাত আসে চলে যায় বিদায় হয়ে নতুন সকালে পাহাড়ের কাছ থেকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে।

ঝরনা

উপরের বন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আবছায়া দেখা যাচ্ছে,— এই ছায়াপুরী থেকে একটি ঝরনাধারা রৌদ্রমাখা নিচের বনে নেমে চলেছে। উপরের মানুষ ঝরনাজলে ময়লা কাপড়ে ধোপ দিচ্ছে— নিচের মানুষ একটা কসাই, ঝরনার বুকের ধারে একটা শিলাতলে বসে আপনার ছুরি শানাচ্ছে। একটা বানর দুই জনের মাঝে, পাতায় পাতায় সবুজ পেয়ারা গাছের ডালে বসে সূর্যোদয়ের নিচে দিয়ে সরু একটি

আঁকাবাঁকা আলোর রেখা টেনে টেনে ঝরনা যেখানে মহানদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে,—সেই সুদূরে চেয়ে চুপটি করে বসে কি যেন ভাবছে!

*

দক্ষিণে পাহাড়-তলায় যতদূর দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত নিশ্চল মেঘ-সমুদ্র, উত্তরে তুষার পর্বতের অচল ঢেউ, তারি মাঝে একখানি কালো পাথর আর তার গলা জড়িয়ে একটি বনলতা! পাথর সে কাঞ্চনশৃঙ্গের দিকে চেয়ে সকাল সন্ধ্যা সোনার স্বপ্ন দেখেছে, বনলতা পাহাড়তলার দিকে চেয়ে মেঘ-সমুদ্রের তলায় যে সবুজ বন সবুজ মাঠ লুকিয়ে আছে তারি স্বপন দেখেছে, এই দুজনের স্বপ্ন একটি সোনার পাতার রূপ ধরে বেরিয়ে এল গহন বনের গোপন একটি ঝরনার কিনারায়! উত্তর থেকে হিম বাতাস তুষার পর্বতের কথা তার কানে কানে বলে যায়, পাহাড়তলির মেঘ তার কাছে এসে সবুজ বনের খবর দিয়ে সবুজ বৃন্তে বাঁধা সোনার পাতা কালো পাথরের বুক আঁকড়ে সকালের আলোয় এদিক চায়, ওদিক চায়— ঝরনা তাকে অকূল কালোজলের ডাক শুনিয়ে চলে দিনরাত।

দেওয়ালি

কাল রাতে চাঁদ ছিল না, পাহাড়ে পাহাড়ে দীপালি উৎসব করেছে মানুষরা মিলে, পরবের আতসবাজি আর ঢাকের শব্দ দুপুর রাতের পাহাড়ের সুপ্তি ভেঙে দিয়ে রাতের গায়ে ক্রমাগত আঘাত দিয়েছে, বনের সুষুপ্তি নষ্ট করে দিয়েছে। নীল রাত্রির বুকের উপরে মানুষের দেওয়া আগুনের মালা থেকে একটির পর একটি ফুল্‌কি নিভিয়ে দেওয়ালির রাত চলে গেল কখন কেউ দেখলে না। সকালের আলো হিমালয়ের শিখর বেয়ে নেমে এসে দাঁড়াল উৎসবের অবসাদে কাতর মানুষের ঘরের দরজায়। উষার দুখানি অরুণ-চরণের অলক্তক রাগ পথের উপরে ধুলায় পড়ে রইল, সবার অসাক্ষাতে আকাশের মেঘ এসে লুটিয়ে পড়ল মানুষের এই চলাচলের পথে। পথের উপরে গোলাপি রঙের রেশ দিয়ে সাদা আঁচল ভর্তি করে নিয়ে চলে গেল সে দূর দিগন্তের পারে যেখানে সকালে আলোক-সমুদ্রের ঢেউ উঠেছে রাতের দেওয়ালির অবসানে। খনির তলায় লুকিয়ে আছে মণি, পাহাড়ের পথে কাঁকর সকালের আলোয় সূর্যকান্ত মণির মরীচিকা দেখিয়ে বলে, আমাদের তুলে দেখ-না। পথে-বিপথে আমি নুড়ি আর পাথর কুড়িয়ে চলি। অন্য পথিক তারা চলে বনের ফুল পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে, আমাকে ভাবে এরা পাগল। শুকনো ঝরনার পাথরের বুক ফেটে যে কথা বার হচ্ছে এরা কি তা শুনতে পায় না! ঐ যে একটা পাহাড়ি পথের মাঝে কার ঝুড়ি থেকে পড়ে যাওয়া একটুকরো কয়লা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে চলেছে, আর এই যে আমি ঝরনার বিরহে যার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে এমন একটুকরো পাষাণ কুড়িয়ে নিয়ে চলেছি— এই দুজনকেই এই পাহাড়— ভাল করেই চিনে রাখছে।

*

খানকতক মরচে-ধরা টিন আর বাক্স ভাঙা তক্তা, তাই দিয়ে ঘরখানি বেঁধেছে সুন্দর করে পাহাড়িয়া দোকানি। রাস্তার মোড়ে ঘর, শুকনো একটা ঝরনার বাঁকে একটুখানি বাগান, তাতে দু-চারটে গাঁদাফুলের গাছ— সেইখানে একটা মুরগী গোটা কতক বাচ্ছা চরিয়ে বেড়াচ্ছে— এদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে— একটা সাদা পায়রা— উড়তে ভুলে গেছে সে! টিনের ছাদের উপর দিয়ে বরফের পাহাড় দেখা যায়, থেকে

থেকে হিম বাতাসের ঢেউ সেদিক থেকে বইছে— দূর দূরান্তর থেকে যাত্রী পাখি দলে দলে এই উত্তরের বাতাসে পাখা মেলিয়ে উড়ে গেল দূর থেকে দূরে পাহাড়তলি ছাড়িয়ে দক্ষিণ সমুদ্রের মাঝে কোনো এক সবুজ দ্বীপের সন্ধানে। পোষা পায়রা গিয়ে চুপটি করে ঘুমোতে বসল বরফের মতো সাদা ডানায় মুখ লুকিয়ে কেরোসিনের বাক্সয় কাটা ছোট্ট একটা খোপে।

*

মানুষের মুখ এপাশ থেকে দেখি ওপাশ থেকে দেখি একই মুখ বদল নেই। আর এই চলার পথ এর এমুখ ধরে দেখতে দেখতে যাই এক দৃশ্য, ওমুখ ধরে দেখতে দেখতে ফিরি আর এক দৃশ্য, যেতে আসতে নতুন হয়ে দেখা দেয় এই পাহাড় পথ।

*

আগে পিছে দুর্গম দুর্জয় পর্বত, তার মাঝ দিয়ে চা-বাগানের শুঁড়িপথটি গভীর খাদের বুকে যেখানে রাতের কুয়াশা জমাট বেঁধে রয়েছে, তারি তলায় ডুব দিয়েছে। সেই কুয়াশার আড়াল থেকে একটি সানাই সুরে বলে যাচ্ছে শুনছি— সুদূর পাহাড়তলির অজানা গাঁয়ের না-দেখা বর কনের বিয়ের কথা! সকালের হাওয়া কুয়াশার পর্দা হঠাৎ খুলে দিয়ে গেল রোদ-ঢালা সবুজ পাহাড়ের ঢালুর উপরে একখানি ছোট গ্রাম, তার পথ ঘাট দুয়োর নিয়ে হঠাৎ দেখা দিলে একেবারে চোখের গোড়ায়। রাঙ্গামাটির সরু পথ, সেই পথে একদল লোক আসছে, সঙ্গে বাজনদার বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। সামনে একজন শুকনো ফুল ছড়াচ্ছে— পিছনে আসছে চাদরে-ঢাকা মৃতদেহ। সকালের আলো সাদা চাদরের উপরে ধরা ছোট্ট একটি রাঙা টুপির কিনারায় ঝিক্‌মিক্‌ করছে।

*

গোলাপি ঘাঘরা নীল ওড়না, নীল ঘাঘরী তার উপরে জাফরানী ঘোমটা, এমনি নানা রঙের প্রজাপতির মতো পাহাড়ি মেয়ে চা-বাগানের সবুজ ঝোপের উপরে উড়ে বসেছে। নীল আকাশের আলো নিচের পাহাড়ে বেগুনি রঙের গাঢ় প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছে। উপরের পাহাড়ে কচি পাতার রঙে ছোপানো রোদের ঘোমটা, সমস্ত চা ক্ষেতগুলো দেখাচ্ছে যেন গেরুয়ার উপরে চাকা চাকা সবুজের ছোপ ধরানো গুলবাহার এক একখানি শাড়ি, অতি যত্নে মানুষ পাহাড়ের গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে। এই যতনের চা ক্ষেতের ধারে, পথের একটা বাঁকে একঝাড় বাঁশ, তারি দুটি পাতার মধ্যে দিয়ে ধবলাগিরি দেখা যায়, সেইখানে একটা কতকালের কালো পাথরকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে অযতনের একটি চা গাছ শীতে সমস্ত সবুজ পাতা ঝরিয়ে দিয়ে ডালে ডালে ফুল আর ফল ধরিয়ে চেয়ে আছে উত্তর মুখে, তার আশে পাশে ঘাসের ফুল গোলাপি নীল পীলা ছোট ছোট, যেন আকাশের তারা ফুল হয়ে নেমে এসেছে শুধু পাতায় পাতায়, সবুজ যতনের চা-বাগানের পথের ধারে!

*

দুর্গম পর্বত শিখর যেখানে একেবারে বরফের গায়ে কালো ঢেউ দিয়ে দাঁড়িয়ে, সেইখান থেকে নেমে এসেছে দুজনে এরা স্ত্রী পুরুষে নিচের পাহাড়ের হাটে। মাথায় চামড়ার টুপি, গায়ে কম্বল, কোমর থেকে চামর দুলছে। মেয়েটি চলেছে পিঠে একটা ঝুড়িতে গোটা দুই ছেলে বয়ে। পুরুষ চলেছে একটা দুন্দুভি বাজিয়ে। তুষার পর্বতের রুক্ষ বাতাস এদের মুখে পাকা বাদাম পাতার রঙ ধরিয়ে দিয়েছে! উপর

পাহাড়ের মানুষ এরা, দেবদারু গাছের মতো সিধে সরল, ছোট পাহাড়ের মানুষ এদের কাছে ছোট দেখাচ্ছে। মেঘগম্ভীর দুন্দুভির শব্দে ছোট ছোট দোকান ঘরের টিনের ছাত কাঁপিয়ে পুরুষ নাচ সুরু করলে ঘূর্ণি বাতাসের ছন্দ রূপ ধরে ঘুরে চলল। মেয়েটি গান ধরলে, ঝড়ের রাতের প্রচণ্ড বাতাসের একটানা ক্রন্দনধ্বনি হাটের কোলাহল ডুবিয়ে দিয়ে হঠাৎ জেগে উঠল। এই পাহাড়ে পাহাড়ি নাচ গান কেউ পছন্দ করে না— বাঁশিতে ছেলেরা বিলিতি গৎ ফোঁকে। রাস্তার ধারে চিনামা হাউস, সেখান থেকে থিয়েটারের গান শিখে পাথর ভেঙে চলে মেয়েরা "এমনি করে ধরবো ধনু মারবো বিষের বাণ" বেসুরে গাইতে গাইতে। কাজেই হাটে এসে এরা শুধুহাতে ঘুরে বেড়াতেই থাকল পাহাড়িয়া নর্তক নর্তকী!

*

রোদে তপ্ত পাথরের উপরে এতটুকু একটি জংলী গাছ অনেক উপর থেকে ছায়া ফেলেছে। সেই ছোট ছায়ার মধ্যে ধরা পড়ল ঝরনার সুশীতল পরশ, দূর পাহাড়ের চোখ জোড়ালো নীল নতুন-ফোটা বনফুলে, মন ভোলানো পরিমল! আর পাহাড়িদের চলাচলের রাস্তায় তাদের বসত বাড়িগুলো বড় বড় ছায়া ফেলেছে, পাঁক হয়ে সেই ছায়া সাদা কালো একজোড়া হাঁসের ডানার আগায় লেগে আছে।

*

উষার আলো শীতকাতর পাখির মতো প্রহরের পর প্রহর ধরে চুপ করে সামনের পাহাড়ে একগোছা কচি বাঁশের আড়ালে বসে আছে। বরফের একটা চূড়া আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে হারানো সূর্যের স্বপন দেখছে আর একটা চূড়া তরায়ের জঙ্গলে ছোট একটি নদীর দিকে ঝুঁকে দেখছে চুপটি করে, আর একটা পাহাড়ি ফুলগাছ চেয়ে রয়েছে চুপটি করে চা-ক্ষেতের দিকে, সেখানে রঙিন প্রজাপতির মতো একদল মেয়ে কাজ করতে নেমেছে।

*

পূবে পাহাড়গুলিতে নিবিড় কুয়াশা স্থির হয়ে আছে। উপরে সমস্ত উত্তর আকাশ নেবু ফুলের বুকের ভিতরের রঙ ধরে প্রকাশ পাচ্ছে। হরিদ্রা মণির মতো তরল আভা বরফের পাহাড়কে এসে আলিঙ্গন করলে, সকালের বাতাসে দেবদারু বনের ঘুম ভেঙেছে কি পর্বতে পর্বতে দিকে দিকে ঘনমেঘের পর্দা পড়ে গেল, দিনের আলো ফিরে গেল, উত্তর পর্বত ছেড়ে সুদূর পূর্ব দিগন্তের পারে, যেখানে রাতের চাঁদ উদয়-গিরির ওপারের আকাশে কুন্দফুলের রঙ ধরিয়েছে।

*

ঝরনার পাখি শেষ রাতের আলো-আঁধারে লুকিয়ে এসে গান গেয়ে ঘুম ভাঙায় পাহাড়ে, কারো কাছে তার রূপ ধরা দিলে না রঙ ধরা দিলে না, ধরা দিলে শুধু তার সুরটুকু, তাই দিয়ে তাকে চিনতে হয়। প্রতিপদের চাঁদের আলোর মতো এতটুকু ঝরনাধারা ছোট একখানি পাথরকে মালার মতো বেড়ে নিয়েছে অরণ্যের মাঝে অন্ধকারের বুকে। ভোরের পাখি রাত থাকতে আসে যায়, ঝরনার বুকে তার রূপের ছায়া কোনোদিন পড়ে না, ঝরনা শুধু তার সুরটুকু মনে রেখে চিনে নেয় ঝরনা-তলার পিয়াসী পাখিকে। ঝরনার বুকের পাথর, অন্ধকারে অচিন পাখি তার উপরে এসে বসে, অন্ধ বধির পাষাণ তার পায়ের পরশটুকু পায়, সে তাই দিয়ে আপন পাখিকে চিনে নেয়।

*

আমার ঘরের বোঝা বা কিছু ঘরেই রেখে, একা পাহাড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছি— বিদেশের মানুষ আর পাহাড়ের মানুষ তারা কে জানে কাদের ঘরের মস্ত মস্ত বোঝা বয়ে পাহাড় পথে উঠছে নামছে।

*

পাহাড়ের রাস্তায় যাবার বেলায় হোটেলের কাছটা পর্যন্ত পা খুব দৌড়ে চলে, হোটেলের সীমানা পার হয়েই মন দৌড়োতে থাকে পাহাড়ের একটার পর একটা বাঁক ঘুরতে ঘুরতে বরফের পাহাড়ের দিকে। ক্রমেই পা পিছিয়ে পড়তে চায় আর রইতে বলতে থাকে মনকে। বাড়ি মুখে ফেরবার বেলায় পা চলে দৌড়ে আগে পৌঁছতে, মন চায় না পাহাড়ে ঝরনা ছেড়ে যেতে, তখন সে পা'কে বলে রয়ে বসে চলতে। ঘরে পৌঁছে পা বলে মনকে— "নাও এইবার বসে ছবি লেখ। মন বলে, তাড়া কিসের তুমি একটু সামলে নাও-না তার পরে দেখা যাবে।"

*

চিম্‌নি চা বাগানের কারখানা, সিফাই ঝোরা, মহানদী, এই হ'ল আমার সঙ্গীটির দৌড়। মাইল হিসেবে আমার দৌড়ের চারগুণ হবে, মহানদীর একটি চুনোপুঁটিও ধরতে পারলেন না আজও সঙ্গীমশায়? আর দু পা যেতে যেতে পথের থেকে কুড়িয়ে পাই এত, যে আমার পকেট বুক ভর্তি হ'য়ে যায় রোজ রোজ। আমার সঙ্গী চলেন লক্ষ্য ভেদ করে সোজা, কোনো দিকে না চেয়ে, আমি চলি সঙ্গীর চোখে যা কিছু এড়িয়ে যায় তাতেই ঠেকতে ঠেকতে এঁকতে বেঁকতে সঙ্গীকে অনুসরণ করে।

*

শীতের মাঝে কাল রাতে ধারাশ্রাবণ পাহাড়ে হঠাৎ দেখা দিয়ে গেছে, গাছপালা সকালে সবুজ রঙে ধোয়া বর্ষার সাজ পরে উৎসবে বার হয়েছে, ঝরনা আজ তার সমুদ্রকে ভুলে মেঘের কথা শোনাচ্ছে ঝাউ-বনকে!

*

সকাল সন্ধ্যা কত রঙই লাগে বরফের পাহাড়ে, রাতের কাজল তাকে মলিন করে দেয়, কিন্তু কোনো রঙ কোনো মলিনতা লেগে থাকতে পায় না তার গায়ে, সে যে সাদা সেই সাদাই থাকে। এই সবুজ পাহাড়ের শ্রেণী এদের উপর দিয়ে ঝড় বহে যায়, কুয়াশা এসে একে বারে বারে আচ্ছন্ন করে— পাহাড় যে সবুজ সেই সবুজই থাকে কিছুতেই তার রঙ বদলায় না। মানুষ বিচিত্রতা ভালবাসে, তাই সাদার উপরের রঙ-সাজ দেখতে ছোটে সে, রঙের উপরে সাদা মেঘের আবরণ দেখতে দেখতে ভুলে যায় সে, পর্বতের বিনা সাজের রূপ কেমন তা সে দেখতেই চায় না!

*

রোদে-পোড়া উপর পাহাড়ের এক গোছা ঘাস নীল আকাশ থেকে ঝুঁকে দেখছে অনেক নিচে জলে-ভরা একখানি মেঘ ঝর্নার পথ ধরে আস্তে আস্তে উঠে আসছে তার দিকে।

*

পথের ধারে পদম গাছ শীতের আরম্ভে অরুণোদয়ের দিকে চেয়ে এতটুকু একটি গোলাপি কুঁড়ির স্বপ্ন দেখছে। ও ধারের কালো পাহাড় তুষার পর্বতের ছেড়ে ফেলা রঙিন উত্তরীয় নিজের মাথায় জড়িয়ে নিয়ে হিমগিরির দিকে পিঠ ফিরিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছে পদম গাছের দিকে চেয়ে।

*

বাজারের ধারে, সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে একখানি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তরকারিওয়ালী ডাকছে— পোখলী পোখলী— পোখলী সে ছাগলছানা, কি একটা ছোট্ট কানঢাকা টুপি-পরা পাহাড়ি ছেলে, না নীল ঘাঘরী পীলা চাদর-পরা একটি মেয়ে, তা বোঝা গেল না। শুধু জানলেম পৌষ মাসে কুয়াশার মধ্যে একদিন সে জন্মেছিল, আজ শীতের সন্ধ্যায় ঘন কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়ের কোন্ একটা কোণে খেলতে বার হয়ে গেছে— এখনো তার দেখা নেই!

*

দিন চলে যাচ্ছে দুধ কমলা গোলা একখানি মেঘের পর্দার আড়ালে সমস্ত পাহাড় ঢেকে দিয়ে। এই প্রজাপতির ডানার চেয়ে হাল্‌কা ও স্বচ্ছ মেঘের মধ্যে দিয়ে অস্তমান সূর্যের গায়ে সুদূর পাহাড়ের উপরের একটি গাছের কাজল রূপ সোনার পটে তুলি দিয়ে টানা, দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ি মেয়ের রঙীন ওড়নার আড়ালে তার সোনার কানখানির মতো দুলছে সূর্যমণ্ডল। হঠাৎ মেঘের মধ্যে থেকে একটা গ্রামোফোন— 'আমার জন্মভূমি' বলে একটা স্বদেশী গান কর্কশ গলায় গেয়ে উঠল।

*

উত্তর আকাশ জুড়ে ধূসর বর্ণের চন্দ্রাতপ। তারি তলায় গভীর রাতের ঘননীল অন্ধকার দিয়ে বোনা শীত বসনের রাজা বেশ পরে পর্বত দেখা দিয়েছেন। কচি পাতায় সবুজ সাজে সেজে এসে শীতের গাছ সকালের দরবারের মাঝে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে পর্বতের দিকে চেয়ে আছে, তার বুকের পাখি গান ভুলে স্তব্ধ হয়ে গেছে আজ সকালে।

*

উপরে মেঘ নিচে মেঘ, তারি ফাঁকে দুটি পাহাড় ঝুঁকে পড়েছে একটি নদীর দুই পারে। বহু দূরে সে নদীতে কে যে জাল ফেলে তা দেখা যায় না, কিন্তু সেখান থেকে মাছ দিতে আসে অন্নপূর্ণার মতো রূপবতী পাহাড়ি মেয়েটি— একে দেখে ভুলে থাকতে ভুল হয়ে যায় তাদের, যারা মনে পড়া মনে না-পড়া দুই পর্দার ফাঁক দিয়ে রোজ চেয়ে থাকে আমার দিকে।

*

পাহাড়ের উপর পোলো খেলা, তাই দেখতে দলে দলে পাহাড়ি মেয়ে ভেঙে পড়ল। বৈকালের ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে তারা হাসি খুসি করতে করতে ফিরছে, সবার গায়ে নতুন নতুন সাজের বাহার। শুধু একটি মেয়ে এসেছিল দুহাতে দুই ভাই বোন, পিঠে একটি কচি ছেলে বয়ে, রুখো মাথায় গায়ে একখানি মলিন চাদর জড়িয়ে। তার সাজা ছিল তার মুখের হাসি। তারি সুর দিয়ে কুয়াশায় ঢাকা পথ সে আলো করে দিয়ে চলে গেল!

*

পর্বত চোখের আড়াল হতেই সূর্যাস্ত শীতের কুয়াশাকে আপনার মনের কথা জানিয়ে গেল। ঝরে পড়া গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতো সেই কথা জলে ভেজা সাদা আঁচলে জড়িয়ে নিয়ে চলে গেল কুয়াশা রাত্রিমুখে ছায়াপথের দিকে অভিসারে।

*

কাজল রাতের বুকে সোনার তরী— প্রতিপদের চাঁদ সে স্বপ্নের পসরা বহে আসতে আসতে পর্বতের একখানা পাথরে ঠেকে অতল আলোক-সাগরে তলিয়ে গেল, ঝর্নাতলার ঝাউবন নিশ্বাস ফেলে এই কথা জানিয়ে দিলে শীতের কুয়াশায় কাতর চন্দ্রমল্লিকার মতো শুকতারাটিকে।

*

সারাদিনের মধ্যে সূর্যমুখী ফুলের সঙ্গে আজ সূর্যের দেখা হয় কি না এই কথাটি পর্বতের চূড়ায় সোনালি কুশাঙ্কুরকে ভ্রমর এসে শুনিয়ে গেল প্রত্যুষেই।

*

বেলা শেষে উত্তর দিক্‌বধূ হিম আর কুয়াশার আঁচলে মুখ ঝেঁপে অস্তাচলের দিকে অভিসারে চলেছিল, পূবের পাহাড়ে সূর্যদেবের কাঁচা সোনায় মাখা সূর্যমুখী ফুলের বনের দিকে চেয়ে হঠাৎ সে থম্‌কে দাঁড়িয়েছে।

*

সকালে আলোকে ধরে রাখলে একটি সূর্যমুখী কুয়াশার আঁচল চাপা দিয়ে, সন্ধ্যাদেবী পরতে পেলে না সূর্যের দেওয়া সিন্দুর রাগ।

*

অরুণ সারথির দিক ভুল হয়েছে ভোরের কুয়াশায়, নিচের পাহাড়ে সূর্যের হরিতাশ্ব কয়টা ছেড়ে ভোর থাকতে নিজে উঠেছে উত্তরগিরির চূড়ায়, সেখানে দাঁড়িয়ে সে ঘন মেঘস্তরের উপর দিয়ে পেতে চাচ্ছে অস্তাচলের দিশা।

*

প্রভাত কুয়াশার মধ্যে দিয়ে এসে পথের ধারে কোথা থেকে ঝরে পড়া একটি বাদাম পাতাকে অনুরাগ জানিয়ে আপনার রঙিন উত্তরীয় পরিয়ে দিয়ে গেছে, এই কথা নিয়ে বাঁশপাতারা নানা কথা বলাবলি করছে— পথের বাঁকে গোলাপ লতার নতুন ফুলটির পাশেই দাঁড়িয়ে।

*

চা গাছের সাদা ফুলের বুকের আড়ালে সূর্য। সকালের মেঘ পাহাড়ের পর পাহাড় খুঁজে চলেছে, হিমাচলের শিখর পর্যন্ত সূর্যের দেখা পাচ্ছে না।

*

মেঘের উপরে মিনার। সেখান থেকে আহ্বান পৌঁছে যাচ্ছে হাটে বাজারে, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সবার কাছে। গিরিশ্রেণী এই আহ্বানের প্রতিধ্বনি দিচ্ছে একবার দুবার তিনবার, তিন সন্ধ্যা।

*

হিমাচলের শীত লেগেছে, বরফের পাহাড় মেঘের তলায় যেখানে মেঘ-ফাটা রোদে আম-বুটি গাঁয়ের বাঁশ-ঝাড়ে-ঘেরা ছোট একখানি ঘরের এতটুকু একটি পাহাড়ি মেয়ে ভিজে চুল শুকিয়ে নিচ্ছে, সেইখানটিতে নেমে এসে সাদা-কালো ডোরা টানা শীতকাতর প্রকাণ্ড একটা হিমাবাঘের মতো চুপটি করে পড়ে আছে।

*

বাঁশ গাছের ঝোপে দোয়েল পাখি মাছি খেতে এসেছিল। পায়ের শব্দ পাওয়া-মাত্র সে ঝরনা পেরিয়ে চা ক্ষেতের ঢালু রেখে সোজা আম-বুটির গাঁ থানার দিকে পালিয়ে গেছে— এই কথা নিয়ে সারাটা পথ কানামাছি ফিরে ফিরে কানের কাছে এসে পথিককে তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জ্বালাতন করতে থাকল।

*

সকালের আকাশের চোখ দুটি কাজল-ঘেরা নীল-ডানা প্রজাপতি হয়ে চা বাগানের উপর দিয়ে উড়ে যেতে ঘাসের প্রেমে আটকা পড়ে রইল। রাতের হিম এসে ঘাসকে আর তার প্রজাপতিকে একই সঙ্গে চিরকালের মতো ঘুম পাড়িয়ে গেল। ভোরের আলো এসে সে ঘুম ভাঙাতে গিয়ে দেখলে বুড়ো চা গাছ পথের ধারে দুজনকে ছায়া করে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে বরফের পাহাড়ের দিকে চেয়ে। সকালে ফোটা চা ফুলের পাপড়িগুলি শিশিরে ভিজে উঠছে।

*

পাহাড়ি ঝাউ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে বরফের পাহাড়ের শিখরে শিখরে চাঁদের আলো, নীল আকাশের বুক জুড়ে সন্ধ্যাতারার অসীম বেদনাটুকু দীপ্তি পাচ্ছে।

*

পাহাড় ভুলে গেছে কিন্তু একখানি পাথর সে ভুলতে পারে নি। যে ঝরনা সমুদ্রে গিয়ে মিলল আর ফিরল তাকে যেখানে দিয়ে তার কোলের ঝরনা ফেলে চলেছিল, সে কোলটি পর্বত ছেড়ে দিয়েছে বাগানের ফুলদের, শুধু সেই একলা পাথর পড়ে থাকল। তার চলে যাওয়া ঝরনাজলের পদক্ষেপের অটুট চিহ্নগুলি বুকে ধরে ফুলবাগানের ধারে কে জানে কবে আকাশ পথে তার হারানো ঝরনা চলতে চলতে তাকে দেখে নেমে এল মেঘের রথে। সেই থেকে একগাছি শেঁওলী মালা ধ্যানী পাথরকে চিরদিনের মতো অম্লান সবুজের স্রোতে ঘিরে নিলে।

*

সকালে ফোটা সূর্যমুখী ফুলটিকে নীল আকাশ আলোর খবর এনে দিতে না দিতে প্রথম পৌষের দুরন্ত কুয়াশা দিক্ বিদিক্ ঘিরে নিলে। হিমজর্জর সন্ধ্যার আকাশ চেয়ে দেখলে অস্তমান সূর্যের আগুন-বরন জয়পতাকা সকালের কুয়াশা ফুলের বনের পায়ের কাছে আস্তে আস্তে নামিয়ে ধরলে।

'বিক্রমবাহু'

গরুপবভন

রক্তকরবী

[বিহার ভূকম্প-পীড়িতের সাহায্যার্থে কলকাতার নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে ৬ এপ্রিল ১৯৩৪ রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হয়। The Tagore Dramatic Group -এর উদ্‌যোগে প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের প্রযোজনায় এই অভিনয় হয়েছিল। এই উপলক্ষে মুদ্রিত অভিনয়-সূচীর মধ্যে 'রক্তকরবী' শীর্ষক এই রচনাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে (পত্র ৫।পৃ ১০৩) এই রচনাটির উল্লেখ আছে।

অধুনালুপ্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় -সম্পাদিত নাচঘর পত্রিকার ৩০ চৈত্র ১৩৪০ সংখ্যায় রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয়।]

এই নাট্যব্যাপার চলেছে "যক্ষপুরীতে" যেখানে মাটির তলায় কবর দেওয়া থাকে যক্ষের ধন,—পাতালের কাছাকাছি একটা জায়গায়। যক্ষপুরের ভারবাহীর দল— মাটির তলাকার সোনা তোলার কাজে দিনরাত নিযুক্ত— খুঁড়ে তুল্‌ছে মাটি, কেটে চলেছে সুড়ঙ্গ, বহে আন্‌ছে কত কত সোনা তাল তাল অবিরাম। এখানকার "মালিক" যে, সে আছে অষ্টপ্রহর অসংখ্য মানুষের সুখদুঃখ থেকে দূরে, একটা অত্যন্ত জটিল জালের আবরণে ভীষণ তার অদৃশ্য শক্তি নিয়ে প্রচ্ছন্ন। প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানুষের প্রাণ থেকে শক্তি শোষণ করে নিয়ে স্ফীত হবার জাদু সে জানে,— তাই নিয়ে অমানুষিক নির্মমতার নানা পরীক্ষায় সে নিযুক্ত। তার পরীক্ষাশালায় যে প্রবেশ করে সে বেরিয়ে আসে কঙ্কালসার হয়ে, তার অস্তিত্ব হয় ছায়ার মত নিঃস্বত্ব। বিরাট এই জালের তৈরি বেড়া, এর বাহিরে খোদাইকরদের কাটা নানা কালো কালো খানাখন্দগুলোই ক্ষুধার্ত দানবের কবলের মতো পড়ে দৃষ্টিপথে। এইখানে তপ্ত ফাল্গুনের প্রখর আলোয় কোনো এক প্রমত্ত বসন্তদিন ফুটিয়ে তুললে একটি "রক্তকরবী"। আনন্দহীন কর্মের আবর্জনার একধারে মূল্যহীন আনন্দের ইশারা জানালে সেই ফুল! "বিশু পাগল" সে আগলভাঙা প্রাণ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এই রক্তকরবীকে ঘিরে— মরুভূমির খোলা বাতাস যেন সে! কর্মের শেষে যক্ষপুের ওঠে "চাঁদ", শান্ত তার দৃষ্টি— জাগায় নেশার অতৃপ্তি কারিগরদের মনে, মাতলামির অট্টহাস্যের ধ্বনি জাগে, অশান্ত রাত্রির পারে তলিয়ে যায় চাঁদ মাতালের হাতে ভাঙাচোরা একটা স্বর্ণ পাত্রের মতো।

প্রথম—

যক্ষপুরীর মানুষ-ধরা ফাঁদে কখন্ ধরা পড়েছে নন্দিনী। ছিল সে "রঞ্জনের" নর্মসখী, প্রেমের নন্দনবনে, এখানে এসেছে প্রাণগ্রাসী পাতালপুরীর হাঁ-করা গহ্বরের প্রদোষান্ধকারে। "রঞ্জনের" বাঁশির ডাকের সুর আসে নন্দিনীর চোখে, তার হাসিতে, তার চলায় বলায় চঞ্চল হয়ে ওঠে যক্ষপুরীর বাহনের দল, তার কাছে ছুটে আসে "কিশোর", না-দেখা বনের রক্তকরবী ফুলের সন্ধান দেয় নন্দিনীকে। ক্ষণে ক্ষণে ব্যাঘাত হয় অধ্যাপনায়, ওর কাছে কাছে ঘুরে বেড়ান "অধ্যাপক", ইনি শক্তিতত্ত্বের আলোচনা করেছেন অনেককাল, এখন নন্দিনীকে দেখে অবধি আনন্দরহস্যের সীমা পান না। তাঁর নিরঞ্জন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে রক্তকরবীর রঙের অঞ্জন লাগল। রঞ্জনের বাঁশি ডাকে থেকে থেকে নন্দিনীকে কাজের ভিড়ের মধ্যেও। এই খবরটা জানে মালিক;— আর সে এও জানে যে, যে সোনা সে পায় হাজার

হাজার মানুষের প্রাণ দেউলে ক'রে, সেই সোনা দিয়ে সে আনন্দ পায় না কণামাত্র। তাই সে ঐশ্বর্যের পিঞ্জরে গর্জাতে থাকে বন্ধ্যা সম্পদের নিষ্ফলতায়। রঞ্জন আর নন্দিনীর মাঝে সে সৃষ্টি করতে চায় প্রচণ্ড বিচ্ছেদ। পিপাসার্ত নীরস কণ্ঠের নিরানন্দ অট্টহাসি হাসে সে আপন জটিল জালের আড়ালে বসে— নন্দিনীর 'পরে তার নিগূঢ় টান নির্মম ঈর্ষায় সাংঘাতিক হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়—

যক্ষপুরীতে ধ্বজাপূজার উৎসব লেগেছে— কর্মক্লান্ত দিনের মাঝে একটুখানি অবসর, যার অবসান হল বীভৎস উল্লাস আর নিদারুণ ধস্তাধস্তি কোস্তাকুস্তির প্রাণান্তকর দৃশ্যে!

তৃতীয়—

শক্তিদেবীর কাছে অসংখ্য বলির মধ্যে রঞ্জনও কখন্ প্রাণ হারালো। তখন আর সইল না, নন্দিনী উঠল রুদ্রাণী হয়ে। জাল থেকে বেরোলো রাজা, অন্তহীন সংগ্রহের মোহ গেল তার ছুটে, বিদ্রোহ ঘোষণা করলে নিজেরই বিরুদ্ধে। মুক্তির প্রবল আবেগ, ধ্বংসের প্রচণ্ড ঝটিকা, নিরুদ্ধ শক্তির বিরাট ভূকম্পনের মধ্যে যক্ষপতির জয়যাত্রা শুরু হ'ল নন্দিনীর হাতে হাত রেখে, মৃত্যুর তোরণদ্বার উত্তীর্ণ হয়ে। ভেঙে পড়ল যক্ষপুরীর সেই ধ্বজদণ্ড যা পৃথিবীর মর্মকেন্দ্র বিদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। আকাশে ছিন্নভিন্ন একটা গন্ধর্ব নগরীর মতো মিলিয়ে গেল যক্ষপুরী হাওয়ায় হাওয়ায়। যে কবর থেকে উঠেছিল সেই পুরী, সেই কবরেই তলিয়ে গেল বিরাট মিথ্যা— ভাঙন আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল একটিমাত্র রক্তকরবী গাছ, সবুজপাতার ছায়া শুকনো মাটিতে মেলে দিয়ে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিপত্র

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মাকে লিখিত

১

5, Dwarka Nath Tagore's Lane
Calcutta
29th April 1924 ?

প্রিয় ধীরেন

তোমার চিঠি এই মাত্র পেলাম। আমার প্রশ্নের উত্তর তোমার যা মনে হয় সময় মতো লিখে পাঠিও তাড়াতাড়ি নেই। আমি প্রশ্নগুলো লিখছি বটে কিন্তু উত্তরগুলো কি হবে তা আমিও ভাবি নি সুতরাং নির্ভয়ে জবাব দিও, মণি গুপ্ত প্রশ্নের একটা সোজাসুজি রকম জবাব দিয়েছে কিন্তু ওগুলোর মধ্যে নানা ছোটখাটো দিক রয়েছে যা এখনো সে পরিষ্কারভাবে ধরতে পারে নি, তোমার উত্তরের জন্যে উৎসুক রইলেম।

দেশের artর কথা তুমি যা বলেছো তা ঠিক, শুধু তোমাদের দেশটাই নয় সারা ভারতবর্ষের art ঐ-ভাবে ঘুমন্ত রাজকন্যার মতো রূপকথার রাজত্বে অপেক্ষা করছে সোনার কাঠির স্পর্শের জন্য এটা আমি এখনো দেখছি। সে দিন যখন তোমাদের কাছে বোলপুরে গিয়েছিলেম তখন গাড়িতে যেতে যেতে এই কথাই ভেবেছিলেম, কোথায় যে সোনার কাঠি লুকোনো আছে তার সন্ধান কেউ নিচ্ছে না কেবলি সাবল নয়তো লাঙ্গল চালিয়ে দেখছে কোথায় গুপ্তধন কিছু লুকোনো আছে কি না! এই যে Indian আর্ট বলে একটা জিনিষের ধুয়ো উঠেছে আজ এটার বিষয়ে আমি যতই ভাবছি ততই মনে আমার একটা ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে— এ ভাবে নিজের ভাণ্ডারে এবং পরের ভাণ্ডারে সিঁদ দিয়ে যা কিছু বেরিয়ে আসছে সঙ্গীতে ছবিতে মূর্ত্তিতে তা হচ্ছে চুরির মাল যেগুলো আমাদের বলে আমরা চালাতে চাচ্ছি বাজারে, এ কারসাজি ধরা পড়বে একদিন না একদিন।

আমি তো তোমাদের সামনেই সেদিন নন্দলালকে সাবধান করেছি জানো, ঐ অজন্তার মুখেই চলো আর গ্রীস জাপান বা চীনের দিকেই চল সে পরের রাস্তা ধরে চলা ছাড়া আর কিছুই হবে না। অন্যের বন্দরে আমার জাহাজ কেন ভেড়াবো আমাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র বন্দর রয়েছে যখন। একলা চলা ছাড়া উপায় নেই আমাদের কারো, নিজের ফসলে নিজের নৌকা বোঝাই করে নিজের বন্দরে গিয়ে নামলেম এর চেয়ে আর ভাল গতি ও মুক্তি নেই artistর। আমার নৌকায় তোমার স্থান নেই তোমার নৌকায় আমার স্থান নেই—

"ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি"

এই গান গেয়ে সব আর্টিষ্টকেই চলতে হয়েছে চিরকাল একলা একলা, রূপের রাজত্বের বন্দরে বন্দরে বন্দরে এই একই গান চিরকাল গেয়ে চল্লো সবাই। তোমরা যে চাও গুরুর সঙ্গে শিষ্য চলবে তার সঙ্গে আবার তার শিষ্য প্রশিষ্য চলবে এরূপে পরম্পরাগত ভাবে চলা মানে এক শিকলে অনেক মানুষের বন্দিভাবে চলা ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন কারু সঙ্গে লড়াই দিতে হয় তখন সেপাই সাজিয়ে এইভাবে চলাতে ফল হয় কিন্তু রসের রাজত্বের দিকে যাবার রাস্তা কেমন তা কেউ কি জানো না তোমরা? ও যে নদীর এক একটি ধারা শত-মুখি হয়ে যে ভাবে চলে সেইভাবে স্বতন্ত্র হয়ে চলা তা কি তোমাদের বলি নি? একজন ছাড়া সন্ধান পথে সাতজন যাবার উপায় নেই বলেই art এখনো রয়েছে, না হলে অনেক সন্ন্যাসীতে মিল্লে গাজন কোনকালে নষ্ট হয়ে যেতো তার ঠিক নেই।

তোমার দেশের যে রূপ— সব আছে অথচ সবই নেই দেখলে এই রূপটি সারা ভারতবর্ষের আমি দেখেছিলেম এইখানে বসে বসে তামাক টানতে টানতে, তখন তোমরা কেউ কাছে ছিলে না, আমার কাঠের ঘোড়া মাত্র কাছে ছিল তখন, সেই কাঠের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আমিও বার হয়েছিলেম একলা আমার রাজকন্যার দেশের দিকে, সোনার কাঠি কোথায় পেয়েছিলেম জানো কি তোমরা? অজন্তা গুহায় সেটা পাই নি ইউরোপে এসীয়াতে সেটা লুকোনো ছিল না, ছিল সেটা লুকোনো আমার নিজের বুকের মধ্যেকার একটা কৌটোতে। আর্ট বিষয়ে সৌখিন যারা সোনার ছড়ি হাতে দেশময় বেড়ায় দেখতে পাও তারা artist নয়, artist যেখানে কুলির মতো খেটে মরে সেই সব কারখানা ঘরের দারোগা তারা, সোনার কাঠির বদলে সোনার রুল মেরে তারা ঘুমের দেশের রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গাতে চলে নয়তো সোনার কলমের খোঁচা দিয়ে রাজকন্যার ঘুমন্ত মুখে অলকা তিলকা টানতে চলে।

তোমার দেশের সত্যকার রাজকন্যা একটির সঙ্গে তোমার বিয়েটা হয়ে গেলে হয়, আমরা তা হলে গুরু শিষ্য সবাই মিলে আনন্দ বাধাই। আমার পক্ষিরাজ ঘোড়া এখন খোঁড়া হয়েছে আগরতলায় গড়ের আগড় টপকাতে পারবে না বিয়ের নিমন্ত্রণের দিনে, কিন্তু হয়তো সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তোমাদের দুজনকে দেখতে আর একবার আমাকে নিয়ে বোলপুরে উপস্থিত হতে পারে শীতের দিনে।

তোমারি
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

কলিকাতা
বৃহস্পতিবার
? ২০ মার্চ ১৯২৫

প্রিয় ধীরেন,

তোমার ১৯শে মাঘের চিঠি কদিন হল পেয়েছি কিন্তু লেকচার লিখতেই বসে ছিলেম তাই সময় মতো জবাব দিতে পারি নি। তোমাদের শান্তিনিকেতনে দক্ষিণ এবং বাম দুদিকের হাওয়ায় একই সঙ্গে ঝরা এবং ফোটার কাষ চলে কিন্তু আমার মনের মধ্যেকার শান্তিনিকেতনে কিছুদিন আগে একটা প্রলয় ঝড় বহে গেছে আমি এখন বাসাভাঙ্গা পাখীর মতো জীবন মৃত্যু দুই বৃক্ষের মাঝামাঝি একটা ডাল আশ্রয় নিয়ে একলা বসেছি— লাগছে ভাল এ অবস্থাটা আর কিছুর জন্যে ভাবনা নেই শুধু শীতের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে যে পূর্ণ

চন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছি ঝাপ্‌সা তারি শোভায় চোখ আর মন নিমগ্ন করে আছি রাত্রির মুখে। ছবিটা এঁকে গেলেম পাছে সেটা দেখে তোমরা ভাবটা না বোঝো তাই এত কথা লিখলেম। নানা পক্ষি এক বৃক্ষে এই ভাবে তোমরা কলাভবনের মধ্যে ধরা আছো কিন্তু এমন একটা একটা সময় যদি তোমরা করে না নাও যখন নিজের মধ্যে নিজে এবং বাহিরের দিকে ধরা আর যে আপন ও এক তার মধ্যে আপনাকে তলিয়ে দিতে পারো তবে ঠিক ভাবে কায করা হবে না।

তোমাদের ওখানে সাধারণ উপাসনা একটা একটা সময় ও নির্দ্দিষ্ট দিন ধরে হয় কিন্তু আর্টিষ্টের উপাসনার সময় নেই কি? শোভার মধ্যে মন তলিয়ে গেল, রংএর রহস্যে রূপের রহস্যে দৃষ্টি হারিয়ে গেল এই তো আমাদের উপাসনা। একটা সময় করে নিও যে সময় ছবি আঁকার হিসেব Exhibitionর ভাবনা এসব ফেলে দিয়ে নিজেকে একলা করে নিয়ে গাছ পালা পশু পক্ষি আকাশ বাতাসের সঙ্গে মিলতে যেতে পারো, এইটুকু হলে আস্তে আস্তে কোনো কিছুর সঙ্গে যখন তখন দেখা হওয়া মাত্র মিলন ব্যাপারটি সহজ হয়ে যাবে তখন বুঝবে অফুরন্ত মিলনে আনন্দ, তারি ছিটে ফোঁটা ধরা পড়ে ছবিতে।

এ আমার কতবার মনে হয়েছে ছবি আঁকার বেলায়— মিলছে না মন যাকে আঁকছি তার সঙ্গে, রং তুলি সাজ সরঞ্জাম সবই, মন অথচ বল্লে— কি কাজ এ সব, আসন পাতা হল কিন্তু আসনে বসাই কাকে? আমাদের আদর-সিংহাসন ব্রত তার আয়োজনের ব্যর্থতা একটি আদরিনী বিনা তো কেউ ভরিয়ে তুলতে পারে না! মাটির আদর দুই হাতের দশটা আঙ্গুল যখন স্পর্শ করে তখনি হয় গড়া সার্থক, রংএর আদর তুলিকে স্পর্শ করলে, রূপের আদর কাগজকে গালিয়ে দিলে তবেই হল সার্থক ছবি এটা মনে রেখো।

আমাকে আদর করার লোকটি সব সময়ে কাছে থাকে না তাই মাসের পর মাস যায় ছবি আঁকি নে লেকচারই লিখি— রং তুলি সবগুলোর উপরে ধূলো জমতে থাকে এসরাজের তারে মরচে ধরে বাঁশের বাঁশি শুকিয়ে কাঠ হয়ে পড়ে থাকে কোণে হঠাৎ এক একদিন "বিরু" এসে বলে— দাদামশায় একটা হাতি আঁকো-না, অমনি হাওয়া বয় শুকনো পাতা নতুন হয়ে দেখা দেয় ধূলো উড়ে যায় দমকা হাওয়ায় এইভাবে আমার ছবি আঁকা চলে। কিন্তু লেকচার লেখার সময় বিরুবাবুর প্রবেশ নিষেধ, তখন University-র চাপরাশি দরজায় কড়া পাহারা দিতে আসে তোমাদের চিঠিরও জবাব দেওয়ার সময় নষ্ট করার হুকুম পাই নে সে সময়।

ছোট ছোট ছেলেদের পক্ষে তোমাদের কাছে অবাধে আসার পথ তোমরা যদি না খুলতে পারো তো তোমরা নিজেরাই ঠকবে— ফুল পাতা পাখি বনের হরিণ আকাশের তারা বৃষ্টির মেঘ গাঁয়ের কুটীর বাঁধের ধারের ঝিকৃঝিকে জল এরা সবাই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চেয়ে শতগুণে ভীরু, তুলি উঁচিয়ে কাউকে আসতে দেখলে এরা ভয়ে মরে, এদের খেলার সাথি হতে পারে না রসিক ছাড়া কেউ এটা তো বোঝো?

তোমাদের কাছে তো যেতে চাই আমি কিন্তু ডানা পাই নে যে! সব আর্টিষ্ট মিলে দুখানা ডানা আমাকে বানিয়ে দিতে পারো না কি? কিন্তু মনে রেখো ডানা পেলে ওড়ার ইচ্ছে আমাকে হয়তো কোন্ পারে নিয়ে ফেলে দেবে বোলপুর ছাড়িয়ে ভীষণ একটা উড়ো কলের মতো— তোমরা থাকবে মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশে চেয়ে আমি চলে যাবো ডানায় ভর করে অতএব ডানা কায নেই একটা পুষ্পক রথের জোগাড় দেখ যাতে দল শুদ্ধ উড়ে পড়া যায়!

তোমারি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ নিও নন্দলালকে বোলো লক্ষ্ণৌয়ে তার সঙ্গে কদিন আমার অনেক দিনের মনের ক্ষুধা মিটিয়ে দিয়েছে ফটো যদি ছাপিয়ে থাকে তো আমায় যেন দু একখানা দেয়।

শ্রীঅবনীন্দ্র

বিরু = পৌত্র শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

কলিকাতা
বুধবার

প্রিয় ধীরেন

তোমার সে চিঠিখানা যখন এসেছিল তখন আমি ভাল ছিলেম না কে জবাব দেবে বল?

আজ তোমায় বর্ষারাতের চিঠির উত্তর সকালের খট্‌খটে রোদে বসে দিচ্ছি।

ছবির নেশা মনকে যখন পায় তখন ছবির পর ছবি দিয়ে নেশার খোঁয়ারী মেটাই তখন আশপাশের ছবির দিকে নজরই দিতে সময় পায় না মন, নেশা ছুটলো মনের পেয়ালা শূন্য রইলো তখন চোখে পড়লো আকাশের রঙ্গ বাতাসের মোহ ভরা নৃত্যের কু কাননের সাজ গোজ। artistর এই যে খোঁয়ারীর অবস্থা এতে করে চোখ মেলি আমরা বাহিরের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবির জন্যে উস্‌খুস্ করতে থাকি মনে মনে। যখন ছবি আঁকার নেশা কেটেছে এবং বাইরের ছবি দেখার প্রতিও টান নেই তখনি জানবে artistর অবস্থা খারাপ তখন সে চিঠি লেখে প্রবন্ধ লেখে ছবিও হয় না ছবি দেখাও হয় না। আমার এখন এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছে— ভাল লাগছে না এ অবস্থা কিন্তু উপায় নেই।

তুমি সূর্যকে অত বড় দেখ বলেই প্রকৃতির দৃশ্যগুলোকে আপনার ছবির চেয়ে বড় করে দেখ কিন্তু এই যে জোনাকির মতো জলছে আমাদের দুই চোখের দৃষ্টি এ না থাকলে সূর্য চন্দ্র তারা সবই থেকেও থাকে না সুতরাং ছোট হলেও আমার কাছে এর বেশি দাম।

অভাব সৃষ্টি করবার ক্ষমতা মানুষের একটা মস্ত ক্ষমতা এই ক্ষমতা আছে বলেই সে গ্রহ চন্দ্র তারাকে ডাক দিয়ে বলতে পারে তোমাদের আমার মতো হতে হবে, না হলে আমার চলছে না। যা পাই নে Natureএ তার অভাব ছবি দিয়ে কবিতা দিয়ে নাচ গান সব দিয়ে পূরণ করে নিই আমরা।

এক টুকরো পাথরের কিছুর অভাব নেই ভিতরে নিরেট ভাবে পরিপূর্ণ সে কাযেই অভাব সৃষ্টি করে না এবং অভাবটা নানা ভাবে নানা জিনিষ সৃষ্টি করেও পূরণ করতে চলে না। পাথরে মানুষে এইটুকু ভেদ!

মানুষ পাথর থেকে রস পেতে চাইলে, না হলে তার অভাব মেটে না এ তো দেখতে পাচ্ছো? কোথাও কিছু নেই মানুষ বায়না ধরলে পাথরকে সজীব করবে, না হলে তার অভাব মোচন হচ্ছে না।

স্বভাব অভাব আর ভাব এ যেন ত্রিমূর্তি, বর্ষা এল স্বভাবের নিয়মে তুমি আমি অভাবের শূন্য কলসী নিয়ে জল ভরতে চল্লেম, ভরা কলসী এনে ঘরে ধরলেম এই তিন অবস্থা হল ছবি সংগ্রহের অবস্থা। বর্ষার জলটা অমনি বহে যেতে দিও না ধরে ফেল— ভাগ্যক্রমে তোমার কলসী এখন শূন্য আছে দেখতে পাচ্ছি জলের অভাবে— মিঠে জল ঘরে তোলো এই বেলা।

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

সোমবার

[পোস্টমার্ক ৭ নভেম্বর ১৯২৭]

প্রিয় ধীরেন

এ কয় দিন অসুখ ছবি আঁকা এবং জাভার গল্প এতেই ব্যস্ত থেকে তোমার চিঠি এবং জিনিষগুলোর কথা ভুলেই বসেছিলেম।

জাঁতী আর খড়ের বগ্‌লীটা চমৎকার দুটোই কাজের এবং দুটোই সুন্দর ওর একটাও দুষ্প্রাপ্য নয় এই হল artএর লক্ষণ। যখন দেশে আর্ট থাকে তখন এমনি হাওয়ার মতো সহজ সর্ব্বব্যাপী ভাবেই থাকে আর যখন দেশ থেকে আর্ট চলে যায় তখন জিনিষগুলো দুর্ম্মূল্য দুষ্প্রাপ্য মিউজিয়াম পিস্‌রূপে থেকে যায় এবং শীতের মাঝে হঠাৎ দখিন হাওয়ার মতো মনের উপর কাজ করে।

বোলপুরে Fresco শেখাতে লোক আসছে ভালই কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে বাঁশের ভারায় উঠে কাজ করা চাই তবে ও বিদ্যেটা টিকবে এদেশে। তোমাদের সঙ্গে দু একজন মিস্ত্রি (Local রাজ মজুর) যদি এই কাজটা শিখে নেয় তবেই ঠিক হয়। না হলে আমার Art Schoolর Fresco শেখানোর মতো বিদ্যাটা ব্যর্থ হবে জেনো। দেখা যাক কতদূর কি হয়ে ওঠে, ওটা সখের জিনিষ করে ভেবো না।

আশা করি তোমরা ভাল আছ।

তোমারি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

5, Dwarka Nath Tagore Lane
Calcutta

[পোস্টমার্ক ২৫ জুন ১৯২৮]

প্রিয় ধীরেন

আমি এখন প্রায় সেরে উঠেছি। হাতের বাত নেই বল্লেও চলে, তবে এখনো ছবি আঁকা লেখা এসব বন্ধ আছে। নতুন ছবি কিছুই হয় নি।

তোমার চিঠি পেয়ে বুঝছি আমার চেয়ে তোমাদের রোগটা শক্ত। সেদিন সোমেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তোমাকে পূর্ব্বে বলেছি এবং তাকেও বল্লেম তোমার উচিৎ হয় তোমার দেশের জন কয়েক ভাল ভাল কারিগর নিয়ে একটি Art School খোলা, প্রাচীন art & crafts মেয়েরা পুরুষরা যাতে আদর করতে শেখে এবং ঐ সব design ইত্যাদি যাতে করে আজকের দিনে কাজে আসে এই উদ্দেশ্য নিয়ে যদি কাজে নাম্‌তে পারো তো আর ভাবনা থাকে না— এই হল মস্ত একটা ঔষধ তোমার এখনকার অবস্থায়। আর একটা অমোঘ ঔষধ হচ্ছে প্রকৃতির ঝর্ণার ধারে বাসা বাঁধা তোমরা কেউ ওদিকটাতে যেতেই চাও না। হয় মাষ্টার মশায়ের জল কলসী নয়তো নিজের কল্পনার সুরাই এরি উপরে নির্ভর করে সাহারা পার হতে চাচ্ছ, ঝর্ণার সন্ধানই নিলে না তো হবে কি। সব artist-কেই তিনটে ধাপ

অতিক্রম করতে হয় বা তিন অবস্থা পেতে হয় ১. গুরু পদাঙ্ক ধরে চলা, ২. নিজের কল্পনা রথে ভর দেওয়া, ৩. প্রকৃতির ঝর্ণা-জলে অবগাহন করা। তোমাদের প্রথম দ্বিতীয় অবস্থা কাটে নি, আমার কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে গোড়ার অবস্থা দুটোতেই বেশিদিন থাকতে হয় নি থাকার সুবিধাও পাই নি সোজা ঝর্ণাতলায় এসে গেছি কেমন করে তা কে জানে। এখন আমি নির্ভাবনা ছবি হলেও হয় না হলেও দুঃখ নেই। ভান্ হাতটা যেতে যেতে রয়ে গেল শুধু তোমাদের জন্যে প্রকৃতিদেবীর আশীর্ব্বাদ বহে আনার অপেক্ষায়।

তোমারি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোমেন্দ্র = আগরতলাবাসী সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা—
শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র

শিল্পে সাহিত্যে জীবনে অবনীন্দ্রনাথ

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

নদী এসে সাগরে মেশে; বলি সাগর সংগম, আমরা তাকে মাহাত্ম্য দিই। সাগর ছাড়াও তিন নদী এক জায়গায় এসে মিলল, বলি ত্রিবেণীসংগম, তাকেও মাহাত্ম্য দিই। সংগমে স্নান করে লোকে পুণ্যার্জন করে। মিলনের মিশ্রণের একটা মহিমা আছে, সেজন্যেই সকলের চোখে এর মাহাত্ম্য। একের সঙ্গে আরেক মিশে যোগফল হয় দ্বিগুণ অর্থাৎ গুণ বাড়ে। আবার দুয়ে মিলে যে জিনিসের সৃষ্টি হয় সে জিনিস সম্পূর্ণ নতুন। সে প্রাণবান বেগবান, বিরাট বিচিত্র। এই নতুনকে বৃহৎকে বিচিত্রকে পাওয়াই পুণ্যার্জন। এই যেমন নদীর মিলন তেমনি আছে কালের মিলন, যুগের মিলন। এক যুগ গিয়ে আরেক যুগ যখন দেখা দেয় তখন তাকে বলি যুগসন্ধি। তাকেও একই কারণে বলা যেতে পারে পুণ্যসংগম। একটা প্রচলিত জীবনধারার সঙ্গে একটা অপরিচিত জীবনধারার যখন সংযোগ ঘটে তখন জীবনের বিস্তার বাড়ে, বৈচিত্র্য বাড়ে, সম্ভাবনা বাড়ে। যুগসন্ধির সেটাই মহিমা।

নবাবী আমল গিয়ে বিলিতি আমল এসেছে। নতুন মাত্রই আসে বহু সম্ভাবনা নিয়ে। আবার যে যুগ চলে যায় সেও নিজেকে একেবারে নিঃশেষ করে যায় না, তারও কিছু থেকে যায়। নবাবী আমলের জাঁকজমক— ঝাড় লণ্ঠন, ফরসি ফরাশ একেবারে বিদায় হয় নি; বিলিতি কায়দা কানুন, লটবহরও পুরোপুরি এসে পৌঁছয় নি। তা হলেও দু-এর সমাহারে এক অপূর্ব বর্ণসমারোহের সৃষ্টি হল। নতুন পুরাতনের বিরোধে মিলনে, গ্রহণে বর্জনে সমাজে এক আবর্তের সৃষ্টি হয়। আমরা বিলিতি ঢঙে তার নাম দিয়েছি রেনেশাঁস। নামটা পুরোপুরি অসংগত না হলেও এর মধ্যে একটু অতিশয়োক্তি আছে। কারণ আমরা ঘুমে এমন অচৈতন্য ছিলাম না যে ইংরেজ এসে ঝাঁকুনি দিয়ে আমাদের জাগিয়ে দিল। দেশের জ্ঞানভাণ্ডার শূন্য ছিল না, জ্ঞানচর্চা এবং জ্ঞানস্পৃহারও অভাব ছিল না। কাজেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বার্তা যখন এসে পৌঁছল সেদিনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় তাকে গ্রহণ করতে খুব একটা ইতস্ততঃ করেন নি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনে যে বহু বিচিত্র প্রতিভার স্ফুরণ হল, নিজ ভাণ্ডারে যথেষ্ট সঞ্চয় না থাকলে কেবল নকলনবিশির দ্বারা তা কখনোই সম্ভব হত না।

আমাদের রেনেশাঁস প্রকৃতপক্ষে দুই ভিন্ন জীবনধারার সংগম। সে সংগমে সেদিন যাঁরা পুণ্যস্নান করেছিলেন তার মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার অগ্রগণ্য। আবর্তের মুখে প্রথম যাঁরা সংগমে স্নান করেছেন কিছু তাঁদের বেগ পেতে হয়েছে, নাকানি চুবুনি অনেকেই খেয়েছেন। পুণ্যার্জনে অল্পবিস্তর বিঘ্ন থাকেই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যে পরিচয় আজ দেশবাসীর কাছে সমুজ্জ্বল তাতে বিশ্বাস করাই কঠিন যে তিনি হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্র ছিলেন। সেখানকার বিজাতীয় পরিবেশের ফাঁড়া কাটিয়ে তিনি অক্ষত দেহ মনে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। বিজাতীয় শিক্ষাকে তিনি নিজগুণে শোধন করে নিয়েছিলেন। নিজ পরিবারের শিক্ষায় দীক্ষায় পাশ্চাত্য বিদ্যাকে যথাযোগ্য আসন দিয়েও বিলিতিয়ানার রাহুগ্রাস থেকে তাকে রক্ষা করেছিলেন। তথাপি গোড়ার দিকে আতিশয্য খানিকটা ছিল, সে কথা

স্বীকার করতেই হবে। ৬ নম্বর বাড়ির ঐশ্বর্যে তখনই একটু বৈরাগ্যের রঙ লেগেছিল কিন্তু ৫ নম্বর বাড়ির জৌলস তখনো জাজ্বল্যমান। পলতার বাগানবাড়িতে অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথ পার্টি দিচ্ছেন। কন্যা বিনয়িনীর (প্রতিমা দেবীর মাতা) বিয়ে ঠিক হয়েছে, সে উপলক্ষ্যে পার্টি। এক রাজসূয় যজ্ঞ। বালক বয়সে দেখা সে পার্টির বর্ণনা অবনীন্দ্রনাথ নিজ মুখেই দিয়েছেন— 'যেখানে যত আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সাহেবসুবো কেউ বাদ রইল না। বিরাট আয়োজন হল। দিকে দিকে তাঁবু পড়ল। কেক-মিষ্টান্নে ফুলে ফলে, আতর-গোলাপে ভরে গেল চার দিক। নাচ-গানেরও ব্যবস্থা হয়েছে। বাবুর্চি খানসামা টেবিল ভরে স্যাণ্ডউইচ আইসক্রিম সাজাচ্ছে। ওদিকে বৈঠকখানায় শুরু হয়েছে পার্টি নাচ গান। প্রথম দিন দেশি রকমের পার্টি; দ্বিতীয় দিন হল সাহেবসুবোদের নিয়ে ডিনার পার্টি। ব্যারিস্টার নন্দ হালদার টোস্ট-প্রস্তাবের পর গ্লাস শেষ করে বিলিতি কায়দামাফিক পিছন দিকে গ্লাস ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অমনি সকলেই আরম্ভ করলেন গ্লাস ছুঁড়ে ফেলতে। একবার করে গ্লাস শেষ হয় আর তা পিছনে ছুঁড়ে ফেলছেন, ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে চার দিক মুখরিত। মনে আছে, খানসামারা যখন লাইন করে করে সাজাচ্ছিল কাচের গ্লাস— গোলাপি আভা, খুব দামি। পরদিন সকালে যখন ঝাটপাট শুরু হল, গোলাপের পাপড়ির সঙ্গে গোলাপি কাচের টুকরো স্তূপাকার হয়ে বাইরে চলে গেল।" দু-তিন দিন পরে পার্টি শেষ হল। নবাবী আমলের জেল্লা জলুস আর বিলিতি আমলের হরষ বিলাস— দু-এর মিলন এ ভাবে হত। জোড়াসাঁকো বাড়ির সেকাল-একাল মেশানো বহু বৈভব-চিত্রের মধ্যে এই একটা নমুনা দেওয়া গেল।

আবর্তের তোড়ে যে ফেনা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে তা মজে যেতে একটু সময় লাগে, ঠাকুর-পরিবারেও লেগেছে। তবে শিক্ষা এবং রুচি মজ্জাগত ছিল বলে তামসিকতা দূর হতে খুব একটা বিলম্ব হয় নি। রাজসিকতা বরাবরই ছিল; বলা বাহুল্য, রাজসিকতা বলতে রজোগুণ-জাত লক্ষণাদি নয়। রবীন্দ্রনাথ যে রাজ-মহিমা, রাজ-সমারোহের কথা বলেছেন এ সেই রাজসিকতা। সে রাজ-মহিমার প্রকাশ সৌন্দর্যে মাধুর্যে ঔদার্যে। ভারতীয় সমাজে এ জাতীয় রাজসিকতার মাহাত্ম্য অজানা ছিল না। 'রাজর্ষি' কথাটির মধ্যেই তার প্রমাণ। দেবেন্দ্রনাথ মহর্ষি আখ্যা লাভ করেছিলেন, রাজর্ষি আখ্যা দিলেও কিছু বেমানান হত না। ঐশ্বর্যের দীপ্তি তখনো দেদীপ্যমান কিন্তু আতিশয্য বর্জন করে ক্রমে তা একটি স্নিগ্ধ সংযত রূপ ধারণ করল। বিলাস ব্যসনের ধরন গেল বদলে। মহর্ষি ছিলেন সৌন্দর্যের উপাসক। সমগ্র পরিবারে নিত্যদিনের জীবনযাত্রায়— বসনে ভূষণে, কথনে চিন্তনে, আমোদে আহ্লাদে ক্ষুদ্রতম কর্মটিকেও শোভন সুন্দর করে দিয়েছিলেন। সৌন্দর্যবোধ প্রকৃতপক্ষে বিশেষ এক ধরনের মূল্যবোধ। সাধারণতঃ আমরা কোনো জিনিসের মূল্য নির্ণয় করি প্রয়োজনের নিরিখে আর প্রয়োজন ভুলে অকারণে কোনো জিনিসকে যদি মূল্য দিই সেটি নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যবোধ-জাত। একটি হল গতানুগতিকের দৃষ্টি, অপরটি অনুরাগের। অনুরাগের দৃষ্টিকেই বলে দিব্যদৃষ্টি। সব-কিছুকে ভালোবেসে দেখা। এ দৃষ্টি যিনি লাভ করেন রূপে রঙে রসে সমস্ত পৃথিবী তাঁর কাছে অপরূপ হয়ে দেখা দেয়। সৌন্দর্যবোধ একটি যেন সোনার কাটি। মহর্ষি তাঁর পরিবারে সোনার কাটিটি ছুঁইয়ে দিয়েছিলেন। আর তারই ফলে একটি মাত্র পরিবারের পরিধির মধ্যে একে একে বিচিত্র প্রতিভার স্ফুরণ হতে লাগল। শিল্পে কলায় সংগীতে সাহিত্যে বাংলা দেশে এক নবযুগের সূচনা হল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে শুধু সৌন্দর্যনিকেতন নয়, আনন্দনিকেতনও বলা যেতে পারত। সম্বৎসর আনন্দোৎসব লাগাই থাকত। এ-সবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অবনীন্দ্রের পিতা গুণেন্দ্রনাথ এবং মহর্ষিপুত্র

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথের উক্তিতে— গুণজ্যোতি হয়ে যেথা মনের তিমির— এর আভাস আছে। গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন শৌখিন মানুষ, নানা রকমের শখ ছিল। দিশী বিলিতি নানা জাতীয় ফুলে লতায় অপূর্ব বাগান রচনা করেছিলেন। আর ছিল সংগ্রহের বাতিক; জহুরীরা আসত কত রকম দামি পাথর নিয়ে— হীরা পান্না নীলা পলা ইত্যাদি। কেউ বা আসত পাথরে বা কাঠে কাজ করা নানাবিধ শিল্পসামগ্রী নিয়ে। বড় বড় ওস্তাদ গাইয়েরা আসতেন, সংগীতের আসর বসত। চিত্রকলারও শখ ছিল। গুণেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুজনেই আর্টস্কুলের ছাত্র ছিলেন। স্বদেশী নাট্যমঞ্চের গোড়াপত্তনে পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়ির মতো জোড়াসাঁকো বাড়িও যথেষ্ট সহায়তা করেছে। অবনীন্দ্র-পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 'নববাবু বিলাস' নাটকের অভিনয় হয়েছিল। সেই প্রথম, দ্বিতীয় অভিনয় হয়েছিল পিতা গুণেন্দ্রনাথের উদ্যোগে। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়ে বহুবিবাহের নিন্দা করে নাটক লেখানো হল। নাম 'নবনাটক'। নাট্যকারকে দামি শাল এবং পাঁচশো টাকা পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ তখন শিশু। প্রথম দিকে যা ছিল কেবলমাত্র শখের ব্যাপার ক্রমে তা নানাবিধ সৃষ্টিমূলক কিছুবা দেশাত্মবোধক কাজে নিয়োজিত হতে লাগল। জ্যেঠামশায় গণেন্দ্রনাথ হলেন হিন্দু মেলার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক রচনায় মনোনিবেশ করলেন। সংগীত প্রেমিক ছিলেন, নতুন নতুন সুরসৃষ্টি করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাতে কথা জুড়ে দিয়েছেন। পরিবার-পরিজনকে নিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হল।

এক অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য জোড়াসাঁকোর নিত্যদিনের জীবনে হাসি গানকে চিত্রে শিল্পে সুন্দরের আবাহনে যেন মাতিয়ে রেখেছিল। পরিবার-মধ্যে এই বিচিত্র প্রাণ মাতানো কর্মকাণ্ড অবনীন্দ্রের শিশুমনকে নিত্য দোলা দিয়েছে। যেখানে জীবনস্রোত নিত্য বহমান সেখানে ধীরে ধীরে পলি জমতে থাকে। সেই পলি থেকেই কবি এবং শিল্পী মনের সৃষ্টি হয়। শিশুমনের এই সঞ্চয়ের কথা অবনীন্দ্রনাথ বারম্বার বলেছেন তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' এবং 'আপন কথা' গ্রন্থে। শিশুরা রূপকথার গল্প শোনে, অবনীন্দ্রনাথ এক রূপকথার রাজ্যে মানুষ হয়েছেন। সেখানকার মানুষজন যেমন শানিত-বুদ্ধি তেমনি মার্জিত-রুচি, যেমন বিত্তবান তেমনি হৃদয়বান। এঁদের হাসি খেলা, আমোদ আহ্লাদে কোথাও কোনো স্থূলতা নেই। এক কথায় সমস্তই যেন larger than life. সে রূপকথার রাজ্যের ছবি অবনীন্দ্রনাথ নিজ হাতে তুলে ধরেছেন তাঁর দুই স্মৃতি-চারণ গ্রন্থে—'ঘরোয়া' আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে'।

ইচ্ছা করেই রূপকথার রাজ্য বলছি; কারণ এক সময়ে ঐ কথাটি নিন্দাচ্ছলে উচ্চারিত হতে শুনেছি। আমার এক বন্ধু পূর্বোক্ত গ্রন্থ দুটি পাঠ করে বলেছিলেন, রূপকথার কাল কি আর আছে? এঁরা এক অবাস্তব জগতে বাস করতেন। শুনে আমি খুব অবাক হই নি; কেননা খুব সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক আটপৌরে ধরনের ব্যাপার না হলে কোনো কিছুকে এ যুগে বাস্তব বলে গ্রাহ্য করা হয় না। বোধ করি ঠাকুরবাড়ির পার্থিব বৈভবের চিত্রই আজকের পাঠকের কাছে রূপকথার ন্যায় অবাস্তব বলে মনে হয়েছে। পারিবারিক বৈভবের কথা অবশ্যই বলেছেন, না বললে সত্য গোপন করা হত। কিন্তু একটি সহজ কথা আমরা ভুলে যাই যে দুঃখের অভিজ্ঞতায় সকল মানুষই সমান। প্রকৃতপক্ষে এক দারিদ্র্য ছাড়া সাংসারিক আর সকল রকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এঁদের যেতে হয়েছে। এঁরা বিধাতার আদুরে সন্তান নন— দুঃখ আঘাত মৃত্যুশোক এঁদের ভাগে কিছু কম জোটে নি। পলতার বাগানে যে পার্টির উল্লেখ করেছি তারই

দুদিন পরে পিতা গুণেন্দ্রনাথের মৃত্যু। শৈশবেই পিতৃহারা। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, একদিনেই যেন ছেলেবেলাটা ফুরিয়ে গেল। কিন্তু ফুরিয়ে যেতে দেন নি, চিরজীবন আঁকড়ে ধরে থেকেছেন। সেজন্যেই ছেলেদের নিয়ে তাঁর খেলা, ছেলেদের জন্যে গল্প বলা, তাদের জন্যে খেলনা গড়া।

দুঃখ আঘাত অনেক পেয়েছেন, বহু মৃত্যু পার হয়ে এসেছেন কিন্তু সমস্তকেই দেখেছেন জীবন-দেবতার নিপুণ শিল্প হিসাবে। আমরা এঁদের ঐশ্বর্যটাকেই বড় করে দেখেছি সেজন্যে বুঝতে অনেক ভুল করেছি। তিনি যে ঐশ্বর্যের চিত্র এঁকেছেন তাতে কোথাও কোথাও প্রচ্ছন্ন কৌতুক প্রকাশ পেয়েছে আবার এরই বর্ণচ্ছটা ক্ষণে ক্ষণে তাঁকে মুগ্ধও করেছে। তা ছাড়া ঐশ্বর্যের কথা যেমন বলেছেন তেমনি আবার তুচ্ছতম জিনিসটিও উল্লেখ করতে ভোলেন নি— "রান্নাবাড়ির একধারে ছোট্ট ঘর, অমৃতদাসী সেই ঘরে বসে জাঁতায় সোনামুগের ডাল ভাঙে আর বাটনা বাটে।··· সেই ঘরটি আর জাঁতাটি, সারাজীবন তাই নিয়ে কেটেছে; তার মিউজিক ছিল জাঁতার ঘড়ঘড়ানি। সোনামুগ আর বাটনার হলুদের জল ভেসে যাচ্ছে, কাপড়েও লেগেছে, সোনাতে হলুদে মাখামাখি। এখনও মনে হয় তার কথা; দুঃখিনী একটি বুড়ির ছবি চোখে ভাসে।" আর ফেলাবতীর কাহিনী? সত্য তো বটেই— সত্যের চাইতেও যাকে বড় বলব— রস, কাব্যরস— সেই রসে সিক্ত স্নিগ্ধ সেই কাহিনী। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন— "একদিন মাও গেলেন; দাদাও গেলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ি শূন্য করে। ক্রমে ক্রমে আমার দক্ষিণ বারান্দার জলসা বন্ধ হল।··· ভাই বন্ধু সঙ্গী ছাত্র সব চলে গেছে, অতবড় খালি বাড়ির সেই দক্ষিণ বারান্দায় একা বসে আমি পুতুল গড়ি··· এমন সময় একদিন ফেলাবতী এসে হাজির। কোথা থেকে উঠে এল এতটুকুন মেয়েটি, নেড়া ভোলা চেহারা। বললুম, কে তুই?

আমি ফেলা।

ও ফেলা, তা এসো।

দেখে বড় আনন্দ হল। যখন ফেলে-দেওয়া জিনিস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি, নতুন রূপ দিচ্ছি, তখন এল ফেলাবতী আমার। বললুম, কোত্থেকে আসিস? ঘর কোথায়?

বললে, এই এখান থেকেই। বলে, রাস্তার মোড়ের দিকটা দেখালে।···

ভাবছি, এ কোন্ ফেলা এল। মনে হল না সে মানুষ।

বললুম, কি চাই তোর?

আমি এখানে বসে খেলা করি নে একটু?

তা বেশ তো, কর তুই খেলা। বলি, ফেলা একটা সন্দেশ খাবি?

তা খাব।

রাধুকে বলি, রাধু, আমার ফেলার জন্যে সন্দেশ নিয়ে আর একটা।··· [রাধু] একটা সন্দেশ আর মাটির গেলাসে জল এনে দেয়। ফেলা সন্দেশ খেয়ে জল খেয়ে গেলাসটি এক কোনায় রেখে দেয়।

বলি, কেমন লাগল?

ফেলা বলে, তোমাদের সন্দেশ কেমন আঠা আঠা, গলায় লেগে যায়।···

এমনি রোজ আসে সে, সন্দেশ খাইয়ে ভাবসাব করি। সে একপাশে বসে খেলে, আমিও খেলি।··· বিনি পয়সার খেলুড়ি ফেলা নিঃসঙ্গ দিনের, মানুষের মধ্যেও সে ফেলা, কাঠকুটরো, ছেঁড়া টুকরো কাগজেরই সামিল। যত ফেলা জিনিস কুড়িয়ে বাড়িয়ে এক বুড়ো আর এক মেয়ে খেলা জুড়েছি সেই দক্ষিণের

বারান্দায়।... দক্ষিণের বারান্দায় সেই শেষ প্রবেশ ফেলাবতী ও আমার। তার পর অসুখে পড়লুম। সেই অবস্থাতেই শুনি দক্ষিণের বারান্দা বিকিয়ে গেছে মাড়োয়ারিদের হাতে।"

এই হচ্ছে আসল রূপকথা। শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখলে আর কবির মন নিয়ে বললে তবেই এমন বাস্তব রূপকথার সৃষ্টি হয়। আর রূপকথা কি নিন্দের কথা? কথা যদি রসের মধ্যে রূপ লাভ করে তা হলে রূপ-কথাই হয় রসসাহিত্য। অবনীন্দ্রনাথের লেখায় যেমন রূপকথার আমেজ আছে তেমনি আবার আমাদের চিরপরিচিত পাঁচালির জমাট ভাবটি আছে। দাশু রায়ের পাঁচালি একদিন যেমন বাঙালীকে মাতিয়েছিল এই সেদিনও বিভূতিভূষণের পাঁচালি তেমনি তাকে মাতিয়েছে। পথের পাঁচালিকে যদি বলি অপুর পাঁচালি, অবনীন্দ্রের কথা কাহিনীকে বলব অবুর পাঁচালি ('মাসি' গল্পে অবু নামেই তাঁর পরিচয়)। শিল্পকলায় ভারতের বিস্মৃতপ্রায় ঐতিহ্যকে তিনি যেমন পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, সাহিত্যে তেমনি বাংলাদেশের লুপ্তপ্রায় গল্পবলার ধারাটিকে তিনি পুনরাবিষ্কার করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ সত্যিকারের কথা-সাহিত্যিক অর্থাৎ তাঁর মুখের কথাতেই সাহিত্যের আমেজ থাকত। কথা বলার নিজস্ব একটা ঢঙ ছিল, রবীন্দ্রনাথ সেটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনিই তাঁকে সাহিত্যের আসরে টেনে আনলেন। প্রথম দিকে নিজের মনেই সংশয় ছিল। লেখা বলতে অবনীন্দ্রনাথ বুঝতেন ছবি লেখা। নানা বর্ণে রঙ-বেরঙের ছবি লিখেছেন; কিন্তু বর্ণমালা দিয়েও যে মালা গাঁথা যায়, ছবি ফুটিয়ে তোলা যায় সে কথা কখনো মনে আসে নি। বললেন, আমি আবার কি লিখব, কেমন করে লিখতে হয় আমি জানি নে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তুমি যেমনটি করে কথা বল, গল্প কর ঠিক তেমনটি করেই লিখবে। লিখলেন শকুন্তলার কাহিনী। পাণ্ডুলিপিটি এনে রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ পড়ে বললেন, চমৎকার হয়েছে। কোথাও কলম ছোঁয়ালেন না। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্নীকে বলেছিলেন বাংলাদেশের রূপকথা সংগ্রহ করতে। মৃণালিনী দেবী তাঁর সংগ্রহ থেকে ক্ষীরের পুতুলের গল্পটি একদিন অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, কাকীমা ঠিক যেমনটি করে গল্পটি বলেছিলেন ঠিক তেমনটি করেই তিনি লিখেছেন। বলা বাহুল্য, শিল্পীসুলভ মন নিয়ে তিনি তাঁর ভাষায় যথেষ্ট রঙ ছড়িয়েছেন। তা হলেও রূপকথায় তাঁর হাতে-খড়ি যে মৃণালিনী দেবীর কাছেই হয়েছিল সে কথাটি সোৎসাহে স্বীকার করেছেন। বলেছেন, এই আমার রূপকথার আদিকথা। ক্ষীরের পুতুল তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। রূপকথার জগতে এর তুলনা মেলা ভার। সেই শুরু। ক্ষীরের পুতুলের রাজার মতো অবু সদাগর তাঁর সপ্তডিঙায় পাল তুলে দিয়ে সাহিত্যের দরিয়ায় ভেসে পড়লেন। মণি মুক্তা হীরা জহরতে ডিঙা ভরতি হতে লাগল। দুয়োরানীর যেমন দুঃখ ঘুচেছিল আমাদের শিশু সাহিত্যেরও তেমনি দুঃখ ঘুচল। 'রাজকাহিনী' যখন লিখলেন রীতিমতো সোরগোল পড়ে গেল। এক সময়ে লোকে বলত বাংলাভাষার এমন বর্ণাঢ্য জমকালো রূপ এর আগে কখনো দেখা যায় নি। রাজকাহিনী সম্পর্কে একটি কথা অবশ্য আমার মনে হয়েছে। চিত্রশিল্পী হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ রঙের ব্যবহারে অতিশয় সংযত কিন্তু সাহিত্যশিল্পী হিসাবে রঙের ব্যবহারটা একটু যেন বেহিসাবী হাতে করেছেন। রাজকাহিনীর ভাষা একটু অতিমাত্রায় কাব্যময়। রূপকথায় সেটা খুব মানিয়ে যায় কারণ রূপকথার জগৎ কাব্যের জগৎ।

সাহিত্য রচনায় শিশুকে করেছিলেন তাঁর মিডিয়াম কিম্বা বলা যেতে পারে শিশুরাই তাঁকে পেয়েছিল মিডিয়াম হিসাবে। শিশুর জগৎ বিস্ময়ের জগৎ। অবনীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে তারা তাদের নিজের

জগৎকে আরো স্পষ্ট করে দেখেছে, তাঁর মুখ থেকে সে জগতের বিস্ময়কর কাহিনী শুনেছে। সে জগৎ যেমন বিস্ময়ের তেমনি বিশ্বাসের। শিশুর জগতে সবই সম্ভব, অসম্ভব কিছুই নেই। সেখানে একটা জলজ্যান্ত ছেলে ঠাকুর দেবতার শাপে বুড়ো আঙুলটির মতো এইটুকুন একটা যক্ হয়ে গেল। তার পরে এক খোঁড়া হাঁসের পিঠে চড়ে, বুনো হাঁসের দলে ভিড়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। গল্প বলবার এমনি আশ্চর্য কৌশল যে আমরা বয়স্ক বুদ্ধিমন্তরা যারা বিশ্বাসের জগৎ থেকে নির্বাসিত, সেই আমাদেরও নেশায় পেয়ে যায়। গল্পের শেষে রিদয়-এর মতোই মনে প্রশ্ন জাগে, 'আমি কি সত্যিই বড় হয়ে গেছি?' শিশুজগতের চাবিকাঠির সন্ধান একমাত্র কবি শিল্পীরাই জানেন। শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর প্রধানতম প্রয়াস হল সৃষ্টির গভীরতম রহস্যের আবিষ্কার এবং উদ্ঘাটন। সৃষ্টির আদিমতম রূপটির অনুধাবন কবি শিল্পীর এক নিরন্তর জিজ্ঞাসা। শিশুও আদিম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিশু সংসারের সব চাইতে পুরাতন সামগ্রী। আদি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সে একই আছে, তার কোনো পরিবর্তন হয় নি। সৃষ্টির আদিম রূপের নিদর্শন হিসাবে শিশুর প্রতি কবি শিল্পীর স্বাভাবিক আকর্ষণ। ইংরেজ কবিদের মধ্যে একদিক থেকে সব চাইতে ওরিজিন্যাল কবি বলা যেতে পারে উইলিয়াম ব্লেক। শিশুর মনই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু, সেই মনকে বুঝবার এবং বোঝাবার চেষ্টাতেই লিখেছেন তাঁর Songs of Innocence। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শিশুরঞ্জনী কবিতা তেমন লেখেন নি কিন্তু তাঁর কাব্যে শিশু এবং শৈশব কৈশোর অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। রবীন্দ্রনাথও বলতে গেলে আজীবন শিশুপরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যালয় স্থাপন করে বলেছিলেন, শিশু মহারাজের দ্বাররক্ষীর কাজ নিয়েছি। দ্বাররক্ষী তো নয়, তিনি ছিলেন শিশুমহারাজের সভাকবি। গল্পে নাটকে কবিতায় গানে ছড়ায় নানাভাবে শিশুমনের তুষ্টি এবং পুষ্টি -সাধন করেছেন। আর অবনীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় শিশুমহারাজের দরবারে বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মজার মজার কাহিনী আর যত রকমের উদ্ভট গল্প বলে শিশুর মনোরঞ্জন করেছেন। 'আপন কথা'র ভূমিকায় নিজেই বলেছেন, "আমার ভাব ছোটদের সঙ্গে··· থেকে থেকে যারা কাছে এসে বলে, 'গল্প বলো', সেই শিশুজগতের যারা সত্যিকার রাজা-রানী, বাদশা-বেগম তাদেরই জন্যে আমার লেখা।" পশ্চিমের অনেক দেশেই শিশু-সাহিত্য সুসমৃদ্ধ এবং সুপ্রচুর। নিরক্ষরতা দেশব্যাপী বলে আমাদের শিশুসাহিত্যের পরিমাণ এবং বিস্তার দুই-ই কম। কিন্তু সমৃদ্ধির দিক থেকে সে কারো তুলনায় কম নয়। বরং শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে নিষ্ঠা দেখিয়েছে পৃথিবীর আর কোনো দেশে তা দেখা যায় নি। কোন্ দেশে বিদ্যাসাগরের সমতুল্য ব্যক্তি লিখেছেন কথামালার গল্প, লিখেছেন বোধোদয়? (প্রকৃতপক্ষে বাঙালী সন্তানের হাতে-খড়ি হয়েছে বিদ্যাসাগরের হাতে; তাঁর 'বর্ণপরিচয়'-এর দৌলতে বাঙালীর অক্ষর পরিচয় হয়েছে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথও ঐ কাজটি করেছেন তাঁর 'সহজ পাঠ'-এর মাধ্যমে।) 'কথা ও কাহিনী'র ন্যায় narrative verse পৃথিবীর উন্নততম দেশেও ক'টি লেখা হয়েছে? কোন্ দেশের শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ শিল্পী— মহামনস্বী ব্যক্তিরা বুড়ো আঙুলের মতো ছোট্টটি হয়ে একরত্তি ছেলেমেয়েদের জন্যে গান ধরেছেন, ছড়া বেঁধেছেন, জমিয়ে বসে গল্প বলেছেন, নিজের হাতে গল্পের বইতে ছবি এঁকে দিয়েছেন? একমাত্র বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরাই এ সৌভাগ্য লাভ করেছে। এই কারণে এক সময়ে আমার একটি প্রবন্ধে আমি বাংলাদেশকে শিশুতীর্থ আখ্যা দিয়েছিলাম।

রূপকথা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অনেক কথাই এসে গেল। সাহিত্যে শিল্পে রূপসৃষ্টি নিয়েই কারবার।

কথা সুর ছন্দ দিয়ে যেখানে রূপ সৃষ্টি হয় সেখানেই সাহিত্যের রূপকথা আর রেখা রঙ তুলি দিয়ে যেখানে রূপের সৃষ্টি সেখানে শিল্পের রূপলেখা। শিল্পী সাহিত্যিক দুজনেই রূপকার, দুজনেরই শক্তি পরীক্ষা এক মাপকাঠিতে— যা প্রত্যক্ষ তাকে অধিকতর উজ্জ্বল আর যা অপ্রত্যক্ষ তাকেও চোখের সুমুখে জাজ্বল্যমান করে তোলার ক্ষমতায়। অবনীন্দ্রনাথ কথা দিয়েও ছবি এঁকেছেন; তাঁর লেখনী তুলির কাজ করেছে। লেখার মধ্যে রঙ ছড়িয়েছেন প্রচুর। অথচ দেখুন ছবির বেলায় রঙের ব্যবহার করেছেন ভয়ংকর হিসেব করে, কোথাও এতটুকু বাড়তি খরচ করেন নি। ছবি আঁকেন নি তো, ছবি আপনা থেকে যেন ফুটে বেরিয়েছে। মতিবাবু ছিলেন কত্তাদের আমলের সভাসদ। কত্তারা চলে গিয়েছেন, এখন ছেলেদের দরবারেই নিত্য এসে বসেন। গল্পগুজব করেন, ছবি আঁকা দেখেন। একদিন বললেন, "দেখুন,··· আপনার ছাত্র নন্দলাল, সুরেন গাঙ্গুলী, ওরা ছবি আঁকে, দেখে মনে হয় বেশ যত্ন করে ভালো ছবিই এঁকেছে। কিন্তু আপনার ছবি দেখে তো তা মনে হয় না।···

তবে কী মনে হয়?···

আপনার ছবি দেখলে মনে হয় আঁকা হয় নি মোটেই।

সে কি কথা! আপনার কাছে বসেই আঁকি আমি, আর বলছেন আঁকা বলেই মনে হয় না!

না, মনে হয় যেন ঐ কাগজের উপরেই ছিল ছবি।" ঐ যে বলেছি, ছবি যেন আপনা থেকেই ফুটে বেরোত, সে কথাটাই ভদ্রলোক বলতে চেয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন 'বুড়ো [মতিবাবু] বড় সার্টিফিকেটই দিয়েছিলেন আমায়'।

অবনীন্দ্রনাথ বলতেন আর্টিস্টকে তিনটি ধাপ পেরোতে হয়। প্রথম দিকটাতে রঙ রেখার কায়দাটুকু নিয়েই মেতে থাকে, তার পরে আসে রসের প্রৌঢ়তা, রঙ সাজসজ্জার কী বাহার— মোগল আমলের আর্টে যেমনটা দেখা যায়। "তারপর সেই বাহার থেকে পৌছল গিয়ে রসের আরো উঁচু ধাপে, তবে এল বাইরের রঙ-চঙ-ছুট ছবি যেন মেঘলা দিনের ছায়া, স্নিগ্ধ গম্ভীর।" আর্টের দুই শক্তি— দৃশ্য বস্তুকে জীবন্ত করে চোখের সামনে তুলে ধরা, অদৃশ্য ভাবকেও তেমনি জাজ্বল্যমান করে ফুটিয়ে তোলা। 'শাজাহানের মৃত্যু' ছবির কথায় বলেছেন— প্রাণাধিকা কন্যার মৃত্যু হয়েছিল অল্পদিন পূর্বে, অন্তরের বেদনাকে ঢেলে দিয়েছিলেন ঐ ছবির মধ্যে। মৃত্যুকে ফুটিয়ে তোলা তাতেই সম্ভব হয়েছিল। ঐ যে বলেছেন, তুলিটি জলে ডোবাই, রঙে ডোবাই, মনে ডোবাই— তবে তো ছবি আঁকা হয়। সংগীতের বেলাতেও ঐ কথাই বলেছেন— অন্তর বাজে তো যন্তর বাজে। এক সময়ে অবনীন্দ্রনাথ যন্ত্রসংগীতের যথেষ্ট চর্চা করেছিলেন, অধিকারও জন্মেছিল।

শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে একই ব্যাপার। টেকনিক সব-কিছুতেই আছে কিন্তু সবার মূলে হল মনের কারসাজি। মন যদি গররাজি হয় তো কোনো কারসাজিতেই কাজ দেবে না— ছবিতে রঙ ধরবে না, সাহিত্যে রস লাগবে না, সংগীতে সুর বাজবে না। একেই বলে 'একে তিন তিনে এক'। অর্থাৎ তিনটিরই রহস্য এক। একটির রহস্য ভেদ করতে পারলেই বাকি দুটিকেও পাওয়া যায়। রেখার জগৎ থেকে লেখার জগতে, সুরের জগৎ থেকে রসের জগতে প্রবেশপথ দুর্গম নয়। নাট্যাভিনয়েও অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। সেখানেও ঐ একই রহস্য— যে ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন নিজেকে সর্বান্তঃকরণে তার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন।

শিল্পী মানুষ— তিনি চিত্রকর হন, সাহিত্যিক হন, সংগীতজ্ঞ হন কিম্বা অভিনেতাই হন— উঁচু দরের কৃতিত্ব অর্জন করতে হলে তাঁকে প্রেমিক হতে হবে। তাঁকে ভালোবাসতে হবে শুধু আপনজনকে নয়, আপন পর সকলকে, সকল জীব, সকল সামগ্রীকে। অবনীন্দ্রনাথের ন্যায় এমন হৃদয়বান, মায়ামমতাশীল মানুষ সচরাচর দেখা যায় না; শিল্পকে সাধে বলেছে মায়াবিনী, মায়া দিয়ে তাকে গড়তে হয় আবার সেই মায়া দিয়েই সে অপরের মনে মোহের সৃষ্টি করে। ভাঙাচোরা ছেঁড়াখোঁড়া জিনিস— কাঠের টুকুরো, টিনের পাত, পিসবোর্ড জোড়াতালি দিয়ে অপূর্ব সব খেলনা গড়েছেন। এ এক অত্যাশ্চর্য কল্পনার খেলা। একটা কোনো সৌসাদৃশ্যকে মূর্তি দেওয়া— একটা resemblance-কে ফুটিয়ে তোলা— শিল্পীর যথার্থ কাজ। কল্পনাশক্তির এ এক কঠিন পরীক্ষা। তাঁর জীবনের শেষ খেলা ঐ কুটুম কাটাম নিয়ে। এই যে 'কুটুম' কথাটি ব্যবহার করেছেন এর মধ্যেই তাঁর আন্তরিক মমতাটি প্রকাশ পেয়েছে। আবার যা-কিছু গড়েছেন তাতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভাঙা টুকরো-টাক্‌রা জুড়ে তৈরি করছিলেন একটা ইঁদুর। শ্রীমতী রানী চন্দকে বলছেন— দেখলে, যেই না স্প্রিং দিয়ে লেজটি জুড়ে দিয়েছি অমনি জ্যান্ত হয়ে এক লাফে কোথায় গেল পালিয়ে, আর খুঁজেই পাচ্ছি না। শিল্পের আর শিল্পীর একই রহস্য। শ্রেষ্ঠ শিল্পী যা ধরবেন তাই জীবন্ত হয়ে উঠবে। মনে আছে অনেক কাল আগে— তখন বোধকরি আমি স্কুলের ছাত্র— মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের একটি ছবির প্রিণ্ট দেখেছিলাম। ছবিটির তলায় লেখা— the spirit of the stone. একটা প্রকাণ্ড পাথর পড়ে আছে— শ্যাওলায় ঢাকা। রঙ প্রয়োগের কৌশলে সমস্ত জিনিসটা এমন ইঙ্গিতময়, মনে হচ্ছিল পাথরটা জীবন্ত, এক্ষুনি নড়েচড়ে উঠবে। আমি ছবির কিছু বুঝি না কিন্তু সে ছবি আমার কিশোর মনে আশ্চর্য মোহের সৃষ্টি করেছিল; কতবার যে ছবির পাতাটি উল্টে দেখেছি, ভেবেছি পাথরটা এক্ষুনি নড়ে উঠবে।

মোহ মায়া যদি সৃষ্টি না করল তো শিল্প কী? সৃষ্টিমূলক কাজ আমাদের জীবনের পরিধি বাড়িয়ে দেয়, আমাদের আত্মীয়তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। মানুষজন তো বটেই, প্রাণীজগৎ, গাছপালার জগৎ, মাঠের সবুজ, মেঘের রঙ, জলের ঢেউ সব-কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধের গ্রন্থি রচনা করে। এ-সবই শিল্পের মোহিনী মায়ার গুণে। লিখতে যখন বসেছেন তখনো সেই মোহেরই সৃষ্টি করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ লেখেন যেন কথা বলেন। এ কথা আমরা সকলেই জানি যে মুখের কথার তুলনায় ছাপার কথা অনেক বেশি আড়ষ্ট। অবনীন্দ্রনাথের লেখায় বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই। মনের কথা মুখের ভাষায় এমন নিখুঁত ভাবে লেখার পাতায় এসে নেমেছে যে পথে এতটুকু তার খোয়া যায় নি। কথা দিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করতে হয় কিন্তু সে কথা শুধু সশব্দ হলে চলবে না, তাকে সজীব হতে হবে। অবনীন্দ্রনাথের ভাষা আশ্চর্য রকম প্রাণবন্ত, বলা যেতে পারে throbbing with life। ইংরেজিতে যে বলে style is the man, সে কথাটা খুব খাঁটি। প্রত্যেক লেখকের নিজ নিজ স্টাইল; যার যার যেমন নিজস্ব চরিত্র, এও তেমনি। লেখকের ব্যক্তিত্বটিই তাঁর স্টাইল হয়ে ফুটে ওঠে। টেকনিক নকল করা যায়, স্টাইল নকল করা যায় না। যে জিনিস অনুকরণসাধ্য সে জিনিস খুব উঁচু দরের নয়, তার আয়ুষ্কালও দীর্ঘ হয় না। অনেকে যখন অনুকরণ করতে শিখল তখনই তার মূল্যহানি ঘটল, সে আপনি বরবাদ হয়ে যাবে। এজন্যে টেকনিক কেবলই বদলাতে থাকে কিন্তু স্টাইল তার নিজস্বতা বরাবর বজায় রাখে।

অবনীন্দ্রনাথ স্টাইলের রাজা, যেমন তাঁর ছবিতে তেমনি তাঁর লেখায়। তার কারণ তাঁর জীবনযাপন-

নর্তকী

নাগাযোদ্ধ

সারেঙ্গী-বাদক
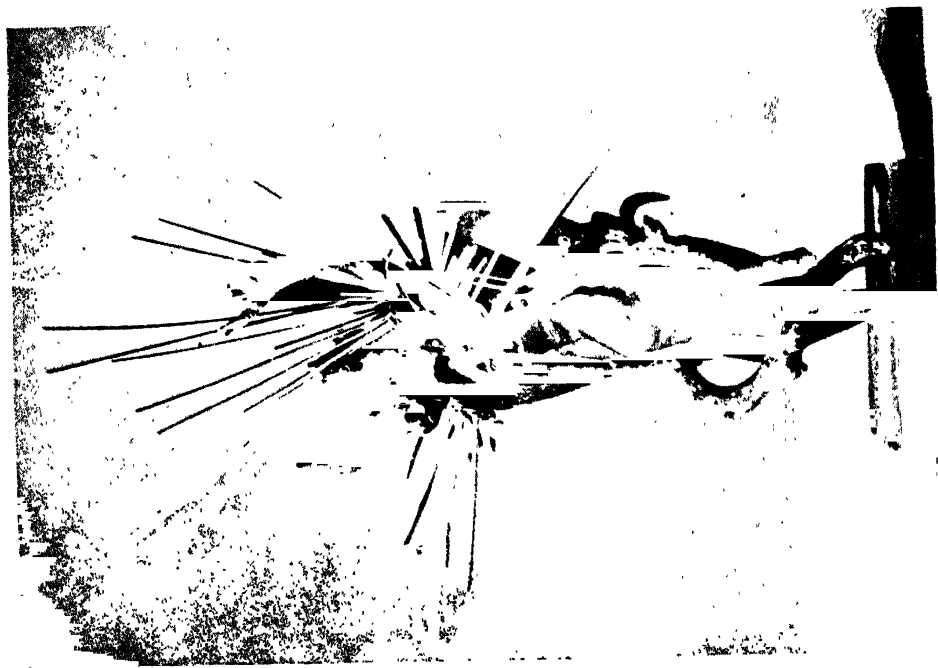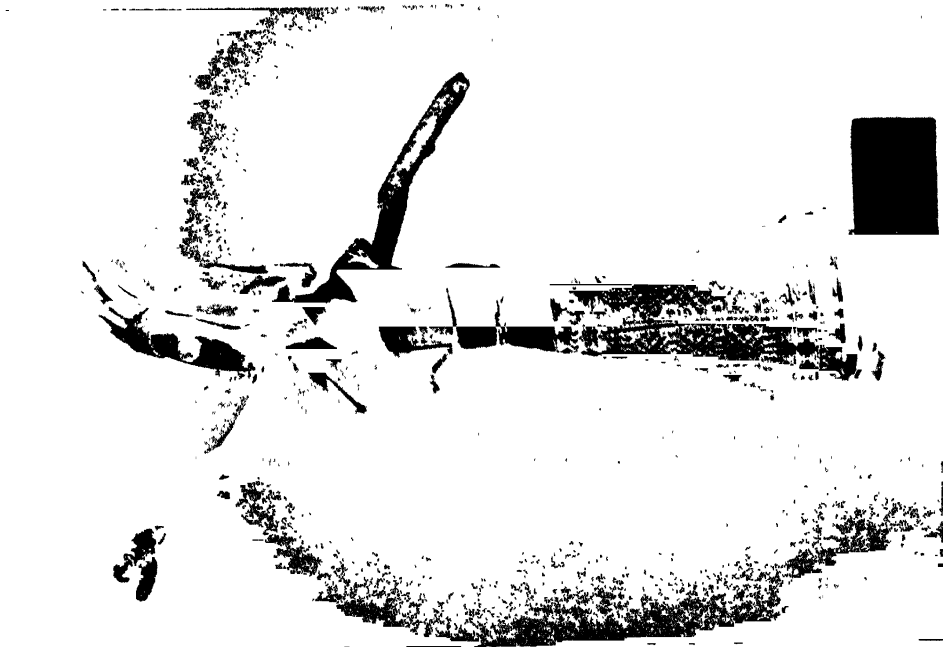
প্রণালীর মধ্যেই একটি নিজস্ব স্টাইল বা ঢঙ ছিল। জাঁকজমক সমারোহের মধ্যে বাস করেছেন রাজা-বাদশার মতো কিন্তু সেই সমারোহকে তিনি সাংসারিক জীবনের ভোগের মধ্যে যতখানি পেয়েছেন তার চাইতে বেশি পেয়েছেন শিল্পীমনের উপভোগের মধ্যে। আকাশের মেঘে মেঘে রঙের সমারোহকে যে চোখে দেখেছেন পার্থিব বৈভবকেও সেই চোখে অর্থাৎ শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখেছেন— যে দৃষ্টি থাকলে শুধু সমারোহ নয়, নিতান্ত অনাড়ম্বর ঘটনার মধ্যেও তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়, রিক্ত নিরাভরণ বস্তুর মধ্যেও সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যায়। যে দৃষ্টি অনাদৃত অবহেলিত জিনিসের এবং মানুষের অ-দৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে পারে তাকেই বলে শিল্প-দৃষ্টি। মোগল প্রাসাদের ছবি যেমন এঁকেছেন তেমনি আবার সাজাদপুরের পল্লীদৃশ্যও এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথের পোর্ট্রেট যেমন করেছেন— তেমনি আবার নিজের চাকর রাধুরও পোর্ট্রেট করেছেন— একটি নয়, তিন তিনটি। প্রথম ছবিতে— রাধু মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে এসেছে গামছা কাঁধে চাকরির খোঁজে; দ্বিতীয় ছবিতে রাধু বসে খবরের কাগজ পড়ছে; তৃতীয়টিতে রাধুর মাথায় গান্ধীটুপি, রাধু কংগ্রেস ভলান্টিয়ার সেজেছে। তিন ছবি মিলিয়ে নাম দিয়েছিলেন— transformation of রাধু। শিল্পের দৃষ্টি তুচ্ছকে তাচ্ছিল্য করে না। সামান্যকে অসামান্য করে দেখতে জানে। নিজের মতো করে যিনি দেখেন, নিজের মতো করে যিনি ভাবেন তিনিই আবার নিজের মতো করে প্রকাশ করতেও পারেন। একান্তভাবে নিজস্বভঙ্গিতে প্রকাশ করার নামই স্টাইল। ভাববার বিষয় এক হতে পারে, এমন-কি, ভাবটা অপরের কাছ থেকে ধার করাও হতে পারে কিন্তু ভাববার ভঙ্গি যাঁর নিজস্ব তাঁর প্রকাশের ভঙ্গিও নিজস্ব। শিল্পে সাহিত্যে পরস্বাপহরণ একটা মস্ত বড় অপরাধ নয় যদি তাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করা যায়। শুধু গলাধঃকরণ করলে চলে না, তাকে মনে মজ্জায় মিশিয়ে নিতে হয়। নারীকে বলপূর্বক হরণ করলে অপরাধ হয়, কিন্তু সে নারীর যদি হৃদয় হরণ করা যায় তা হলে বরমাল্য লাভ হয়। অবনীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গল্প-গ্রন্থ— খাতাঞ্চির খাতা, আলোর ফুলকি, বুড়ো আংলা, হানাবাড়ির কারখানা— বিদেশীগল্পের ছায়ায় রচিত। কিন্তু ঐ ছায়াটুকুই, কায়াটি সম্পূর্ণ নিজের হাতে গড়া। সে-সব কাহিনীকে তিনি বাংলাদেশের মাটি জল হাওয়ার সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়ে নিয়েছেন যে তাদের আর বিদেশী বলে চিনবার জো নেই। পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত তারা সম্পূর্ণরূপ বিস্মৃত হয়েছে। এক সময়ে একটি গল্প লিখেছিলেন, তার বিদেশী কায়াটি পুরোপুরি ঢাকা পড়ে নি, তলায় নিজেই লিখে দিয়েছিলেন— ফরাসী থেকে চুরি।

চার্লস ল্যাম-এর ছিল স্টাইল। তিনি বলতেন— You may derive thoughts from others, but your way of thinking, the mould in which the thoughts are cast, must be your own. Intellect may be imparted, but not each man's intellectual frame. ল্যাম-এর স্টাইল ইংরেজি সাহিত্যে আর হয় নি, অবনীন্দ্রনাথের স্টাইলও বাংলা সাহিত্যে আর হবে না। কারণ সে স্টাইল তাঁর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাস্তবিকপক্ষে কবি শিল্পী যে জীবন যাপন করেন, যে-সব ধ্যান ধারণা তাঁর মনে রঙ ধরিয়েছে, ফুল ফুটিয়েছে সে-সমস্তই মিলে মিশে তাঁর শিল্পরীতি হয়ে দেখা দেয়। ছবির মধ্যে যেমন নানা রঙের মিশ্রণ, অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় তেমনি চলিত অচলিতের মিশ্রণ— এমন কিছু শব্দ, এখন যা ব্যবহারে নেই, অর্থটাও অস্পষ্ট। হঠাৎ করে বলে ওঠেন— 'লবঙ্কা।' নিজেই বলেছেন, "কী সেটা, দেখতে লঙ্কার মতো আর খেতে ঝাল না মিষ্টি তা জানি নে, কিন্তু খুব

চেঁচিয়ে কথাটা বলে খুব মজা পাই।" ল্যাম্-এর রচনাতেও বহু archaic শব্দের প্রয়োগ। তাঁর সমকালীন ভাষার সঙ্গে এলিজাবেথীয় বাক্যচ্ছটা এবং সপ্তদশ শতকীয় পত্তরীতির প্রতিধ্বনি মিশে গিয়ে যেন রামধনুর বর্ণচ্ছটা বিস্তার করেছে। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যভাষারও ঐ বর্ণাঢ্য রূপটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। মজলিসী মানুষ তো— কিছু বৈঠকি ভাব, সাবেকি ঢঙ, পুরোনো দিনের ছড়া, রূপকথার ভাষা— সবটা মিলিয়ে ল্যাম্-এর ভাষার ন্যায় একটু যেন ছিটগ্রস্ত। কিন্তু ছিটগ্রস্ত মানুষের যেমন একটা আকর্ষণ আছে, এ ভাষাও তেমনি এক অদ্ভুত মোহের সঞ্চার করে। এ ছাড়া, অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে যতখানি ছন্দের দোলা বাংলা সাহিত্যে এমন আর কারো গদ্যে নেই। ভাষামাত্রই শব্দ-বাহন, শব্দের মধ্যে সংগীতের ছন্দ লুক্কায়িত থাকে যেজন্যে আমরা বলি শব্দতরঙ্গ। আবার বাক্যের গতির মধ্যে নৃত্যের ছন্দও বর্তমান। যিনি ভাষা-শিল্পী তিনি এই দুই ছন্দেরই যথোচিত ব্যবহার জানেন। অবনীন্দ্রনাথ ভাষায় ঐ স্বচ্ছন্দতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সজ্ঞান। প্রত্যক্ষ নমুনা দেখুন, ছেলেবেলাকার বর্ষাদিনের স্মৃতিচারণ— "সারারাত সাতদিন ঝমাঝম। মটর ভাজি কড়াই ভাজি ভিজে ছাতি। যেদিকে চাও ভিজে শাড়ি ভিজে কাপড় পরদা টেনে হাওয়ায় দুলছে, তারই তলায় তলায় খেলে বেড়ানো সারাদিন, সন্ধ্যে থেকে কোলা ব্যাঙে বাদ্যি বাজায়, রাজ্যের মশা ঘরে সেঁধোয় টাকাংদিং টাকাংদিং মশারি ঘিরে। দাসী চাকর সরকার বরকার সবার মাথায় চড়ে গোলপাতার ছাতা।... ছেলে বুড়ো মিলে গান গল্প, বাবু ভায়ে মিলে খোস গল্প— আর কত কি মজা, আঠারো ভাজা জিবে গজা। গুড়গুড়ি ফরসি দাদুরীর বোল ধরত গুড়ুক ভুড়ুক।"

অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের কথা ভাবতে গেলে শেষের কবিতায় অমিট রায়ের মুখের সেই উক্তিটি আমার মনে পড়ে— শিবের ছিল স্টাইল, একেবারে ওরিজিন্যাল। সত্যি সত্যি শিবের মূর্তিটি একবার ভেবে দেখুন— মাথাভর্তি জটাজুট, লটপট বাঘছাল, তার ববম্ ববম্ বাজে গাল— সমস্তটা মিলিয়ে শিব একাধারে যে বিস্ময় এবং কৌতুকের উদ্রেক করেন সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের স্টাইল— সাধু অসাধু, চলিত অচলিত শব্দের মিশ্রণে, অভিনেতা-সুলভ বাচনভঙ্গিতে এবং অদ্ভুত ধরনের ধ্বনি-মুখর শব্দ প্রয়োগে সেই কৌতুক-মিশ্রিত বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

অবনীন্দ্রনাথ বড়দের জন্যে সামান্যই লিখেছেন। তবে এ কথাও সত্য যে তাঁর শিশু বা কিশোর -সাহিত্য একান্তভাবে বেবী-ফুড নয়। Alice in Wonderland যেমন সর্বজনীন আনন্দের ভোজ, অবনীন্দ্রনাথের শিশুরঞ্জনী গ্রন্থাবলীও বয়স নির্বিশেষে সর্বজনের উপভোগের সামগ্রী। বড়দের কথা ভেবেছেন জীবনের শেষার্ধে। এক সময়ে ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে কিছুদিন গঙ্গাবক্ষে ষ্টীমারে ভ্রমণ করেছেন। ষ্টীমারের ডেলি প্যাসেঞ্জারদের অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। 'পথে বিপথে'র গল্পে এঁদের কেউ কেউ বিভিন্ন চরিত্রে দেখা দিয়েছেন। সেই ষ্টীমার-ভ্রমণের কৌতুকাবহ বর্ণনা আছে 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র স্মৃতিচারণে। 'ঘরোয়া' এবং 'জোড়াসাঁকোর ধারে' দুই যমজ গ্রন্থ। এ দু-এর তুলনা নেই। এ তাঁর আপন কথা, আপনজনের কথা, সর্বোপরি তাঁর সারাজীবনের 'হিয়েরো' রবিকার কথা। পারিবারিক কাহিনী কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে এক যুগের বিস্মৃতপ্রায় বাঙালী সমাজের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। এ দিক থেকে চারুচন্দ্র দত্তের "পুরানো কথা'কে বলা যেতে পারে এ দুই গ্রন্থের জ্ঞাতি-ভ্রাতা। এ ছাড়া বড়দের জন্যে যা লিখেছেন তা প্রধানত শিল্পসম্পর্কিত আলোচনা।

বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা আমাদের শিল্পালোচনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

এত কথার পরেও যে কথাটি বলতে বাকি থাকে সেটি হল সৃজনীপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্রষ্টা নিজে। রবীন্দ্রনাথের জীবনই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য; তেমনি অবনীন্দ্রনাথ যে জীবন যাপন করেছেন সেটিই তাঁর শিল্প-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্ব

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

"... আত্মার মধ্যে যেখানে নিখিলের সমস্তই দর্পণের মতো প্রতিবিম্বিত দেখা যাচ্ছে, সমস্তই দিব্য দৃষ্টিতে পরশ ও পরখ করে নিলে মানুষ।... তারপর এলো দেখানোর পালা।... যে এতদিন দর্শক ছিল সে হল প্রদর্শক, দ্রষ্টা হয়ে বসলো দ্বিতীয় স্রষ্টা।"

—অবনীন্দ্রনাথ, "দৃষ্টি ও সৃষ্টি", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী' (১৩৬৯), পৃ. ৪৪

১

আমাদের বর্তমান আলোচনা শিল্পী বা সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে নয়, শিল্পশাস্ত্রজ্ঞ অবনীন্দ্রনাথকে নিয়েও নয়। শিল্প-আলোচনার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের যে অসামান্য রসগ্রাহিতার পরিচয় সমুজ্জ্বল, এখানে তা-ও আমাদের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য শিল্পতত্ত্ব ; আমাদের লক্ষ্য শিল্প-আলোচনার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বদর্শিতা ও মননশীলতা।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-বিষয়ক রচনাসমূহে রসগ্রাহিতা ও মননশীলতা এমন ভাবে এক হয়ে আছে যে, তার একটির থেকে অপরটিকে পৃথক্ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। শুধু দুঃসাধ্য নয়, সাধারণ ভাবে দেখলে তা অনাবশ্যকও বটে। কিন্তু সব সময় অনাবশ্যক নয়, ক্ষেত্রবিশেষে তারও প্রয়োজন আছে।

রসগ্রাহিতা এবং তত্ত্বদর্শন কিছু ভিন্ন বস্তু, এবং অবনীন্দ্রনাথের রচনায় প্রথমটির প্রবলতা অধিকাংশ সময়ই দ্বিতীয়টিকে কিছু পরিমাণে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যিনি অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বমীমাংসার পরিচ্ছন্ন রূপটি দেখতে ইচ্ছুক, তাঁর পক্ষে অবনীন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তি ও রসগ্রাহিতার আকর্ষণ থেকে অন্তত সাময়িক ভাবে স্বেচ্ছায় নিজেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বর্তমান প্রবন্ধের মূল বিষয় অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বমীমাংসা। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তার তত্ত্বগত কাঠামোটাই এখানে আমাদের লক্ষ্য। যিনি অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-আলোচনার সামগ্রিক পরিচয় পেতে চান, তাঁকে অবনীন্দ্রনাথের মূল রচনারই দ্বারস্থ হতে হবে। এ প্রবন্ধ সেই মূল রচনার বিকল্প নয়। সে বিকল্প নেই এবং হয় না।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-বিষয়ক আলোচনার একটা প্রধান অংশ শিল্পশাস্ত্রের পরিচয় এবং তৎসম্পর্কিত বিচার-বিশ্লেষণ। আগেই বলেছি, এ দিকটাও আমাদের বিবেচনার বাইরে। শিল্পশাস্ত্র আর শিল্পতত্ত্ব আমাদের দেশে খুব আলাদা ভাবে গড়ে ওঠে নি বটে, কিন্তু তা হলেও বিষয় দুটো যে সম্পূর্ণ আলাদা এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। শিল্পশাস্ত্র ব্যাবহারিক, ঐতিহ্য-আশ্রয়ী এবং গুরুমুখী বিদ্যা। শিল্পতত্ত্ব তা নয়। শিল্পশাস্ত্র মূলত শিল্পবিশেষের বিষয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যজ্ঞান, এবং শিল্পবিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মকানুন, পদ্ধতি-প্রকরণ। কার্যত অনেক ক্ষেত্রেই তা ঐতিহ্যবাহী অনুশাসনপুঞ্জ। শিল্পতত্ত্ব গড়ে ওঠে মৌলিক শিল্পচিন্তাকে অবলম্বন করে। তার পথ উপলব্ধি ও মননের পথ।

অবনীন্দ্রনাথ নিজে শিল্পশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেও, শাস্ত্রবিধানের উপযোগিতা এবং অনুপযোগিতা দুয়ের সম্পর্কেই তিনি সচেতন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, শিল্পীর কাছে শাস্ত্রের বচন কখনোই অলঙ্ঘনীয় নয়। কথাটা তাঁর ভাষাতেই বলি। তিনি বলেছেন, "এটা মনে রাখা চাই যে আগে শিল্পী ও তাহার সৃষ্টি, পরে শিল্পশাস্ত্র ও শাস্ত্রকার— শাস্ত্রের জন্য শিল্প নয়, শিল্পের জন্য শাস্ত্র। আগে মূর্তি রচিত হয়, পরে মূর্তি-লক্ষণ, মূর্তিবিচার, মূর্তিনির্মাণের মান-পরিমাণ নির্দিষ্ট ও শাস্ত্রাকারে নিবদ্ধ হয়।" [১]

শিল্পতত্ত্বও শিল্পরচনার পূর্বগামী নয়। আগে শিল্প, তার পর শিল্পজিজ্ঞাসা। কিন্তু তার স্বভাবটা তথ্যমুখী বা প্রয়োগমুখী নয়। শিল্পতত্ত্ব হল শিল্পরহস্যের সমাধানচেষ্টা। সাধারণভাবে বলতে পারি, শিল্পের দর্শন। শিল্পবিশেষের, অথবা শিল্পমাত্রেরই। শিল্পসমালোচনার সূত্রসমূহ, সেই-সব সূত্রের ভিত্তি-স্থানীয় মৌল প্রত্যয়সমূহ এবং সেই-সব প্রত্যয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও সামগ্রিক ঐক্য— এই হল শিল্পতত্ত্বের মোটামুটি বিষয়-পরিধি।

যিনি যুগপৎ রসিক এবং তত্ত্বদর্শী, শিল্পতত্ত্বের রাজ্যে একমাত্র তারই অবাধ সঞ্চরণের অধিকার। রসগ্রাহিতা এ-রাজ্যের প্রবেশপত্র। কিন্তু সেইটেই সব নয়। যদৃচ্ছ পরিক্রমণের পাথেয় হল মননশীলতা। অবনীন্দ্রনাথের প্রবেশপত্র নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা নেই। আমাদের কৌতূহল অবনীন্দ্রনাথের পরিক্রমণের ফলাফল নিয়ে।

২

শিল্প নিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। সব জিজ্ঞাসাই অবশ্য শেষ পর্যন্ত শিল্পের সেই একই অতলস্পর্শ রহস্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে, কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, সবরকম জিজ্ঞাসাই আমাদের সমান গভীরে নিয়ে যেতে পারে না। কোনো কোনো প্রশ্ন উপরকার ফুল-পল্লব নিয়ে, শাখা-বিস্তার পত্র-বিন্যাস নিয়ে, আবার কোনো কোনো প্রশ্ন একেবারে গোড়া-ঘেঁষা। সেই গোড়া-ঘেঁষা প্রশ্নসমূহের সামগ্রিকতার দিকে দৃষ্টি রেখেই সাধারণত শিল্পতত্ত্বের কাঠামো রচিত হয়ে থাকে।

শিল্পব্যাপার মানুষের জীবনকে, তার উপলব্ধি ও চিন্তাকে যে-সব দিক থেকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে, শিল্পকে আমরা সেই-সব বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারি, এবং সাধারণত দেখে থাকি। যেমন, রচয়িতার দিক, রসিক ভোক্তার দিক, সমাজের দিক— শিল্পের সামাজিক ভূমিকার দিক। এ ছাড়া শিল্পবস্তুর স্বকীয় একটা দিকও আছে। শিল্পবস্তু যখন নিজগুণেই আদরণীয়, রচয়িতার আনন্দ, ভোক্তার আনন্দ, সমাজের লাভক্ষতি সবই যখন তাকে ঘিরে, তখন তার নিজস্ব দিকের গুরুত্বও অবহেলা করা যায় না। একে বলতে পারি, শিল্পবস্তুর স্বকীয় বিশিষ্টতার দিক, শিল্পের স্বরূপলক্ষণের দিক।

এর যে-কোনো এক বা একাধিক দিক থেকে আমরা শিল্পরহস্যের কেন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হতে পারি। মৌল দৃষ্টিকোণ খুব বেশিসংখ্যক নয়, সেই কারণে শিল্পতত্ত্বের মৌল প্রশ্নও সংখ্যায় খুব বেশি নয়।

প্রথমত, শিল্পস্বরূপের প্রশ্ন— শিল্প কী, তার সংজ্ঞা কী, শিল্পবস্তু কোন্ গুণে শিল্পবস্তু, অপরাপর বস্তু থেকে কোথায় তার স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি প্রশ্ন। সংজ্ঞা-নিরূপণ স্বরূপলক্ষণ-নির্ধারণ ইত্যাদি আলোচনা সব

---

১ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতশিল্পে মূর্তি', বিশ্বভারতী, ১৩৫৪, ভূমিকা।

সময়ই দর্শনের নিজস্ব এলাকার আলোচনা। এ আলোচনায় দার্শনিকের যত আনন্দ, অপরের তত নয়। পুরাতনপন্থী অধিবিদ্যা-ঘেঁষা নন্দনতত্ত্বের এইটেই হল একেবারে কেন্দ্রস্থ বিষয়।

দ্বিতীয়ত, রচয়িতার দিককার প্রশ্ন— স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব, সৃষ্টিশক্তি এবং সৃজনক্রিয়া সংক্রান্ত প্রশ্ন। শিল্পীর শিল্পদৃষ্টি, প্রেরণা, কল্পনা, তাঁর অনুভূতির বিশেষত্ব— তীব্রতা গভীরতা ব্যাপকতা, এ-সব প্রশ্নও মোটামুটি এই গোত্রেই পড়ে। শিল্পতত্ত্বের এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে শিল্পীর ব্যক্তিগত সাক্ষ্যের মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। এক-শিল্পীর সাক্ষ্য অন্য-শিল্পীর ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য, সৃজনের ভূমি থেকে সরে এলে— সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালে অর্থাৎ সাংসারিক বা ব্যাবহারিক ভূমিতে ব্যক্তিসত্তায় অধিষ্ঠিত হলে শিল্পীর সাক্ষ্য কতটা নির্ভরযোগ্য থাকে, এ-সব তর্ক অবশ্যই উঠতে পারে। কল্পনা, ব্যক্তিত্ব, প্রেরণা ইত্যাদি প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত রায় দেবার অধিকারটা যে কার, শিল্পীর, না জীবনীকারের, না মনোবিজ্ঞানীর, না দেহক্রিয়াতত্ত্বজ্ঞের— নাকি দার্শনিকেরই, এ নিয়ে প্রচুর মতভেদের অবকাশ আছে। অধিকার যারই হোক, দিকটা যে মূলত শিল্পীরই দিক তাতে সন্দেহ নেই।

তৃতীয় হল ভোক্তা-সংক্রান্ত প্রশ্ন— রসগ্রাহী পাঠক-দর্শক-শ্রোতা, যাঁদের বলা হয়েছে সহৃদয় সামাজিক, তাঁদের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে প্রশ্ন। অর্থাৎ রসাস্বাদন নিয়ে প্রশ্ন। সোজাসুজি বলতে পারি, রস নিয়ে প্রশ্ন। রসিকের সাক্ষ্যই হয়তো এখানে শেষ কথা। কিন্তু কে যে রসিক, কে যে নয়, তার কোনো মীমাংসা নেই। তা ছাড়া, এ হেন জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে হলে যে তথ্যনিষ্ঠা, বিশ্লেষণশক্তি এবং বিচারবুদ্ধি থাকা দরকার, যে নিপুণ প্রকাশক্ষমতার দরকার সব রসিকের তা না-ও থাকতে পারে। রায় দেবার অধিকার নিয়ে এখানেও প্রচুর মতভেদ। আধুনিককালে এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে মনোবিজ্ঞানের— বিশেষত পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান, সংখ্যাভিত্তিক মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি শাস্ত্রের উত্তরোত্তর প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

আর-এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল সমাজের দিকের প্রশ্ন— শিল্পের সঙ্গে জীবনের যোগাযোগের প্রশ্ন, সমাজ এবং শিল্পী এদের পারস্পরিক নেওয়া-দেওয়ার প্রশ্ন, শিল্পের সামাজিক ভূমিকার প্রশ্ন। ইতিহাসের সর্পিল গতির সঙ্গে মিল রেখে এ প্রশ্নের গুরুত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। স্থূল ভাবে বলা যায়, ধর্মপ্রচারক, নীতিবেত্তা, রাজনৈতিক কর্মী, সমাজবিজ্ঞানী— শিল্পতত্ত্বের এই দিকটাতে এঁদেরই সমধিক আগ্রহ। শিল্পী নিজে এই ক্ষেত্রটাতে সাধারণত বড়ই স্পর্শকাতর। মীমাংসার অধিকার এখানেও অনির্ণীত।

প্রশ্নগুলি আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র হলেও, প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের নিঃসম্পর্কিত নয়। যে-কোনো শিল্প-তাত্ত্বিক মতবাদে এই-সব বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সমাধান পরস্পরের সঙ্গে সংগতিরক্ষা করবে এইটেই প্রত্যাশিত। এদের সংগতিপূর্ণ সামগ্রিকতাই মতবাদবিশেষকে পূর্ণাঙ্গ সিস্টেমের মর্যাদা দেয়।

সিস্টেম-নির্মাণে দার্শনিকেরাই পারদর্শী। সেই কারণে, কম-বেশি হলেও, উক্ত চার শ্রেণীর প্রশ্নের প্রত্যেকটিতেই তাঁর আগ্রহ আছে। কিন্তু শিল্পী যখন শিল্প-আলোচক হন, তখন তাঁর আগ্রহ স্বভাবতই পক্ষপাতধর্মী। শিল্পীরা সাধারণত সেই পথ ধরেই আলোচনায় অগ্রসর হন, যে-পথ তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত। তাঁদের দৃষ্টি প্রধানত সৃষ্টি-কেন্দ্রিক। সৃজনক্রিয়া— এবং সেই সূত্রে শিল্পীর মনের রহস্য, অর্থাৎ শিল্পী নিজে— এই হল তাঁদের মুখ্য বিষয়। আর সবই গৌণ।

তবে, ভোক্তার প্রশ্নকেও তাঁরা একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তার কারণ শিল্পী নিজেও

অনেক সময় ভোক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন— নিজের রচনার ক্ষেত্রেও, অন্য শিল্পীর রচনার ক্ষেত্রেও। সমাজ সংক্রান্ত প্রশ্নও একেবারে উপেক্ষিত থাকতে পারে না। পারার উপায়ও নেই। কারণ শিল্পীও সামাজিক জীব। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সমাজের সঙ্গে বোঝাপড়া তাঁকে করতেই হবে।

শিল্পীর শিল্পতত্ত্ব-আলোচনায় দুটি অনাগ্রহ সুস্পষ্ট। এক, শিল্পের সংজ্ঞা-নিরূপণে— শিল্পের স্বরূপ নিয়ে কূট তর্কে। দ্বিতীয়, সিস্‌টেম-নির্মাণে। অনেক সময় তৃতীয় একটি অনাগ্রহও নজরে পড়ে। তাকে অনাগ্রহ বলব কি অক্ষমতা বলব জানি না। সে হল বিভিন্ন সমাধান সূত্রগুলির মধ্যে সংগতিরক্ষায় অনাগ্রহ। এই শেষেরটিকে ত্রুটি বলে গণ্য করতে পারি, প্রথম দুটিকে তা পারি না। যাঁর যা দেবার তাঁর কাছে তার বেশি প্রত্যাশা করা অসংগত।

অবনীন্দ্রনাথকে সিস্‌টেম-নির্মাতা দার্শনিক বা শিল্পতাত্ত্বিক বললে যাথার্থ্যের হানি ঘটবে, অবনীন্দ্রনাথেরও গৌরববৃদ্ধি হবে না। তাঁর শিল্প-আলোচনা শিল্পীরই শিল্প-আলোচনা, দার্শনিকের নয়। কিন্তু মাত্র এইটুকু বলেই যদি থেমে যাই, তা হলে বিপরীত দিক থেকে যাথার্থ্যের সমানই হানি ঘটবে। তাঁর সমাধান-সূত্রগুলি কখনোই উল্লেখযোগ্য রকমের সংগতিভঙ্গ করে নি। শিল্পের স্বরূপ সংক্রান্ত প্রশ্নেও অবনীন্দ্রনাথ একেবারে নীরব নন। বস্তুত, কোনো শ্রেণীর প্রশ্নকেই তিনি সম্পূর্ণ পরিহার করেন নি। এই কারণে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্ব-আলোচনায় একটা সমগ্রতার ভাবও লক্ষ্য করা যায়। তা কতখানি পূর্ণাঙ্গ, তাকে সিস্‌টেম বলে অভিহিত করা যায় কি না, তার সঙ্গে অপরাপর ক্ষেত্রের তত্ত্বসিদ্ধান্তের কোনো সংগতিপূর্ণ ঐক্য গড়ে উঠেছে কি না, এ-সব নিয়ে তর্ক থাকতে পারে। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, একালের খুব কম ভারতীয় লেখকের রচনাতেই এতখানি স্বকীয়তা এবং এতখানি পূর্ণাঙ্গতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

শিল্প-আলোচনায় অবনীন্দ্রনাথের কাছের লক্ষ্য চিত্রশিল্প। কিন্তু তাঁর তত্ত্বগত সিদ্ধান্তগুলির মর্মকথা সব শিল্পকেই অল্প-বিস্তর স্পর্শ করে। চিত্রশিল্পের বিশিষ্টতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাদের অনায়াসে আমরা অবনীন্দ্রনাথের সাধারণ শিল্পসিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করতে পারি। এই সাধারণ শিল্পসিদ্ধান্তগুলির সামগ্রিক পরিচয়েই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বের পরিচয়।

৩

অবনীন্দ্রনাথ কখনো শিল্পের সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেন নি। শিল্প কী, এ-প্রশ্নে কোনো সরাসরি জবাব তাঁর কোনো রচনায় পাওয়া যাবে না। এই ধরনের তর্ককে তিনি বৃথা বাগ্‌বিস্তার বলেই মনে করেন। শান্তিনিকেতনের এক ভাষণে (১৯২৩) তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে, আর্ট কী এই নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে যে প্রবল মুখরতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা ওদেশের শিল্পচর্চার রসহীনতারই প্রমাণ দেয়।[১]

তা সত্ত্বেও প্রশ্নটিকে অবনীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারেন নি। বিভিন্ন মতামতের উল্লেখ ও

---

১ Gurdial Mallik, "Abanindranath at Santiniketan", *The Visva-Bharati Quarterly, Abanindra Number,* 1942, p. 85

আলোচনার ক্ষেত্রে— মতবাদ বিশেষের প্রতিবাদের প্রসঙ্গে— এ-বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের নিজের মতামতও বেশ স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

শিল্পের স্বরূপ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের মতামত কোনো বিশেষ এক জায়গায় গ্রথিতভাবে পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের মধ্যে তা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। সেই কারণে, যে-সব মতামত অবনীন্দ্রনাথের মনে প্রতিবাদ জাগিয়ে তুলেছে, অথবা তাঁর শিল্প-সিদ্ধান্তের উপলক্ষ হিসেবে কাজ করেছে, তাদের বিষয় একটু সন্ধান নেবার প্রয়োজন আছে।

প্রথমেই যে মতবাদটির কথা উঠবে, তা সকলেরই সুপরিচিত। তাকে বলতে পারি ক্লাসিক মতবাদ অথবা যা ক্লাসিক মতবাদের গোড়ার কথা— অনুকরণবাদ। শিল্প জিনিসটা বাস্তবের অনুকরণ, জীবনের অনুকরণ, অথবা বলতে পারি, জগৎ ও জীবনের রূপায়ণ, এই হল এ মতবাদের মূল বক্তব্য।

সহজেই বোঝা যায় যে, অবনীন্দ্রনাথের মতো কোনো সৃজনশীল শিল্পী— তাই বা কেন, শিল্পীর সৃজনধর্মিতায় বিশ্বাসী কোনো রসগ্রাহী মনই শিল্পকর্মকে নকলনবিশী বলে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবে না। শিল্প জিনিসটা নকল এ কথা অবনীন্দ্রনাথ কখনোই স্বীকার করেন না।

কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই চুকে যায় না। শিল্প-প্রসঙ্গে অনুকরণ কথাটির অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। বিভিন্ন শিল্পতাত্ত্বিক কথাটিকে ঈষৎ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। কথাটার একটা প্রচলিত অর্থও অবশ্য আছে। সেই অর্থে গ্রহণ করেই অবনীন্দ্রনাথ অনুকরণ ব্যাপারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু এ প্রতিবাদ ক্লাসিক অনুকরণবাদকে— বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের অনুকরণবাদকে কতখানি স্পর্শ করে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সেই কারণে ক্লাসিক শিল্পতত্ত্বে অনুকরণ কথাটির সঠিক অর্থ কী, তা একটু বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে।

শিল্প কী, এ প্রশ্নের যে জবাব প্লেটো বা অ্যারিস্টটল দিয়ে গিয়েছেন, তা নিয়ে অদ্যাবধি বিতর্কের অবসান হয় নি। শিল্পকর্ম কোন্ জাতের কর্ম— শিল্পবস্তু কোন্ জাতের বস্তু, তার বিশিষ্টতা কোথায়, প্লেটো-অ্যারিস্টটলের সামনে এইটেই ছিল মূল প্রশ্ন।

তাঁদের উত্তরটা আপাতদৃষ্টিতে খুবই স্পষ্ট। বস্তুজগতে যা-কিছু আছে, তা হয় স্বভাবের সৃষ্টি, না-হয় কারো-না-কারো নির্মাণ। শিল্পবস্তু স্বভাবের সৃষ্টি নয়, নির্মিত বস্তু। এই নির্মাণ যে-কোনো রকমের নির্মাণ নয়, নিজের বাইরে এর একটা আদর্শ আছে, যাকে এ রূপ দিতে চেষ্টা করে। সেই আদর্শ হল স্বভাব বা প্রকৃতি— বিশ্বজগৎ। অথবা বলতে পারি, জীবন। আদর্শটা নির্মিত বস্তুর নিজের বাইরে বলেই এই নির্মাণকে অনুকরণ বলা যায়। শিল্পবস্তু তার আদর্শের অনুকরণ, অর্থাৎ কিনা স্বভাবের অনুকরণ— জগৎ ও জীবনের অনুকরণ। অ্যারিস্টটলের মতে এমন অনুকরণ যা মূল্যবান এবং আনন্দদায়ক।

প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল অনুকরণ বলতে ঠিক এক জিনিস বোঝেন নি। প্লেটোর অনুকরণ প্রচলিত অর্থে অনুকরণ, অর্থাৎ নকল। অ্যারিস্টটলের তা নয়। প্লেটো বলেন, শিল্পের অনুকরণ অপরাধজনক, শিল্পের আনন্দ ক্ষতিকারক এবং সেই কারণে শিল্প-ব্যাপারটাই পরিহারযোগ্য। অ্যারিস্টটল এর কোনোটাই মানেন না। যেহেতু পরবর্তী ক্লাসিক শিল্পতত্ত্বের ধারা, কয়েকটি ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে, প্রধানত অ্যারিস্টটলকে অনুকরণ করেই অগ্রসর হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে বিকৃতি ঘটলেও

অ্যারিস্টটলের নামেই তা ঘটেছে, সেই হেতু অনুকরণবাদ বলতে সাধারণত অ্যারিস্টটলীয় ধারাকেই উদ্দেশ করা হয়ে থাকে, এবং আমরাও এখানে তা-ই করব।

অ্যারিস্টটলের মতে প্রত্যেক শিল্পের উপাদান-উপকরণ ভিন্ন, অনুকরণের রীতি-নীতি ভিন্ন। সেই কারণে একই আদর্শের অনুকরণ কবিতায় ছবিতে গানে— শিল্পে শিল্পে ভিন্ন রূপ নেয়। আর্ট যদি জীবনের হুবহু অনুকরণ হত তা হলে সবই একরকম হত।

আরো-একটা কথা আছে। স্বভাবের প্রত্যেকটা বস্তুই বিশিষ্ট বস্তু, জীবনের প্রত্যেকটা ঘটনাই বিশিষ্ট ঘটনা, সংসারের প্রত্যেকটা মানুষই বিশিষ্ট মানুষ। আর্ট বিশিষ্টের অনুকরণ নয়, বিশিষ্টের আড়ালে যে সাধারণ লুকিয়ে আছে, আর্ট তার অনুকরণ। এই অর্থে আর্ট জীবনের ব্যক্ত-তথ্যের অনুকরণ নয়, নিহিত সত্যের অনুকরণ। যাকে হুবহু নকল বলতে পারি, তা সব সময়ই বিশিষ্টের নকল, যেমন ইতিহাস। আর্ট সর্বজনীন বা সার্বভৌমের অনুকরণ বলেই তা হুবহু নকল হতে পারে না।

অ্যারিস্টটল মনে করেন, ইতিহাসের মতো আর্টের সত্যও জীবনেরই সত্য। কিন্তু ইতিহাসের সত্যের থেকে আর্টের সত্য উচ্চতর বা গভীরতর। আর্টে জীবনের সেই সত্য আছে, যা বিশিষ্ট বস্তু-নিচয়ের ভিড়ে, বিশিষ্ট তথ্যপুঞ্জের বিশৃঙ্খল জনতায় সাধারণত দুর্লক্ষ্য। আর্ট রূপতাৎপর্যহীন এলোমেলো বাস্তবিকের অনুকরণ নয়, সুবিন্যস্ত এবং নির্দিষ্ট রূপ-তাৎপর্যে-বিধৃত সম্ভাব্যতার অনুকরণ। জীবনের বাহ্য রূপের অনুকরণ নয়, জীবনের অন্তর্নিহিত রূপ-তাৎপর্য ও সত্যের অনুকরণ।

অনুকরণ বলতে সাধারণত আমরা বাহ্য রূপের অনুকরণই বুঝে থাকি। পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটলীয় মতের বিকৃতি যে-অনুকরণবাদের জন্ম দিয়েছে, তা অনেক সময় এই অনুকরণকেই সমর্থন করেছে। অবনীন্দ্রনাথ এই অনুকরণকেই বার বার তিরস্কৃত করেছেন। এ-তিরস্কারে অ্যারিস্টটলও অনায়াসে কণ্ঠ মেলাতে পারতেন। কিন্তু জীবনের নিহিত সত্যের যে-রূপায়ণকে অ্যারিস্টটল অনুকরণ বলেছেন, অবনীন্দ্রনাথ কি সেই সত্যকেও অস্বীকার করেছেন? অ্যারিস্টটলের দ্বারা গৃহীত ঈষৎ পারিভাষিক অর্থে যে-অনুকরণ, অবনীন্দ্রনাথ কি তারও বিরোধী? এমন কথা জোর দিয়ে বললে ভুল হবে।

অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন, বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি এই-যে বিশ্বচরাচর, এর একটা অন্তর্নিহিত রস-রূপ আছে। শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিতে এই রস-রূপ প্রত্যক্ষ হয়। এই রস-রূপই আর্টের আদর্শ। এই আদর্শটা যখন আর্টের নিজের মধ্যে নয়, বাইরে— বিশ্বসংসারে, তখন একে অ্যারিস্টটলের পরিভাষায় অনুকরণ বললে খুব দোষ হয় কি?

কথাটা আর-একটু খুলে বলা দরকার। প্রাচীন ঋষিরা বিশ্বজগৎকে বলেছেন, দেবতার কাব্য। সেই ঋষিবাক্য অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথের মতো অবনীন্দ্রনাথও জগৎকে বলেছেন, দেব-শিল্প। অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন, এই দেব-শিল্পের সঙ্গে মানব-শিল্পের সম্পর্ক অতি নিবিড়। এই দেব-শিল্পই মানব-শিল্পীর শিল্প-রচনার সাক্ষাৎ উদ্‌বেজনা। এই দেব-শিল্পের অন্তর্নিহিত রস-রূপই মানব-শিল্পের সাক্ষাৎ আদর্শ। এই রস-রূপের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই শিল্পের সিদ্ধি এবং এইখানেই তার শিল্প-সার্থকতার চরম মানদণ্ড।

শিল্পসাধনার প্রথম ধাপে ইন্দ্রিয়মনের সাধনা, বিশ্বজগতের রূপ-রসকে উপলব্ধি করার সাধনা, তাকে আত্মস্থ করার সাধনা। তারপর তার প্রকাশ। বিশ্বজগতের রূপ-রসই মানুষের আত্মগত হয়ে মানুষের

নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ পায়। কথাটা অবনীন্দ্রনাথের মুখেই শোনা যাক।—

> "...ভাবুক ও শিল্পী সেই সাধনার বলে শক্তিমান যে সাধনা প্রাণের সঙ্গে বাক্যকে, চক্ষুর সঙ্গে মনকে, শ্রোত্রের সঙ্গে আত্মাকে যুক্ত করে। এই-যে নতুন, দর্শন-শ্রবণ-কথনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হল, মানুষের আত্মগত ও বিশ্বের অন্তর্নিহিত রসাত্মরচনা: কবিতা, ছবি, গান, সেই-সমস্তকেই বলা চলে দেব-শিল্প অনুসারে রচিত শিল্প-রচনা।"[১]

—সোজা কথায়, শিল্প হল 'মানুষের আত্মগত ও বিশ্বের অন্তর্নিহিত রসাত্ম-রচনা' এবং তা দেব-শিল্পের অর্থাৎ বিশ্বজগতের 'অনুসারে রচিত শিল্প-রচনা'।

মানব-শিল্প দেব-শিল্পের অনুসরণ করে, অবনীন্দ্রনাথের এই কথা, আর শিল্প স্বভাবের অনুকরণ—জগৎ ও জীবনের অনুকরণ, অ্যারিস্টটলের এই কথা, এ দু'য়ের মধ্যে মর্মগত তফাত কতটুকু তা ভেবে দেখবার মতো।

অবনীন্দ্রনাথ বলেন, শিল্পীর দৃষ্টি হল ভাবুকের দৃষ্টি, তা কাজের দৃষ্টি নয়, বিলাসীর দৃষ্টিও নয়। কাজের দৃষ্টি, বিলাসীর দৃষ্টি দুই-ই স্বার্থের দৃষ্টি। সে-দৃষ্টি—

> "স্বার্থের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থেকে সৃষ্টির যথার্থ শোভা সৌন্দর্য ও রসের বিষয়ে মানুষটাকে বাস্তবিকই অন্ধ করে রাখে অনেকখানি।[২]

শিল্পীর কাজ জগৎকে সত্য করে দেখা—

> "বিশ্বজগৎ একটা নিত্য উৎসবের মধ্যে দিয়ে নতুন-নতুন রসের সরঞ্জাম নিয়ে ভাবুকের কাছে দেখা দেয় এবং সেই দেখা ধরা থাকে ভাবুকের রেখার টানে লেখার ছাঁদে বর্ণে ও বর্ণনে।"[৩]

অবনীন্দ্রনাথ মানবমনের দুই বিপরীতমুখী গতির কথা এবং সেই অনুসারে মানবশিল্পের দ্বিমুখী ধারার কথা বলেছেন। একটা হল শিল্পের বহির্মুখী গতি, অন্যটা শিল্পের অন্তর্মুখী গতি। এই দুই গতি ধরে শিল্পে দুটো আলাদা ধারা এবং আলাদা রীতির সৃষ্টি হয়েছে। একটা বস্তুপ্রধান রীতি, অপরটা ভাব-প্রধান রীতি। বস্তুপ্রধান রীতিতে বাইরের রূপের প্রাধান্য। ভাবপ্রধান রীতিতে অন্তর্নিহিত রসের প্রাধান্য। প্রথমটাতে নিছক আকৃতিগত সাদৃশ্য— যান্ত্রিক যথাযথতা মূল্য পেয়েছে। দ্বিতীয়টার ঝোঁক অন্তঃপ্রকৃতির সাদৃশ্যের উপর।[৪]

বলা বাহুল্য, অবনীন্দ্রনাথের পক্ষপাত দ্বিতীয় ধারার প্রতি। তিনি বলেছেন—

> "শিল্পের ইতিহাস চর্চা করলে দেখি মানবশিল্পের যে দিকটা রসের রূপের সঙ্গে মেলাতে চলল, সেটা আকৃতিগত সাদৃশ্য মানতে বাধ্য না হয়ে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে ফুটে উঠবার সুযোগ পেলে।"[৫]

কিন্তু এ-দিকটাও বাস্তব-ছাড়া নয়। বাস্তবকে বাদ দিয়ে শিল্প হয় না।—

---

১ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিল্পায়ণ', সিগনেট, ১৩৬১, পৃ ২১

২ "দৃষ্টি ও সৃষ্টি", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', রূপা, ১৩৬৯, পৃ ৩৪

৩ তদেব, পৃ ৪১

৪ 'শিল্পায়ণ', পৃ ৩৯

৫ তদেব।

"কল্পনা ছাড়া বাস্তব, বাস্তব ছাড়া কল্পনা, কোনো আর্টিস্টের কাজে দেখা যায় না।"[১]

যাকে কল্পনা বলি, তারও শেষ আশ্রয় দৃষ্ট-রূপ, অর্থাৎ বাস্তব।—

"...যা কিছু মানস-কল্পনা মানুষের তা দৃষ্টরূপের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিষ্ঠোতে পারে না। গরুড়ের কল্পনা খানিকটা দেখা-পাখির পাখা নিয়ে, ঠোঁট নিয়ে তবে প্রকাশ পেল; ... সব কল্পনাই মানুষের দৃষ্টরূপের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে তবে বর্তালো শিল্পে।"[২]

পুনশ্চ—

"বাস্তব রূপের স্পর্শশূন্য নিছক রূপ একটা খুঁজি, কিন্তু কোথায় সেটা? হিজিবিজি? তাও দেখি পাখির বাসায়, চুলের ঘোরপ্যাচে, মেঘের প্রলেপে পাই। সত্যপীরের মাটির ঘোড়া দেখা-ঘোড়ার আকারের প্রকারটুকু ধরে' আছে।"[৩]

অনুমান করতে পারি, আজকের দিনে অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট শিল্প সম্পর্কেও অবনীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যই করবেন। বলবেন, যত নির্বস্তুকই হোক, তা-ও সম্পূর্ণভাবে বাস্তব রূপের স্পর্শশূন্য নয়।

দেখা-রূপের বাইরের দিকটাই সব নয়, তার একটা ভিতরের মহলও আছে। তাকে বলতে পারি রস-রূপের মহল। কিন্তু সে-ও দেখা-রূপেরই মহল, সে-ও কিছু কম বাস্তব নয়। শিল্পে রস-রূপের মধ্যে দেখা-রূপের যে-সাদৃশ্যকে পাই, তা ওই অন্তর-মহলের সাদৃশ্য। এ হল মর্মগত সাদৃশ্য।

এই সাদৃশ্যের কথা স্মরণ করেই অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"যে নিয়মে প্রকৃতির সৃজনক্রিয়া চলল, সেই নিয়মের অনুরূপ পথ ধরে চলল মানুষের সৃষ্টিকার্য। এই কারণেই ঋষিরা বললেন মানব-শিল্পকে— 'দেবশিল্পানামনুকৃতি'... !"[৪]

—স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এই ঋষিবাক্যে যে অনুকৃতি কথাটি আছে, তাতে অবনীন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

অবনীন্দ্রনাথ বাস্তবের বাইরের রূপের অন্ধ আনুগত্যে আপত্তি জানিয়েছেন। এই অর্থে তিনি অনুকরণের বিরোধী। তিনি শিল্পীর স্বাধীনতায় আস্থাশীল। শিল্প যে নিয়তিকৃত নিয়মরহিত, এ বিষয়ে তিনি কাব্যপ্রকাশ-কারের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। সবই ঠিক কথা, কিন্তু সেইসঙ্গে এ-ও ঠিক যে, তাঁর শিল্পতত্ত্বে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান রিয়ালিটির— কাজের জগৎ আর কাজভোলা জগৎ সবকে জড়িয়ে নিয়ে যার প্রকাশ।

রিয়ালিটিই অবনীন্দ্রনাথের কাছে সকল রূপের আধার, সকল রসের উৎস। তাঁর ভাষাতেই বলি—

"পাথরের রেখায় বাঁধা রূপ, ছবির রঙে বাঁধা রেখা,...শিল্পের এ সবই তো যে রস ঝরছে দিনরাত তারি নির্মিতি ধরে প্রকাশ পাচ্ছে...। কাজের জগতের মাঝেই রস ঝরছে— আনন্দের ঝরণা, আলোর ঝোরা; তার গতি ছন্দ সুর রূপ রং ভাব অনন্ত; আর কোথায় যাবো— শিল্প শিখতে শিল্পকে জানতে?

---

১ 'শিল্পায়ন', পৃ ৪২

২ তদেব, পৃ ৪০

৩ তদেব, পৃ ৪১

৪ তদেব, পৃ ৬৩

…এমন চিত্রশালা যার ছবির শেষ নেই, এমন বাণী মন্দির যেখানে কবিতার অবিশ্রান্ত পাগলাঝোরা ঝরছেই, এমন সঙ্গীতশালা যেখানে স্বরের নদী সমুদ্র বয়ে চলেছে অবিরাম… ।”[১]

তা হলে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্ব কি রিয়ালিজমেরই সমর্থন করে ? একে কি বলব বাস্তববাদী শিল্পতত্ত্ব ? স্থূল বা প্রচলিত অর্থে ধরলে বলব, নিশ্চয়ই নয়। সূক্ষ্ম অর্থে, গভীর অর্থে— আসল অর্থে ধরলে, এ শিল্পতত্ত্বকে বাস্তববাদ বলতে খুব বেশি বাধা দেখি না। বাধা কেবল এইটুকু যে, 'বাস্তববাদ' কথাটার স্থূল অর্থটাই আজকাল বেশি প্রচলিত, সূক্ষ্ম অর্থটা প্রায় অপ্রচলিত। অপ্রচলিত অর্থের ব্যবহারে— সে-অর্থ যতই যুক্তিসংগত হোক-না কেন— ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে। আসল প্রশ্নটা যখন নাম নিয়ে নয়, বিষয় নিয়ে, তখন বাস্তববাদ বলি আর না-বলি, বিষয়টাকে ঠিকমতো চিনতে পারলেই হল।

৪

ক্লাসিক শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে— অন্তত অ্যারিস্টটলীয় শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে— অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে বেশ বড় রকমের সমধর্মিতা আছে, তা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু এইটেই সমগ্র সত্য নয়। ক্লাসিক শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে কয়েকটি বড় রকমের অমিলও যে আছে, সে-কথা না বললে একদেশদর্শিতা ঘটবে। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বে কল্পনার উপর, শিল্পদৃষ্টির বিশেষত্বের উপর, কিংবা শিল্পীর নিজস্বতার উপর যে-রকম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ক্লাসিক শিল্পতত্ত্বে তার সাক্ষাৎ পাই না। এ-ব্যাপারে বরং রোমান্টিক শিল্পতত্ত্বের সঙ্গেই অবনীন্দ্রনাথের মিল গভীরতর।

রোমান্টিক শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বের বড় মিল মনোভঙ্গীর মিল, মেজাজের মিল। মনে রাখতে হবে, শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের মনোধর্ম অনেকখানি পরিমাণে রোমান্টিক মনোধর্ম। এদেশের সাংস্কৃতিক ভাবপরিমণ্ডলও তখন বহুল পরিমাণে রোমান্টিকতার প্রভাবে প্রভাবিত। সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, রোমান্টিক শিল্পতত্ত্বসন্ধানীদের মতো অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণও মূলত স্রষ্টার দৃষ্টিকোণ। তাঁর শিল্পতত্ত্ব মূলত স্রষ্টাকেন্দ্রিক শিল্পতত্ত্ব।

রোমান্টিক মতবাদের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বের মিলটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তা হলেও একে চূড়ান্ত মিল বলে গ্রহণ করবার উপায় নেই। শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে শিক্ষাদীক্ষার উপর, বিচার-বুদ্ধির উপর, সংযমের উপর, কিংবা ঐতিহ্যের উপর ক্লাসিকপন্থীরা যে-রকম গুরুত্ব দিয়েছেন, অবনীন্দ্রনাথ তা দেন নি বটে কিন্তু এই-সব বিবেচনাকে রোমান্টিক মতবাদ যে-রকম জোরের সঙ্গে উড়িয়ে দিয়েছে, অবনীন্দ্রনাথ তা-ও করেন নি। অন্যপক্ষে, কল্পনা, শিল্পীর নিজত্ব ইত্যাদির উপর অবনীন্দ্রনাথ যে-রকম গুরুত্ব দিয়েছেন তা ক্লাসিক শিল্পতত্ত্বের তুলনায় যেমন অনেক বেশি তেমনি গোঁড়া রোমান্টিকের তুলনায় অনেক কম। অর্থাৎ কতকগুলি দিক থেকে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্ব যেমন সুস্পষ্টভাবে রোমান্টিক, অপর কতকগুলি দিক থেকে তা তেমনি তর্কাতীতভাবে ক্লাসিকপন্থী। আশা করি রোমান্টিক শিল্পতত্ত্বের মূল সূত্রগুলিকে অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে একটু মিলিয়ে দেখলেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ক্লাসিক মতে শিল্প যেমন অনুকরণ, তেমনি রোমান্টিক মতে শিল্প হল সৃষ্টি। বলা হয়েছে যে, সৃষ্টি

---

১ "শিল্পের অধিকার", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ২১

কখনোই নিছক নির্মাণ নয়। সৃষ্টি তার আপন স্বধর্মের কারণেই সমস্ত নির্মাণ থেকে পৃথক্। সেই ধর্মটা কী? সে হল প্রকাশ। কী প্রকাশ, কিসের প্রকাশ? উত্তরে বলা হয়েছে, ভাবের প্রকাশ, অনুভূতির প্রকাশ। কেউ কেউ শিল্পীর আত্মতার উপর জোর দিয়ে বলেছেন, শিল্পীর আত্মপ্রকাশ! বলা বাহুল্য, শিল্পীর অনুভূতিকে প্রকাশ করা আর শিল্পীর নিজেকে প্রকাশ করা হুবহু এক ব্যাপার নয়। কিন্তু দুয়ের মধ্যে একটা জাতিগত ঐক্য আছে। দুই ক্ষেত্রেই শিল্পীর অন্তর্জীবনের উপর চূড়ান্ত রকমের জোর। উভয় ক্ষেত্রেই, শিল্পের আসল কাজ হল ভিতরকে বাইরে আনা। শিল্পব্যাপারে বহির্বিশ্বের ভূমিকার উপর গুরুত্ব উভয় ক্ষেত্রেই যৎসামান্য।

প্রথমে ভাবপ্রকাশের কথাটা ধরা যাক। তর্ক সৃজনক্রিয়াকে নিয়ে নয়, তর্ক সৃষ্ট বস্তুটিকে নিয়ে। শিল্পবস্তু আর কিছুই নয়, সে হল প্রকাশিত ভাব— রূপপ্রাপ্ত অনুভূতি। এমন বলা হচ্ছে না যে, অনুভূতি জন্মায় এবং তার প্রবর্তনায় শিল্পবস্তু রূপায়িত হয়। বলা হচ্ছে যে, অনুভূতিই রূপ পেয়ে শিল্পবস্তুতে পরিণত হয়। শিল্পবস্তু অনুভূতিরই বস্তুরূপ, অনুভূতিরই মূর্তি। কবিতা ছবি গান ভাস্কর্য, এরা সবই মূর্ত অনুভূতি। বলতে পারি, অনুভূতির প্রতিমা।

কার অনুভূতি? একজনের অনুভূতি অপরে প্রকাশ করতে পারে না, সুতরাং— বলাই বাহুল্য— শিল্পীর নিজেরই অনুভূতি। একান্তভাবেই নিজের।

অনুভূতি অর্থে ভাব জিনিসটা একেবারেই ব্যক্তিগত, যার-যার তার-তার ব্যাপার। ভাব ব্যক্তিবিশেষের অন্তর্জীবনের অনন্য ঘটনা, সম্পূর্ণ দোসরহীন, সম্পূর্ণ প্রাইভেট। শিল্পে এই প্রাইভেট জিনিসই পাব্‌লিক হয়।

অবনীন্দ্রনাথও শিল্প-প্রসঙ্গে ভাব কথাটির উপর প্রচুর গুরুত্ব দিয়েছেন। এর মধ্যে যে অনেকখানি পরিমাণে রোমান্টিকতার উত্তরাধিকার ক্রিয়া করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরোপুরি নয়। ভাব কথাটিকে তিনি সর্বত্র ঠিক এক-অর্থে ব্যবহার করেন নি। বিভিন্ন অনুষঙ্গে তার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ। কোথাও অনুভূতি, কোথাও বা অন্য-কিছু।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাবকে তিনি একটা রসাবিষ্ট অবস্থার সঙ্গে— প্রেরণার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। যেমন—

> "শিল্প-কাজ সমস্তের মধ্যে একটা দিক থাকে যেটা রস ও ভাবের দিক। সেখানে ভাব উদয় হল, কবিতা লিখলেম, ছবি লিখলেম, গান গাইলেম, নৃত্য করলেম; ভাবের বশে কলম চললো তুলি চললো হাত চললো পা চললো।"[১]

ভাবের বশে কলম চলা আর ভাবটাকেই কলমের সাহায্যে বস্তুরূপ দেওয়া ঠিক এক জিনিস নয়। ভাবটাই যে রূপ নিচ্ছে এমন কথা অবনীন্দ্রনাথ এখানে বলছেন না, ভাবটা যে অনুভূতিই তা-ও বলছেন না।

অন্যত্র কিন্তু ভাবকে রূপ দেবার কথাও বলেছেন। বলেছেন, রূপকে ভাবের সদৃশ হতে হবে।

---

১ "ভাব", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ৩০২

যেমন— "… প্রতিমা-শিল্পের কৌশলই হচ্ছে রূপটাকে ভাবের প্রতিম করে' তোলাতে।… ভাবের প্রতিম যেটি হ'ল সে… রস ও ভাবের বস্তু হয়ে রইলো।"[১]

ভাবপ্রকাশের কথাও বলেছেন। একটি বাক্যাংশ উদ্‌ধৃত করছি, সমগ্র বাক্যটিতে এখানে আমাদের প্রয়োজন নেই—

"মানুষের ভাব প্রকাশ করে যে সমস্ত রস-রচনা কবিতা গান ছবি ইত্যাদি ইত্যাদি…"।[২]

শিল্পবস্তু যে ভাবের প্রতিম হবে, মানুষের ভাবকে প্রকাশ করবে, এ কথা তিনি স্পষ্টই বলেছেন। কিন্তু এখানে ভাব অর্থ কী? ভাব যে ঠিক সেই বস্তু মনোবিদ্যায় যাকে অনুভূতি বা ফীলিং নাম দেওয়া হয়েছে, কিংবা যাকে আবেগ বা ইমোশন বলা হয়েছে, ভাব যে আর কিছুই— কেবলই অনুভবক্রিয়া, এমন কথা তিনি কখনোই স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেন নি। এইখানেই রোমান্টিক অনুভূতিতত্ত্বের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের ভাব-তত্ত্বের প্রধান পার্থক্য।

অনেক সময় ভাব বলতে অবনীন্দ্রনাথ রসাবিষ্ট চিত্তের একটা সামগ্রিক অবস্থাকেও বুঝেছেন। এই সামগ্রিকতার মধ্যে অনুভূতি নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু অন্য উপাদানও বড় কম নেই। তা ভাবনা-বেদনা-বাসনার, শিল্পদৃষ্টি-প্রেরণা-কল্পনাশক্তির একটা ঘনীভূত ঐক্য। এমন একটা অবস্থা যেখানে যুগপৎ প্রেম ও নিরাসক্তি ক্রিয়াশীল, যেখানে মন একই সঙ্গে তন্ময়তা ও আত্মস্থতায় প্রতিষ্ঠিত।

ভাব বলতে অবনীন্দ্রনাথ অনেক সময় বুঝেছেন, ভাবনা— আইডিয়া। যে-কোনো অবস্থার যে কোনো রকমের আইডিয়া নয়, অনুভূতি-রাগরঞ্জিত রূপ-পরিগ্রহণশীল আবেগাপ্লুত আইডিয়া। চিন্তা যদি বলি তো সে এমন চিন্তা যা অনুভূতির থেকে অভিন্ন, আর অনুভূতিই যদি বলি তো সে এমন অনুভূতি যা চিন্তার সঙ্গে একাত্ম। কোনোটাই না-বলে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভাব। পাশ্চাত্যদেশের রোমান্টিকতার প্রবক্তারা ফীলিং বলতে যা বুঝেছেন, অবনীন্দ্রনাথ-কথিত ভাব তা নয়। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় ভাব কথাটিকে যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন, ভাবনা-বেদনা-বাসনার রাসায়নিক একতা, উপলব্ধির অখণ্ড সমগ্রতা, তার সঙ্গেই বরং এর অনেকখানি মিল।

এ-ভাব একান্তভাবে শিল্পীর ব্যক্তিগত নয়। জিনিসটা মানুষের— সর্বমানবের— সাধারণ সম্পত্তির মতো। শিল্পীর চিত্তে তার উদয় হয়। শিল্পী যেন ভাবকে আপনার চিত্ত-দর্পণে প্রত্যক্ষ করেন, আবিষ্কার করেন। শিল্পবস্তুর মধ্যে যে সর্বজনীনতা, তার ভিত্তি এইখানেই।

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"… মানুষের দেওয়া একটি রূপরচনা বিশ্বের মানবজাতির ভাবনা চিন্তা সুখ দুঃখ সভ্যতা ভব্যতা শিক্ষা দীক্ষা সমস্তেরই সঙ্গে লিপ্ত হয়ে আছে।"[৩]

—সহজেই বোঝা যায়, অবনীন্দ্রনাথ-কথিত ভাবপ্রকাশ-তত্ত্ব আর রোমান্টিকদের দ্বারা প্রচারিত অনুভূতিপ্রকাশের তত্ত্ব মোটেই এক জিনিস নয়।

---

১ "ভাব", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ৩০৩

২ তদেব, পৃ ৩০১

৩ "রূপবিদ্যা", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ২৩১

রোমান্টিক শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের আসল মিল অনুভূতি প্রকাশের তত্ত্বে নয়, আসল মিল অন্তর্জগতের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়াতে। তেমনি, আসল তফাত হল বহির্জগতের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ায়। বহির্জগতের উপর গুরুত্বটা অবনীন্দ্রনাথের ভাবপ্রকাশতত্ত্বের মধ্যেই লক্ষ করা যায়।

অনেক সময় ভাব অবনীন্দ্রনাথের কাছে বস্তুরই মনঃকল্পিত একটা রস-রূপ। মনঃকল্পিত বটে, কিন্তু সে কল্পনা বস্তুকে অবলম্বন করেই। বস্তুর এই রস-রূপে কোথাও মনের আরোপ-ক্রিয়া লক্ষগোচর, কোথাও-বা তা নয়— রূপটা যেন বস্তুরই তদ্‌গত রূপ। যেমন—

"... যখন কবি একটি গাছকে সবুজপরী বলে বর্ণনা করলেন তখন এটা হ'তে পারে যে কবি নিজের মনের ভাবটা গাছেতে আরোপ করে' গাছকে দেখছেন পরীরূপ, আবার এও হতে পারে যে গাছটি সত্য সত্যই আপনাকে ধরেছে কবির সামনে পরী সেজে।"[১]

অনেক সময় মনের কল্পনার উপর একেবারেই জোর না দিয়ে বস্তুর নিজস্ব রস-রূপকেই ভাব নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন—

"... সকালের ভাব সন্ধ্যার ভাব দিনের ভাব রাতের ভাব, এসব বুঝতে দেরী হয় না আমাদের ।"[২]

অথবা—

"...সকালের আকাশ সন্ধ্যার আকাশ জানাচ্ছে রঙের ভাষায় নানা ভাব, একমাত্র ভাবুক জানে এই ভাষা যা দিয়ে মেঘ যাচ্ছে জানিয়ে ভাব-ফুল ফুটছে এবং ঝরছেও জানিয়ে ভাব।"[৩]

আর-একটি অংশ তুলে দিচ্ছি।—

"সূর্যের আলোয় রুদ্র তেজস্বিতা ইত্যাদি অনেক ভাব, চাঁদের আলোয় শীতল কান্ত নানা ভাব। সূর্যের এক রকম ভাব, জলের এক রকম, আকাশের অন্য রকম ভাব। ঋতুতে ঋতুতে চরাচরের ভাবপরিবর্তন এ-সব চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভাবের ক্রিয়ার।"[৪]

দেখা যাচ্ছে, অবনীন্দ্রনাথের মতে, ভাব যেমন শিল্পীর মনে, তেমনি আছে বিশ্বজগতে— বস্তুর বস্তু-সত্তাতে। এই দুয়ের মিলনেই সার্থক শিল্পসৃষ্টি। শিল্পবস্তু অন্তর ও বাহির দুয়ের মিলনস্থল, অন্তর ও বাহির দুয়েরই প্রকাশ।

বস্তুর অন্তঃপ্রতিকৃতি, তার রস-রূপ এই একদিকে আর শিল্পীর মনের শক্তি, তার কল্পনার মায়া এই আর-এক দিকে, দুয়ে মিলে শিল্প।—

"মানুষ বিশ্বের আকৃতির প্রতিকৃতি নিজের রচনায় বর্জন করলে বটে, কিন্তু প্রকৃতিটি ধরলে অপূর্ব কৌশলে যার দ্বারা রচনা দ্বিতীয় একটা সৃষ্টির সমান হয়ে উঠলো।"[৫]

শিল্পের মধ্যে শিল্পীর কল্পনার মায়া আর বস্তুর নিজের কায়া দুয়ের যুগলমিলন। কিন্তু শুধু শিল্প কেন,

---

১ "ভাব", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ৩০৫

২ তদেব, পৃ ৩০৪

৩ তদেব, পৃ ৩০৫

৪ তদেব, পৃ ৩০৭

৫ "শিল্প ও দেহতত্ত্ব", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ৯৪

বিশ্বজগৎ-ও তাই— মায়া আর কায়ার যুগলমিলন।—

"মায়াকে ধরে রয়েছে কায়া, কায়াকে ঘিরে রয়েছে মায়া…। জগৎ শুধু মায়া কি শুধু কায়া নিয়ে চলছে না, এই দুয়ের সমন্বয় চলেছে; তাই বিশ্বের ছবি এমন চমৎকারভাবে আর্টিস্টের মনটির সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে।"[১]

এই যুগলতত্ত্বকে কি ক্লাসিক রোমান্টিকের সমন্বয় বলে গণ্য করতে পারি? কিন্তু যথার্থ বিরোধের কি সমন্বয় সম্ভব? সম্ভব, যদি উচ্চতর ভূমিতে এমন একটা ব্যাপকতর সত্যে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়, যা দুই বিরোধী সত্যকেই গ্রাস করে নিতে পারে। তা যদি না হয় তা হলে সমন্বয়ের নামে শুধু গোঁজামিলই সম্ভব। অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সার্থক সমন্বয় যদি সত্যিই সাধিত হয়ে থাকে, তা হলে এ-ও মেনে নেব যে, তাঁর শিল্পতত্ত্ব ক্লাসিক ও রোমান্টিক দুয়ের থেকে উচ্চতর ব্যাপকতর— এবং সম্ভবত, আধুনিকতর শিল্পতত্ত্ব।

৫

শিল্পবস্তু শিল্পীর নিজের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ— শিল্পীর আত্মপ্রকাশ, রোমান্টিক ধারার এই মতবাদটির স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা, আশা করি, নিষ্প্রয়োজন। কারণ অনুভূতিপ্রকাশ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই মতবাদের ক্ষেত্রেও প্রায় সমানভাবেই প্রযোজ্য। বরং বেশি করেই প্রযোজ্য। কারণ আত্মপ্রকাশ সম্পর্কেই অবনীন্দ্রনাথের আপত্তি স্পষ্টতর। শিল্পে শিল্পীর আত্মতা নয়, অবনীন্দ্রনাথের মতে শিল্পে যা অভিব্যক্ত তা হল মানুষ আর বিশ্বের যুগলমিলন।

অবনীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

"মানবপ্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতি এই দুয়ের মিলনে শিল্পের উৎপত্তি…।"[২]

—এ কথা যিনি বলতে পারেন, তিনি কেমন করে শিল্পবস্তুকে একান্তভাবে শিল্পীর আত্মতারই প্রকাশ বলে দাবি করতে পারেন? কেউ কেউ বলেন বটে, আত্মতা শিল্পীর ব্যক্তিসত্তার নয়, শিল্পীর শিল্পীসত্তার। অবনীন্দ্রনাথ তা-ও বলেন নি। যুক্তিযুক্তভাবে বলতেও পারেন না। বললে, তা তাঁর যুগল মিলনের তত্ত্বকে খণ্ডিত করে দেবে।

এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্পষ্ট।—

"আর্টের সঙ্গে আর্টিস্টকে পাই তাই আর্টের আদর করি… এমনি কতকগুলো বচন আর্ট সমালোচনাতে প্রচলিত হয়ে গেছে।"[৩]

—অবনীন্দ্রনাথ এই লোক-প্রচলিত বচনে একেবারেই বিশ্বাসী নন। তিনি বলেন, শিল্প শিল্পীর কাছে পৌঁছে দেবার সোপান নয়, যেমন রূপ অরূপের কাছে পৌঁছে দেবার সোপান নয়। তাঁর মতে—

"রূপ আছে আর্টিস্টের কথা অরূপের ধ্যান ভুলিয়ে দিতেই।"[৪]

---

১ "শিল্প ও দেহতত্ত্ব", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ৯৫

২ "শিল্পবৃত্তি", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ১৬৯

৩ "অরূপ না রূপ", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ২০৩

৪ তদেব, পৃ ২০৪

তিনি বলেন—

"ছবির কবিতার সঙ্গীতের উদ্দেশ্য রচয়িতাকে সুপরিচিত করা—এ হতেই পারে না।... ছবির সঙ্গে আর্টিস্টকে জানছি এ নয়, আর্টিস্টকে জানলেম না শুধু জানলেম রচনাকে এবং পেলেম তা থেকে মাধুরী যা পাবার তা—এই হল ঠিক ভাবে রূপের উপভোগ।"[১]

কথাগুলি ক্লাসিকপন্থী শিল্পতাত্ত্বিকের একেবারে মনের মতন কথা। কিন্তু, আগেই বলেছি, এইটেই শেষ-কথা নয়। ক্লাসিক মতবাদের জোর সাদৃশ্যের উপর, সৃজনশীল মনের ভূমিকার বিষয়ে অধিকাংশ ক্লাসিকপন্থী পণ্ডিতই প্রায় সম্পূর্ণ নীরব। অবনীন্দ্রনাথ সৃজনশীল মনের ভূমিকা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। সাদৃশ্যকে তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু সে-সাদৃশ্যও ভাব-রসের সাদৃশ্য। তাকেই তিনি বলেছেন, ভাবের সত্য সাদৃশ্য।—

"উচ্চ স্তরের আর্টে এই ভাবের সত্যসাদৃশ্য দেবার চেষ্টাই হয়েছে, ভ্রান্তি জাগানো সাদৃশ্য নিম্নস্তরে পড়ে রয়েছে আজও।"[২]

—এ-ব্যাপারে স্বয়ং অ্যারিস্টটলের সঙ্গে তাঁর মনের মিল থাকতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ সাদৃশ্যপন্থীর সঙ্গেই তাঁর মতভেদ অনিবার্য।

যে-শক্তি ভাবকে আবিষ্কার করে, বস্তুর রস-রূপকে প্রত্যক্ষ করে এবং ভাবের সত্যসাদৃশ্যকে রূপায়িত করে তোলে, সৃজনশীলতা বলতে সেই শক্তিকেই বুঝব। এই শক্তিকেই এককালে আমাদের দেশে প্রতিভা নাম দেওয়া হয়েছে। রোমান্টিক এবং উত্তর-রোমান্টিক শিল্পতত্ত্বে এরই নাম কল্পনা। আধুনিক প্রচলিত ব্যবহারে সৃজনীপ্রতিভারই অপর নাম কল্পনা।

অবনীন্দ্রনাথ এই শক্তিকে পুরোপুরি স্বীকার করেছেন। কিন্তু এর নামকরণের বেলায় খুব সুস্থিরতার পরিচয় দেন নি। এই সৃজনীশক্তিকে তিনি কখনো বলেছেন ভাব, কখনো বলেছেন ভাবব্যঞ্জনা, কখনো বলেছেন ভাবরস, কখনো বলেছেন রসসৃষ্টি। আবার কখনো কখনো একে কল্পনাও বলেছেন।

সৃজনীশক্তি এবং কল্পনাকে সম্পূর্ণ অভিন্ন জ্ঞান করাটা নিঃসন্দেহে রোমান্টিক উত্তরাধিকার। কল্পনাই শিল্পের প্রাণ, কল্পনাই ঘটনাকে ভাব-রসে সঞ্জীবিত করে, বিদ্যমানকে অবিদ্যমানের সংযোগে নতুন প্রাণ নতুন মূর্তি দেয়, এ রকম কথা অবনীন্দ্রনাথ একাধিকবার বলেছেন। যেমন—

"ঘটনার সঙ্গে কল্পনার মিলন হল, তবেই হল একটা শিল্পরচনা।"[৩]

অথবা—

"বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান এই দুই ডানার উত্থান পতনের গতি ধরে চলেছে মানুষের মনের সঙ্গে মানুষের মানস-কল্পনার প্রকাশগুলি।"[৪]

---

১ "অরূপ না রূপ", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ২০৪

২ "সাদৃশ্য", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ৩৩০

৩ "অন্তর বাহির", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ১০০

৪ তদেব।

কিংবা—

"শিল্পের প্রাণ হচ্ছে কল্পনা, অবিদ্যমানের নিশ্বাস।"

—উপরের তিনটি উক্তিতেই কল্পনার গৌরব-ঘোষণা উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু প্রথম উক্তি দুটিতে আর-একটা তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত আছে। ঘটনা, যাকে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যমান, শিল্পব্যাপারে তার ভূমিকাও যে নগণ্য নয়, এ কথাও ওর মধ্যে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় যেমন বলেছেন, শিল্পের প্রাণ কল্পনা, তেমনি অনেক জায়গায় আবার সম্পূর্ণ অন্যরকম কথাও বলেছেন। বলেছেন, শিল্পের প্রাণ ঘটনার নিজস্ব ভাব-রসের মধ্যেই বিদ্যমান।[১]

অবনীন্দ্রনাথ তিন রকম সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। সব থেকে নীচের ধাপে ঘটনামূলক সাদৃশ্য বা নিছক বাহ্য প্রতিরূপ। সেখানে দৃষ্টরূপের যথাযথতার মধ্যেই রচনার সীমা।

এর উপরের ধাপে কল্পনামূলক সাদৃশ্য।—

"এটি দিয়ে মনঃকল্পিত যা কিছু অবতারণা করা চললো। এখানে আর দেখা-রূপের সীমা মেনে চলতে হল না।··· এখানে দেখা রূপে না-দেখা রূপে বা কল্পিত রূপে মেলামেশানোর অবসর হল এবং তার ফলে নানা অদ্ভুত রূপসৃষ্টির দেখা পেলেম।"[২]

এইবারে সর্বোচ্চ স্তরের সাদৃশ্যের কথা। অবনীন্দ্রনাথের ভাষাতে বলি।—

"এর চেয়ে উচ্চ স্তরে উঠে পেলেম আর্টের মধ্যে ভাবনামূলক সাদৃশ্য। যা অন্তর্নিহিত ছিল, গোপন ছিল, তা বাইরে প্রকাশিত হল অপূর্ব কৌশলে। এ ক্ষেত্রে রূপ ও কল্পনা দুই-ই ভাব-ব্যঞ্জনার কাজে লাগলো, এবং ভাব ও রসই এখানে প্রাধান্য পেলে দৃষ্ট আর কল্পিত দুয়ের উপরে।"[৩]

উদ্‌ধৃতিগুলি থেকে মনে হয়, শিল্পের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ কল্পনার একাধিপত্যকে স্বীকার করেন না। কল্পনা যেন সৃজনীশক্তির অন্তর্গত একটি সীমাবদ্ধ বৃত্তি— নিম্ন-অধিকারী। সৃজনীশক্তিকে অবনীন্দ্রনাথ মনের কোনো বৃত্তি-বিশেষের সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে অনিচ্ছুক। এখানে তিনি সমগ্রতায় বিশ্বাসী। সৃজনীশক্তি সমগ্র মনের শক্তি, তার মধ্যে মনের প্রত্যেক বৃত্তি একসঙ্গে অপৃথক্‌ভাবে ক্রিয়াশীল।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্ব অন্তর ও বাহিরের যোগের তত্ত্ব।—

"শিল্পীর কৌশল বস্তুরূপের সঙ্গে রসের পথ ধরে অন্তর-বাহিরে যোগ।"[৪]

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বে না অন্তর না বাহির, না অবিদ্যমান না বিদ্যমান, কারো অধিকারই চূড়ান্ত নয়। কারো ক্রিয়াই স্বতন্ত্র নয়, কেউ একলা নয়। অন্তর বা বাহির, কেউ স্বয়ংসিদ্ধ নয়। এ শিল্পতত্ত্ব অন্তর ও বাহিরের ডায়লেক্‌টিক যোগাযোগের শিল্পতত্ত্ব। অন্তর বাহিরের স্তন্যরসে পুষ্ট, বাহির অন্তরের স্পর্শে রূপময়, তাৎপর্যময়, প্রাণময়।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বও অন্তর ও বাহিরের যুগলমিলনেরই শিল্পতত্ত্ব। তফাত এই যে, রবীন্দ্রনাথের

---

১ "অন্তর বাহির", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ১০২

২ "সাদৃশ্য, 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ৩৩২

৩ তদেব।

৪ 'শিল্পায়ণ', পৃ ৪৫

শিল্পতত্ত্বের ভিত্তিটা দার্শনিক, অবনীন্দ্রনাথের তা নয়। রবীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বের ভিত্তি তাঁর বিশিষ্ট মানবতত্ত্বে। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষমাত্রেই শিল্পী— অন্তর ও বাহিরের যুগলমিলনেই তার শিল্পীধর্ম তথা মনুষ্যধর্ম সিদ্ধ হয়। অবনীন্দ্রনাথ এরকম-কিছু বলেন নি। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্ব বিশেষভাবে চিত্র-ভাস্কর্য-সংগীত-সাহিত্যাদিরই তত্ত্ব, বিশেষভাবে এবং বিশেষ অর্থে যাকে আর্ট বলা হয় তারই থিয়োরি, মানবতত্ত্ব নয়, কিংবা যুগপৎ মানবতত্ত্ব এবং শিল্পতত্ত্বও নয়। রবীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্ব একই সঙ্গে শিল্পতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব ও দর্শনতত্ত্ব।

৬

এইবারে ভোক্তার দিকের প্রশ্ন।—

ভারতীয় রসতাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে শিল্প-ব্যাপারে ভোক্তার গুরুত্ব অসামান্য। তাঁদের মতে শিল্পের প্রাণ আস্বাদনের আনন্দে। অর্থাৎ কিনা রসে। আস্বাদনের বাইরে শিল্প নেই। এই-যে আস্বাদনানন্দ বা রস, এর আধার শিল্পবস্তুও নয়, নিছক-শিল্পী হিসেবে শিল্পীর চিত্তও নয়। রসের অধিষ্ঠান ভোক্তার চিত্ত। ভোক্তার আনন্দেই শিল্পের শিল্পত্ব।

অবনীন্দ্রনাথ রস কথাটি প্রচুর ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তা রসতাত্ত্বিকদের পারিভাষিক অর্থে নয়। অর্থাৎ, রস ভোক্তার স্বসংবিদানন্দচর্বণব্যাপার, এ অর্থে নয়। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বে ভোক্তার গুরুত্ব স্বীকৃত, কিন্তু তা কখনো স্রষ্টার গুরুত্বকে ছাপিয়ে যায় নি। স্রষ্টার ভূমিকাই প্রাথমিক।—

"রূপ-রসের রাস্তা ধরে রচনাটি শেষ করে আর্টিস্ট হাত গুড়িয়ে বসল তার পর এল ভোক্তার পালা, দর্শকের পালা, শ্রোতার পালা।"[১]

রোমান্টিক শিল্পতত্ত্বে ভোক্তার ভূমিকা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অস্বীকৃত। সৃষ্টি যেন সম্পূর্ণ ই ভোক্তা-নিরপেক্ষ ব্যাপার, একান্তই স্রষ্টার স্বগতোক্তি, রোমান্টিক শিল্পতাত্ত্বিকদের ভাবটা অনেকটা এই রকম।

অবনীন্দ্রনাথের মতে শিল্পের আসর স্রষ্টা-ভোক্তার মিলিত আসর।—

"একদিকে রইল রস দেবার নানা উপকরণ প্রকরণ নিয়ে ক্রিয়া করে চলেছে যে আর্টিস্ট সে, আর একদিকে রইল রস-উপভোক্তা রসিক সে। একজন পাচ্ছে শিল্প-ক্রিয়া করে আনন্দ আর একজন পাচ্ছে সেই সমস্ত রস-রচনা ভোগ করে আনন্দ। দর্শক প্রদর্শক এই দুই নিয়ে তবে জমে শিল্পের মজলিশ।"[২]

শিল্প ব্যাপারটা ক্রিয়া আর ভোগ দুই মিলিয়ে একটা সমগ্র ব্যাপার, দুই অংশে মিলে তবে সম্পূর্ণ। এর আরম্ভের প্রান্তে প্রদর্শক, শেষের প্রান্তে দর্শক।—

"আর্টের রাঙানো পট— প্রভাতের আকাশ সন্ধ্যার আকাশ যেন ছন্দে দুলছে, এরই ওপারে প্রদর্শক, এপারে দর্শক, মাঝে শিল্পরচনা।"[৩]

আরম্ভেরও যেটা আরম্ভ সেখানে কিন্তু প্রদর্শক নিজেই দর্শক। দর্শক হিসেবে তাঁর যে তপস্যা,

---

১ 'শিল্পায়ণ', পৃ ৬৪

২ তদেব, পৃ ৬৩

৩ তদেব।

সেইখান থেকেই শিল্পের শুরু।—

"আর্টকে পেতে তপস্যা, আর্টকে বুঝতে তপস্যা, কারিগরির তপস্যা সমঝদারের তপস্যা। এই তপস্যার ফলে তুজনের মন রসের গোপন ধারা বয়ে মিলতে চলে। শিল্পী পেলে ঠিক সমঝদার, সমঝদার পেলে ঠিক শিল্পী, রসের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হল তবেই।"[১]

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বে স্রষ্টার ভূমিকা এবং ভোক্তার ভূমিকা আলাদা হয়েও শেষ পর্যন্ত খুব আলাদা নয়। এ শিল্পতত্ত্বে স্রষ্টাও ভোক্তা, ভোক্তাও স্রষ্টা। তুজনেরই দৃষ্টি একই ভাব-রসের দৃষ্টি।

স্রষ্টা নিজেই যেখানে দর্শক, সেইখানেই এ-দৃষ্টির প্রথম উদ্‌ভাস।—

"দর্শক ও শ্রোতার জায়গায় বসে মানুষ দেখবার মতো করে দেখলে, শোনবার মতো করে শুনে নিলে নিখিলের এই রূপের লীলা সুরের খেলা…। দেখা শোনা পরশ করার চরম হয়ে গেলো, তারপর এলো দেখানোর পালা। মানুষ এবারে আর-এক নতুন অদ্ভুত অনিয়ন্ত্রিত অভূতপূর্ব সৃষ্টি সাধন করে গুণী শিল্পী হয়ে বসলো। এই দৃষ্টিবলে আপনার কল্পলোকের মনোরাজ্যের গোপনতা থেকে মানুষ নতুন-নতুন সৃষ্টি বার করে আনতে লাগলো। যে এতদিন দর্শক ছিল সে হল প্রদর্শক, দ্রষ্টা হয়ে বসলো দ্বিতীয় স্রষ্টা।"[২]

দ্রষ্টা-স্রষ্টার এই ভাব-রসের দৃষ্টিই শিল্পসৃষ্টি। এই শিল্পদৃষ্টিতে যা উদ্‌ভাসিত হয় তা কিন্তু বিশ্বেরই ভাব-রস-রূপ, নিখিলেরই রূপের লীলা, সুরের খেলা।

তার মানে, শিল্পী যে রসের খেলায় যোগ দেন সে রসটা বিশ্বপ্রকৃতিরই।—

"বিশ্বপ্রকৃতি আপনার রচনা সমস্তের বিরাট রহস্য-প্রাচীরের মধ্যে লুকিয়ে রাখলে রস··।"[৩]

তা হলে এ রস কি একেবারেই মানব-নিরপেক্ষ? যেখানে মানুষের মন নেই, সেখানেও কি এই রস আপনা থেকেই সিদ্ধ হয়ে আছে?

হঠাৎ শুনলে, উপরের কথাগুলি থেকে সেই রকমই মনে হয় বটে। এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। কিন্তু এ রকম সিদ্ধান্ত অবনীন্দ্রনাথের অন্তর-বাহিরের মিলনতত্ত্বের সঙ্গে খাপ খায় না। তা ছাড়া মানব-নিরপেক্ষ বিশ্বজগৎকে পাবই বা কোথায়, আর রস সেখানে স্বয়ংসিদ্ধভাবে বিদ্যমান কি অবিদ্যমান তা জানবই বা কেমন করে?

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বে রসের আধার আলাদা করে স্রষ্টার চিত্তও নয়, ভোক্তার চিত্তও নয়, আলাদা করে নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক বহির্বিশ্বও নয়। এদের সম্মিলনেই রসের সঞ্চার, এদের সম্মিলিত ঐক্যই রসের আধার। ত্রিশক্তির এই সম্মিলনের তত্ত্বেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বের মৌলিকতা।

৭

অবনীন্দ্রনাথের মতে মানুষের কাজের দৃষ্টি আর তার শিল্পদৃষ্টি এক নয়। কাজের দৃষ্টি হল প্রয়োজনের দৃষ্টি, ভোগের দৃষ্টি, আসক্তির দৃষ্টি। তা স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বার্থবুদ্ধি অন্তরের সঙ্গে বাহিরের সহজ

---

১ 'শিল্পায়ন', পৃ ৬৩

২ "দৃষ্টি ও সৃষ্টি", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ৪৪

৩ 'শিল্পায়ন', পৃ ৬৩

মিলনের পথে বাধা ঘটায়, জগতের রস-সত্যকে আবৃত করে দেয়। ভাবুকের দৃষ্টি, শিল্পীর দৃষ্টি নিঃস্বার্থ নিরাসক্ত দৃষ্টি। নিরাসক্ত, কিন্তু উদাসীনের মতো নিষ্প্রেম নয়। এ দৃষ্টি অনেকটা শিশুদৃষ্টির মতন। অবনীন্দ্রনাথ একে বলেছেন—

"ছেলেবেলাকার হারিয়ে-যাওয়া খেলাঘরের কাজ-ভোলা দৃষ্টি।"[১]

এই কাজ-ভোলা শিশুদৃষ্টিই শিল্পদৃষ্টি।—

"শিশুর বিস্ময় যে ভাবে গিয়ে স্পর্শ করে বিশ্বচরাচরকে একমাত্র ভাবুক আর শিল্পী সেই ভাবের সহজ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারে চেয়ে সৃষ্টির রসের প্রকাশ সমস্ত দিকে।"[২]

—এই যে "ভাবের সহজ দৃষ্টি" যার মধ্যে স্মৃতি কল্পনা বিস্ময় মিশে আছে, অনাসক্তি এবং ভালোবাসা এক হয়ে আছে, এই দৃষ্টির সামনে জগৎ তার রস-সত্যকে অবারিত করে মেলে ধরে।—

"শিল্পীর দেখায় আর সাধারণের দেখায় তফাত হল কেবল সেইখানে যেখানে কাজ-ভোলা দৃষ্টি, চিরতরুণ দৃষ্টি নিত্যকার কাজের থেকে নির্লিপ্ত হয়ে বস্তুর ধ্যানে নিবিড়ভাবে নিযুক্ত হবার অবসর পেতে যাচ্ছে।"[৩]

এই যে "বস্তুর ধ্যানে নিবিড়ভাবে নিযুক্ত" দৃষ্টি, এর সামনে জগৎ তার সত্যকে প্রকাশ করে। যে সত্যকে প্রকাশ করে তা বাহ্য আকার নয়, তা হল রস-সত্য। রস-সত্যই যথার্থ সত্য। এ সত্য মানুষের বিস্ময়ের রঙে রাঙানো, ভালোবাসার রসে অভিষিক্ত। যা এই বিস্ময়ের, এই ভালোবাসার বাইরে তা সত্যই নয়। মানুষের কাছে তার অস্তিত্ব অজ্ঞাত। মানুষ এই সত্যের দ্রষ্টামাত্র নয়, নিজের অজ্ঞাতে—অন্তত আংশিকভাবে মানুষ এর স্রষ্টাও বটে। অন্তরও সত্য নয়, বাহিরও সত্য নয়, সত্য অন্তর-বাহিরের সংযোগে।

যে শিল্পতত্ত্ব এই কথাকে স্বীকার করে, জগতের ভাব-রস-সত্য সম্পূর্ণভাব মানবনিরপেক্ষ, এমন সিদ্ধান্তকে সে-শিল্পতত্ত্ব কখনোই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করতে পারে না। এবং এই কারণেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বকে সূক্ষ্ম বা নিহিত অর্থে সাদৃশ্যবাদ বলে গণ্য করতে পারি, কিন্তু কোনো অর্থেই অনুকরণবাদ বলে বর্ণনা করতে পারি না। ঠিক যেমন পারি না রবীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বকে।

রবীন্দ্রনাথের মতো অবনীন্দ্রনাথের মতেও শিল্পদৃষ্টিই সত্যদৃষ্টি, সত্যদৃষ্টিই শিল্পদৃষ্টি। তা যদি হয়, তা হলে একটা প্রশ্ন উঠবে: সত্যদৃষ্টিই কি সৌন্দর্যদৃষ্টি? কিন্তু তাকেই তো লোকে বলে সৌন্দর্যদৃষ্টি যা সুন্দর-অসুন্দরের ভেদ করে, সুন্দরকে চিনিয়ে দেয়? সত্যদৃষ্টি কি তা-ই করে?

সত্যদৃষ্টির কাছে সুন্দর অসুন্দরের পক্ষপাতিত্ব নেই, মনোমতো ও অমনোনীতের ভেদ নেই, সত্যের সবই সত্য। সত্যদৃষ্টির সামনে জগৎ আপনার অন্তহীন রস-সত্যকে অনাবৃত করে দেয়, কিছুই এ দৃষ্টির বাইরে নয়, কেউ এর কাছে অস্পৃশ্য নয়, জগতের কোনো কিছুই এর প্রসাদবঞ্চিত নয়। শিল্পদৃষ্টি, সত্যদৃষ্টি, সৌন্দর্যদৃষ্টি, এরা যদি সত্যিই অভিন্ন হয়, তা হলে বুঝতে হবে, জগতে অসুন্দর কেউ নেই। বুঝতে হবে,

---

১ "দৃষ্টি ও সৃষ্টি", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ৩২

২ 'শিল্পায়ণ', পৃ ১৯

৩ তদেব, পৃ ১৮

শিল্পে সুন্দর-অসুন্দরের ভেদটাই মিথ্যা। বুঝতে হবে, সৌন্দর্যদৃষ্টি বলে আলাদা কোনো দৃষ্টি নেই। বুঝতে হবে, সৌন্দর্যদৃষ্টি কথাটাই অর্থহীন।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বে যখন সত্যদৃষ্টি আর সৌন্দর্যদৃষ্টি এক, তখন এ-ও ধরে নেব যে সত্য আর সুন্দরও সেখানে এক। সত্য সম্বন্ধে যে-কথা প্রযোজ্য, সুন্দর সম্বন্ধেও তাই; সুন্দর কেবল মনেরও সৃষ্টি নয়, কেবল বস্তুরও গুণ নয়, অন্তর ও বাহিরের সংযোগেই সুন্দরের আবির্ভাব।

অনেকে মনে করেন সৌন্দর্য জিনিসটা সম্পূর্ণ অবজেক্‌টিভ, সম্পূর্ণ বস্তুগত। কেউ দেখুক না-দেখুক, যা সুন্দর তা সুন্দর। আবার অনেকে বলেন, সৌন্দর্য সম্পূর্ণ সাবজেক্‌টিভ, বস্তুর নিজের কোনো সৌন্দর্য নেই, কুশ্রীতাও নেই। আমাদের মনই বস্তুর উপর সৌন্দর্য আরোপ করে, কুশ্রীতা আরোপ করে : গোলাপকে বলে সুন্দর, সুন্দর হয় সে।

কখনো-কখনো অবনীন্দ্রনাথের কথা শুনে মনে হয়, তিনি সুন্দর অসুন্দরের স্বয়ংসিদ্ধ ভেদ অস্বীকার করেন, সৌন্দর্যকে বস্তুগত বলে মনে করেন না, সৌন্দর্যকে একান্তভাবে ব্যক্তিগত এবং সাবজেক্‌টিভ বলেই মনে করেন। যেমন—

" .. নিজের-নিজের চেহারা আয়নাতে যেমন আমরা দেখি সুন্দর, তেমনি নিজের-নিজের মনোদর্পণে নিজের মনোমতোকে যখন দেখি তখনই বলি সুন্দর।"[১]

অথবা—

"সুন্দরের সঙ্গে সম্পর্ক হল মনে ধরা নিয়ে আর অসুন্দরের সঙ্গে ঝগড়া রইল মনে না-ধরা নিয়ে।"[২]

—বাক্যাংশ উদ্ধার করে আরো কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

"নিজের মন ছাড়া যখন সুন্দর-অসুন্দরের আদর্শ কোথাও নেই কোনোকালে নেই এবং ছিলও না, থাকবেও না এটা নিশ্চয়…।"[৩]

কিংবা—

"ব্যক্তিগত রুচি ও অরুচির উপরে সুন্দর-অসুন্দরের যখন বিচার নির্ভর করছে…।"[৪]

—আশা করি, আর অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হবে না।

কিন্তু, এই-যে সাবজেক্‌টিভের উপর এতটা জোর দেওয়া, এ কিছুতেই অবনীন্দ্রনাথের পুরোপুরি মনের কথা হতে পারে না। তা যদি হত তা হলে তিনি শিল্পীর দৃষ্টিকে অমন দ্বিধাহীনভাবে "বস্তুর ধ্যানে নিবিড়ভাবে নিযুক্ত" দৃষ্টি বলতে পারতেন না। যাঁরা সৌন্দর্যকে বিষয়গত বলে মনে করেন, বস্তুর স্বকীয় ধর্মবলে— সম্পূর্ণভাবে মন-নিরপেক্ষ ব্যাপার বলে মনে করেন, মনে হয় তাঁদের মতকে সামনে রেখে জোরালো প্রতিবাদের সংকল্প নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ উল্টো দিকে একটু অতিশয়োক্তি করে ফেলেছেন। আবার এর উল্টোটাও ঘটেছে। যেমন বস্তুর ভাব-রসের ব্যাপারে। সেখানে সাবজেক্‌টিভ

---

১ 'শিল্পায়ন', পৃ ৩২

২ তদেব।

৩ তদেব, পৃ ৩৩-৩৪

৪ তদেব, পৃ ৭৫

মতবাদকে খণ্ডন করতে গিয়ে এমন করে বলেছেন, যেন বস্তুর ভাব-রস একেবারেই বস্তুর নিজস্ব ব্যাপার— সম্পূর্ণভাবেই মানব-নিরপেক্ষ।

নিছক সাবজেকৃটিভ বা নিছক অবজেকৃটিভ, কোনোটাই অবনীন্দ্রনাথ বলতে পারেন না। বললে তাঁর শিল্পতত্ত্বের মূল বক্তব্যের বিরোধী হয়ে পড়বে। এ কথা জগতের ভাব-রস-সত্য সম্পর্কে যেমন প্রযোজ্য, সৌন্দর্য সম্পর্কেও তেমনি প্রযোজ্য। বস্তুত, অবনীন্দ্রনাথের মতে বিষয়দুটো মোটেই আলাদা নয়, একই— যা ভাব-রস-সত্য তারই অপর নাম সৌন্দর্য। আলাদা করে সুন্দর বলাই বরং অনর্থকর।

সুন্দর সম্পর্কে এইটেই অবনীন্দ্রনাথের আসল বক্তব্য। সুন্দর বলে আলাদা কিছু নেই। অসুন্দর বলেও আলাদা কিছু নেই। অসুন্দরের স্বাতন্ত্র্য কেবল চেতনার নিম্নতর স্তরের পক্ষেই সত্য। অসুন্দরের বোধ নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উঠবার একটা সিঁড়ির মতো। উপরে উঠলে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তার স্বাতন্ত্র্যও ঘুচে যায়। সত্যদৃষ্টিকেই যদি সৌন্দর্যদৃষ্টি বলি, তা হলে অসুন্দরের স্থান সৌন্দর্যের মধ্যেই, বাইরে নয়। বলা বোধকরি নিষ্প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের সৌন্দর্যসিদ্ধান্ত থেকে এ-সৌন্দর্য-সিদ্ধান্ত খুব পৃথক্ নয়।

অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন, শিল্পদৃষ্টি শিশুর দৃষ্টির মতো। শিশুর কাছে সুন্দরে-অসুন্দরে ভেদ নেই।

"সুন্দরে অসুন্দরে সমদৃষ্টি শিশুর, চাঁদ থেকে মাটির ঢেলাটি পর্যন্ত তার কাছে সুন্দর…।"[১]

তথাকথিত সুন্দর আর তথাকথিত অসুন্দর, দুই-ই রূপ, রস-সত্যে দুই-ই সমান।—

"রসের প্রেরণা সুন্দর-অসুন্দরের ধারণাকে মুক্তি দিলে, আর্টিস্টের মধ্যে সুন্দর অসুন্দরে মিলিয়ে এক এক রসরূপ সে দেখে চললো! আর্টিস্ট রূপমাত্রকে নির্বিচারে গ্রহণ করলে…।"[৪৮]

আর্টিস্ট সুন্দরের আদর্শ খোঁজেন না, সুন্দরের বাঁধা-আদর্শকে ভেঙে দেন, তথাকথিত অসুন্দরের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দেন। যা-কিছু আছে সবই যে সুন্দর, আর্টিস্ট এই সত্যকে প্রত্যক্ষ করেন এবং অপরের প্রত্যক্ষগোচর করে তোলেন।

সৌন্দর্য কথাটাই বিভ্রান্তিকর। সেইজন্যে সৌন্দর্যের বদলে অনুরূপ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অনেক সময় অবনীন্দ্রনাথ রস কথাটি ব্যবহার করেছেন, রস-সত্য কথাটি ব্যবহার করেছেন। রসই বলি আর রস-সত্যই বলি অথবা সৌন্দর্য বলি— কিংবা কেবল সত্যই বলি, তা একই সঙ্গে বস্তুগত এবং চিত্তগত। আমাদের বস্তুজগৎ এবং আমাদের অন্তর্জগৎ, কোনোটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বয়ংসিদ্ধ নয়। রস হিসেবেই সিদ্ধ এবং সম্পূর্ণ। কাজের জগতে এই সত্যটা ঢাকা থাকে। শিল্পের জগতে এর অনাবৃত প্রকাশ।

৮

শিল্পের কোনো সামাজিক ভূমিকা আছে কি না, থাকলে তার গুরুত্ব কতখানি, তার উপর শিল্পের ভালো-মন্দ নির্ভর করে কি না, যে-রচনা সমাজের দিক থেকে আপত্তিকর— অকল্যাণকর, তা শিল্প হিসেবেই বর্জনীয় কি না, অবনীন্দ্রনাথ এ-সব সমস্যার মধ্যে তেমন ভাবে প্রবেশ করেন নি। Art for Art's sake— এই সুপ্রচলিত বচনটির সমর্থনের মধ্যে দিয়ে শিল্পের উদ্দেশ্যের প্রসঙ্গটিকে যৎসামান্য স্পর্শ করেছেন মাত্র।

---

৪৭ 'শিল্পায়ন', পৃ ৩২

৪৮ "সৌন্দর্যের সন্ধান", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ৭৭

শিল্পের উদ্দেশ্য কী, শিল্পের মূল্য কোথায়, এ নিয়ে তর্ক অনেক কালের। শিল্প আনন্দ দেয়, এ কথা সকলেই মানেন। এ নিয়ে কোনো তর্ক নেই। তর্কটা সেই আনন্দের গুরুত্ব নিয়ে, সেই আনন্দের অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে। এই তর্কের প্রধান পক্ষ দুটি। Art for Art's sake বচনটি এই তর্কে তার এক-পক্ষের সূত্রাকার সিদ্ধান্ত। অপর-পক্ষ বলেন, আর্ট জীবনের জন্য, জীবন-যাপনের জন্য, জীবনের সুখ-বর্ধনের জন্য; এক-কথায়, আর্ট সমাজের জন্য— মানব-কল্যাণের জন্য।

তর্কটা সকলেরই সুপরিচিত। শিল্প শুধু আনন্দই দেয় না, সেইসঙ্গে হয়তো আরো অনেক-কিছুই দেয়। শিক্ষার সহায়তা করে, সামাজিক কল্যাণ-সাধন করে, ক্ষেত্রবিশেষে শিল্পীকে অর্থ দেয়, সম্মান দেয়, সামাজিক সাফল্যের দরজা খুলে দেয়— অনেক-কিছুই করে, অনেক-কিছুই দেয়। এই দামগুলি কি শিল্পের শিল্পমূল্যকে বাড়িয়ে দেয়? এই দানগুলির জন্যই কি শিল্পের আদর? না, শিল্প যে-আনন্দ দেয়, সেই আনন্দটাই শিল্পের শেষ-কথা, একমাত্র কথা? শিল্পের কি এমন একটা নিজস্ব এলাকা আছে, যেখানে সে স্বাধীন, চূড়ান্তভাবে স্বাধীন?

মতভেদটা এইখানেই। একদল মনে করেন, শিল্পের নিজের এলাকায় শিল্পেরই একাধিপত্য, সেখানে তার কোনো শরিক নেই। তাঁরা বলেন, আনন্দই শিল্পের চূড়ান্ত কথা। শিল্প শিল্পের জন্যেই, অর্থাৎ আনন্দের জন্য। আর যা-কিছু, সবই তার শিল্পত্বের দিক থেকে অবান্তর। আনন্দমূল্য ছাড়া আর-কোনো মূল্যের কথা শিল্পের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক এবং অগ্রাহ্য। আনন্দ ছাড়া আর্টের আর-কোনো 'জন্য' নেই। অর্থাৎ কিনা, Art for Art's sake।

অনেকে এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, জীবনের কোনো মূল্যই বিচ্ছিন্ন বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অনেকে আবার আরো-একটু এগিয়ে গিয়ে বলেন, আর্টের আনন্দ যতই মূল্যবান হোক-না কেন, তা, জীবনের উচ্চতর এবং মহত্তর মূল্যের অধীন। সেই মহত্তর মূল্য কী? মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, মানবকল্যাণ। কেউ ছোট করে বলবেন, স্বদেশ ও স্বসমাজের কল্যাণ, কেউ বা বড় করে বলবেন, বিশ্বহিত। কল্যাণের রূপ নিয়ে, চরিত্র নিয়ে, আদর্শ নিয়ে দেশে-দেশে কালে-কালে নানান্ রকমের মতভেদ দেখতে পাই। সেই অনুযায়ী শিল্পের আদর্শ নিয়েও মতভেদ। কেউ বলবেন, শিল্প আদর্শ রাষ্ট্র-গঠনের সহায়তা করবে। কেউ বলবেন, শিল্পের লক্ষ্য ধর্ম, শিল্পের কাজ ধর্মের সহগামী এবং অনুগামী হয়ে চলা। কারো দৃষ্টি নীতির দিকে, কারো দৃষ্টি লোকশিক্ষায়। আবার কেউ-বা বলবেন, শিল্প মানুষের জীবনযুদ্ধের হাতিয়ার, তার কাজ সমাজের অগ্রগতি-বিধান।

অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের আনন্দ-মূল্যকেই সব থেকে বড় করে দেখেছেন। স্বক্ষেত্রে শিল্পের স্বাধিকারে তিনি বিশ্বাসী। শিল্প-বিচারে তিনি ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক মাপকাঠির প্রয়োগকে সংগত বলে বিবেচনা করেন নি। এই দিক থেকেই তিনি 'শিল্প শিল্পের জন্যই' মতবাদের সমর্থক।

এ পর্যন্ত কোনো জটিলতা নেই। কিন্তু উক্ত মতবাদটির কিছু নিহিতার্থও আছে। সেই নিহিতার্থ অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বচনটি যখন শ্লোগান হিসেবে উচ্চারিত হয়, তখন তার আসল জোর বাচ্যার্থের উপর নয়, আসল জোর এর বিবিধ অভিব্যঞ্জনার অনুরঞ্জিত নিহিতার্থসমূহের উপর।

তার প্রধান একটা হল এই যে, শিল্প একটা উচ্চাঙ্গের লীলা-বিলাস, একটা দায়হীন দায়িত্বহীন খেলা। এর ব্যঞ্জনা নানামুখী। শিল্পী সামাজিক জীব নন, তাঁর উপর সমাজের দাবি বা অধিকার

প্রতিকৃতি

নেই, তিনি উচ্চতর কোটির অধিবাসী। অথবা, শিল্প সমাজের থেকে বড়— জীবনের থেকেও বড়: সবার উপরে শিল্পই সত্য, তাহার উপরে নাই। কিংবা, শিল্পীর কাজ— একমাত্র কাজ সৌন্দর্যের সন্ধান। কুশ্রীতার পরিহার এবং জীবনে সেই বহুসন্ধানলব্ধ সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ স্থূল অর্থে যাকে জীবন-যাপন বলে তা নয়, সুকুমার সুললিত সুন্দর একটি জীবনশিল্পের— অথবা শিল্পময় জীবনের সংরচন। এমন জীবন যা এই কুৎসিত রূঢ় গন্ধময় বাস্তবের উর্ধ্বে, জীবনসংগ্রামের স্থূলতা যাকে স্পর্শ করতে পারে না।

অবনীন্দ্রনাথ এই নিহিতার্থসমূহের কোনোটিকে সমর্থন করেন নি। তিনি সৌন্দর্যের 'কাল্টে' বিশ্বাসী নন। তাঁর শিল্পতত্ত্ব পাশ্চাত্যদেশের ইস্থেটদের শিল্পতত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্।

এ কথা ঠিক, অবনীন্দ্রনাথ আনন্দকেই— শিল্পের নিজস্ব আনন্দকেই সর্বোচ্চ আসন দিয়েছেন। কিন্তু এই আনন্দের প্রশ্নটিও দৃশ্যত যত নিরীহ, কার্যত মোটেই তা নয়।

'শিল্পের জন্য শিল্প' অর্থ যদি হয় আনন্দের জন্য শিল্প, তো সে আনন্দ কার? স্রষ্টার না ভোক্তার? না, আর-কারো?

এ আনন্দ যদি ভোক্তার— খুবই হতে পারে— তা হলে প্রশ্ন ওঠে, এই ভোক্তা কি সমাজ-বহির্ভূত কেউ? একলা-মানুষের তো অস্তিত্বই নেই। ভোক্তার শিক্ষা-দীক্ষা অভ্যাস-সংস্কার, এর অনেকটাই তো সমাজের দান, সভ্যতার দান। ভোক্তার রুচি প্রবণতা, ভোক্তার সংস্কার, ভোক্তার বাসনা, সবের মধ্যেই সমাজের নিয়ন্ত্রণ আছে। শিল্পে ভোক্তার আনন্দকে চরম বললে, সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তার বাসনা-লোককে, ভোক্তার সংস্কার-লোককে স্বীকার করে নেওয়া হল, এবং সেই সূত্রে নানা দৃশ্য ও অদৃশ্য পথে— নানা সূক্ষ্ম ও স্থূল উপায়ের মধ্যে দিয়ে— সমাজের দাবিকে অনেকখানি পরিমাণে স্বীকার করে নেওয়া হল।

ভারতীয় রসবাদী শিল্পতত্ত্বে ভোক্তার আনন্দের উপরেই পুরো জোর দেওয়া হয়েছে। শিল্পের ক্ষেত্রে চরম রায় দেবার অধিকার ভোক্তার। শিল্পের লক্ষ্যও ভোক্তা, তাঁর দাবিই একমাত্র দাবি। ভোক্তার দাবিকে চরম বলে গ্রহণ করলে, শিল্পীর স্বাধীনতা অনেকখানি সীমিত হয়ে পড়ে। শিল্পের জন্য শিল্প, এই বচনটি শিল্পীর স্বাধীনতার দাবিরই একটি বিশিষ্ট শ্লোগান। এই শ্লোগান যাঁরা উচ্চারণ করেন, শিল্প জিনিসটাকে তাঁরা শিল্পীর দিক থেকেই দেখে অভ্যস্ত। ভোক্তা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। 'শিল্পের জন্য শিল্প', 'আনন্দের জন্য শিল্প', এই কথা যখন শিল্পীর নিজের মুখেই শ্লোগান রূপে উচ্চারিত হয়, তখন বুঝে নিতে হবে, এর লক্ষ্য ভোক্তা নয়, আনন্দ এখানে ভোক্তার আনন্দ নয়।

রসবাদী শিল্পতত্ত্বের ভোক্তা অবশ্য একান্তভাবেই আদর্শ-ভোক্তা। এমন ভোক্তা যিনি রসগ্রহণকালে বিষয়ান্তরের স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারেন, এমন ভোক্তা যিনি ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রসকে গ্রহণ করবার যোগ্যতা ধরেন। এই রকম বিশুদ্ধ ভোক্তা অনেকটা তত্ত্বগত প্রকল্পের মতো। কিন্তু সেই তত্ত্বগত প্রকল্পের ক্ষেত্রেও, সেই আদর্শায়িত ভোক্তার ক্ষেত্রেও তাঁর পূর্বসংস্কার, তাঁর বাসনালোক, তাঁর শিল্পচর্চা, তাঁর অনুশীলন, তাঁর উপর ঐতিহ্যগত শিল্পধারার প্রভাব— ভারতীয় রসবাদীরা এ-সবকেও একেবারে অগ্রাহ্য করেন নি। সিদ্ধরস নামক ব্যাপারটিকে তাঁরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। এই স্বীকৃতি পরোক্ষ-ভাবে সমাজকেই স্বীকৃতি দেওয়া।

রক্তমাংসের মানুষ কোনো সময়ই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একক নয়। তার রুচি প্রবণতা ইত্যাদির মধ্যে সমাজের প্রভাব সবসময়ই সক্রিয়। ভোক্তার দৃষ্টিকোণকে মূল্য দিলেও পরোক্ষভাবে শিল্পের সামাজিক ভূমিকাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, এবং সে ক্ষেত্রে শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে বিষয়ান্তরের স্পর্শশূন্য গণ্য করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

কিন্তু যদি শিল্পীর নিজের আনন্দই শিল্পের শেষ-কথা হয়? তা হলে সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দাবি অনেকখানি খণ্ডিত হয়ে যায়। অনেকে বলবেন, তখনো সমাজের দাবি কিছু পরিমাণে থেকেই যাচ্ছে, কেননা শিল্পী নিজেও সামাজিক জীব, শিল্পীর মনও সমাজের হাতে-গড়া বস্তু ছাড়া নয়। কথাটা হয়তো পুরোপুরি মিথ্যা নয়। তা হলেও, শিল্পীর মানস-গঠনের উপর সমাজের যত প্রভাবই থাক্-না কেন, আনন্দটা যদি শিল্পীর ব্যক্তিগত ব্যাপারই হয়, সে ক্ষেত্রে রচনার জন্ম শিল্পীকে কারো কাছে কৈফিয়ত দেবার দায়িত্ব অন্তত থাকে না।

রোমান্টিক ভাবানুষঙ্গে শিল্পের স্বাধিকারের শ্লোগানটি সাধারণত যেভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে তার ব্যঞ্জনাটা এই রকমই। আনন্দটা শিল্পীর নিজের, শিল্পের ব্যাপারে সমাজের কথা বলবার কোনো এক্তিয়ার নেই।

'শিল্পের জন্ম শিল্প'— এই বচনটিকে অবনীন্দ্রনাথ ঠিক এই ব্যঞ্জনায় গ্রহণ করতে পারবেন বলে মনে হয় না। কথাটিকে তিনি নিছক স্রষ্টার স্বাধিকারের শ্লোগান হিসেবে কখনোই ব্যবহার করেন নি। তাঁর মতে, শিল্পের আনন্দ স্রষ্টা ভোক্তা উভয়েরই আনন্দ। পৃথক্‌ভাবে হয়েও, শেষ পর্যন্ত পৃথক্‌ভাবে নয়, মিলিত ভাবে।

অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্যে সমাজের দাবি একাধিপত্য পায় নি, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃতও হয় নি। শিল্পদৃষ্টির প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের রচনায় অন্তর ও বাহিরের যে-ধরনে ডায়লেক্‌টিক যোগাযোগের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, প্রদর্শক এবং দর্শকের সম্বন্ধ, স্রষ্টা এবং ভোক্তার সম্বন্ধ— অথবা বলতে পারি, শিল্পী ও তাঁর সমাজের সম্বন্ধ, হুবহু না হলেও, অনেকটা যেন সেই জাতের। আমরা তো আগেই দেখেছি, অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্ব আসলে স্রষ্টা, ভোক্তা ও বিশ্ব— এই তিনের নিবিড় মিলনের শিল্পতত্ত্ব। এই মিলনের মধ্যে সমাজেরও স্থান আছে। বস্তুত সমাজ এই তিনের মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে।

শিল্পের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ বিশদ করে বেশি কিছু বলেন নি। কিন্তু এ-সম্পর্কে তিনি যে নিতান্ত অনবহিত ছিলেন, এমন মনে করার কারণ নেই। তাঁর রচনার অনেক জায়গাতেই এর কিছু-কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। দু-একটা তাঁর নিজের মুখ থেকেই শোনা যাক।—

> "জড়তা থেকে মুক্তি দেওয়া, আনন্দ ও ভোগের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া এবং মানুষকে ক্ষমতাবান করে তোলা রসসৃষ্টি এবং রূপসৃষ্টির বিষয়ে, এই হল শিল্পের কাজ।"[১]

—এটা নিশ্চয়ই একলা-শিল্পীর কেবল নিজের আনন্দের কথা নয়, এর ইঙ্গিত অনেক ব্যাপক।—

> "মানবজাতির পূর্বাপর সমস্ত সংস্কার বাদ দিয়ে কোনো রূপদক্ষ তো ফোটায় না কিছুই সেইজন্তেই একটি রূপ কিন্তু তার ইতিহাস তার খবর জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে আছে, কালকের ছবি মূর্তি কবিতা সে

১ 'শিল্পায়ণ', পৃ ১৫

ধারণাতীত কালের রহস্য সমস্ত বহন করছে।"[১]

শিল্পের উপর স্থান-কালের প্রভাব, সমাজ বা ধর্মের প্রভাব, এ-সব সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ একেবারে উদাসীন নন। শিল্পীর স্বাধীনতা যে আপেক্ষিক স্বাধীনতা, নিয়মবদ্ধ স্বাধীনতা এমন কথাও তিনি বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন। তাঁর উক্তি দিয়েই আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করা যাক।—

"...নিয়মের দ্বারা বিধৃত এই বিশ্বসৃষ্টি, তার মধ্যে শিল্পীও ধরা পড়বে না, ছাড়া থাকবে, চলবে যেমন খুশি প্রবৃত্তির বশে,— এ হতে পারলে না, বিশ্বপ্রকৃতি শিল্পীর মনকে ও কাজকে আলোছায়ার রঙের রেখার সুরের ছন্দের নিয়মে বাঁধলে, পাগলের মতো সে যা-তা খেয়াল নিয়ে থাকতে পারলে না। শুধু এই নয়, স্থান কাল সমাজ ধর্ম, এক কথায় এক মানুষের প্রবৃত্তি অন্য মানুষের প্রবৃত্তির সংস্পর্শে এসে সুনিয়ন্ত্রিত হতে থাকল, মন হরণের মনোহর রাস্তা শিল্পী এবং শিল্পরসিক দুয়ে মিলে প্রস্তুত করলে, ঠিক যেভাবে মাটি ও জল দুয়ে মিলে নদীর খাত প্রস্তুত হয় সেই ভাবের ক্রিয়াবশে শিল্পীর প্রবৃত্তি ও সাধারণের প্রবৃত্তির যোগাযোগ হল।"[২]

---

১ "রূপবিদ্যা", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ২৩১

২ "শিল্পবৃত্তি", 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', পৃ ১৫৭-৫৮

বাংলার ব্রত ও অবনীন্দ্রনাথ

বিনয় ঘোষ

মানুষের কামনার অনুষ্ঠান হল 'ব্রত'। কামনা ছাড়া মানুষ নেই, মানুষ ছাড়া কামনা নেই। বনবাসী নিষ্কাম সন্ন্যাসীরও কামনা আছে, ঐশী শক্তিলাভ ও ঈশ্বরদর্শনের কামনা। এই কামনা পূর্ণ করার জন্য সন্ন্যাসীকেও ব্রত করতে হয় এবং তাঁর সাধনা ও সাধনপদ্ধতি হল তাঁর ব্রত। মানুষই একমাত্র জীব যার কামনা আছে, আর কোনো জীবের কামনা নেই। মানুষের কামনা আছে বলেই সেই কামনা চরিতার্থ করার নানারকম কৌশলের কথা মানুষকে চিন্তা করতে হয়েছে, বিশেষ করে সেই সমস্ত কামনা যা সহজে ইচ্ছামতো পূর্ণ করা যায় না। প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পারমাণবিক যুগ পর্যন্ত লক্ষাধিক বছরের মানবসভ্যতার ইতিহাস হল এই কৌশল উদ্‌ভাবনের চিন্তাধারার ইতিহাস। মানববিজ্ঞানীরা সাধারণত এই চিন্তাধারাকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে থাকেন— একটি প্রাক্‌বৈজ্ঞানিক চিন্তা, যাকে ঐন্দ্রজালিক চিন্তা বলা হয়, আর-একটি বৈজ্ঞানিক চিন্তা। সাম্প্রতিক কালে কয়েকজন বিখ্যাত মানববিজ্ঞানী মানবচিন্তার রৈখিক ক্রমবিকাশ এবং তার এরকম পর্ববিভাগ অযৌক্তিক বলে প্রতিপন্ন করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ অবশ্য 'বাংলার ব্রত' অনুষ্ঠানের পর্যালোচনা করেছেন মানবচিন্তার এই ক্রমোন্নত পর্ববিভাগ মেনে নিয়ে, কিন্তু সে-বিষয় পরে আলোচ্য। বিস্ময়কর হল ব্রত সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। যেমন প্রখর তাঁর ইতিহাসবোধ, তেমনি প্রকৃত মানববিজ্ঞানীর মতো তাঁর সজাগ বিশ্লেষণধর্মী বুদ্ধি ও মন। শিল্পী ও বিজ্ঞানীর আশ্চর্য মিলন হয়েছে তাঁর মধ্যে।

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন "কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত"। ব্রতগুলিকে তিনি মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করেছেন— মেয়েলি ব্রত ও শাস্ত্রীয় ব্রত। মেয়েলি ব্রতকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে— নারীব্রত ও কুমারীব্রত :
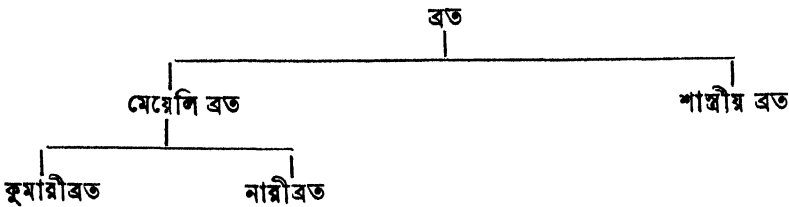
আদি অকৃত্রিম ব্রতের খানিকটা রূপ খুঁজে পাওয়া যায় মেয়েলি ব্রতের মধ্যে এবং শাস্ত্রীয় কৃত্রিমতা নারীব্রতের মধ্যে দেখা গেলেও কুমারীব্রতের মধ্যে দেখা যায় না। শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক ব্রতে কৃত্রিম আচার-অনুষ্ঠানের প্রাবল্য দেখা যায়। ব্রতের বিকাশের মধ্যে এই তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। এই তিনটি স্তরের মধ্যে দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটা আভাসও পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথ বাংলার ব্রত-অনুষ্ঠানের আলোচনার প্রারম্ভেই বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষের এই সামাজিক সাংস্কৃতিক

পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত করেছেন। তাতে ভারত-ইতিহাসের বহমান ধারার বিচার তিনি যে-দৃষ্টিতে করেছেন, তার সঙ্গে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টির যতটা মিল আছে, ঐতিহাসিকের গতানুগতিক দৃষ্টির সঙ্গে ততটা মিল নেই।

হিন্দু ধর্মের সুলভ সংস্করণ ব্রতমালা বিধানকে অবনীন্দ্রনাথ "চিনির ডেলার আকারে যেন কুইনাইন পিল" বলেছেন। তন্ত্রপুরাণকথা অনেকটা লৌকিক ব্রতের ছাঁচে ঢেলে রচনা করা হয়েছে সাধারণ মানুষের গলাধঃকরণের জন্য। কিন্তু ছাঁচটা ব্রতের মতো হলেও তার ভিতরের মালমশলায় এতরকমের ভেজাল আছে যে শাস্ত্রীয় ব্রতকে একটা কৃত্রিম জড়পদার্থ ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। কলের পুতুলের সঙ্গে জীবন্ত মানুষের যে প্রভেদ, শাস্ত্রীয় ব্রতের সঙ্গে খাঁটি মেয়েলি ব্রতেরও সেই রকম প্রভেদ। বিভিন্ন রকম ব্রতের রূপ বা গড়ন ও তার অনুষ্ঠানের আকারপ্রকার বিচার করলে শাস্ত্রীয় ও মেয়েলি ব্রতের এই পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শাস্ত্রীয় ব্রতের প্রথমে হল সামান্যকাণ্ড। 'ব্রতমালাবিধান' গ্রন্থে সামান্যকাণ্ড সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "যে কোনো ব্রত করিতে হইবে তৎসমুদায়েই সামান্যকাণ্ডের প্রয়োজন। সামান্যকাণ্ডে কথিত কার্য, সকল ব্রতেই করিতে হয়। কেবল স্ত্রী-প্রচলিত ব্রতে এসব ব্যাপার নাই।" এই সামান্যকাণ্ড কি? আচমন স্বস্তিবাচন কর্মারম্ভ সংকল্প ঘটস্থাপন পঞ্চ-গব্যশোধন শান্তিমন্ত্র সামান্যার্ঘ আসনশুদ্ধি ভূতশুদ্ধি মাতৃকা-ন্যাসাদি এবং বিশেষার্ঘস্থাপন। তার পর ভুজ্জি-উৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণকে দান-দক্ষিণা। সকলের শেষে, বিশেষ করে ভুজ্জি-উৎসর্গ ও দানদক্ষিণাদির পালা শেষ হলে, ব্রতে যাতে রুচি জন্মায় সেজন্য ব্রতকথা শোনা। ব্রত ও ব্রতকথাটা এখানে যে নেহাতই দায়সারা গোছের ব্যাপার তা সামান্যকাণ্ডের প্রলম্বিত আড়ম্বর-অনুষ্ঠান থেকে বোঝা যায়। 'ব্রতমালাবিধানে' শতাধিক ব্রতের সুদীর্ঘ তালিকা আছে। এ ছাড়া 'ব্রতমালা' 'ব্রতকথা' ও অন্যান্য ব্রতসংগ্রহ মিলিয়ে তালিকা তৈরি করলে ব্রতের সংখ্যা পাঁচ-শতাধিক হবার সম্ভাবনা। সমস্ত প্রচলিত ব্রত, বিশেষ করে মেয়েলি ব্রত, সংগৃহীত হয়েছে এমন কথাও বলা যায় না। শাস্ত্রীয় ব্রতের তালিকা প্রায় সম্পূর্ণই তৈরি করা যায়। এখানে তার প্রয়োজন নেই। শুধু শাস্ত্রীয় ব্রতের বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্য কয়েকটিমাত্র ব্রতের উল্লেখ করছি:

ধর্মঘটব্রত

প্রতিষ্ঠাকালে ব্রাহ্মণকে সদক্ষিণা ভোজ্য দান। ব্রতের ফল দীর্ঘায়ু, ঐশ্বর্য ও অচলা স্ত্রী লাভ, দেহাবসানে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি।

ফলসংক্রান্তিব্রত

মাসে মাসে বিভিন্ন ফল দান করলে (অবশ্য ব্রাহ্মণকে) বিভিন্ন ফল লাভ হয়। শেষে ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে স্বর্ণ দান করতে হয়। দেহান্তে বিষ্ণুলোক লাভ।

তালনবমীব্রত

এই ব্রতে তালফল দান করাই প্রধান কর্তব্য। খর্জুর নারিকেল রম্ভা দাড়িম্ব দিতে পারলে আরো ভালো। তার পর ব্রাহ্মণকে ও স্বামীকে পিষ্টক ভোজন করিয়ে নিজে খেতে হয়। ফলে লক্ষ্মী অচলা থাকেন, কদাচ বৈধব্য হয় না এবং ধনধান্যপুত্রলাভে সুখ হয়। স্বর্গবাসও সুনিশ্চিত।

বামনদ্বাদশীব্রত

ব্রাহ্মণকে গোরু মহিষ ও কাঞ্চনাদি দান করাই ব্রতের প্রধান অনুষ্ঠান। যত বেশি ও ঘন ঘন করা যায় ততই মঙ্গল, তা না হলে অমঙ্গল ও অশান্তি।

ষোলকলাব্রত

চৈত্রসংক্রান্তিতে এই ব্রত আরম্ভ করে পরে প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে একজন ব্রাহ্মণকে ষোলটি কলার একটি ছড়া দিতে হয়। শেষ অর্থাৎ দ্বাদশ সংক্রান্তিতে দ্বাদশজন ব্রাহ্মণকে এই রকম কলার ছড়া দিয়ে, ভোজন করিয়ে দক্ষিণা দিতে হয়। যাঁরা ধনিক তাঁরা যদি সোনার বা রুপোর কলার ছড়া গড়িয়ে ব্রাহ্মণকে দান করেন, তা হলে খুবই ভালো। তার ফলে তাদের ধনৈশ্বর্য বৃদ্ধির সীমা থাকবে না।

আদরসিংহাসনব্রত

চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে আরম্ভ। উত্তমরূপে আলপনা দিয়ে সিংহাসন প্রস্তুত করতে হয়। তার পর কোনো সধবা ব্রাহ্মণীকে আদর করে ডেকে এনে সেই সিংহাসনে বসিয়ে, নাপতিনী দিয়ে ভালোভাবে প্রসাধন করিয়ে, ভোজন করাতে হয়। গোটা বৈশাখমাস ধরে এই অনুষ্ঠান করতে হয়, অন্তত চার বছর। ব্রত শেষ করার সময় প্রথম যে ব্রাহ্মণীকে দিয়ে ব্রত উদ্‌যাপন করা হয়েছিল, তাকে ডেকে, পূজা করে পরিতোষরূপে ভোজন করিয়ে, অলংকার কাপড় শাঁখা সিঁদুর ইত্যাদিসহ দক্ষিণা দিতে হয়। এই ব্রত করলে নারীর ভাগ্যে স্বামী-পুত্রের আদর ভালোবাসা, সংসারের সুখশান্তি ধনলাভ ইত্যাদি কেউ খণ্ডাতে পারে না।

ব্রাহ্মণব্রত

মহাবিষুব সংক্রান্তিতে ব্রত আরম্ভ করে সমস্ত বৈশাখ মাস প্রতিদিন একজন ব্রাহ্মণকে পরিতোষরূপে ভোজন করিয়ে দক্ষিণা দিতে হয়। চার বছরে এই ব্রত শেষ হয়। যাঁকে দিয়ে ব্রত আরম্ভ করা হয়, সেই ব্রাহ্মণকে দিয়েই ব্রত শেষ করতে হয়। সমাপনকালে ব্রাহ্মণকে বস্ত্র অলংকার পাদুকা ছাতা প্রভৃতি দান করে, পর্যাপ্ত ভোজন করিয়ে দক্ষিণা দিতে হয়।

মিষ্টসংক্রান্তিব্রত

মহাবিষুব সংক্রান্তিতে ব্রত আরম্ভ করতে হয়। আরম্ভ করার সময় যজ্ঞোপবীত ও সন্দেশ ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। প্রত্যেক সংক্রান্তিতে এইভাবে একজন করে ব্রাহ্মণকে এইসব দিতে হয়। এক বছরে ব্রত শেষ হয়। প্রথম যে ব্রাহ্মণকে দিয়ে ব্রত আরম্ভ হয়, শেষ করার সময় তাকে নানাবিধ মিষ্টান্নভরা পাত্র, বস্ত্র আংটি উপবীত ছাতা জুতো ইত্যাদি দিয়ে, পেট পুরে ভোজন করিয়ে যথাসাধ্য দক্ষিণা দিতে হয়।

এরকম ব্রতের তালিকা আরো অনেক দীর্ঘ করা যায়। ব্রতগুলি 'ব্রতকথা' (কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন -সম্পাদিত) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। 'ব্রতমালাবিধানে'ও (বীরেশ্বর কাব্যতীর্থ -সংগৃহীত) এই ব্রতগুলির উল্লেখ আছে। এই ব্রতগুলি শাস্ত্রীয় ব্রতের অন্তর্ভুক্ত এবং অবনীন্দ্রনাথ এগুলিকে 'ব্রাহ্মণদের মনগড়া ব্রত' বলেছেন। দধিসংক্রান্তি কলাছড়া গুপ্তধন ঘৃতসংক্রান্তি দাড়িম্বসংক্রান্তি ধন-গছানো প্রভৃতি যে ব্রতগুলির

নাম তিনি ব্রাহ্মণদের মনগড়া ব্রত বলে উল্লেখ করেছেন, আমাদের পূর্বের তালিকাবদ্ধ ব্রতগুলির মধ্যেই সেগুলি ভিন্ননামে বা ছদ্মনামে আছে। বস্তুত শাস্ত্রীয় ব্রতের অধিকাংশই লৌকিক ব্রতের রূপান্তর বা গোত্রান্তর। অনেক শাস্ত্রীয় ব্রত অবশ্য লৌকিক ব্রতের অনুকরণে ব্রাহ্মণদের নিজেদের উদ্‌ভাবিত। রূপান্তর ও উদ্‌ভাবন দুইই যে ব্রাহ্মণশ্রেণী নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। "এগুলি কেবল নৈবিদ্য ও দক্ষিণার লোভ থেকে পূজারিরা সৃষ্টি করেছে। কলাছড়ায় ব্রাহ্মণকে কলা দান; সন্দেশের ভিতর পয়সা দিয়ে গুপ্তধন; ঘৃত দাড়িম্ব এই সব জিনিস বিশেষ-বিশেষ তিথিতে ব্রাহ্মণকে দিলে ভালো হয়— এই ব্রতগুলির মূল কথাটা এ ছাড়া আর-কিছুই নয়।" ব্রাহ্মণরা লৌকিকব্রতের স্থান ধীরে ধীরে কেমন করে দখল করেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে হলে বেশ বড় একটা ইতিহাস লিখতে হয়। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ তা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

যেমন আদরসিংহাসন ব্রত। ব্রতের বিবরণ আগে দিয়েছি। স্বামী-পুত্রের আদর-স্নেহ কামনা করে এই ব্রতের অনুষ্ঠান। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "স্বামীর সোহাগ কামনা করে এই মানুষ-পূজা মেয়েদের মধ্যে খুব চলছে দেখে পূজারি ব্রাহ্মণদের লোভ হল, অমনি তাঁরা এক ব্রত সৃষ্টি করলেন 'ব্রাহ্মণাদর'।" আমাদের পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণব্রত আর ব্রাহ্মণাদরব্রত একই। আদরসিংহাসন ব্রতের যে বিবরণ আমরা আগে দিয়েছি, তাতে 'ব্রাহ্মণী'কে ডেকে আদর-আপ্যায়ন করার কথা আছে। কাজেই ব্রাহ্মণপোষণের উদ্দেশ্যে সবসময় যে লৌকিক ব্রতের অনুরূপ একটি শাস্ত্রীয় ব্রত উদ্‌ভাবন করতে হয়েছে তা নয়। লৌকিক ব্রতের সাধারণ নায়ক-নায়িকার পরিবর্তে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে চুপিসাড়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের যা প্রাপ্য তা ব্রাহ্মণরা কৌশলে আদায় করে নিয়েছেন— কোনো সময় বিকল্প ব্রত রচনা করে, আবার কোনো সময় লৌকিক ব্রতকে ব্রাহ্মণকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে পরিণত করে। প্রধানত এই দুই পদ্ধতিতে লৌকিক ব্রতের ব্রাহ্মণীকরণ (Brabminisation) হয়েছে।

এই ব্রাহ্মণীকরণের পদ্ধতি সবিস্তারে বোঝাবার জন্য অবনীন্দ্রনাথ কুক্কুটীব্রতের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কুক্কুটীব্রত হল ছোটনাগপুরের পার্বত্য জাতির ব্রত, অর্থাৎ 'অহিন্দু' ব্রত। কুক্কুটী হল তাদের উপাস্য দেবী। ব্রতের ফল হল মৃতবৎসা দোষনিবারণ এবং বীর্যবান বহুসন্তানলাভ। এই ব্রতের ব্রাহ্মণীকরণ ও হিন্দুয়ানি গড়নের জন্য ব্রাহ্মণরা যা করেছেন তাতে দেখা যায় যে ব্রতকথার সঙ্গে অনুষ্ঠানের যোগ নেই এবং অনুষ্ঠানের সংকল্পের সঙ্গে ব্রতকথার কামনাবাসনার কোনো মিল নেই। ব্রতের ফলটি ঠিক রাখা হল, যেমন মৃতবৎসা দোষনিবারণ, বীর্যবান বহুসন্তানলাভ এবং দেহান্তে শিবলোকপ্রাপ্তি, কিন্তু পাছে অহিন্দু পাষণ্ডদের মতো সন্তান হয় তাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ব্রতের সংকল্পে 'পাষণ্ড ধর্মরোহিত্য পুত্রপৌত্র-ধনধান্য' ইত্যাদি কথা জুড়ে দিলেন। এইভাবে কোনোরকমে ব্রতের আচার-অনুষ্ঠানাদি গোঁজামিল দিয়ে মিলিয়ে তাঁরা ব্রতকথার উৎপত্তি কি করে ব্যাখ্যা করা যায় তাই নিয়ে চিন্তায় পড়লেন। ঠেকো দেবার মতো একটি পুরাণকথা রচনা করা হল। রাজা নহুষের রানী চন্দ্রমুখী এবং পুরোহিতপত্নী মালিকা একদিন দেখলেন সরযূতীরে উর্বশী মেনকা এঁরা হাতে আটটি সুতোর প্যাঁচ-দেওয়া ডোরা বেঁধে শিবপুজো করছেন। রানী প্রশ্ন করলে অপ্সরারা উত্তর দিলেন যে তাঁরা কুক্কুটীব্রত করছেন। ব্রতের নাম বলা হল কুক্কুটী, কিন্তু তাঁরা করছেন শিবপুজো। কাজেই গল্পের মধ্যে একটা ফাঁকি রয়ে গেল। মালিকা ও চন্দ্রমুখী ব্রতের অনুষ্ঠান জেনে নিলেন এবং সেটা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। এত করেও শেষ পর্যন্ত ব্রতের নাম

কেন 'কুক্কুটী' হল তারও একটা মীমাংসা করার দরকার হল এবং মীমাংসা হল এইভাবে। রানী ব্রত করতে ভুলে গেলেন, কিন্তু পুরোহিতপত্নী মালিকা ভুললেন না। ভোলার জন্য রানী চন্দ্রমুখী হলেন বানরী, এবং না-ভোলার জন্য মালিকা হলেন জাতিস্মরা কুক্কুটী। তার পর জন্মে জন্মে এই ব্রত করে মালিকা সুখে থাকেন, চন্দ্রমুখী দুঃখ পান। অবশেষে মালিকা ব্রত শেখালেন চন্দ্রমুখীকে এবং তার ফলে তাঁর দুঃখ দূর হল। কুক্কুটি জন্মেও মালিকা ব্রত করেছিলেন বলে এই ব্রতের নাম হল 'কুক্কুটীব্রত'। শাস্ত্রকারদের এই বানানো গল্পের মধ্যে এত গলদ যে দেখিয়ে-বুঝিয়ে না দিলেও তা ধরা যায়। ব্রত করেও কেন মালিকা কুক্কুটী হলেন এবং তাঁর কুক্কুটীত্বের সঙ্গে ব্রতবিস্মৃত চন্দ্রমুখীর বানরীত্বের তফাত কী তা বোঝা যায় না। এইরকম গোঁজামিলের পদ্ধতিতেই অধিকাংশ অনার্যব্রতের ব্রাহ্মণীকরণ বা আর্যীকরণ সম্ভব হয়েছে।

অবশ্য সর্বক্ষেত্রে যে এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছে তা নয়। কুক্কুটীব্রতের ক্ষেত্রে নামটি হুবহু বজায় রেখে যেমন তার অনুষ্ঠান ও উৎপত্তির কাহিনী একেবারে বদলে ফেলা হয়েছে, অন্যান্য অনেক ব্রতের ক্ষেত্রে তা করা হয় নি। কোথাও নামটি পুরোপুরি অথবা আধাআধি বদলে দিয়ে অনুষ্ঠান অনেকটা বজায় রাখা হয়েছে। আর্যীকরণের এই আপসপন্থী পদ্ধতি সাধারণত বহুজনপ্রিয় বড় বড় ব্রতের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে দেখা যায়। অর্থাৎ যে-ব্রতের অনুষ্ঠান প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে চলে, এবং যার গুরুত্বও খুব বেশি, সে ক্ষেত্রে প্রচলিত অনুষ্ঠানাদিতে শাস্ত্রকাররা বিশেষ হস্তক্ষেপ করেন নি, ব্রাহ্মণীকরণের জন্য কেবল কিছু শাস্ত্রীয় ভেজাল মিশিয়ে দিয়েছেন, তাও খুব সাবধানে। এরকম ব্রতের দৃষ্টান্ত হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ 'লক্ষ্মীব্রতে'র উল্লেখ করেছেন। এটি বাংলাদেশের হিন্দু মেয়েদের খুব বড় ব্রত। হেমন্তের শস্য আশ্বিনপূর্ণিমায় যখন ঘরে ওঠে তখন এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলতে থাকে, সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপূজা। অনুষ্ঠানের প্রধান পর্ব হল ঘরে চৌকিতে পিঁড়িতে ঘটে হাড়ি-কুঁড়িতে মেঝেয় উঠোনে দরজায় নানারকমের আলপনা আঁকা। আলপনার বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রধান হল লক্ষ্মীর পায়ের চিহ্ন, ধানছড়া লতাপাতা ইত্যাদি। লক্ষ্মীসরার পিঠে লাল নীল সবুজ হলদে রঙের লক্ষ্মীনারায়ণ লক্ষ্মীপেঁচা প্রভৃতির আলপনা। লক্ষ্মীর কাপড় সবুজ, গা হলদে, অধর পা ও করতল লাল। পটভূমিকার কারুকাজ নীল। উপাদানের মধ্যে শুয়োরের দাঁত, কড়ি, সিঁদুরের কৌটো, নারকেলের মালা, পিটুলির পুতুল, ডাব ও ফলমূল উল্লেখ্য। নারকেলের মালা হল কুবেরের মাথা, অর্থাৎ মাথার খুলি। শুয়োরের দাঁতটি কি? হয়তো দূর অতীতের কোনো আদিম কৌমের টোটেমের নিদর্শন। কড়িটা কি? ফলনশক্তির (fertility) প্রতীক। কড়ির ঝাঁপি ছাড়া লক্ষ্মীপূজা হয় না। পিটুলির পুতুলগুলি কি? দেশভেদে তিন রঙের তিনটি পুতুল, লক্ষ্মীনারায়ণের ও কুবেরের। এ কথা অবনীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শুধু কি তাই? পিটুলি ও মাটির পুতুল অতীতের নরবলির প্রতীক। দুর্গাপূজায় আজকাল বৈষ্ণবরীতিতে 'ভেজিটেবল' বলি দেওয়া হয় এবং তার সঙ্গে মাটির পুতুলও। এটা প্রাচীনকালের নরবলির বৈষ্ণবী রূপান্তর। নরবলিও ফলনশক্তিবৃদ্ধির অনুষ্ঠান (fertility-cult)।

এই সমস্তই হল অনার্য অব্রাহ্মণ অনুষ্ঠানের উপকরণ। আসলে লক্ষ্মী হলেন আদি অকৃত্রিম শস্যদেবী। কোথাও ধানের ছড়া কোথাও গমের ছড়া, কোথাও ভুট্টার ছড়া, যে-দেশের জীবনধারণের যা প্রধান শস্য, তারই পূজা লক্ষ্মীপূজা। নাম সব জায়গায় নিশ্চয় 'লক্ষ্মী' নয়, কিন্তু নানাদেশে নানা নামে এই

শস্যদেবীর উৎসব হয়ে থাকে। আমাদের দেশে যে 'অলক্ষ্মীবিদায়' নামে অলক্ষ্মীর পুজা হয়ে থাকে ঘরের বাইরে, তিনিই হলেন আসল অনার্য শস্যদেবী, যাকে 'অলক্ষ্মী' নাম দিয়ে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকাররা ঘরের বাইরে স্থান করে দিয়েছেন, কিন্তু পুজোটা ঘরের 'লক্ষ্মী'র আগে বাইরের 'অলক্ষ্মী'র প্রাপ্য। প্রাকৃতজনের দাবি এইভাবে শাস্ত্রকাররা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন এবং দুই পক্ষের মধ্যে এখানে একটা আপস হয়েছে দেখা যায়। এটা একটা সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও মিশ্রণের (যাকে সংস্কৃতিবিজ্ঞানীরা 'acculturation' বলেন) বিশেষ রীতি। বিদেশাগত কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যখন স্বদেশস্থ কোনো জাতি-জনগোষ্ঠীর সংঘাত বা সংস্পর্শ ঘটে, তখন উভয়ের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান হয় তাতে প্রথমে বাস্তব পার্থিব উপাদানেরই (material traits) আধিপত্য দেখা যায়। পরবর্তী স্তরে, অনেক ধীরে সুস্থে, আদর্শগত উপাদানের (ideological traits) মিলন-মিশ্রণ ঘটতে থাকে এবং এই মিলনে কখনও একপক্ষের (বিজয়ী হলেও) একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না (W. H. R Rivers)।* অর্থাৎ সংস্কৃতি বা তথাকথিত 'উন্নত' জাতি কোনো বিজিত 'অনুন্নত' জাতিকে একেবারে গ্রাস করে ফেলতে পারে না। আমাদের দেশে ভারতসংস্কৃতির ইতিহাসে শুধু যে আর্য-অনার্যের সংঘাতের যুগে তাই হয়েছে তা নয়, মুসলমানযুগে ও ইংরেজযুগেও তাই হয়েছে। বিজিতকে সংস্কৃতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গ্রাস করা যায় না বলে, মিশ্রসংস্কৃতির মধ্যে বিজয়ী-বিজিতের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি মিলেমিশে থাকে এবং বিজ্ঞানীদের চোখে তা পরিষ্কার ধরাও পড়ে। বাংলাদেশের ব্রতগুলিকে, বিশেষ করে শাস্ত্রীয় ব্রত ও নারীব্রতগুলিকে, এরকম আর্য-অনার্যের মিশ্রসংস্কৃতির নিদর্শন বলা যায়। কয়েকটি ব্রতের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে শাস্ত্রকাররা অনার্য কুমারীব্রতগুলিকে নানা কৌশলে আর্যীকরণের চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন এবং শাস্ত্রীয় উপাদান যথেষ্ট মিশিয়েও সেগুলিকে একেবারে ঢেলে সাজাতে বা আত্মসাৎ করতে পারেন নি। অনার্য অনুষ্ঠান তার মধ্যে অনেক থেকে গিয়েছে এবং তাই তাঁরা মানিয়ে নিয়েছেন।

লক্ষ্মীব্রতের কথাই ধরা যাক। বাংলাদেশের মেয়েরা প্রধানত তিনটি লক্ষ্মীব্রত করে থাকেন, প্রথম ফাল্গুন মাসে বীজবপনের আগে, দ্বিতীয় আশ্বিন মাসে যখন সোনার ফসল দেখা দেয় এবং তৃতীয় অঘ্রান মাসে যখন পাকাধান ঘরে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের নবান্ন উৎসব বা পৌষ উৎসবও এই নতুন ফসলের উৎসব। সবরকমের লক্ষ্মীব্রতই মূলত শস্যোৎসব। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন : "মেয়েরা যে-যে মাসে লক্ষ্মীব্রত করছে এবং অন্য দেশের লক্ষ্মীপুজোর সঙ্গে আমাদের পুজাটি মিলিয়ে দেখলে দেখি যে লক্ষ্মীব্রত হচ্ছে দেশের তিন প্রধান শস্য-উৎসব।" কিন্তু পূজারি ব্রাহ্মণরা লক্ষ্মীব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে যে শ্লোকটি মেয়েদের আবৃত্তি করান, তার সঙ্গে এই বিভিন্ন পর্বের শস্যোৎসবের কোনো দূরসম্পর্কও নেই। যেমন

লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রত সর্বব্রত সার,
এ ব্রত করিলে ঘোচে ভবের আঁধার।
বন্ধ্যা নারী পুত্র পায়, যায় সর্ব দুখ,
নির্ধনের ধন হয়, নিত্য বাড়ে সুখ।

কতকগুলি ধোঁয়াটে কথা— যেমন 'ভবের আঁধার'— এবং কতকগুলি সাধারণ আকাঙ্ক্ষা— যেমন 'বন্ধ্যা

---

* প্রবন্ধের শেষে 'গ্রন্থপঞ্জী' দ্রষ্টব্য।

নারী পুত্র পায়' 'নির্ধনের ধন হয়' ইত্যাদি আমদানি করে, অনার্য শস্যোৎসবের মূলোচ্ছেদ করার চেষ্টা হয়েছে। চেষ্টার ফলে আসল উৎসবের চেহারাটি চাপা পড়ে গেলেও ব্রতের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে তার স্মৃতিচিহ্ন অনেক রয়ে গিয়েছে। বিজিত জনগোষ্ঠীর উপর সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করার এটা একটা কৌশল বিশেষ। লোকসমাজের মানসক্ষেত্রে যুগে যুগে এইভাবে উপরের শাসকশ্রেণী তাঁদের চিন্তা ও আদর্শের বীজ বপন করেছেন।

যে-কোনো কারণেই হোক, শাস্ত্রকারদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে এরকম মেয়েলিব্রত এখনও অনেক আছে, যার মধ্যে ব্রতের নির্ভেজাল চেহারাটি দেখতে পাওয়া যায়। এরকম ব্রতের দৃষ্টান্ত হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ 'তোষলা' ব্রতের উল্লেখ করেছেন। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ দু'জায়গাতেই এই ব্রতের চলন আছে। অঘ্রানের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত পালন করা হয়। নতুন সরাতে পাতা বিছিয়ে তার উপর গোবরের গুলি রাখতে হয়, প্রত্যেক গুলিতে সিঁদুরের টিপ দিয়ে পাঁচগাছি করে দূর্বাঘাস গুঁজে দিতে হয়, এবং তার উপর নতুন আতপচালের তুঁষ ও কুঁড়ো দিয়ে, সরষে মুলো শিম ইত্যাদির ফুল ছড়িয়ে ব্রতের ছড়া বলতে হয়। ব্রতের উপকরণ ও নাম থেকে বোঝা যায় যে এটি চাষের ক্ষেত উর্বর করার ব্রত। প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে, সাজানো সরা হাতে নিয়ে ক্ষেতের দিকে মেয়েরা ব্রত করতে যায়। সেখানে তোষলার স্তুতি ও অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়ে ছড়া আবৃত্তি করা হয়। কোনো-কোনো অঞ্চলে মেয়েরা এলোচুলে এই ব্রত করে, উদ্দেশ্য হল ক্ষেতের ফসলও যেন (যেমন ধান) এলোচুলের মতো বড় হয়ে হাওয়ায় দুলতে থাকে। তার পর ব্রতের কামনা জানানো হয়, যেমন—'কোদাল-কাটা ধান পাব, গোয়াল-আলো গোরু পাব' ইত্যাদি। পৌষসংক্রান্তির দিন সকালে সূর্যোদয়ের আগে উঠে মেয়েরা ব্রত সাঙ্গ করে, একটি সরায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে মাথায় নিয়ে, অনেক সময় ব্রতের ছড়া গাইতে গাইতে সারি বেঁধে নদীতে স্নান করে তোষলা ভাসাতে যায়। তোষলার সরা নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে, চাষের দুই প্রধান সহায় সারমাটি ও সূর্যকে প্রণাম জানিয়ে মেয়েরা স্নান করতে নেমে নদীর জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে। এই হল মোটামুটি তোষলাব্রতের অনুষ্ঠান। এর মধ্যে শাস্ত্রীয় ভেজাল বিশেষ কিছু নেই, দেবস্তুতির মধ্যে একটু-আধটু হিন্দুয়ানির স্পর্শ ছাড়া।

এই তোষলাব্রতই হল পশ্চিমবঙ্গের উত্তররাঢ় অঞ্চলের—বিশেষ করে মেদিনীপুর বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার—'টুসু পরব'। স্থাপন, পালন, জাগরণ ও বিসর্জন— এই চারটি পর্বের ভিতর দিয়ে টুসু পরবের অনুষ্ঠান আরম্ভ ও শেষ হয়। অঘ্রান-সংক্রান্তিতে টুসুর প্রতিষ্ঠাকে 'স্থাপন' বলে। ঘরে ঘরে ঘটে ও সরায় ঠিক তোষলার মতো তুষকুঁড়ো গোবর ইত্যাদি দিয়ে 'টুসু' স্থাপন করা হয়। সারা পৌষমাস ধরে সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে গভীর রাত পর্যন্ত নাচ ও ছড়াগানের ভিতর দিয়ে যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে বলে 'পালন'। সংক্রান্তির আগের দিন সারারাত ধরে জেগে নাচগান করে টুসুর উৎসব হয়। একে বলে 'জাগরণ'। শেষে নদীতে টুসু ভাসানোকে বলে 'বিসর্জন'। রাঢ় অঞ্চলে এই টুসু পরব জাতীয় গণ-উৎসবের মতো জমকালো। মধ্যবিত্ত হিন্দুরা, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকেরা, টুসু পরবের অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেন না। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় একাধিকবার এই উৎসব দেখেছি— বাস্তবিকই দেখবার মতো উৎসব, কিন্তু কোথাও উৎসবটিকে বর্ণহিন্দুদের উৎসব বলে মনে হয় নি। মনে হয়েছে এই উৎসব এখানকার আদিম অধিবাসীদের

খাঁটি শস্যোৎসব। এই আদিম অধিবাসীদের বংশধরদেরই আমরা আজকাল 'তফসিলী জাতি ও উপজাতি' (Scheduled Castes and Tribes) বলি। উত্তররাঢ়ে এই তফসিলভুক্ত 'অনুন্নত' জাতির মধ্যে প্রধান হল সাঁওতাল ভূমিজ মাহাতো বাউরি প্রভৃতি। উত্তররাঢ়ের সীমান্ত পার হলে দেখা যায় যে সিংভূম হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চলে টুসু উৎসব প্রধানত সাঁওতালদেরই উৎসব, এবং আকারে-প্রকারে তা প্রায় আমাদের দুর্গোৎসবের মতো রঙিন ও আনন্দমুখর।

'তোষলা' ও 'টুসু' উৎসবের এই সাদৃশ্য আমাদের প্রতিপাদ্যের দিক থেকে বিশেষ লক্ষণীয়। প্রতিপাদ্য হল, মেয়েলি ব্রতগুলি মূলত অনার্য উৎসবের নিদর্শন, আমাদের দেশের বিভিন্ন আদিম জাতি-উপজাতির কামনা-বাসনা চরিতার্থতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একরকমের অনুষ্ঠান। ফসলের কামনাই মানুষের সবচেয়ে বড় কামনা, তাই এই শ্রেণীর উৎসব বা ব্রতের মধ্যে শস্যকামনার উৎসবই প্রধান দেখা যায়। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশে। এ সত্য নৃবিজ্ঞানসম্মত, এবং অবনীন্দ্রনাথও ব্রত সম্বন্ধে এই কথা বলতে চেয়েছেন। টুসু' ও 'তোষলা'র সাদৃশ্য বিচার করলে আজকের দিনেও তা পরিষ্কার বোঝা যায়। খাঁটি ব্রত সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন— "খাঁটি ব্রতের লক্ষণ মোটামুটি এই বলে নির্দেশ করা যেতে পারে: প্রথমত খাঁটি ব্রতে ব্রতীর কামনার সঙ্গে ব্রতের সমস্তটার পরিষ্কার সাদৃশ্য থাকা চাই। দ্বিতীয়ত, ব্রত হতে হলে একের কামনা অথবা একের মনের দোলা দশকে দুলিয়ে একটা ব্যাপার হয়ে নাচে গানে ভোজে ইত্যাদিতে অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার"। ব্রতের অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যের মধ্যে ব্রতীর কামনা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়, এ কথা ঠিক। খাঁটি ব্রতের এটা খুব বড় লক্ষণ। কিন্তু তার চাইতেও বড় লক্ষণ হল, ব্রত একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর (human collective) কামনা-চরিতার্থতার অনুষ্ঠান, কোনো একজন বা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অনুষ্ঠান নয়। অর্থাৎ ব্রত সমাজের এমন এক পর্বের অনুষ্ঠান যখন 'ব্যক্তি' বা তার বাসনা-কামনা সমাজ-জীবনে প্রধান হয়ে ওঠে নি। এই লক্ষণ থেকেও বোঝা যায় যে ব্রত-উৎসব সমাজের আদিস্তরের সংঘবদ্ধ অনুষ্ঠান, পরবর্তী 'সুসভ্য' স্তরের (প্রধানত মধ্যবিত্ত) ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান নয়। "এগুলি আমাদের পূর্বপুরুষেরও পূর্বেকার পুরুষদের; তখনকার যখন শাস্ত্র হয় নি, হিন্দুধর্ম বলে একটা ধর্মও ছিল না এবং যখন ছিল লোকেদের মধ্যে কতকগুলি অনুষ্ঠান যেগুলির নাম ব্রত" (অবনীন্দ্রনাথ)।

'টুসু' ও 'তোষলা' ব্রতের উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠানের সাদৃশ্যের মধ্যেও যে পার্থক্য ধরা পড়ে তা থেকে খাঁটি ব্রত ও শাস্ত্রমার্জিত ব্রতের মধ্যে তফাত কী তা বোঝা যায়। একটি বন্য জীবের সঙ্গে গৃহপালিত জীবের যে তফাত, টুসুর সঙ্গে তোষলারও প্রায় সেই তফাত। অথচ তোষলার মধ্যে মেয়েলি ব্রতের আসল রূপ অনেকটা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তা হলেও পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় অঞ্চলে তফসিল জন-গোষ্ঠীর মধ্যে টুসু উৎসবের যে সংঘবদ্ধ প্রাণস্ফূর্তি প্রকাশ পায়, নৃত্যগীতমুখর অনুষ্ঠানের মধ্যে, প্রধানত বর্ণহিন্দু মেয়েদের অনুষ্ঠিত তোষলা ব্রতের মধ্যে তা প্রকাশ পায় না। শাস্ত্র যেখানে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, সেখানে খিড়কি দিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে তার জাল বিস্তার করেছে। তার ফলে তোষলা ব্রত, খাঁটিত্ব সত্ত্বেও, ছা-পোষা মধ্যবিত্ত গৃহীর মার্জিত ব্রতে পরিণত হয়েছে। বস্তুত বর্ণহিন্দুসমাজের অধিকাংশ খাঁটি মেয়েলি ব্রত বা কুমারীব্রতের অবস্থা হয়েছে তাই। কাজেই খাঁটি ব্রতের প্রকৃত আনুষ্ঠানিক রূপ আজকালকার কুমারীব্রতের মধ্যেও সন্ধান করলে পাওয়া যাবে না। অকৃত্রিম ব্রতের উৎসসন্ধানে ইতিহাসের কালের দিক থেকে অনেক দূর অতীতে আমাদের যাত্রা করতে

হবে, এবং বর্তমানে তার অন্তত খানিকটা আভাস পেতে হলে আমাদের উর্ধ্বাধঃ স্তরবিন্যস্ত সমাজের অনেক নীচের স্তরের জনসমাজের মধ্যে নামতে হবে।

ব্রতের আচার-অনুষ্ঠানগুলি বিশ্লেষণ করলে তার ভিতর থেকে একটা সুবিন্যস্ত আকার ফুটে ওঠে। মনে হয়, ব্রতের গড়ন বেশ সুপরিকল্পিত, অথচ বাস্তবিকই কোনো পূর্বপরিকল্পনা তার মধ্যে থাকতে পারে না। অনুষ্ঠানগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিন্যস্ত হয়ে গিয়েছে ব্রতের মধ্যে। অবশ্য সমস্ত ব্রতের মধ্যে তা হয় নি। ছোটখাটো ব্রত, অথবা দু-একদিনের ব্রতের মধ্যে এই সুযোগ নেই। বড় বড় ব্রত, যে-গুলির বিস্তার আছে এবং যে-সমস্ত ব্রত ঘটনাবহুল, সেগুলির অনুষ্ঠানের মধ্যে সুন্দর একটি অঙ্গবিন্যাস দেখা যায়। যেমন ভাদুলি ব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত ইত্যাদি। চিত্র, নাট্য ও গীত— এই তিনটি শিল্পকলার সুসমন্বয় হয়েছে ব্রতের মধ্যে। কোনো শিল্পই এখানে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র নয়— না চিত্রশিল্প, না নাট্যশিল্প, না গীতশিল্প। চিত্রনাট্যগীতের ত্রিবেণীসংগম হল ব্রত। চিত্র হল বিভিন্ন ব্রতের বিচিত্র আলপনা, নাট্য হল আচার অনুষ্ঠানের ক্রিয়া বা অভিনয় এবং গীত হল ছড়া ও গান। নৃত্যকলাও এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে, যদি নৃত্যকে নাট্যের অন্তর্ভুক্ত না করা হয়। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন— "খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলি ঠিক কোনো দেবতার পুজো নয়। এর মধ্যে ধর্মাচরণ কতক, কতক উৎসব; কতক চিত্রকলা নাট্যকলা গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া, মানুষের ইচ্ছাকে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্য নৃত্য এমনি নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্মাচরণ করছে, এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা।"

ভাদুলিব্রত মাঘমণ্ডলব্রত ও শস্পাতাব্রত বা ভাঁজোর দৃষ্টান্ত দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ব্রতের এই চেহারাটি বুঝিয়েছেন। ভাদুলি ও মাঘমণ্ডল বেশ বড় ব্রত। ভাদুলিতে দেখা যায়, বর্ষায় দেশ ভেসে যাবার পর শরৎকাল আসছে, তারই উৎসব নানা দৃশ্যে ও গানে ফুটে উঠছে। মাঘমণ্ডলে দেখা যায়, শীতের কুয়াশা কেটে গিয়ে সূর্যের আলোয় ঝলমলে বসন্তের দিন আসছে, তারই উৎসব। দুটি উৎসবের মধ্যেই মানুষের কামনা-বাসনা নানারকমের নাট্যক্রিয়ার ভিতর দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তেমনি বর্ধমান অঞ্চলের মেয়েদের ভাদ্রমাসের শস্পাতা বা ভাঁজোর উৎসব। ভাদ্রমাসে ভাঁজোর উৎসব হয়। উৎসবের যে বর্ণনা দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ তা এই: ভাদ্রমাসের মন্থনষষ্ঠী থেকে আরম্ভ করে শুক্লাদ্বাদশীতে অনুষ্ঠানের শেষ। ষষ্ঠীর আগের দিন পঞ্চমীতে পাঁচ রকমের শস্য— মটর মুগ অড়র কলাই ছোলা— একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখা হয়, পরদিন ষষ্ঠী পুজোয় সেগুলি নৈবেদ্য দিয়ে বাকি শস্য সরষে ও ইঁদুরমাটির সঙ্গে মেখে নতুন একটা সরাতে রাখা হয়। দ্বাদশী পর্যন্ত প্রতিদিন স্নান করে মেয়েরা একটু একটু করে ঐ সরাতে জল দেয়। চার-পাঁচদিন পরে যখন সরাতে শস্যবীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে তখন জানা যায় যে সে-বছর প্রচুর শস্য হবে এবং মেয়েরা তখন উৎসাহের সঙ্গে সকলে মিলে শস্যোৎসবের আয়োজন করতে থাকে। দ্বাদশীতে উৎসব এবং এই দ্বাদশী হল ইন্দ্রদ্বাদশী। চাঁদের আলোয় উঠোনের মাঝখানে অনুষ্ঠান। সুন্দর করে নিকোনো বেদীর উপর ইন্দ্রের বজ্রচিহ্নযুক্ত আলপনা। কোথাও মাটির ইন্দ্রমূর্তিও থাকে। বেদীর চারি দিকে পাড়ার মেয়েরা সকলে জড়ো হয় এবং সরাগুলি সাজিয়ে দেয়। তার পর কুমারী মেয়েরা বেদীর চারি দিক ঘিরে হাত ধরাধরি করে নাচগান শুরু করে এবং বাদ্যকাররা বাজনা বাজিয়ে তাল দিতে

থাকে। অনেক সময় মেয়েরা দুই দলে ভাগ হয়ে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছড়া কাটাকাটি ও নাচগান করে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, নাচগানের এই ভঙ্গির সঙ্গে সাঁওতালী নৃত্যের সাদৃশ্য আছে।

পরিষ্কার বোঝা যায়, উৎসবটি মূলত শস্য-উৎসব এবং বীজ- বপন ও উদ্‌গমের উৎসব। বর্ধমানের এই ভাঁজো উৎসবের সঙ্গে পুরুলিয়া (মানভূম) অঞ্চলের 'করম' বা 'জাওয়া' ('জীয়ন' থেকে জাওয়া) পরবের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। প্রকৃতপক্ষে 'ভাঁজো' ও 'করম' একই শস্য-উৎসব, অর্থাৎ বীজ বপন ও উদ্‌গমের উৎসব। দুয়েরই অনুষ্ঠান ভাদ্রমাসে। 'করম' পুরুলিয়া-মানভূম থেকে আরম্ভ করে ছোটনাগপুর অঞ্চলের অধিকাংশ আদিবাসীদের খুব বড় পরব এবং প্রধানত মেয়েদেরই পরব। এই অঞ্চলের তফসিল জাতি-উপজাতিভুক্ত মেয়েরাই এই উৎসবের প্রধান নায়িকা। ভাদ্রমাসের প্রতিদিন সন্ধ্যায় মেয়েরা গ্রামে-গ্রামে পাড়ায়-পাড়ায় দলবদ্ধ হয়ে নাচগান করে এবং অনেক রাত পর্যন্ত নাচগান চলতে থাকে। সংক্রান্তির কয়েকদিন আগে মাটির সরাতে অথবা মালসায় মাটি ও বালি দিয়ে তার উপর বীজ ছড়ানো হয়। প্রতিদিন তাতে জল দেওয়া হয় যাতে সংক্রান্তির মধ্যেই বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। সংক্রান্তির দিন একটি করম গাছের ডাল কাছাকাছি জঙ্গল থেকে কেটে এনে গ্রামের একস্থানে মাটিতে পোঁতা হয়। এই ডালের চারি দিকে অঙ্কুরিত সরাগুলিকে সাজিয়ে দিয়ে মেয়েরা ঘিরে বসে। এই সরা-সাজানোকে 'জওয়ার ডালি সাজানো' বলে। গোল হয়ে ঘিরে বসে মেয়েরা ব্রতকথা শোনে। এই ব্রতকথার নাম 'ধরমু করমু ব্রতকথা।' ব্রতকথা শোনার পর মেয়েরা 'ইঁদ পরব' দেখতে যায়। 'ইঁদ পরব' বা ইন্দ্রধ্বজের উৎসব ভাদ্র সংক্রান্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়। করমের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এই ইঁদ পরব এই অঞ্চলের বেশ বড় অনুষ্ঠান এবং মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমা পর্যন্ত ইঁদ উৎসবের ব্যাপক বিস্তার দেখা যায়। করমের সঙ্গে 'ইঁদ' পরবের যে প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। ইন্দ্রধ্বজের উৎসব রাজার অভিষেক-উৎসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এবং রাজার (king) উদ্‌ভব হয়েছে সমাজে 'fertility magic' থেকে (Frazer)। অতএব 'করম' পরবের সঙ্গে 'ইঁদ' পরবের সংযোগ কোথায় তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না। এও দেখা যায় যে ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের মধ্যে, বিশেষ করে ওরাঁওদের মধ্যে, 'করম' পরবের লোকপ্রিয়তা অত্যধিক (Dalton)।

অবনীন্দ্রনাথ-বর্ণিত 'তোষলা' ও 'ভাঁজো' ব্রতের সঙ্গে আমরা যে উত্তররাঢ় অঞ্চলের 'টুসু' ও 'করম' পরবের বিবরণ দিয়েছি, তা থেকে খুব পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, ব্রতের উৎস কোথায়। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ নিজেই একাধিকবার তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর্য ও আর্যশাস্ত্রের অনেক আগেকার কাল থেকে যে ব্রতের এই অনুষ্ঠান-উৎসবগুলি চলে আসছে এবং এগুলি যে আমাদের 'পূর্বপুরুষদেরও পূর্বেকার পুরুষদের', যখন কোনো শাস্ত্র ছিল না, আমাদের হিন্দুধর্ম বলে কোনো ধর্মও হয় নি, তখন যে মানুষ নানারকমের কামনা-বাসনা চরিতার্থতার জন্য ব্রতের মতো বহুবিধ অনুষ্ঠান করত, এ কথাও তিনি বলেছেন। এইটাই হল ব্রত সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের আসল বক্তব্য। তোষলার সঙ্গে টুসুর এবং বর্ধমানের ভাঁজোর সঙ্গে পুরুলিয়া-মানভূম-ছোটনাগপুরের করম পরবের তুলনা করে দেখলে তাঁর প্রতিপাদ্য তিনি সহজেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কিন্তু হাতের কাছে দৃষ্টান্তগুলি না থাকার জন্য এবং চলতি ব্রত সংগ্রহে বাংলার সীমান্তের আদিবাসী-অঞ্চলের এই-সমস্ত পরবের কোনো বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না বলে তিনি এগুলির উল্লেখ করেন নি। আমাদের বাংলাদেশের প্রচলিত মেয়েলি ব্রতের পাপাপাশি আদিবাসীদের এরকম উৎসব-অনুষ্ঠানের

আরো অনেক বিবরণ দেওয়া যায়, কিন্তু এখানে তার প্রয়োজন নেই। দুটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। এই দৃষ্টান্ত থেকে আরো একটি প্রক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়, সেটি হল সংস্কৃতিবিজ্ঞানীরা যাকে 'Acculturation' বলেন, অর্থাৎ বিভিন্ন সংস্কৃতির সান্নিধ্যজনিত উপাদান-মিশ্রণের প্রক্রিয়া— সামাজিক পরিবেশের ভিন্নতা এবং কোনো বিশেষ সংস্কৃতির মূলস্তরগত দৃঢ়তা অনুযায়ী এই মিশ্রণের তারতম্য ঘটে। মানভূম থেকে বর্ধমান পর্যন্ত এসে 'করম' পরব ও 'ধরমু-করমু' ব্রতকথা হয়েছে ভাঁজো বা শস্পাতার ব্রত এবং ইঁদ পরব বা ইন্দ্রের উৎসব তাঁর বজ্রচিহ্নাঙ্কিত আলপনায় শেষ হয়েছে। বর্ধমান রাঢ়ের সীমানাভুক্ত, তাই দেখা যায় যে আসল ও আদি বীজবপন-উদ্‌গম উৎসবের উপাদানের বেশ কিছুটা অংশ— এমন-কি, fertility উৎসবের প্রতীকস্বরূপ রাজোৎসবের (দেবরাজ ইন্দ্রের) উপাদানটিও— ভাঁজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। রাঢ়ের সীমানা ছাড়িয়ে বাংলাদেশের আরও পুবদিকে গেলে দেখা যাবে যে এই ব্রত ও তার অনুষ্ঠান, মূল থেকে আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে, অনেক বেশি তরল ও কৃত্রিম হয়ে গিয়েছে। কাজেই মেয়েলি ব্রতের মধ্যেও ব্রত-অনুষ্ঠানের ঠিক আদিরূপটা খুঁজে পাওয়া যায় না, একটা অকৃত্রিম 'বন্য' রূপের 'গৃহপালিত' নম্র চেহারা দেখা যায় মাত্র।

ব্রত সম্বন্ধে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন। সেটি হল, ব্রতের অনুষ্ঠানের মধ্যে চিত্রকলা গীতকলা ও নাট্যকলার বিচিত্র সমাবেশ দেখা যায়। "বেশির ভাগ ব্রতে ছড়া হয় গীত কিম্বা নাট্য আকারে, আলপনা হয় প্রতিচ্ছবি নয় মণ্ডনরূপে থাকেই থাকে— কামনাকে সুব্যক্ত সুশোভন রূপে ব্যাখ্যা করতে। নাট্য, নাচ, গান এবং ছবি-আঁকা বলতে মানুষের স্বাধীন চেষ্টা বলে আমরা এখন বুঝি, তখন কিন্তু সেগুলো ব্রতের অঙ্গ বলেই ধরা হত" (অবনীন্দ্রনাথ)। এর পর আরো একটু স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন : "ব্রতের অনুষ্ঠান দেখা যাচ্ছে, এখন যাকে আমরা বলি ধর্মানুষ্ঠান, তা নয়। এখন যাকে বলি আমরা কলাকৌশল, তাও নয়। ধর্ম এবং শিল্প দুই-ই এখানে স্বাধীনভাবে আপনাদের দুটো দিক অবলম্বন করে চলছে না।" ধর্ম আর শিল্প কেমন করে স্বপ্রধান হয়ে উঠেছে তার আভাস দিয়েছেন তিনি গ্রামের রাখালদের 'কুলাই ঠাকুরের ব্রতে'র অনুষ্ঠান উল্লেখ করে। এই ব্রতে রাখালরা শুধু ছড়া আবৃত্তি করে না, বাঘ সাজে, জোরে জোরে হাঁটে, ঝপাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সজাগ হয়ে এদিক-ওদিক তাকায় এবং হাম্বুর হাম্বুর গর্জন করে। এর মধ্যে অনেকটাই নাটক, গানও আছে ছড়ার মধ্যে। পল্লীগ্রামের রাতের অন্ধকার, প্রদীপের আলো, ঝোপঝাড় ইত্যাদি দৃশ্যও আছে। বাঘের ভয় থেকে গ্রামে গোরুবাছুর যাতে রক্ষা পায় সেই কামনা করে রাখালরা বাঘ সেজে, বাঘের ছড়া গেয়ে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে। ক্রমে এই ব্রতের পরিবর্তন হয়ে বাঘের মূর্তিপুজোয় পরিণত হল, ধর্মের দিকটা গেল মূর্তিপুজোর দিকে এগিয়ে, শিল্পের দিকটা ক্রমে বহুরূপীর বাঘের অনুকৃতি থেকে আরম্ভ করে শিল্পের উচ্চতর ধাপের দিকে অগ্রসর হল। কুলাই ঠাকুরের ব্রতের এই পরিবর্তনধারা ব্যাখ্যা করে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "খাঁটি অবস্থায় দেখি ব্রতের দর্শক-প্রদর্শক নেই, যে নট সেই ব্রতী বা সেই চিত্রকর এবং গায়ক ; কিন্তু ব্রত থেকে যখন শিল্প বিচ্ছিন্ন তখন যে আলপনা দিচ্ছে, চিত্র করছে, অভিনয় করছে বা ছড়া বলছে কিংবা বাঘ সেজে কি আর-কিছু সেজে নৃত্য করছে সে যে ব্রতী হয়ে ধর্মকামনায় সেটা করছে এ হতেও পারে, নাও হতে পারে, বাঁধাবাঁধি কিছু নেই। ব্রতের বাঘ বহুরূপীর বাঘে যেমন দাঁড়ালো, অমনি সেখান থেকে

লাটসাহেবের ফটকের উপরের বাঘ পর্যন্ত হতে তার আর-কোনো বাধা রইল না।"

ব্রত সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ যে বক্তব্যটি এখানে পেশ করতে চেয়েছেন তা এই : মানুষের কামনা-বাসনা পরিপূরণের জন্য ব্রতের অনুষ্ঠান, কিন্তু কামনা-বাসনা বা তার অনুষ্ঠান কোনোটাই ব্যক্তির জন্য নয়, জন-গোষ্ঠীর জন্য, সমষ্টির জন্য, সমাজের জন্য। শাস্ত্রীয় ব্রত তো বটেই, নারীব্রতেরও অধিকাংশই ব্যক্তিগত-ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তার কারণ শাস্ত্রীয় ব্রত ও নারীব্রত সমাজের ক্রমবিকাশের এমন এক স্তরে রূপগ্রহণ করেছে যেখানে সমাজের গোষ্ঠীবোধ ও সমষ্টিচেতনা বিদীর্ণ করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের (class society) ব্যক্তিস্বার্থচিন্তা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এমন-কি, বর্তমানের যে কুমারীব্রতের মধ্যে আদিব্রতের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়, তাও শুধু আভাস মাত্র, এবং অনেকটাই তার ঘরপোষা ও আত্মকেন্দ্রিক মনের কামনার প্রকাশ। কাজেই এ কথা আমরা বলতে পারি যে শাস্ত্র ধর্ম ব্রাহ্মণ প্রভৃতি যে-সমাজের দান, সেই সমাজ হল শ্রেণীসমাজ, এবং প্রকৃত ব্রত ও তার অনুষ্ঠান হল শ্রেণীপূর্ব (pre-class) বা শ্রেণীহীন (class-less) সমাজের বিশেষ একটি গোষ্ঠী-উৎসব, যে-উৎসবের লক্ষ্য ব্যক্তিকামনার ঊর্ধ্বে গোষ্ঠী-কামনার চরিতার্থতা।

এখন প্রশ্ন হল, কেন এরকম ব্রত ও তার অনুষ্ঠান? কেন মানুষ তাদের কামনা পূরণের জন্য সকলে মিলে এরকম অনুষ্ঠান করছে? ফসলের প্রাচুর্যের জন্য fertilizer-এর কথা চিন্তা না করে আদিম মানুষ লক্ষ্মীব্রত, ধরম্-করম্ ব্রতের মতো অনুষ্ঠান করছে কেন? একটা চিন্তা ও বিশ্বাস থেকেই তো করছে! আমরা বলতে পারি, তাই করছে বটে, কিন্তু সেই চিন্তা ও সেই বিশ্বাস 'অ-বৈজ্ঞানিক', কোনো 'সুসভ্য' মানুষের চিন্তা নয়। কিন্তু এত সহজে এ কথার উত্তর দেওয়া যায় না। এ প্রশ্ন অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলার ব্রত' রচনায় উত্থাপন করেন নি, করার অবকাশও তাঁর আলোচনার মধ্যে ছিল না। তথাপি বিষয়টি প্রাসঙ্গিক বলে আমরা খুব অল্পকথায় কিছু বলব।

আদিম মানুষের এই ধরনের চিন্তাধারা ও কর্মানুষ্ঠানকে নৃবিজ্ঞানীরা 'ম্যাজিক' (magic) বলেছেন। ফ্রেজার (J. G. Frazer) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত *The Golden Bough : A Study in Magic and Religion* গ্রন্থে (কোষগ্রন্থতুল্য) আদিম মানবসমাজের আচার-অনুষ্ঠানের স্তূপাকার তথ্যসহযোগে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বিষয়টির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ। এখানে সেরকম আলোচনা অনাবশ্যক। ফ্রেজারের মূল বক্তব্য হল, আদিম মানুষ যে কালে আধুনিক মানুষের মতো বৈজ্ঞানিক চিন্তা করতে শেখে নি, সেকালে এরকম ঐন্দ্রজালিক চিন্তা করাই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। সাদৃশ্যবোধ (Similarity) ও সংস্পর্শবোধ (Contiguity) থেকে ঐন্দ্রজালিক চিন্তা এবং সেই চিন্তাপ্রসূত কর্মানুষ্ঠানের (যেমন 'ব্রত') উৎপত্তি। ফ্রেজার এই আদিম ঐন্দ্রজালিক চিন্তাধারাকে এইভাবে ভাগ করেছেন :

সমবেদী (Sympathetic) ম্যাজিক

সদৃশবিধান ম্যাজিক (Homoeopathic Magic)	সংস্পর্শজনিত ম্যাজিক (Contagious Magic)

'Like produces like' অর্থাৎ 'Law of Similarity' ব্রতের মতো অধিকাংশ আদিম উৎসব-

অনুষ্ঠানের ভিত্তি। ফ্রেজারের ভাষায় বলা যায়, হোমিওপ্যাথিক ম্যাজিকই বেশির ভাগ কামনা-উৎসবের প্রেরণা যোগায় এবং স্পর্শজাত (contagious) ম্যাজিক থেকে 'taboo' 'sorcery' 'witchcraft' ইত্যাদির উৎপত্তি। ছোট পুকুর কেটে জল ভর্তি করে অনুষ্ঠান করলে (পুণ্যিপুকুর ও বসুধারা ব্রত) প্রচুর বৃষ্টি হয়। কোথাও কোথাও মেঘের ডাক অনুকরণ করে উপর থেকে জল বর্ষণ করার অভিনয় করলে প্রচুর বৃষ্টি হয় বলে লোকের বিশ্বাস আছে। ফসলের ও ধনদৌলতের প্রাচুর্য কামনা করে যে ব্রতগুলির কথা আগে আমরা উল্লেখ করেছি, তা সবই প্রায় হোমিওপ্যাথিক ম্যাজিক বলা যায়। কিন্তু এই 'ম্যাজিক' বা ঐন্দ্রজালিক চিন্তার প্রকৃত গড়ন ও রূপ কি ? সত্যিই কি ম্যাজিক, ধর্ম (Religion), শিল্পকলা (Art), বিজ্ঞান (Science)—এইভাবে মানবচিন্তার রৈখিক ক্রমবিকাশ হয়েছে ?

এ-বিষয়ে মানববিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। এতাবৎকাল ফ্রেজারের বক্তব্যই মানবচিন্তার অগ্রগতির সূত্র বলে গৃহীত হয়েছে। সম্প্রতি লেভি-স্ট্রাউস (Levi-Strauss) ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা ফ্রেজারের এই ম্যাজিক-ধর্ম-বিজ্ঞানের রৈখিক ছক্ মানবচিন্তার ক্রমোন্মেষের ক্ষেত্রে অস্বীকার করেছেন। ফ্রেজার তাঁর যুক্তি অনুযায়ী ম্যাজিককে বলেছেন 'false science' ও 'abortive art' কারণ তাঁর বিশ্বাস হল, "magic is a spurious system of natural law as well as a fallacious guide of conduct।" অনেকটা ফেজারের মতো লেভি ব্রূল (Levy-Bruhl) তাঁর *Primitive Mentality* গ্রন্থে আদিম মানবচিন্তাকে বলেছেন 'pre-logical' ও 'mystic'— তার কারণ কার্যকারণ সূত্রবোধ তাদের নেই এবং তারা অতিপ্রাকৃতিক বা দৈব ঘটনায় বিশ্বাসী। কিন্তু আধুনিক মানুষের চিন্তা যুক্তিধর্মী নয়, এরকম কথা বললে আধুনিকপূর্ব যুগ পর্যন্ত মানবসভ্যতার অগ্রগতি এবং শিল্পকলাসংস্কৃতির আশ্চর্য বিকাশের কোনো যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা করা যায় না। আর 'যুক্তি' বস্তুটিই বা কী ! ঘোর যুক্তিবাদীর পক্ষেও 'যুক্তি' ও 'অ-যুক্তি'র মধ্যে সঠিক ভেদরেখা টানা মুশকিল। নিশ্ছিদ্র যুক্তিধারা কখন অতর্কিতে অ-যুক্তির চোরা পথে চলতে আরম্ভ করে তাও বলা যায় না। যুক্তি যদি উচ্চচিন্তার এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার মানদণ্ড হয় তা হলে আদিম ও আধুনিক মানুষের চিন্তার মধ্যে মৌল কোনো পার্থক্য নেই বলতে হয়। আদিম ও আধুনিক মানুষ উভয়েই এই অর্থে যুক্তিবাদী, তবে উভয়ের যুক্তির গড়নের (structure) মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। যুক্তিবাদিতা যদি বৈজ্ঞানিক চিন্তার আবশ্যিক উপাদান হয়, তা হলে আদিম ও আধুনিক উভয় মানুষকেই 'বৈজ্ঞানিক' বলতে বাধা কোথায় ? প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের জন্য, প্রকৃতির শক্তিকে ধীরে ধীরে আয়ত্তে আনার জন্য, প্রকৃতির রহস্যের কপাট একটি-একটি করে উদ্‌ঘাটন করার জন্য, যারা বহুরকমের বিচিত্র পাথুরে হাতিয়ার তৈরি করেছে— তার পর তামা ব্রোঞ্জ ও লোহার হাতিয়ার, বন্য জীবজন্তু পোষ মানিয়ে পালন করেছে খাদ্য উৎপাদনের জন্য, বন্য তৃণ ও বীজ থেকে খাদ্যশস্য ফলিয়েছে, কৃষিকাজ উদ্‌ভাবন করেছে, তারা আধুনিক টেকনোলজিস্ট-বৈজ্ঞানিকের চেয়ে কম কৃতী কিসে এবং তাদের চিন্তাধারা 'যুক্তিপূর্ব' ও বিজ্ঞানপূর্ব' স্তরের উপাদানে গঠিত, এমন কথা বলার যুক্তি কোথায় ? যুক্তি নেই এবং যে-কোনো যুক্তি এ ক্ষেত্রে অযৌক্তিক। 'ভাষা'র (language) কথা ভাবলে সবচেয়ে বেশি অবাক হতে হয় এবং ভাষার 'বিকাশ' ও 'বৈচিত্র্যে'র কথা ভাবলেও বোঝা যায় যে চিন্তার ক্ষেত্রে ম্যাজিক-ধর্ম-বিজ্ঞানের মতো সরল গতিরেখাশ্রয়ী বিকাশের যুক্তি কত অবাস্তব ও অযৌক্তিক। ভাষার আলোচনা তাই লেভি-স্ট্রাউসের *The Savage Mind* গ্রন্থের প্রাথমিক আলোচনা। মানবচিন্তার ম্যাজিক-ধর্ম-বিজ্ঞানের
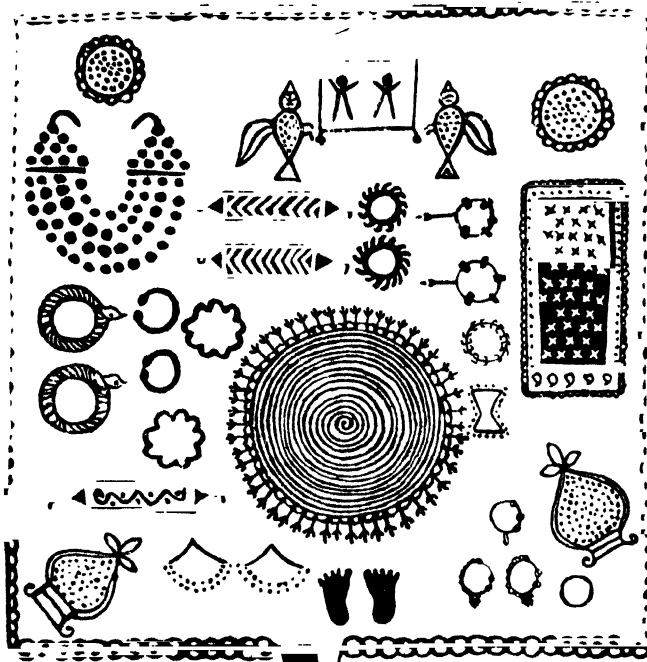
বসনভূষণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মীপেঁচা ইত্যাদি
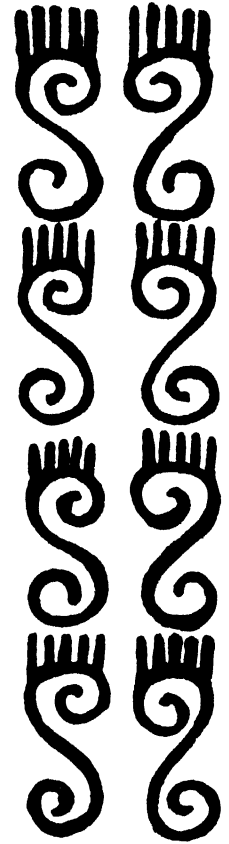
লক্ষ্মীর পদচিহ্ন

ব্রতের আলপনা
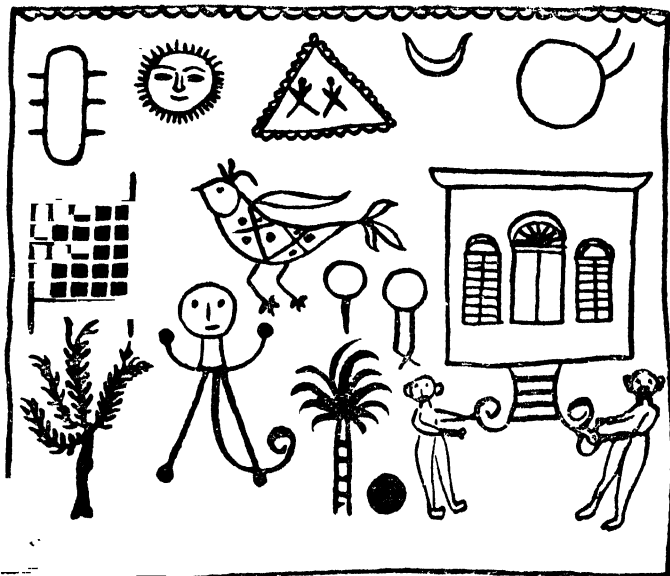
সেঁজুতি ব্রতের আলপনা
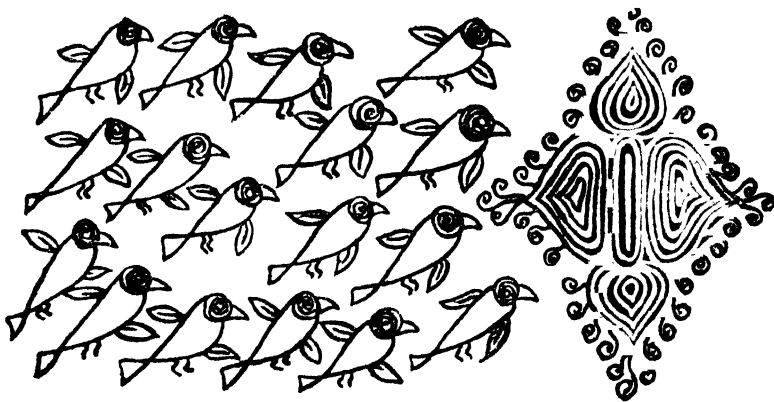
সুবচনীর হাঁস

ব্রতের আলপনা

সম্পর্ক সম্বন্ধে লেভি-স্ত্রাউস বলেছেন :

"The magical thought is not to be regarded as a beginning, a rudiment, a sketch, a part of a whole which has not yet materialized. It forms a well-articulated system, and in this respect independent of that other system which constitutes science.··· Both science and magic however require *the same sort of mental operations* and they differ not so much in kind as in the different types of phenomena to which they are applied." (Italics বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের)

ঐন্দ্রজালিক চিন্তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে জড়ানো ঠিক নয়, কারণ উভয়চিন্তারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে। তবে এ কথা মনে রাখা উচিত যে এই দুই চিন্তাধারারই মানসিক প্রক্রিয়া একরকম, তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আধুনিক বিজ্ঞানী যে-ভাবে চিন্তা করেন, আদিম ম্যাজিসিয়ানও ঠিক সেইভাবে চিন্তা করেন। লেভি-স্ত্রাউসের মূল বক্তব্য হল এই। কেবল যে-সমস্ত বিষয় ও ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তাঁর চিন্তা প্রয়োগ করেন, সেই-সমস্ত ক্ষেত্রে ম্যাজিসিয়ান তাঁর চিন্তা প্রয়োগ করেন না। চিন্তা-প্রয়োগের এই ক্ষেত্রের পার্থক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ; যদি এমন কথা বলা যায় যে আদিম ম্যাজিসিয়ানের চিন্তার ক্ষেত্র আজও তার 'মনোপলি' বা একচেটে এখতিয়ারভুক্ত, বৈজ্ঞানিক তার মধ্যে প্রবেশ করা তো দূরের কথা, ধারেকাছেও যেতে পারেন নি, তা হলে অত্যুক্তি হয় না। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যেমন চন্দ্রলোকে লোক পাঠানো হচ্ছে, অন্যান্য গ্রহেও পাঠাবার চেষ্টা হচ্ছে. তার জন্য বিজ্ঞানীরা তাঁদের চিন্তা প্রয়োগ করে স্পেসক্র্যাফ্‌টের অনেক উন্নতি করেছেন। আদিম মানুষের তো বটেই, সাধারণ মানুষের বা প্রাকৃতজনের চন্দ্রলোকে বা মঙ্গলগ্রহে গমন করার কোনো বাসনা ছিল না কোনোদিন, আজকেও নেই, ভবিষ্যতের কথা না বলাই ভালো। কিন্তু বৃষ্টি যদি না হয় তা হলে বৈজ্ঞানিকরা কী করতে পারেন? যতদূর জানি কিছুই না। হাওয়া-আফিস থেকে খবর আসতে পারে যে বৃষ্টি হবে, কিন্তু হাওয়াবিজ্ঞানের হিসেব গরমিল হয়ে বৃষ্টি নাও হতে পারে, এমন হামেশাই হয়। বৃষ্টির সময় বৃষ্টি যদি না হয়, পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়, তা হলে ফসল হবে না, এবং ফসল যদি না হয় তা হলে অনাহারে মানুষের মৃত্যু হবে। এ চিন্তা খুবই logical, এর মধ্যে pre-logical ব্যাপার কিছু নেই। এরকম জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান করতেই হয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তা আজও যেখানে অপারগ, ম্যাজিক্যাল চিন্তা সেখানে সক্রিয়। বর্ষণমুখী প্রকৃতির সমস্ত লক্ষণ অনুকরণ করে খানিকটা অভিনয়ের মতো করলে বৃষ্টি হতেও তো পারে! মধ্যে মধ্যে এরকম আনুষ্ঠানিক অভিনয়ের পর দেখা গিয়েছে বৃষ্টি হয়েছে। যুক্তিটা কাকতালীয় হতে পারে, কিন্তু তাতেই বা কি! বৈজ্ঞানিক হাওয়াঅফিসের খবরও তো অনেক সময় মিথ্যা হয়, কিন্তু তাতে কি প্রতিদিন খবর দেওয়া বন্ধ থাকে? থাকে না। তা যদি না থাকে, তা হলে অনুষ্ঠান-অভিনয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি নাও হতে পারে, কিন্তু তার জন্য অনুষ্ঠান অর্থহীন, এমন কথা আদিম মানুষের মনে হত না। ব্রত ও ব্রতের মতো অনুষ্ঠান-উৎসবের গভীর তাৎপর্য ও সার্থকতা এইখানে।

আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আদিম ও আধুনিক সকল মানুষই প্রচুর ফসল কামনা করে, কারণ

বাঁচার আগ্রহ সকলেরই সমান। বৈজ্ঞানিকরা ফসলের প্রাচুর্যের জন্য চাষের যন্ত্রপাতির উন্নতি করেছেন, নানারকমের রাসায়নিক সার তৈরি করেছেন এবং এগুলি প্রয়োগ করে সফলও হয়েছেন। কিন্তু যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক সার দিয়ে চাষ করে প্রচুর ফসলের সম্ভাবনা যখন দেখা দিল, তখন অতিবৃষ্টি বন্যা ও সাইক্লোনে সমস্ত ফসল ধ্বংস হয়ে গেল। না অতিবৃষ্টি, না বন্যা, না সাইক্লোন — কোনোটাই বৈজ্ঞানিকরা রোধ করতে পারলেন না। কাজেই বৈজ্ঞানিক চিন্তাতেও প্রচুর ফসলের গ্যারাণ্টি দেওয়া যায় না। শুধু বলা যায় যে এ ক্ষেত্রে ম্যাজিকের চেয়ে বিজ্ঞানের সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু চিন্তার রাজ্যে যখন প্রাচুর্যের কামনা জাগে, তখন ম্যাজিক বা ঐন্দ্রজালিক উৎসব-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। এখানে সাফল্য এক্ষেত্রে বেশি, এক্ষেত্রে কম। কিন্তু ম্যাজিক ও বিজ্ঞান দুরকম চিন্তারই এখানে অবকাশ আছে। তার চেয়েও বড় কথা, মানুষের কতরকমের কামনা-বাসনা, কত তার বৈচিত্র্য! বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটারিতে তার অধিকাংশই পূরণ করা সম্ভব নয়। অথচ কামনা পূর্ণ হোক সকলেই চায়। কাজেই ব্রত ও ব্রতের মতো অন্যান্য ঐন্দ্রজালিক উৎসব-অনুষ্ঠানের একটা প্রয়োজন মানুষের দিক থেকে থেকেই যায়। বিজ্ঞান সেখানে বিশেষ নাকগলাতে পারে না। তাই দেখা যায়, ঘোর বিজ্ঞানী তাবিজ-মাদুলি পরেন, এবং বিজ্ঞানী যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করলেও তাঁর স্ত্রী নিয়মিত লক্ষ্মীব্রত করেন। কারণ প্রাচুর্যের কামনা মেটে না কোনোদিন।

তা হলে অবনীন্দ্রনাথ যে বলেছেন, "ব্রতের মূলে কতখানি ধর্মপ্রেরণা, কতখানি-বা শিল্পকলার সৃষ্টির বেদনা রয়েছে তা বোঝা শক্ত", তা বোঝা বাস্তবিকই শক্ত, তবে কথাটা এইভাবে হয়তো না বললেও চলে। কারণ ধর্ম ও শিল্পকলা কোনোটাই ব্রতের মতো গোষ্ঠী-উৎসব-অনুষ্ঠানের (যাকে 'collective magic' বলা যেতে পারে) আগে নয়, অথবা তার প্রেরণাজাত নয়। 'ধর্ম' ঠিক 'ম্যাজিক' নয়, অথবা ধর্মানুষ্ঠান ও ম্যাজিকের মতো গোষ্ঠীবদ্ধ উৎসব-অনুষ্ঠানও এক নয়। ধর্মকে বলা যায় 'humanization of natural laws' এবং ম্যাজিককে বলা যায় 'naturalization of human actions', কিন্তু তা হলেও লেভি-স্ট্রাউস বলেছেন যে 'these are not alternatives or stages in an evolution', অর্থাৎ ম্যাজিক থেকে ধর্মের বিকাশ হয় নি এবং তার পর বিজ্ঞানের। বরং এ কথা বলা যেতে পারে যে 'ম্যাজিক' ও 'ধর্ম' কতকটা একরকমের চিন্তাধারার 'two components which are always given', অর্থাৎ 'There is no religion without magic any more than there is magic without at least a trace of religion' (Levi-Strauss)। এমন 'ধর্ম' নেই যার মধ্যে কিছুটা 'ম্যাজিক' নেই, এবং এমন 'ম্যাজিক' নেই যার মধ্যে 'ধর্মে'র সামান্য চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই হল 'ম্যাজিক' ও 'ধর্মে'র পার্থক্য ও সম্পর্ক। ব্রত-অনুষ্ঠান, বিশেষ করে কুমারীব্রত-অনুষ্ঠান, সবই প্রায় ম্যাজিকধর্মী বলে ম্যাজিক ও ধর্মের এই পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাকি থাকে 'ম্যাজিক-ধর্মে'র সঙ্গে শিল্পকলার সম্পর্ক। শিল্পকলার জন্য ম্যাজিক নয়, ম্যাজিকের জন্য শিল্পকলা অর্থাৎ ম্যাজিকের অনুষ্ঠান থেকে শিল্পকলার উৎপত্তি। আর্নস্ট ফিশার (Ernst Fischer) বলেছেন :

> This magic at the very root of human existence, creating a sense of powerlessness and at the same time a consciousness of power, a fear of nature together with the ability to control nature, is the very essence of all art.

ফিশার তাই বলেছেন যে 'the first toolmaker was the first artist' এবং 'Art was a magic tool'। ছবি নাচ গান অভিনয়, সব রকমের শিল্পকলা মানুষের গোষ্ঠীজীবনের প্রাণধারণের সংগ্রাম, শিকার চাষবাস প্রভৃতি খাদ্যোৎপাদন ক্রিয়া, প্রাকৃতিক বিপদ আপদ থেকে আত্মরক্ষা, জন্ম-মৃত্যুর ভয়-রহস্যভেদের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত। মানুষের কোনো ব্যক্তিগত (individual) বাসনা-কামনা ভয়-ভাবনা আনন্দ-বেদনা প্রকাশ বা চরিতার্থ করার জন্য শিল্পকলার উৎপত্তি হয় নি, মানবগোষ্ঠীর (human collective) কামনা-আনন্দ-বেদনা প্রকাশের জন্য হয়েছে। পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে সভ্যতার যত অগ্রগতি হয়েছে, উৎপাদন-পদ্ধতির (production-technique) যত উন্নতি হয়েছে, প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক যত জটিল ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের দূরত্ব ও শ্রেণী-ব্যবধান যত বেড়েছে, তত একক বিচ্ছিন্ন মানুষের কামনা-বেদনা-কল্পনা শিল্পকলার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। শিল্পের মধ্যে চিত্রকলা হল অনেকটা মানুষের আদি ভাষার (language) মতো। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ভাষার উৎপত্তি, এবং ভাষাই সমস্ত শিল্পের জনক ও আদিশিল্প। প্রাথমিক প্রাকৃতিক অনুকরণজাত শব্দঝংকার থেকে ভাষা ধীরে ধীরে ব্যঞ্জনাময় প্রতীকী শব্দসম্ভারে পরিণত হয়েছে। তেমনি হয়েছে চিত্রকলা, হিজিবিজি অর্ধস্ফুটরূপের আঁচড় থেকে বিমূর্ত প্রতীকী রূপায়ণ ও বাস্তব প্রতিরূপায়ণের পথে এগিয়ে গিয়েছে চিত্রকলা। বাংলার ব্রতের মধ্যে চিত্রকলার এক আদিরূপের আভাস আমরা পাই আলপনাতে।

আলপনার চিত্রগুণ ও রীতিবিচার করতে হলে আদিম চিত্রকলার (Primitive Art) পশ্চাদ্‌ভূমি, উপাদান ও রীতির বৈচিত্র্য ও বিকাশ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করতে হয়। কিন্তু ব্রতের আলোচনা যেখানে প্রধান সেখানে চিত্রকলার দিক থেকে আলপনার বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই বললেই হয়। অবনীন্দ্রনাথও আলপনার কলাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সামান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন মাত্র। আমরাও তাই এখানে খুব সংক্ষেপে এ-বিষয়ে কয়েকটি কথা বলে আলোচনা শেষ করব।

বাংলাদেশের ব্রতের আলপনার বৈচিত্র্য বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কত রকমের যে আলপনা তা হিসেব করে বলা যায় না। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, "তার হিসাব নিলে দেখা যায়, এখনকার আর্ট-স্কুলের ছাত্রদের চেয়ে ঢের বেশি জিনিস মেয়েরা না-শিখেই লিখছে এবং সৃষ্টিও করছে। শ্রেণীবিভাগ করলে আলপনার ফর্দটা এইরকম দাঁড়ায়: প্রথম, পদ্মগুলি। দ্বিতীয়, নানা লতামণ্ডন বা পাড়। তৃতীয়, গাছ ফুল পাতা ইত্যাদি। চতুর্থ, নদনদী ও পল্লীজীবনের দৃশ্য। পঞ্চম, পশুপক্ষী মাছ ও নানা জন্তু। ষষ্ঠ, চন্দ্রসূর্য, গ্রহনক্ষত্র। সপ্তম, আভরণ ও নানাপ্রকার আসবাব। অষ্টম, পিঁড়িচিত্র।" শ্রেণী-বিভাগ আরও দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই, অবনীন্দ্রনাথের এই তালিকাই যথেষ্ট।

আলপনাশিল্প হচ্ছে সমতলভিত্তিক চিত্রণ এবং চিত্রবিষয়ের পরিষ্কার রূপায়ণ। "একটা জিনিসের ঠিক চেহারাটি দু-চার টানে আঁকা যে কতখানি ক্ষমতার কাজ তা চিত্রকরমাত্রেই জানেন।" শিল্পকলার দিক থেকে অবনীন্দ্রনাথ আলপনাগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, "এক

রকম আলপনা— সেগুলি কেবল অক্ষর বা চিত্রমূর্তি— কতকটা ঈজিপ্তের চিত্রাক্ষরের মতো।” এই শ্রেণীর আলপনায় (যেমন সেঁজুতি ব্রতের আলপনা) ঘরবাড়ি চন্দ্রসূর্যগ্রহ গাছগাছড়া ইত্যাদির রূপায়ণ কতকটা মানচিত্রের মতো। অবনীন্দ্রনাথের মতে, এগুলিকে ঠিক শিল্পকর্ম বলা যায় না, কারণ যা ঠিক কামনা করা হচ্ছে তার চেয়ে বেশি বা অতিরিক্ত কিছু এর মধ্যে নেই। দ্বিতীয় আর-এক শ্রেণীর আলপনা আছে, যেমন কলমিলতা খুন্তিলতা শঙ্খলতা প্রভৃতি লতামণ্ডন অথবা নানা রকমের পিঁড়ি-চিত্র— যার মধ্যে কামনার গণ্ডির বাইরে শিল্পীমন স্বচ্ছন্দে ঘুরছে দেখা যায়, সেগুলিকে প্রকৃত শিল্প বলা যেতে পারে। এই প্রকৃত শিল্পকর্মের মধ্যে কারিগরি ও সুন্দর করবার ইচ্ছা প্রবল।

শিল্পকলার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে, এখানে যে-বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, তা নিয়ে কলারসিকদের মতামতের মিল আজ পর্যন্ত হয় নি। কাজেই কোনো মিল বা মীমাংসার কথা আমরা বলব না। কামনার সঠিক প্রতিচ্ছবির চেয়ে ‘অতিরিক্ত’ উপাদানটি কী যা মানচিত্রকে শিল্প করে তোলে? অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে সেটা ‘কারিগরি’ ও ‘সুন্দর’ করার ইচ্ছা। অর্থাৎ সেটা সম্পূর্ণ ‘টেকনিক’ ও ‘স্টাইলে’র পারদর্শিতার কথা। ফ্রান্‌জ বোয়াস (Franz Boas) বলেছেন :

> It is hardly possible to state objectively just where the line between artistic and pre-artistic forms should be drawn, because we cannot determine just where the aesthetic attitude sets in··· Since a perfect standard of form can be attained only in a highly developed and perfectly controlled technique, there must be an intimate relation between techinque and a feeling for beauty.

মানচিত্র ও সুন্দর শিল্পকর্মের মধ্যে পার্থক্য কেমনভাবে দেখা দিল, কখন আদিশিল্পীর মনে সৌন্দর্যবোধ জাগল, যার ফলে তিনি মানচিত্রকর থেকে চিত্রকর হয়ে উঠলেন, তা বলা খুবই মুশকিল। তবে ‘টেকনিক’ ও ‘সৌন্দর্যবোধ’— এই দু’য়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ শিল্পী যখন তাঁর শিল্প-কারিগরিতে কুশলী হয়ে উঠেছেন, তখনই ‘সুন্দর’ (beauty) তাঁর চোখের সামনে প্রতিভাত হয়েছে। ফিশার বলেছেন :

> Art in the dawn of humanity had little to do with ‘beauty’ and nothing at all to do with any aesthetic desire : it was a magic tool or weapon of the human collective in its struggle for survival.”

কোনো বিষয়বস্তুর নিখুঁত বাস্তব চিত্রণ কোনোকালেই আদিম শিল্পীর লক্ষ্য ছিল না। আদিম শিল্প মূলত প্রতীকী (symbolic) চিত্র। “Neither primitive man nor the child believes that the design or the figure he produces is actually an accurate picture of the object to be represented.” (Boas). কাজেই আদিম শিল্প, একেবারে আদিপ্রস্তর যুগের গুহাশিল্প থেকে আরম্ভ করে নব্যপ্রস্তর কৃষিযুগের ব্রতের মতো সব ম্যাজিক অনুষ্ঠানের চিত্র এবং অন্যান্য আদিম-শিল্প পর্যন্ত, সমস্তই প্রায় চিত্রাক্ষরের মতো, অর্থাৎ প্রতীকী শিল্প, যে-শিল্পের রূপ আদিম মানবসদৃশ শিশুর চিত্রাঙ্কণের মধ্যে দেখা যায়। আমাদের দেশের আদিবাসীদের মধ্যেও আজও এই চিত্রাক্ষরতুল্য

শিল্পের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। সাঁওতাল ওরাঁও মুণ্ডা হো শবর প্রভৃতি আদিবাসীদের শিল্পনিদর্শন দেখলে তা পরিষ্কার বোঝা যায় (Verrier Elwin)। ব্রতের আলপনাচিত্র এই আদিম চিত্রকলার সমগোত্র ও সমধর্মী।

আদিতে 'ম্যাজিক' বা ব্রতের মতো সব উৎসব-অনুষ্ঠান, তার পর সেই অনুষ্ঠানের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে সব রকমের শিল্পকলার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছে টেক্‌নিকের উন্নতির ফলে, টেক্‌নিকের উন্নতি সম্ভব হয়েছে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে। সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্য-তত্ত্বজ্ঞান ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করেছে, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে শিল্পীর অবস্থার পরিবর্তনের ফলে। "The original magic gradually became differentiated into religion, science, and art." (Fischer).

"খাঁটি অবস্থায় দেখি ব্রতের দর্শক-প্রদর্শক নেই, যে নট সেই ব্রতী বা সেই চিত্রকর এবং গায়ক।" অবনীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে ফিশারের কথার তাৎপর্যই প্রকাশ পেয়েছে। এইটাই ব্রতের প্রকৃত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য এবং সমস্ত শিল্পকলার আদিকথা।

গ্রন্থপঞ্জী

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'মেয়েলি ব্রত', ১৩০৩
বীরেশ্বর কাব্যতীর্থ, 'ব্রতমালা বিধান', ১৩১০
কাশীনাথ তর্কবাগীশ, 'ব্রতমালা', ১৭৮৯ শক
রামপ্রাণ গুপ্ত, 'ব্রতমালা', ১৩১৪
কিরণবালা দাসী, 'ব্রতকথা', ১৩১৭
নরেন্দ্র মজুমদার, 'ব্রতকথা', ১৩২২
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ব্রত-উদ্‌যাপন', ১৩২২
বিমলা দেবী, 'উত্তরবঙ্গের ব্রতকথা', ১৩৩৮
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'বাংলার পালপার্বণ', বিশ্বভারতী, ১৩৫৯
বিনয় ঘোষ, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', কলিকাতা, ১৯৫৭
J. G. Frazer, *The Golden Bough—A Study in Magic and Religion*, London, 1933
Lucien Levy-Bruhl, *Primitive Mentality*, London, 1923
Claude Levi-Strauss, *The Savage Mind*, London, 1966
Franz Boas, *Primitive Art*, New York, Dover, 1955
Ernst Fischer, *The Necessity of Art—A Marxist Approach*, Pelican, 1970
Verrier Elwin, *The Tribal Art of Middle India*, O. U. P., 1951

W. H. R. Rivers, *Psychology and Ethnology*, London, 1926, "The Contact of Peoples".

E. T. Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal*, Calcutta, 1872

A. C. Haddon, *Evolution in Art*, London, 1895

পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ

P. C. Bagchi, "Female Folk-rites in Bengal", *Man in India*, Vol II, 1922

Charulal Mukherji, "Bratas in Bengal", *Man in India*, Vol XXVI, 1926

Charulal Mukherji, "Bratas in Bengal", *Man in India*, Vol XXX, 1950

Benoy Ghose, "Cultural Profile of Purulia", *District Census Handbook 1961* : Purulia-

Tushar Chattopadhyay : "Tusu— a Folk Festival." *District Census Handbook 1961* : Purulia

ওকাকুরা তেন্‌শিন ও অবনীন্দ্রনাথ

সত্যজিৎ চৌধুরী

কাকুজো ওকাকুরা তেন্‌শিন[১] (১৮৬৩ - ১৯১৩) -এর মৃত্যু উপলক্ষে একটি ছোটো শোক-নিবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> আচার্য ওকাকুরার যখন প্রথম পরিচয় লাভ করি তখন আমি আমার সারা জীবনের কাজটুকু সবেমাত্র হাতে তুলিয়া লইয়াছি, আর সেই মহাপুরুষ তখন শিল্পজগতে তাঁর হাতের কাজ সার্থকতার সমাপ্তির মাঝে সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া জীবনে দীর্ঘ অবসর লাভ করিয়াছেন এবং ভারতমাতার শান্তিময় ক্রোড়ে বসিয়া Asia is one এই মহাসত্যের— এই বিরাট প্রেমের বেদধ্বনি প্রচার করিতেছেন।[২]

এই প্রথম পরিচয়ের কাল ১৯০২ খৃস্টাব্দ। উক্তিটি থেকে মনে হয় বুঝিবা ওকাকুরা তেন্‌শিন-এর তখন প্রচুর বয়স। তা নয় কিন্তু, ১৯০২ সালে তেন্‌শিন-এর বয়স ছিল ৩৯, অবনীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৩১। তেন্‌শিন দীর্ঘজীবী হন নি, মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ৩৯ বৎসর বয়সের একজন মানুষকে প্রবীণ বলা যায় না, তবুও ভারতীয় সংস্কৃতি-জগতে তিনি জ্ঞান ও কর্মে অর্জিত কীর্তির গৌরবে প্রবীণ মনীষীর মর্যাদায় গৃহীত হয়েছিলেন। ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে জাপান সম্পর্কে তখন অপার কৌতূহল জেগে উঠেছিল। এশীয় জাতিগুলির মধ্যে জাপান স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হল, য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে নিয়ে দ্রুত এক আধুনিক শক্তিমান জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করল। য়ুরোপের শোষণে জর্জর এশিয়ারই একটি জাতির এই স্বাতন্ত্র্যময় অভ্যুদয় খুব স্বাভাবিক ভাবে ভারতীয়দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। জাপান তার শক্তির অব্যর্থ প্রমাণ দিল রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-০৫) জয়ী হয়ে। এশিয়ার আত্মমর্যাদাবোধের প্রতীক হয়ে উঠল। তেন্‌শিন প্রথমবার ভারতে আসেন রুশ-জাপান যুদ্ধের দুই বৎসর আগে। স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে যাবার আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে তিনি ভারতে এসেছিলেন। স্বদেশে তখন তেন্‌শিন-এর খ্যাতি ও সম্মান কত ব্যাপ্ত ছিল তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায়[৩] আছে। বোম্বাই বন্দরে তেন্‌শিন একটি জাপানি জাহাজ দেখতে পেলেন। স্থির করলেন, সুরেন্দ্রনাথের জন্যে জাহাজ থেকে উৎকৃষ্ট জাপানি পানীয় 'সাকী' সংগ্রহ করে আনবেন। কাজটা আইনসিদ্ধ ছিল না। তাঁরা দুজনে জাহাজে উঠতেই জাহাজের অফিসারেরা জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে

[ওকাকুরা তেন্‌শিন সম্পর্কে জাপানি ভাষায় লেখা বইপত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীমতী ওয়াকাকো উস্থদা এবং শ্রীমাসাইয়ুকি উস্থদা। এঁদের আনুকূল্য ভিন্ন এ প্রবন্ধ তৈরি করা সম্ভব হত না। উস্থদা-দম্পতির কাছে আমি অশেষ ঋণে ঋণী। —লেখক]

১. Kakuzo Okakura নিজের লেখায় Ten-shin ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। তেন্=স্বর্গ, শিন্=হৃদয়; শব্দটির ব্যঞ্জনা : স্বর্গীয় হৃদয় যার এমন মানুষ। জাপানে তাঁকে তেন্‌শিন নামে উল্লেখ করাই রীতি।

২. "স্বর্গগত শ্রীমদ্ ওকাকুরা", ভারতী, কার্তিক ১৩২০ বঙ্গাব্দ, পৃ ৮০২-০৩

৩. Surendranath Tagore, "Kakuzo Okakura", *The Visva-Bharati Quarterly*, Vol. XI, Part II, August 1936.

সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাধা পেয়ে তেন্‌শিন শুধু নিজের নাম উচ্চারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের লোকেরা সম্ভ্রমে নুয়ে নিজেদের জানু স্পর্শ করে বলে উঠলেন, 'ঘাস, ঘাস, আমরা আপনার পায়ের নিচের ঘাস'। তেন্‌শিন-এর কাজের ক্ষেত্র ছিল বিশেষভাবে শিল্পের জগতে। কিন্তু জাপানের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের এবং প্রাচ্য সংস্কৃতির শ্রেয়ত্বের উদ্‌গাতা রূপে তিনি স্বদেশে জনজীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। উত্তরকালে যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে জাপান ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এগিয়েছে, তার সমাজমানসে নানামুখী পরিবর্তন ঘটে গেছে কিন্তু তিনি জাপানের জাতীয় জীবনে জাতীয় আত্মসম্মানবোধের প্রতিভূরূপে আজও সম্মানিত। তেন্‌শিন সম্পর্কে জাপানি জাতির অক্ষুণ্ণ আগ্রহের একটি প্রমাণ, এই ৭০-এর দশকে, ১৯৭৫-এর মধ্যে তাঁর উপরে অন্তত পাঁচখানি বই প্রকাশিত হয়েছে।

স্বজাতির আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলায় কৃতী এই মনীষী ভারতীয়দের মধ্যেও অনুরূপ চেতনার পরিচয় পাবেন আশা করে এসেছিলেন। প্রথম আলাপেই সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, What are you thinking of doing for your country. সুরেন্দ্রনাথ কোনো স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেন নি। ভারতীয়দের ভারতের জন্য কী করা উচিত সে-বিষয়ে কোনো সুষ্ঠু ধারণা তখনও এদেশে গড়ে ওঠে নি। স্বাধীন জাপানের অর্জিত শক্তি ও আত্মমর্যাদাবোধ এবং উপনিবেশ-ভারতের সদ্য ঘুম-ভাঙা মনের জড়তায় প্রভেদ অনেক। এখানকার যুবকদের অনির্দিষ্ট উত্তরে, নৈরাশ্যে তেন্‌শিন ব্যথিত হতেন। একান্ত আলোচনায় উদ্দীপনা জাগাতে চেষ্টা করতেন। সেকালের ভারতীয় রাজনৈতিক ভাবনায় বৈপ্লবিক ঝোঁকের মূলে তাঁর কিছু প্রভাব ছিল। ঔপনিবেশিক চাপের মধ্যেও যাঁরা চৈতন্যের স্বাবলম্বন অর্জনের চেষ্টা করছিলেন, শিল্প-সাহিত্যে যাঁরা নতুন পথের সন্ধান করছিলেন, ওকাকুরা তেন্‌শিন-এর স্থিতপ্রজ্ঞ মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বে তাঁরা গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। অবনীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ উক্তিতে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছিল মনে করা যায়, অবশ্য তাঁর কাছে অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার কারণ আরও গভীর। শিল্পীজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তি উত্তরণে অবনীন্দ্রনাথ তেন্‌শিন-এর এবং তাঁর মাধ্যমে জাপানি শিল্পীদের সাক্ষাৎ সাহায্য পেয়েছিলেন। অবনীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ এবং অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা সংগঠনের দিক থেকে এ-যোগাযোগ তাৎপর্যময়।

২

অবনীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় চিত্রকলার আধুনিকতা বিষয়ে আলোচনায় সকলেই ওকাকুরা তেন্‌শিন-এর প্রসঙ্গ তুলেছেন, কিন্তু এই-সব আলোচনায় সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। এমন-কি তাঁর ভারতে অবস্থানের সাল-তারিখ নিয়েও সংশয় রয়েছে। এখানে তাই সংক্ষেপে তাঁর জীবনের তথ্যপঞ্জী উল্লেখ করা সংগত মনে করি।

১৮৬৩ : জন্ম ইয়োকোহামা-য়। ইংরেজি বইপত্রে জন্মতারিখ দেখানো আছে ২৬ ডিসেম্বর ১৮৬২। জাপানি মতে তাঁর জন্ম বুংকিউ পঞ্জিকার দ্বিতীয় বর্ষের দ্বাদশতম মাসের ২৬ তারিখে। খৃস্টাব্দের হিসেবে তারিখটি দাঁড়ায় ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩।

১৮৭৭ : তোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ।

১৮৭৮ : মার্কিন অধ্যাপক আর্নস্ট ফেনোল্লোসা দর্শন পড়াবার কাজ নিয়ে তোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে

আসেন। ইনি জাপানের প্রাচীন শিল্পকলা সংরক্ষণের আন্দোলন প্রবর্তন করেন। তেন্‌শিন তাঁর সঙ্গে, পরিচিত হয়ে তাঁরই প্রভাবে প্রাচীন শিল্প বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন।

১৮৮০ : স্নাতক হন এবং জাপান সরকারের শিক্ষামন্ত্রকে চাকরি নেন।

১৮৮১ : জাপানি শিল্প বিষয়ে গবেষণায় অধ্যাপক ফেনোল্লোসাকে সাহায্য করেন এবং তাঁর রচনা অনুবাদ করেন।

১৮৮২-৮৪ : কিয়োতো ও নারা অঞ্চলে প্রাচীন মন্দির সম্পর্কে গবেষণা।

১৮৮৬ : শিল্পগবেষণা কমিটির সদস্যরূপে অধ্যাপক ফেনোল্লোসার সঙ্গে য়ুরোপ যাত্রা।

১৮৮৯ : তোকিয়ো বিজুৎসু গাক্কো নামক সরকারি শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং এখানে তেন্‌শিন রাজকীয় সংগ্রহশালার প্রধান পদে নিযুক্ত হন।

১৮৯০ : অধ্যাপক ফেনোল্লোসা আমেরিকায় ফিরে যান। তেন্‌শিন বিজুৎসু গাক্কো-র অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

১৮৯৩ : চীন যাত্রা।

১৮৯৭ : শিক্ষামন্ত্রকের কাছে শিল্পশিক্ষা সম্পর্কে নিজস্ব পরিকল্পনা উপস্থাপন।

১৮৯৮ : বিজুৎসু গাক্কো-র অধ্যক্ষপদ থেকে অপসারিত হন। কাউণ্ট রিউইচি কুকি-র সমর্থনে তেন্‌শিন ঐ পদ পেয়েছিলেন। কুকি-র পত্নী হাৎসুকো হোশিজাকির সঙ্গে তেন্‌শিন-এর প্রণয়ের কথা রাষ্ট্র হওয়ায় কুকি বিরূপ হন। এই প্রণয় ব্যাপার উপলক্ষ করে জাপানি শিল্পে পাশ্চাত্য রীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী উপদল তেন্‌শিনকে অপসারিত করেন। তেন্‌শিন শিল্পে নির্বিচারে পাশ্চাত্য আদর্শ মেনে নেবার বিরোধী ছিলেন। নীতিঘটিত বিরোধের চরম পর্যায়ে চারিত্রিক বিচ্যুতির অভিযোগ ওঠায় তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এই বৎসরেই ১৫ আগস্ট তারিখে তাঁর নিজস্ব শিল্পবিদ্যালয় নিপ্পোন্ বিজুৎসু-ইন প্রতিষ্ঠা করেন। [ইংরেজিতে 'নিপ্পোন্ বিজিৎসু-ইন্' লেখা হয়, জাপানিতে আছে 'নিপ্পোন্ বিজুৎসু-ইন']

১৯০১-০২ : ১৯০১-এর ২১ নভেম্বর ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। কলম্বো হয়ে মাদ্রাজে পৌছন ১৯০২-এর ১ জানুয়ারি সকাল ৮টায় এবং ৪ জানুয়ারি মাদ্রাজ থেকে রওনা হয়ে ৬ জানুয়ারি কলকাতায় পৌছন। ১৯০২-এর ৩০ অক্টোবর জাপানের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তেন্‌শিন-এর সঙ্গে হোরি নামে একজন ছাত্র এসেছিলেন। তাঁর দিনলিপি থেকে এই তারিখগুলি পাওয়া যায়।

১৯০৩ : ইয়োকোইয়ামা তাইকান্ (১৮৬৮-১৯৫৮) এবং হিশিদা শুন্‌সোকে (১৮৭৪-১৯১১) তেন্‌শিন ভারতে পাঠান। এঁরা দুজনেই বিজুৎসু গাক্কোর প্রথম স্নাতক এবং তেন্‌শিন-এর ছাত্র।

১৯০৪ : তাইকান, হিশিদা ও শিসুইকে সঙ্গে নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে বস্টন মিউজিয়মে যান এবং এপ্রিল মাসে বস্টন মিউজিয়মের চীন-জাপান বিভাগে উপদেষ্টা নিযুক্ত হন।

১৯০৬ : দ্বিতীয়বার চীন যাত্রা।

১৯১১ : হার্ভার্ড বিশ্ববিত্থালয় তাঁকে মাস্টার অব আর্টস ডিগ্রি দেন।

১৯১২ : ১৪ আগস্ট দ্বিতীয়বার ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। কলকাতায় পৌছন সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে। ১২ অক্টোবর বোম্বাই থেকে বস্টনের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

১৯১৩ : জাপানে ফিরে আসেন এবং ২ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

৩

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল অবধি য়ুরোপীয় কোনো জাতির পদানত হবার আশঙ্কায় জাপান সতর্কভাবে বাইরের সংস্রব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিল। বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে ১৮৫৩-৫৪ খৃস্টাব্দে ম্যাথু ক্যালব্রেইথ পেরী-র (Matthew Calbraith Perry. ১৭৯৪-১৮৫৮) নেতৃত্বে মার্কিন নৌবহরের জাপান অভিযানের ফলে। আমেরিকার সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূচনা হল, জাপানের বন্দর বিদেশী জাহাজের জন্যে খুলে দেওয়া হল। আমেরিকার মাধ্যমে আধুনিক য়ুরোপের সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জাপানে য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিত্থা আয়ত্ত করার সর্বাত্মক তৎপরতা জেগে উঠেছিল। 'জাপান-যাত্রী' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন :

> এশিয়ার মধ্যে জাপানই এই কথাটি একদিন হঠাৎ অনুভব করলে যে, য়ুরোপ যে-শক্তিতে পৃথিবীতে সর্বজয়ী হয়ে উঠেছে একমাত্র সেই শক্তির দ্বারাই তাকে ঠেকানো যায়। নইলে তার চাকার নিচে পড়তেই হবে এবং একবার পড়লে কোনো কালে আর ওঠবার উপায় থাকবে না।

ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার অন্য দেশগুলির ইতিহাস পাশ্চাত্য শক্তির আঘাতে গুঁড়িয়ে যাবারই ইতিহাস, ব্যতিক্রম একমাত্র জাপান। অদ্ভুত দক্ষতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাপান শক্তিমান হয়ে ওঠার পশ্চিমী কলাকৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছিল। এমনভাবে 'এক দৌড়ে দু তিন শো বছর হু হু করে পেরিয়ে' যেতে পেরেছিল বলেই য়ুরোপীয় কোনো শক্তির আঘাতে ভেঙে পড়ে নি, স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছে। জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থায়, জীবন যাপন পদ্ধতিতে য়ুরোপীয় প্রভাব তীব্র হওয়া সত্ত্বেও দেশীয় ভাষা-সাহিত্যের শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত বা বিপর্যস্ত হয় নি। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অধীন প্রাচ্য জাতিগুলির জীবনে পাশ্চাত্য প্রভাবের সঙ্গে স্বাধীন জাপানের জীবনে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় মৌলিক প্রভেদ ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রবণতার দোটানায় জাপানি সমাজও প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়েছিল, কিন্তু সেই দ্বন্দ্বে জাপানের জাতিগত আত্মসচেতনতা যত দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠেছিল, ভারতের মতো উপনিবেশে তা ছিল সম্পূর্ণ অভাবনীয়। এই দিক থেকে ওকাকুরা তেন্‌শিন-এর ব্যক্তিত্বের বিকাশ আধুনিক জাপানের আত্মসচেতনতা বিকাশের প্রতীকের মতো মনে হয়।

প্রচণ্ড সামাজিক আলোড়নের মধ্যেই তেন্‌শিন-এর জন্ম। তাঁর পিতা কান্‌এমোন্ ওকাকুরা ছিলেন বিত্তবান্ ব্যবসায়ী শ্রেণীর মানুষ। এই শ্রেণীর মানুষেরা সন্তানসন্ততিদের য়ুরোপীয় শিক্ষাদীক্ষায় পারদর্শী করে তুলতে চাইতেন। বালক বয়সে তেন্‌শিন পাশ্চাত্যমুখী শিক্ষার ভেতর দিয়ে বেড়ে ওঠেন, কিন্তু ইংরেজির সঙ্গে তিনি মাতৃভাষা এবং চীনা ভাষা চর্চা করেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য প্রভাবের উভয়বলতা তাঁর চরিত্রে ক্রমেই সমন্বয়ের দিকে এগিয়েছে। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি তোকিয়ো বিশ্ববিত্থালয়ে পড়তে যান। মার্কিনী অধ্যাপক আর্নস্ট ফেনোলোসা (Ernest Fenollosa)-র সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। এই সময়ে

পাশ্চাত্য রুচির আধিপত্যের ফলে পরম্পরাগত জাপানি শিল্প সম্পর্কে চরম উদাসীনতা দেখা দিয়েছিল। অধ্যাপক ফেনোল্লোসা ধর্মমন্দিরগুলির শিল্পসংগ্রহ ও অন্যান্য প্রাচীন শিল্পসম্পদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং রক্ষণাবেক্ষণের আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর গবেষণায় ও আন্দোলনে তেন্‌শিন প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। প্রাচীন শিল্পকলা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, ফেনোল্লোসার উৎসাহে ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে কান্‌গা-কাই নামে একটি সঙ্ঘ গড়ে ওঠে। কান্‌গা-কাই-এ তেন্‌শিন নেতৃভূমিকা গ্রহণ করেন। ফেনোল্লোসার সহকারিতায় এবং স্বাধীন গবেষণায় কঠোর পরিশ্রমী যুবক কাকুজো ওকাকুরা জাপানের শিল্পকলা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞের মর্যাদা অর্জন করেন। মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিজুৎসু গাক্কো-র শিল্পবিভাগের প্রধান পদে নিয়োগ এই স্বীকৃতিরই প্রমাণ। এর আগে য়ুরোপে গিয়ে তিনি পাশ্চাত্য শিল্পকলা সম্পর্কে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে চীন ভ্রমণের সুযোগ পেলেন। পূর্ব ও পশ্চিম দুই জগৎ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তেন্‌শিন আধুনিক জাপান বা সমগ্রভাবে এশীয় শিল্পের আধুনিক গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে গঠিত মতবাদ প্রচার ও আন্দোলন সংগঠনে নিজেকে উৎসর্গ করেন। জাপানের শিল্পীসমাজে এবং শিল্পসংক্রান্ত প্রশাসন কর্তৃপক্ষের চিন্তাভাবনায় পশ্চিমী রুচির হাওয়া দেশীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে যে উপেক্ষার মনোভাব জাগিয়ে তুলছিল, প্রখর ব্যক্তিত্ব-শক্তি নিয়ে তেন্‌শিন তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তাঁর চরিত্রে অনমনীয়তা ও সহজাত কর্তৃত্বশক্তির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল নাটকীয়তার গুণ। পোশাক-পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্যে, বাগ্মিতার অসাধারণত্বে তিনি তরুণ শিল্পীদের হৃদয়ে এক মর্যাদাবান্ উপাস্য ব্যক্তিত্ব রূপে সহজেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। বালক বয়স থেকে তিনি পারিবারিক পরিবেশে পশ্চিমী প্রভাবের মধ্যে থেকেও প্রাচ্য ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সশ্রদ্ধ ঔৎসুক্য পোষণ করতেন। কর্মজীবনে প্রবেশের পরে সেই দ্বিমুখী প্রবণতা ক্রমে সুনির্দিষ্ট সামঞ্জস্যে পরিণতি পায়। তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের এই বিশিষ্টতা সম্পর্কে এলিসি গ্রিল্লি মন্তব্য করেছেন :

> This dualism of interests formed the central threads in the fabric of his life, finally becoming firmly twisted into a single cord when, *precisely because he was able to absorb ancient ideas and express them in a new language*, he became a link between the cultures of two hemispheres.[১]

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১১ খৃস্টাব্দে 'মাস্টার অব আর্টস্' ডিগ্রি দেবার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর তাঁর মনীষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন :

> ...Okakura Kakuzo who has no equal in investigating thoroughly the depth of oriental arts, while willingly accepting the things which the west can give, and in studying intensely and respectfully the heritage of forefathers and who

১. Elise Grilli. "Okakura Kakuzo, A Biographical Sketch", Okakura, *The Book of Tea*, Tokyo 1957. উদ্ধৃতির ইটালিক বর্তমান লেখকের।

has a firm decision to preserve the traditional character of Japanese art.[১]

তেন্‌শিন-এর ব্যক্তিত্ব ও মনীষা সম্পর্কে এই মূল্যায়ন যথার্থ। প্রাচ্য সংস্কৃতির শ্রেয়ত্ব বিষয়ে তাঁর অভিমানের কথাই বিশেষভাবে বিদিত, আমাদের এখানে তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে তাঁকে প্রাচীন প্রাচ্য শিল্পের পুনরুজ্জীবনবাদী রূপে দেখা হয়েছে। কিন্তু কখনোই তিনি আধুনিক কালের দাবি উপেক্ষা করে শিল্পের বিকাশধারা অবরুদ্ধ করতে চান নি। অবসিত অতীতের শিল্পভাষা আধুনিক মনের প্রকাশ মাধ্যম হতে পারে— এমন কোনো তত্ত্ব প্রতিপাদন করেন নি। জাপানের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের দ্বন্দ্বসংঘাতের কাল। বিশেষ করে শিল্পকলায় আধুনিকতার আন্দোলনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় বিগত শতাব্দীর শেষ দুই দশক। জাপান বুঝেছিল শুধু ধার নিয়ে পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হওয়া যাবে না, ওদের বিদ্যা নিজেদের জীবনের জমিতে ফলবান্ করে তুলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, 'প্রথম কিছুদিন ওরা য়ুরোপ থেকে শিক্ষকদের দল ভাড়া করে এনেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের প্রায় সমস্ত সরিয়ে দিয়ে, হালে এবং দাঁড়ে নিজেরাই বসে গেছে— কেবল পালটা এমন আড় করে ধরেছে যাতে পশ্চিমের হাওয়া তার উপরে পুরো এসে লাগে'। ওকাকুরা তেন্‌শিন এই যুগেরই মানুষ। জাপানি জীবনের ক্ষেত্রে আধুনিকতা আত্তীকরণের যে উদ্যোগ চলছিল, শিল্পকলায় সেই প্রক্রিয়া ফলবান্ করে তোলার দায়িত্ব তিনি নিজের উপরে তুলে নিয়েছিলেন। জাতীয় স্বভাব থেকে বিচ্যুত না হয়ে আন্তর্জাতিক আধুনিকতা আয়ত্ত করার আন্দোলন জাগানো তেন্‌শিন-এর বিশিষ্ট কীর্তি। যাঁরা নির্বিচারে পশ্চিমী আঙ্গিক অনুসরণের পরামর্শ দিচ্ছিলেন, কেবল ধার করা বিদ্যার উপরে নির্ভর করতে শেখাচ্ছিলেন, তিনি তাঁদের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। আত্মবিস্মৃতির ঘোর কাটাবার জন্যেই তাঁকে বিশদভাবে জাপানের পরম্পরাগত শিল্পকলার ঐশ্বর্যের দিক, গোটা প্রাচ্য শিল্পের বিশিষ্ট নৈপুণ্যের দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়েছিল। কঠোর পরিশ্রমে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে নিজেদের গৌরবময় ঐতিহ্যের মর্ম শিল্পীসমাজের সামনে তুলে ধরতে হয়েছিল। এই লড়াইয়ের সময়ে মোহগ্রস্তদের আঘাত করার জন্যে তিনি কখনো কখনো এমনও বলেছেন যে জাপানি শিল্পের সমুন্নতির জন্যে য়ুরোপ থেকে কিছুই শিখবার নেই। তেন্‌শিন-এর ব্যক্তিত্বের ছিল আপসহীনতা, যুযুধান স্বভাব। নিজের প্রত্যয়গত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পথের বাধা বিধ্বস্ত করা তাঁর লক্ষ ছিল। ফলত পশ্চিমী আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণকামী শিল্পপ্রশাসকদের আঘাত করার উদ্দেশ্যে এক সময়ে উগ্রভাবে প্রাচ্য শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। মতাদর্শের বিরোধ থেকে ক্রমে তাঁর সঙ্গে অনেকের ব্যক্তিগত শত্রুতার সম্পর্ক দাঁড়ায় এবং এজন্যে তাঁকে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল। কিন্তু এ-সব উগ্রমত ও অতিকৃতি সাময়িক আদর্শ সংঘাতেরই ফল।

১৮৯৮ খৃস্টাব্দে তেন্‌শিন সরকারি প্রতিষ্ঠান বিজুৎসু গাক্কো থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলেন এবং ঐ বৎসরই স্বাধীন ভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে নিপ্পোন্ বিজুৎসু-ইন্ প্রতিষ্ঠা করলেন। হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও বিজুৎসু গাক্কো-য় তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি বেরিয়ে

১. Boston Museum Bulletin, Vol. IX, No. 52 (Aug 1911), পৃ ২৯। দ্র. ইয়াসুকো হোরিয়োকা-র "ওকাকুরা তেন্‌শিন" (তোকিয়ো ১৯৭৪)

আসায় প্রায় অর্ধেক ছাত্র তাঁর সঙ্গে নতুন প্রতিষ্ঠানে চলে আসেন। নিপ্পোন্ বিজুৎস্থ-ইন্ বিদ্যালয় সম্পর্কে নিম্নের মন্তব্য দুটিতে জাপানের শিল্পকলায় আধুনিকতা বিষয়ে তাঁর পরিণত ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে :

> নিপ্পোন্ বিজুৎস্থ-ইন্ সিউডো-ক্লাসিক্যাল এবং সিউডো-য়ুরোপীয়ান— দুটি প্রবণতাকেই প্রতিরোধ করার প্রয়াস। শিল্প জাতীয় জীবনের অঙ্গ। ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হলে শিক্ষা বিপথে চালিত হবে। আমরা নিজেদের প্রাচীনপন্থী বা আধুনিকপন্থী কোনো নামেই জাহির করতে চাই না।[১]

> According to this school, freedom is the greatest privilege of an artist, but *freedom always in the sense of evolutional self-development.* Art is neither the ideal nor the real. Imitation, whether of nature, of the old masters, or above all of self, is suicidal to the realisation of individuality, which rejoices always to play an original part, be it of tragedy or comedy, in the grand drama of life, of man, and of nature.[২]

তেন্‌শিন বুঝেছিলেন, আধুনিক কালের বাতাবরণে বাস করে কোনো শিল্পীর পক্ষে ক্ল্যাসিক্যাল শিল্প সৃজন সম্ভব নয়, তেমন চেষ্টারও কোনো উপযোগিতা নেই। অন্যপক্ষে জাপানি রক্তের উত্তরাধিকার অস্বীকার করে জাপানি শিল্পীর পক্ষে য়ুরোপীয় হয়ে ওঠার চেষ্টা একান্ত বিফল প্রয়াস। তিনি মনে করেন, আধুনিক কোনো শিল্পীর প্রধান চেষ্টা হওয়া উচিত আত্মসচেতন ভাবে নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা, কোনো প্রথা বা প্রভাবের বশীভূত না হওয়া এবং নিজের কাজের পক্ষে সহায়ক সুযোগগুলির উপরে কর্তৃত্ব অর্জন করা। স্বাধীন আত্মবিকাশের ক্ষমতা শিল্পীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, realisation of individuality বা ব্যক্তিস্বরূপের সত্তা পরিচয় উপলব্ধি আধুনিক শিল্পীর মূল লক্ষ হওয়া উচিত। এই আধুনিক ব্যক্তিস্বরূপ তার দেশ-কালের বাতাবরণ থেকে পুষ্টির, বিকাশের উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। সত্তার আশ্রয় বর্তমান— ইতিহাসের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো মায়াদ্বীপ নয়, অতীত পরম্পরারই উদ্‌বর্তনে আবির্ভূত এবং এই আধুনিক পর্ব আবার উদ্‌বর্তিত হবে ভবিষ্যতের দিকে। তেন্‌শিন সচেতন গ্রহণ-বর্জন ও আবির্ভূত সুযোগের সদ্‌ব্যবহারের উপরে গুরুত্ব দিতেন। নিজের উত্তরাধিকারের স্বরূপ চেনো এবং অতীতে অর্জিত সেই কীর্তির স্তর অতিক্রম করে নিজের প্রতিভা বিকাশের সূত্রে জাতীয় শিল্পের আধুনিক স্তর গঠন করে তোলো— ছাত্র ও শিষ্যদের তিনি এই উপদেশ দিয়েছেন। তরুণ শিল্পীরা কোনো অন্ধ মতবাদের প্রভাবে যাতে ভেসে না যায়, বিচারশীল আত্মস্থ ব্যক্তিত্বশক্তি ও আত্মমর্যাদাবোধ যাতে তারা অর্জন করতে পারে, স্বজাতির ও বৃহত্তর প্রাচ্যের ঐতিহ্য এবং আন্তর্জাতিক আধুনিকতার উৎস থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান নির্বাচনের বোধ যাতে তাদের মধ্যে জেগে ওঠে— শিক্ষক হিসাবে তেন্‌শিন এই

---

১. ইয়াহকো হোরিয়োকা-র 'ওকাকুরা তেন্‌শিন' (তোকিয়ো ১৯৭৪) গ্রন্থে "Catalogue for Exhibition of Japanse Paintings on silk and lacquer, works of the Bijutsuin", Cambridge Mss. 1904 থেকে অনূদিত।

২. Kakuzo Okakura, *The Ideals of the East*, Calcutta 1973, P. 184. উদ্‌ধৃতির ইটালিক বর্তমান লেখকের।

দায়িত্ব বহন করেছেন। তরুণদের নিবিড় মমতায় কাছে টেনে নিয়ে স্বাধীন আত্মবিকাশে তাদের সাহায্য করেছেন।

বিজুৎস্থ গাক্কো এবং নিপ্পোন বিজুৎস্থ-ইন্-এ তেন্‌শিন-এর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে যাঁরা কাজ শেখেন তাঁদেরই হাতের কাজে জাপানি শিল্পকলার নবজাগরণ সম্ভব হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ভারতে বিশেষভাবে পরিচিত এবং অবনীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ ইয়াকোইয়ামা তাইকান ও হিশিদা শুন্‌সো ছিলেন বিজুৎস্থ গাক্কোর প্রথমবারের স্নাতক। এঁরা দুজন এবং অপর খ্যাতিমান আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শিমোমুরা কান্‌জান্ (১৮৭৩-১৯৩০), কিমুরা বুজান, সেইগো কোগেৎস্থ (১৮৭৩-১৯১২)— সকলেই তেন্‌শিন-এর নির্দেশে নিবিষ্ট চর্চায় পরম্পরাগত জাতীয় চিত্রকলা থেকে গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি রূপায়ণের কলা-কৌশল আয়ত্ত করেন। এই চর্চায় এঁরা জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমিতে নিজেদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় আঙ্গিকও অনুশীলন করেন। প্রয়োজনে সচেতনভাবে য়ুরোপীয় আঙ্গিক ব্যবহারে তেন্‌শিন তাঁর ছাত্রদের কখনো বাধা দেন নি। তিনি শিল্পকলায় সিদ্ধি অর্জনকে যুদ্ধজয়ের তুল্য মনে করতেন। এ যুদ্ধে প্রকরণ মাত্রেই একান্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্র। শিল্পের ক্ষেত্রে অ্যানাটমি ও পার্সপেক্‌টিভ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে তিনি সামরিক বাহিনীর রসদের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, নিজের স্বভাবে অবিচল থেকে জাপানি শিল্প এই জ্ঞান আত্মস্থ করে নিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় স্বভাব থেকে পাওয়া শিল্পীর বিশিষ্ট মানসভঙ্গির গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর বলেছেন, সব উদ্যোগের আড়ালে থাকবে অবিচল, আত্মস্থ শিল্পীব্যক্তি, তিনিই এ-যুদ্ধে সার্বভৌম সেনাপতি। তেন্‌শিন-এর ভাষায় :

> Technique is thus but the weapon of the artistic warfare; scientific knowledge of anatomy and perspective, the commissariat that sustains the army. These Japanese art may safely accept from the West, without detracting from its own nature. Ideals in turn, are the modes in which the artistic mind moves, a plan of campaign which the nature of the country imposes on war. Within and behind them lies always the sovereign-general, immovable and self-contained, nodding peace or destruction from his brow.[১]

উৎপাদন, প্রশাসন ও সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর জাপান কার্যকর ভাবে য়ুরোপীয় অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করে নিয়েছিল। সেই বৈষয়িক সিদ্ধি তেন্‌শিন-এর উপমার ভিত্তি।

৪

স্বদেশের শিল্পসংস্কৃতি জগতে কৃতকীর্তি ওকাকুরা তেন্‌শিনকে পূর্বোক্ত শোক-নিবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'জাপানের কালরাত্রির অন্ধকার পটে···তমোহন্ত্রী পূর্ণচন্দ্র'। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়ে

---

১. পূর্বোক্তসূত্র, পৃ. 185, । ইটালিক্ বর্তমান লেখকের ।

অবনীন্দ্রনাথেরও চারপাশে নিবিড় তমিস্রা ঘনিয়ে ছিল। শিক্ষানবিশির পাট চুকিয়ে দিয়ে তিনি এর বছর সাতেক আগে থেকে স্বাধীন পরীক্ষায় আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার নতুন ভাষা উদ্ভাবনের চেষ্টা শুরু করেন। ১৮৯৫-৯৭-এর মধ্যে রাধাকৃষ্ণ লীলার বিষয় নিয়ে ২০ খানি ছবির একটি সিরিজ শেষ হল। কৃষ্ণলীলা আবহমান ভারতীয় চিত্রকলায় বহু ব্যবহৃত, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের হাতের ছবিতে ঠিক পুরোনো আমলের প্রকাশরীতি অনুসৃত হয় নি। পশ্চিমী আঙ্গিকে অর্জিত দক্ষতায় এবং পশ্চিমী মিনিয়েচর পেইন্টিং-এর প্রভাবে এই সিরিজের ছবিতে এমন অভিনবত্ব ফুটল যাতে একে কিছুতে রাজপুত বা কাংড়া কলমের অনুবর্তন বলা যায় না। এ ছবির বিশিষ্টতা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'দেশী বা বিদেশী ছবির করণকৌশল এতদিন অচল অবস্থায় ছিল, অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে দুই কৌশল একত্রিত হয়ে সক্রিয় হয়ে উঠল'।[১] তাঁর নিজেরই উত্তরকালীন সৃষ্টির তুলনায় এ-ছবি দুর্বল রচনা, তবুও এই কাজগুলিতে তিনি প্রথম নিজের শক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হন। বোঝেন ভারতীয় উত্তরাধিকার অর্জন তাঁর কাম্য হলেও কোনো প্রথার কাছে মনের এবং হাতের স্বাধীনতা বাঁধা দেবার প্রয়োজন নেই। ১৮৯৭-এ অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেলের সংস্পর্শে আসেন। হ্যাভেলের উৎসাহে মোগল শৈলীর সূক্ষ্ম অলংকরণ, রঙ ব্যবহারের আশ্চর্য নৈপুণ্য নিবিষ্টভাবে অনুশীলন করেন। এইভাবে বিভিন্ন ভারতীয় শৈলীর রহস্য তাঁর আয়ত্তে এসে যাচ্ছিল এবং প্রাচীন শিল্পীদের দক্ষতার দৃষ্টান্তগুলি ভেঙে ভেঙে, মিলিয়ে মিশিয়ে তিনি নিজের বিশিষ্ট শৈলী উদ্ভাবনের পরীক্ষায় ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। অনুভব করছিলেন, তাঁরই হাতে ভারতীয় চিত্রকলার একটা নতুন অধ্যায়ের যথার্থ সূচনা হচ্ছে। তবুও ভেতর থেকে বাধা কাটে নি; ভারতীয় পরম্পরার সব কীর্তি আয়ত্তে এসে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর মনে হত অতীতের শিল্পীদের হাতের কাজে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় আছে ঠিকই, কিন্তু সে নিপুণতা অনেকটাই অসাড়, নিষ্প্রাণ, কেবলই রীতিবদ্ধ চর্চার দক্ষতা। তাঁর আধুনিক চিত্তের প্রসার, অনুভূতির বৈচিত্র্য— ঐ স্থাবর আঙ্গিকের ছাঁচের মধ্যে পূর্ণত আধারিত করা অসম্ভব মনে হচ্ছিল। ভারতীয় সমাজ যেমন নিজের ভেতরের শক্তির দ্বন্দ্বে পুরোনো ছক ভেঙে উদ্‌বর্তিত হয় নি, তেমনি পুরোনো ঘরানার শিল্পীরাও চিরাগত করণ-কৌশলের ছক ভেঙে বেরিয়ে আধুনিকতার আলোয় এসে দাঁড়াতে পারেন নি। পুনরাবৃত্তিময় চর্চার যান্ত্রিকতায় সমস্ত উদ্দীপনা নিঃশেষ হয়ে গেছে। অথচ অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন অপর আধুনিকদের মতোই ভারতীয় পরিস্থিতির সংকীর্ণ সুযোগের মধ্যে বাইরের পৃথিবীর আলোহাওয়ার পুষ্টিকর প্রভাবে বেড়ে উঠেছিলেন। নান্দনিক রুচির আধুনিকতা, চৈতন্যের বিস্ফার, অনুভূতির অন্তহীন বৈচিত্র্য, প্রাণশক্তির গতি-বিভঙ্গ আস্বাদনের আনন্দ তাঁর শিল্পীব্যক্তিত্বে প্রচণ্ড উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলছিল। পরম্পরাগত ভারতীয় শিল্পের আঙ্গিকে সে-উদ্দীপনা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বাধা পাচ্ছিলেন, পীড়িত বোধ করছিলেন। বার বার তিনি এই সংকটের কথা, এই অতৃপ্তির কথা বলেছেন। যেমন :

> মোগল, পারশিয়ান, কাঙড়া আর্ট নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করেছি, তাদের অপূর্ব নৈপুণ্য, অসামান্য কারুকার্য আমার মনকে মুগ্ধ করেছিল।... কিন্তু সত্যি বলতে কি, তাতে মনের তৃপ্তি হয় নি। এককালে চিত্র আঁকাকে শিল্পীরা বলত পুত্‌লী বানায়া। সত্যিই সেগুলো মানুষের পুতুল-মূর্তি ছিল। এইগুলিতে কারিকুরির অভিনব খেলা, কারুকার্যের চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যেত, কিন্তু প্রাণ কই!

---

১. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, "অবনীন্দ্রনাথ", বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ২-৩, পৃ ১৭৯

পুত্‌লীর কারুকার্য নিয়ে ভারতীয় চিত্রকলা চিরদিন তো পরিতৃপ্ত থাকতে পারে না।... মন বললে, আমি কী করতে পারি, আমার কী দেবার আছে? ভেতর থেকে সাড়া পেলুম, সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[১]

এ তাঁর ২৯-৩০ বৎসর বয়সের কথা। তীব্র সংকট বোধে পীড়িত শিল্পী তখন এক তমিস্রার স্তর অতিক্রম করে স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়েই, ১৯০২ খৃস্টাব্দে জাপানের 'তমোহন্ত্রী পূর্ণচন্দ্র'-র সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। স্বাধীন জাপানের তুলনায় উপনিবেশ-ভারতে শিল্পের সমস্যা ছিল অনেক জটিল, তমিস্রা নিবিড়তর। আত্মবিকাশের ব্যক্তিগত সমস্যা উত্তরণে এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় শিল্পের মুক্তির পথ চেনায় মনীষী ওকাকুরা তেন্‌শিন-এর কাছ থেকে অবনীন্দ্রনাথ গভীর সাহায্য পাবেন আশা করেছিলেন।

প্রথমবার ভারতে অবস্থানের সময়ে তেন্‌শিন তাঁর 'দি আইডিয়াল্‌স অব দি ইস্ট' বইখানি রচনা করেন। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে এই বই ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত হয়ে ভারতে পৌছয় এবং সরলা দেবী চৌধুরানীর ভাষায়, 'ওকাকুরার বইয়ের অন্তর্গত ভাব ও বাণী বাঙলা থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত মুখে মুখে প্রচার হতে থাকল, লাজপৎ রায় প্রমুখ প্রত্যেক দেশভক্তের লেখনীতে প্রতিফলিত হতে লাগল।'[৩] ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মন্তব্য করেছেন :

> With the publication of the book, a furore went amongst the intellectuals of India. It was also alleged that he was the bearer of a Pan-Asiatic mission to unite the Asian countries against occidental inperialism.[২]

উত্তরকালে এশীয় ঐক্যের বাণী এশিয়ার অন্যদেশগুলির উপরে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের স্লোগানে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু তেন্‌শিন যখন ভারতের মাটিতে বসে এশীয় ঐক্যের বাণী উচ্চারণ করেন তখনো জাপানের চিত্ত সাম্রাজ্য-বিস্তারের লালসায় কলুষিত হয় নি। তেন্‌শিন-এর বাণীর শুদ্ধ আন্তরিকতা ভারতীয় চিত্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। অপর ভারতীয়দের মতো অবনীন্দ্রনাথও প্রাচ্য-প্রতিভার স্বকীয়তা বোঝার এবং তৎসাময়িক বর্তমানের দুর্দশার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টায় তেন্‌শিন-এর চিন্তাসূত্রগুলি পরম আশ্রয় মনে করেছিলেন। সূত্রগুলি, তেন্‌শিন-এর নিজের ভাষায় :

> Asia is one.
>
> Asiatic races form a single mighty web.
>
> The task of Asia to-day, then, becomes that of protecting and restoring *Asiatic modes*. But to do this she must herself first recognise and develop consciousness of these modes. For the shadows of the past are the promise

---

১. প্রতিমা দেবী, 'স্মৃতিচিত্র', সিগনেট প্রেস, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ ৬৯-৭০

২ *Swami Vivekananda—Patriot-Prophet*. দ্রষ্টব্য নেপাল মজুমদার, 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৯৬১, পৃ ১৮৩

of the future. No tree can be greater than the power that is in the seed. *Life lies ever in the return to self.*

Victory from within, or a mighty death without.

'দি আইডিয়াল্‌স অব দি ইস্ট' বইখানি হাতে আসার আগে থেকেই অবনীন্দ্রনাথ তেন্‌শিন-এর মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন ধরে নেওয়া যায়, কারণ, তেন্‌শিন এখানে বেশিরভাগ সময় কাটাতেন নিবেদিতা ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্যে, আর এঁরা দুজনেই অবনীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পাশ্চাত্যের প্রভাবে অভিভূত না হয়ে নিজেদের ঐতিহ্যের জমিতে দাঁড়িয়ে প্রাচ্যের মানুষ আধুনিক বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে সম্মানজনক ভূমিকা নিতে পারে, বিশ্বে 'as a cultural and philosophical counterpoint' (এলিসি গ্রিল্লির ভাষা) প্রাচ্যের ভূমিকা সমূহ গুরুত্বপূর্ণ— তেন্‌শিন-এর এই প্রত্যয়ে অবনীন্দ্রনাথ নিজের ভাবনার দৃঢ় সমর্থন পেলেন; নিজের কাজে এতদিন তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের, Indian mode-এর তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করে এসেছেন। ভারতপন্থ্‌ বিষয়ে তাঁর জিজ্ঞাসা তেন্‌শিন-এর প্রভাবে আরো পরিব্যাপ্ত পটভূমিতে বিস্তৃত হল; Asian mode বা এশীয় পন্থ্‌-এর পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। কিছু পরে, ১৩১৫ বঙ্গাব্দে লেখা 'পরিচয়' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য বোঝার প্রয়োজন নির্দেশ করে বলেন:

> পুরাকালে এই শক্তি (adapting) আমাদের শিল্পে কিরূপে কাজ করিতেছিল তাহা বুঝিতে হইলে প্রাচীন Asiatic Art-টার চর্চা করিতে হইবে। অর্থাৎ তুরস্ক হইতে জাপান, একদিকে চীন তাতারের উত্তর সীমা আর একদিকে দক্ষিণ মহাসাগর এই বিরাট ভূখণ্ডের খণ্ডশিল্পগুলার ক্রমচর্চা আবশ্যক, পরে বৌদ্ধযুগে যে মহাশিল্প এই খণ্ডশিল্পগুলাকে নিজ তেজে অনুপ্রাণিত করিয়া এক অখণ্ড অম্লান Asiatic Art রূপে প্রকাশ করিয়া গেছে সেটার প্রতি দৃষ্টিপাত করা চাই।··· চীনে যাই, জাপানে চলি, তুরস্কের মরুপ্রান্তরেই বা সন্ধানে ফিরি সেই শিল্প যে শিল্প আমাদের ভারত-স্তুপ ভাস্কর্যে মণ্ডিত, অজন্তাগুহা বিচিত্র চিত্রে রঞ্জিত করিয়াছে। সে যেখানেই গিয়াছে সেইখানেই নিজের ছাপ স্পষ্ট অঙ্কিত রাখিয়াছে অথচ সেই সেই দেশের শিল্পটাকে লোপ না করিয়া।[১]

ঐতিহ্য বিচারে এশীয় পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে সচেতনতার জন্যে অবনীন্দ্রনাথ তেন্‌শিন-এর কাছে ঋণী। আনন্দ কেণ্টিশ কুমারস্বামী তাঁর শ্রমসাধ্য গবেষণায় প্রাচ্য শিল্পের তথ্যগত পরিচয় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু করার আগে তেন্‌শিন-ই এশীয় শিল্পের তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করেন। জাপানি শিল্প-ঐতিহ্যের বিশ্লেষণে দেখান কীভাবে জাপান প্রকাশের ভাষার জন্যে চীন এবং আদর্শগত প্রেরণার দিক থেকে ভারতের উপরে নির্ভর করে এসেছে। তাঁর মতে জাপানের শিল্পকলায় এশিয়ার সম্মিলিত সংস্কৃতি প্রাণময় অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। জাপানি শিল্প-সংস্কৃতির স্বরূপ মহাদেশীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বোঝা যাবে না, তেন্‌শিন-এর এই অভিমত অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য মূল্যায়নে কাজে লাগান। ধারণাটিকে আরো প্রসারিত করে তিনি বিভিন্ন শিল্পরীতির বিমিশ্রণে শিল্পীর

---

১. 'পরিচয়', ভারতী, চৈত্র ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ ৫৭৪

স্বাধীনতার কথা বলেন। কোনো একটি শিল্পপ্রথা অনড় ভাবে আঁকড়ে থাকায় শিল্পীর ক্রিয়াকর্ম পঙ্গু হয়ে যেতে বাধ্য, বাইরে থেকে কোনো রীতি গ্রহণ করায় দেশীয় শিল্পের জাত যায় না। গ্রহণ-বর্জনের স্বাধীনতা ক্রিয়াবান্ শিল্পীরা সর্বদা পেয়ে এসেছেন এবং একালেও পাওয়া উচিত— এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পে নিরন্তর মেলামেশার দৃষ্টান্তে অবনীন্দ্রনাথের এই ধারণাগুলি বস্তুভিত্তি পায়।

তত্ত্বগত ভাবে যেমন অবনীন্দ্রনাথ তেন্‌শিন-এর ধ্যান-ধারণায় অভিপ্রেত অবলম্বন পেলেন, তেমনি সাক্ষাৎ শিল্পকর্মেও তাঁর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সাহায্য পেয়েছিলেন। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে তেন্‌শিন তাঁর দুই কৃতী ছাত্র ইয়োকোইয়ামা তাইকান এবং হিশিদা শুন্‌সোকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। তখন পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ নিরন্তর অনুশীলনে অর্জিত নৈপুণ্যকে কোনো ব্যক্তিগত শৈলীর বিশিষ্টতায় উত্তীর্ণ করতে পারেন নি। তাঁর ব্যক্তিগত বিকাশের সেই ক্রান্তিকালে তিনি তাইকান-হিশিদার মাধ্যমে জাপানি চিত্রকলায় প্রাচ্য-আধুনিকতার একটি নির্ভরযোগ্য আদর্শ পেলেন। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' স্মৃতিকথায় অবনীন্দ্রনাথ এঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করার কথা নিজেই বলেছেন। সব বড়ো শিল্পীর জীবনেই এমন অভিজ্ঞতা আসে : তাঁরা আত্মবিকাশের একটা স্তরে পৌঁছে অনুভব করেন, কলাকৌশল সবই মুঠির মধ্যে এসে গিয়েছে, কিন্তু প্রকাশে স্বাচ্ছন্দ্য আসছে না। কিছুতেই আয়ত্তে আসছে না সেই 'আপনার ভাষা' যাতে 'অন্তরের ধ্যানখানি' সম্পূর্ণ বাণীলাভ করবে। অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে 'প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত' প্রতিভার এই সংকটবোধের, যন্ত্রণাবোধের কারণ তাঁর দেশকালের, তাঁর শ্রেণীমানসের বাতাবরণেই নিহিত ছিল। সমৃদ্ধ, কিন্তু বিকাশের সম্ভাবনাহীন জাতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আকর্ষণ করে নেবার এবং ব্যক্তিগত প্রতিভার সামর্থ্যে উত্তরাধিকারকে আধুনিক বিশ্বের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ভাষায় অভিব্যক্ত করার যে দুরূহ ব্রত তাঁর উপরে বর্তেছিল, সেই ব্রত পালনে তিনি ব্যাপক সামাজিক সমর্থন পান নি। তিনি নিজে যে-শ্রেণীর মানুষ উপনিবেশের সেই নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর মানস ও রুচির আধুনিকতাও ছিল খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। অবনীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকার বিদ্রূপময় মন্তব্যগুলি স্মরণ করলে বোঝা যায়, তাঁর পক্ষে রুচির প্রতিকূলতা ঠেলে এগোনো কত কঠিন কাজ ছিল। এমন পরিবেশে, এমন সময়ে তিনি তাইকান-এর মধ্যে সৃষ্টির আনন্দে তন্ময়, সদাউদ্দীপ্ত, নতুনকালের শিল্পীব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত দেখলেন। তাইকান-হিশিদার সান্নিধ্যে এবং আধুনিক জাপানি শিল্পের করণ-কৌশল সম্পর্কে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় এক নতুন উদ্দীপনা অনুভব করলেন, অবসাদ ও অসাড়তা কেটে গেল। এই উদ্দীপনায় তাঁর সমুদ্যত কিন্তু প্রতিহত শক্তি আত্মপ্রকাশের সচ্ছল ভাষা উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছিল, আয়ত্তে এসেছিল নিজস্ব শৈলী। প্রসঙ্গত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়-এর বিশেষজ্ঞ অভিমত স্মরণীয় :

> The Japanese influence changed Abanindranath's technical process altogether··· In the Illustrations of Omar Khayyam we see for the first time Abanindranath's work showing a definite individual style. This series is a landmark in Abanindranath's style. For the first time we see texture, atmosphere, deep interest in portraiture and dramatic expression.[১]

১. Binodebehari Mukherjee, "A Chronology of Abanindranath's Paintings", *The Visva Bharati Quarterly*, May-Oct 1942, Pp. 125-26

অবনীন্দ্রনাথ স্থূলভাবে জাপানি রীতি কখনোই অনুসরণ করেন নি, যেমন মোগল বা য়ুরোপীয় রীতিও হুবহু অনুসরণ করেন নি। তাঁর নিজস্ব শৈলীর উপাদান তিনি আহরণ করেছিলেন মোগল, য়ুরোপীয় এবং জাপানি রীতি থেকে। এবং বিনোদবিহারীর ভাষায়, 'by dint of his wonderful talent he effected a fusion of western and oriental techniques and evolved a new style in painting.[১] জাপানি শিল্পীদের সংস্রবে ১৯০৩ সালেই তাঁর ছবির নতুন পর্ব শুরু হয়েছিল। 'দেয়ালি' (১৯০৩), 'ভারতমাতা' (১৯০৩/৪), 'ঊর্ধ্বাকাশে সিদ্ধদম্পতি' (১৯০৫)— ছবিগুলির ভেতর দিয়ে তাঁর নিজস্ব শৈলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটে 'ওমর খৈয়াম' চিত্রমালায় (১৯০৬-১১)।

অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত শৈলীর বিকাশে জাপানি শিল্পীদের সাক্ষাৎ প্রভাব প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ওয়াশ পদ্ধতির কথা ওঠে : 'টাইকানের ছবি আঁকা দেখে দেখেই একদিন আমার মাথায় এল, জলে কাগজ ভিজিয়ে ছবি আঁকলে হয়।' ইংরেজ শিল্পীদের ধরনে জলরঙে আঁকতে অবনীন্দ্রনাথ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন, তেল রঙ বা ভারতীয় ছবির চিরাচরিত টেম্পারা পদ্ধতি (আঠা বা ডিমের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে ব্যবহার) তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করে নি। তাইকানের দৃষ্টান্তে জলরঙের অভ্যস্ত রীতি অবনীন্দ্রনাথের হাতে সম্পূর্ণ নতুন তাৎপর্যের দিকে বাঁক নিল। শুকনো কাগজ আর ভিজে কাগজ রঙ-প্রয়োগের দিক থেকে যে উপাদান হিসেবে ভিন্ন হয়ে যায়, এই তথ্য অবনীন্দ্রনাথ তাইকানের কাজ দেখেই উপলব্ধি করেন। আগে কাগজে ছবির রূপরেখা ছকে নিয়ে এক পর্দা স্বচ্ছ জলরঙ প্রয়োগ, তারপর গোটা ছবি জলে ডুবিয়ে তুলে রোদে শুকিয়ে আবার রঙ প্রয়োগ— অবনীন্দ্রনাথ এই পদ্ধতিতে আঁকা শুরু করেন। তাইকান মোটা তুলি দিয়ে জল টেনে ছবি ভেজাতেন, অবনীন্দ্রনাথ গোটা ছবিটাকে জলে ডুবিয়ে নিতেন। রোদ-জল খাওয়ানোর ব্যাপারে কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম মানতেন না। বার বার জলে ভেজাবার ফলে কাগজের ভেতরে রঙ সুনিবিষ্ট হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন রঙের প্রান্তীয় স্বাতন্ত্র্য বিলীন হয়ে রঙে রঙে মিশে যায়। পটে অনুগ্র আলোছায়ার মায়া ছড়িয়ে পড়ে। পটের অপ্রধান অংশগুলি ছায়াচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। পেছনের অংশে প্রায়শ দূরাভাস ফুটে ওঠে। প্রয়োজনে অবনীন্দ্রনাথ কাগজের মূল সাদা অংশ বাঁচিয়ে, এমন-কি, ঘষে ঘষে রঙ তুলে দিয়ে আলোর মাত্রা বাড়াতেন। ওয়াশ পদ্ধতিতেও তিনি নিরন্তর নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। কাঞ্চন চক্রবর্তী বলেছেন :

> Even a casual comparison will obviously speak that a Japanese wash-painter hardly demonstrates an evolution of his own in the technique while Abanindra-wash-style displayed a phenomenal evolution throughout. He could innovate a new synthesis eventually to transform into a style entirely his own so that that could prove to be the most 'suitable vehicle to convey his sympathies'.[২]

---

১. Binodebehari Mukherjee, "The Art of Abanindranath Tagore", *The Visva-Bharati Quarterly*, May-Oct. 1942, P. 115

২. Kanchan Chakraberti, "Wash technique and Abanindraana", *Abanindranath*, Published by Abanindra Centenary Celebration Committee, Visva-Bharati, 1973, P. 56-57.

অবনীন্দ্রনাথের মতো সমর্থ প্রতিভার পক্ষে এই তো স্বাভাবিক। সব প্রভাবই তাঁর সৃষ্টিময় স্বভাবে সংগত হয়ে যায়, তাঁকে আবদ্ধ করে না।

ওয়াশ পদ্ধতি ছাড়া আরো কিছু কিছু আঙ্গিক অবনীন্দ্রনাথ জাপানি সূত্র থেকে নিয়েছেন। তাইকানের কাছে জাপানি রীতিতে ধীরে ধীরে লাইন টানা অভ্যাস করেন, 'তার কাছেই শিখলুম এক একটি লাইন কত ধীরে ধীরে টানে তারা'। জাপানিরা যখন বড়ো পটে ছবি করেন তখন পটের বেশির ভাগ ফাঁকা রেখে দেন। কল্পিত বিষয়টি খুব স্পষ্ট ও জোরালো ভাবে এঁকে ছেড়ে দেন, পারিপার্শ্বিক ফোটানোর নামে অবান্তর বিষয় পট জুড়ে বসে না। কোনো কোনো ছবিতে অবনীন্দ্রনাথ এই রীতি অনুসরণ করেছেন, যেমন 'কণারক-এর পথে' ছবিতে। পটের একেবারে ডান পাশে ক্রমোচ্চ জমির উপরে মন্দির, গোটা পটখানার মাঝ দিয়ে বালিয়াড়ির আভাস বোঝাতে শুধু একটি ভাঙা ভাঙা রেখা টানা। পাল্কিবাহকদের, মন্দিরটিকে আমরা কতদূর থেকে দেখছি। এই সুদূরতার ভাবটুকু পটের ধৌত ও লাঞ্ছিত অংশের অনুপাতের উপরে নির্ভর করে আছে। বস্তুভারে ভরে না তুলে পটের অধিকাংশ ফাঁকা রেখে দেওয়ার এই জাপানি ধরন অবনীন্দ্রনাথের আরো অনেক ছবিতে দেখা যায়। 'নির্বাসিত যক্ষ' ছবিতে গাছ-পাতা আঁকা হয়েছিল প্রকৃতির ছবি আঁকার জাপানি রীতি মনে রেখে। জাপানি শিল্পীদের অনুসরণে অবনীন্দ্রনাথ ছবিতে সীল ব্যবহার শুরু করেন, সীলটি তাঁকে তেন্‌শিন উপহার দিয়েছিলেন[১]। অবনীন্দ্রনাথের কোনো কোনো ছবিতে এই সীল ছবির মূল বিন্যাসের অঙ্গ হয়ে উঠেছে, পটে সন্ন্যস্ত বিষয়ের ভারসাম্য বজায় রাখায় সীলটি নানা কৌশলে ব্যবহার করেছেন। খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে অবনীন্দ্রনাথের মধ্যপর্বের কাজে আরো অনেক জাপানি উপাদান আকর্ষণ করে নেবার দৃষ্টান্ত দেখানো যায়। সবচেয়ে বড়ো কথা, শিল্পভাবনার দিক থেকে যেমন তেমনি শিল্পকর্মেও তেন্‌শিনের মাধ্যমে জাপানের সঙ্গে যোগাযোগে অবনীন্দ্রনাথ আত্মবিকাশের এক সংকটপর্ব অতিক্রম করে আসার জোর পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা উচিত, অবনীন্দ্রনাথ যেমন তাইকান-হিশিদার কাজের দৃষ্টান্ত থেকে অনেক শিখেছেন, তাইকান-হিশিদাও তেমনি অবনীন্দ্রনাথের কাছে ভারতীয় আঙ্গিকের পাঠ নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার অন্তরঙ্গ সম্পর্কই ছিল।

৫

তেন্‌শিন দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন ১৯১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং অক্টোবরে দেশে ফিরে যান। আগের বারের তুলনায় এবার অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পান। ১৯০২-৩ থেকে ১৯১২-র মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ যেমন নিজের শিল্পী-জীবনের সংকটপর্ব অতিক্রম করে আত্মস্থ হয়েছিলেন তেমনি

---

১. তেন্‌শিন কলকাতা থেকে সাঙহাই-তে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু নাগাও-উজানকে ৭ অক্টোবর ১৯১২ তারিখে সীল পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেন। লেখেন: "এখানে দুই ভাই আছেন যাঁরা ভালো শিল্পী। বড় জনের নাম স্বর্গের ইন্দ্র ['তেন্‌-তাইশাকু' (তেন্‌—স্বর্গ, তাইশাকু—ইন্দ্র)], ছোট জনের নাম ধরণীর ইন্দ্র ['চি-তাইশাকু' (চি—ধরণী)]। আমি তাঁদের সীল উপহার দিতে চাই। রত্নের উপরে দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে খোদাই করিয়ে তৈরি করিয়ো। রত্নটি যেন সুন্দর হয়। কিছু নক্‌শার অলংকরণ থাকতে পারে" (সীলের আকার এখানে তেন্‌শিন এঁকে দিয়েছিলেন)। হিদেতোকি শিমোমুরা -সম্পাদিত 'তেন্‌শিন তো সোনো শোকান্‌' ('তেন্‌শিন এবং তাঁর চিঠিপত্র'), তোকিয়ো ১৯৬৪—সংকলনের ২০৮ সংখ্যক চিঠি। —অনূদিত।

'গভর্নমেণ্ট স্কুল অব আর্ট'-এর শিক্ষক হিসেবে তরুণ শিল্পীদের একটি দলকে গড়েপিটে তৈরি করে তুলেছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯০৭-এ 'দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট' স্থাপিত হওয়ায় তাঁর কাজের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয়। কিছুটা রাজপুরুষদের সহায়তায় এবং অনেকটাই গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের উদ্যোগ-উদ্দীপনায় সৃজন-প্রদর্শন-বিচারবিশ্লেষণ মিলিয়ে বিংশ শতকের প্রথম দশকে কলাচর্চা একটা আন্দোলনের চেহারা পেয়েছিল। এই নবজাত শিল্পকলার কথা বিদেশেও কিছুটা প্রচারিত হয়। বিলেতের 'দি স্টুডিয়ো' পত্রিকায় হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথের কাজ সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন (অক্টোবর ১৯০২ এবং জানুয়ারি ১৯০৩)। জাপানের 'কোক্কা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় স্যার জন উড্‌রফ-এর 'এ মডার্ন স্কুল অব ইণ্ডিয়ান পেইন্টিং' প্রবন্ধ (১৯০৮)। দ্বিতীয়বার কলকাতায় এসে নতুন জেগে ওঠা উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশে তেন্‌শিন তৃপ্তি পান। মন্তব্য করেন :

> দশ বছর আগে যখন আমি এসেছিলাম তখন তোমাদের আজকালকার আর্ট বলে কিছুই দেখি নি। এবারে দেখছি তোমাদের আর্ট হবার দিকে যাচ্ছে। আবার যদি দশ বছর বাদে আসি তখন হয়তো দেখব হয়েছে কিছু।[১]

এই 'হবার দিকে যাওয়া' জায়মান নবীন শিল্পের মূল তত্ত্বধারক ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, আর অবনীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষে পরোক্ষে নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন ওকাকুরা তেন্‌শিন-এর প্রেরণায়। সুতরাং জাপানের 'তমোহন্ত্রী পূর্ণচন্দ্র' ভারতেরও তিমির হননে একটা স্মরণীয় ভূমিকা পালন করে গেছেন মানতে হয়।

হিদেতোকি শিমোমুরা লিখেছেন :

> তেন্‌শিন যখন ঠাকুরদের সঙ্গে বাস করতেন তখন শুধু শিল্পকর্ম ও সমালোচনায় প্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ নয়, বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীরা, যেমন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল বসু মাঝে মাঝেই তাঁর কাছে এসে বসতেন। স্বভাবতই তেন্‌শিন-এর সঙ্গে এঁদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং তিনি এঁদের প্রভাবিত করেন।[২]

অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ছাত্রদের স্মৃতিকথা থেকেও জানা যায় দ্বিতীয়বার কলকাতায় থাকার সময়ে তেন্‌শিন মাঝে মাঝে তরুণ শিল্পীদের নিয়ে বসতেন, উপদেশ দিতেন, কখনো কখনো ছবির ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়ে দিতেন। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় নানাজনের টুকরো স্মৃতির উপরে নির্ভর করে তাঁর 'আধুনিক শিল্পশিক্ষা' গ্রন্থে তেন্‌শিন-এর উপদেশগুলির সারসংকলন করে দিয়েছেন :

> ছবির কম্পোজিশানের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে প্রখর বোধ প্রয়োজন।
>
> দর্শকের মনে সম্মোহনের শুদ্ধভাব জাগিয়ে তোলায় রঙ প্রয়োগের চরমোৎকর্ষ।
>
> বস্তু-সত্তার প্রকৃতিভেদে বস্তুর নিজস্বধর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত।
>
> আঙ্গিকের উৎকর্ষ ভিন্ন শুধু ভাবের গৌরবে কোনো শিল্পরূপ পূর্ণতা পায় না।
>
> শিল্পীজীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন tradition, nature, originality এই তিন-এর সমন্বয়। ব্যক্তিগত প্রতিভার আশ্রয় ভিন্ন মৌলিকতা বা জীবনের স্পন্দন প্রকাশ পায় না।

১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জোড়াসাঁকোর ধারে', বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃ ১১৩
২. হিদেতোকি শিমোমুরা -সম্পাদিত 'তেন্‌শিন তো সোনো শোকান্‌', তোকিয়ো ১৯৬৪, পৃ ১১৬ ১৭।— অনূদিত।

অপরিণত তরুণ শিল্পীদের তত্ত্বজ্ঞান দেবার চেষ্টা না করে তিনি সরলভাবে শিল্পকর্মের মূলনীতিগুলি বুঝিয়ে দিতেন।

৬

পাশাপাশি উভয়ের উক্তি উদ্ধৃত করে তেন্‌শিন ও অবনীন্দ্রনাথের ভাবনার মিল দেখানোর বা প্রভাব দেখানোর হয়তো কোনো উপযোগিতা নেই, কারণ, অবনীন্দ্রনাথের সৃজনধর্মী ব্যক্তিত্বে কারো কোনো প্রভাব স্থূলভাবে চিরলগ্ন হয়ে থাকে নি। তাঁর অর্জন-উপার্জন সবই নিজের সৃষ্টির ভুবনে মিলে মিশে গেছে, তাঁর ভাবনার মুক্তিতে সংগত হয়ে গেছে। তবুও দুজনের চিন্তা-চেতনার পরিচয় পাশাপাশি সাজালে বোঝা যায় প্রাচ্যের প্রাচীন দুই দেশের এই দুই আধুনিক, সমকালবর্তী কৃতীপুরুষের সামনে একই ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তেন্‌শিন-এর ভাবনা ও কর্মপদ্ধতির দৃষ্টান্তে অবনীন্দ্রনাথ নিজের সমস্যা উত্তরণের উপযোগী কিছু ইঙ্গিত পেয়েছিলেন এবং কাজে লাগিয়েছিলেন। ঐতিহ্যের মৃত্তিকা থেকে বিচ্ছিন্ন আধুনিকতার কোনো যথার্থ মূল্য নেই— এই বোধ অবনীন্দ্রনাথের নিজেরই অভিজ্ঞতা থেকে নির্ধাসিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট ধারণার আকার নিচ্ছিল। এ-ধারণা ব্যাপ্ত পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণতর করে তোলায় ঐতিহ্য অর্থে গোটা প্রাচ্য-ঐতিহ্য সম্পর্কে তেন্‌শিন-এর বিশ্লেষণ থেকে তিনি সাহায্য পেলেন। শিল্পীজীবনের প্রথম পর্বে অব্যবস্থিত নান্দনিক আদর্শের বিশৃঙ্খলায় অবনীন্দ্রনাথ বাইরে থেকে সাহায্য পাবার কোনো উপায় দেখেন নি। সেই দুঃসময়ে নতুন পথ খোঁজার স্বাধীনতায় শিল্পীর অক্ষুণ্ণ অধিকারের উপরেই তাঁকে জোর দিতে হয়েছিল। তাঁর নিঃসঙ্গ ব্রত উদ্‌যাপনের দিনে তিনি তত্ত্বগত-ভাবে বার বার তাই সকল আরোপিত বিধিবিধানের বাইরে এসে দাঁড়াবার কথা বলেছিলেন। শিল্পীর স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতা সম্পর্কে তাঁর এই ধারণার সঙ্গে তেন্‌শিন-এর ধারণার মিল পাওয়া যায়। নিপ্পোন্ বিজুৎস্থ-ইন্-এর আদর্শ সম্পর্কে তেন্‌শিন যেমন বলেছিলেন: স্বাধীনতা এই প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের মহত্তম অধিকার, স্বাধীনতার অর্থ শিল্পীর সচেতন আত্মবিকাশ; ভারতীয় বাস্তবতায় শাস্ত্রবিহিত প্রথার এবং ঔপনিবেশিক শিল্প-শিক্ষাবিধির শাসনের বিরুদ্ধে অবনীন্দ্রনাথকেও তেমনিভাবে শিল্পীর স্বাধীনতার জন্যে তত্ত্বগত সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। তেন্‌শিন ও অবনীন্দ্রনাথ কখনো রীতিবদ্ধ চর্চায় শিল্পীর উদ্ভাবনীবৃত্তি শৃঙ্খলিত করার তত্ত্বে বিশ্বাস করেন নি। শুরুতে তাঁরা দুজনেই আধুনিকদের পক্ষে স্বজাতীয় প্রাচীন শিল্পকলা চর্চার উপরে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন— সে ছিল য়ুরোপীয় প্রভাবের বিপর্যয় ঠেকাবার একটা সাময়িক উপায়। কিন্তু অভিজ্ঞতাজাত প্রকৃষ্ট বোধে উভয়েই অচিরে বোঝেন, শিল্পকলায় 'পুনরুজ্জীবনবাদ' মুক্তির উপায় নয়। বোঝেন, উপস্থিত বর্তমানের দাবি আধুনিক শিল্পীর পক্ষে অবশ্য-মান্য এবং কোনো অবসিত আঙ্গিক আধুনিক মনের অব্যর্থ ভাষা হয়ে উঠতে পারে না এবং ঐতিহ্যলগ্ন হয়েও সচেতনভাবে ঐতিহ্যের উদ্‌বর্তন ঘটানোই একালের শিল্পীর স্বাধীন-দায়িত্ব। 'দি বুক অব টি' গ্রন্থে তেন্‌শিন যেমন বর্তমানের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করেন:

> The claims of contemporary art cannot be ignored in any vital scheme of life. The art of to-day is that which really belongs to us: it is our own reflection. In condemning it we but condemn ourselves··· It is indeed a shame that despite

> all our rhapsodies about the ancients we pay so little attention to our own possibilities.···The past may well look with pity at the poverty of our civilization; the future will laugh at the barrenness of our art.[১]

তেমনি অবনীন্দ্রনাথও স্পষ্ট বলেন :

> অতীতের শিল্পসম্পদ হারিয়ে বসা আমাদের শিল্পের পক্ষে দুর্ঘটনা, কিন্তু শুধু তাই রইল, একালের অর্জিত কিছুই রইল না, এটা শিল্পের বাঁচার পক্ষে অনুকূল অবস্থা মোটেই নয়। গাছের আগডালে যে নতুন মুকুল গাছের গোড়ায় অতীতের অন্ধকারে গাছের বীজটির প্রাণের স্রোতের সঙ্গে যুক্ত থেকে নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে যেভাবে মিলছে সেইরূপ মেলাই হল ঠিক। অতীতের শিল্পের সঙ্গে বর্তমান শিল্পের নতুন প্রকাশের এই হল স্বাভাবিক যোগ।[২]

'শিল্পীর intention বা ধ্যান, তারি অনুপাতে' কালে কালে শিল্পক্রিয়া এগিয়ে চলে, 'শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়,'— মৌল এই বিশ্বাসের ফলে শিক্ষকের আসনে বসা সত্ত্বেও অবনীন্দ্রনাথ কখনো ছাত্রদের উপরে নিজের প্রভুত্ব খাটান নি, বাঁধাবাঁধি শিক্ষাবিধির ছকে ফেলে কোনো গোষ্ঠী বা ঘরানা তৈরির কথা ভাবেন নি। তেন্‌শিন যেমন আধুনিক শিল্পীর 'Sense of evolutional self-development'-এর উপরে গুরুত্ব দিতেন, অবনীন্দ্রনাথও তেমনি শিল্পীর আত্মজ্ঞানকে মনে করতেন সবচেয়ে মূল্যবান্। আধুনিক শিল্পীর প্রধান লক্ষণ আত্মসচেতনতা, এঁরা বার বার শিল্পীমানসের আত্মসচেতন বিচার ও বিকাশের কথা বলেছেন।

তেন্‌শিন ও অবনীন্দ্রনাথ দুজনেই সরকারি শিল্প-বিদ্যালয়ে চাকরি নিয়েছিলেন। 'বিজুৎসু গাক্কো' এবং কলকাতার 'গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট' প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে নিশ্চয়ই তুলনা চলে না। একটি স্বাধীন দেশের জাতীয় জীবনের চলমান ধারার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠান, অপরটি উপনিবেশের প্রভুদের দাক্ষিণ্যে পুষ্ট, —অগত্যা বিদেশী শাসকদের স্বার্থের অনুকূল শিক্ষা-পরিকল্পনার গৌণ অঙ্গ। কিন্তু কার্যত তেন্‌শিন এবং অবনীন্দ্রনাথের চাকরি-জীবনের অভিজ্ঞতা প্রায় একই রকম। বিজুৎসু গাক্কোয় তেন্‌শিন পাশ্চাত্যপন্থী শিল্প-প্রশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশের মাটির সঙ্গে সংলগ্ন শিক্ষাবিধি চালু করেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে ছাত্রেরা তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করেন। এখানে হ্যাভেল শিক্ষাবিধিতে ভারতীয় প্রবণতা বাড়ানোর নীতি কার্যকর করার জন্যে সহযোগী হিসেবে অবনীন্দ্রনাথকে চাকরিতে আনেন। অবনীন্দ্রনাথ স্বাধীনভাবে নিজের আদর্শমতো কাজ করতে পারবেন এই শর্তে চাকরি নিয়েছিলেন। সরকারি স্কুলে সুযোগ ছিল খুবই কম, তবুও হ্যাভেলের আনুকূল্যে এবং সাময়িকভাবে অধ্যক্ষের পদ পাওয়ায় তিনি কিছুদিন বেশ জমিয়ে কাজ করেন। অবনীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট রুটিন অনুসারে সিলেবাস ধরে ছাত্রদের পাঠ দেবার বিরোধী ছিলেন। নিজেদের প্রবণতা অনুসারে ছাত্রেরা স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাবে, বারংবার সংশোধনের চাপে কারো স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ করা হবে না— এই ছিল তাঁর শিক্ষাবিধির মূল নীতি।

---

১. Kakuzo Okakura, "Art Appreciation", *The Book of Tea*, Tokyo, 1957 (প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৬-এ) P. 87

২. 'শিল্পায়ন', সিগনেট প্রেস, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ ৫২

ভারতীয় মানসিকতার মর্মের সঙ্গে ছাত্রদের যোগ ঘটাবার জন্যে ছাত্রদের তিনি দেশের লোকসংস্কৃতি, পুরাণ-ইতিহাস, মহাকাব্যের আখ্যান ও সামাজিক আদর্শ সম্পর্কে অবহিত হতে উপদেশ দিতেন। বিনোদবিহারী বলেছেন, অবনীন্দ্রনাথ নিজের উদ্‌ভাবিত উপায়ে সাহিত্যধর্মী বর্ণনা ও নাটকীয় ভঙ্গির সাহায্যে আঁকার বিষয়-সম্পৃক্ত ভাবরূপ ছাত্রদের মনে জাগিয়ে তুলতেন। নিতান্ত বাধ্য না হলে কাগজে কলমে সংশোধন করতেন না। তাঁর সময়ের ছাত্ররা নিজেদের গরজে আর্ট গ্যালারির পুরোনো ছবি দেখে অনুশীলন করতেন এবং প্রধানত ঈশ্বরীপ্রসাদের কাছে রীতিবদ্ধ আঙ্গিক চর্চা করতেন, অবনীন্দ্রনাথ হাতে ধরে কাউকে বিশেষ কোনো আঙ্গিক শেখান নি। কোনো আর্ট স্কুলে এতখানি স্বাধীনতা, এমন মুক্ত পরিবেশ পাওয়া প্রায় অভাবনীয় ব্যাপার। শিক্ষক হিসাবে আর্ট স্কুলে আসবার (১৯০৫) আগেই অবনীন্দ্রনাথ তেন্‌শিন-এর সঙ্গে পরিচিত হন (১৯০২)। প্রথমবারের পরিচয়ে তিনি শিল্পশিক্ষার রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কতটা আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন জানা যায় নি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে অবনীন্দ্রনাথের শেখানোর পদ্ধতির সঙ্গে তেন্‌শিন-এর পদ্ধতি মিলে যায়।

ইয়োশিমি তাকেউচি লিখেছেন :

> তেন্‌শিন-এর শিক্ষাপদ্ধতির মূল লক্ষ্য ছিল শিল্পীর আন্তর-উপলব্ধি উদ্‌বোধিত করা। তিনি মনে করতেন, ছবির সারবস্তু বর্ণ বা ছায়াতপ নয়, শিল্পীর চিৎপ্রকর্ষ।[১]

তাঁর শেখানোর পদ্ধতি ছিল গভীর অভিভাবনাময়, Suggestive। কখনোই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিতেন না; মৃদু সংকেতে অভিপ্রায়টি ধরিয়ে দিতেন। তেন্‌শিন-এর ছেলে কাজুয়ো ওকাকুরার লেখা থেকে[২] জানা যায় নিপ্পোন্ বিজুৎসু-ইন্-এ অনুষ্ঠিত নিয়মিত আলোচনাচক্রে উপস্থিত সভ্যেরা একই বিষয় নিয়ে আঁকার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতেন। তেন্‌শিন আঁকতে দেওয়া বিষয়বস্তু সাক্ষাৎভাবে ছবিতে না এনে তার আনুষঙ্গিক অনুভূতি প্রকাশ করতে বলতেন। যেমন 'উজ্জ্বল চাঁদ' বিষয় হলে ছবিতে চাঁদ না এঁকে উজ্জ্বল চাঁদ যে অনুভূতি জাগায় সেই অনুভূতি ফোটাতে বলা হত। এইভাবে তিনি অভিভাবনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শেখাতেন। মাকোতো ঔওকা[৩] বলেছেন : কোনো ছাত্র ছবির কোনো থীম্ তেন্‌শিন-এর গোচরে আনলে তিনি ইতিহাস ও সাহিত্যের সূত্র থেকে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কল্পিত থীম্‌টি ঋদ্ধ করে তোলার উপায় বলে দিতেন। তিনি বলতেন, শুধু আঙ্গিক আয়ত্ত করা যথেষ্ট নয়, দেশের ইতিহাস-সাহিত্য-দর্শন সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন ভিন্ন বড়ো শিল্প সৃজন অসম্ভব। শিক্ষক হিসেবে তেন্‌শিন ও অবনীন্দ্রনাথ দুজনেই চেয়েছেন, জাতীয় পুরাণ-ইতিহাস চর্চায় তরুণ শিল্পীদের মন সমৃদ্ধ হোক। ক্রমাগত নির্দিষ্ট আঙ্গিকের চর্চা না করে স্বাধীনভাবে নানা আঙ্গিকের পরীক্ষার ভেতর দিয়ে শিল্পীর স্বকীয় প্রকাশরীতি গড়ে উঠুক। তাঁরা মনে করতেন, পদে পদে নির্দেশ দেওয়ায় ও সংশোধন করায় শিল্পীর মনের উদ্দীপনা নষ্ট হয়। গুরুর উচ্চ আসনের দূরত্বে

---

১. ইয়োশিমি তাকেউচি, "ওকাকুরা তেন্‌শিন", 'নিহোন নো শিসোকা' ('জাপানি মনীষা') গ্রন্থমালা প্রথম খণ্ড, তোকিয়ো ১৯.২, পৃ ৩৬১। —অনূদিত।

২. কাজুয়ো ওকাকুরা, 'চিচি ওকাকুরা তেন্‌শিন' ('আমার বাবা ওকাকুরা তেন্‌শিন'), তোকিয়ো ১৯৭১, পৃ ১৫৯

৩. মাকোতো ঔওকা, 'ওকাকুরা তেন্‌শিন', তোকিয়ো ১৯৭৫, পৃ ২৩৫-৩৬

নিজেকে সরিয়ে না রেখে তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্ক রচনা করতেন। অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, 'ছাত্র বলিনে, বলি পথ চলার সঙ্গী।'

প্রতিপক্ষের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তেন্‌শিন বিজুৎসু গাক্কোয় আট বছর (১৮৯০-৯৮) নিজের আদর্শে অবিচল থেকে কাজ করেন, একদল নিষ্ঠাবান তরুণ শিল্পী গড়ে তোলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত হন। নিজের আদর্শে কাজ করার জন্যে তাঁকে নিপ্পোন্ বিজুৎসু-ইন্ প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করতে হয়। হ্যাভেলের আমলের পরে সরকারি আর্টস্কুলে অবনীন্দ্রনাথকেও অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়েছিল। পরবর্তী অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন-এর সঙ্গে ক্রমে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিল। অবনীন্দ্রনাথ কখনো ছাত্রদের ক্লাসের নিয়ম-কানুনের মধ্যে বাঁধেন নি, 'ইচ্ছাসুখে' কাজ করবার সুযোগ দিয়ে এসেছেন। অধ্যক্ষ ব্রাউন স্কুলের শৃঙ্খলা ভাঙা হচ্ছে বলে আপত্তি তুললেন। ক্রমেই তিক্ততা বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ দশ বছরের সরকারি চাকরি (১৯০৫-১৫) থেকে পদত্যাগ করে চলে আসেন। এর আগেই ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর পত্তন হয়েছিল, সেখানে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেলেন। আর ছিল জোড়াসাঁকোর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দা।

৭

ওকাকুরা তেন্‌শিন-এর মৃত্যুর কয়েকমাস পরে ১৩২১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথ 'চিত্রে ছন্দ ও রস', 'ভারত ষড়ঙ্গ' ও 'ষড়ঙ্গ দর্শন' নামে তিনটি প্রবন্ধ লেখেন, যা পরে 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' পুস্তিকায় সংকলিত হয়েছে (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ)। তেন্‌শিন-এর সংস্রবে অবনীন্দ্রনাথের মনে বৃহত্তর প্রাচ্যের শিল্পভাবনা সম্পর্কে যে আগ্রহ জেগেছিল, তার পরিণাম চীন জাপান ও ভারতের চিত্রনীতি সম্পর্কে এই তুলনামূলক আলোচনা। বাৎস্যায়ন টীকায় যশোধর-এর সূত্র থেকে নেওয়া রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ— ছবির এই ছয় অঙ্গ অবনীন্দ্রনাথের আলোচনার ভিত্তি। রচনাটিতে তাঁর দীর্ঘ মননজাত সুস্থির সিদ্ধান্ত প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচ্যের প্রাচীন তিনটি জাতির পারস্পরিক ভাববিনিময়ের স্বীকৃত তথ্য থেকে মূল ভারতীয় ধারণার ক্রমিক বিস্তার-বিবর্তনের ধারাটি অবনীন্দ্রনাথ আশ্চর্য নৈপুণ্যে স্পষ্ট করে তুলেছেন; ভারত, চীন ও জাপানে অনুসৃত চিত্রনীতিগুলির আপাত-বৈসাদৃশ্যের অন্তর্গত একত্ব যুক্তিযুক্তভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। তেন্‌শিন 'দি আইডিয়াল্‌স্ অব দি ইস্ট' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, জাপানি সংস্কৃতি চীনের মাধ্যমে ভারত থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান আকর্ষণ করে নিয়ে পুষ্ট হয়েছিল। চিত্রনীতির ক্ষেত্রে এশীয় পন্থ্-এর মর্ম উন্মোচনে অবনীন্দ্রনাথ এই ইঙ্গিত অনুসরণ করে প্রাচ্য শিল্পভাবনার উৎসরূপে ভারতীয় মনীষার মর্যাদা প্রতিপন্ন করেছেন। রচনাটির আরো গুরুত্বপূর্ণ দিক: পরিশীলিত আধুনিক রুচির আলোয় ঐতিহ্য-ধৃত ধারণার সৃজনশীল মূল্যায়ন। তিনি যেভাবে ষড়ঙ্গসূত্রের মর্ম ব্যাখ্যা করেছেন তাতে সূত্রটি একালের শিল্পক্রিয়ারও মান্য আদর্শ হয়ে ওঠে। ভারতশিল্প বা প্রাচ্যশিল্প বিষয়ে জিজ্ঞাসু নন্দনতাত্ত্বিকেরা রচনাটিকে একটি প্রামাণ্য বিচারের মর্যাদা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-এর ইংরেজি অনুবাদে 'ভারত ষড়ঙ্গ' ও 'ষড়ঙ্গ দর্শন' প্রথমে 'মডার্ন রিভিয়্যু' (অক্টোবর ১৯১৫) পত্রিকায় এবং পরে ইণ্ডিয়ান

সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট থেকে প্রকাশিত পুস্তিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। ১৯২২-এ আঁদ্রে কার্পেলে তাঁর লেখা ভূমিকা-সংবলিত এর একটি ফরাসি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯৩০-এ বের্লিনের 'আটলান্টিস' পত্রিকায় (নভেম্বর সংখ্যা) এর একটি সংক্ষেপিত জর্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

পরিশেষে উল্লেখ করি ওকাকুরা তেন্‌শিন ও অবনীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা অনুসরণ করতে গিয়ে মনে হয়েছে, প্রাচ্য-আধুনিকতার সমস্যা-বিচারে এবং শিল্পের ক্ষেত্রে আধুনিকদের কর্তব্য নির্ণয়ে মতামতের ঐক্য সত্ত্বেও উভয়ের মানসিক ঝোঁক কিছুটা ভিন্ন, দৃষ্টিভঙ্গি হুবহু এক নয়। তেন্‌শিন সর্বদা শিল্পের উৎকর্ষকে religious বা spiritual শুদ্ধতা মনে করেন। প্রাচ্যশিল্পের ঐতিহ্যকে তিনি প্রাচ্য ধর্মভাবনার ধারার সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করেন। ধর্মীয় আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার উপরিস্তরে এশীয় জাতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে তিনি যত আগ্রহী, প্রত্যক্ষ শিল্পকর্মের প্রকরণ-বিষয়ক জ্ঞান আদান-প্রদান বা উচ্চতর মানস-সংস্কৃতির বস্তুভিত্তি-স্বরূপ সামাজিক আধারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি তত উৎসাহী নন। অবনীন্দ্রনাথের রচনায় এ ধরনের ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক ঝোঁক নেই বললেই চলে। যেখানে ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক মানসিকতার প্রসঙ্গ আসে সেখানে বিষয়টিকে অবনীন্দ্রনাথ একটি বিচার্য তথ্য হিসেবেই গ্রহণ করেন, ঐ বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হন না। বিশেষত তিনি লোকসমাজের আচার-অনুষ্ঠানের বস্তুভিত্তির উপরে নির্ভর করে উচ্চতর ধ্যান-ধারণার তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করেন। ছড়া-গানে, ডাক-খনার বচনে, মানবপন্থ্-এর পথিক কবীর-এর মতো সাধকের দোঁহায় সংবদ্ধ লৌকিক প্রজ্ঞার আলোয় নন্দনতত্ত্বের ব্যাসকূট ভেদ করেন। 'চিত্রে ছন্দ ও রস' -এর আলোচনায় 'রূপে রস, রসে রূপ' সম্প্রদানের রহস্য ব্যাখ্যায় 'দুই সুপর্ণের' রূপকের সাহায্য যেমন নেন, তেমনি স্ত্রীআচারের দৃষ্টান্ত থেকে নিজের ধারণার সমর্থন সংগ্রহ করেন। জীবনাচরণের বাস্তবতা থেকে আহরিত তাৎপর্যময় ইঙ্গিতগুলির আলোয় অবনীন্দ্রনাথ ভারত-চীন-জাপানের চিত্রনীতির যে সৃজনশীল ব্যাখ্যা দেন তা বাওঈ (Bowie), বিনিয়ন (Binyon) বা কুমারস্বামীর লেখায় পাওয়া যায় না; তেন্‌শিনও এ-ভাবে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন না।

তেন্‌শিন-এর ভাবনায় ধর্মীয়তা-আধ্যাত্মিকতার ঝোঁক এত তীব্র কেন তা বোঝার একটি সূত্র পাই। জাপানের জাতীয় মানসিকতায় যা-কিছু শুদ্ধ সমুন্নত তাকেই religious-spiritual মনে করার প্রবণতা দেখা যায়। ব্যক্তিগত আচরণের শুদ্ধতা কিংবা কোনো বাস্তব কর্তব্যে নিষ্ঠার ঐকান্তিকতাকেও তাঁরা religious বলেন। 'নিপ্পোন্ বিজুৎসুশি' নামে মুদ্রিত একটি বক্তৃতায় তেন্‌শিন বলেছিলেন: শুধুই সুন্দর কিন্তু আপন কালের মহত্তম ধর্মচেতনার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত কোনো শিল্পকে মহৎ বলা যায় না।[১] শিল্পরস আস্বাদনের অভিজ্ঞতা কী অর্থে ধর্মীয় উপলব্ধির সদৃশ বোঝাতে গিয়ে অন্যত্র লিখেছেন:

> Nothing is more hallowing than the union of kindred spirits in art. At the moment of meeting, the art-lover transcends himself. Atonce he is and is not. He catches a glimpse of Infinity, but words cannot voice his delight, for the eye has no tongue. *Freed from the fetters of matter, his spirit moves in the rhythm*

১. 'তেন্‌শিন জেন্‌শু' ('তেন্‌শিন-এর রচনা সংগ্রহ'), তোকিয়ো ১৯২২, পৃ ৩১১

> *of thing. It is thus that art becomes akin to religion and ennobles mankind. It is this which makes a masterpiece something sacred.*[১]

বোঝা যায়, এই আধুনিক জাপানি মনীষী তাঁর স্বজাতির আবহমান মননভঙ্গির প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত। 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' রসের প্রাচীন ভারতীয় ধারণার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথও পরিচিত ছিলেন, এই ধারণা তিনি নিজস্ব নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা বিশ্লেষণে কাজেও লাগিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মননে সেই তুরীয় রসধ্যানের প্রভাব সামান্যই। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের প্রত্যক্ষ রূপায়ণের দিক সম্পর্কেই বেশি আগ্রহী। এই কারণে তেন্‌শিন-এর তুলনায় অবনীন্দ্রনাথকে আমার আধুনিক অর্থে শুদ্ধতর শিল্পদৃষ্টির অধিকারী মনে হয়।

১. "Art Appreciation", *The Book of Tea*, Tokyo 1957, P. 81-82, উদ্‌ধৃতির ইটালিক বর্তমান লেখকের।

কল্পনার হিস্টিরিয়া

শঙ্খ ঘোষ

রানী চন্দকে একবার বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ : 'শিল্পী যে, সে শুধু ছবিই আঁকবে কেন ? তার সৃষ্টি যেদিকে যে রূপে ফুটে উঠবে সেই দিকেই সে যাবে।' বোঝা যায় যে এই স্বাধীনতার বোধ নিয়েই কখনো ছবি-আঁকা ধরছিলেন কখনো ছবি-আঁকা ছাড়ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। আর, যখন আঁকছিলেনও, তখনো ঠিক একই আদর্শের পুনরাবৃত্তি ছিল না তাঁর ছবির জগতে, একইভাবে বিচার করা চলত না 'শাজাহানের মৃত্যু' আর কণারক-সিরিজকে, কবিকঙ্কণ-গুচ্ছ আর তাঁর মুখোশগুলিকে। সৃষ্টি যে দিকে যে রূপে ফুটে উঠতে চেয়েছে সেভাবেই শিল্পী তখন টানতে চেয়েছেন তাঁর তুলি।

ঠিক সেইরকমই, অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যের কলমকেও ব্যবহার করেছেন নানা ভিন্ন ধরনে, এক আদর্শে ধরা যায় না তাঁর 'রাজকাহিনী' আর 'বাদশাহী গল্পে'র গদ্য। একদিন যিনি কেবল রবিকা-র ভরসায় গদ্যলেখায় হাত দিয়েছিলেন, ছবি-আঁকার মধ্যে মধ্যে ছবির মেজাজেই গদ্য তৈরি করছিলেন যিনি, তাঁর ধরন একেবারে পালটে গেল পরে। 'রাজকাহিনী' থেকে 'আলোর ফুলকি', 'আলোর ফুলকি' থেকে 'বুড়ো আংলা' : অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে এই আমাদের পরিচিত পৃথিবী। কিন্তু শেষ পঁচিশ বছর জুড়ে আরো যে অজস্র লিখেছেন তিনি, যার অল্পই এখনো সংকলিত হয়েছে তাঁর বইয়ের মধ্যে, সেখানে দেখা দিচ্ছে একটা পালটা ধাক্কা, যেন ভাষার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে আসছে কোনো প্রতিভাষা। যে কথকতার ভঙ্গিকে বলা হয়েছে তাঁর গদ্যের অন্যতম গুণ, সেইটেই এখন আসছে এমন একটা অর্থপারম্পর্যহীন স্রোতের মতো যে গোটা ব্যাপারটা হয়ে উঠছে কেবল কথার কৌতুক, শব্দ থেকে শব্দে সরে যাওয়ার মজা। একদিন ছিল তাঁর গদ্যের এই চরিত্র :

> একটা ঝড় অনেকখানি ঠাণ্ডা হাওয়ার ধাক্কায় গাছপালা ঘরবাড়ি জলস্থল আকাশ তুলিয়ে দিয়ে চলে গেল, অনেকখানি বৃষ্টির জল ঝরঝর করে চারিদিকে ঝরে পড়ল, বিদ্যুৎ বাজ খানিক চমক দিয়ে ধমক দিয়ে চলে গেল ; তারপরে মেঘ আস্তে-আস্তে পাতলা হয়ে এল, রাত্রিশেষের সঙ্গে রুপোর মতো শাদা আলো ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে অন্ধকারকে ক্রমে ফিকে করে ভোরের একটি ছোটো পাখির গানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল। (চণ্ড/রাজকাহিনী)

এই দীর্ঘ বয়নের মধ্যে ছিল একটা ছবি জাগিয়ে তোলার প্রাঞ্জলতা। কিন্তু তার বদলে একদিন এল এই গদ্য :

> দেখতে দেখতে সৃষ্টির প্রাক্কাল মধ্যাহ্নকাল সায়ংকাল কেটে ঘোরতর অমানিশার চেয়ে তিন ডবল অন্ধকার রাত এসে পড়ল! প্রথম সৃষ্টিতে দিন হল খতম। যেমন অন্ধকার নামা, আর জীবজন্তু সব কামড়া কামড়ি শুরু করা! সৃষ্টিতে অনাসৃষ্টিতে বেধে গেল! বিরাট জীবজন্তুদের বিকট হাঁকডাক! চচ্চড় ছিঁড়ে চাম্ যেন কলাপাতা ফাঁড়া হচ্ছে, শালপাতা হচ্ছে প্রীতিভোজের দিনে। (হেতিহোতির বৃত্তান্ত)

এই বর্ণনায় ছবির চেয়ে ধ্বনির ঝোঁকটা বড়ো। পরম্পরায় এখানে তাই আসে প্রাক্কাল মধ্যাহ্নকাল সায়ংকাল, অথবা দেখা দেয় বাক্যাবলিতে ক্রিয়াপদের বিচিত্র ব্যবহার, আর শেষ বাক্যে এসে পৌঁছয় 'চচ্চড় ছিঁড়্ছে চাম্'। ধ্বনির মধ্যে এখন তিনি বাজনা শুনতে চান, বাজনা শুনতে পান বলেই লেখেন :

খাস্তা নাস্তা পেট কি ওয়াস্তা না কুছ মজুদ্ হুয়ে গোমস্তা নাস্তা-নাবুঁদ। বুঝলে কিছু বাদোশাবাবু? না, তবে ওটা শুনতে জাঁকাল; যেমন কত্তাল বাজছে কাছে 'খাস্তা নাস্তা নাস্তা নাবুদ'।

(বাদশাহী গল্প)

এই প্রবণতাই অবনীন্দ্রনাথের গদ্যকে টেনে আনছে কিছু-বা পদ্যের দিকে, ছন্দের মাপ পুরো না-মেনেও একটা ছন্দ জাগিয়ে দেবার আয়োজন আসছে তাঁর লেখায়, আর মেতে উঠছেন তিনি মিলের ফুর্তিতে। এক সময়ে যিনি বলছিলেন : 'শিল্পীর কাজ কোলাবোরেশন। ছবিতে গানে কথায় মিলিয়ে সব হবে,' সেই কোলাবোরেশনের এক বিহ্বল চেহারা দেখাতে লাগলেন তিনি এইসব গদ্যে :

ঘোষের পোর মুখ বিবর্ণ, ঘাড়ের সাথে ফিরল কর্ণ, গোধূলির গোলাপি বর্ণ, কোথাও তার চিহ্নও আর নাই। গা-হাত-পা ঝিন্ ঝিন্, মন বলল, এটা রাত না দিন? পিছনে শব্দ পায় টুপটাপ ঘুটঘাট— যেন কাঠের খড়ম পায়ে হাঁটছে কেউ ভেঙে মাঠ, নিয়ে তারি পাছ। আর কোথা আছে! ঘোষের পোর ঘামে ভিজল আতরমাখা মেরজাই ফিনফিন। (হানাবাড়ির কারখানা)

মিলের টানে এখানে 'ভেঙে মাঠ' অথবা 'মেরজাই ফিনফিন' লেখাও সম্ভব হল, গদ্যের চলন এখানে থমকে যাচ্ছে কিনা সে কথা ভাববার আর দরকার হল না তাঁর।

পরপর তিন বছর জুড়ে (১৩৪৫ বৈশাখ - ১৩৪৭ ফাল্গুন) একসময়ে অবনীন্দ্রনাথ 'রংমশালে'র পাতায় লিখছিলেন 'বাদশাহী গল্প' আর 'চটজলদী কবিতা'। গল্প যখন শেষ হল, কবিতার তখন শুরু। কিন্তু পড়ে দেখলে বোঝা যায় যে এর গল্পও ঠিক গল্প নয়, কবিতাও নয় কবিতা। পুঁথিতে আর যাত্রাপালায় যে কিমাকার জগৎ তৈরি হচ্ছিল, এরও অবলম্বন সেই একই তালমানছেঁড়া খেয়ালখুশি, আর তাকে প্রকাশ করবার ভাষাতেও তিনি ভেঙে দিচ্ছিলেন সব রকমের পূর্বসংস্কার, যেমন পূর্বসংস্কার ভাঙছিলেন তিনি সমকালীন কবিকঙ্কণ ছবির গুচ্ছে। তাই 'বাদশাহী গল্প' আর 'চটজলদী কবিতা' কেবল নামতই ভিন্ন, দুই-ই মিলে আছে গদ্যপদ্যের এক মিশ্র ভূমিতে। 'দেখেন সগরাশ্বমেধের ঘোড়ার আক্কেল দাঁত/সিলোনে পাওয়া মাটির তলায় পাঁচ হাত' এ যদি হয় 'বাদশাহী গল্পে'র লাইন, তবে 'চটজলদী কবিতা'র লাইন স্বচ্ছন্দে হতে পারে এ-রকম : 'দেখ্ ব্রাহ্মণকে কাহিল শরীরে বকাস্ নে বল্ কী বলবি।' তার মানে কেবল এই যে এসব রচনায়, অথবা 'হানাবাড়ির কারখানা'য়, কিংবা অসংকলিত আরো তাঁর নানা রচনায় অবনীন্দ্রনাথ এমন এক গদ্যরীতিতে এসে পৌঁছলেন যার কোনো সাধু প্রতিপত্তি নেই, সৌষম্য নেই, আর পাঠকের কাছে তার আবেদন বিষয়েও খুব নিশ্চয়তা নেই। এ কথা বলা যায় না যে এসব লেখার আছে কোনো কাহিনীগত টান, প্রভাময় কোনো প্রতিমাবলয় তৈরি হয়ে উঠছে বলেও মনে হয় না তেমন। একটা রূপ ফুটে উঠতে না উঠতেই সব ঝাপসা হয়ে যায় ধ্বনির আঘাতে, এবং মধ্যবর্তী মিলের আয়োজনও প্রতি পদক্ষেপে থমকে দেয় আমাদের পাঠ। 'আলোর ফুলকি'র যুগ পর্যন্ত যা ছিল কথার চালে উঠে-আসা অনায়াস মিল, যার ছিল কচিৎ-প্রয়োগ, পরবর্তী রচনায় সেইটেই হয়ে উঠল এক সচেতন চর্চা, আর অনর্গল তার ব্যবহার। মিলের একটা গুণ নিশ্চয় এই যে সে এক

অলক্ষ্য সামঞ্জস্যে বেঁধে নেয় বর্ণনাকে, অথবা আবেগকে; দুলিয়ে দিয়ে যায় মনকে। কিন্তু তার অতিপ্রয়োগের একটা দোষ তেমনি এই যে কেবলই সে পিছন দিকে টেনে ধরতে চায় মন। গল্পের মধ্যে মধ্যে কেবলই এই মিলের খেলা লেখকের সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও অসংগতরকম সচেতন করে তোলে, আনে একটা পিছনটান, থমকে থমকে চলা। তাই অবনীন্দ্রনাথের এই রচনাগুলিতে যতটুকু-বা গল্প-ছবি আছে, তাও হারিয়ে যেতে চায় মিলের মধ্যে, শব্দগত চাতুর্যে, অনুষঙ্গ থেকে অনুষঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে চলায়। শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁর একটি চিঠিতে (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১):

> আমাদের এবং অনেককে যখনই এই লেখাগুলি পড়ে শোনাতেন তখন বলতেন— এ লেখাগুলো পড়বার গল্প নয়—শোনবার গল্প। একজন পড়বে অন্যেরা শুনবে— ঠিকভাবে পড়তে না পারলে এর রস জমে না। দাদামশায় পড়তেন আর বাতাসের উপর দিয়ে তাঁর ডান হাতের লম্বা লম্বা পাঁচটা আঙুল নানা ভঙ্গিতে ঢেউ খেলে যেত, গলার স্বর কখনো উঠত কখনো নামত। সেইসব দৃশ্য যেন এখনো পরিষ্কার চোখের সামনে দেখতে পাই।

গলার স্বরের এই ওঠানামায় একটা রস জমে ওঠে ঠিকই, কিন্তু সে একটা ধ্বনির রস, ছবির রস ততটা নয়। আর বস্তুবিরল এই ধ্বনির রস অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে না মন। পাঠকের যে বাধা, সেটা শ্রোতার পক্ষেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না একেবারে।

এমন নয় যে অবনীন্দ্রনাথ জানতেন না এসব লেখার এই বিপদ। তিনি জানতেন যে, যা তিনি লিখছেন এখন, সেখানে আছে কেবল 'কল্পনার হিস্টিরিয়া'। তাঁর গল্পের শ্রোতারা তাই, তাঁর নিজের বর্ণনাতেই শুনি, কখনো কখনো 'হাই তোলে', কখনো বলে 'কাল চাই ভালো গল্প', কখনো 'না, আমার ঘুম পাচ্ছে' বলে সরে পড়তে চায়। বাদশাবাবু তাঁকে জানিয়ে দেন, 'সবাই বলছে তোমার ছবিতে যেমন শিল্পরস নেই, তেমনি তোমার গল্পেও সাহিত্যরস নেই।' এর উত্তরে দাদামশায়ের কৈফিয়ত কেবল এইটুকু :

> আমি রসের ব্যাপারি
> চরস বেচি না কিনা না কিনা ইচ্ছা তোমারি।

২

সামান্য এই কৈফিয়তটুকুর আড়ালে নিশ্চয় বড়ো রকমের একটা জেদ কাজ করছে কোথাও। কেননা, সাহিত্যশাস্ত্রীদের তর্জন উপেক্ষা করে কেবল-যে ওই গল্পটিকেই তিনি এগিয়ে নিলেন তা নয়, ওর পরেও ছোটো বড়ো আরো অন্তত পঞ্চাশটি এমন লেখা ছাপলেন যার কোনো প্রচলিত 'সাহিত্যরস' নেই। এ কি কেবল জেনেশুনে আলস্যচর্চা? অভ্যাসের অসহায় রোমন্থন? না কি সচেতন কোনো পরিকল্পনার ফল?

ছোটোরা যখন গল্প লিখতে ভয় পেত, অবনীন্দ্রনাথ বলতেন : 'স্বপ্ন দেখিস না? স্বপ্নগুলো লিখে ফেল্, দেখবি গল্প আপনি এসে যাবে!' মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন যে এইভাবে তাঁদের ছোটোবেলায় তৈরি হয়েছিল ঢালাও কাগজে লেখা এক 'স্বপ্নের মোড়ক', অবনীন্দ্রনাথ নিজেও

বালিকা

তাতে লিখতেন তাঁর স্বপ্ন। এ যে কেবল ছোটোদের উশকে দেওয়া তাই নয়, এর মধ্যে পাওয়া যায় গল্পবিষয়ে তাঁর নিজেরও কিছু ধারণা, বোঝা যায় যে গদ্যেও তাঁর সৃজনশীল মন ঘুরতে চাইছে যুক্তিময় গদ্যজগতের বাইরে। প্লটের কোনো বাঁধুনি নয়, তাঁর নিজের মৌলিক গল্পগুলিতে বর্ণনা চলতে থাকে স্বপ্নস্রোতের মতোই। একে হয়তো সাজিয়ে নেওয়া যেত শীলিত শিল্পের ফ্রেমে, মার্জিত করা চলত সাহিত্যশ্রীতে, কিন্তু তখনই নিশ্চয় অবনীন্দ্রনাথের মন বলে উঠত 'কুটুমকাটামে'র সৃষ্টিধরনে : 'দেখো যেন ফিনিশটিনিশ করতে যেও না— শুধু উড়িয়ে দেবে ঐটুকু।'

সত্যি বলতে, এই ফিনিশ করতে না-চাওয়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে সাধু শিল্পের বিরুদ্ধে একটা অভিমান। একবার, প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের 'কাদম্বরী' অনুবাদে 'মাঝে মাঝে দুচারটে প্রাকৃত বাংলা শব্দ অতিরিক্ত গ্রাম্য হয়েছে', রবীন্দ্রনাথের এই অনুযোগ শুনে অবনীন্দ্রনাথ নাকি

> একেবারে খাপ্পা। বলেন— ত্যাখ্, তুই বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস। রবিকার কাছে যদি শিখতে চাস তো সেখানেই ভেসে পড়্। আমার কাছে আর ছবি লিখতে আসিস নি। ছেলেগুলোর মাথা মুড়োতে রবিকার হাত একেবারে ক্ষুর-সিদ্ধ। দুঃখু করিস নি। আমাকেও একদিন বলেছিলেন, 'অবন, বেশ ছবি আঁকছিলে, আবার কলম ধরেছ কেন? লেখাটেখাগুলো ছাড়ো।' কই, আমি কি ছাড়তে পেরেছি?··· যাস্ নে রবিকা-র কাছে। প্রুফগুলো আমার কাছে পাঠিয়ে দিস।

যদি ধরেও নেওয়া যায় যে এর ভাষাভঙ্গি অনেকটাই প্রবোধেন্দুনাথের নিজস্ব, তা হলেও এই বিবরণ থেকে আমাদের প্রত্যাশিত বড়ো একটা ইঙ্গিত পেয়ে যাই। ছবিছুট অবনীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ যে ছবির দিকে ফিরিয়ে আনতে চাইছিলেন, এ কথার একটা দিক আমরা লক্ষ করেছি এতদিন। কিন্তু এর অন্য একটা দিক নিশ্চয় এই যে কবি মনে করছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ কেবল অপচয় করছেন তাঁর সময়ের। যাত্রাপালা শুনে মন্তব্যহীন উঠে যেতেন তিনি, অথবা 'আবার কলম ধরেছ কেন' বলে এই যে প্রশ্ন করতেন অবনীন্দ্রনাথকে, তার একটা কারণ কি এই যে এখানে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন কথা পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, যে পরিবেশ অভ্যস্ত সাহিত্যরুচিতে একেবারেই মানায় না? ইতিহাসের এই এক কৌতুক : যাঁকে নিজেই একদিন কলম ধরিয়েছিলেন কবি, তাঁর হাত থেকে আজ তিনি সরিয়ে নিতে চান কলম। কিন্তু তবু অবনীন্দ্রনাথ, তাঁর ওই তপ্ত সংলাপে, তৈরি করছেন যেন রাবীন্দ্রিকতার প্রতিস্পর্ধী এক শৈলী, এমন-কি শিষ্যদের বলতে পারছেন সগর্বে : যাস্‌নে রবিকার কাছে। কয়েকটি প্রাকৃত শব্দের গ্রাম্য ব্যবহার দেখে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ণ ছিলেন, আর অবনীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় ইচ্ছে করেই ছড়িয়ে দেবেন ছ্রাবণ, প্রীতিপদ্দ, ব্রক্ত (বিরক্ত), ইস্‌চে (ইচ্ছে), সৈষ্ঠব, আবাজ, ছেংছন, মিচিধরার মতো হাজার হাজার উল্টোপাল্টা শব্দ। এইভাবে অবনীন্দ্রনাথের কাছে তৈরি হয় ভাষাপ্রকাশের এক বিপর্যস্ত আদর্শ, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি বলতে পারেন : 'আমি গান বাঁধি ছড়ার গান, যাত্রার গান— আর রবিকা গান বাঁধেন পড়ার গান, নড়ার গান।'

ছোটো-একটি কথিকায় অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ছবিওয়ালা কবিওয়ালা আর খবরওয়ালার এক তুলনা : 'কবি শোনান সাঁওতালি গান, ছবি দেখান কালো চেহারা। খবরী দেখেশুনে বললেন— যাচ্ছেতাই। অতি তুচ্ছ, গেঁয়ো জিনিস, একটুও ভালো লাগল না। আর্ট নেই, ভাল্‌গার।' জীবনের

শেষাংশে আমাদের শিল্পী জেনেশুনেই বাসা নিয়েছেন এই না-আর্টের ভালগার জগতে। এসব জগতে এখন তাঁর প্রধান পাত্রপাত্রী কারা? এটা আকস্মিক ব্যাপার নয় যে 'আপন কথা'র স্মৃতিচারণ শুরু হয়েছিল পদ্মদাসীকে দিয়ে। ঠাকুরবাড়ির একটি পুরোনো ছবি গড়ে ওঠে 'আপন কথা'র লেখাগুলিতে কিন্তু সে-ছবি কতই ভিন্ন 'জীবনস্মৃতি'র ঠাকুরবাড়ি থেকে। রবীন্দ্রনাথও অল্প অবসরে বলে নিয়েছিলেন জ্যোৎস্নার আলোয় বসা দাসীদের গল্প; তাদের মুখের ছড়া যে মনে গেঁথে আছে তাঁর, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন একবার। কিন্তু তেমন কোনো জ্যোৎস্নাধোয়া স্নিগ্ধ বর্ণনা নয়, অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতি ভরাট হয়ে থাকে সৌরভী মঞ্জরী কামিনী রসোদাসী পদ্মদাসীদের নিয়ে; নন্দ ফরাশ, সমশের কোচম্যান, গোবিন্দ খোঁড়া, রামলাল চাকর, বুড়ো জমাদার, উড়ে বেয়ারা, ভিস্তি মুটে চৌকিদার ডাক-পেয়াদা গোমস্তা মুহুরির নানা কথাই হয়ে ওঠে তাঁর আপন কথা। এটা লক্ষ করতে ভুল হয় না যে এই চরিত্রগুলিই আবার ভিড় করে আসে 'হানাবাড়ির কারখানা'র গোয়ালা গোয়ালিনী, তাঁতির পো, মুচির শ্বশুর চামার অথবা দপ্তরি মুহুরি পেশকারের মধ্যে; অথবা 'বাদশাহী গল্পে'র রাঁধুনি ঠাকুর, নাপিত, ছিরে মেথর, যুধিষ্ঠির মালী, মথুর দারোয়ান, জগু মুনসী আর বিশ্বেশ্বর হুঁকোবরদারদের মধ্যে। তাই অবনীন্দ্রনাথের শৈলী যে তৈরি করে তুলবে একটা অবজগৎ, সাহিত্যশ্রীর প্রচলিত মান থেকে সেটা ভেঙে দাঁড়াবে দূরে, এ খানিকটা প্রত্যাশিত ছিল। প্রত্যাশিত ছিল 'মাসি' বইতে অনেক-অনেক দাসদাসী বিষয়ে তাঁর এই কৌতূহল :

আর সেই যে ছিল গোবরার মা—
জাঁতা ঘোরাত দিনে,
রাতে দাবাত পা,
মাইনেও নিত না, দেশেও যেত না—
তাকে কি দাসীহাটে কিনেছিলে, মাসি ?...
কাজেতে যেমন খেলাতে তেমন মজবুত
ছিল তারা বড়ো অদ্ভুত।
না চাকর, না নফর, না বাঁদী, না দাসী,
তারা কে ছিল ভেবে পাই নে, মাসি।

মাসি যে এর উত্তরে বলেন, 'অবু, তারা তোমারও কেউ ছিল, আমারও কেউ ছিল, পাখিরও কেউ ছিল, বেড়ালেরও কেউ ছিল', সেই উত্তরটিরই এক বেদনা ছড়িয়ে আছে অবনীন্দ্রনাথের এই ভাঙা শৈলীর মধ্যে, এই বেদনাকে উলটে ধরেই তিনি তৈরি করতে চান তাঁর অদ্ভুতের ভুবন :

ঠিক এইখানে পৌঁছবার জন্যই অবনীন্দ্রনাথকে ছেড়ে আসতে হয়েছে তাঁর পুরোনো রঙমহল। ঠিক এইখানে পৌঁছবার জন্যই নিজেকে দুখানা করে ভেঙে নিতে হয়েছে তাঁর। 'পথে বিপথে'র টুকরোগুলি লেখা শুরু হয়েছিল ১৩২৩ সালের বৈশাখে। এ বইতেই আমরা প্রথম টের পাচ্ছি কীভাবে চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের হাত ছেড়ে বেরোতে চাইছেন একজন কথক অবিন ঠাকুর। 'পথে বিপথে' ছবিতে ভরা, কিন্তু এখানে আমরা স্তব্ধ হয়ে শুনছি এক পাঁজরের স্বপ্ন, দেখছি সেই হাড়খানা যেখানে স্বপ্নের বাসা,

শুনছি এই স্বীকৃতি : 'আমার বুকের ভিতরে সব হাড়গুলো বাঁশির মতো ফাঁপা ও ফুটো।' তাই সম্ভাবনা দেখা দেয় ভাবী এক মানুষের, যিনি 'মনুসংহিতায়, বাইবেলে, কোরানে যেগুলো শুদ্ধ, সেগুলো বিরুদ্ধ কাজে খাটিয়ে আপনার চারিদিকে এমন একটা হাস্যরসের এবং অদ্ভুত রসের অবতারণা করে রেখেছেন যে, মন সেখানে এসে দুঃসাহসে ভরে না উঠে যায় না।' অবিনের কাছে এই গল্পগুলি শুনতে শুনতে চোখ খুলে হঠাৎ দেখেন অবনীন্দ্রনাথ, 'যেখানকার সেইখানেই আছি— পূর্বের মতো শ্রীঅবনীন্দ্র। রামধনুক আর পক্ষীরাজের সঙ্গে অবিনটা পালিয়েছে।' ছবিতে তিনি সই করতেন 'শ্রীঅবনীন্দ্র', সকলেরই নিশ্চয় মনে পড়বে। ছবির সেই অবনীন্দ্রনাথ ওখানে রইলেন পড়ে। দাস-দাসীদের জগতে, শুদ্ধকে বিরুদ্ধ করবার জগতে, প্রাকৃত আর গ্রাম্যভাষার জগতে, দুঃসাহসিক অদ্ভুত রসের শব্দক্রীড়ার জগতে এবার উড়ে চললেন অবিন।

কিন্তু এ কি কেবল উড়ে চলাই, না কি পৌঁছেও দেওয়া কোথাও? এটা বোঝা যায় যে একটা ভিন্ন উদ্দীপনা কাজ করছে তাঁর রচনার ইতিহাসে, কাজ করছে একটা ভিন্ন আদর্শ। কিন্তু সে-আদর্শ কি শেষ পর্যন্ত বয়স্ক মননে তেমন কোনো স্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়? তাঁর অভিপ্রায় আমরা বুঝতে পারি বটে, কিন্তু তাঁর শেষ যুগের এই সৃষ্টিসমাজ কি বড়ো রকমের কোনো আলোড়ন আনছে আমাদের সমগ্র বোধে?

৩

এ কথার উত্তর খুঁজবার আগে, তুলনায় এখানে ভাবতে ইচ্ছে করে একেবারে ভিন্ন দেশের ভিন্ন এক শিল্পীর কথা। তাঁর ছবির রাজ্য থেকে সরে এসে পিকাসো-ও কখনো কখনো খেলাচ্ছলে তৈরি করতেন পদ্য অথবা পালা। এ-রকমই দুটি আশ্চর্য পালা তাঁর Desire Caught by the Tail আর The Four Little Girls। অবনীন্দ্রনাথের মতোই, পিকাসো-ও তাঁর এই নাটক ভরে তুলছেন ভাষার মজায়; মানছেন না কোনো অন্বয়, ছড়িয়ে দিচ্ছেন ছড়া ছবি ধাঁধা প্রবাদ আর অর্থহীন কথার ছর্রা; তাঁরও নেশা যেন এক শব্দ বাজানোর খেলাতেই। অবনীন্দ্রনাথের 'ফলেই ফলাই ফল না হয় বিফল, তবেই সফল সব যদি হয় ফল' যেমন (বাদশাহী গল্প), পিকাসো-ও তেমনি নেশা ধরিয়ে দেন The Four Little Girls-এর এইসব অংশে :

> The life of life to life of life if life the life to life for life so life to life the life the death to death so death the death to death of life to death so life so death the life the death to life of scented life…

অবনীন্দ্রনাথ দেখেন 'ঝুমকা লতার সুর্মা' (সিকস্তিপয়স্তি কথা), তাঁর রোদ যেন 'ওৎ পেতে বসে চট্ করে কাউকে গিলে সট্ সরে যায়' (ভবের হাটে হেতি হোতি), পিকাসোরও তেমনি পাখিদের আছে শিং, ফুলেরা খুঁটে খায় আঙুলের নখ, মেঘ দিয়ে সেখানে মুছে নেওয়া হয় জানালার কাঁচ। পিকাসো দেখেন শাদার নীল, গোলাপের নীল, হলুদের নীল, লালের নীল, লেবুর নীল, কমলার নীল। এখানেও হঠাৎ দেখা দেয় কোনো চরিত্রের সচেতন এই ঝংকার : Shut up, you bore us! ছবিতে যে

ছেঁড়াখোঁড়া পথের মানুষ তুলে আনতে চেয়েছিলেন পিকাসো, সেই একই আকর্ষণ তাঁকে টেনে আনে ভাষার এই পথচলতি খেয়ালে।

কিন্তু প্রথমে যাকে মনে হয় খেয়াল মাত্র, তার মধ্য দিয়ে পিকাসো যে ছুঁতে চেয়েছেন তাঁর আর্ত সমকালকে, একটু পরেই সেটা ধরা পড়ে। Desire Caught by the Tail লেখা হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, বিধ্বস্ত পারীর পরিবেশে। প্লটের বাঁধুনিহারা এই গল্প ক্রমে হয়ে ওঠে তীব্র এক খিদের গল্প, বাসনার গল্প; আর তাই এর প্রথম দৃশ্য শুরু হয় প্লেটের ওপর সাজানো মাছ মাংস মদ আর একখণ্ড মানুষের মাথা দিয়ে। এটা আশ্চর্যের নয় যে সেদিনকার ফরাসী মনীষীরা এক গভীরতর সংলগ্নতার বোধ খুঁজে পেয়েছিলেন এই লেখায়, মেতে উঠেছিলেন অনেকখানি, নাট্যপাঠে ভূমিকা নিতে এগিয়ে এসেছিলেন কামু সার্ত বা সিমোন-দ্য-বোভোয়ার মতো মানুষেরা।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর খেয়ালখুশির জগৎ নিয়ে ঠিক সেভাবে কি আকর্ষণ করতে পারেন কোনো বয়স্ক মনন? এ প্রশ্ন হয়তো উঠত না, যদি 'জেন্তসভা'য় আমরা সুন্দরবনের বাঘের এই বক্তৃতা না শুনতাম: 'আমরা লড়াই দেব, খুনজখম, রক্তপাত করব, মানুষের জাতকে জাত পৃথিবী থেকে লোপ করে দেব! এসো বড়ো বড়ো সব জানোয়ার, সেনাপতি হয়ে সব এগিয়ে এসো।' অথবা, যদি-না লিখতেন তিনি 'বাবুইপাখির ওড়নবৃত্তান্ত', যেখানে শহরবাসী বাবুইরা বলেন 'একে তো শহরের আবহাওয়া ফাঁকার মতো ভালো নয়, তার উপর মিছরি না পেলে, আমরা কী সুখে বাঁচি?' যেখানে বর্ণনা শুনি ঘুণ পিঁপড়েদের, যারা 'দেশের মাথা, আজন্ম এঁরা পালকের গদি আর পালকের সাজসজ্জা করে থাকেন।'

কিন্তু তবুও, কেউ বলতে পারেন, পিকাসোর সঙ্গে এই তুলনা কি অন্য অর্থে একটু অসংগত নয়? যদিও The Four Little Girlsএর চরিত্রগুলি ছিল শিশু, তা হলেও পিকাসো ঠিক কিশোর সাহিত্য বানিয়ে তোলেন নি তাঁর নাটককে। এর সঙ্গে কি মিলিয়ে দেখা ঠিক অবনীন্দ্রনাথের লেখাগুলিকে?

সর্বাঙ্গীণ তুলনায় কোনো মানে নেই ঠিকই। এই প্রসঙ্গের উত্থাপন কেবল একটি সমস্যাকে বুঝে নেবার জন্য। কিন্তু তখনো, এই একটি কথার স্পষ্ট উচ্চারণ দরকার যে অবনীন্দ্রনাথের রচনায় কিশোর সাহিত্য অল্পই আছে। অন্তত উত্তরপর্বের যে রচনাগুলির কথা আমরা ভাবছি এখানে, কুটুমকাটাম যাত্রাপালা পুঁথিপত্রের সমকালীন সেই গদ্যরচনাগুলিতে ভাবনা যেভাবে শব্দে শব্দে ঝাঁপ দিয়ে চলে; শব্দের কৌতুককে যেভাবে লক্ষ করতে আহ্বান করেন লেখক, কিংবা যে ব্যক্তিগত নস্টালজিয়ায় ভেসে পড়তে চান কখনো কখনো, তার স্বাদ ঠিক কিশোরসেব্য নয়। কোনো কিশোর কখনোই পছন্দ করবে না এই লেখাগুলি, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। বলাই বাহুল্য যে অনেক কিশোরই অনেই সময়ে ছুঁতে পারে বয়স্কযোগ্য রচনা। বলতে চাই কেবল এইটুকু যে এই রচনাবলির প্রকৃতিকে বিশেষ রূপে কিশোরচিহ্নিত বলার মানে নেই কোনো। তাদের সামনে একটা অস্পষ্ট ঢেউ রেখে দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের মন চলতে থাকে তাঁর নিজেরই খেয়ালী মেজাজে।

কিশোরচিহ্নিত বলার মানে নেই, সুকুমার রায়ের মতো কোনো নির্ভার শব্দকৌতুকও নয় এর, অথচ বয়স্কের অভিজ্ঞতাতেও এর ভর বেশিক্ষণ নয়। পড়তে পড়তে অল্প পরেই একটা হাঁপ ধরে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায় এর মধ্যে। তাঁর সমকালীন সেই বিদেশী শিল্পীর খেয়ালের সঙ্গে তাই তাঁর সাদৃশ্য ঘটে না ঠিক। কেননা, 'জেন্তসভা' বা 'বাবুইপাখি'তে যে ভরসা রেখে যান অবনীন্দ্রনাথ, ছড়া ছবি

ধাঁধা প্রবাদ আর অর্থহীন কথার ছর্‌রাকে তিনি শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করেন না তেমন-কোনো বাস্তবতাকে বুঝে নেবার গরজে, যেমন করতে চেয়েছিলেন পিকাসো। ছড়া-পুরাণের উপাদান কতটুকু তাঁকে সাহায্য করছে এসব লেখায়? তাঁর শিল্পতত্ত্বে এটা অবশ্যই বলেন অবনীন্দ্রনাথ, অতীত আর ঐতিহ্য এক নয়। তিনি জানেন যে ঐতিহ্যকে প্রবহমাণ করে তুলতে হয় বর্তমানের খাতে, ওরিয়েণ্টাল আর্ট কথাটার আবর্তনে সবচেয়ে বিরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি নিজেই। কিন্তু কীভাবে ছুঁতে পারবেন এই বর্তমানকে কোন্‌খানে স্থির করবেন নিজেকে, কোন্ জগৎকে ধরবেন তিনি তাঁর ব্রতকথা পুরাণ অথবা লোকচর্চার অভ্যাস দিয়ে, সেটা তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে না অবনীন্দ্রনাথের কাছে। ব্রতপুরাণ হয়ে উঠতে পারে ব্যক্তির সঙ্গে যৌথকে মেলাবার একটা পদ্ধতি, হতে পারে দেশের অন্তঃসারকে স্পর্শ করবার একটা পদ্ধতি, এই পদ্ধতিকে বড়ো মর্যাদা দেন অবনীন্দ্রনাথ। কিন্তু এ তো পদ্ধতি মাত্র? সময়কে ছেড়ে দিয়ে, বিষয়কে ছেড়ে দিয়ে কেমন করে দাঁড়াবে সে?

অবনীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ তিরিশ বছর ভারতবর্ষের মস্ত তিরিশ বছর, সময় তার এক যুগ ভেঙে চলে আসছে আরেক যুগের মধ্যে, চারপাশে শোনা যাচ্ছে চুরমার হবার শব্দ। তখন অবনীন্দ্রনাথও কেবল ভেঙে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু এই ভাঙার সঙ্গে কোনো যোগ হচ্ছে না তাঁর পরিপার্শ্বের। 'রাজাপ্রজা উঁচুনিচু থাকার অসুবিধেগুলো কী' সেটা তিনি বোঝান বটে 'মৌমাছিদের রাজতন্ত্রে', আনেন বটে তাঁর যুধিষ্ঠির মালী ছিরু মেথর আর বিশ্বেশ্বর হুঁকোবরদারদের, জড়িয়ে নেন তাদের ছড়া ব্রতকথা কথকতার মোড়কে। কিন্তু শব্দ এসে কেবলই ঢেকে দেয় তাদের স্পষ্ট রূপ, হাতছাড়া হয়ে যায় কেন্দ্র, লেখকের ব্যক্তিগত অবচেতনের স্রোতে ভেঙে যায় চরিত্রগুলির নিজস্ব রেখা। তখন তাঁর এই লেখাগুলি হয়ে থাকে যেন যুধিষ্ঠিরের রথ, মাটির কাছাকাছি এসেও ঝুলে থাকে শূন্যে।

ফলে, 'মনুসংহিতা বাইবেলে কোরানে যেগুলো শুদ্ধ' তাকে বিরুদ্ধ কাজে খাটিয়ে নিয়েও কোনো বড়ো রকমের তাৎপর্যে পৌঁছয় না তাঁর শেষজীবনের অজস্র এই গদ্য, তা কেবল রেখে যায় কিছু ইঙ্গিত, কিছু অভিপ্রায়, চলতি ধরনের লেখার বিরুদ্ধে কিছু প্রতিবাদের কৌতুক। আর কোনো কেন্দ্র পান না বলেই দিনের পর দিন তিনি আঁকড়ে ধরেন কেবল 'ফর্ম ইটসেল্‌ফ', যে-কথাকে হয়তো তিনি পেয়েছেন হেনরি মূরের আদলে: 'to feel shape as shape' অথবা 'form itself'। হেনরি মুর অবশ্য এই ফর্ম দিয়েই পেতে চেয়েছিলেন মানবেতিহাস, মানবমনের জটিল সংঘর্ষ। সে-সংঘর্ষকে অনেকটা এড়িয়ে গিয়ে মাস্কে বা কুটুমকাটামে অবনীন্দ্রনাথ কেবল রূপের জন্যই গড়ে তোলেন রূপ, গদ্যে পদ্যে বা পালায় ধ্বনির জন্য বাজিয়ে তোলেন ধ্বনি, তাঁর ধ্বনিই সেখানে হয়ে ওঠে রূপ। এইভাবে তাঁর শেষপর্বের গদ্য হয়ে ওঠে এক শব্দ-বাজানোর খেলা যেখানে তিনি ঘোষণাও করে দিতে পারেন যে তাঁর লেখায় এবার 'কল্পনার হিস্টিরিয়া হয়েছে— যা তা আবোল তাবোল বকছে সারারাত!' তবু, ওরই সঙ্গে একটা আশ্বাসও তিনি রেখে যান তাঁর পাঠকদের জন্য: 'আজ ঘরে যাও, কাল এসো ঠিক এই সময়ে'। ঘরে ফিরে আসি আমরা। মনে কেবল এই আশা থাকে যে আজ যদি তেমন কিছু না-ও মেলে, 'হিস্টিরিয়া'র এই ফর্ম থেকে কাল হয়তো আমাদের গল্প তুলে আনতে পারবে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত কোনো প্রাসঙ্গিক পৃথিবী।

অবনীন্দ্রনাথের উপকথার জগৎ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

লালবিহারী দে-কে প্রবর্তনা দিয়েছিলেন স্বনামধন্য রিচার্ড কার্নাক টেম্প্‌ল : ভারতলোকাত্মা-সন্ধানী, সুবৃহৎ পাঞ্জাবি উপকথার সংকলয়িতা। তার আগে অরুণোদয় পত্রিকায় প্রকাশ হওয়া 'বঙ্গীয় উপকথা'গুলি যদি লালবিহারীর নিজের সংগ্রহ হয়, তবু মানতেই হয় ইংরেজদের দেশে তখন নানা জায়গার চেনা-আধাচেনা গ্রামবাসী মানুষের বিশ্বাস ও আচরণের উপকরণ আহরণের যে যজ্ঞকাণ্ড চলেছিল, এ তারই একটুখানি অংশ। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে লণ্ডন শহরের প্রকাশকেরা প্রায় সারা বিশ্বের আংশিক লোকবৃত্ত অনুবাদ করে ফেলেছিলেন। ইংরেজি ভাষায় সেই বৃহৎ লোক-লাইব্রেরি লালবিহারীর একেবারে অপরিচিত ছিল না। 'ফোক টেল্‌স অফ বেঙ্গলে'র ভূমিকায় আছে, ইংরেজি তর্জমায় লেখক স্কটিশ-স্ক্যাণ্ডিনেভিয়-জার্মান সব উপকথা পড়েছেন। তখনকার বিলিতি পণ্ডিতেরা বেদ-পুরাণের ভূমি বলেই মানতেন ভারতবর্ষকে। তার গ্রামজনপদের নদীবৃক্ষমৃত্তিকার পরতে-পরতে যে আদিম লোকবিশ্বাস সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, বোধ করি সেইটুকু সবিস্তারে বোঝাবার জন্যেই টেম্প্‌ল-সাহেব লণ্ডনের ফোক-লোর সোসাইটিতে তাঁর পাঞ্জাবি উপকথার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এক বক্তৃতা করেন। তারই একজায়গায় তিনি জানিয়েছিলেন, ভারতবর্ষের অন্য সব অঞ্চলের উপকথারও সামান্য লক্ষণ নিহিত আছে তাঁর সঞ্চয়নে, যদি সংগ্রহ করে তোলা যায়, দেখা যাবে পৃথিবীর আর-পাঁচটা জায়গার আদিবাসী মানুষের বিশ্বাস-আচরণের সঙ্গেও এদের কিছুটা যোগসূত্র আছে। লালবিহারীর ভূমিকায় এই তুলনামূলক লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গ বেশ জোর পেয়েছে। গঙ্গাপারের কালাচামড়া আধানাগা চাষীর সঙ্গে টেম্‌স-পাড়ের সুবেশ শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ-সন্তানের যে ভয়ানক অনাত্মীয়তা নেই সেই তৃপ্তিস্বাদটুকু এই বইয়ের সম্পদ।

তবু নিজেকে বাঙালি গ্রিম ভেবে লালবিহারীর একটু লুকোনো অভিমান যদি থেকে থাকে তা সাধিত হবার দুটি বড়ো বাধাও তাঁর ছিল। ভাষার বাধা, আর ধর্মের বাধা। 'বাঙ্গালার পল্লীর এই শ্রুতি-সাহিত্য', বাঙলার নিজস্ব 'গার্হস্থ্য উপকথা' বেঙ্গল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা থেকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু বিদেশীর নিশ্চয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু সে তো এদেশাগত বিদেশীরা নিজেরাই সক্রিয় সংকলন করে চলেছিলেন এখানকার পুঁথিপাঁচালি গল্পগাছা ছড়াপ্রবাদ— কোম্পানির লোকেরা এবং মিশনারিরা, যুগ্মহাতে। এতদ্দেশীয়দের সামাজিক জীবন এবং ফোক-লোর সন্ধানের জন্য লঙ সাহেব পাঁচশো প্রশ্নের এক বিস্তারিত জিজ্ঞাস্যতালিকাই তৈরি করে ফেলেছিলেন, এবং সেই সন্ধানের কাজে অপরিহার্য জ্ঞান করেছিলেন বিলিতিশিক্ষিত নেটিভদের 'একমাত্র যাঁরা জানেন তাঁদের সমাজের অন্তঃশায়ী বিবরণের খোঁজ' আর সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগতে পারেন সন্দিৎসু বহির্দেশীর। 'ভারতীয় লোকবৃত্তের কারণে উৎসর্গিতপ্রাণ' টেম্প্‌ল সাহেব লালবিহারীকে যে কাজে প্রবৃত্ত করেছিলেন, বোঝা যায় তা তাঁর অনায়ত্ত পরিপূরণের প্রয়োজনে— তাঁর সঙ্গে শম্ভুর মা কি কোবিদ ব্রাহ্মণ কি গল্পজানা নাপিতের তত যোগ থাকা সম্ভব ছিল না। কবি রঙ্গলালকে লঙ তাঁর সংকলিত 'ইউরোপ ও এস্যা খণ্ডস্থ

প্রবাদমালা'র অনুবাদে উৎসাহী করেছিলেন। সংক্ষিপ্ত ভূগোলবাসী বাঙালিকে বসুধার কুটুম্বিতার লোভ দেখাতে? যেমন স্বপ্ন দেখি 'ফোক টেল্স্ অফ বেঙ্গলে'র তুলনাআদর্শী ভূমিকায়? কিন্তু লালবিহারী তাঁর সেই গ্রাম্য গল্প গাঁথতে বসে সেই মুহূর্তেই টেম্পলের অনুজ্ঞার বদলে গ্রিমের আদর্শ ভেবে যে সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন •মনে করতে পারি, তার একাংশও জুটেছিল এই বইতে? অবশ্য লালবিহারী দক্ষিণারঞ্জনের 'বরেণ্য পথপ্রদর্শক' হয়ে স্মৃতিধার্য হয়েছেন।

সেই স্বার্থ কি সাধতে পেরেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার? পরিভাষা-ব্যগ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কুলজিউদ্ধারব্রতী দ্বিতীয় হাতটি? 'বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র' যিনি 'মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন'? পরের দিকের আরো প্রতিষ্ঠান, অন্য কাগজপত্র? নানাজনের খুঁজে ফেরা কিস্‌সাপাঁচালির শ্রুতিকথা, কথকতার পুঁথি? গ্রিমেদের 'গার্হস্থ্য উপকথা' দেশের আদিসত্তা, সেই-সঙ্গে সারা বিশ্বের আদিমবাসীদের লোকপুরাণ লক্ষণের সঞ্চয়িতা। বিলেতদেশের লোক-শ্রুতিবিদেরা দিনের পর দিন ধরে গ্রামবাসীদের স্মৃতি থেকে পুরোনো আচার ব্যবহার সংস্কার ছড়া প্রবাদ হেঁয়ালির লুপ্তোদ্ধার করে চলেছিলেন যদি কোনোদিন য়াকব গ্রিমের মতন কেউ এসে সেই আপাতনিরর্থ উপকরণ জড়ো করে ইংরেজজাতির সুসংবদ্ধ লোকপুরাণ পুনর্গঠন করে দিতে পারেন, সেই আশায়। অনেক বড়ো কালান্তর তখন আমাদের দেশে। বড়ো, কারণ ভেতরের স্ফূর্তি-প্রস্তুতি এড়িয়ে তা বাইরের পথে আসা — বিদেশী বিজেতার বেশে, পুরোনো খারিজ করে, নিঃশর্ত আধুনিকরূপে। আমাদের ধ্রুববাদী-হিতবাদী নব্যদীক্ষিতেরা দৈবী বরের পূর্ণ সুযোগ নেবার জন্যে যখন শতউৎসুক, বিবর্তন-দর্শনের পাঠ পড়া বহিরাগতরাই বরং সেই অবকাশে ঠাওর করেছিলেন— নতুন মুহূর্তের নাড়া-খাওয়া এখানকার সমাজতত্ত্ব বোঁটার ওপর থেকে ঝরে যাওয়ার মুখে, আর হয়তো বা সেই কারণে বিশ্ববৃক্ষের এই পুব ডালটির থেকে অনতিমৃত প্রত্নাবশেষের কিছু নমুনাচিহ্ন সময়ে সময়ে তুলে রাখা ভালো ভেবেছিলেন। আমাদের ভালো অবশ্য তখন নিজেকে ভোলা, আত্মোন্নতির সুলভতম বিনিময়।

অবসানমুখী যে সব কুললক্ষণ তা চিনে রাখার, নিজের পরিচয়চিহ্নটুকু টিকিয়ে রাখারও চেষ্টা জেগেছিল, কিন্তু সে খুব নিঃসহায় চেষ্টা। তা লেগেছে নতুন রাজার প্রজাঅবধানের কাজে, খানিক তাকে লিখিয়েছে রোম্যান্টিক কবিতার বিষাদ-নসট্যালজিয়া। এই পর্যন্ত। তা নিয়ে বিশদবিস্তার করে লেখা ডয়শে মিথোলগির পূর্ব-ভাগ আরেকখানি, কিংবা আরো পিছনদিককার পুরাণ-এড্ডার ইতিবৃত্তগ্রন্থক স্নোরি স্টুর্লুসনের মমতাময় মধ্যযুগীয়তা দিয়ে গড়ে নেয়া আগাগোড়া স্বদেশ পুরাণ— এখন মনে হয়, মন্দ হত না এতখানি ভাবনাও যদি ভাবতেন কেউ, কোনো কবিস্রষ্টিকার।

ঐতিহাসিক স্মৃতির জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। লোকজীবনবৃত্তের আলেখ্য এবং দেশমাতৃকার প্রকৃত যে ধ্যান সেই 'প্রকৃত সামাজিক' ইতিহাস। 'বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কগণের জীবনচরিত মাত্র' নয়। সেই ইতিহাসের ভগ্নাংশ খুঁড়তে গিয়ে, আশ্চর্য লাগে তাঁর মতো প্রৌঢ় দার্শনিক টেনে এনেছিলেন হবুচন্দ্র রাজার লঘু কিংবদন্তীর স্মৃতি। এই তাঁর কৈফিয়ত—

> এ ইতিহাস নহে— এ সত্যও নহে— এ পিতামহীর উপন্যাসমাত্র। তবে এ ঐতিহাসিক প্রবন্ধে এই অমূলক গালগল্পকে স্থান দিলাম কেন? এই কথাগুলি রাজার ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পুনঃপুনঃ প্রবর্তনার ফলে, যিনি অর্ধেক রাজত্বসহ রাজকন্যা দান করতে পারতেন তিনি লিখলেন বালকশিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক: 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত।'

তবু, বিক্ষিপ্ত, ইতস্তত, নানা জনের নানা প্রতিষ্ঠানের মন পড়েছিল বাংলার পুরোনো সামাজিক লোকবস্তুর সন্ধানে— পারিভাষিকভাবে যা লোকপ্রত্ন বা 'পপুলার অ্যান্টিকুয়িটিজ'। পটশিল্প সূচী-শিল্প গৃহশিল্প ব্রতাচারের যূথশিল্প সংগৃহীত হতে লাগল অনেক, সেইসঙ্গে ছড়া-উপকথার শব্দশিল্পও। আর এই যে সব উপকথা, 'দেশের মেরুমজ্জায় জড়িত নিরুপম স্বাভাবিক' সব উপকথা, দক্ষিণারঞ্জনের ভাষায় 'জাতির বেদনা-উল্লাসের মর্মমর্যাদা'— পুনরধিষ্ঠিত হতে চলল 'শিশু-শয়ন-রাজ্যে'— অন্যের কী কথা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থাপত্রে। যে আপাতঅসংলগ্ন ভাঙাচোরা কবিতাপঙ্‌ক্তির মধ্যে চিরকেলে গৃহস্থ বাঙালির অর্ধস্ফুট ঘরের ছায়া পড়ে আছে বলে চোখে পড়েছিল কারো কারো, সেই ছড়াসংগ্রহের 'উত্তম বালকবালিকাগণের পরিতোষের জন্য সীমাবদ্ধ' হল। অর্থাৎ দুয়েরই ঠাঁই হল সাক্ষাৎ পুঁথিপ্রাণ গবেষকের হাত থেকে শিশুর খেলাঘরে।

তার সংগতি আর তার এই অধোগতি— দুইই লেখা ছিল দক্ষিণারঞ্জন- যোগীন্দ্রনাথের দুখানি বইয়ের ভূমিকাতে— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তখনকার দুই মুখ্যকর্মা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তার পরিচায়িকা লিখেছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন-যোগীন্দ্রনাথ দুজনেই ছিলেন তখনকার পরিষৎ-আকল্পিত মহাব্রতের অংশী। এঁদের ঠিক অব্যবহিত একখানি উপকথা-বিজ্ঞানের বইয়ে: উপকথার রাজ্য যে শিশুর আনন্দ-কল্পনার ব্যাপার নয়, অকৃত্রিম আদিবিশ্বের মানস-সাক্ষ্য, এই উনিশ শতকেও যার একটুখানি কেশাগ্র ভেসে রয়েছে— এই তর্জনী দেখতে পাই, টীকাভাষ্যসহ। এডুয়িন সিডনি হার্টল্যাণ্ডের লেখা এই বইখানি লণ্ডন থেকে বেরোয় ১৮৯১ সালে, পরিষৎ পত্রিকার ধারাবাহিক গ্রাম্য-সাহিত্যআকলনের প্রত্যক্ষজনক প্রাক্‌কালে। কিন্তু এই বক্তব্যের সীমানা পার হয়ে গিয়েছিলেন আমাদের চিন্তাবিদেরা। ছেলেভুলোনো ছড়ার পরিচয় লিখতে রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে কেবলমাত্র অনাদিকালাবধি 'মাতৃমাতামহীগণের স্নেহ সঙ্গীত স্বর' শোনান নি, লক্ষ্য করেছেন, 'ইহারা সজীব, ইহারা সচল: ইহারা দেশ কাল পাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে।' রামেন্দ্রসুন্দরও লিখেছেন, 'ইহার ফল দূরতর ও প্রশস্ততর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইবে বলিয়া বস্তুতই আমি মনে করি।' একটি ১৮৯৪ সালের, আরেকটি ১৮৯৯ সালের কথা।

কিন্তু এতখানি বিশ্বাস-সচেতনতাকে নির্জয় করে শুধুই— ক্রমেই— আমাদের বাড়তে লাগল প্রত্যক্ষবুদ্ধির ঘের। সংসারী ছাপ পড়তে লাগল সাধারণ গাঁ-ঘেঁষা মানুষেরও মুখে— এখানে ছিল পশ্চিমা শিল্পের কাঁচা মালের ঘাঁটি— শতাব্দীর অনেকদিন ধরে, পণ্য বেচার বিপনি। এখানেই কলকারখানা গড়ে উঠতে লাগল এখন একে একে। বাড়তে লাগল শহর, শহুরেয়ানা। অতখানি ভূগোলমৃত্তিকা বাঁধিয়ে নেয়ার অসম্ভবকে পিছন করে এক বিন্দু বাঁধাভিতের দশ পাড় ছেঁকে ধরল মাছির ঝাঁক। প্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রমেই মিলিয়ে যেতে লাগল পুরোনো ঘায়ের দাগ, পুরোনো সব মনস্তাপ। তাড়াতাড়ি সমসাময়িক হয়ে ওঠার কঠিন ক্লান্তিতে সমস্ত উত্তরাধিকার হয়ে উঠল স্বপ্ন, বুকের ভেতরকার ফাঁপা হাড়ের ডালপালা কাজ দিয়ে বোজানো হতে লাগল নিঃশেষে। অবনীন্দ্রনাথের গল্প থেকে বলি:

সেই থেকে বংশানুক্রমে আমরা ভয়ংকর-রকম কাজের মানুষ হয়ে জন্মাতে লাগলেম। বুকের ওই হাড়, যেটাকে স্বপ্ন এসে বাঁশির মতো ফুঁ দিয়ে বাজিয়ে তোলে, সেটা আর আমাদের কারু মধ্যে গজাতে পেল না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কাজে-দক্ষতার একটা শিলমোহর বুকে নিয়েই যেন আমাদের বংশের সব ছেলেগুলো ভূমিষ্ঠ হত এবং আমাদের মধ্যে কোনো ছেলের বুকে যদি কখনো ওই হাড়ের বাঁশির অঙ্কুরমাত্র আছে এরূপ সন্দেহ হত, তবে হাকিম এবং বুজ্‌রুগ ডেকে সেই শিশু-বুকে একটা তপ্ত লোহার শলা চালিয়ে স্বপ্নের অঙ্কুর দগ্ধ করে দিতে আমাদের কেউ কোনোদিন ইতস্তত করেন নি, যদিও স্বপ্নের সন্দেহে অনেক সময় শিশু-প্রাণগুলি পুড়ে ছাই হতে বিলম্ব হয় নি।

এই গল্প 'অস্থি' যখন লেখা তখন 'বাংলার ব্রত' লেখারও উদ্‌যোগ চলেছে। সে আরো প্রত্যক্ষভাবে স্বপ্নে পোঁতা 'ঐতিহাসিক স্মৃতি' খুঁড়ে তোলার আয়োজন।

ছড়ার বাঙলাদেশ

এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহ সংগীত স্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশবনৃত্যের নূপুরনিক্কন ঝংকৃত হইতেছে।... ইহারা অতীত কার্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল... —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, মাঘ, ১৩০১

'বাল্যগ্রন্থাবলী'র লেখকরূপেই কথাশিল্পকার অবনীন্দ্রনাথ প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। ১৮৯৫-৯৬ সালে ছ-সাত মাসের অন্তরে প্রকাশিত হয় তাঁর 'শকুন্তলা' ও 'ক্ষীরের পুতুল'। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' ১৮৯৯ সালে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' বেরোয় ১৯০৭এ,উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই' ১৯১০এ। তিনটিই বাল্যগ্রন্থাবলী।

চন্দ্রকুমার দে -সংগৃহীত দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ-মৈমনসিংহ গীতিকার গীতকথা— যাদের বলা যায় বয়স্কপাঠ্য, বেরোয় আরো পরে পরে— ১৯২৩ সাল থেকে। অবনীন্দ্রনাথের বই দুখানি তথাকথিত ছড়াকাহিনীর সংগ্রহ নয়। তবু এক অর্থে তাই বটে। একটি তো ষষ্ঠীঠাকরুনের ব্রতকথা। আরেকটি আরো স্বরূপ রূপকথা – বনবালা কন্যার সাথে রাজপুত্রের মিলন – বাঙলা-পার আর্যভারতের— তবে এ রূপকথা বাঙলারও, সবজায়গাকার। কিন্তু দুটিতেই যা বিশেষ করে চোখে পড়ে তা হল, দুটি কথাই অবনীন্দ্রনাথ গড়েছেন পুরোনো কথকদের ধারায়— নয়া আসরের উপযোগী করে। আরো চোখে পড়ে কথাকারের দেখার চোখ দুটি আর বলার টানা রঙ— যেন 'বর্ণন' এই শব্দটুকুর ইচ্ছাপালনার্থ। সচেতনভাবেই, কেননা এই স্বকীয়তা পরবর্তীকালে তাঁকে নিজে মুখেই সপরিহাসে বলতে শুনি : 'বর্ণনে হুবহু তাজা তাজা, অবিন ঠাকুর ছবির রাজা'।

এই ছবি-আঁকা গুণ বাঙলা লেখায় যতই বলার বিষয় হোক, অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে নিশ্চয় তত নয়, কারণ ১৮৯৫-৯৬ সালে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী হিসেবেও পরিচিত। বলার বরং একছত্র ইতিহাস : বাল্যগ্রন্থাবলীর এই রচনাসময় অতি উল্লেখযোগ্য সময় তাঁর শিল্পীজীবনেরও— নতুন এক আরম্ভ, যখন হঠাৎ স্ফুট হয়ে উঠেছে প্রলোভসংশয়াতীত তাঁর লক্ষ্যপথ। খুবই সাধারণ শুরু— দ্বিজেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের দু-একটি রূপকথা জাতীয় -কবিতার ইলাসট্রেশন দিয়ে। কিন্তু 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র সেই অংশ বা 'বিম্ববতী' 'বধূ' কবিতার সেই সব ছবি আঁকতে গিয়েই সেই রূপকথা-ছাওয়া দেশজতার যে স্বাদ লাগল তাঁর মনে তাইতেই 'সত্যি

যেন খুলে দিল মনোমন্দিরের চাবি।' আলোছায়ামধুর দেশ, পামার সাহেবের কাছে ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকার পাঠ নিয়ে যে দেশের অপরূপ সব দৃশ্যছবি তিনি খুঁটিয়ে দেখতে শিখেছিলেন— কলকাতার আশপাশের 'বড় বড় গাছের নীচ দিয়ে, গাঁয়ের ভিতর দিয়ে', মুঙ্গেরের এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে, 'সেই চমৎকার পল্লীগ্রামের সুগন্ধ'— তাঁকে টান দিল অন্তর্ভূমির প্রাণস্পন্দের খোঁজে। শিক্ষানবিশীর পর্ব পেরোতে না পেরোতে তাঁর অনুমানে ভেসে উঠল 'দেশের শিল্পের উদ্দিশ'।

এই দেশজতা অবশ্য বিষয়ের, শুধুই বিষয়ের। প্রকাশিত বাল্যগ্রন্থ দুটির আগে তিনি হাত দিয়েছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকথা' আর 'নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান'— সজাতের দুটি পুরাণ কথায়, শেষ করেন নি। আবার 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-'বধূ'র আবছায়া গ্রাম্য সন্ধ্যা থেকে নিজেকে বাড়িয়ে নিয়েছিলেন 'শকুন্তলা ও সন্ধ্যা' ছবিতে। কেমন এই শকুন্তলা? কতখানি সংস্কৃত? আর্য ঋষির লালিতা? 'প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে বনপথে বনদেবীর মতো' তাঁর ছবিটি ফুটে আছে লেখার ভাষায়। এর পরেই স্বচিত্রাঙ্কিত তাঁর 'শকুন্তলা' 'ক্ষীরের পুতুল' বই। প্রথম সংস্করণে এই ছবি ছাপা দেখি নি, কিন্তু বুঝতে পারি গল্পাকারে লেখা তার প্রসঙ্গ, আস্বাদ। আর, একই সঙ্গে পাশাপাশি তাঁর ছবির নতুন সূচনা। 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করি এই সময়মুহূর্তটি—

> দেশের শিল্পের রাস্তা তো পেয়ে গেছি, এখন আঁকব কি? রবিকাকা আমায় বললেন, বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে ছবি আঁকতে।··· লেগে গেলুম পদাবলী পড়তে।

তারই প্রথম ছবি হল গোবিন্দদাসের কবিতা থেকে 'শুক্লাভিসারে'র ছবি। ছবি, না ইলুমিনেটেড কবিতা? বাঁ পাড়ে যে লতামণ্ডন, ওপর-নিচে শিরোনাম-সহ সাত ছত্রে ধারাবাহী যে চৌদ্দ পদ-পঙ্‌ক্তি: 'পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ চৌদিশে হিমকর হিম করু বন্দ'— তার তুলনায় প্রধান নয় মাঝখানের দৃশ্য বা চরিত্রালেখ্য। এই রাধাকে দেখলেও শিশির ঘোষ মশায় নিশ্চয় হেসে বলে উঠতেন: 'এ কী রাধার ছবি!' কিন্তু করণশৈলি যাই হোক, এই বিষয়ের মাঝ দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন নিজের— না কি দেশের— পুরোনো হারানো আলোহাওয়ার মণ্ডলে।

বৈষ্ণব পদাবলীর ছবি তৈরি হল এক সেট। কুড়িখানি— বিলিতি ধারার মিনিয়েচার, তার উপর অধিকন্তু 'সোনার রুপোর তবক ধরিয়ে'। তার পর, অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> তারপর 'বেতালপঞ্চবিংশতি আঁকতে শুরু করলুম। সেই পদ্মাবতী পদ্মফুল নিয়ে বসে আছে, রাজপুত্তুর গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে; আর অন্যগুলিও। যাক রাস্তা পেলুম, চলতেও শিখলুম, এখন হু হু করে এগোতে হবে।··· তখন কি আর ছবির জন্য ভাবি, চোখ বুজলেই ছবি আমি দেখতে পাই—

পদাবলীর রূপকথা ধরে রূপকথার ভেতর-চত্বরে— অলোক-লোকায়ত স্বদেশী অন্তর্দেশে মেলানো। 'শকুন্তলা' 'ক্ষীরের পুতুলে'র না-দেখা ছবি বর্ণনাতে দেখি শব্দে আঁকা আগাগোড়া দিগ্‌নগরের। কেবল এই দিগ্‌নগর মধ্যযুগী কুলীন কবির হাত-ফেরতা নয়, সমবায়িক চিরকেলে বাঙলা কবিতার মন্ত্রণা নিয়ে আঁকা। ষষ্ঠীঠাকরুণের কথায় মাসিপিসি মায়া করলেন সে দেশে, দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু জেগে রইল রাস্তার শেয়াল-কুকুর, রাজার হাতি-ঘোড়া, বনের পাখি, আর রানীর বানর। বানরের চোখে চাপা রইল না ষষ্ঠীঠাকরুনের কলঙ্ক। বানরকে তাঁর দিতেই হল নিজের

ছেলেদের থেকে একটিকে, দুয়োরানীর জন্য। কোথায় গেল সেই দেশ— যে দেশ বানরের চোখে শুধু হাতটুকু বুলিয়ে দিতেই, তার দিব্যচক্ষু হল, সে দেখতে পেল তারই পায়ের নীচে—

বানর দেখলে··· সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য! সেখানে কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলাধুলো; সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই। সেখানে আছে দিঘির কালো জল তার ধারে সর বন, তেপান্তর মাঠ তার পরে আম-কাঁঠালের বাগান, গাছে গাছে ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি, নদীর জলে গোল-চোখ বোয়াল মাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক। আর আছেন বনের ধারে বনগাঁ-বাসী মাসি-পিসি, তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু নাচেন। নদীর পারে জন্তীগাছটি তাতে জন্তী ফল ফলে, সেখানে নীল ঘোড়া মাঠে মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, গৌড় দেশের সোনার ময়ূর পথে ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছেলেরা সেই নীলে ঘোড়া নিয়ে, সেই সোনার ময়ূর দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে, ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজিয়ে, ডুলি চাপিয়ে, কমলা-পুলির দেশে পুঁটুরানীর বিয়ে দিতে যাচ্ছে। বানর কমলাপুলির দেশে গেল। সে টিয়েপাখির দেশ, সেখানে কেবল ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়েপাখি, তারা দাঁড়ে বসে ধান খোঁটে, গাছে বসে কেঁচ্‌মেচ্‌ করে, আর সে-দেশের ছেলেদের নিয়ে খেলা করে। সেখানে লোকেরা গাই-বলদে চাষ করে, হীরে দিয়ে দাঁত ঘষে! সে এক নতুন দেশ— সেখানে নিমেষে সকাল, পলকে সন্ধ্যা হয়, সে দেশের কাণ্ডই এক! ঝুরঝুরে বালির মাঝে চিক্‌চিকে জল, তারি ধারে এক পাল ছেলে দোলায় চেপে ছ-পণ কড়ি গুণতে গুণতে মাছ ধরতে এসেছে; কারো পায়ে মাছের কাঁটা ফুটেছে, কারো চাঁদমুখে রোদ পড়েছে। জেলেদের ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছে— এমন সময় টাপুর-টুপুর বিষ্টি এল, নদীতে বান এল; অমনি সেই ছেলের পাল, সেই কাঠের দোলা, সেই ছ-পণ কড়ি ফেলে, কোন্ পাড়ায় কোন্ ঘরের কোণে ফিরে গেল। পথের মাঝে তাদের মাছগুলো চিলে কেড়ে নিলে, কোলা ব্যাঙে ছিপগুলো টেনে নিলে, খোকাবাবুরা ক্ষেপ্ত হয়ে ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়িয়ে খেতে দিলেন। আর সেই চিক্‌চিকে জলের ধারে ঝুরঝুরে বালির চরে শিবঠাকুর এসে নৌকো বাঁধলেন, তাঁর সঙ্গে তিন কন্যে— এক কন্যে রাঁধলেন বাড়লেন, এক কন্যে খেলেন আর এক কন্যে না-পেয়ে বাপের বাড়ি গেলেন। বানর তাঁর সঙ্গে বাপের বাড়ির দেশে গেল। সেখানে জলের ঘাটে মেয়েগুলি নাইতে এসেছে, কালো কালো চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে। ঘাটের দুপাশে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠল, তার একটি গুরুঠাকুর নিলেন, আর একটি নায়ে ভরা দিয়ে টিয়ে আসছিল সে নিলে। তাই দেখে ভোঁদড় টিয়েকে এক হাতে নিয়ে আর মাছকে এক হাতে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলে, ঘরের দুয়োরে খোকার মা খোকাবাবুকে নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন— ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা।

বানর দেখলে— ছেলেটি বড় সুন্দর, যেন সোনার চাঁদ, তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কেড়ে নিলে! অমনি ষষ্ঠীতলার সেই স্বপ্নের দেশ কোথায় মিলিয়ে গেল, ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি আকাশ সবুজ করে কোন্ দেশে উড়ে গেল, শিবঠাকুরের নৌকো কোন্ দেশে ভেসে গেল। ঘাটের মেয়েরা ডুরে শাড়ি ঘুরিয়ে পরে চলে গেল। ষষ্ঠীর দেশে কুনোবেড়াল কোমর বেঁধে, শাশুড়ি ভোলাতে উড়কি ধানের মুড়কি নিয়ে, চার মিন্‌সে কাহার নিয়ে, চার মাগী দাসী সঙ্গে আমকাঁঠালের বাগান দিয়ে পুঁটুরানীকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে যেতে আমতলার অন্ধকারে মিশে গেল। তেঁতুল গাছের ভোঁদড়গুলো নাচতে

নাচতে পাতার সঙ্গে মিলিয়ে গেল— দেশটা যেন মাটির নিচে ডুবে গেল।
বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় দেশটা যেন পায়ের নীচেই ডুবে আছে— এখনো, এই দণ্ডেও। একবার শুধু দিব্য চক্ষু পাই তো অমনি ছায়াবাজির মতন আবার সব-সুদ্ধ জেগে উঠবে সামনে। শুধু পুরোনো ছড়ার বর্ণনা এক করতেই দেশটার ইতিহাস-ভূগোল মানুষজন ভেসে উঠেছে সব। আর, হয়তো এর মধ্যে শুধুই মজা নয়, একটু বেশিও আছে।

'ক্ষীরের পুতুল' বেরোবার মাত্র অল্পদিন আগে সাধনা পত্রিকায় বাঙলা ছড়ার আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'এই ছড়াগুলিকে একটি আস্ত জগতের ভাঙা টুকরা বলিয়া বোধ হয়।' পরে 'খুকুমণির ছড়া'র ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও ইঙ্গিত করেছিলেন—

> এই সকল ক্ষুদ্র মাহাত্ম্যহীন অর্থহীন অসংলগ্ন কবিতার ভগ্নাংশগুলির মধ্যে এক এক স্থানে গৃহস্থ বাঙ্গালী গৃহের সুস্পষ্ট ছবি দেখিতে পাওয়া যায়।··· পরলোকগত সার মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্ কিছুদিন হইল হিন্দুজাতির 'হোম' নাই বলিয়া করুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশাল হিন্দুজাতির কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা যে 'হোমে'র মধ্যে আশৈশব লালিত হইয়া আসিয়াছি, পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, বৃদ্ধা দিদিমা, ও অতিবৃদ্ধ দাদা মহাশয় যে 'হোমে'র মধ্যে বাস করিয়া পরস্পর স্নেহ ও প্রীতির বিনিময় করিয়া আসিতেছেন, 'মাসী পিসী বনগাঁ-বাসী' এমন-কি, যাহাদের 'বনের মধ্যে ঘর' তাহাদেরও যে 'হোমে'র মধ্যে স্থান নির্দিষ্ট আছে, মুষ্টিভিক্ষাজীবি অজ্ঞাতকুলশীল অতিথিও মুহূর্তের জন্য যে 'হোমে' আপনার বিহিত স্থান অধিকার করিতে সঙ্কোচ করে না এবং গৃহমার্জার, গৃহগোধিকা ও বাস্তু সাপ পর্যন্ত যে 'হোমে'র মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই বিশাল 'হোমে'র সহিত অনুদার অপ্রশস্ত সঙ্কীর্ণ স্বার্থের প্রাচীরে বেষ্টিত বিলাতী 'হোমে'র তুলনা করিয়া বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের অবমাননা আমার পক্ষে অসাধ্য।

এর উপরেই জ্বালা মর্মজ্বালা, কিন্তু তা বাদ দিলে, নিবিড় একদল পুরোনো মানুষের ঘরের যে আভাস এমন অর্থহীন কবিতার ভগ্নাংশের মধ্যে আজও বেঁচে আছে সেই আশ্চর্য প্রত্যয়টুকু টের পাওয়া যায়।

ঐ আপাত-অসংলগ্ন ভাঙা টুকরো-টাকরা জুড়ে যদি কোনো চৌহদ্দি স্পষ্ট হয়ে ওঠে— সেই খেলাটি লঘুভাবে তাঁর গল্পের মধ্যে বসিয়ে দিলেন অবনীন্দ্রনাথ? কিন্তু উদ্দেশ্যহারা নয়, বোধ করি তারই সায় দিতে এইটুকু কেবলমাত্র 'ক্ষীরের পুতুলে'র নয়, পরেও ফিরে ফিরে এসেছে। খেলার মজা নিয়ে, কখনো বা একটু-কবিতারই মতো।

যেমন 'ভূতপত্‌রী'র শেষটুকু। স্পষ্টই মজা। 'কিচকিন্দের সঙ্গে এ পাড়া ও পাড়া ঘুরে রথতলায় চলেছি, এমন সময় দেখি গোবিন্দর মা একটি ভোঁদড়-ছানা নিয়ে তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে আর সুর করে ছড়া কাটছে—

> 'ধেই-ধেই চাঁদের নাচন।
> বেলা গেল চাঁদ নাচবি কখন।'···

আমাকে দেখে গোবিন্দর মা বলছে, 'ও কিচকিন্দে, এ কাদের ছেলে গা?
'আমাদের দাদাবাবু গো। মামার বাড়ির লোক। এনাকে একবার রথতলাটা দেখিয়ে আনি।'
'চল, আমিও যাই একবার রথতলায়'— বলেই গোবিন্দর মা ভোঁদড়-ছানাটি কোলে আমাদের সঙ্গে চলল।

একে একে এল ইকড়িমিকড়ির দল, ছুতোরের পো দামুদার, হুতুমপ্যাচা, ভুঁড়োশেয়ালি, সুবুদ্ধি তাঁতির বেটা, একানোড়ে, কানকাটা জয়জগন্নাথ-দর্শনাকাঙ্ক্ষী হনুমান— সবাই এল সশরীরে, হুল্লোড়ে তোলপাড় করে তুলল ছত্রের পর ছত্র।

'ক্ষীরের পুতুলে' মাসি-পিসির একটুখানি দেখা পাওয়া গিয়েছিল, 'ভূতপত্রীর দেশ' ভূত-কাহারের কাঁধে চেপে সেই বনগাঁ-বাসী মাসি-পিসির দেশে যাওয়ার বৃত্তান্ত। বাঙালি ঘরের সেই অন্তরতম মাসি-পিসির কথা বলতে গিয়ে নিজের ছোটবেলার মাসি-পিসি, জগন্নাথের গুণ্ডিচাবাড়ির মাসি-পিসি, বাঙলা ছড়ার চিরন্তনী মাসি-পিসিকে এক চেহারায় যে মিলিয়ে নিয়েছেন লেখক তার জের চলেছে শেষ জীবনে লেখা 'মাসি' অবধি। মা-র ঘর থেকে সেই মাসি-পিসির ঘর— তার একটা ভৌগোলিক যাওয়া-আসা পথ পর্যন্ত খুঁড়ে বের করা গেছে। সেই পথ ধরে 'হুম্পাহুমা পালকি চলেছে বনগাঁ পেরিয়ে ; ধপড়ধাঁই পালকি চলেছে বনের ধার দিয়ে, মাসির ঘর ছাড়িয়ে, ভূতপত্রীর মাঠ ভেঙে, পিসির বাড়িতে।··· পিসি থাকেন তেপান্তর মাঠের ওপারে সমুদ্দুরের ধারে. বালির ঘরে।' 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র স্বীকৃতি, পুরীকোণারকের বর্ণনা দিয়ে লেখা 'ভূতপত্রীর দেশ'। বাঙলাদেশের রথতলাটি সেই 'সমুদ্দুরের ধারেই··· । বেশ জায়গাটি। চারদিকে ঝাউবন, মাঝে অনেকখানি বালি পরিষ্কার তকতক করছে। তারই মাঝে মুড়ো রথখানা।' বাড়ি সেখান থেকে কতই বা পথ। শুধু মনে পড়ার অপেক্ষা, অমনি 'এক-দৌড়ে ষষ্ঠীতলায় হাজির। সেখান থেকে দেখছি— গঙ্গার ওপারে তুলসীগাছের পাতা ঝুর-ঝুর করছে, তারই তলায় মা-আমার দুগ্‌গো-পিদিম জ্বালছেন।' ওঠা-পড়া কৌতুকউচ্ছ্বাসের ঢেউয়ের মধ্যে কোথায় হঠাৎ চিকচিক করে উঠেছে ভাঙা ডুবোজাহাজের একখানা মোহর।

এইরকম দুটিএকটি ভাঙাচোরা ছড়ার কথা এক করে, কখনো বা চকিত একটি ছড়ার ফাঁপা ভরাট করে অবনীন্দ্রনাথ তৈরি করেছেন ছোট-বড় উপকথা— কথা, কিংবা পালা। সেখানে শিবু সদাগরের পিছন পিছন হাজির সিঙ্গির মামা ভোম্বলদাস, বদ্যিবুড়ির পাশেই হুম্বুর-মুম্বুর, আছে বৌ-কথা-কও পাখিটি, চাঁদামামা, জল পী পী কাঠের ঘোড়া। ছড়ার সব স্বনামধন্যেরা এসে সাজিয়ে গেছে একটি একটি মজার গল্প, নয়তো এক-একটি গল্পের খানিকটা করে মজা। বুঝি এও একরকমের প্রাকৃতমানসের প্রত্নোদ্ধার। কালকবলিত মঠ-মন্দির-মূর্তি-মুদ্রা-প্রাসাদ-পরিখার লুপ্তোদ্ধার করে যে ইতিহাস খোঁজা শুরু হয়েছিল তারই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে জাতির হৃদয় অনুধাবন করবার জন্য শুরু হয়েছিল আমাদের লোকবৃত্তের চর্চা। এই লেখা পড়ে মনেই হয় না, ঐসব উপকরণেরই টুকরো কুড়িয়ে, কুড়িয়ে আবার জোড়া লাগাবার এক ইচ্ছাব্রতে রত হয়েছেন শিল্পী। অর্থাৎ এগিয়েছেন আরো একটা বাঁক। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন, 'ইহারা সজীব, ইহারা সচল ; ইহারা দেশ কাল পাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে'— সেই সচল চেতিয়ে তোলার, উপযোগ ফিরিয়ে দেওয়ার সোনার কাঠি ছোঁয়ানো বহ্নিআধারে ধরে অবনীন্দ্রনাথ জীইয়ে তুলেছেন এই প্রত্ন-survivals, আর ঐ বিবর্তনবাদী ভিক্টোরীয় ধারণা অতিক্রম করে গিয়ে হয়তো বা সূত্রপাত করেছেন একটু নব্যতর পর্যবেক্ষণের ধারা।

এইসব ভাঙাচোরা টুকরোর তিনি প্রণিধানযোগ্য মান্য দিয়েছেন, চোখে পড়ে। নয়তো রামায়ণের গল্প বলতে কেন বাঙলা ছড়ার ধুয়ো

চড়ুইটিরে মরুইটিরে আসরে বসো সে

ছড়ার গায়ে হাতটুকু ছুঁইয়ে

চড়ুইটিরে মরুইটি দুয়োরে বসো সে
রামচন্দ্রের কান বিঁধাবো নাড়ু বিলাও সে

কিংবা রসতত্ত্বের 'সুন্দরে'র পরিচয় লিখতেই বা কেন খনার বচন

ডাকয়ে পক্ষী না ছাড়ে বাসা
উড়িয়ে বসে খাবে করি আশা
ফিরে যায় নিজালয় না পায় দিশা
খনা ডেকে বলে সেই সে উষা।

উষার সহজ সুন্দর বর্ণনা।... বেদেও উষার বর্ণনা আছে, সে আর-এক ভাবের সুন্দর।

ভাগ্যে 'বাংলার ব্রতে'র গাঢ় তত্ত্ব-আলোচনাতেও স্বভাবটি সংবৃত নয়।

আবার-গড়ে দেখা, বা দেখানো— ব্যাপারটি কেন? কিংবা কেমন?— অন্তত এই বইটির মধ্যে বিশদ-ভাবে পড়ে নেওয়া যায় শিল্পীর ইচ্ছা। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ব্রতের... ছড়াগুলি পড়তে পড়তে... আমরা অনায়াসে কল্পনা করতে পারি, বহুযুগ আগেকার বাংলাদেশের একখানি গ্রামের উপর রাত্রির যবনিকা আস্তে আস্তে সরে গেল...'— এই বলে ব্রতের উপকরণ দিয়ে সেই আমাদের পুরোনো দিনগুলিকে তৈরি করে তুলতে বসেছেন সরাসরি। একটু একটু করে শিল্পীর হাতে ফুটে উঠেছে 'তোষলা ব্রতের জীবন্ত দৃশ্যকাব্যটি'। সেই ভাবে ভাদুলি ব্রত, অশথপাতার ব্রত, সেঁজুতি ব্রত, মাঘমণ্ডলের ব্রত— এ দেশের আদিম মানুষদের 'একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া' এইসব ব্রতোৎসবে মানুষের সঙ্গে গাছপালায় ঋতুপর্যায়ে মিলিয়ে যে রূপক রচনা হয়েছে, 'প্রত্যেক ঋতুর ফুলপাতা, আকাশবাতাসের সঙ্গে এইসব অশাস্ত্রীয় অথচ একেবারে খাঁটি ও আশ্চর্যরকম সৌন্দর্যে রসে ও শিল্পে পরিপূর্ণ বাঙালির সম্পূর্ণ নিজের ব্রতগুলির যে গভীর যোগ দেখা যাচ্ছে', প্রবন্ধের মাঝ-খানেই দৃশ্য-অঙ্কে ভেঙে লেখক সবিস্তারে তা নিয়ে নতুন পালা বেঁধেছেন। ব্রতের মধ্যে রয়েছে পুরো একটি নাটিকা— জীবননাট্য— ছবি-ছড়া-আঁকা-অভিনয় সব মিলিয়ে। কিন্তু যত্ন করে গুছিয়ে আবার বেঁধে না দিলে দেখতে পাওয়া যাবে কি তার অন্তর্গত জীবনের ধারা, হৃৎপ্রদীপখানি? তাই ব্রতের ছড়াগুলি নিয়ে পালা বেঁধেছেন অবনীন্দ্রনাথ, যেমন ছেলে ভুলোনো ছড়া নিয়েও বেঁধেছেন— পালা, বা গল্প।

ছেলেভুলোনো ছড়ায় ব্রতের ছড়ার বৈচিত্র্য নেই, সে হল একটিমাত্র ভাব দৃশ্য বা ঘটনা। ছেলে ভুলোনো ছড়া, যেমন—

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুমের বাড়ি এস,
সেঁজ নেই, মাদুর নেই, পুঁটুর চোখে বস।
ডিবে ভরে পান দেব, গাল ভরে খেও,
খিড়কি-দুয়োর খুলে দেব, ফুড় ত করে যেও

কিম্বা যেমন—

ইকড়িমিকড়ি চামচিকড়ি
চামকাটা মজুমদার,
ধেয়ে এল দামুদার,
দামুদার ছুতোরের পো,
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।

এগুলোর মধ্যে ওঠাবসা, চলাফেরা, মাসি, পিসি, মজুমদার, দামুদার, ছুতোরের পো— এমনি নানা ঘটনা, নানা পাত্রপাত্রী যথেষ্ট রয়েছে ; কিন্তু এদের নিয়ে অভিনয় বা নাটক করা চলে না। না চলুক, গল্প বাঁধা চলে নিশ্চয়। অবশ্য যদি থাকে কল্পনা। সেই কল্পনা— শিল্পের যা প্রাণ, 'বাগেশ্বরী'র প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করা 'অবিদ্যমানের নিশ্বাস'। আবার চাঁইবুড়োর ছেলেভুলোনো পাঠান্তরে যার পরিচয় এইরকম—

'গল্প শুনবে তো তল্প নাও, জল্পনা রাখো, কল্পনা কর— অল্প সল্প !'

—'কল্পনা করতে তো আমি জানিনে চাঁই দাদা।'

—'তা ঠিক তুমি যে আজকালকার ছেলে— হিস্টিরি পড়ে কখনো কেউ কল্পনা করতে পারে ?'

নির্ফাকী তথ্যের জালে কল্পনা তো কল্পনা, কোথায় তলিয়ে যায় গোটা মনটাই। ছোট ছোট সময় টুকরোর মধ্যে বন্দী হয়ে হাঁসফাঁস করতে থাকে। আর যদি 'হিস্টিরি' হীন আবহমানের কল্পনাই পারো, তা দিয়ে যা-খুশি নিয়ে যে-কোনো আদলই তো বানিয়ে তোলা যায় ইচ্ছে মতন। তাই করেছেন অবনীন্দ্রনাথ।

ছেলেভুলোনো ছড়া তা সব কতকালের। সেই 'দামোদর ছুতোর, শ্যামঠাকুর, শিবুসদাগর কংস রাজা হড়ম বিবি কোন্ অতীতকালের বিস্মৃতপ্রায় ই তি বৃ ত্তে র অপরিচিত স্মৃ তি চি হ্ন মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে, তাহা আমরা এখন কল্পনায় আনিতে পারি না।' রামেন্দ্রসুন্দরের এই 'কল্পনা' কেবল স্মৃতি। অবনীন্দ্রনাথের কাছে সৃষ্টি, বা ভিশন। কল্পনাসৃষ্টির বলেই না দেখতে পাওয়া দায় যা হেথায় নেই তার'অবিদ্যমানের' সজীব চলাফেরা। 'বাগেশ্বরী'র প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন, ওই সব ছড়ার মধ্যে রয়েছে মানুষের আদিম শিল্পের রূপ ও রঙ, 'ছেলেমানষী নয়, একটা জাতের তরুণ দৃষ্টিতে দেখাশোনার ছবি ও ছাপ ওরা'। ওদের ভর করে তাই সোজা সচ্ছন্দে চলে যাওয়া যায় সেই আদিম দিন-পহরের মধ্যে। নয়তো ব্রতের ছড়া রূপকথার ছড়ার সঙ্গে জুড়ে গেঁথে তৈরি করে নেওয়া যায় অখণ্ড সমগ্র— সর্ববয়সী আদি মানুষের পূর্ণবলয়।

তবু এই যে ছুতোরের পো দামুদার, ইকড়িমিকড়ির দল, সুবুদ্ধি তাঁতি, রতা শেয়াল, ভোম্বল দাস, এমন-কি মাসি-পিসি ব্রতকুমারীরা— এরা কি সত্যি এতখানি ? মুখোশ-রূপকিত ? সত্যিই জাতি-মানসের প্রাগিতিহাস গড়ার অতবড় কুলীনতা আছে নাকি এই এদের ? একটু ইতিহাস মনে করলে দ্বিধা হয়তো কাটে। সে ইতিহাস খুব সম্ভ্রান্ত ইতিহাস। একসময় ম্যাক্স্ ম্যুলারের মতো প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি অবধি ছেলেভুলোনো গল্প বা নার্সারি টেলগুলিকে মানতেন আর্য পুরাণের অপভ্রংশ বলে। তাঁর ধারণা ছিল ভাষার অর্থাবলোপের ফলে তার উচ্চ ভাব মাহাত্ম্যরিক্ত হয়ে বাহিত হয়ে গেছে উপকথায়। গ্রিমের

গল্পের ব্যাঙ-রাজপুত্রকে নিয়ে দুই দলে— আন্তরীক্ষ পুরাণতাত্ত্বিক আর নব্য নৃতত্ত্ববিদদের খানিক বিসংবাদ হয়েছিল। ম্যাক্স ম্যূলার বলেছিলেন মূলত এটি পুরোনো দিনের একটি সৌর মীথ, যখন সূর্যের একটি নাম ছিল 'ভেকী', এখন 'ভেকী'র সেই অর্থপ্রসার না থাকায় গল্পটির নিহিতার্থ আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। ম্যাক্স ম্যূলারের অনুগামীদের মধ্যে জর্জ কক্স্ এ নিয়ে আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। আবার নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষকেরা— যেমন অ্যাণ্ড্রু ল্যাঙ, পুরাণভক্তদের এই-সব বাগ্‌বিস্তার নিয়ে পরিহাস করলেও গ্রিমের ব্যাঙটিকে সামান্য জ্ঞান করেন নি। তাঁরা দেখিয়েছিলেন বিবাহার্থী ঐ ব্যাঙটি এমন একটি আদিমজাতির কথা ব্যক্ত করছে যাদের কুললাঞ্ছন টোটেম ছিল ব্যাঙ, বিকাশের পথে টোটেম-স্তর অতিক্রম কবার পরেও তথ্যগুলি তাদের মধ্যে রূপকাবরণে রক্ষিত হয়ে গেছে। আমাদের ছড়া-প্রবাদ-গল্পের ইতিহাস-খোঁজার বা রূপকভঙ্গের যত্ন কখনো অবশ্য এইভাবে করা হয় নি।

ছড়া-প্রবাদের টুকরো কিংবা কথাকবিতার সূত্র দিয়ে পুরোনোদিনের রাজনীতিক নয় অধিমানসিক ইতিহাসটি তৈরি করে নেওয়া যায়, গ্রিমেদেরও ছিল সেই বিশ্বাস। নৃতাত্ত্বিক ই. বি. টাইলর পুরোনো মানসের জীবিতাবশেষ বলে ঐগুলির পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু সে কতদিনকার পুরোনো দিন? মার্গারেট হাণ্ট-অনূদিত 'গার্হস্থ্য উপকথা'র ভূমিকায় উপকথা পর্যালোচনা করতে গিয়ে অ্যাণ্ড্রু ল্যাঙ লিখেছিলেন, এইসব মেয়েলি গল্পের মধ্যে দৈত্য-দানা, পশুদের সাথে কুটুম্বিতা, জাদু, নানান অপ্রাকৃত প্রভৃতি অজস্র আদিম-বিশ্বাসের যে-সব দাগ দেখা যায়, ঐতিহাসিক যুগের শিক্ষিত জার্মানদের জগতে কি তা খুব পরিচিত জল-চল? বা স্বাভাবিক? কে বলবে সে কথা সাহস করে। এই মানসস্তর তা হলে অনেক কালের পুরোনো গ্রাম্য মানসিকের ভগ্নাবশেষ, যখন আধুনিক জার্মানজাতির পূর্বপুরুষেরা ছিলেন জুলু, মাওরি বা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মতন-ই আদিমবাসী।

'পৃথিবীর আদিম জাতিদের মধ্যে যে সমস্ত শিল্প, তাদের মধ্যে একটা মিল দেখা যায়'— অবনীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন। এ দেশের পুরোনো মানুষদের ব্রতাচার বা শিল্পাচারের আদর্শ তিনি খুঁজে নিয়েছেন পেরু, মেক্সিকো, মিশর, আমেরিকার হুইচল জাতি, অস্ট্রেলিয়ার বুশম্যান, গুহাবাসী স্পেন, নিউজিল্যাণ্ডের মাওরিদের মধ্যে থেকে। মনে করতেন, বাঙলা ব্রতের— হয়তো বা বাঙলা ছড়ারও মধ্যে— জমে আছে আর্য-পূর্ব সংস্কৃতির জীবিতাবশেষ: পুরাণের চেয়ে পুরোনো, বেদেরও পূর্বেকার মানুষদের স্মৃতিচিহ্ন। তার উপরে হিন্দু কৃষ্টিশিল্পসভ্যতার হিন্দু ধর্মের হিন্দু শাস্ত্রের অনেকগুলো আস্তর পড়েছে পর পর।

পশ্চিমের ইতিহাস-সন্ধানীদের চোখে পড়েছিল, চতুর্থ শতক থেকে শাস্ত্রীয় খৃষ্টধর্ম প্রবর্তিত হতে থাকে টিউটনিক জাতিগুলির মধ্যে, কিন্তু পুরোনো পেগানেরা সেই নতুন শাস্ত্র মেনে নিলেও ভেতরে ভেতরে তাঁদের সনাতন জীবন-সংজ্ঞা বিসর্জন দেন নি। লণ্ডন শহরের ইতিহাসবিদ্ জর্জ লরেন্স গোম তথাকথিত ইংরেজ সমাজের মধ্যে দেখেছিলেন আর্য-অনার্য স্পষ্ট দুটি সমান্তরাল কৃষ্টির ধারা, যার আদিম কৃষিনির্ভর শ্রেণীটি অসংশয়েই অনার্য। এই পরের শ্রেণীটির উপরেই প্রভূত প্রাচীনতার ছাপ রয়ে গেছে। যাকে লোকবৃত্ত বলি তার সকল শ্রেণী— ব্রতাচার হেঁয়ালিপ্রবাদ রীতিব্যবহার ছড়াকাহিনী— সারা ইয়োরোপ জুড়ে এই কৃষিবলয়িত গ্রাম্য মানুষদের মধ্যেই যে আজও বেঁচে রয়েছে— এই তথ্য তখনকার নতুন নৃতত্ত্বদীক্ষিত লোকশ্রুতিবিদেরা সাগ্রহে ব্যবহার করেছিলেন। মূলত টাইলরের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে অ্যাণ্ড্রু ল্যাঙ, ক্লড বা সিডনি হার্টল্যাণ্ড ইয়োরোপীয় গ্রামীণ আদিমানসের স্বরূপটি আদ্যন্ত অনুধাবন

করবার জন্ত সমস্তরবর্তী আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের জীবনবৃত্ত সন্ধান করেছিলেন— এঁদেরই সবার মুখপত্র বলে আমরা চিনি 'গোল্ডেন বাউ'য়ের প্রণেতা সার জেমস জর্জ ফ্রেজারকে। সে জায়গায় গোম তাকিয়েছিলেন ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তের দিকে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, দু-দেশেই সমাজের উপরের দিকে আছে বহিরাগত আর্য-সংস্কৃতি, কিন্তু তলায় বয়ে চলেছে কৃষি-বলয়িত গ্রামীণ কৃষ্টির ধারা। উপরন্তু, ইয়োরোপে রাজনীতি-অর্থনীতির নতুন বিন্যাস সেই তলার স্তরটিকে যেভাবে প্রায় মুছে দিতে বসেছে, ভারতবর্ষে তা পারে নি। গোম বলেছেন, তবু ব্রিটেনের গ্রামগুলির আর্থনীতিক বিন্যাসে যদি আগের আমলেই রোমানবিজয়ের ছাপ পড়ে থাকে, গ্রামের লোকাচার ধর্মকর্ম ব্রতবিশ্বাসের উৎস সেই আর্য ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যাবে না, সেখান থেকে তা উৎসারিত হয় নি।

বরং আর্য-সংস্কৃতিরই অনেকখানি এসেছে অনার্যদের ঘর থেকে, প্রতিপাদন করেছেন অবনীন্দ্রনাথ; যাঁর প্রথম পরিচয় বাঙলা শিল্প-স্কুলের জনক, বা ছেলেভুলোনো গল্পের শিল্পী। 'ভারত শিল্পের ইতিহাস শুধু বৈদিক যুগ পর্যন্ত নয় তারো এবং আরো পূর্ব থেকে তার ধারা চলে আসছে।' ঐ অনার্য প্রাগিতিহাস খুঁজে তিনি যদি ফিরে আসেন তাঁর নিজের পায়ের তলার মাটিতে, তা-ও অনৈতিহাসিক কিছু নয়। কতদিনকার পুরোনো আমাদের এই বাঙলাদেশ। পণ্ডিতে মানেন, ভারতভূমণ্ডলের প্রাচীনতম ব্রতবিশ্বাস সংরক্ষিত হয়ে আছে এর ভূপরিসরে। মোহেন্-জো-দড়ো, মিশর, ক্রীটের লুপ্ত সভ্যতার সঙ্গেও নাকি যোগ এখানকার সংস্কৃতিপ্রবণতার। 'বাগেশ্বরী'তে 'বাংলার ব্রতে'ও বিশ্বের নানা জায়গার প্রাগার্য অনার্য লোকসংস্কারের সঙ্গে বাঙালি মানসের সেই যোগ দেখানো আছে, তা আগেই বলেছি। তার পর আর্যরা বাইরে থেকে এ দেশে এসে এখানকার আদিমবাসিন্দাদের নাম দিলেন অন্ত্যব্রত। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন 'বাঙালীর ইতিহাসে': গুপ্তাধিপত্যকে আশ্রয় করে ঐ চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকেরই মধ্যে সর্বপ্রথম

> আর্য ভাষা, আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত সবেগে বাংলাদেশে প্রবাহিত হইল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকথা, বিচিত্র লৌকিক গল্পকাহিনী ইত্যাদি সমস্তই সেই স্রোতের মুখে এদেশে আসিয়া পড়িয়া এদেশের প্রাচীনতম ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, লোককাহিনী সমস্ত কিছুকে সবেগে সমাজের একপ্রান্তে অথবা নিম্নস্তরে ঠেলিয়া নামাইয়া দিল।

আর অবনীন্দ্রনাথ আগেই দেখিয়ে গেছেন, আমাদের

> মেয়েলি ব্রতগুলির মধ্যে আমরা সেইসব দিনের মধ্যে গিয়ে পড়ি যেখানে আমাদের পূর্বতন-পুরুষ অন্ত্যব্রতরা তাঁদের ঘরের মধ্যে রয়েছেন দেখি। সব-উপরে হিন্দু-অনুষ্ঠানের অনেকটা গঙ্গামৃত্তিকা, গৈরিক— এমনিসব নানা মাটির একটা খুব মোটা রকমের স্তর: তার পর বৈদিক আমলের মূল্যবান ধাতুস্তর; তারও তলায় অন্ত্যব্রতদের এই সব ব্রত— একেবারে মাটির বুকের মধ্যেকার গোপন-ভাণ্ডারে।

অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এখনো-চলিত 'বাংলার এই ব্রতগুলি আমাদের মেয়েদের দিয়ে তখনকার অন্ত্যব্রতচারিণীদের জীবন্ত বর্ণনা।' কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ নিছক তত্ত্ববিৎ নন, পুরোনো এভল্যুশনিস্ট স্কুলের মর্গান-টাইলর-ফ্রেজারের ধারাঅনুসারীও নন। এর ব্যবহারী উপযোগটুকু দেখানো না অবধি, সেই উৎসদীপের আলোর তাপে হাত না সেঁকা অবধি তাঁর শান্তি নেই। প্রদীপ জ্বলে শুধু সোনার কাঠির ছোঁয়ায়, 'স্মৃতিশক্তির সেই সোনার কাঠি' ছুঁইয়ে ঐ-সব ব্রতাচারে পূর্ণ আয়তনটি চাক্ষুষ করে তুলতে পারলে

সেই জীবন আবার গঠিত করে নেওয়া যায় যার মধ্যে আছে নৃত্য-গীত-চিত্র-নাট্য-উপন্যাস এবং সর্বোপরি ধর্ম— সব মিলে আদ্যন্ত তরঙ্গিত লোকযাত্রা— কেবল এই মুহূর্তের একটু প্রবর্তনা, তাইতেই জীবন জ্বলে উঠতে পারে তার সর্বাঙ্গে। 'কাজেই ব্রতগুলি আমাদের কাছে তুচ্ছ জিনিস নয়।'

ব্রতের পুনর্গঠিত নমুনাকটির মধ্যে সত্যি জীবন জেলে দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। ব্লেক লিখেছিলেন, ব্রিটেনের প্রত্নসম্পদ আজ একা কবির ঘরে। সেই কবির মতো অবনীন্দ্রনাথ গড়তে চেয়েছেন চোখের উপর আমাদের পুরোনো ঘরটি। প্রত্ন-বিলাস নয়, ত্রিশঙ্কু আমাদের অসহায় সময়টুকুকে পরম্পরার উপরে দাঁড় করিয়ে জীবনের মানে খুঁজে আনার দুরভিলাষে।

অবনীন্দ্রনাথের সব রচনাতেই অভিপ্রায়ী এই আগুন আছে। ছবিতে বোধ হয় আরো তা স্পষ্ট— ঐ শিল্পীর আত্মপরিচয়ের এই ঈষদংশ :

১ লোকে বলে, যে তারাকে দেখি চোখে সে তারা লোপ পেয়ে গেছে বহুযুগ আগে। তার আলোর কম্পনটুকুই দেখছি আমরা আজ তারারূপে। আমার মনও কি তাই। প্রাণের সেই বহুযুগ আগে লোপ পেয়ে যাওয়া কম্পন ধরে দিচ্ছে আজকের ছবিতে লোক-চোখের সামনে।

২ অনেক ছবিই আমার তাই— মনের তলা থেকে উঠে আসা বস্তু।

৩ মন চায় বাড়ি ফিরতে, বোঝা বাঁধাছাঁদা করে। স্বপ্নে দেখে বহুকাল আগের ছেড়ে-আসা বাড়ি ঘর ঘাট মাঠ গাছ।

প্রথম-জীবনের পদাবলীর ছবির সঙ্গে উত্তর-জীবনের কবিকঙ্কণ-কৃষ্ণমঙ্গলের ছবি মিলিয়ে পড়লে ফেরার পথটিও তার ভেসে ওঠে, আগাগোড়া। আর পড়বারই ছবি সে সব— রঙধোয়া বিষণ্ণ লিরিক।

অসিতকুমার হালদার বিচিত্রা পত্রিকায় গুরু-বন্দন করতে গিয়ে লিখেছিলেন, " 'যদ্দৃষ্টম্ তল্লিখিতম্' এই হল আধুনিক বিশ্বচিত্রকলার কথা। কিন্তু তিনি একেবারে ধ্যানকল্পনার সাহায্যে চিত্রকলা চর্চার প্রবর্তন করে দিলেন ;— শিল্পীকে শুধু কারিগর নয়, কবি করে দিলেন।" এই ধ্যানকল্পনা, অবনীন্দ্রনাথ সহজার্থে যাকে বলতেন 'ভাব'— তাঁর সব রচনাতেই এক পরত গূঢ়ের আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। সমকালীন বাস্তবপন্থা বা জ্যামিতিক-অধিমানসিক চিত্রপন্থায় অভ্যস্ত ছবি-দেখিয়ের কাছে ঐ তাৎপর্য যদি আশুস্বপ্রকাশ না হয়ে থাকে, কিছু বলার নেই। কবিতার এই আবেগ তাঁর শব্দেও। কি তারই ফলে, ছবিতে যাঁর আপাতমুখখানি সেন্টিমেন্টাল, লেখায় তা এমন বালকোচিত। বিলিতি-নিয়ন্ত্রিত সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ে যুক্ত হয়ে পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষা পরিহার করে, অথবা বাঙলা মোগল রাজপুত জাপানী ইয়োরোপীয় সব সংস্কার নিশ্চিহ্নে গ্রাস করে নিয়ে স্বকীয় নিজস্বের প্রস্তুতিতে যেমন তাঁর ছবি, তেমনি চোখের সামনেকার দিশিবিদেশী কাব্যসাহিত্যের সংস্কার— স্বপ্নদুরাশার রোম্যান্টিকতা— সব এড়িয়ে খুঁজেছিলেন তাঁর শব্দগত নিজস্বতা— বিশেষ পদ্ধতিতে— লোকায়তের কুটোঘুঁটি সাজিয়ে— খেলাভরে— কোনো বিশপ পার্সির রেলিক্‌সে তার ছায়া নেই, কোনো রবীন্দ্রচিন্ময়তে তার আকর্ষণ নেই। প্রচল সব রসরাগরূপ অস্বীকার করে শুধু খেয়ালের তারে তা বাঁধা— শুধুই তা অনতিব্যক্ত স্বপ্ন— একই সাথে সদ্য-জাত মানুষের, শিশুর, কবি-শিল্পীর দেখতে পাওয়া স্বপ্ন— কৌতুককল-উচ্ছ্বসিত আপাত-অর্থ-নারাজ। শুধু 'শিশুকালের হারানো চমৎকারি কাচ অনেক কষ্টে খুঁজে' সেই পরকলা চোখে এঁটে পড়তে হয়।

মনের সিন্দুকের লুকোনো দেরাজ থেকে বের করে স্বপ্নের সেই সবুজ খাতাখানি খুলে দেখিয়েছেন শিল্পী :

প্রথম পাতাতেই লেখা কমলাফুলির দেশে সকাল হচ্ছে— আকাশে কমলানেবুর রঙ, গাছে-গাছে সোনালি সব ফল ফুল পাখি, তার মাঝে কনকরাজার মেয়ে কপ্‌লে গাই দুইতে বসেছে। নদীতে সব সোনালি রঙের হাঁস, মাছ আর নৌকো ভাসতে ভাসতে চলেছে, মাঠে মাঠে সোনালি ধানের শিস বাতাসে ঝিক্‌মিক্ করে দুলছে, তার মাঝে ছোট্ট একটি রাখাল বাঁশি বাজাচ্ছে। রাজকন্যের হরিণ সোনার ছিকলি ছিঁড়ে সেইদিকে ছুটে চলেছে বাঁশির গানে ভুলে। আর শেষ পাতার ফটিক জোছনার দেশে রাজকন্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন, নীল আকাশে মস্ত চাঁদ হিঞ্চেবনের আড়াল থেকে রুপোর থালার মতো দেখা দিয়েছে, আর সেই রাখাল পরানের কাটিটি আস্তে-আস্তে রাজকন্যার বুকে ছুঁইয়ে দিচ্ছে। এই দুই ছবির মাঝে রয়েছে— কোন্নগর, আঁস্তাকুড়ে বেড়াল বসে আছে, খেলাঘরে ছেলেরা ইকড়ি-মিকড়ি খেলছে, হিঙুল গাছে মাদারের ফুল, আঁকর ফুল বেঁচ ফুল ফুটে রয়েছে, টেঁ্যপের ভিতর সব ঝিঙে ঝুলছে, নটে শাকের গুঁড়িতে ল্যাজঝোলা পাখি উড়ে বসে চাটিম কলা খাচ্ছে, চালতা তলায় ঝিঁঝি ডাকছে আর প্যাখনা বিবি নাচছেন। সোনার আঁচিলে পাঁচিলে হড়ম বিবি খড়ম পায়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, আর হলদে-গুঁড়ির মাঠে গামুর গুমুর ঢোল বাজছে ; চেঙা ক্ষেতে নৈ-ছাগল ঝেঙা ফুল ছিঁড়ে খাচ্ছে, বন-কাপাশি গাছে নোটন পায়রা ডিমে তা দিচ্ছে, রামছাগল আতা-পাতা খেতে লেগেছে, মুড়ো নটে গাছের তলায় গালফোলা গোবিন্দর মা বসে-বসে তাই দেখছে, আর চুবড়ি মাথায় দিয়ে ভোম্বল দাস হাটে চলেছে। তারপর বাপ-মায়ের দেশের ছবি— সেখানে পুকুরে পানকৌড়ি ডুব দিয়ে মাছ ধরছে, বাঁশতলায় বুড়ি শুকনো পাতা ঝাঁট দিচ্ছে, জোড়পুতুলের বিয়ে হচ্ছে, কাঁচনি পাড়ায় নাচনি নাচছে, জটাধারী ভিক্ষে চাইছে, 'হাতে-পো কাঁখে-পো' ছেলে ধরে বেড়াচ্ছে, জোয়ান গুরু জোড়াবেত হাতে বসে, গোয়ালের শোভা নেহাল বাছুর হামা দিচ্ছে। শিবসদাগর অগ্রদ্বীপে বাণিজ্য করতে চলেছেন, ভাত-কাঁদুনে ফেউয়ার মা ছেলে ঘুম পাড়াচ্ছে, আর মাসিপিসি বনগাঁয়ে বসে খয়ের মোয়া পাকাচ্ছেন। ময়রাবুড়ো সন্দেশ খাচ্ছে, কামারশালে হাতুড়ি পড়ছে ঠকাঠক্, খাটের খুড়ো নলের হুঁকো নিয়ে তালপুকুরের ঘাটে চুপটি করে বসে আছেন, কানকাটার মা তাঁর কান চুলকে দিচ্ছে, রামের বাঁশিতে তুলো জড়িয়ে। রামতুলসীতলায় দুখপাসরা নয়নতারার পিদিম জ্বলছে, আর ভুঁড়োশেয়ালি অন্ধকার থেকে মুখ বাড়িয়ে সে দিকে চেয়ে আছে ; মন্দিরে দেবশঙ্খ বাজছে। তারপর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার ছবি সব—বেড়াল কোমর বেঁধে পাল্কির সঙ্গে চলেছে। তারপর বর্ষাকালের ছবি সব— অভদ্রা বর্ষাকালে হরিণ বাঘের ছাল চাটছে, আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, সুয্যি পাটে বসলেন, খুকু জল আনতে পদ্মদিঘির ঘাটে চলল, সেখানে পদ্মদিঘির কালো জলে হরেক রকম ফুল ফুটেছে। খুকুর গোছাভরা চুল বাতাসে হেঁটোর নিচে দুলছে, মা দূর থেকে ডাকছেন—

বৃষ্টি এলে ভিজবে সোনা, চুল শুকোনো ভার,
জল আনতে খুকুমণি যেয়ো নাকো আর।

তার পর একটি ছবি সে যে কী চমৎকার কি বলব— ছোট নাতনি তার বুড়ো দাদামশায়ের গলা ধরে

বাপের বাড়ি যেতে কইছে—

ওপারেতে কালো রঙ
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকটুক করে
ওগো দাদাভাই আমার মন কেমন করে!

দাদাভাই তার পিঠে হাত বুলিয়ে কইছেন—

এ মাসটা থাক দিদি কেঁদে ককিয়ে,
ও মাসেতে লয়ে যাব পাল্কি সাজিয়ে!

তার পর দু-জনে দু-জনের গলা ধরে কাঁদছে আর বলছে—

হাড় হল ভাজাভাজা, মাস হলে দড়ি
আয়রে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি!

এমন সব ছবি যা দেখে হাসি চাপা যায় না, আবার এমন সব ছবি যা দেখতে দেখতে চোখে জল আসে।

ছড়ায়-রূপকথায় মিলিয়া ছোটদের বইয়েরই রচনা। তবু এরই মধ্যে নিজের সঙ্গে এর একটু বাঁধান দিতে ভোলেন নি শিল্পী, এই বর্ণনারই গোড়ায় বাঁধা—

আমার মা আমাকে একদিন আমার সবুজ খাতাখানি দিয়েছিলেন। আমি কি তখন জানি সে খাতার গুণ,— আর-একটু হলেই একটা বিলিতি খবরের কাগজের ছবির সঙ্গে সেটা বদল করেছিলুম আর-কি! ভাগ্যি মায়ের চোখে পড়েছিল, তিনি আমায় কোলে বসিয়ে যখন সেই খাতা থেকে একটির পর একটি ছবি দেখাতে লাগলেন তখন আমি অবাক হয়ে গেলুম। কি রঙ দিয়েই সে-সব ছবি লেখা! বাজারে সে রঙ পাবার জো নেই!

এর মন্ত্রণা কারোকে না ছুঁক, অন্তত ঘা দিয়ে ওঠে কবিস্বভাবীর মনে মনে। যেন বাঙালি কবির কবিশিক্ষা আসলে ভাগবতপুরাণ বিজয়মঙ্গল ভারতপাঁচালি কিছু নয়, মিল্টন-কালিদাসও নয়, শুধু বাঙলাদেশের ছড়া আবহমান— ঘুমপাড়ানি, মনভোলানি, খেলাচালানি— ব্রতের, রূপকথার, ছেলে-ভোলাবার, অন্তত একখণ্ড 'খুকুমণির ছড়া'।

অবনীন্দ্রনাথের উপকথার জগৎ

ছড়ার থেকে গুরুতর, বা আর্যতর, বা অন্যতর বিষয়ও অবনীন্দ্রনাথ অবলম্বন করেছিলেন। রাজস্থানী ইতিহাস নিয়ে লিখেছিলেন 'রাজকাহিনী'র গল্প, বুদ্ধের সমসকার সময় নিয়ে 'নালক', রামায়ণ-মহাভারতের টুকরো গল্প, এমন-কি আদ্যন্ত রামায়ণ-পালা। লিখেছিলেন ঈশপ আরব্য উপন্যাস ভাঙা লেখা, ইসলামি কিস্‌সার বয়ান। সারা উনিশ শতক ধরে অনেকখানি ভিন্‌দেশী লোকসাহিত্য বাঙলাতেও সংকলিত হয়েছিল, তার বাইরেও যাওয়াআসা ছিল তাঁর। কিন্তু আগেই বলেছি, তা নিয়ে ভয়-ভক্তি-জাগানো কোনো গুরু-সাহিত্য তিনি প্রণয়ন করেন নি।

অথচ শব্দ যে তাঁর কাছে ছবির চেয়ে কম ছিল, তা তো নয়। সাহিত্যকে তিনি ছবি-আঁকার

শ্রান্তিহারী বলে নেন নি, অবসর কাটাবার লঘুতা দিয়েও লেখেন নি। এক সময়ে ছবি-আঁকা একেবারে বন্ধ করে একাধিক্রমে আট-দশ বছর শুধুই লিখেছেন। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন 'দক্ষিণের বারান্দা' বইয়ে, সেই সময় একবার তাঁর পুরোনো বন্ধু বেন্থল সাহেবের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'দেখলুম ছবি-টবি কিছু নয়। ছেলেমানুষি। গভীরতর রসের সন্ধানে নেমেছি। নানা রকম শব্দ বাজিয়ে বাজিয়ে দেখছি কি-রকম চিত্র ফুটে ওঠে মনের মধ্যে।' আশ্চর্য লাগে সেই গভীরতার দৃশ্য চিত্র বয়স্ক-পাঠ্য গাম্ভীর্যটুকুও পরে নেয় নি।

এই হয়তো সত্যি লোকশৈলি, যেখানে গমনাগমনের কুশাগ্র বাধা থাকলে চলে না, আর হয়তো এই বিশেষ শৈলিটুকুই ছিল শব্দশিল্পে তাঁর সাধনীয়। তার আগে-ভাগে অবশ্য বিষয়, ব্যক্ত লোকবিষয়।

প্রবণতাটি ছবির মধ্যেই বোধ হয় স্ফুটতর।

বাঙলা পট থেকে শুরু করে ভারত ইতিহাসের ঘাটে ঘাটে স্তরে স্তরে থামতে থামতে শিল্পী পিছু চলেছেন, উত্তরাধিকারের খোঁজে। আবছা মুখটি পুরিয়ে তুলতে পাশের প্রাচ্য দূরের পাশ্চাত্য কারু-কলা— কেউ অস্বীকার্য নয়। কিন্তু সব মিলিয়ে ছবিরও পুরোভাগে সেই বিষয়। কিছু প্রকৃতি-প্রাণীচিত্র বাদ দিয়ে ইতিহাস-পুরাণ-উপকথার তা আশ্রিত, বা কাব্য-কথার ইলাসট্রেশন। যেমন পদাবলি-কবিকঙ্কণের ছবি, মেঘদূত-ঋতুসংহারের শ্লোক, ওমর খৈয়ামের রুবাই, এমন-কি গীতাঞ্জলির কবিতা। অশোকমহিষী, জেবুন্নিসার ছবি, সপার্ষদ চৈতন্যদেবের ছবি, মোগল রাজাদের ছবি। বুদ্ধের নির্বাণ, বুদ্ধ-প্রসঙ্গ সিরিজ। আবার বেতাল-পঁচিশী, আরব্য উপন্যাসের উপকথা— নূর-উদ্দীনের গল্প, সিন্দবাদ জাহাজীর গল্প। হিন্দু পুরাণ বা বাঙলার নিজস্ব লোকপুরাণ— কচ-দেবযানী শিব-পার্বতী গণেশজননী,বাঙলা যাত্রাপালার মহেশ নারদ মন্ত্রী। আরব্য মরুভূমির শেষযাত্রী উট, ওড়িশায় দেবদাসী নৃত্য, বাঙলা উপকথার বেগুন খেতে শেয়াল— পাশে পাশে। চোখে পড়বার মতো ছবির বিবিধ বিচিত্র বিষয়, আর সেই বিষয়ের মধ্যে ইতিহাস আর লোকায়তের সহজ চলাচলের পথ।

কিন্তু কোনো ছবিই নিছক বিষয় নয়। তার ভেতর শিল্পীর অভিপ্রায় জলছে স্বপ্নওয়াশ ধোয়া রূপকথার মতো। মূলত তা মিনিয়েচার সংস্করণে হাতে ধরে দেখার কবিস্বপ্ন।

লেখায়ও এই— এই ইতিহাস-লোকায়ত, দিশিবিদেশী উপকথার নিবিড়গ্রন্থী মুহূর্ত, হাঁফ ছেড়ে দাঁড়াবার লোকপুরাণ— সব-কিছুর উপরে রূপকথার এক আঁচড় রঙ। হয়তো ছবির ছোট-আয়তন প্রভাবেই ছেঁটে দেওয়া সেই লেখার বাড়, ভেতরে যা-ই হোক দৃশ্যত তা ছোটদের লেখা।

তা ছাড়া বুদ্ধ-প্রসঙ্গ কি উড়িষ্যা-রাজস্থান বাঙলার বাইরেরও কিছু নয়। উড়িষ্যার কথাতে একটু রূপকথার রঙ চড়িয়ে তাকে আমাদের 'অনেককালের বনগাঁ বাসী মাসির ঘর' বলে লিখেছিলেন। রাজপুতানার ইতিহাসের সঙ্গেও খুব আত্মীয়তা হয়েছে আমাদের উনিশ শতকে। 'রাজকাহিনী' রাজপুত ইতিহাস নিয়ে লেখা উনিশ শতকী কাব্য-নাট্য-উপন্যাসেরই উত্তরতরঙ্গ। কিন্তু প্রমথনাথ বিশী সুন্দর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, 'রাজকাহিনী'র জগতে প্রবেশ করা মাত্র রাজস্থানী ইতিহাসের পাত্রপাত্রীরা তাদের স্থান-কালের সংজ্ঞা বিসর্জন দিয়ে নিঃশেষে হয়ে উঠেছে রূপকথার পাত্র-পাত্রী। আবার 'নালক'ও সেই রূপকথা, বিষয় বাদ দিলে আগের লেখা 'শকুন্তলা'র মতনই আরেকখানি।

'রাজকাহিনী'র গল্প যেন মোগল-রাজপুত কলমের মিনিয়েচার শব্দআলেখ্য, যে মোগল-শিল্পীর অন্তরে

অন্তরে সেই পুরাতন ভারতীয় ভাবই বয়ে চলেছে বলে অবনীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। 'নালকে'র গল্পও বুদ্ধ প্রসঙ্গ ছবিরই আরেকটি, আর যে সময়ের গল্প, অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়, সেই 'বৌদ্ধযুগে আর্যরা যেন আর একবার পুনরাবৃত্তি করে চলেছে সবদিক দিয়ে সেই পুরাতনী উষার আলো-অন্ধকারে-ঘেরা অবস্থা।' আর রামায়ণ কাহিনী তো আমাদেরই বহুকালের পিতৃধন। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের হাত থেকেই বাঙালি ছোপ ধরা।

অবনীন্দ্রনাথের রামায়ণ তার চেয়েও আরো ঘরোয়া। কাব্য নয়, তা পুঁথি। 'চাঁইবুড়োর পুঁথি' 'পোড়া-লঙ্কার পুঁথি' 'হনুমানের পুঁথি' 'মারুতির পুঁথি' 'জয়রামের পুঁথি'। নয়তো পুরোদস্তুর পালা: যাত্রাপালা বাঁধা রামায়ণ, 'যাত্রাগানে রামায়ণ'। উঠোনমণ্ডপের যাত্রাকথকতার গাঁ-উজাড় আসরের সামগ্রী।

রামায়ণ লেখার ইতিহাস মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন। অনেকদিন ধরে রামায়ণের গল্পটি লিখতে চেষ্টা করছিলেন অবনীন্দ্রনাথ,

> লিখতেন কাটতেন আবার লিখতেন। আর আমাদের পড়ে পড়ে শোনাতেন। আমাদের বেশ লাগত। কিন্তু দাদামশার পছন্দ হত না কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে লেখা এই যাত্রাগুলো। শেষে একদিন বললেন— ধরেছি কোথায় গলদ হচ্ছে। পয়ারে লেখা রামায়ণ থেকে সোজাসুজি যাত্রা হবে না। ওকে আগে পুঁথির মত করে রামায়ণ লিখতে শুরু করে দিলেন দাদামশায়।··· তারপর এই সব পুঁথি সামনে রেখে রামায়ণ-যাত্রা লিখতে শুরু করলেন।

ফলে যাত্রা-পাঁচালী উভয়ত্রই রাম-আখ্যানের পাশে পাশে অলঙ্কার-পাড়ের মতো বসল চারধারের শ্রোতার উৎকর্ণ ইচ্ছা-আগ্রহ— তারা চিরকেলে শ্রোতাও বটে, এখনকার হালফ্যাশান মানুষও বটে, কাজেই প্রতি পদক্ষেপে পুরাণকে হতে হল এই মুহূর্তের সহনীয়-রোচনীয়। কৃত্তিবাসের শ্রীরামপাঁচালীই কি কবি স্বাক্ষরিত কাব্যটি শুধুমাত্র? তাও কাব্য ও শ্রোতার যোগে উৎপন্ন আরেকটি। সেই তৃতীয় বস্তুটির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষসজাগ অবনীন্দ্ররামায়ণ— কাব্যের কবিতা আর শ্রোতার রুচিসংস্কার মিলিয়ে লেখা— প্রয়োজনমতো দেশপ্রতিবেশের সোপকরণ সংমিশ্রিত, ক্ষণে ক্ষণে শ্রোতার মুখ-প্রতিক্রিয়ার দিকে চেয়ে রহস্যকৌতুক-উচ্চকিত।

কালোপযোগী নতুনেরই আগ্রহী অবনীন্দ্রনাথ, তবু তাঁর রামায়ণ না মেঘনাদবধকাব্য, না নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর শিশু রামায়ণ। হয়তো অতখানি কাব্য অতখানি সরলতাই তার মধ্যে হারিয়ে রইল।

অবনীন্দ্রনাথের পুঁথি শুরু হয়েছে: 'মা ঠাকরুনগণ, আজ আসর-বন্ধান গেয়ে যাই। ভাদ্দরমাসের তাল-পঞ্চমী থেকে রামপাঁচালী গান শুরু হবে।' আসরটিও বাঁধা থাক সবিস্তারে—

> ভাদ্রমাসের পঞ্চমীতে রামপাঁচালী গীত
> আসর বান্ধিবে যেরূপ শুন তার রীত।
> গজমুখী ঘর, ছাউনি হবে নাড়া,
> রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুহ্‌ণ চারি খম্বায় খাড়া।
> লব-কুশ দুই খুঁটি পুব পশ্চিম ভাগে,
> তন্মধ্যে খাড়া হয়ে রামপাঁচালী গাবে।

আসর সাজাবে নানা অস্ত্রেতে শস্ত্রেতে,
অথবা পূর্ণকুম্ভ রামকদলী সুরঙ্গ বস্ত্রেতে।
ছত্রিশ জাতের রাখ আসরে প্রবেশ,
রামপাঁচালী গাহিবার সর্বকাল সর্বদেশ।
ওড়া ভরি মৎস্য আর মিষ্ট পানি ফল,
সমৃণাল শতদল, নীল উৎপল।
নীল বস্ত্রে ঢাকি নৈবেদ্য ধরিবা সভার আগে,
তবে এই রামপাঁচালী শুনিলে ফল পাবে।

তার পর যথারীতি পরের দিন এই বলে আরম্ভ করলেন চাঁইবুড়ো—

'ছাগলে মুড়ায় নটে-শাক পাতা দাঁত ওঠার আগে
রাক্ষসে চিবায় কাঁচা মাথা গোঁফে লাগার আগে
—দেখতে ভয় লাগে!

দেবতাদের গোঁসাইনী যেমন রাশিবুড়ি, রাক্ষসদের গোঁসাইনী তেমনি বিরশী বুড়ি— নড়ি হাতে গুড়ি গুড়ি একদিন রাক্ষস-পাড়ায় উপস্থিত, দেখেন গোহাটায় নিকষার মায়ের মাশাস্ কসাই বুড়ি! যেমন দেখা অমনি ঘোঁট শুরু হওয়া —'বলি ও দিদি, কালে কালে হলো কি?'

— 'কেন নিন্দের কথাটা এতে কি আছে?'

— 'না নিন্দের কথা নয়, তবে কি না—

রূপকথা-প্রাপ্য রাক্ষসের ভয়-অলৌকিক, আর গ্রামস্ত্রী-পরিভাষা। এই পরিভাষা-বদ্ধ পুরুষেরাও— রাবণের মতো দেবতাজয়ী মহাবীর পুরুষেরও এই ভাষা। মুখপত্র কথকের ভূমিকাটিও বিশদ করে আঁকা:

রঘুবর রাম, বানরকটকমধ্যগত রাম, হনুমন্ত-সেবিত রাম।

ভাব লেগে চাঁইবুড়ো যেন মূর্ছিত হন এমনি ভাব দেখিয়ে আকাশে চক্ষু তুলে বললেন—'ঐ যে তিনি এসে গেছেন—

মারুতির পুঁথি পাঠ হইবে যে স্থানে
তাঁহার উদয় হইবে সে স্থানে।

সবাই আকাশের পানে চায়— মাথার পরে চাঁদোয়া অল্প দুলছে···

অথবা দরকার কী পুঁথির? পুঁথি নেই হাতের কাছে, কথা আরম্ভ হল বিনা পুঁথিতেই!

কাল বৈশাখী আগুন ঝরে
কাল বৈশাখী রোদ চচ্চড়ে!

—'বাপ্‌ কি তাত্‌।' বলছেন আর কালনেমী মামা সামা খুলে মাথায় হাত বুলোচ্ছেন।···

রাবণ বলছেন—'মামা, আর তো যায় না বসে বসে ঘামা।'

—'কি করতে চাও তবে বল বাবা।'

রাবণের পালঙের দুই পাশে সোনারুপার গাছপিছুম। সোনার গাছে হোমা পাখি, রুপার গাছে

গোমা পাখিকে জিভ দেখিয়ে বলছে—

পানি বিনা শ্বাসগত ব্যাকুলিত প্রাণ।

সোমাপাখি তাকে নোলা দেখিয়ে বলছে—

'সমুদ্রের তীরে গিয়ে করি জলপান।'

—'তাই ভাল, এখানে থেকে আর লাভ নেই।

অনাবৃষ্টি হেতুক বৃক্ষেতে নাই ফল
নদ-নদী-সরোবর তাহে নাই জল।

—'কি বলছে পাখি দুটো মামা?'...

—'বাবা আমি তো শকুনবিদ্যে শিখিনি।... একবার খনা গণৎকারকে ডেকে গণিয়ে দেখলে হয়।'

রাবণের আজ্ঞায় খনা এসে বাঁশের চোঙার মধ্যে দিয়ে আকাশে দৃষ্টি করে দিয়ে বল্লে—

'রোহিণীতে শনির দৃষ্টি
সে কারণে হয় না বৃষ্টি।'

কাজেই মহোদর সেনাপতির উপর আজ্ঞা হল শনিকে দমন করে আসবার জন্য। পাঁচ গণ্ডা কড়ি খনা গণৎকারকে দিয়ে ভালো করে গুনিয়ে নিয়ে মহোদর বেরোলেন শনি-দমনে। আবার, রাবণের 'মুকুট গেছে দশ-মাথার বানরের খপ্পরে পড়ে, এখন নরের হাতে পড়ে দশটা মাথা না যায়!' বলে মন্দোদরী চোখে আঁচল দিয়ে শাশুড়ীর ঘরে গিয়ে কাঁদতে থাকলেন। শাশুড়ী বৌকে বোঝান—

না কান্দ না কান্দ বৌ মন কর স্থির,
বেঁচে বর্তে থাক্ তোমার ইন্দ্রজিত বীর।

এইভাবে রামায়ণ পাঁচালীর মধ্যে দিব্যি বেঁচে বর্তে এসে বসেছে বসুধারা ব্রতের ছড়া, রূপকথার ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, দিশি প্রবাদ, খনা গণৎকার, বাঙলা সমাজের নিন্দা-কোঁদল, শাশুড়ি-বৌ— ভুঁয়ে ছড়ানো আস্ত লোকস্বদেশটি। রয়েছে বিহিত কুলীন পাত্রপাত্রী, তার চেয়েও সদাপে আছে যাত্রাপালার তুড়ি-জুড়ি, বভিনাথের ষাঁড়, তালচড়াই, কাকভুশুণ্ডী বিচিত্র পশুপক্ষী, তেজীভূত, মেটেভূত, জলসাভূত-আদি ভূত, আস্তি-মধ্যি-অস্তি, রাশি বুড়ি, নিদ্রাউলী ইত্যাদি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সব চরিত্র। এখানে বাল্মীকি আসরে প্রবেশ করে তাঁর স্বলিখিত সংস্কৃত পদ্যে কথা বলেন, পাশে দাঁড়িয়ে কুশীলব তা ভাষায় ব্যাখ্যা করে দেয়।

বাল্মীকি॥ অকর্দ্দমমিদং তীর্থ তমসান্ত নিশাময়
রমণীয় প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্য মনো যথা।

কুশীলব॥ কর্দমহীন নির্মল নীর নির্জন তমসার তীর
নির্মেঘ নীলাকাশে বয় বাতাস হেমন্তে শিশির
ঝির ঝির ঝির ঝির
পাখি হিমানীর পরশ হনা মেলায় ডানা
আলোছায়াটানা দেখা দেয় তমস্বিনীর উভয় তীর।

বিশ্বামিত্র কখনো বলেন কৃত্তিবাসী, কখনো দাশু রায়। অন্য চরিত্রেরাও কখনো কৃত্তিবাস আওড়ায়,

কখনো পালাগান, কখনো নিজেদেরই মতন ছড়া কাটে। কিষ্কিন্ধ্যা-সন্তানেরা পদ্য বেঁধে ওড়িয়া বলে। ফুলঝুরির মতন ফুল কাটতে থাকে পুরোনো কাব্য ছড়া-পদাবলি-লোকগীতির লাইন, যাত্রা-গান-দোহা-ভজন-কবীর-তুলসীদাস, ভাঙা-শ্যামাসঙ্গীত, ভারতচন্দ্রের রাজকীয় ছত্র, আবার তার পাশেই দেহাতী গীতের ধুয়ো, তুড়িজুড়ির গীত বিচিত্র কোলাজে। ডয়সন দেখিয়েছেন, উপকথাকথককে একা একটা পুরো প্রমাণ নাট্যের সমগ্র সমবায় ফুটিয়ে তুলতে হয় ভাষা-ভঙ্গি-স্বর দিয়ে, সেটিকে লেখায় বদ্ধ করতে আরো যত দরকার সব অবনীন্দ্রনাথ— শুধু রামায়ণ পুঁথিতে নয়, সব জায়গায়— শ্লিষ্ট করে নিয়েছেন, বিচিত্র কিমিয়ায়।

সব মিলে আপাত চেহারাটি যেমনই হোক, এত আয়োজন কি কেবল ছোটদের মুখ চেয়ে! কেবল একছত্র কৌতুক উৎপাদনের জন্যও কি এত আয়োজন?

অথচ এই লঘু কথার বেশি আদ্যন্ত একটি লোককথাও তিনি 'ক্ষীরের পুতুলে'র পর ঐরকম গাঢ় চিত্তে আর লেখেন নি। 'বুড়ো আংলা'র অমন ঠাসবুনোট, আকৃতি-আঁকার অমন ঔপন্যাসিক কুশলতা; ওমর খৈয়াম-সিরিজের ছবি, প্রকৃতির দৃশ্যছবি, শাহজাহানের মৃত্যুশয্যার সেই বিধুর ছবি যে কবিকে আভাষিত করে, যাত্রাপালার মধ্যে যে অদ্ভুত অ্যাবসার্ড চলে ফিরে ওঠে, তার কোনোটিকেই তিনি বিকশিত করেন নি। অদ্ভুত ঐ খেয়াল, বিমিশ্রণ, রঙ্গরঙ— অত্যন্ত সম্বল যা আধুনিক নন্দনচর্চাকারীর— দাদা বা স্যুররিয়ালিস্টদের, একটু মোচড় দিলে তাঁরই কাছ থেকে মিলত তার অদ্ভুতব্যঙ্গ্যগর্ভ শিল্পায়ন— অদ্ভুত, কারণ এই প্রাচ্যভূখণ্ডের মনস্তাপ তির্যকাচারী ছবিকবিতায় তত ফোটে নি। তার বদলে তিনি যেন কেবল সেই পুরোনো সমাজের কৌম সমাজের পট-লিখিয়ে পুতুল-গড়া কারিগর। নিজেকে কেবলই ঠেলে নিয়ে গেছেন মমতামাত্রে ছাওয়া সাতপুরোনো স্বস্তি-স্বস্থতার ঘেরের মধ্যে। 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে একজায়গায় আছে: সারনাথে বেড়াতে গিয়ে একটি জায়গা 'দেখেই মনে হল এ আমার ঘর, এইখানে আমি থাকতুম, পুতুল গড়তুম, বেচতুম।... নেলিকে বললুম, 'ওরে দেখ্ দেখ্। এইখানে বসে আমি পুতুল গড়তুম'।' কথাশিল্পের ক্ষেত্রেও তাই, যেন পুরোপুরিই কুটুমকাটামের কারিগর।

ঐ পুতুলশৈলিতেই— যে ভাবে কৃষ্ণমঙ্গলের কিছু ছবি এঁকেছিলেন— যদি লিখতেন গদ্য-পদ্য-রোমাঞ্চ, আপামরপাঠ্য নব্য মানুষের উপকথা— কথাসরিৎ হাজার আফ্সানার ছাঁচে একটু বৃহৎবিশদ করে! কি ছবি কি লেখা কোথাও সরব যুগান্তকারিতা বোধ হয় তাঁর স্বভাবে ছিল না।

তবু এই পুতুলগুলিকেও সামান্য জ্ঞান করতে দ্বিধা হয়। পুতুলওয়ালারই ইচ্ছায়। পুতুল আর প্রতিমার মধ্যে ভেদ করেন নি অবনীন্দ্রনাথ, বিশ্বাস করতেন দুয়ের মধ্যে রয়েছে একই শিল্পসত্তার উৎসার। পুতুলওয়ালা বরং বিশ্বশিল্পের আরো ঘনিষ্ঠ, প্রতিমাকারের মতো শাস্ত্র মানতে হয় না তাকে, সহজাত স্বপ্ন-মাত্র সম্বল করে শিল্পীবিধাতার সাথী হয়ে গড়ছে সে খেলনা, শিল্পের ছোঁয়া লেগে সে খেলনাই কখন হয়ে উঠেছে অনির্বচনীয়। যত ছোট হোক তার লক্ষ্য, যত হেলাফেলা হোক ক্ষেত্র, গুরুতম শিল্পসৃষ্টিরও অন্যূন সে: 'ছেলে-খেলার পুতুল গড়ার কোনো শাস্ত্র নেই অথচ তার অনেক পুতুলই মেদিচীর ভিনাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে আর্টের কৌশল ও সৌন্দর্যের দিক থেকে'— বিশ্বাস করতেন অবনীন্দ্রনাথ; লিখেছেন, একটা পোড়ামাটির পুতুল— সেও ভাবের প্রতীক, যথার্থ রসের মধ্যে তার শিকড়। তার সঙ্গে প্রতিমার ভেদ এইটুকু যে প্রতিমায় শিকড় রয়েছে ধর্মের ভিতরে।

এ গেল শিল্পতত্ত্বের ভাষ্য। মাসির কাছে ঐ পুতুলেরই পরিচয় দিয়ে বলছে অবু, 'আমার পুতুল-সব সেই বত্রিশ সিংহাসনের পুত্তলিকাদেরও কথার আগেকার, তারও আগেকার কথা কয়, আবার আজকের কথাও কয়।'

অবনীন্দ্রনাথের গল্পকথা এই মাটির পুতুলেরই মতো সব এসে দাঁড়িয়ে অভিনয় করে বলে: 'আমি বাঘ বটে কিন্তু খেলাতে এসে যোগ দিতে পারব এমন বাঘ আমি। লঘুভার চমৎকার বাঘ যাকে দেখতে বাহার, খেলতে মজা যার সঙ্গে।' কিংবা 'পুরোনো খেলনা-পাতি'-ছবির জটেবুড়ির মতন ঝুড়ি-কুলো পেতে তার উপর আরশি-কাঁকই-ঝাঁপি-মালাগাছ-ছাগলছানাটি সাজিয়ে চুপ করে বাঘের চোখে চেয়ে থাকে।

তাঁর বড় আকারের পালা-গল্পের এই ধাঁচ। আবার এই ভাবেই তৈরি ছোট ছোট গল্প: রতা শেয়ালের গল্প, ভোম্বলদাসের গল্প, কানকাটা রাজার গল্প, শিবসদাগরের গল্প, রতনমালার গল্প, বনলতার গল্প, কনকলতার গল্প, চাঁদনির গল্প, আদরপুরের অনাদরপুরের কাহিনী: যেন বাঙলা মাটির উপকথা। শিবাই শিল্পীর গল্প, কালনেমী মামার গল্প, বাতাপী রাক্ষসের গল্প— উড়িষ্যার-রামায়ণের-ভারতপুরাণের। অথবা একটু মিলিয়েজুলিয়ে 'রামায়ণের তিনশো বত্রিশ পাতা ছেড়ে বার হল যেন দুটি গুটিপোকা'— বেরিয়ে দুই রাখাল বালক হেতিহোতি ভবের হাটে ঘোল খেতে চলল। আবার, যেন ইতিহাস ফুঁড়ে বেরোনো গল্প— সালেবেগের, মাতৃগুপ্তের কাহিনী। স্বকালটিও বর্জিত নয়, আছে 'পথে বিপথে'র স্বপ্নে-ভোবা আখ্যায়িকা— সাত স্বর্গ পর্যটক মহাপুরুষ যিনি বিষ্ণুর জপমালা ব্রহ্মার ঘেরগুসংহিতা শিবের সিদ্ধির পুঁটুলি ফেলে নীল গেরুয়া শাদা তিনটি কপোত ভরসা করে পৃথিবীতে ফের নেমে এলেন; স্বপ্নের জালে চোখ ঢাকা মূর্তিমান বসন্ত; অগাধ বিষয়ের মালিক বোগদাদ শহরের সবচেয়ে সুপুরুষ অধুনা জাহাজী খালাসী; শেমুষির বুকের হাড়ের বাঁশি; সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা; এমন-কি পরীর রাজ্য।

আছে বাদশাহী গল্প। যে বাদশাহী ঘোর ছিল মোগল ইতিহাসের ছবিতে, তারই ভগ্নাবশেষ?

তারও পরে আছে বাইরের ব্যাপার বৃত্তান্ত।

ছবির মতো আরব্য পরিবেশ। 'একে মরুভুঁই, তায় সুর্মা-কাজল রাত।... খিমার মধ্যে তিনটি কম্বলের বিছানা—

আবার নুন মরিচি হাওয়া বইল, গজল গনগনিয়ে উঠল গলা পর্যন্ত—

নুন মরিচ গলদা চিংড়ি
ঝোল কাবাবি দোলমা
কোর্মাবাগের মুর্গাদারি
পিকৃকাবাবি খোরমা
সুর্মা কাজল রাতে রাতে
গরমাগরম টুকরা
গুলমুর্গার খুনখারাবি
বখরেদ্দারি বখরা।

যেন গল্প শুনতে বসেছেন ক্যামবেল সাহেব, বেদুইনের তাঁবুর বাইরে বসে। ঠাণ্ডা কালো মরুভূমির

রাত, মাংস সেঁকার গন্ধ আসছে। গল্প বলছে হামুদ মহম্মদ-হাসান কিম্বা আবেদ : মকদাদের গল্প, ফেতলা জাতির কোনো গল্প, কি হারুন-অর্-রশিদের কালেরই কাহিনী। কিন্তু সে সব কিছুই নয়। তার বদলে এখানে 'খাতাঞ্চিমশায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন— 'শোনো, হোম্বাম জাদুগিরের পাল্লায় পড়েছিলাম'।'

অমন সম্ভ্রান্ত যে আলিফ লায়লা— তারও হাল হয়েছে এই : তুর্কিস্তানকে পাশা হারুন-অল-রসিদ নবাব খাঞ্জা খাঁ খাঁজাহান-ই-জাহান্দার শা বাদশা বোগদাদি হয়েছেন হারুন্দে, কাফ্রি চাকর মস্রুর হয়েছে কালো কিচকিন্দে উড়ে বেহারা, সিন্দবাদ জাহাজীর বাণিজ্যপোত ছুটে গেছে হিন্দুস্থানের কাফেরদের মন্দিরের মাথায় জাঁতার মতো চুম্বক পাথরের টানে। কোনার্ক-কিংবদন্তী আর আরব্য উপন্যাস মিশেছে এক গায়। হারুনের ম্যাজিক সতরঞ্চি উড়ে এসেছে একেবারে গঙ্গা-পার হাবড়ার পুল কলকেত্তা। তাই দিয়েই আবার তৈরি হল পুতুর এক-দণ্ড জিরোবার ভাসন্ত মেঘখানা।

সিন্দবাদ বাণিজ্য করতে যায় বছর বছর সাতসমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে, নিয়ে ফেরে জাহাজভরা হীরেজহরত, আর তার চেয়েও দামি সব গল্প : 'রক পাখির গল্প, মহীরাজের ঘোড়ার কথা, লোমশ মানুষের ইতিহাস, অজগর সাপের কাহিনী, বিষলতার, গোলমরিচের ক্ষেতের, আরবি পাশার, জিন-লাগামহীন ঘোড়সোয়ারের, কবরী কন্যার, ভীষণ বুড়োর, মুক্তোর ক্ষেতের,৫ বাম্বেটে জাহাজের, হাতী শিকারের নানা অদ্ভুত অদ্ভুত খোস গল্প'। আরব্য-উপন্যাস সিরিজেও তো যত্ন করে এঁকেছিলেন কত গল্প। কিন্তু লেখবার সময়ে খুব বেশি হল তো লেখা হল ইসলামি বাঙলার কয়েকছত্র পয়ার,

> মেরা নাম ছন্দবাদ শুনহ কাপ্তান।
> আমি সেইজন বটি দেখ মেহেরবান॥
> আপনি জানিলে যারে মরিল দরিয়ায়
> ভালামতে আছি এই দেখহ আমায়॥…
> মালামৎ না করিব তোমার খাতেরে।
> রহম হইল মুঝে দেখিয়া তোমারে।
> বোঝা মেরা ধরা আছে জাহাজ উপরে।
> চলহ খালাসীগণ লইয়া এহারে॥
> তোমার বোঝায় কেহ না ডালিবে হাত।
> সেতাবি করিয়া তুমি চল মেরা সাত॥

উনিশ শতকী ইসলামি কিস্‌সার ধারায় পাশে পাশে এক-আধ টুকরো উর্দু গজলের লাইনও, বড় জোর।

যে তিনখানি পুরো বই তাঁর অনুবাদ-কর্ম বলে পরিচিত, তাও বা কতটুকু বিদেশী-নির্ভর? 'বুড়ো আংলা' সুইডিশ লেখিকা সেলমা লাগেরলফের কাহিনীর প্রেরণায় লেখা, 'খাতাঞ্চির খাতা' ইংরেজি 'পিটার প্যানে'র গল্প অবলম্বন করে, 'আলোর ফুলকি' এদমঁ রস্তার ভাবানুবাদ। কিন্তু এ যদি অনুবাদ হয়, শেক্‌সপীয়রী নাটকও তবে তর্জমা। তাঁর অধিকাংশ ছবিই তো ইলাসট্রেশন, কিন্তু সেও যেমন তাঁরই স্ব-ভাবের রূপ— সালংকারা বিকাশ, তাঁর লেখার পরকীয় সূত্রও তার বেশি নয়। আর সে ক্ষেত্রেও আক্ষরিক অনুবাদের চেয়ে লক্ষ্য তাঁর অন্তদিকে— ব্যাপকরণের, মিশ্রণের।

যেমন, ধরা যাক 'বুড়ো আংলা'। গল্প-সূত্র এইটুকুনি: আমতলি গাঁয়ের হিরিদয় গণেশের শাপে বুড়ো আঙুলের মতো ভয়ানক ছোট হয়ে বুড়ো আংলা যক হয়ে পড়ল। শাপমুক্তির জন্য গণেশের কাছে দরবার করতে বেরিয়ে পড়ল সে কৈলাস পর্বত, হাঁসেদের দলে ভিড়ে তাদের পোষা হাঁসটির পিঠে চেপে সে উড়ে চলল মানস সরোবর।

রিদয় একই সঙ্গে বুড়ো আংলা আর যক, ইস্থন বোশি, টম থাম,ত্রিং টিং ফট্ -মন্ত্র পড়ে পাতালপুরীতে বসিয়ে আসা নিডর দুষ্টু ছেলে। রাজ্যিজয়ী 'দেড় আঙুলে' রিকি-তারো। রিদয়ের বাহন তাদের পোষা খোঁড়া হাঁসটি: সুবচনী ব্রতের হাঁস যার উড়াল-চিত্র আছে 'বাংলার ব্রতে'র আলপনায়, আবার সে হান্স অ্যাণ্ডারসেনের কুচ্ছিত ডাকলিং। চাঁদপুরী খেঁকশিয়াল: রতা শেয়ালের পুত্র ও মহামান্য রেনার্ড। বহুকালের পুরোনো রাজবংশী পুরোনো দলপতি চোঁড়াকাক: কেলটিক কাহিনীর রাজা ল্যু বা লুগ। কাকচিরার কাকেদের পাওয়া গুপ্তধন: পাখির পাওয়া ধন উপকথার এক সর্বত্র-পরিচিত সূত্র, অনেক রকমের বৈচিত্র্য আছে এর— ধরা যাক এটিও একটি। কঙ্ক, ভুশুণ্ডিকাক; ভারতপুরাণ-আগত। রিদয়-কথিত সৃষ্টি-তত্ত্ব: উৎস এদেশী লোকপুরাণ। সর্বোপরি হংপাল হিরিদয়ের চিত্রটি: এর চেয়ে পুরোনো এর চেয়ে বিশ্বজনীন শিল্পের বা ধর্মের মোটিফ অল্পই আছে।

এ ছাড়াও এতে আছে পাখিসমাজের অন্তরঙ্গ বিবরণ, উত্তরবাঙলা-আসাম থেকে তিব্বতমুখো হাওয়াই পথের বাস্তব বর্ণনা। আরো আছে দুটি গণেশচিত্র

১ এই বুড়ো-আঙুল যতটুকু, গণেশটি ঠিক ততটুকু! পেটটি বিলিতি-বেগুনের মতো রাঙা চিকচিকে, মাথাটি শাদা, শুঁড়টি ছোট একটি কেঁচোর মতো পেটের উপর গুটিয়ে রয়েছে; কান দুটি যেন ছোট দুখানি কুলো, তাতে সোনার মাকড়ি দুলছে; গলায় একগাছি রুপোর তারের পৈতে ঝোলানো; পরণে লাল-পেড়ে পাঁচ আঙুল একটি হলদে ধুতি, গলায় তার চেয়ে ছোট একখানি কোঁচানো চাদর; মোটাসোটা এতটুকু দুটি পায়ে আংটির মতো ছোট ছোট ঘুঙুর, গোলগাল চারটি হাতে বালা, বাজু, তাড়; গলা থেকে লাল সুতোয় বাঁধা ছিটমোড়া ছোট্ট ঢোলকটি ঝুলছে।
২ পেঁচা…রিদয়কে নিয়ে আর একটা হাতিশুঁড়ো গজদন্তের খিলানের মধ্যে দিয়ে গণপতি গণেশের বৈঠকখানায় এনে হাজির করে দিলে। রিদয় দেখলে ঘরের উত্তর গায়ে মস্ত একটা তক্তাপোশে গের্দা হেলান দিয়ে থানধুতি পরে মেরজাই পরে এক ভদ্রলোক বসে আছেন, তাঁর গজদাঁতও নেই শুঁড়ও নেই, মোটা পেটও নয়, দিব্যি দেবতার মতো চেহারা।

পেঁচা রিদয়ের কানে-কানে বললে— 'ইনিই রাজা গণেশ…'।

আর্চার লক্ষ্য করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের আঁকা হিন্দু দেবতাদের চিত্রগুলি সু-উপস্থাপিত নয়, তাতে তাঁর গাঢ় বিশ্বাসের অভাব ফুটে আছে। কোন্ বিশ্বাসের অভাব? ধর্ম নয়, শিল্পোৎস থেকে তিনি যে দেব-আইকনের স্বরূপ সন্ধান করেছিলেন, প্রতিমালক্ষণের রূপকভঙ্গ করাতে চেয়েছিলেন স্ববিহিত উপায়ে, সেটুকু মনে না রাখলে ভুল বুঝতে হয়।

কিন্তু থাক্ সে কথা। সব মিলিয়ে 'বুড়ো আংলা'র মধ্যে লাগেরলফের ছায়া যদি কিছু থাকে তা খুঁজে পাওয়া কঠিন। অচ্যুতভাবে এটি তাঁর 'আংলা বিজয় কাব্য', রায়গুণাকরেরও পরেকার নতুন মঙ্গল

খোঁড়া হাঁসেরে লইয়া খোঁড়া হাসেরে লইয়া
রচিলাম মহাকাব্য যতন করিয়া।

নতুন আসরের কথা মনে রেখে 'মঙ্গল' নাম বদলে রীতিমতো মহাকাব্য। নতুন সময়ের কথা মনে রেখে গদ্যগল্পভাষী।

'খাতাঞ্চির খাতা'র পুতুও দেখতে ছোট, যদিও ঠিক বুড়ো আংলা সে নয়। ঐরকম অসহায় মানব-শিশুও সে নয়। সে উড়তে পারে, পাখিদের দলে পরীদের মধ্যে তার যাতায়াত। আরো তার আছে মায়া বাঁশিটি। সেই বাঁশিতে দেবতার মন গলে, গাভী দুগ্ধবতী হয়ে ওঠে। শুনলে পরে তার মাও অবাক হয়ে বলতেন, 'আহা, কি বাঁশিই বাজালি পুতু!'

কিন্তু তবুও পুতুকে পরীদের থেকে আলাদা রাখা হয়েছে। পরীর-মোটিফ একটু মিশলে রিদয়ও হতে পারত রবিন গুডফেলো আর রবিন হুডের সমাহার। 'কাকে-ধরা যক! কাকে-ধরা যক!'— বলে তাকে সর্বত্র জানান দিয়ে ফিরতে হত না। ঐ পরীত্বটুকু জুড়ে দিলে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসিও হতেন নিদ্রাপরী-তন্দ্রাপরী। কিন্তু পরীর জন্যে অতটা টান এ দেশে নেই।

কাজেই পুতু এসেছে 'পুতুল' থেকে শব্দ-ভেঙে। চেহারা তার 'খানিক-পাখি খানিক-মানুষ'— 'কতকটা কুঁকড়ো কতকটা মানুষ'। আমাদের পোড়ামাটির পুতুলের একটি বহুলপ্রাপ্ত রূপ এই পাখি-মানুষে মেশানো। মাথাটা হাঁস বা কুঁকড়োর, কুঁকড়োর ঝুঁটির মতনই বুঝি ঘোড়াচুল-বাঁধা, গা মানুষের। এ রকম পুতুলের নমুনা আমাদের ট্র্যাডিশনাল পুতুল-ছবির বইতে অনেক আছে। পুতু সেই পুতুল-রাজ্যেরই বুঝি রাজা, রাখাল রাজার মতো বাঁশি-বাজিয়ে। লালদিঘির শ্বেতদ্বীপে পরীরাজ্যে গিয়ে সে হাজিরও হয়েছিল— আধ ইঞ্চি পরচুন না হোক পরীরাজ ওবেরনের চেয়ে ছোট, শিশু-পরীর মতো। যদিও নন্দনকাননের শিবঠাকুরের সঙ্গে এই পরীরাজ্যের একটু ঘটকালি করা হয়েছে, তবু ঐ পরীরা-সব সত্যিকার শ্বেতদ্বীপেরই বাসিন্দা, ভারতীয়া অপ্সরা-কিন্নরীদের কুটুম্বিনী নন। লালদিঘির শ্বেতদ্বীপের ঐ পরীরা আর্থারী রোমান্সের সরসীবাসিনী সেই সব পরী, স্বপ্নের রানী করে শেলি যে পরীরানী ম্যাবকে এঁকেছিলেন, বুঝি তিনিই এখানকার পরীদের রানী।

সোনাতনের কুকুর বৌ বেড়াল বৌয়ের মধ্যেও পরী-বীজ একটু থাকতে পারে, কিন্তু সে নেহাতই কৌতুক করে বলা, আর অবিকশিত। তা বাদে ষষ্ঠীঠাকরুনের দেশে বেড়াল বৌয়ের পরিচয় অদরকারী। কুকুর বৌটিও তবে সাঁওতালি-লেপচা উপকথার সেই কুকুর বৌ— যারা অলক্ষিতে কুকুর-ছাল খুলে রেখে সুন্দরী মেয়েটি হয়ে ঘরকন্না গুছিয়ে রাখে, শরৎচন্দ্র মিত্রের সংকলনে যাদের অনেক কথা আছে। ছালের ছদ্মে লুকোনো রূপসী অলৌকিকার রূপকথা অবশ্য সব জায়গার, কিন্তু কুকুরছালটি যেন এইখানেরই। বোহিম-কে গল্পের অনেকটা জায়গাও দেওয়া হয়েছে।

পরীর সাথে পর, পরীর পরে, ভূত। 'খাতাঞ্চির খাতা'র জোনাকপরীর সঙ্গেই যে দুই সখী— একটি তার আলেয়া, কিন্তু সে ভূতের চেয়েও পরী। 'ভূতপত্‌রীর দেশ' আর 'ভূতপত্‌রীর যাত্রা'য় আছে ভূত— ঘোড়া ভূত, বেহারা ভূত, আলপটকা ভূত, দিশিবিলিতি ভূত, মনসাতলার লণ্ঠন-ভূত, আছে ভূতপত্‌রীর মাঠ, মাঠের মাঝে শ্যাওড়াগাছের ঝোপ, অন্ধকারে গোঁফফুলোনো কালো বেড়াল, চার ভূতের চার সুরের লম্বা গীত: ভূতপেরেতে চলছে রেতে হনহনিয়ে ভূতপেরেতে। কিন্তু 'ভূতপত্‌রীর দেশে'র

'প্রকাণ্ড কাঁচের গোলার' মতো যে চাঁদটি সে চাঁদামামাও বটে শশাঙ্কও বটে, আবার 'গিয়োকুতো'ও বটে— চরকাকাটা বুড়ির ক্যাঁ-কোঁ চরকা-ঘুরোনো যে খরগোশ, এদেশী শশ সে যতখানি, ততটাই জাপানী উসাগি।

পরীর মতো বিষয় আরো কিছু আছে। তার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য 'ভূত-পত্‌রীর দেশে'র জলজ অপ্রাকৃত কয়েকটি প্রাণী : কালা-কানা-আংলা টানা, গামলা-চালা ফোঁপরা-জালা, ঘণ্টাকর্ণ রক্তশোষা মাথায় ছাতা, শাঁখচূর্ণি মুক্তোকলাই, শুঁড়-ঢুলঢুল কাঁচমাচু, কলকবজা দড়া বাঁধা, রাঘববোয়াল পায়রা চাঁদা। নামগুলিতে মনে হয় শুধুই ছড়া মেলাবার জন্যে এদের সৃষ্টি। মোহনলাল জানিয়েছেন, এদের মধ্যে রচয়িতার প্রকৃতিবিজ্ঞান-পাঠের ছাপ আছে। সামনে থেকে এদের আচরণ প্রত্যক্ষ করলে মনে হয় তার চেয়ে বেশি : 'দেখি একরাশ চিনেমাটির মার্বেল জলের ভেতর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। কাছে আসতে দেখি— সেগুলি এক-একটি গোল খাঁচা আর ভেতরে একটি করে খুদে আংলা বসে আছে।' অথবা 'ঘণ্টার গায়ে ছোট-ছোট গোল-গোল কত যে চোখ জ্বলছে তার ঠিক নেই— কোনোটা লাল, কোনোটা হলদে! গোলাপি সবুজ শাদা বেগুনি— কত রঙের চোখ! ঘণ্টাগুলোর দু দিক দিয়ে দুটো করে লম্বা শুঁড়ের মতো কান ঝুলছে!' এ নিছক পুরাণের কল্পনাকে বাঁকিয়ে লীয়ারের আঁকা 'ননসেন্স' নয়। এই বর্ণনার মধ্যে আগেকার দিনের মীথিকাল অপ্রাকৃত প্রাণীদের অ-তিরস্কৃত ছায়া আছে— হয়তো জলজ অপ্রাকৃতের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ কেলটিক উপকথারও একটু দূরসূত্র।

'ভূতপত্‌রীর দেশে' অন্য আরো প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু 'ভূতপত্‌রী' মূলে ভূতের গল্প। এই ভূতেরও কেউ বানানো ভূত নয়। তারা কেউ ওড়িয়াগ্রামের জীয়ন্ত 'দেউতা', কেউ বা মাসির ইচ্ছেসুখে ছুটি দেওয়া সেবাসুখী আপ্তজন। হয়তো বা লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় পাওয়া, *memorat*। জীবিতজগতের মধ্যে তাদের যাতায়াত বিস্মিত নয়। আবার তার মধ্যে মনসাবুড়োর মুখে সৃষ্টিতত্ত্ব আছে, একটু আরব্য উপকথা আছে, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের হিন্দু পুরাণ আছে, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কাহিনী আছে। সবই ভূতভূর্ব ব্যাপার। কেবল ভৌতিক ভয়াবহতাটুকুই তাদের মধ্যে বিরল।

সেই ভয়-রহস্য বরং কিছুটা আছে 'আলোর ফুলকি'তে। নিষুতি অন্ধকারে আগুনের মতো তিনজোড়া চোখ খুলে কুঁকড়োর সর্বনাশের ঘোঁট পাকাচ্ছে যে পেঁচারা, তারা যেন 'ম্যাকবেথে'র ডাইনিদের সংস্কার থেকে সোজা তুলে আনছে 'howlet's wing'। আবার

> নিশাচর নিশাচরী রক্তপাত করি, আচম্বিতে নিঝুম রাতে, দুপুর রাতে ; নষ্টচন্দ্র, ভ্রষ্ট তারা, ভিতর-বার অন্ধকার-রাত সারা রাত। নিঝুম দুপুর, নিখুঁত দুপুর, অফুর রাত।

—হুতুমের এই ছন্দ-বাঁধা গম্ভীর আঁধার-স্তুতি যেন তান্ত্রিক অভিচারমন্ত্র।

গেল ভূত-প্রেত-পরী-পিশাচ-অপ্রাকৃত। রাসধারীর সঙ্গে শিবসদাগরের সঙ্গে এসেছে যে চর্ভটি নাটকের কুলীন ভালুক, সে আসে নি বনের থেকে, এসেছে আসলে পাশ্চাত্যের ভাষানিরুক্তি ভেঙে। ভালুক-নামধেয় অভিজাত বংশের তরুণ পর্যটকেরা রাসধারী শিক্ষকের সাথে বেরোত গ্র্যাণ্ড ট্যুরে, সত্যিকার সব 'সবুর বাদশার উজিরপুত্তুর'। বিশেষ করে আঠারো শতকে— প্রথাটি ছিল জোরদার। আর ঐ চর্ভট্টি নাটক : অবনীন্দ্রনাথের সব লেখাই তো এক দিক দিয়ে তা-ই— কৌতুকনাট্য, হাসিতামাশার পালা। একে তিন তিনে এক। অবনীবাবু, রাধু, খাতাঞ্চিমশায়, বোহিম কুকুর, সোনাতন, হারুন-অল-

রসিদ, কথামালার বাঘ, উড়ে যাত্রা, হারমনি-বাজা বাজানো স্বদেশী গান, গোলবাগ জহরুত পাথরে বাঁধা রাস্তা, ফুল চানকা ফোহারা, তার মধ্যে তেলেছমাতের বাগান পাহাড় পর্বত কেল্লা, কালপরী নিদ্রাপরী, গজস্কন্ধে মাহুত, হিড়িম্বা, শূর্পণখা, পূতনা রাক্ষুসী, কত নাম করব— সব সেখানে একত্রে মিলে মিশে রয়েছে। আবার পাশেই আছে: ছিরিপদ ছিরিকণ্ঠ, ছিরি অভিলাষ। টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটিলেস্টার, হাব্বাই ভাণ্ডার হাণ্ডিউয়ার! এল স্বদেশী রেল কোম্পানির গাড়ি— গাবগুবাগুব, গাবুরগুবুর, গব্ গব্ গব্, আমতা, জামতা, ঘুঘু-মেতি স্যঃ। আবার এই সবের মধ্যেই গুন্‌গুন্ করে বেজে উঠল একছত্র দেহতত্ত্বের গান। গল্প বলতে বলতে চাঁইদাদা নিজেই স্বীকার করছেন তাঁর কল্পনার হিস্টিরিয়া হয়েছে— যা তা আবোল তাবোল বকছে সারারাত। শুধুই আবোল তাবোল, হিস্টিরিয়ার সুপ্রণীত শিল্পরূপ নয়। তবু সেই আবোল তাবোলেরই পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে বোষ্টমী মাসি খঞ্জনি বাজিয়ে ধরেছেন দু-ছত্র গীত

নিপট নিরদয় তোমায় দয়াময় বলাও বল কোন গুণে
হয়ে রাজকন্যে বনবাসী দাসী হয় রাজমহিষী,
সকলই তোমার কৃপায়

হঠাৎ-লাবণ্যের মতো। এই এক কণা লাবণ্যই আছে কোথাও লুকিয়ে, কিন্তু তাও টের পেতে চাই মোলায়েম মুনশীর পুঁথিপড়ুয়াকে, যেমন

'কুমার কুসন্ত কাচ বিশেষ প্রকাশ।
কান্দন শুকাত্রিক কিবা ভুবন প্রকাশ॥
মঙ্গল পঞ্চসিমউচ্ছ হয় মহাসুখ।
মুঞি অতি ভাগ্যহীন, মরমে মোর দুখ॥'

মানে না বুঝেই কান্না পায়—

মোটামুটি এই হল লেখার চেহারা। সেখানে নজ্জুমের গণনা করা তুফান এড়াবার নৌকো বানাতে জঙ্গলে কর্পূর গাছ কাটতে চলে যায় টুকরি বুড়ির ছেলে; দিন কাটে, রাত কাটে, ফুলের স্বপ্ন দেখে গাছ আর গাছের ছাওয়া দুজনে মিলে। আবার সেখানে 'তারেৎ ব্রহ্মঃ সনাতনঃ'— আওড়াতে আওড়াতে খাতাঞ্চিমশায় তালামুদের পাতা ওল্টান, নহুষের পালায় এসে পাট করে যায় আরব্য উপন্যাসের মাহিগীর, ঈশপের ছাগলের মুখে শোনা যায় শুভঙ্করের আর্যা।

এই হল অবনীন্দ্রনাথের উপকথার জগৎ: মিশোল উড়ুটি, কথামালার হট্টমালার দেশ। চিন্তিত শিল্পীর খেয়ালী মগজের লেখাই কি সেই কথামালা? যা কিছু এখানে আছে সব ছেয়ে আছে কেবল কল্পনা-জানা প্রাকৃত মানুষের দৃষ্টি। তারা একটা কাঠকেই করলে ঘোড়া, সওয়ার হয়ে চলল টগ্‌বগ্।

সাদা কাগজে লিখলেম, আরব কি বোগদাদ; বাদশা কি বেগম, অমনি তো তারা চোখের সামনে এল…

আসলে তখন এল বাদশা-বেগম দেখা অবাক দুটো চোখ। এই সাধারণ মানুষজন তাদের গ্রাম্য আচারইচ্ছেসংস্কার – সব-সুদ্ধু সংকুলান হয়ে আছে এই লেখায়। সংস্কার, বা জাদু-কুসংস্কার: নিদ্রাউলী মায়া পেতে গেছে পাড়ায় পাড়ায়, শকুনবিদ্যের পরিচয় পাওয়া গেল খাতাঞ্চিমশায়ের নতুন চাকরটির কাছ থেকে, পাখিতেও জানে ধুলোপড়া বেড়ি দিয়ে পেঁচোর মুখবন্ধন করে দিতে। আছে

ভূত-পরীর মাহাত্ম্য। আবার আলংকারিকভাবে এই-সব লেখা যাত্রাপালা বা ব্রতকথা, মজার কথা, ব্রতকথা, ভূতের গল্প, ছন্দান্বিত ফাবলিয়ো, এনিম্যাল টেল। দিশিবিদেশী ঝাঁপির রঙবেরঙ আঁশ তুলে বানানো আরেকখানা আনকোরা ঝাঁপি।

কোথাও নেই টানা-পুনর্কথনের দায়, কেননা উপকথা ছাপা বইয়ের কপি নয়, এক পাঠের সঙ্গে আরটির যান্ত্রিক মিল রাখার তার দায় নেই। শুধু কথার যে ভাঁড়ার ছিল কথকদের কাছে, পুরস্ত্রীর মহলে, তাঁদের বলার ভঙ্গিটি শুধু টুকে নেয়া— সবিস্তারে, কিছু তাতে জুড়ে দেওয়া প্রয়োজনমতো— এইটুকু। এর মধ্যে সাহিত্যও আছে ততটুকুই, লোককথায় সাহিত্যের যতটুকু পরিসর।

অর্থাৎ, না গ্রিমের দায়িত্ব, না অ্যাণ্ডারসেনের নিটোল স্বলেখা, না অস্কার ওয়াইল্ডের ভাবার্দ্র সাহিত্যিকতা— কিছু তেমন নেই। ল্যুয়িস ক্যারলের আজব দেশ বানাবারও বাসনা নেই, অথবা সি. এস. ল্যুয়িসের তন্নিষ্ঠ পুরাণজগৎ। অবনীন্দ্রনাথ লোককথার সংগ্রাহকও নন, শিশু-সাহিত্যিকও নন।

লিপিবদ্ধ কথকতা, এক-চরিত্র পালার সাতরঙিন অনুষ্ঠান। তাঁর লেখা আরেকরকম লেখা, শুধু পরম্পরার সাক্ষী। আর সেই কারণেই তা লেখা-হিসেবে ভালো কি মন্দ, কথা হিসেবে বিশ্বাসী না অবিশ্বাসী তা অপ্রাসঙ্গিক। তবু তা নিয়ে যদি কেউ উপকথা-টাইপের সাথে মিলিয়ে শ্রেণীবিভাগের মার্কা দেগে দেন, স্টিদ টমসন বা ব্যাসকমের চাইতেও শ্রেণীবহুল টাইপোলজির বিন্যাস যদি কেউ করেন তা নিয়ে, তাতেও জাতিনাশের অপরাধ ঘটবে না মনে হয়। ঈশপের সঙ্গে লা ফঁতেনের যত দূর, তাঁর সঙ্গে লোকবৃত্তের তত অন্তর যে নেই তার কারণ সাহিত্যকারুর বিরলতা নয়, তার কারণ তিনি স্বয়ং সেই লোকজগতের— পটকর্তা, পুঁথিকর্তা। বহু পুরোনো পট, তবু নতুন। কালদষ্ট পুঁথি তবু সদ্য, মৌলিক— যেমন নিত্য নব হয়ে ওঠে সততসজীব লোকশিল্প। তা দিয়ে তিনি গুরু কবিতা বানাতে গিয়েও হটে এসেছেন শুধু সম্ভাবনামাত্র চিহ্নিত করে— কল্লোলের একটি কবিতা বা মাসির একটি কবিতা নয়, সব জায়গায়। ছবি-বানানো পাণ্ডুলিপিতে, গদ্যপদ্যবদ্ধ রঙিন শৈলিতে গাঢ় মুখ উঁকি দেওয়ার আগেই লঘু উপল বাজিয়ে তুলে কথার মোড় ফিরিয়ে হঠাৎ নেমে পড়েছেন বয়োভারহীন শিশুর খেয়াল খেলায়। আসলে তাঁর পথ নয় মার্গশিল্পের পথ, শিল্পের সমস্ত সন্ধানটিই তাঁর যেমনতেমন-একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে রূপকথার যাত্রা— 'মাটির ঢেলা, পাথরের টুকরো সিঁদুর কাজল'— যা কিছু হাতে নিলেন তাঁর কাছে তা-ই হয়ে উঠল অসীম রস আর রহস্যের আধার! আমাদের কাছে যেন তা পাথরের টুকরো মাটির ঢেলার বেশি মনে না হয়।

পক্ষী-পুরাণ

মানুষের শিল্প ও তার মনের পাখির গতিবিধির চিহ্ন রেখে গেল কালে কালে।— বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী।

পাখির চেয়ে পুরোনো, পাখির চেয়ে জীবন্ত রূপকথা আর কী আছে? একই সঙ্গে রূপকথা, আর ভূয়োদর্শন? অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, ভূমাপিপাসু বেদের কবিরা তাঁদের আত্মা-পরমাত্মা উপলব্ধির পাখির রূপকটি পেয়েছিলেন আদিমবাসীদের স্বপ্ন থেকে। তাঁদের 'দ্বা সুপর্ণা'র অভিব্যক্তি ফুটিয়ে দিয়েছিল রূপকথার ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, শুক-সারী।

একই সঙ্গে পৃথিবীর আর নভোনীলিমার ঐ পাখি আদিমানুষের ধর্মে-বিশ্বাসে-জীবনচর্যায় অঙ্গীভূত হয়ে

ছিল। তার মাথার মুকুটে তীরের পুচ্ছে পাখির পালক, পাখির মূর্তি তার দেবতাবিগ্রহ— প্রভু হোরাস, হংসারূঢ় সৃষ্টিকর্তা, কিংবা অমিততেজ গরুড়বাহন ; নিজেতে-পাখিতে মিলিয়ে শুরু হয়েছিল তার শিশ্লেষা। লাসকো-র গিরিগাত্রে প্রত্নপ্রস্তরযুগে আঁকা পাখিমানুষের ছবির থেকে আজকের রথের মেলায় বিকোতে আসা বাঙলা-গাঁয়ের পোড়ামাটির পাখিমানুষের পুতুলটি অবধি তার অচ্ছেদ বিস্তার। আমাদের শিল্পকবিতার সবচেয়ে সনাতন আবহমান বিভাব এই পাখি: বাল্মীকির ক্রৌঞ্চ থেকে রবীন্দ্রনাথের বলাকা— তারও অনন্ত পর অবধি তার বিস্তার।

'এই পক্ষীরূপকই রচনা করেছে গুরুদেবকে; এই পাখিদেরই আবার রচনা করছেন গুরুদেব'— অবনীন্দ্রনাথের শিল্পশিষ্য প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন। পাখির এক সেট ছবি এঁকেছিলেন, 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে বলেছেন তার মধ্যে ছিল তাঁর সর্বসাধ্য কলাশক্তি। পাখির ভাষা বোঝা শকুনবিদ্যের ওপর কথাউপকথার নানান জায়গায় তাঁর ঝোঁক। তাঁর বড় তিনটি বইও মূলত পাখির পুরাণ। একটিতে পাখির পিছু ধাওয়া খোঁড়া স্বপ্ন,

> "চড়ুই মুনিয়া পাবড়ুয়া টুনটুনি বুলবুল ফুলঝুটি ভিংরাজ রঙে-রঙে সবুজে-লালে সোনালীতে-রুপোলীতে আকাশ রাঙিয়ে চলেছে যে যার দেশে বাতাসে ডানা ছড়িয়ে। রিদয় কেবলি বসে-বসে দেখতে লাগল আর মনে-মনে বলতে লাগল—'যদি ডানা পেতুম !'

একটিতে পাখিমানুষের সেই আদিম মোটিফ— পুতু, সবসময় স্খলন-আশঙ্কাতুর :

> পাখিগুলোও ·· আমাকে দেখে সরে যাচ্ছে, তবে তো আমি এখনো মানুষ আছি! ভেবে আমার কান্না এল।

আর একটি সরাসরি পাখিরই জবানি। 'আলোর ফুলকি'।

আরো কাছে যাওয়া যায়? সশরীরে? বিভাব-রূপক ভেঙে? পুতু যেতে চেয়েছিল। পাখি হতে না পারার দুঃখে 'ক্রমে পাখিবিদ্যেতে পাখিদের চেয়েও পণ্ডিত' হল সে। ওড়া-পাখির বাতাসনির্ভার মন হল না তাই অবনীন্দ্রনাথও হয়ে উঠেছিলেন পাখিবিদ্যেতে পাখির চেয়ে পাকা, তাঁর কন্যা জানিয়েছেন: 'ঠিক যেমন করে মা আমাদের কচিবেলায় মানুষ করতেন, তেমনি আদরে, বকে-ঝকে, গান শুনিয়ে' পাখি মানুষ করতেন। আবার তাঁর শিষ্য প্রবোধেন্দুনাথ বলেছেন—'ঐ আকাশচারী পাখির দলই গুরুদেবের ছিল সত্যিকার সখা। ওরাই তাঁর কাছে বহন করে নিয়ে আসত,— রূপময় বর্ণময় গন্ধর্বলোক থেকে, তার চিত্রকানন থেকে,— এক পৃথিবী-ভোলানো সঙ্গীত, যে সঙ্গীতটির অগ্নি-মাধুরী কানের মধ্যে প্রবেশ না করলে কোনো মরণশীল মানুষই রূপ দেখবার অধিকারী হয় না।'

সুন্দরের নন্দনশাস্ত্রীয় পরিচয় লেখার বেলাতেও গোড়াতেই তাঁর হাতে উঠে এসেছে এই পাখির রূপ, রূপপর্যায় :

> মেঘের সঙ্গে ময়ূরের মিত্রতা, তাই কোনো একদিন নিজের গলা থেকে গন্ধর্ব নগরের বিচিত্র রঙের তারাফুলে-গাঁথা রঙিন মালা ময়ূরের গলায় পরিয়ে দিয়ে মেঘ তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলে। মানুষ প্রথম ভাবলে, এমন সুন্দর সাজ কারো নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সে দেখলে বকের পাঁতি পদ্মফুলের মালার ছলে সুন্দর হয়ে মেঘের বুক থেকে মাটির বুকে নেমে এলো, মানুষ বললে, ময়ূর ও বক এরা দুইটিই সুন্দর। আবার একদিন এলো জলের ধারে সারস পাখি— মেঘ যাকে নিজের

গায়ের রঙে সাজিয়ে পাঠালে। এমনি একের পর এক সুন্দর দেখতে দেখতে মানুষ বর্ষাকাল কাটালে, তারপর শরতে দেখা দিলে আকাশে নীল পদ্মমালার দুটি পাপড়িতে সেজে নীলকণ্ঠ পাখি, এমনি ঋতুর পর ঋতুতে, সুন্দরের সন্দেশবহ আসতে লাগলো একটির পর একটি মানুষের কাছে— সব শেষে এলো রাতের কালো পাখি আকাশপটের আলো নিভিয়ে অন্ধকার দুখানি পাখনা মেলে— পৃথিবীর কোনো ফুল, আকাশের কোনো তারার সঙ্গে মানুষ তার তুলনা খুঁজে না পেয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

এই পাখির দল, প্রবোধেন্দুনাথ লিখেছেন, 'উপরকার আলো, আর নীচেরকার মৃত্তিকার মাঝখান দিয়ে ওরাই ছিল যেন তাঁর সম্বন্ধ-সূত্র।'

এই ভাবটুকুর খেই ধরেই অবনীন্দ্রনাথ ছোট্ট এক মূর্তি গড়েছেন— সামান্য এক কুঁকড়োর মূর্তি। কিন্তু সামান্য করে গড়েন নি, সে পাহাড়তলির সা মোরগ। মাটিতে তার পা, আর সূর্যের দিকে তার মুখ ফেরানো। আকাশ আর মাটি— এতখানি জুড়ে তার বাঁচার বিস্তার।

আরও আছে তার। আছে অলৌকিক শক্তি। আদিম জাদুকরের মতো অন্ধকার থেকে সকালকে সে উঠিয়ে আনে সোনালি মন্তরে, সে প্রতিদিনকার প্রভাতস্রষ্টিকারী। আধুনিক কলাকৈবল্যবাদী শিল্পী নয়, সবার জন্যে সবার আকিঞ্চন নিজের মধ্যে জমিয়ে তুলে তার জীবনপণ সাধনা। নিজের ঐন্দ্রজালী শক্তির কথা বলতে গিয়ে কুঁকড়ো বলছে তার সোনালিয়া পাখিটিকে: 'আমাকে সুর খুঁজে খুঁজে তো গান গাইতে হয় না, সুর আপনি ওঠে আমার মধ্যে, মাটি থেকে লতায় পাতায় রস যেমন করে উঠে আসে, গানও তেমনি করে আমার মধ্যে ছুটে আসে আপনি, জ ন্ম ভূ মি র বু কে র র স।' এই স্বতঃউচ্ছ্বসিত জাদুশিল্প আমাদের থেকে আজ অনেক দূর। আর, বিস্মরণ হয়ে গেছে বলেই সে কথা বিশদ করে বলেছে পাহাড়তলির শিল্পী সা মোরগ: আমি যেন একটি আশ্চর্য বাঁশি, যার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর কান্না আকাশের বুকে গিয়ে বাজছে।…

> ভোর বেলার সবাই কাঁদছে, দেখবে, আলো চেয়ে, গোলাপের কুঁড়ি সে অন্ধকারে কাঁদছে আর বলছে, আলো দিয়ে ফোটাও। ঐ যে খেতের মাঝে একটা কাস্তে চাষারা ভুলে এসেছে, সে ভিজে মাটিতে পড়ে মরচে ধরে মরবার ভয়ে চাচ্ছে আলো, একটু আলো এসে যেন রামধনুকের রংএ চারিদিকের ধানের শিষ রাঙিয়ে দেয়।
>
> নদী কেঁদে বলছে, আলো আসুক, আমার বুকের তলা পর্যন্ত গিয়ে আলো পড়ুক। সব জিনিস চাচ্ছে যেন আলোয় তাদের রং ফিরে পায়, আপনার আপনার হারানো ছায়া ফিরে পায়, তারা সারারাত বলছে, আলো কেন পাচ্ছিনে, আলো কী দোষে হারালেম।
>
> আর আমি কুঁকড়ো তাদের সে কান্না শুনে কেঁদে মরি, আমি শুনতে পাই ধানখেত সব কাঁদছে, শরতের আলোয় সোনার ফসলে ভরে ওঠবার জন্যে, রাঙা মাটির পথ সব কাঁদছে, যারা চলাচল করবে তাদের ছায়ার পরশ বুকের উপর বুলিয়ে নিতে আলোয়। শীতে গাছের উপরের ফল আর গাছের তলার গোল গোল নুড়িগুলি পর্যন্ত আলো তাপ চেয়ে কাঁদছে, শুনি। বনে বনে সূর্যের আলোক কে না চাচ্ছে বেঁচে উঠতে জেগে উঠতে, কে না আলোর জন্যে সারারাত কাঁদছে। এই জগৎসুদ্ধ সবার কান্না আলোর প্রার্থনা এক হয়ে যখন আমার কাছে আসে তখন আমি আর ছোটো পাখিটি থাকিনে, বুক আমার বেড়ে যায়, সেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাজছে শুনি, আমার দুই

> পাঁজর কাঁপিয়ে তার পর আমার গান ফোটে, 'আ-লো-র ফুল।' আর তাই শুনে পুবের আকাশ গোলাপী কুঁড়িতে ভরে উঠতে থাকে, কাকসন্ধ্যার কা কা শব্দ দিয়ে রাত্রি আমার গানের সুর চেপে দিতে চায়, কিন্তু আমি গেয়ে চলি, আকাশে কাকডিমে রং লাগে তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল, তারপর হঠাৎ চমকে দেখি আমার বুক সুরের রঙে রাঙা হয়ে গেছে আর আকাশে আলোর জবাফুলটি ফুটিয়ে তুলেছি আমি পাহাড়তলির কুঁকড়ো।

এই ভাবে দিনের পর দিন অনন্তের দীপটি জ্বালিয়ে চলেছে পাহাড়তলির কুঁকড়ো। তার নিজের সেই ছোট স্বজনকুটুমের ভূসমাজটুকুর জন্য।

শুধু আলোর শিল্পী নয়, নিজের ওড়ারও স্রষ্টা এই পাখি। এবড়োখেবড়ো কাদামাটি জঙলাপাড় পানাপুকুরের বাঁধা ঘের ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে সুবচনীর খোঁড়া হাঁস— পালকবাতাস ডানায় বেঁধে যেখানে উড়ে আসে চারদিগন্তের পাখি, উঁচু চুড়োর পর চুড়ো ডিঙিয়ে নামে এসে হলুদ ব্রাহ্মণী হাঁস, সেই সুদূর মানস সরোবরের লক্ষ্যে। বুনো হাঁসের ডাক শুনে মুহূর্তে-মুহূর্তে উড়তে মন আনচান। যত রূপকথাই হোক, রূপকথার মতো আদি যে কবিতা তার সমবয়সী সাথী, তারও কণ্ঠ এর মধ্যে চাপা নেই।

গঙ্গাতীরের বাঙলাদেশের বর্ণনা করতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একখানি মরীচিকার মতো'। লিখেছিলেন

> এ-সব কতদিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড়ো সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারি দিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। এমনতরো শোভা আর এ জন্মে দেখিতে পাইব না।

এই বর্ণনা উপলক্ষ করে সুকুমার সেন লিখেছেন

> সে শোভা রবীন্দ্রনাথ কেন আর কেউই তারপর দেখতে পান নি। তীরে রেলের বেড়ি আগে থেকেই লাগতে শুরু হয়েছিল, সে বেড়ির প্রসার ও চাপ বেড়েই চলল। তার উপর পাটকলের আবির্ভাব। প্রবন্ধ লেখবার পর থেকে প্রকৃতি ও প্রকৃতিপুষ্ট মানুষ কলকাতার নিকটবর্তী গঙ্গাতীর থেকে দ্রুতপদে অন্তর্ধান করেছে। আমাদের দেশে যন্ত্রযুগের প্রথম মহড়ার প্রধান ক্যাজুয়ালটি পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাতীর।

এই যন্ত্রযুগ: কলের ভোঁ চিমনির ধোঁয়া শিল্প আর ব্যাবসার শহুরে বাবু চাকুরে বাবুর মুরুব্বিয়ানা-বিষয়বুদ্ধি, আর কাজের মানুষ হয়ে ওঠার ব্যস্ত প্রবণতা— একটু একটু করে সবার চোখের উপর ছড়িয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ দেখেছেন, 'যেন কাজের যন্ত্রগুলো দাঁতে চিবিয়ে ছোবড়া বানিয়ে ছেড়ে দিলে'। কিন্তু তাঁর অল্পবয়সের দেখার এই বর্ণনা—

> হাওড়ার পুলের অপর মুখে টোলঘর পেরিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলুম, বড় বড় গাছের নীচ দিয়ে, গাঁয়ের ভিতর দিয়ে— গাঁগুলি তখনো জাগে নি ভালো করে, মাকড়শার জালের মতো ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার মাঝ দিয়ে চলেছি আমরা। কখনো বা থেকে থেকে দেখা যায় গঙ্গার একটুখানি,···আবার বাঁক ঘুরতেই গঙ্গা ঢাকা পড়ে গাছের ঝোপে আড়ালে। শালকের

কাছাকাছি এসে কি সুন্দর পোড়ামাটির গন্ধ পেলুম। এখনও মনে পড়ে কি ভালো লেগেছিল সেই সোঁদা গন্ধ।...

আবার ১৯৩১ সালে তাঁর চিঠি পড়ি :

আহা, এই শহরের বাড়ি-ঘেরা দৃশ্য কি চমৎকার! সকালের একটু একটু কুয়াসার মধ্যে দিয়ে বাড়িগুলোর উপর দেখছি রোদ আর ছায়া পড়েছে, দেখাচ্ছে ঠিক যেন পর্বতের গায়ে আলোছায়ার ঝরনা ঝরছে! মাঝে মাঝে একটা চিমনি ধুঁয়া ছাড়ে আর মনে হয় যেন বনের মধ্যে কারা চড়ুইভাতি খেতে বসেছে— রান্নার গন্ধ পর্যন্ত নাকে আসে! তার উপর এখন আবার ছট্‌পুজো লেগেছে সিংঘীর বাগানে— সকাল থেকে রাত বারটা একটা পর্যন্ত চমৎকার সুরে চারিদিকে মাদোল ঢাক ঢোলের সঙ্গে মেয়েরা ছেলেরা গান জুড়ে দিয়েছে, ওধারে কোথায় একটা নতুন বাড়ি হচ্ছে— মজুররা ছাত পিটছে তালে তালে ঢুপ, ঢুপ, মনে হয় ঠিক যেন কাঠঠোকরা ডাকছে কুব কুব! থেকে থেকে মোটরগাড়ি ভোঁ, সেও সুরে বেজে যাচ্ছে রামশিঙে। একদল পায়রা ছাতে— নীল আকাশের গায়ে কালো দিয়ে লেখা— চুপ করে বসে থাকতে থাকতে অকারণে ঝাঁক বেঁধে উড়ে পড়লো, আবার একটা পথ হারিয়ে এসে বসলো আমাদের কার্নিশে রোদ পোহাতে, কি সুন্দর! ঠিক যেন কাঁচ-পোকার সাড়ি পড়ে টুনুদিদি বসে আছেন।

শহরের এই রূপ শহরের গায় তত ছিল না, যত ছিল তার দ্রষ্টার দু চোখে।

আগেই বলেছি, দেশের অপরূপ দৃশ্যছবি অবনীন্দ্রনাথ প্রথম অন্তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন— ছোটবেলায় চাঁপদানি-কোন্নগরের পরে কলকাতার আশেপাশে, তার পর সদ্য প্রকৃতি আঁকার পাঠ হাতে করে 'মুঙ্গেরের ওদিকে ঘুরে ঘুরে।' 'তোমরা কি জানো না সৌন্দর্য বাহিরের বস্তু নয়?'— এই সূত্র পড়াবার ঢের আগেই দৃশ্য থেকে ডুব দিয়েছিলেন তাঁর চিৎস্বভাবের ভিতরে— ভাবমূর্তির খোঁজে। তখন সে দেশ আর বাঙলাদেশটুকু নয়, 'ভারতমাতা'। ১৯০২ সালের এই স্মরণীয় চিত্রখানি ভাবসম্পদে প্রগাঢ়, সব দিক দিয়েই শিল্পীর জীবনের একটি প্রাপ্তি। এই অনাদি দেশজননীর কোল অধিকার করে থাকা অতিনির্ধারিত যে ইতিহাসসময়, তারও আগের তাঁর বুকের প্রথম সন্তানটি— সেই আমাদের প্রথম স্বরূপিত মুখ, প্রথম জন্ম। সত্তার সেই মূল অবধি পথ ঢুঁড়ে অবনীন্দ্রনাথ যেতে চেয়েছিলেন অতদূর— মধ্যবর্তী ইতিহাসের কুয়াশা সরিয়ে মধ্যবর্তী ইতিহাসের ইচ্ছা শরণ করে— খুঁজে তুলতে চেয়েছিলেন নিজস্ব আমাদের যতটুকু। তবু মধ্যবর্তী ঘাটগুলি তাঁর তত সর্বনাশা মনে হয় নি, যেমন এই আধুনিক নতুন সময়। 'মোগল বা তুর্কের আমলে এক দেশ রাজবেশে এসে আর-এক দেশের পাণিগ্রহণ করলে— ঠিক যে ভাবে এখনো রাজপুত তার ঘোড়ায় চড়ে এসে কন্যাকে কেড়ে নিয়ে যায় বিবাহের রাতে সেই ভাবের ক্ষাত্র বিবাহ হল তখন দেশের ও বিদেশের শিল্পে ও মনোভাবে।' অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লেখা এই ইতিহাসভাষ্য। 'এই ঘটনা মোগল আমলে নয়, তার পূর্বে; তারও পূর্বে কত বার ঘটেছে, কত বার কত দিক দিয়ে মিলন হয়েছে আর্যে-অনার্যে, সমতলবাসীর সঙ্গে পর্বতবাসীর, সমুদ্রের এপারের রাজার সঙ্গে সমুদ্রের ওপারের রানীর। আমাদের ধর্মের ইতিহাস কর্মের ইতিহাস শিল্পের ইতিহাস এই সার্থক মিলনের চিহ্নে ভরা রয়েছে।' কিন্তু এখনকার যে পুব-পশ্চিমের মিলন সে তো প্রভু ও দাসীর সম্বন্ধ। প্রভু যে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছেন তাঁর রাজ-ভোগের স্বাচ্ছন্দ্যবিধায়— আড়াল করছেন আমাদের থেকে আমাদের— সত্যি

কী তা দিতে পারে আমাদের? কিন্তু বিজেতার অনুকম্পার সামনে আত্মসংবরণও সহজ নয়।

'বুঝি আপনাকেও হারাতে বসেছি আমরা'— তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল। যন্ত্রসভ্যতার সবচেয়ে দুর্লক্ষণ, মানুষকে সে শিকড় ছিঁড়ে তার নিজস্ব অভিধার থেকে বহিষ্কার করে আনে। শিল্প-বিপ্লবের গোড়াতেই লক্ষ্য করেছিলেন ব্লেক: নিসর্গের মাঝ থেকে শুকিয়ে গেছে তার অধ্যাত্ম অন্তর্ভাস, মাটি পড়ে আছে প্রাণরসহীন, মানুষ কুঁকড়ে গেছে কীটের মতো। বন্ধু টমাস বাট্‌স্‌কে একটি চিঠিতে ব্লেক লিখেছিলেন, দেবতারা যত বড় ভাবেন নিজেদের, আমাদের উচিত নিজেদের সম্বন্ধে ততটাই উঁচু ভবো। কিন্তু ব্যবহারী উন্নতি ঐ একটি ফোঁটা আত্মসম্ভ্রমই শুধু রিক্ত করে নিয়ে যায়, বিনিময়রূপে।

কেবলমাত্র পটভূমির থেকে ছিন্ন হয়ে গিয়েই হারাতে বসেছি আমরা। দেশের ধূলিদিগন্তের সাথে প্রাণের যোগ হারিয়ে গিয়ে দুইই শুধু জীয়ন্ত শব — অনিকেত, যেমন কারখানার দেয়াল আর যন্ত্রের একটা হাতা — শুধু এই। 'দি ফোর জোআস' কাব্যে ব্লেকের শাশ্বত পুরুষ অ্যালবিয়ন সকাতরে বলেছেন

> My sons, exiled from my breast, pass to & fro before me.
> My birds are silent on my hills, flocks die beneath my branches···
> My robe is turned to confusion, & my bright gold to stone.

অশ্ম কি আবার সোনা করা যায়? তা হলে সেই ব্রতটি কবির। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বাল্যস্মৃতি স্বপ্ন দিয়ে গড়েছিলেন সোনার প্রাকার ঘেরা পুরাণ। তরুলতা অচেতন তাতে চেতন গেয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা রোম্যান্টিক আধুনিক ব্যক্তির একেলে দেখতার পুরাণ। মৃতাত্মা নিসর্গের মাটিহাওয়ায় পুরোনো ঐতিহ্যের সেকেলে জীর্ণ যত দাগ শিল্পীর দিব্য স্বপ্ন দিয়ে আবার নতুন করে কুঁদে ব্লেক সেই অতিবাহিত দেশ-মানুষের প্রাণের যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধে যুদ্ধে বিপ্লবে বিপ্লবে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির উজানভাটির স্রোতে স্রোতে তলিয়ে গিয়েছিল পুরাণ, দেবতারা। ড্রুয়িডী যে প্রত্ন, কিংবা আরও বড়— সমগ্র মানব ইতিহাসের বুকের পঞ্জরে যে পুরাণকথা, তাকে হাতের কাছে না পেয়ে প্রায় পুরাণ-রিক্ত এক জাতির জন্য ব্লেক গড়তে বসেছিলেন স্বরচিত দেবায়তন— আকাশপাতাল ঢুঁড়ে— খৃষ্টপুরাণ থেকে আইসল্যাণ্ডী সাগা অবধি উপকরণ কুড়িয়ে— বহু শ্রমে, কাব্যে কাব্যে সাজিয়ে। এ হল ব্লেকের প্রফেটিক সব পুঁথি। তাঁর আজীবন-শিষ্য ইয়েট্‌স্‌ও তো কবিতার আগুল্‌ফলম্বিত আঙরাখায় বুনে দিতে চেয়েছিলেন পুরাণকথার নকশা। কিন্তু আইরিশদের দেশের গাছে-টিলায় নদীতে মানুষের মনে তখনো মরে নি পুরোনো কথাপুরাণ— ইয়েট্‌স্‌ নিজেই যার একজন সংকলয়িতা।

হয়তো ব্লেকের ঐ দিব্য ভিশন সর্বতোভাবেই ত্রিকালদর্শী প্রাচীন ঋষির ধ্যানদৃষ্টি, আধুনিক কবির হাতে পুরাণ বাঁধার সেই অধিকার— উত্তরাধিকার, উঠে আসে নি। ব্লেকের শ্রমাঢ্য কাব্যগুলিও পুরাণ না হয়ে হয়ে উঠেছে প্রস্থান — দার্শনিক সিসটেম। অথচ এইভাবেই একদিন ছড়ানো উপকরণ গুছিয়ে বেদের কবিরা গেঁথে তুলেছিলেন হিন্দু পুরাণের archetype, আলেকজান্দ্রিয়ান কবিদের হাতে গড়ে উঠেছিল গ্রীক পুরাণ, এমন-কি অজীবিত বিশ্বাসের টুকরো জীইয়ে বেঁধেছিলেন রোমান ভার্জিল, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকেও আইসল্যাণ্ডী স্ক্যাণ্ডিনেভিয় পুরাণকথার নির্ধারিত রূপ বেঁধেছিলেন স্নরি স্টুর্লুসন। কৃত্তিবাস-কবিকঙ্কণের হাতেও তো গড়ে উঠতে পারত অনপনেয় কৈলাস পর্বতটি, আসগর্ড-ওলুম্‌পসের পাশে— অসহায় সম্প্রতিমানুষের বিশ্বাস-আশ্বাসের মতো।

অভয়া দুর্গার পালা ধরে আঁকার মৌল প্রেরণাটি তাই অনুমান করতে ইচ্ছা হয়; 'বাগেশ্বরী'তে বহুলভাবে ব্যাখ্যাত: 'এই কথাই একদিন হয়তো বলেছিলেম আমরা মোগল আমলে এবং তার পূর্বে ও তারো পূর্বে—'পরধর্মো ভয়াবহঃ'; কিন্তু ভয়ের মধ্য দিয়ে তবে আসে অভয়-রূপ আশীর্বাদ— এই সত্য এখনো দেশের শিল্পীরা সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি দিয়ে ঘোষণা করছে…'। এই সত্য, এই অভয়-আশীর্বাদ হাতে এই মুহূর্তেও 'দুর্গা দুর্গা জয়দুর্গা দুর্গতিনাশিনী'-অভয়া মঙ্গল-কলস মাথায় আলতা রাঙানো পায়ের ছাপ রিক্ত মাটির উপর এঁকে এঁকে এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে— অবনীন্দ্রচিত্রে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে। মুকুন্দরামের সুবর্ণগোধিকা পালার চরণপঙ্‌ক্তির শিরোধার্য হয়ে। নসট্যালজিয়াতুরশূন্য চতুষ্পার্শ্বে বাঁধা হয়ে। যত দূর যত ছিন্ন হোক আজ, হাজারপুরুষের ঐ বিশ্বাসের পাশে নতুন সৌধ-ইমারতের কতটুকু দাম? নতুন জলুসগুলি যে মরা, ছোঁয়ার যোগ্যও নয়, তা তো তাঁর কুঁকড়োটিও বুঝেছিল

> এগুলো নতুন কি না, কাজেই কুচ্ছিৎ; কিন্তু পুরোনো দেয়াল, ভাঙা বেড়া, ফাটা দরজা, পুরোনো ঐ মুরগির ঘরটি আর কতকালের ওই লাঙল, ধানের মরাই আর শেওলার সবুজ খিড়কির দুয়োর পানাপুকুর আর ওই কুন্দলতার থোকা-থোকা ফুল, কী সুন্দর এগুলি।

ছড়ার টুকরো জুড়ে সেই শতচ্ছিন্ন দেশটিও আঁকতে বসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। আমতলি গাঁয়ের রিদয়ের বাড়ি সেই আদলে, খনার বচন মেনে

> 'পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ
> উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ ছেড়ে।'…
>
> রিদয়দের বাড়ি নেহাত সামান্যরকমের কিন্তু তা হলেও এই সামান্য জমিটুকু— ক'খানি ঘর, হাঁসপুকুর, বাঁশঝাড়, তেঁতুল গাছটি নিয়ে, কি সুন্দরই ঠেকল! যেন একখানি ছবি!

বরানগরের নতুন বাড়িতে এসে এই বাড়িই যেন খুঁজে পেলেন প্রত্যক্ষ। তাঁর পুত্র অলোকেন্দ্রনাথ লিখেছেন

> বাবা দেখেই বললেন—এ যে একেবারে খনার বচন। উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ ছেড়ে, পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ।

আঁকতে বসলেন যখন মাসির নতুন বাড়ি

মাসিমাতার বাসা, গুপ্তনিবাস,
পোঃ আলমবাজার, বরাহনগর, বেলঘুরিয়া।

আঁকলেন

> ফুলবাগিচার উত্তরধারে দেখা যায় মাসির দোতলা বাসাবাড়ি, গেরিমাটির রং-করা ছোট্ট যেন পুতুল খেলার বাড়িটি। পশ্চিমধারে দিঘি, পূবধারে পুকুর হাঁসচরা, আঁকতে ইচ্ছে করে

বোঝা যায় না আসল না স্বপ্ন কিসের প্রতিচ্ছবি। তার পর মাসি যখন বললেন

> হাওয়া এসে যেন পর্দা সরিয়ে দিলে চোখের উপর থেকে, দেখলেম, আমি আমার সেই বাড়িতে বসে আছি।

এ তা হলে সেই স্বপ্নেরই উজ্জীবিত রঙ, সেই গুহাহিত স্বপ্ন— 'কারুস্মৃতি'? যে স্মৃতিশক্তির সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে ওঠে হাজার বছরের ঘুমন্ত রূপ। শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশ-কৃত তাঁর

একটি প্রসিদ্ধ চিত্রভাষ্যের কিয়দংশ এই সূত্রে উদ্ধার করি—

> Calcutta is in India but, far from being wholly of India, it is an international and commercial settlement : The people of India and Bengal who live in it had to unlearn much of their Indian and Bengali ways to keep themselves alive in it. Now they slowly try to remember.
>
> They are helped by the paintings of Abanindranath Tagore the first Indian painter brought up in an international and modern town who painted in 'Indian style'. He had to look back in order to remember. In pictures he brought the *India of his vision* before the modern minds in Calcutta and other large towns.
>
> Abanindranath Tagore belongs to Calcutta but he is not of this commercial, swampy. rootless town.

এই 'ভিশনে'র কথাই কি বলতে চেয়েছিলেন ব্লেক ? কবির দেবদত্ত কবচকুণ্ডল যে দিব্যদৃষ্টি ? ডাক্তার ট্রাসলারকে ব্লেক লিখেছিলেন, যে বৃক্ষটি একজনের চোখ অশ্রু ভিজিয়ে দেয় আর পাঁচজনের চোখে তা রাস্তার পাশের সবুজ একটা কিছু ছাড়া কিছু নয়। দিব্যধ্যান-উৎসারিত ঐ অশ্রু বৃক্ষের আধারে দেখে সত্য চিরন্তন অপরিবর্তনীয়কে। অবশ্য ব্লেকের 'ভিশন' স্মৃতিশক্তি মাত্র নয়, অলোক প্রেরণা, এবং তা নিয়ে তিনি তত্ত্ব গড়েছেন।

তবু অবনীন্দ্রনাথের কথা বলতে আধুনিক কবিচিত্রীদের চাইতে ব্লেকের কথা মনে হয়। ছোট কবিতা লিখতে ব্লেক নির্ভর করেছিলেন কিছু লোকশৈলি— গীতি-প্রবাদ-ছড়ার প্রকরণ : এমন-কি 'বাঘে'র মতন কবিতা লেখা ছড়ার চালে, জীবন্ত প্রবাদ কুড়িয়ে গাঁথা তাঁর 'সহজা প্রবচনমালা'— 'অগ্যারিজ অফ ইনোসেন্স'। অবনীন্দ্রনাথের সাতপুরু দুঃখ-ঢাকা যে-খেয়ালকৌতুক-পরিহাস, তা আর প্রত্যাশা করা যায় কেমন করে ! ব্লেকের ছবিও কাব্য-কথার ইলাসট্রেশন, কুশল ক্যালিগ্রাফি। স্বভাবে শুধু ভিন্ন : প্রবল, জটিল, রবীন্দ্রনাথের ছবিকে অবনীন্দ্রনাথ যে-ভাবে চিনতেন, অনেকটা সেইরকম, volcanic। অবনীন্দ্রনাথের শান্ত উদাসীন বিষাদভরা ছবির পাশে তা ভিন্নজগতের। 'ইনোসেন্সে'র পরে ব্লেকের লেখাও তাই— তীব্র, বিদ্রূপশাণিত, যৌন, উন্মাতাল। যেমন তাঁর স্বরচিত অর্ক। আর অবনীন্দ্রনাথের সকল রচনার ওপর জাপানী ওয়াশ ধোয়া Zen-প্রশান্তি, বিধুর ঔদাস্য, একটু রঙ্গ একটুখানি রহস্য, আর অযৌনতা। সর্বতোঅযৌনতা।

ব্লেকের চিত্তটি তবু মূলে যেন অবনীন্দ্রনাথেরই মতো— স্বচ্ছ ধোয়া জলরঙে আঁকা, সরল, গ্রাম্য শ্যামলতায় ভরা : লিলি ফুলের পাপড়ির শেজে ঘুমিয়ে আছে ওবেরন-টাইটেনিয়া, অথবা থর্নটন-অনূদিত ভার্জিলের 'প্যাস্টোরালসে'র জন্য কাঠখোদাই-ছাবি। 'ইনোসেন্সে'র পর্বের ব্লেক শক্ত দাগা লাইন জলরঙে ভিজিয়ে শান্ত দীপ্য করে আঁকতে ভালোবাসতেন। ১৮২১ সালের ব্লেকের কাঠখোদাইয়েও সজীব হয়ে উঠেছে কবির অন্তরের দেশজতা— গ্রামীণ শান্তিনিকেতন। সূর্যরশ্মির একটি রেখায় জলে উঠেছে হলের ফলা, গোরুর শিঙ ; রাখাল তার কুকুরটি পশ্চাৎপটের কিরণরেখারই অবিচ্ছেদ অংশ। দেশ

আর মানুষ যেন নাড়ির বাঁধনে বাঁধা, সুড়িটিও জীবনউজ্জ্বল। ডাক্তার ট্রাসলারকে ব্লেক লিখেছিলেন, স্বপ্ন দেখতে জানে এমন মানুষের চোখ দিয়ে আমি দেখি প্রকৃতিকে, প্রকৃতি সেই মূর্ত কল্পনা। অপাপ শিশুর কাছে প্রকৃতি ঠিক এই রকম, আদিম মানুষের কাছে তাই, কবিদেরও কাছে। যেন অবনীন্দ্রনাথেরই ভাবা কথাগুলি।

আরো বড় বিশদ 'সঙস অফ ইনোসেন্স' যেন অবনীন্দ্রনাথের রচনা। ঐ রকমই ইস্কুল-পালানো স্বপ্ন-দেখা ছেলের কথা। কেবল অবোলা শিশু যে কথাটি ব্যক্ত করতে পারলে না, একজন বয়স্ক, শিশুর সৃষ্টিকৌশলে তা ভাষায় ফুটে উঠেছে। ঐ রকমই শরগাছ ভেঙে গ্রাম্য কলম বানিয়ে একটু অমল জল রাঙিয়ে নিয়ে তা লেখা : 'পড়তে কষ্ট নেই, মানে বুঝতে কথায় কথায় মিনিং বুক কনসাল্ট করায় না; পড়তে পড়তেই হাসি পায়, কান্না পায়, পেটে খিল ধরে, চোখের জল গড়িয়ে পড়ে, ঘাম ছোটে'। চিরকালের মাসির বাড়িটি তার চৌহদ্দি জুড়ে— তাই কোথাও তার বাধা নেই, জলতরঙ্গের মতন সে সহজ উচ্ছল লীলাময়।

অবনীন্দ্রনাথ শেষ অবধি বেঁচেছেন তাঁর সেই মাসির ঘরটুকুতে। মাসিকে গঙ্গা নাইতে নিয়ে গেছেন সাথী হয়ে, পালকির পাশ পাশ হেঁটেছেন মাসির হাত ছুঁয়ে। শেষ দিকে মাসির এই কথাগুলি ঘুরতে থাকে মনে মনে—

> দেখ অবু, পুরোনো বাড়ি ছাড়বার সময় রোগশয্যেতে পড়ে আমি ঠাকুরকে ডেকে বলেছিলেম, প্রভু, যেখানেই যাই যেন উদয়-অস্ত চাঁদ-সূর্ষির আলো পাই ; আর সেখানে খেলাঘরে অবু আমার হেসে খেলে বেড়াবে দেখব।

সেই খেলা ঘরের স্মৃতি শতকীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে আছে অবনীন্দ্রনাথের লেখায়।

অবনীন্দ্রনাথের ছবি

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনার লক্ষ্য ছিল ভাবের পথে জীবনের উপলব্ধি। ঐদিক দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বিমূর্তবাদী আধুনিক শিল্পীদের থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সামাজিক বা নৈতিক আদর্শ অপেক্ষা 'অহেতুক' তাঁর শিল্পপ্রেরণাকে সজীব রেখেছিল ও সক্রিয় রেখেছিল। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই অহেতুক ইচ্ছার দ্বারাই তিনি চালিত হয়েছিলেন। পারিপার্শ্বিক প্রভাব অপেক্ষা অবনীন্দ্রনাথের মানসিক লক্ষণ বারংবার তাঁর শিল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। এই কারণে বলা চলে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প শিল্পীর ব্যক্তিত্বের দ্বারা যতটা প্রভাবান্বিত সমাজের দ্বারা ততটা নয়।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ও সাহিত্য প্রায় একই সময় আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই কারণে উভয় দিকের মধ্যে একটি যোগসূত্র থাকা স্বাভাবিক। সম্বন্ধ থাকলেও অবনীন্দ্রনাথ কখনও সাহিত্যের উপাদান শিল্পে অথবা শিল্পের উপাদান সাহিত্যে প্রবর্তিত করবার ব্যর্থ প্রয়াস করেন নি।

অবনীন্দ্রনাথ কখনও বস্তু সাদৃশ্যকে অস্বীকার করেন নি। সাদৃশ্য, লাবণ্য এই দুই গুণের সাহায্যে তিনি বাস্তবতার রূপান্তর ঘটাতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। অনুভূতি প্রকাশ (Expression) একমাত্র লক্ষ্য ছিল বলেই অবনীন্দ্রনাথের রচনাতে বিচারবুদ্ধির প্রভাব গৌণ।

শিশুসুলভ মনের স্বচ্ছতা ও তদনুরূপ উল্লাস নিয়ে তিনি ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনা গ্রহণে সক্ষম ছিলেন। বিচিত্র ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের শৈশবকাল কিভাবে কেটেছিল তার উজ্জ্বল প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর আত্মচরিতে। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো, লাল চটিজুতো, দেয়ালের গায়ে পান্নাদাসীর ছায়া, আয়নায় প্রতিফলিত শ্বেত পাথরের ফুল, ভারি নরম হাতের স্পর্শ— এই হল অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীমনের প্রথম ও সর্বপ্রধান পাথেয়।

জোড়াসাঁকোর বাড়ি ও সংলগ্ন বাগানের গাছ, সকাল-সন্ধ্যায় আলো, অন্য দিকে ভেতর মহলে বৃহৎ পরিবার, বা'রমহলে দেশী বিদেশী গুণী জ্ঞানীর সমাগম পরিণত জীবনের পাথেয় জুগিয়েছে। কলকাতা শহরের অলিগলি, শহরের জনতার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের শৈশবকাল থেকেই ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এই প্রত্যক্ষ পরিচয়ের রূপান্তর ঘটেছে তাঁর শিল্পে ও সাহিত্যে। অপর দিকে মুশৌরী, দার্জিলিং, ডালহৌসি পাহাড়ে ভ্রমণ করেছেন, দেখেছেন পুরীর সমুদ্র, দেবদাসীর নৃত্য, কোণারকের মন্দির, সাহাজাদপুরের নদী, গ্রাম, ফসলের ক্ষেত। তারপর বসেছেন তাঁর বিস্তৃত দক্ষিণের বারান্দায় এবং ছবি এঁকেছেন, গল্প লিখেছেন, শিল্পশাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, শিষ্যমণ্ডলীকে শিখিয়েছেন ও দেখিয়েছেন, তাঁর মূল্যবান শিল্পসংগ্রহ থেকে আঙ্গিকের উপাদান সংগ্রহ করেছেন নিজের প্রয়োজনমত।

অবনীন্দ্রনাথের জীবনের প্রায় সত্তর বৎসর কেটেছে এইভাবে। তার পর জীবনের নূতন অধ্যায় শুরু

---

* অবনীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতন কলাভবন-কর্তৃক অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় পঠিত ও বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সংগ্রহ Abanindranath (এপ্রিল ১৯৭৩) হইতে সংকলিত।

হল যখন তখন তিনি বৃদ্ধ। জীবনের স্মৃতিজড়িত আভিজাত্যের সমারোহ শেষ হল। অবনীন্দ্রনাথ কলকাতার উপকণ্ঠে নূতন বাড়িতে অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে গিয়ে নূতন জীবন শুরু করলেন।

জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর শিল্পজীবনের সমগ্রতা অনুসরণ করলে লক্ষ্য করা যাবে যে বিষয়, ভাব, গঠন অতিক্রম করে তাঁর শিল্প বিমূর্ত নির্মিতিতে এসে পৌঁচেছে। এই বিবর্তনের ধারা কোথাও আবর্তে পরিণত হতে দেখা যায় না। নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের কারণে তাঁর শিল্পের মধ্যে যোগসূত্র কোথাও বিচ্ছিন্ন হতে দেখা যায় নি। গভীরতম রস-সৌন্দর্য তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন উপলব্ধির পথে। এই কারণে ধারণামূলক রূপ ও বর্ণ তাঁর রচনাতে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্য, অভিনয়, সংগীত এবং সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরাজি চর্চার পথে তাঁর সহজাত শিল্পবৃত্তি যখন কতকটা বিক্ষিপ্ত এমন এক মুহূর্তে অবনীন্দ্রনাথ কায়মনে শিল্পচর্চা শুরু করলেন ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ইউরোপীয় শিক্ষকের কাছে।

একখানি দিল্লী কলমের অ্যালবাম সামান্য কয়খানি আইরিশ ইল্যুমিনেশনের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের মুহূর্তেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভা অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠল। মনের দোলায়মান অবস্থা কাটিয়ে উঠলেন তিনি। শিল্পীর উপলব্ধি নিয়ে শিল্প রচনা শুরু করলেন।

বিলাতী ধরনের শৌখিনতা, সোনালী ফ্রেমে বাঁধা বিলাতী ছবি দিয়ে সাজানো পরিবেশে যাঁর জীবন কেটেছিল এবং ইউরোপীয় শিল্পের আঙ্গিক আয়ত্ত করতে যিনি প্রয়াস পেয়েছিলেন, তিনি কী পেয়েছিলেন এই যৎকিঞ্চিৎ ছবি কয়খানিতে? এই প্রশ্নের জবাব অবনীন্দ্রনাথের উক্তি থেকেই কিছুটা পাওয়া যায়। তাঁর উক্তির সাক্ষ্য থেকে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর মনের গতি প্রকৃতি মূর্ত করে তোলার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন এই ছবিগুলি থেকে। অবনীন্দ্রনাথ রঙে, রেখায়, আকার ভঙ্গীতে দেশী ছবির উপাদান ও ইউরোপীয় আঙ্গিকের দক্ষতা নিজের মতি মেজাজ অনুযায়ী প্রয়োগ করেছিলেন তাঁর রাধাকৃষ্ণ চিত্রাবলীতে।

রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে অতীতের পরম্পরা অপেক্ষা আধুনিক মনের প্রকাশ হওয়ার কারণেই এই রচনা থেকেই ভারতীয় শিল্পের সূচনা এবং এই দিক দিয়েই ছবিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য। রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা অপেক্ষা চিত্র নির্মাণের তাগিদ যে প্রধান তা উক্ত ছবিগুলির সাক্ষ্য থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে। পৌরাণিক বিষয়-আশ্রিত হলেও ছবিগুলিতে মানবীয় চেতনা প্রকাশিত হয়েছে নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে। এই ছবিগুলিতে নাটকীয় পরিবেশের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেটি অবনীন্দ্র-নাথের শিল্পীমনের বৈশিষ্ট্য এবং এই নাটকীয় উপাদান তাঁর পরবর্তী সকল রচনার একটি বিশেষ লক্ষণ।

ই. বি. হ্যাভেলের সংস্পর্শে এসে অবনীন্দ্রনাথ অতীত শিল্পের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে ভারতীয় চিত্রের বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করার প্রয়াস করলেন। মোগল চিত্রের আঙ্গিকগত দক্ষতা যেমন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল তেমনি মোগল চিত্রে নরনারী চিত্রণে প্রাণহীনতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। ইতিমধ্যে ওকাকুরার সংস্পর্শে অবনীন্দ্রনাথ সুদূর প্রাচ্যের শিল্পপরম্পরা ও সে-দেশের নন্দন আদর্শ চিনলেন ও জানলেন। ক্রমে জাপানী শিল্পীরা এলেন অবনীন্দ্রনাথের বাসগৃহে, তাঁরা ছবি আঁকলেন। সকল প্রকার শিল্প-সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় পরবর্তী কয় বৎসরের রচনাতে।

বিভিন্ন আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বহু দৃষ্টান্ত 'রাধাকৃষ্ণ' চিত্রাবলীর পরের রচনাতে পাওয়া যায়। 'ঋতুসংহার', 'বজ্রমুকুট' যেমন ভারতীয় পরম্পরার উপাদানে গঠিত তেমনি নিজস্ব ভঙ্গীতে রচিত হয়েছিল 'কচ ও দেবযানী' (ফ্রেস্কো)। 'কচ ও দেবযানী' যেমন আকারনিষ্ঠ তেমনি পাওয়া যাবে জাপানী আঙ্গিকের অনুকরণে 'ভারতমাতা' চিত্র, অপর দিকে 'সাজাহানের মৃত্যু' (অয়েলপেন্টিং); আঙ্গিকগত পরীক্ষার ক্ষেত্রে আকার অপেক্ষা বর্ণের বাস্তব আবেদন (আলোছায়া) ও বর্ণের মণ্ডনধর্মী-গুণ এই দুটি দিকের সংযোগের পথ অনুসন্ধানই অবনীন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রধান লক্ষ্য। আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তিনি পৌঁচেছিলেন 'ওমর খৈয়াম' চিত্রাবলীর রচনাকালে। মোগল চিত্রের আঙ্গিকগত উপাদান এই সময়ের রচনাতে যেমন তিনি নিজের মতো করে প্রয়োগ করেছেন তেমনি ইউরোপীয় জলরঙের আঙ্গিক প্রয়োগ করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। স্টাইলের নির্দিষ্ট গতি অবনীন্দ্রনাথের রচনাতে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করল 'ওমর খৈয়াম' চিত্রাবলীর বিশেষ কতকগুলি রচনাতে। 'ওমর খৈয়াম' চিত্রাবলীর অনেকগুলি ছবি যেমন বর্ণোজ্জ্বল তেমনি কতকগুলিতে আছে ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার বর্ণসংঘাত। বর্ণোজ্জ্বলতা ও বর্ণসংঘাত এই দুই ভিন্নমুখীর গতি সমন্বয়ের চেষ্টা দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের রচনাতে লক্ষ্য করা যায়। 'ওমর খৈয়াম' চিত্রাবলী শেষ করার পর ধারাবাহিকভাবে কোনও বিষয় চিত্রিত করার চেষ্টা অবনীন্দ্রনাথের রচনাতে পাওয়া যায় না দীর্ঘকাল পর্যন্ত। একান্তে শিল্পসাধনার দিন শেষ হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ক্রমে বৃহত্তর সমাজের সামনে উপস্থিত হলেন জাতীয় আন্দোলনের মুহূর্তে (১৯০৫)।

তাঁর পরবর্তী রচনাতে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে চিত্র রচনার প্রয়াসের মূলে যুগপৎ জাতীয়তাবোধ এবং হ্যাভেলের প্রভাব মেনে নিতে হয়। জাতীয় শিল্পীর দায়িত্ব হ্যাভেলের কাছে অবনীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। এই দায়িত্ববোধ থেকেই অবনীন্দ্রনাথের রচনাতে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয়াশ্রিত চিত্র রচনার প্রয়াস দেখা যায়। তাঁর অহেতুক আনন্দ অপেক্ষা উদ্বেগপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই শ্রেণীর চিত্রে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের রচিত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক চিত্রগুলি বিচার করলে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায় যে অতীতের গৌরব অপেক্ষা নাটকীয় পরিবেশ ও গীতিধর্মী ভাব তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। এই কারণেই জীবনের ক্ষেত্রে অনুরূপ ভাব অনুসরণ করবার সুযোগ যখনই পেয়েছেন তখনই তিনি অতীত অপেক্ষা বর্তমান থেকে উদ্দীপনা গ্রহণের প্রয়াস করেছেন।

উড়িষ্যা ভ্রমণ অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত। ভারতীয় মূর্তিশিল্পের অনবদ্য রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন কোণারকের মন্দিরের সামনে উপস্থিত হয়ে।

ভারতীয় মূর্তিশিল্পের এমন আবেগপূর্ণ আন্তরিক প্রশংসা অবনীন্দ্রনাথ জীবনে আর কখনও করেন নি। কোণারকের মন্দির যে তাঁকে কত গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল তার পরিচয় নিম্নের উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাবে।—

"এখানে কিছুই নীরব নাই, নিশ্চল নাই অনুর্বর নাই, পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান অশ্বের মতো বেগে রথ টানিয়া, উর্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তন-পুষ্পিত কুঞ্জ-লতার মত শ্যাম-সুন্দর আলিঙ্গনের সহস্র বন্ধে চারিদিক বেড়িয়া! ইহারই শিখরে, এই শব্দায়মান, চলায়মান উর্বরতার চিত্রবিচিত্র শৃঙ্গারবেশের চূড়ায়, শোভা পাইতেছে কোণারকের দ্বাদশ শত শিল্পীর

মানসশতদল— সকল গোপনতার সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, নির্ভীক, সতেজ, আলোকের দিকে উন্মুখ।"[১]

প্রাচীন মূর্তির পটভূমিতে তিনি দেখলেন উড়িষ্যার নরনারীর জীবনযাত্রা এবং উৎকীর্ণমূর্তির মধ্যে তিনি পেলেন জীবনের গতিপ্রবাহ। সম্ভ্রান্ত পরিবেশ ও নাগরিক জীবনের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা, উৎসব অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীমনকে যে কতটা অভিভূত করেছিল তার বহু সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাঁর উড়িষ্যা-ভ্রমণের পরের রচনাতে। 'কাজরি নৃত্য', 'দেবদাসী', 'নটনটী' ইত্যাদি চিত্রের ব্যঞ্জনা অনতিকাল পূর্বের রচনা থেকে যে কতটা ভিন্ন তা তুলনার সাহায্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হবেন।

১৯১৬ সাল পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের রচনাতে দুটি ভিন্নমুখী গতি লক্ষ্য করা যায়। এক দিকে মোগল চিত্রের আঙ্গিক ও ভারতীয় প্রাচীন ভাবধারার অনুসরণ, অন্য দিকে বাস্তব উদ্দীপনা ও পারিপার্শ্বিক সচেতন রিয়ালিস্টিক আঙ্গিকের প্রবর্তন। এই দুই ভিন্নমুখী গতির সংযোগ অনুসন্ধানের প্রয়াস অবনীন্দ্রনাথ বারংবার করেছিলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে। উড়িষ্যার মূর্তিশিল্প তাঁর বাস্তব উদ্দীপনাকে প্রকাশ করবার সহায় হয়েছিল। এইজন্যই উড়িষ্যা-ভ্রমণের পরের রচনাতে মূর্তিধর্মী গুণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে অবনীন্দ্রনাথের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব চিত্রধর্মী রচনাতে। বর্ণই তাঁর রচনার সর্বপ্রধান আবেদন। কাজেই আকারগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েই তাঁর সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচার সম্ভব নয়। উড়িষ্যা-ভ্রমণের পর যে জীবজন্তুর ছবি তিনি করেছিলেন সেগুলির সাক্ষ্য থেকে তাঁর বাস্তব উদ্দীপনার আবেদন সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা করা যেতে পারে।

অবনীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম গীতিধর্মী মন অনেকবারই রূপকধর্মী নামের সাহায্যে চিত্রের বাস্তব উদ্দীপনার লক্ষণকে রূপক চিত্রের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করবার চেষ্টা করেছেন, যেমন 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি'। স্পষ্টই ধরা পড়ে যে এটি একটি প্রতিকৃতিমূলক চিত্র। নারীর অনবদ্য মুখের আকার, হাতের সাবলীলতা উভয়ক্ষেত্রেই রূপকধর্মী ভাব প্রকাশের কোনো ইঙ্গিত নেই এবং নামের সাহায্যে চিত্রের সার্থক আবেদনকে আচ্ছন্ন করেছিলেন শিল্পী। রূপক চিত্রের সুস্পষ্ট প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর 'পদ্মপত্রে অশ্রুবিন্দু'-নামাঙ্কিত চিত্রে। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির ইতিহাসে এই ছবিটি একটি ব্যতিক্রম। হাতেধরা পদ্মপাতাটি ঢেকে দিয়ে স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করে একটি বিশিষ্ট নারীমূর্তি।

বাস্তব উদ্দীপনার কষ্টকল্পিত বিকৃত চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে যদিও অবনীন্দ্রনাথ আর কখনও চেষ্টা করেন নি কিন্তু নামের সাহায্যে চিত্রের স্বভাবানুগত লক্ষণকে ভিন্নপথে চালিত করবার চেষ্টা করেছেন তিনি অনেকবার।

'অরুণিমা', 'আঁখিপাখি', 'প্রভাতের শিশির বিন্দু' ইত্যাদি রচনা প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা চলে না বলেই রূপকধর্মী হলেও এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

অবনীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে চূড়ান্ত মতামত যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পের ভারতীয়ত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। অপর দিকে প্রি-র‍্যাফেলাইট (Pre-Raphaelites) -স্কুলের সঙ্গে অবনীন্দ্রগোষ্ঠীর তুলনা জাতীয়তার প্রকাশ তথা রিভাইভালিস্ট (Revivalist) রূপে দেখবার চেষ্টার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার সম্বন্ধ যে অতি ক্ষীণ তার সাক্ষ্য তাঁর পরবর্তী রচনা। প্রসঙ্গক্রমে এইমাত্র

---

১ "গমনাগমন", পথে বিপথে।

বলা চলে যে অবনীন্দ্রনাথের সহজাত প্রতিভার দিকে অধিকাংশেরই দৃষ্টি পড়ে নি। বিশেষভাবে তাঁর পরিণত রচনার পূর্বে যে মতামত দিয়েছিলেন হ্যাভেল বা কুমারস্বামী সকলে সেইটিকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়ার কারণে অবনীন্দ্রপ্রতিভার উপযুক্ত বিচার হয় নি। 'ভারতমাতা', 'গণেশজননী', 'দারার ছিন্নমুণ্ড' ইত্যাদি ছবির সাহায্যে অবনীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়েছিলেন কিন্তু এই-সব রচনা যে সাময়িক পরিবেশের দ্বারা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত সে কথা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর শিল্পজীবনের বিবর্তনের সঙ্গে এই শ্রেণীর ছবির বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নেই। অপর দিকে পরবর্তী রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 'ওমর খৈয়াম' উড়িষ্যা-ভ্রমণের পরের রচনা 'ফাল্গুনী' ইত্যাদি।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-বিবর্তনের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায় 'দাসখৎ' নামাঙ্কিত চিত্রে। মোগল ও ইউরোপীয় আঙ্গিকের সার্থক সংযোগ এই চিত্রের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য। নরনারীর আকার-প্রকারের সংযোগ একটি চিরন্তন ভাবকে রূপায়িত করেছে চিত্রের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে লঙ্ঘন না করে। ময়ূর-পুচ্ছের আকারে গাছের প্রক্ষিপ্ত অংশ পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক রূপে প্রবর্তন করেছেন শিল্পী। Space ও surface এই দুই বিরুদ্ধমুখী আদর্শের দ্বন্দ্ব এক্ষেত্রে শিল্পী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। স্বাভাবিকতার দিকে যদিও শিল্পীর প্রবণতা তৎসত্ত্বেও 'দাসখৎ' চিত্রের ধারণামূলক রূপ নির্মাণ ও অন্তর্মুখী গতি সুস্পষ্ট। এই যে বৈশিষ্ট্যগুলি এই চিত্রে লক্ষ্য করা যায় তারই স্পষ্টতর প্রকাশ লক্ষ্য করা যাবে তাঁর পরবর্তী কালের রচনাতে।

১৯২০ সাল থেকে অবনীন্দ্রনাথের রচনার বিষয়, আঙ্গিক,বর্ণবিন্যাস নূতন পথে চালিত হতে দেখা যায়। গাঢ় বাদামী বর্ণ, আলোছায়ার সংঘাত অতঃপর কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। Space-এর আবেদন অপেক্ষা বর্ণের স্তরবিন্যাস সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ যে একটি আদর্শ অনুসরণ করেছেন তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এই সময়ের (১৯২০-১৯৩০) প্রায় সকল রচনাতেই।

সাহিত্যগত ভাব, ঐতিহাসিক পৌরাণিক বিষয় বা মোগল আঙ্গিকের অনুসরণ করার লক্ষণ অবনীন্দ্রনাথের এই সময়ের রচনাতে প্রধান হয়ে ওঠে নি। মনে হয় অবনীন্দ্রনাথ নিজের সহজ শিল্পবোধ ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য করেন নি। যদিও পরবর্তী দশ বছরের রচনার মধ্যে কোনো বিষয়কে ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত করার প্রয়াস নেই, তৎসত্ত্বেও এই কয় বৎসরের রচনার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ধারা সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

এই সময় চরিত্র-চিত্রণ ও still life-এর যুগপৎ দুই লক্ষণ অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের প্রধান অবলম্বন বলা চলে। অর্থাৎ বিষয় অপেক্ষা বস্তুগত গুণ প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন শিল্পী। বর্ণের তরলতা অপেক্ষা গাঢ়তা এবং বর্ণের গতি অপেক্ষা স্থিতিশীলতা এই সময়ের চিত্রের সাধারণ গুণ। বস্তুত প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তীব্র অনুভূতি যতটা অনায়াসে এই সময়ের রচনাতে প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন শিল্পী তার তুলনা পূর্বের রচনাতে দৈবাৎ পাওয়া যাবে।

'ত্রয়ী' (রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, অ্যাণ্ডরুজ) 'আলমগীর' ইত্যাদি ছবিতে চরিত্রগত ভাব সর্বপ্রধান লক্ষ্য। অপর দিকে 'Flute Player', 'উমা', 'মালিনী' 'নূরজাহান' ও অনুরূপ বহু চিত্রে যে চরিত্র-চিত্রণের ভাব সুস্পষ্ট এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

খাদি কাপড়ের উপর করা 'নূরজাহান' ছবিতে আকার ও নির্মাণের সরলতা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মুখমণ্ডলের স্মৃতি প্রকাশিত হয়েছে 'নূরজাহান' চিত্রে। এই ছবি প্রথম প্রদর্শিত হয় 'মমতাজ বিবি' নামে। মুখে আভিজাত্যের সুস্পষ্টতা, গড়গড়ার সটকায় হাত ইত্যাদি সর্বসমেত যে আবেদন তার তীব্রতা আরো স্পষ্ট হয়েছে বর্ণের সংযম ও contrast-এর প্রয়োগে। খাদি কাপড়ের উপর আঁকা এই ছবিটিতে শীতল শ্যামলতা যেমন দূরত্বের আভাস দেয় তেমনি এগিয়ে আনে গাঢ় রঙ ও হাতের ভঙ্গী। এই প্রসঙ্গে 'সুরঙ্গমা' নামে চিহ্নিত ছবিখানির উল্লেখ করা যেতে পারে। শীতল বর্ণ ও contrast প্রয়োগ-কৌশল প্রায় একই রকম। পাশফেরা অবস্থায় কুর্শির উপর উপবিষ্ট একটি নারীর এই প্রতিকৃতি। মনে হয় যেন একই মুখ একবার সামনে থেকে ও একবার পাশ থেকে দেখানো হয়েছে।

উপরোক্ত ছবিতে চিত্রনির্মাণের যে রীতি অনুসরণ করেছেন শিল্পী তারই সঙ্গে তুলনা করা চলে 'পুরানো খেলনা' ছবিটি। ছবিটিতে নির্মাণরীতির (composition) সরলতা লক্ষ্য করতে অসুবিধা হয় না। গাঢ় বাদামী রঙের পৃষ্ঠভূমির সঙ্গে অন্যান্য বর্ণের সংযোগ, লাল ও সবুজের সংঘাত চিত্রের নির্মাণরীতিকেই অনুসরণ করেছে। বস্তুর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের লক্ষণগুলি শিল্পী প্রকাশ করেছেন still life-এর আদর্শ অনুযায়ী। মুখমণ্ডলের আকার-প্রকার অন্যান্য বস্তুর সংঘাতের দিক দিয়ে যতটা সক্রিয়, ভাব ও ভাবনার সঙ্গে সম্বন্ধ তেমন নয়। নামের মিল আকারগত গুণের বৈচিত্র্য ও চিত্রের বাঁধুনিকে দৃঢ়তর করেছে। উল্লিখিত ছবি দুইখানিতে ভাবুকতা প্রকাশ অপেক্ষা আকারগত গুণ নির্মাণ যে শিল্পীর লক্ষ্য তারই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করা চলে।

'নূরজাহান' নামে দ্বিতীয় চিত্রে (পদ্মফুল হাতে নারী মূর্তি) গীতিধর্মীভাবে তাঁর পূর্বের রচনার স্বগোত্রীয়। এই সময়ের রচনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মুহূর্তেই দর্শক অনুভব করবেন যে অবনীন্দ্রনাথের রচনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ধারণার দ্বারা চালিত হয়েছে। কোনো বিশিষ্ট পরম্পরা অনুসরণের চেষ্টা নেই। শিল্পীর মানসিক গঠন ও চিত্তবৃত্তি পৌরাণিক-ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিষয়ের চাপে যে কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল সে কথা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। নূতন চেষ্টার পথে অবনীন্দ্রনাথ সে আড়ষ্টতা সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠেছিলেন এবং প্রত্যক্ষভাবে নিজের প্রতিভা অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ যে সময় বিশেষভাবে ভারতীয় আঙ্গিক অনুসরণের প্রয়াস পেয়েছিলেন সে সময় প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল দৈবাৎ। হিমালয় পাহাড়ে ভ্রমণের কালে জলরঙের ছাপছোপে ছোটো আয়তনের sketchগুলিতে তাঁর আলোছায়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ধরা পড়ে। অপর দিকে বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর দৃশ্যচিত্রের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেগুলি প্রধানত আলোকধর্মী (visional)। দৃশ্যচিত্রের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গতা লক্ষ্য করা যায় ধারাবাহিকভাবে রচিত বাঙলার দৃশ্যচিত্রে।

সাহাজাদপুর-ভ্রমণের পর কলকাতায় বসে অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন এই ছবিগুলি। সমকালীন অন্যান্য চিত্রের মতোই তাঁর এই দৃশ্যচিত্রে নির্মাণরীতির নূতন লক্ষণ সুস্পষ্ট। আলোকে ঝলমল বাঙলার এই দৃশ্যচিত্রগুলিতে প্রকৃতির যে রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সে ক্ষেত্রে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা একটি শাশ্বত প্রাকৃতিক আবেদন সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন, স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল বর্ণের সমন্বয় ও সংঘাতের সাহায্যে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের লক্ষণ সত্ত্বেও কোনো দিক দিয়েই বাঙলার দৃশ্যচিত্রে বাহুল্য লক্ষ্য করা যায় না।

ধারাবাহিক বাঙলার দৃশ্যচিত্রগুলির সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় এই সময়ের পশুপক্ষী অবলম্বনে রচিত চিত্র। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য জীবজন্তু-বিষয়ক চিত্র 'শেষ বোঝা' অথবা ১৯১৬ সালের রচনার সঙ্গে

এই সময়ের পশুপক্ষী চিত্রের তুলনা করলে সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে ভাব অথবা নিছক উদ্দীপনা অপেক্ষা সমকালীন অন্যান্য চিত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য দেওয়াই শিল্পীর লক্ষ্য। 'ছাগল ও বানর' এই চিত্রে আইডিয়া অপেক্ষা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গভীর অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে অবনীন্দ্রনাথ বর্ণোজ্জ্বল আকারনিষ্ঠ চিত্র নির্মাণের প্রয়াস করে-ছিলেন। বস্তু-আশ্রিত আকারের দৃঢ়তা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ কতটা সচেতন হয়েছিলেন তাঁর রচিত 'Mask Drawing' তার প্রমাণ। ইতস্ততঃ রঙের আমেজ (tint) থাকলেও অধিকাংশ ড্রইংএ বর্ণপ্রয়োগ শিল্পী করেন নি। পরিণত বয়সের বিশুদ্ধ ড্রইং সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার একমাত্র নিদর্শন তাঁর এই Mask Drawing।

বাঙলার জাতীয় আন্দোলনের মুহূর্তে অবনীন্দ্রনাথ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ক্রমে জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পাওয়া ও অনুবর্তীদের জনপ্রিয় হওয়ার কারণে অবনীন্দ্রনাথ অনেক পরিমাণে জনতার থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম এবং প্রথম জীবনের কিছু ছবি ভারতের সর্বত্র আদর্শরূপে স্বীকৃত হলেও প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব তাঁর প্রথম অনুবর্তীদের হাতে তিনি অনায়াসে সমর্পণ করেছিলেন। এইজন্যই ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের মুহূর্তে অবনীন্দ্রনাথকে সক্রিয়ভাবে শিল্পীসমাজের নেতারূপে আমরা দেখি না। বলা যেতে পারে এই সময় অবনীন্দ্রনাথ অনেক পরিমাণে নিঃসঙ্গ, তৎসত্ত্বেও শিল্পের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে নূতন কাল উপস্থিত সে বিষয়ে তিনি প্রত্যক্ষভাবে সচেতন ছিলেন। কারণ তাঁর অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতিমধ্যে ইউরোপের বিমূর্ত শিল্পরীতির চর্চা শুরু করেছেন। এই নিঃসঙ্গ অবস্থার মধ্যে রচিত হয়েছে তাঁর আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলী। আভিজাত্যের পরিবেশে আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলী তাঁর শেষ রচনা।

রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার যে বৈশিষ্ট্য তারই চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব হয়েছে এই চিত্রাবলীর মধ্যে দিয়ে। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার ব্যাপ্তি এই ছবিগুলিতে পাওয়া যেতে পারে। আশ্চর্য-ভাবে শিল্পী তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব এই ছবিগুলির সাহায্যে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও উপলক্ষ্য আরব্য উপন্যাস কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা। শহুরে জীবনের অভিজ্ঞতাকে বোগদাদের লৌকিক,অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন এমনভাবে যে কালের ব্যবধান মুছে গিয়েছে সে ক্ষেত্রে। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা শহরের জনস্রোত ও বিচিত্র কর্মজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা আরব্য উপন্যাসের কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। এটিকে আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলী না বলে তাঁর মৌলিক কলকাতা নগরের কাহিনী বলা অসংগত নয়। অতীত ও বর্তমানের মিশ্রণে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা এবং অবাস্তবকে বাস্তবের জগতে পৌঁছে দেওয়া অসাধারণ প্রতিভা অবনীন্দ্রনাথের রচিত সাহিত্যে বারংবার লক্ষ্য করা যায়। চিত্রের ভাষায় সেই প্রতিভা প্রত্যক্ষ করি আমরা আরব্য উপন্যাস চিত্রে। অবনীন্দ্রনাথের কল্পনার সৃষ্টি এই রচনাগুলির সার্থকতা অনুসরণ করতে হলে আঙ্গিকের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আরব্য উপন্যাসের প্রতিটি চিত্রই নির্মিত হয়েছে ইমারতের মতো কঠিন করে। জীবজন্তু, মানুষ, সেলাইয়ের কল, হ্যারিকেন-লণ্ঠন, হোটেলের নাম লেখা স্যুটকেশ সব-কিছুই ছবির ইমারতী বাঁধনকে দৃঢ়তর করেছে। কোথাও অসংলগ্নতা বা বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায় না। নির্মিতির দিক দিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যেমন উপাদান সংগ্রহ করেছেন তেমনি পরম্পরা থেকে অনুরূপ উপাদান আত্মসাৎ করতে

তিনি দ্বিধা করেন নি। নির্মাণধর্মীগুণ যথেষ্ট থাকলেও বর্ণব্যঞ্জনাই এই চিত্রাবলীর সর্বপ্রধান সম্পদ। আতপ্ত বর্ণকে আশ্রয় করে প্রতিটি আকার দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। Tone, hue ইত্যাদি ইউরোপীয় বর্ণ-রীতির গুণ, অপর দিকে তীব্র বর্ণের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সংঘাত, শব্দের ওঠা-নামার মতো চিত্রের প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান।

জীবনের প্রাণময় রূপ যেমন আমরা অনুভব করি আলোর সাহায্যে তেমনি অবনীন্দ্রনাথের আরব্য উপন্যাসের চিত্রিত জীবনপ্রবাহকে আমরা অনুভব করি বর্ণোজ্জ্বল আলোকের পথে। যে আভিজাত্যের পরিবেশ এ পর্যন্ত তাঁর রচনায় প্রকাশিত হয়েছিল তার পরিবর্তন যেমন দেখা দিয়েছিল জীবনে, শিল্পে তেমনি দেখা দিল নূতন যুগ।

'কৃষ্ণমঙ্গল' সিরিজ, 'কবিকঙ্কণ' সিরিজ যখন রচনা করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, তখন ভাবলোক থেকে কঠিন আকার সম্বন্ধে শিল্পী অনেক বেশি সচেতন। মনে হয় যেন শিল্পীর সকল উপলব্ধি দৃঢ়বদ্ধ রঞ্জিত আকারে রূপান্তরিত হয়েছে। উজ্জ্বল সংঘাতপূর্ণ বর্ণের প্রয়োগে এই সময়ের চিত্র রঞ্জিত মূর্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। পশুপক্ষী, মানুষ, গাছ একত্রিত হয়ে প্রাণময় গতিপ্রবাহ এই সময়ের রচনার সর্বপ্রধান আবেদন। এই গতিপ্রবাহকে উজ্জ্বল করে তোলার প্রয়োজনে অথবা শিল্পীর তৎকালীন মানসিক অবস্থার কারণে এই চিত্রাবলীর নানা স্থানে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে বহুবার। এই চিত্রাবলী রচনার কালে অবনীন্দ্রনাথ আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করেন নি। মেজাজ অনুযায়ী জলরঙ, প্যাস্টেল, চারকোল মিশিয়ে দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। এই রচনাবলীর সর্বপ্রধান আবেদন আকার। এই কারণেই আকারগত লক্ষণ সম্বন্ধে আরো একটু আলোচনার প্রয়োজন।

এই-সব রচনাতে আকারের যে সরলতা সেটি বিশ্লেষণের দ্বারা আবিষ্কৃত নয়। অপর দিকে ভাব প্রকাশের অবলম্বন রূপেও এই আকার নির্মিত হয় নি। এইজন্য এই সময়ের রচনাকে ধারণামূলক সৃষ্টি বলেই চিহ্নিত করা সংগত। অবনীন্দ্রনাথের রূপসৃষ্টিতে এই ধারণামূলক উপলব্ধি নানা কারণে আচ্ছন্ন হয়েছে এবং প্রেরণার পথে সেটি উদ্ধার করেছেন শিল্পী। তাঁর নিজের উদ্ভাবিত স্টাইলের সঙ্গে এই-সব রচনার পার্থক্য সুস্পষ্ট। এই-সব চিত্র রচনাকালে অবনীন্দ্রনাথ যে অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন সেক্ষেত্রে বিষয়াশ্রিত বস্তু, ভাব অপেক্ষা ভঙ্গী, বর্ণের তরলতা অপেক্ষা কঠিনতা, মাধুর্য অপেক্ষা গাম্ভীর্য দর্শকের মনে যে ভাব জাগায় সেখানে আবেগ সর্বপ্রধান। বুদ্ধিমার্গীয় চিন্তার কোনো অবকাশ নেই।

সারাজীবনের স্মৃতিজড়িত জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে অপরিচিত জীবন শুরু হওয়ার প্রাক্‌কালে অবনীন্দ্রনাথ ছবি ছেড়ে খেলনা তৈরিতে মন দেন। তার পর বরানগরের বাড়িতে অথবা বিশ্বভারতীর আচার্যপদের দায়িত্বের মধ্যে খেলনা তৈরির কাজ তাঁর বন্ধ হয় নি। বলা যেতে পারে, জীবনের শেষ দশ বৎসর তাঁর প্রধান সৃষ্টি খেলনা। বাড়ির বাগানে অথবা শান্তিনিকেতনের মাঠে প্রাতর্ভ্রমণকালে তিনি সংগ্রহ করতেন খেলনা তৈরির উপকরণ। গাছের শুকনো ডাল, ফলের বীজ, কাঠের টুকরো এমনি বিভিন্ন উপকরণের সংযোগে ঘরে বসে নির্মাণ করতেন বিচিত্র আকার। বিচিত্র বস্তুর সংযোগ ও ভঙ্গুর লক্ষণ থেকেই সম্ভবত অবনীন্দ্রনাথ এগুলিকে খেলনা বলেছেন এবং নাম দিয়েছিলেন 'কাটুম-কুটুম'। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে বিচারবুদ্ধি-বর্জিত শিশুসুলভ আনন্দের প্রকাশ শিল্পের ক্ষেত্রে কমে এসেছে। অবনীন্দ্রনাথের এই খেলনাগুলির মধ্যে সেই লুপ্তপ্রায় শিশুজনোচিত অহেতুক আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। এ দিক দিয়ে তাঁর

মানসিক গঠনের সঙ্গে এগুলির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ইমারতী বাহার ও অনবদ্য তাল মান, বিচিত্র ভঙ্গী ও অপ্রত্যাশিত টেক্‌স্‌চারের সমাবেশ এই রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য। অবনীন্দ্রনাথের কারিগরীসুলভ দক্ষতা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের সাক্ষ্য পাওয়া যাবে এই খেলনাগুলির প্রতি অংশে। ভঙ্গুর উপাদান এবং নির্মিত রূপের স্থিতিশীলতা উভয় দিকের সংযোগে যে চাপা উত্তেজনা (tension) প্রকাশ পেয়েছে সেটিকে এই খেলনার অন্তর্নিহিতগুণ বলা যেতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ ভঙ্গুর উপাদানের সাহায্যে যখন এই খেলনাগুলি তৈরি করেছিলেন তখন এইগুলির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ নিশ্চয়ই ছিল না। উপাদানের ভঙ্গুরতা সত্ত্বেও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার বিশিষ্ট নিদর্শন রূপেই 'কাটুম-কুটুম' খেলনা স্মরণীয়।

খেলনা তৈরির ফাঁকে ফাঁকে অবনীন্দ্রনাথ খেলার ছলেই যে-সব ছবি করেছিলেন সে ক্ষেত্রে অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি কিছু কিছু থাকলেও বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনার অভাব নেই। বিশেষভাবে আচার্যরূপে যখন তিনি শান্তিনিকেতনে বাস করছিলেন সেই সময় তিনি বহু ছবি এঁকেছেন। এ-সব ছবিতে কোথাও কোথাও প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রথম জীবনের ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাব, মোগল শৈলীর প্রভাব। অটোগ্রাফের মতো এইগুলি রচিত হয়েছিল এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে তিনি এই-সব ছবি বিতরণ করেছিলেন। এই সকলের অনেকগুলি রচনার মধ্যে আঙ্গিকের খেলাই প্রধান। অপর দিকে 'কবিকঙ্কণ' 'কৃষ্ণমঙ্গল' সিরিজের অনুরূপ রচনা পাওয়া যাবে যথেষ্ট। 'Deer and the Crow', 'The Donkey', 'Procession', 'The lost child' ইত্যাদি ছবিতে অবনীন্দ্রনাথের তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গি অনায়াসে অনুসরণ করা যায়। কোনো সমস্যা সমাধানের ইচ্ছা নিয়েই যে ছবিগুলি রচিত হয় নি তা বলাই বাহুল্য। ভঙ্গি ও গতির ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যাবে এই-সব ছবিতে।

এই সময়ে করা প্যাস্টেল প্রতিকৃতিগুলি তাঁর পূর্বের প্যাস্টেল ড্রইং-এর স্বগোত্রীয় বলা চলে। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ দরকার।

অবনীন্দ্রনাথ প্রতিকৃতি অঙ্কনের অভ্যাস কোনো দিনই ত্যাগ করেন নি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি প্রথম জীবনের প্যাস্টেল ড্রইং থেকেশুরু করে শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর রচিত প্রতিকৃতির সংখ্যা কম নয়। যে-কোনো কারণেই হোক অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত প্যাস্টেল ড্রইংগুলিকে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেন নি। প্রতিকৃতি শিল্পীরূপে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় যেমন এই প্যাস্টেল ড্রইংগুলিতে পাওয়া যায় তেমনি তাঁর মৌলিক রচনার সঙ্গে এই প্রতিকৃতিগুলির সম্বন্ধওঅতি ঘনিষ্ঠ, কারণ প্যাস্টেল প্রতিকৃতির অভিজ্ঞতা তিনি বারংবার প্রয়োগ করেছেন মুখমণ্ডলের আকার-প্রকার প্রবর্তনের ফলে। মানবীয় ভাব অবনীন্দ্রনাথের জীবনে প্রধান অবলম্বন ছিল বলেই সম্ভবত মুখমণ্ডলের আবেদন তাঁর কাছে এত তীব্র ছিল। আঙ্গিকের দিক দিয়ে প্যাস্টেল রঙের স্তরভেদ অপেক্ষা ঘষে কাজ করার লক্ষণ অধিকাংশ প্যাস্টেল ড্রইংএর বৈশিষ্ট্য। 'Kamini', 'My grandson' পরবর্তীকালের এই দুই রচনার সাহায্যে অবনীন্দ্রনাথের প্যাস্টেল ব্যবহারের রীতি-পদ্ধতি বুঝতে অসুবিধা হয় না। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে তাঁর আঙ্গিকের বিবর্তন নানা সময়ে দেখা দিয়েছে। কেবল প্যাস্টেল ড্রইংএর ক্ষেত্রে আঙ্গিকগত বিবর্তন দৈবাৎ লক্ষ্য করা যায়।

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন 'শিল্পীর ধ্যান চোখ চেয়ে, চোখ বন্ধ করে নয়।' তাঁর এই উক্তির সমর্থকরূপে গ্রহণ করা চলে তাঁর প্রতিকৃতিগুলি।

শিল্পের ভাষাগত উপাদানের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে শিল্পরূপ। এইজন্যই ভাষাগত উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা বাদ দিয়ে শিল্পরূপের সম্পূর্ণ পরিচয় সম্ভব নয়। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই ভাষাগত উপাদানের সংযোগ ঘটে ভিন্ন ভিন্ন পথে এবং আত্মপ্রকাশ করে শিল্পের নূতন নূতন রূপ। যে শ্রেণীর শিল্পী পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ গ্রহণ করেন তাঁদের আঙ্গিকের জটিলতা একটি বিশেষ লক্ষণ রূপে প্রকাশ পায়। অপর দিকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির পথে যে শিল্পী এগিয়ে চলতে চান তাঁর ক্ষেত্রে আঙ্গিক অপেক্ষাকৃত সরল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অবনীন্দ্রনাথের ভাষা সরল ও সাবলীল। অবনীন্দ্রনাথ রূপসাদৃশ্যকে সকল সময়েই স্বীকার করেছিলেন, অপর দিকে বস্তু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তিনি গ্রহণ করেন নি। ভাবব্যঞ্জক গতিভঙ্গি তাঁর রূপ নির্মাণের সর্বপ্রধান উপাদান। ভারতীয় পরম্পরা থেকে রূপ-ছন্দের উপাদান যেমন তিনি গ্রহণ করেছিলেন তেমনি বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেই উপাদানগুলিকে একটি অভিনবত্ব দিতে তিনি প্রয়াস করেছিলেন। বর্ণ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় শিল্পের উপাদান তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষভাবে তাঁর প্রবর্তিত 'ওয়াশ' পদ্ধতিতে ইউরোপীয় বর্ণ-প্রয়োগ-রীতির ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। উজ্জ্বল বর্ণের স্তরবিন্যাসের পরে স্বচ্ছ রঙের আচ্ছাদন দেওয়া এবং মোছার কাজ তিনি যেভাবে করতেন তার সঙ্গে অয়েল পেন্টিং এর glazing এর তুলনা সংগত। বর্ণ প্রয়োগের এই স্টাইল শিল্পীর মতি মেজাজ অনুযায়ী এতই পরিবর্তিত হত যে অপরের পক্ষে সেটি যথাযথ অনুসরণ করা সম্ভব হয় নি। অবনীন্দ্রনাথের বর্ণযুক্ত রেখা অনেক পরিমাণে রীতিধর্মী। প্রধানত মোগল চিত্রের পরম্পরা থেকেই তিনি রেখাত্মক গুণ গ্রহণ করেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অনুবর্তীদের আত্মিক যোগ অতি ঘনিষ্ঠ থাকলেও প্রথম অনুবর্তীদের রচনার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পার্থক্য যথেষ্ট। এই পার্থক্যের সর্বপ্রধান কারণ অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি। শিখিয়ে-পড়িয়ে শিল্পী তৈরি হয় না; শিল্প-দৃষ্টি অনুযায়ী শিল্পী নিজের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে নেবে এই ধারণা থাকার কারণে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। আঙ্গিকগত শিক্ষার বাঁধা পথ তিনি অনুসরণ করেন নি। অবনীন্দ্রনাথ নিজে যেমন একান্তভাবে কোনো পরম্পরাকে আঁকড়ে থাকেন নি তেমনি তাঁর অনুবর্তীদের পরম্পরা অপেক্ষা অন্তরের উপলব্ধিকে অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর এই উদার শিক্ষানীতির প্রভাবে অতি অল্পকালের মধ্যে ভারতের সর্বত্র শিল্প-জাগরণ সম্ভব হয়েছিল। ভারতীয় পরম্পরার পুনঃপ্রবর্তন অপেক্ষা শিল্পীমনকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব সবচেয়ে শক্তিশালী। অবনীন্দ্রনাথের অনুবর্তীদের মধ্যে অঙ্গিকগত দক্ষতা অর্জনের প্রয়াস যেমন আছে তেমনি লক্ষ্য করা যাবে আঙ্গিক সম্বন্ধে অহেতুক উদাসীনতা। এই দুই লক্ষণ থেকে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত শিক্ষানীতির প্রভাব।

অবনীন্দ্রনাথ শিল্পসাধনার পথে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতারই কয়েকটি প্রক্ষেপ তাঁর শিক্ষানীতি। অনুরূপ প্রক্ষেপ পাওয়া যায় তাঁর শিল্পচিন্তার ক্ষেত্রে। অবনীন্দ্র-প্রতিভার এই তিন আয়তনের সর্বত্র তিনি তাঁর প্রতিভার দ্বারাই চালিত হয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথ শিল্পসৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করে যখন দেখেছিলেন সেই সময় জাতীয়তাবাদী তাঁর মন তাঁর সেই আদর্শকে জাতীয়তা ও পরম্পরার দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিল। অবনীন্দ্র-প্রভাবের উপরোক্ত দুই প্রকাশ ও তার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে ভারতীয় শিল্পের

নব-জাগরণের ইতিহাস।

কলোনিয়াল আর্টের প্রভাবে ভারতবর্ষ যে সময় আচ্ছন্ন ছিল সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ শিল্পজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। অবনীন্দ্রনাথ যখন শিল্পের ভাষা ও ভাবের সমন্বয়ে শিল্পের অন্তর্লোক অনুসন্ধানের প্রয়াস করেছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই ইউরোপের শিল্পধারা চলেছিল সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। অবনীন্দ্রনাথ যখন ভেবেছেন ভাবসাদৃশ্যের লাবণ্যের কথা তখন ইউরোপের শিল্পী ঠিক সেই সেই গুণগুলিকেই বর্জন করে বিমূর্ত বিশুদ্ধ শিল্পরূপ নির্মাণের প্রয়াস করেছিলেন। ইউরোপের এই প্রয়াস experession মূলক শিল্পচেষ্টামাত্রকেই সার্থক শিল্পসৃষ্টির প্রতিবন্ধক বলে মনে করেছিল। কাজেই বলা যেতে পারে অবনীন্দ্রনাথ যখন শিল্পের জগতে আত্মপ্রকাশ করলেন ঠিক সেই সময় স্থূল বাস্তবতা ও বিমূর্ত শিল্পরীতির দ্বন্দ্ব চলেছে সর্বত্র। অবনীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ বিমূর্ত রূপ নির্মাণ অপেক্ষা বহু উপাদানে মিশ্রিত শিল্পরূপ নির্মাণের প্রয়াস করেছিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পথে যেমন জীবনের অখণ্ডতার উপলব্ধি হয়ে থাকে তেমনি অবনীন্দ্রনাথের শিল্প বহুবিধ পরিচিত উপাদানের সাহায্যে মনের গভীর উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝখানে আলোক-উজ্জ্বল জীবনের লীলা অবনীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন, সম্ভবত এই কারণে তাঁর রচনাতে ধারাবাহিকতার লক্ষণ বারংবার আত্মপ্রকাশ করেছে। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মনোভাবের সঙ্গে উপরোক্ত লক্ষণের সম্বন্ধ যে ঘনিষ্ঠ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের জীবন ভারতের সহজিয়া সাধকদের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কারণ তাঁর শিল্প ও শিল্পচিন্তা অনায়াসে আত্মপ্রকাশ করেছে। তথ্যের ভারে তাঁর জীবনের কোনো অংশই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি। তাঁর প্রতিভার এই সহজ গতি আধুনিক কালের ইতিহাসে দৈবাৎ লক্ষ্য করা যাবে।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের রচনার পঞ্জী

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

[বিশ্বভারতী পত্রিকার পূর্বতন অবনীন্দ্রসংখ্যায় (ষোড়শ বর্ষ, সংখ্যা ২-৩, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ) মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় সাময়িক পত্রে মুদ্রিত অবনীন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জী ও অবনীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকা -সংবলিত বিভিন্ন লেখকের বইয়ের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। 'এই কাজে প্রথমে হাত লাগান আমার ভাই শোভনলাল, পরে প্রধানত বন্ধুবর শ্রীসনৎকুমার গুপ্তের প্রচেষ্টাতেই… রচনাসূচীটি মোটামুটি সম্পূর্ণ' হয়।

'রচনাসূচীটি প্রকাশের কালানুক্রমে সাজানো। রচনার নাম, বিষয়, প্রকাশের তারিখ, কোন্ পত্রিকায় এবং যে-রচনাগুলি পরে অবনীন্দ্রনাথের গ্রন্থভুক্ত হয়েছে তারও নির্দেশ দেওয়া আছে। ·· ॥ চিহ্নের পর গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে।'

এই তালিকায় যে কিছু অসম্পূর্ণতা আছে সে-বিষয়েও মোহনলাল উল্লেখ করেন। 'সংগ্রহের প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও অধুনা দুষ্প্রাপ্য কোনো কোনো সাময়িক পত্র যাতে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বলে জানা আছে— তা আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি।' তৎসত্ত্বেও সাড়ে তিনশো'র উপর রচনা পঞ্জীভুক্ত হয়।

অতঃপর শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় পূর্বোক্ত তালিকায় অনুল্লিখিত অন্যান্য রচনার সন্ধান করতে থাকেন। এই অনুসন্ধানে শ্রীঅনাথনাথ দাস তাঁর সহযোগিতা করেন। এরমধ্যে এঁরা আরো একশোর অধিক রচনার নাম সংকলিত করেন। পূর্বপ্রকাশিত পঞ্জীর সঙ্গে এই-সব নবসংকলিত রচনার সূচী যোগ করে বর্তমান তালিকাটি প্রকাশ করা হল। এখন মোট রচনার সংখ্যা দাঁড়াল ৪৬৬টি। কোনো কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত রচনাও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হল।

পূর্বতন তালিকায় অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকা -সংবলিত অপর লেখকের গ্রন্থের উল্লেখ ছিল ৫টি, বর্তমান তালিকায় ১০টি নতুন সংযোজিত হয়ে মোট গ্রন্থসংখ্যা হয়েছে ১৫টি।

পূর্বের তালিকায় অনেকগুলি ত্রুটি বর্তমান তালিকায় মোচন করা হয়েছে।

'বিজলী' থেকে লেখার সূচী সংগ্রহ করে দিয়ে বিশেষ আনুকূল্য করেছেন শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।

বর্তমান তালিকাটিকেও সম্পূর্ণ বলা চলে না। আশা করা যায় অবনীন্দ্রসাহিত্যানুরাগীদের চেষ্টায় এটি ক্রমশ সম্পূর্ণ হবে। ইতিমধ্যে এই তালিকাটি তাঁদের প্রয়োজন অনেকাংশে পূর্ণ করবে।]

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনাপঞ্জী

১ দেবীপ্রতিমা। গল্প। ভারতী ১৩০৫ শ্রাবণ

২ চাঁদনী। গল্প। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 'ছেলে ও ছবি' ১৩০৬ ॥ অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন ॥ *রচনাবলী ৩

৩ কানকাটা রাজার দেশ। গল্প। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 'ছেলে ও ছবি' ১৩০৬ ॥ রং-বেরং ॥ রচনাবলী ৩

---

*রচনাবলী= অবনীন্দ্র রচনাবলী

৪ শিলাদিত্য। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১১ বৈশাখ ॥ রাজকাহিনী প্রথম খণ্ড ॥ রচনাবলী ২

৫ গোহ। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ ॥ রাজকাহিনী, প্রথম খণ্ড ॥ রচনাবলী ২

৬ বাপ্পাদিত্য। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১১ শ্রাবণ ॥ রাজকাহিনী, প্রথম খণ্ড ॥ রচনাবলী ২

৭ পদ্মিনী। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১১ আশ্বিন ॥ রাজকাহিনী, প্রথম খণ্ড ॥ রচনাবলী ২

৮ আলেখ্য। গল্প। ভারতী ১৩১২ বৈশাখ ॥ রচনাবলী ২

৯ স্বস্তিবচন[১]। পদ্য। ভারতী ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ

১০ প্রশ্নোত্তর[২]। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভাণ্ডার ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ

১১ ভারতীয় শিল্পের আদর ও অনাদর[৩]। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। জাহ্নবী ১৩১৩ বৈশাখ

১২ স্বর্গীয় রবিবর্মা। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩১৩ পৌষ

১৩ বিজাতীয় রকমে স্বদেশোন্নতি[৪]। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩১৩ ফাল্গুন

১৪ আর্ট ও আর্টিস্ট। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। শিল্প ও সাহিত্য ১৩১৩ ফাল্গুন-চৈত্র ॥ ভারতশিল্প

১৫ গ্রন্থসমালোচনা[৫]। গ্রন্থসমালোচনা। প্রবাসী ১৩১৩ চৈত্র

১৬ মানসচর্চা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গদর্শন ১৩১৪ কার্তিক ॥ ভারতশিল্প

১৭ অরিসিংহ[৬]। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১৫ বৈশাখ ॥ রাজকাহিনী, দ্বিতীয় খণ্ড ॥ রচনাবলী ২

১৮ হাম্বির[৭]। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১৫ ভাদ্র ॥ রাজকাহিনী, দ্বিতীয় খণ্ড ॥ রচনাবলী ২

১৯ হাম্বির[৮] গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১৫ আশ্বিন ॥ রাজকাহিনী, দ্বিতীয় খণ্ড ॥ রচনাবলী ২

২০ আলপাকা বৃত্তান্ত। প্রবন্ধ। সুপ্রভাত ১৩১৫ আশ্বিন

২১ কি ও কেন। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৫ কার্তিক ॥ ভারতশিল্প

২২ স্পষ্ট কথা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৫ ফাল্গুন ॥ ভারতশিল্প

২৩ পরিচয়। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৫ চৈত্র ॥ ভারতশিল্প

২৪ আইনে চীন-ই। গল্প। ভারতী ১৩১৬ বৈশাখ ॥ রচনাবলী ২

---

১ ভারতেশ্বরের আমন্ত্রণে মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের বিলাত যাত্রা উপলক্ষে রচিত।

২ গভর্নমেন্ট শিল্পবিদ্যালয়ে সংগৃহীত বিলাতী ছবি নিলামে বিক্রয় এবং সেখানে দেশীয় চিত্রশিল্প চর্চার আয়োজন প্রসঙ্গে ভাণ্ডার ১৩১২ সালে বৈশাখ সংখ্যায় একটি প্রশ্ন করা হয়। এই প্রশ্নের অন্যতম উত্তরদাতা অবনীন্দ্রনাথ।

৩ কলিকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ১৯০৬ সালে গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে পঠিত। ভাণ্ডার ১৩১৩ আষাঢ় সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

৪ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত 'সর্ববিষয়ে স্বদেশী', প্রবাসী ১৩১৩ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে লিখিত।

৫ দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'সতী বেহুলা ও ফুল্লরা' পুস্তকের সমালোচনা।

৬ রাজকাহিনীতে 'হাম্বির' গল্পের প্রথমাংশ।

৭ রাজকাহিনীতে 'হাম্বির' গল্পের শেষাংশ।

৮ রাজকাহিনীতে 'হাম্বিরের রাজ্যলাভ'।

২৫ হাফেজ। পদ্য। ভারতী ১৩১৬ বৈশাখ-শ্রাবণ
২৬ নামকরণ রহস্য[৯]। প্রবন্ধ। বঙ্গদর্শন ১৩১৬ বৈশাখ
২৭ কলঙ্কভঞ্জন[১০]। পত্র : আলোচনা। প্রবাসী ১৩১৬ বৈশাখ
২৮ শিল্পের ত্রিধারা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৬ আষাঢ় ॥ ভারতশিল্প
২৯ পান্থ হাফেজ। পদ্য। দেবালয় ১৩১৬ শ্রাবণ
৩০ শিল্পের দেবতা[১১]। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবাসী ১৩১৬ কার্তিক
৩১ গঙ্গাযমুনা। গল্প। ভারতী ১৩১৬ পৌষ
৩২ পত্র[১২]। পত্র। প্রবাসী ১৩১৬ পৌষ
৩৩ শিল্পে ভক্তিমন্ত্র। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৭ জ্যৈষ্ঠ
৩৪ হাফেজ। পদ্য। দেবালয় ১৩১৭ অগ্রহায়ণ
৩৫ ভাবসাধন। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৭ অগ্রহায়ণ
৩৬ কালোর আলো। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৮ বৈশাখ
৩৭ অবনীন্দ্রবাবুর পত্র[১৩]। পত্র : স্মৃতিমূলক। ভারতী ১৩১৮ জ্যৈষ্ঠ ॥ রচনাবলী ১
৩৮ দুই দিক। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩১৮ আশ্বিন
৩৯ পুরী-মাহাত্ম্য। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ
৪০ টাইটানিকের হিসাব নিকাশ[১৪]। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩১৯ শ্রাবণ
৪১ জয়শ্রী। গল্প। ভারতী ১৩১৯ কার্তিক ॥ রচনাবলী ২
৪২ সূত্রপাত। গল্প। ভারতী ১৩১৯ অগ্রহায়ণ ॥ রচনাবলী ২
৪৩ বাপুস্টা। গল্প। ভারতী ১৩১৯ পৌষ ॥ রচনাবলী ২
৪৪ উদয়াস্ত। গল্প। ভারতী ১৩১৯ ফাল্গুন ॥ রচনাবলী ২
৪৫ যুগ্মতারা[১৫]। গল্প। ভারতী ১৩২০ বৈশাখ ॥ রচনাবলী ২
৪৬ কানাকড়ি[১৬]। পত্র : শিল্পবিষয়ক। প্রবাসী ১৩২০ শ্রাবণ
৪৭ প্রাণপ্রতিষ্ঠা। প্রবন্ধ, সচিত্র। ভারতী ১৩২০ আশ্বিন

---

৯ শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন' চিত্রের প্রতিবাদস্বরূপ এই কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তিহীনতার বিষয় আলোচনা করে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বঙ্গদর্শন ১৩১৫ পৌষ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। বর্তমান প্রবন্ধে শিল্পকলার দিক থেকে চিত্রটির নামকরণ সমর্থন করা হয়েছে।

১০ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন' চিত্রের প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিত প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরেই রচিত।

১১ কলিকাতা গভর্নমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ের পূজার ছুটি আরম্ভ উপলক্ষে ছাত্রদের প্রতি অভিভাষণ।

১২ স্বর্গত শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্বন্ধে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র। বিবিধ প্রসঙ্গে উদ্‌ধৃত।

১৩ অসিতকুমার হালদার লিখিত 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভারতীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি' প্রবন্ধের অন্তর্গত।

১৪ প্রত্যহ ১৩৫৩ শারদীয়া সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে মুদ্রিত।

১৫ প্রবাসী ১৩২০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

১৬ শ্রী নগদ ক্রেতা ছদ্মনামে লিখিত।

৪৮ পত্তন[১৭]। গ্রন্থসমালোচনা। প্রবাসী ১৩২০ আশ্বিন

৪৯ গোরিয়াঁ। গল্প। ভারতী ১৩২০ আশ্বিন ॥ রচনাবলী ২

৫০ স্বর্গগত শ্রীমদ্ ওকাকুরা। স্মৃতিকথা। ভারতী ১৩২০ কার্তিক ॥ রচনাবলী, ১

৫১ সুঁয্যিমামার ঘর। প্রবন্ধ। সন্দেশ ১৩২০ অগ্রহায়ণ-পৌষ

৫২ মূর্তি। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবাসী ১৩২০ পৌষ-মাঘ ॥ ভারতশিল্পে মূর্তি : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

৫৩ যাওয়া-আসা। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩২০ ফাল্গুন

৫৪ শেষ বোঝা। চিত্রপরিচয়। প্রবাসী ১৩২০ ফাল্গুন

৫৫ সমালোচনা[১৭ক]। ভারতী ১৩২০ চৈত্র

৫৬ চিত্রের পরিচয়। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২১ বৈশাখ

৫৭ গমনাগমন। ভ্রমণবৃত্তান্ত। সবুজপত্র ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ ॥ পথে বিপথে

৫৮ চিত্রে ছন্দ ও রস। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ ॥ ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

৫৯ ভারতষড়ঙ্গ। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২১ আষাঢ় ॥ ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

৬০ ষড়ঙ্গদর্শন। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২১ শ্রাবণ ॥ ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

৬১ নালক। গল্প। ভারতী ১৩২২ বৈশাখ-ভাদ্র ॥ নালক ॥ রচনাবলী ২

৬২ পথে পথে[১৮]। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ

৬৩ কালো ফুল। গল্প। ভারতী ১৩২২ আশ্বিন

৬৪ আদ্দিকালের ছবি। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২২ কার্তিক

৬৫ ফাল্গুনী। ফাল্গুনী অভিনয়ের আলোচনা। প্রবাসী ১৩২২ ফাল্গুন

৬৬ নিষ্ক্রমণ। ভ্রমণবৃত্তান্ত। ভারতী ১৩২২ চৈত্র ॥ পথে বিপথে

৬৭ আরোহণ। ভ্রমণবৃত্তান্ত। ভারতী ১৩২৩ বৈশাখ ॥ পথে বিপথে

৬৮ ভারতীর ছবি। স্মৃতিকথা। ভারতী ১৩২৩ বৈশাখ ॥ রচনাবলী ১

৬৯ বিচরণ। ভ্রমণবৃত্তান্ত। ভারতী ১৩২৩ আষাঢ় ॥ পথে বিপথে

৭০ চৈতন চুটকী। গল্প। ভারতী ১৩২৩ আশ্বিন ॥ রচনাবলী ২

৭১ মোহিনী। গল্প। ভারতী ১৩২৩ চৈত্র ॥ পথে বিপথে

৭২ মাতু। গল্প। ভারতী ১৩২৪ বৈশাখ ॥ পথে বিপথে

৭৩ গুরুজী। গল্প। ভারতী ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ ॥ পথে বিপথে

---

১৭ E. B. Havell -লিখিত *Indian Architecture : Its Psychology, Structure and History from the first Muhammedan Invasion to the Present Day* গ্রন্থের সমালোচনা।

১৭ক মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় -লিখিত *Orissa and Her Remains* গ্রন্থের সমালোচনা।

১৮ প্রবাসী ১৩২২ আষাঢ় সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

৭৪ শেমুষী। গল্প। ভারতী ১৩২৪ আষাঢ় ॥ পথে বিপথে
৭৫ অস্থি। গল্প। ভারতী ১৩২৪ শ্রাবণ ॥ পথে বিপথে
৭৬ টুপী। গল্প। ভারতী ১৩২৪ ভাদ্র ॥ পথে বিপথে
৭৭ দোশালা। গল্প। ভারতী ১৩২৪ আশ্বিন ॥ পথে বিপথে
৭৮ ইন্দু। গল্প। ভারতী ১৩২৪ কার্তিক ॥ পথে বিপথে
৭৯ অরোরা। গল্প। ভারতী ১৩২৪ অগ্রহায়ণ ॥ পথে বিপথে
৮০ পর-ঈ-তাউস। গল্প। ভারতী ১৩২৪ পৌষ ॥ পথে বিপথে
৮১ ছাইভস্ম। গল্প। ভারতী ১৩২৪ মাঘ ॥ পথে বিপথে
৮২ লুকিবিন্দে। গল্প। ভারতী ১৩২৪ ফাল্গুন ॥ পথে বিপথে
৮৩ রূপরেখা[১৯]। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ
৮৪ শিল্প ও শিল্পী[২০]। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ
৮৫ চণ্ড। গল্প : ঐতিহাসিক। পার্বণী ১৩২৫ ॥ রাজকাহিনী, দ্বিতীয় খণ্ড ॥ রচনাবলী ২
৮৬ আলপনা। প্রবন্ধ। পার্বণী ১৩২৫
৮৭ শিব সদাগর। নাটক। আগমনী ১৩২৫ ॥ রং-বেরং
৮৮ বাংলার ব্রত। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৫ কার্তিক-ফাল্গুন ॥ বাংলার ব্রত : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ
৮৯ পাটেল বিল[২১]। প্রবন্ধ। সবুজপত্র ১৩২৫ মাঘ
৯০ মাতৃগুপ্ত। গল্প। ভারতী ১৩২৫ চৈত্র ॥ রচনাবলী ২
৯১ তোরমান। গল্প। ভারতী ১৩২৬ বৈশাখ ॥ রচনাবলী ২
৯২ আলোর ফুলকি। উপন্যাস। ভারতী ১৩২৬ বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ॥ আলোর ফুলকি ॥ রচনাবলী ৩
৯৩ কোটরা। গল্প। ভারতী ১৩২৬ আশ্বিন
৯৪ দারুব্রহ্মের ইতিকথা ও উপকথা। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৬ পৌষ
৯৫ উনো ও দুনো[২২]। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৬ ফাল্গুন
৯৬ রং-বেরং। নাটক। ভারতী ১৩২৭ বৈশাখ
৯৭ নোয়ার কিস্তি। নাটক। ভারতী ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়
৯৮ রাণাকুম্ভ। গল্প : ঐতিহাসিক। রংমশাল ১৩২৭ ॥ রাজকাহিনী, দ্বিতীয় খণ্ড ॥ রচনাবলী ২
৯৯ রাসধারী। নাটক। পার্বণী ১৩২৭ ॥ একে তিন তিনে এক
১০০ গঙ্গাফড়িং। গল্প। পার্বণী ১৩২৭ ॥ একে তিন তিনে এক ॥ রচনাবলী ২
১০১ খাতাঞ্চির খাতা। উপন্যাস। সন্দেশ ১৩২৭ বৈশাখ-মাঘ ॥ খাতাঞ্চির খাতা ॥ রচনাবলী ৩

---

১৯ ৮ ফাল্গুন ১৩২৪ তারিখে বিচিত্রা ক্লাবে পঠিত।

২০ ২৪ মাঘ ১৩২৪ তারিখে বিচিত্রা ক্লাবে পঠিত।

২১ কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল্-এ 'পাটেল বিল'-এর সমর্থনে সভাপতির বক্তৃতা। ভারতী ও প্রবাসীতে ১৩২৫ ফাল্গুন সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

২২ হাইল্যাণ্ড ডিবেটিং ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

১০২ বুড়ো আংলা। উপন্যাস। মৌচাক ১৩২৭-১৩২৮ ॥ বুড়ো আংলা ॥ রচনাবলী ৩

১০৩ জেস্ত সভা বা জন্তুজাতীয় মহাসমিতি। গল্প। ভারতী ১৩২৭ কার্তিক ॥ রং-বেরং ॥ রচনাবলী ২

১০৪ বারোয়ারি উপন্যাস। উপন্যাসাংশ। ভারতী ১৩২৭ কার্তিক ॥ বারোয়ারি উপন্যাস

১০৫ রস ও নীরস। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৭ পৌষ

১০৬ ধরা পড়া। নাটক। শিক্ষক ১৩২৮ আষাঢ় ॥ একে তিন তিনে এক

১০৭ দেবীর বাহন[২৩]। গল্প। ইতিহাস ও আলোচনা ১৩২৮ ভাদ্র ॥ রং-বেরং ॥ রচনাবলী ২

১০৮ ভায়ে-ভায়ে [২৪]। গল্প : ঐতিহাসিক। রংমশাল ১৩২৮ ॥ রাজকাহিনী, দ্বিতীয় খণ্ড ॥ রচনাবলী ২

১০৯ আলো আঁধারে। গল্প। ভারতী ১৩২৮ কার্তিক

১১০ চুরাশিলাথ। মোসলেম ভারত ১৩২৮ কার্তিক

১১১ শিল্পের অন্ধকার যুগ। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবর্তক ১৩২৮ মাঘ

১১২ বাণী ও বীণা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবর্তক ১৩২৮ ফাল্গুন

১১৩ শিল্পে অনধিকার [২৫]। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৮ ফাল্গুন ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১১৪ শিল্পের অধিকার। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৮ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১১৫ সঙ্গীতের পথ। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৯ বৈশাখ

১১৬ দৃষ্টি ও সৃষ্টি।[২৬] প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ॥ বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী

১১৭ এক যে ছিল বাগান। স্মৃতিকথা। প্রবর্তক ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ

১১৮ ছবি ও সুর। কথিকা। ভারতী ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ

১১৯ গভীরে-গম্ভীরে। রচনা। শ্রেয়সী ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ

১২০ শিল্প ও ভাষা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ আষাঢ় ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১২১ তালাসী। প্রবন্ধ : প্রবর্তক ১৩২৯ আষাঢ়

১২২ দুই লাইন। কথিকা। ভারতী ১৩২৯ আষাঢ়

১২৩ সত্যেন্দ্র। স্মৃতিকথা। ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ ॥ রচনাবলী ১

১২৪ শিল্পের সচলতা ও অচলতা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ শ্রাবণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১২৫ রঙ্গালয়ের রঙ্গিন আলো।[২৭] প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৯ ভাদ্র

---

২৩ ছোটদের মাধুকরী ১৩৪৫ পুজা বার্ষিকীতে পুনর্মুদ্রিত।

২৪ রাজকাহিনীতে 'সংগ্রামসিংহ' নামে মুদ্রিত।

২৫ প্রবর্তক ১৩২৮ ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যাতে পুনর্মুদ্রিত।

২৬ ভারতী জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৯ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

২৭ নাট্যশিল্পী অমরনাথ রায়ের স্মৃতিসভায় সভাপতির অভিভাষণ, শিশির ১৩৬৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

১২৬ হিন্দবাদের প্রথম ও সিন্দবাদের শেষ যাত্রা। গল্প। রংমশাল ১৩২৯ ॥ একে তিন তিনে এক ॥ রচনাবলী ২

১২৭ বাতাপি রাক্ষস। গল্প। মৌচাক ১৩২৯ আশ্বিন ॥ একে তিন তিনে এক ॥ রচনাবলী ২

১২৮ সমালোচনা।[২৮] গ্রন্থসমালোচনা। ভারতী ১৩২৯ কার্তিক

১২৯ হাঁসুলি কি ফাঁসুলি।[২৯] প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৯ কার্তিক

১৩০ সৌন্দর্য্যের সন্ধান। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ কার্তিক ॥ বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী

১৩১ শিল্প ও দেহতত্ত্ব। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী

১৩২ সাহিত্যিক সম্বর্ধনা। বিজলী ১৯২৩, ১২ জানুয়ারি

১৩৩ জলে স্থলে[৩০]। গল্প। বুধবার ১৩২৯, ২৬ পৌষ

১৩৪ কর্মচক্র। বিজলী ১৩২৯, ২৮ পৌষ

১৩৫ চিঠি। লেখ-চিত্র। বুধবার ১৩২৯, ২৪ মাঘ ॥ রচনাবলী ১

১৩৬ হাফেজ। প্রবন্ধ। প্রবর্ত্তক ১৩২৯ মাঘ

১৩৭ অন্তর ও বাহির। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ ফাল্গুন ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৩৮ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আর্ট। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। প্রবর্ত্তক ১৩২৯ চৈত্র

১৩৯ মত ও মন্ত্র। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৪০ বাসন্তী পর্ব[৩১]। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৯ চৈত্র

১৪১ সন্ধ্যার উৎসব[৩২]। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩০ বৈশাখ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী, ১ম সংস্করণ

১৪২ উৎসবের কনসার্ট। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩৩০ বৈশাখ

১৪৩ ছেলেভুলানো ছড়া[৩৩]। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩০ বৈশাখ

১৪৪ দর্শন দরবাজা[৩৪]। প্রবন্ধ। অয়ন ১৩৩০ বৈশাখ

১৪৫ মহাবংবুম হক্কীয় সিড়প প্রশ্নোত্তর মালা। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ

১৪৬ শিল্প। প্রবন্ধ শিল্পবিষয়ক। প্রাচী ১৩৩০ আষাঢ়

---

২৮ দীনেন্দ্রচন্দ্র সেনের 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থের সমালোচনা

২৯ কলিকাতা ক্যানিং হস্টেলের চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে সভাপতির বক্তৃতা।

৩০ প্রাচী ১৩৩০ ভাদ্র সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত। এই গল্পের প্রথম খসড়া 'সূর্য কি করতে এলেন' সমকালীন ১৩৬১ শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত।

৩১ বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে পঠিত।

৩২ হার্ডিঞ্জ হস্টেলের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সান্ধ্য সম্মিলনীতে পঠিত।

৩৩ ২৯ চৈত্র ১৩২৯ রামমোহন লাইব্রেরি হলে বিশ্বভারতী সম্মিলনী অধিবেশনে পঠিত।

৩৪ ভারতী ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

১৪৭ কারুছত্র। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। অয়ন ১৩৩০ শ্রাবণ

১৪৮ বড় লেখা ছোট লেখা। প্রবন্ধ। প্রাচী ১৩৩০ শ্রাবণ

১৪৯ ছেলেধরা ফাঁদ। বিজলী ১৩৩০, ২১ ভাদ্র

১৫০ স্ত্রীশিক্ষা। বিজলী ১৩৩০, ২৮ ভাদ্র

১৫১ রীতিমত শিল্পশিক্ষা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। তরুণ ১৩৩০ ভাদ্র

১৫২ সভাসমিতি। বিজলী ১৩৩০, ১৮ আশ্বিন

১৫৩ হারজিৎ। বিজলী ১৩৩০, ২৫ আশ্বিন

১৫৪ এসপার ওসপার। নাটক। ভারতী ১৩৩০ আশ্বিন

১৫৫ টাট্‌কা চিঠি। পত্র। তরুণ ১৩৩০ আশ্বিন

১৫৬ শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩০ আশ্বিন ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৫৭ হীরাকুনি। গল্প। চালচিত্র ১৩৩০

১৫৮ আলোয় কালোয়। গল্প। মৌচাক ১৩৩০ কার্তিক ॥ একে তিন তিনে এক ॥ রচনাবলী ২

১৫৯ ছেলেমানুষী বিদ্যে। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩০ কার্তিক-অগ্রহায়ণ

১৬০ শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩০ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী

১৬১ কারিগর ও বাজীকর। গল্প। প্রাচী ১৩৩০ পৌষ ॥ রং-বেরং ॥ রচনাবলী ২

১৬২ পূর্ণিমা ব্রত। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩০ পৌষ

১৬৩ শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভালোমন্দ। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩০ মাঘ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৬৪ সমালোচনা[৩৫]। সমালোচনা। ভারতী ১৩৩০ ফাল্গুন

১৬৫ রস ও রচনার ধারা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩০ ফাল্গুন

১৬৬ পথের বীণা। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩১ বৈশাখ

১৬৭ নববর্ষের আবদার। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ

১৬৮ উন্নতি ও পরিণতি। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। মহিলা ১৩৩১, ২ জ্যৈষ্ঠ

১৬৯ নাচঘরের আবহাওয়া[৩৬]। প্রবন্ধ। নাচঘর ১৩৩১, ৯ জ্যৈষ্ঠ ॥ রচনাবলী ১

১৭০ নবদূর্বা। প্রবন্ধ। নবযুগ ১৩৩১, ২৪ শ্রাবণ

১৭১ বাংলা থিয়েটারের এক টুকরো। প্রবন্ধ। নাচঘর ১৩৩১, ১৬ শ্রাবণ ॥ রচনাবলী ১

১৭২ চরখা না বেহালা। প্রবন্ধ। শনিবারের চিঠি ১৩৩১, ১৭ শ্রাবণ

১৭৩ মনোমোহনে সীতা[৩৭]। প্রবন্ধ। নাচঘর ১৩৩১, ৩০ শ্রাবণ

---

৩৫ 'কমলাকান্তের পত্র' গ্রন্থের সমালোচনা।

৩৬-৩৭ 'বহুরূপী' ১৯৬৬ অক্টোবর সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

১৭৪ শিল্পাচার্যের পত্র[৩৮]। পত্র। বাঁশরী ১৩৩১ আশ্বিন
১৭৫ পত্র[৩৮]। পত্র। তরুণ ১৩৩১আশ্বিন
১৭৬ নানা পংক্তি[৩৯]। পদ্য। শনিবারের চিঠি ১৩৩১, ৪ আশ্বিন
১৭৭ কাঁচায় পাকায়। গল্প। মৌচাক ১৩৩১ কার্তিক ॥ একে তিন তিনে এক
১৭৮ শিল্পবৃত্তি। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩১ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১৭৯ সুন্দর। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩১ ফাল্গুন ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১৮০ নির্ভাবনার দুর্ভাবনা[৪০]। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩৩১ চৈত্র
১৮১ অসুন্দর। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩১ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১৮২ রূপরেখার রূপকথা। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। প্রবাসী ১৩৩২ বৈশাখ
১৮৩ বড় রাজা ছোট রাজার গল্প। গল্প। মৌচাক ১৩৩২ বৈশাখ ॥ একে তিন তিনে এক ॥ রচনাবলী ২
১৮৪ জাতি ও শিল্প। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১৮৫ স্মৃতির পরশ[৪১]। স্মৃতিকথা। কল্লোল ১৩৩২ আষাঢ় ॥ রচনাবলী ১
১৮৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্মৃতিকথা। বঙ্গবাণী ১৩৩২ আষাঢ়
১৮৭ আশুতোষ[৪২]। স্মৃতিকথা। বঙ্গবাণী ১৩৩২ আষাঢ়
১৮৮ দীপালি। লেখচিত্র। শরতের ফুল ১৩৩২ আশ্বিন
১৮৯ শিল্পের 'ক' ও 'খ'। রচনা: শিল্পবিষয়ক। বার্ষিক বসুমতী ১৩৩২
১৯০ আর্টিস্ট। ভারতী ১৩৩২ আশ্বিন
১৯১ কনকলতা। গল্প। মৌচাক ১৩৩২ আশ্বিন ॥ একে তিন তিনে এক ॥ রচনাবলী ২
১৯২ খাসিয়াদের শারদোৎসব[৪৩]। প্রবন্ধ। কল্লোল ১৩৩২ আশ্বিন
১৯৩ অরূপ না রূপ। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ কার্তিক ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১৯৪ রূপবিদ্যা। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১৯৫ রূপরেখা[৪৪]। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ পৌষ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী।

---

৩৮ শিল্পী চারুচন্দ্র রায় ও তরুণ পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র ১৩৬৬, অবনীন্দ্র-সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

৩৯ রহমন আলী ছদ্মনামে লিখিত।

৪০ রামমোহন লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত কুমার লাইব্রেরির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে ২৪ মাঘ তারিখে পঠিত।

৪১ সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাঁচির গৃহ 'শান্তিধাম' এবং বোলপুরের 'শান্তিনিকেতন'— এই দুই স্মৃতির আলোচনা।

৪২ কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি হলে প্রথম বার্ষিক স্মৃতিসভায় পঠিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীসঙ্ঘের পত্রিকা 'আমাদের কথা'র জন্মশতবার্ষিক আশুতোষ সংখ্যায় (১৩৭১) আংশিক পুনর্মুদ্রিত।

৪৩ Major A.Playfair রচিত The Garo (London, 1909) গ্রন্থ থেকে অনূদিত।

৪৪ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলীতে 'রূপদেখা' নামে মুদ্রিত।

১৯৬ উত্তরা। গদ্যছন্দ। উত্তরা :৩৩২ পৌষ

১৯৭ একখানি পত্র[৪৫]। পত্র। নাচঘর ১৩৩২, ৩ পৌষ

১৯৮ ৺জগদিন্দ্রনাথ। স্মৃতিকথা। মানসী ও মর্ম্মবাণী ১৩৩২ মাঘ

১৯৯ বড় জ্যাঠামশায়। স্মৃতিকথা। ভারতী ১৩৩২ মাঘ ॥ রচনাবলী ১

২০০ একখানি পত্র। পত্র। উত্তরা ১৩৩২ ফাল্গুন

২০১ দোলন চাঁপা। আনন্দবাজার পত্রিকা, দোলসংখ্যা ১৩৩২ ফাল্গুন

২০২ স্মৃতি ও শক্তি। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ ফাল্গুন ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

২০৩ পত্র[৪৬]। পত্র। শান্তিনিকেতন ১৩৩২ ফাল্গুন

২০৪ পত্র। পত্র। শান্তিনিকেতন ১৩৩২ ফাল্গুন

২০৫ আর্য ও অনার্য শিল্প। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

২০৬ দোতারা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। উত্তরা ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ

২০৭ আশ্রমের উৎসব ও অনুষ্ঠান। প্রবন্ধ। প্রবর্ত্তক ১৩৩৩ বৈশাখ

২০৮ আশীর্বাদ ও স্বস্তীবচন[৪৭]। আশীর্বাণী। প্রবাসী। ১৩৩৩ বৈশাখ

২০৯ আর্য্যশিল্পের ক্রম। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৩ বৈশাখ ॥ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

২১০ পত্র[৪৮]। পত্র। শান্তিনিকেতন ১৩৩৩ বৈশাখ

২১১ রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট[৪৯]। পত্র : শিল্পবিষয়ক। শান্তিনিকেতন ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ

২১২ আর্টের সহজ পথ। প্রবন্ধ। উত্তরা ১৩৩৩ আশ্বিন

২১৩ উজোর ঘরের কান্না। খাসিয়া গাথা। কল্লোল ১৩৩৩ আশ্বিন ॥ রচনাবলী ৩

২১৪ আসা যাওয়া[৫০]। গদ্যছন্দ। বার্ষিক বসুমতী ১৩৩৩

২১৫ কোণের ঘর। রূপকথা। বার্ষিক বসুমতী ১৩৩৩ ॥ রচনাবলী ২

২১৬ সাথী। গল্প। বার্ষিক শিশুসাথী ১৩৩৩ ॥ একে তিন তিনে এক ॥ রচনাবলী ২

২১৭ সাহিত্যে শুদ্ধিবিচার। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩৩ কার্তিক

২১৮ ঋতুমঙ্গল। লেখচিত্র। কালিকলম ১৩৩৩ কার্তিক

২১৯ ভোম্বলদাসের কৈলাস যাত্রা। গল্প। মৌচাক ১৩৩৩ কার্তিক ॥ একে তিন তিনে এক ॥ রচনাবলী ২

২২০ রতা শেয়ালের কথা। গল্প। মৌচাক ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ ॥ একে তিন তিনে এক ॥ রচনাবলী ২

২২১ রূপ। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

---

৪৫ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত।

৪৬ নন্দলাল বসুকে লিখিত। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র ১৩৬৬ অবনীন্দ্র-সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

৪৭ প্রবাসীর পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে লিখিত।

৪৮ নন্দলাল বসুকে লিখিত। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র ১৩৬৬ অবনীন্দ্র-সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

৪৯ উত্তরা ১৩৩৩ আশ্বিন সংখ্যায় 'ভারতীয় চিত্রকলার জন্ম' নামে সংকলিত।

৫০ জোড়াসাঁকোয় বর্ষামঙ্গল উৎসবে পঠিত।

২২২ খেলার পুতুল। সচিত্র প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৩ পৌষ॥ বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী, প্রথম সংস্করণ

২২৩ সিংহরাজ্যের রাজ্যাভিষেক। গল্প। মৌচাক ১৩৩৩ পৌষ॥ একে তিন তিনে এক॥ রচনাবলী ২

২২৪ জগদিন্দ্রনাথের স্মরণে। স্মৃতিকথা। মানসী ও মর্ম্মবাণী ১৩৩৩ ফাল্গুন॥ রচনাবলী ১

২২৫ ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ [৫১]। গ্রন্থ সমালোচনা। মৌচাক ১৩৩৩ ফাল্গুন

২২৬ আপন কথা। স্মৃতিকথা। বঙ্গবাণী ১৩৩৩ ফাল্গুন - ১৩৩৪ ভাদ্র॥ আপন কথা॥ রচনাবলী ১

২২৭ রূপের মান ও অভিমান। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৩ চৈত্র॥ বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী

২২৮ এম্‌-এ আর্টিস্টের প্রশ্নমালা। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। কল্লোল ১৩৩৪ বৈশাখ

২২৯ ভুল [৫২]। কল্লোল ১৩৩৪ বৈশাখ

২৩০ হাওয়া বদল [৫৩]। শব্দচিত্র। মানসী ও মর্ম্মবাণী। ১৩৩৪ বৈশাখ

২৩১ দেয়ালী। গল্প। মৌচাক ১৩৩৪ বৈশাখ॥ একে তিন তিনে এক॥ রচনাবলী ২

৩২ মহামাদ তৈল। গল্প। বেণু ১৩৩৪ বৈশাখ॥ একে তিন তিনে এক॥ রচনাবলী ২

২৩৩ ভাব। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

২৩৪ বর্ণমালা। প্রবর্ত্তক ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ

২৩৫ নতুন ও পুরোনোর ছন্দ। প্রবন্ধ। বিচিত্রা ১৩৩৪ আষাঢ়

২৩৬ কলি ও কাল। প্রবন্ধ। নওরোজ ১৩৩৪ আষাঢ়

২৩৭ বাবুই পাখির ওড়ন-বৃত্তান্ত। গল্প। বেণু ১৩৩৪ আষাঢ়-ভাদ্র॥ রং-বেরং॥ রচনাবলী ২

২৩৮ পাহাড়িয়া। গদ্যছন্দ। বিচিত্রা ১৩৩৪ শ্রাবণ

২৩৯ রংমহল। গদ্যছন্দ। বিচিত্রা ১৩৩৪ ভাদ্র

২৪০ রসসৃষ্টি। প্রবন্ধ। নাচঘর ১৩৩৪, ১১ আশ্বিন

২৪১ হাটবার। গদ্যছন্দ। বেণু ১৩৩৪ আশ্বিন॥ অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন

২৪২ তিন দরিয়া। গদ্যছন্দ। বিচিত্রা ১৩৩৪ আশ্বিন

২৪৩ মেঘমণ্ডল। গদ্যছন্দ। বিচিত্রা ১৩৩৪ কার্তিক

২৪৪ আতসবাজি। গদ্যছন্দ। উত্তরা ১৩৩৪ কার্তিক

২৪৫ লাবণ্য। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৪ কার্তিক॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

২৪৬ বাগানে। লেখ-চিত্র। বিচিত্রা ১৩৩৪ চৈত্র

২৪৭ সাদৃশ্য। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। প্রবাসী ১৩৩৪ চৈত্র॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

২৪৮ আলোকশিখা। গদ্যছন্দ। রংমশাল ১৩৩৫

---

৫১ যামিনীকান্ত সোম প্রণীত গ্রন্থের সমালোচনা।

৫২ নিজের মুদ্রিত ফোটোগ্রাফের বিষয়ে লেখা।

৫৩ উত্তরসূরী, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৪ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

২৪৯ আশীর্বাণী। আশীর্বাণী। বিশ্ববার্তা ১৩৩৫ রবীন্দ্র সংখ্যা

২৫০ ভারতশিল্প [৫৪]। গ্রন্থ-সমালোচনা। প্রবাসী ১৩৩৫ বৈশাখ

২৫১ পত্র [৫৫]। পত্র। বিচিত্রা ১৩৩৫ অগ্রহায়ণ

২৫২ বর্ণিকাভঙ্গম। প্রবন্ধ· শিল্পবিষয়ক। বিচিত্রা ১৩৩৫ পৌষ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ

২৫৩ নতুন খাতা। লেখ-চিত্র। চিত্র ১৩৩৬ বৈশাখ

২৫৪ আষাঢ়ে গল্প। গল্প। বার্ষিক শিশুসাথী ১৩৩৭। একে তিন তিনে এক॥ রচনাবলী ২

২৫৫ খোকাখুকি। গল্প। খোকাখুকু ১৩৩৭ কার্তিক। একে তিন তিনে এক॥ রচনাবলী ২

২৫৬ অশত্থপাতা। লেখ-চিত্র। বিচিত্রা ১৩৩৭ মাঘ

২৫৭ বনের ময়ূর [৫৬]। পদ্য। মডার্ন রিভিউ ১৯৩১ মার্চ

২৫৮ যাত্রা ও থিয়েটার [৫৭]। প্রবন্ধ। জয়ন্তী উৎসর্গ ১৩৩৮ পৌষ

২৫৯ নগ্ন ক্ষপণক দেশে রজকঃ কিং করিষ্যতি। প্রবন্ধ। মাসপয়লা ১৩৩৮ ?

২৬০ ব্যাপটাইজ। স্মৃতিকথা। ল কলেজ ম্যাগাজিন ১৩৩৯ বৈশাখ॥ রচনাবলী ১

২৬১ জেন্ত দেশ। পদ্য। ছোটদের বার্ষিকী ১৩৩৯

২৬২ অপরাজিতার মালা। পদ্য। রূপরেখা ১৩৩৯

২৬৩ গীত-হাফেজ। পদ্য। রূপরেখা ১৩৩৯

২৬৪ শিল্পী শ্রীমান নন্দলাল বসু [৫৮]। আশীর্বাণী। বিচিত্রা ১৩৩৯ অগ্রহায়ণ॥ রচনাবলী ১

২৬৫ সহজ মানুষকে নমস্কার। প্রবন্ধ। Acharya Roy Commemoration Vol., 1932.

২৬৬ বাংলার রঙ ও রূপ [৫৯]। চিত্র সমালোচনা। বিচিত্রা ১৩৩৯ পৌষ

২৬৭ ব্রহ্মদেশের নৃত্য। প্রবন্ধ: নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ৭ বৈশাখ

২৬৮ রূপকথার দেশ। পদ্য। উদয়ন ১৩৪০ বৈশাখ

২৬৯ মধুর কলসী [৬০]। গদ্যছন্দে কথামালার গল্প। অভ্যুদয় ১৩৪০ বৈশাখ

২৭০ কুকুর ও প্রতিবিম্ব [৬০]। গদ্যছন্দে কথামালার গল্প। অভ্যুদয় ১৩৪০ বৈশাখ

২৭১ সর্প ও কৃষক [৬০]। গদ্য ছন্দে কথামালার গল্প। অভ্যুদয় ১৩৪০ বৈশাখ

---

৫৪ প্রসন্নকুমার আচর্যের *Indian Architecture* ও *Dictionary of Hindu Architecture* নামক দুখানি গ্রন্থের সমালোচনা।

৫৫ অসিতকুমার হালদার-লিখিত "শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ও নাতিশিষ্যবর্গ" প্রবন্ধের অন্তর্গত।

৫৬ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস্-আয়োজিত চীনা চিত্রকরদের এক প্রদর্শনীতে উপহৃত স্বহস্ত-অঙ্কিত ময়ূরের ছবির সঙ্গে লিখিত।

৫৭ রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত।

৫৮ 'বিচিত্রা-চিত্রশালা'য় প্রকাশিত নন্দলাল বসুর চিত্রাবলীর সমালোচনা।

৫৯ নলিনীকান্ত মজুমদারের ছবির প্রতিলিপি-সংগ্রহের সমালোচনা।

৬০ বিদ্যাসাগরের কথামালার তিনটি কাহিনীর 'গদ্যছন্দে' রূপান্তর মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের সঙ্গে প্রেরিত। দ্র. শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত, "বাংলা গদ্যছন্দে অবনীন্দ্রনাথ", 'অমৃত' ১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড: ২৭শে শ্রাবণ ১২৭৮; এই প্রবন্ধে রচনা-তিনটি পত্রসহ-উদ্ধৃত।

২৭২ নূতনে ও পুরাতনে[৬১]। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। উদয়ন ১৩৪০ আষাঢ়

২৭৩ উড়ো চিঠি[৬২]। প্রবন্ধ: নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ৫ শ্রাবণ

২৭৪ উড়ো চিঠি[৬২]। প্রবন্ধ: নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ১২ শ্রাবণ

২৭৫ উড়ো চিঠি[৬২]। প্রবন্ধ: নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ২৬ শ্রাবণ

২৭৬ উড়ো চিঠি[৬২]। প্রবন্ধ: নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ৯ ভাদ্র

২৭৭ 'পাউই' নৃত্য। প্রবন্ধ: নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ২১ পৌষ

২৭৮ রক্তকরবী[৬৩]। প্রবন্ধ। The Tagore Dramatic Group-কর্তৃক প্রকাশিত 'অভিনয়সূচী', ১৯৩৪ এপ্রিল

২৭৯ কাকলী। পদ্য। রূপরেখা ১৩৪১

২৮০ একে তিন তিনে এক। গল্প। মৌচাক ১৩৪১ বৈশাখ-শ্রাবণ ॥ একে তিন তিনে এক ॥ রচনাবলী ৩

২৮১ ঈ. বী. হ্যাভেল। স্মৃতিকথা। প্রবাসী ১৩৪১ মাঘ ॥ রচনাবলী ১

২৮২ বর্ষবাণী। লেখচিত্র। বর্ষবাণী ১৩৪২

২৮৩ 'মানসারে'র দ্বিতীয় সংস্করণ[৬৪]। সমালোচনা। বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী ১৩৪২ শ্রাবণ

২৮৪ বাসিন্দা নিবাসিন্দার রূপকথা। গল্প। বর্ষবাণী ১৩৪৩

২৮৫ মারুতির পুঁথি। পুঁথির ভঙ্গিতে রামায়ণের গল্প। মৌচাক ১৩৪৪-১৩৪৫ ॥ মারুতির পুঁথি

২৮৬ সিকস্তি পয়স্তি কথা। গল্প। রংমশাল ১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র ॥ রং-বেরং ॥ রচনাবলী ৩

২৮৭ হেতি হোতির বৃত্তান্ত। গল্প। সোনার কাঠি ১৩৪৪ ॥ রচনাবলী ৩

২৮৮ ভবের হাটে হেতি হোতি। গল্প। পাঠশালা ১৩৪৪ আশ্বিন-পৌষ ॥ রং-বেরং ॥ রচনাবলী ৩

২৮৯ ভূত চৌদশী। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৪ কার্তিক ॥ অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন

২৯০ সন্তরণ বিজ্ঞান[৬৫]। পুস্তক সমালোচনা। বিচিত্রা ১৩৪৪ পৌষ

২৯১ বোকার ঘটকালী[৬৬]। গল্প। বঙ্গলক্ষ্মী ১৩৪৪ মাঘ

২৯২ মধুতিক্ত। শিল্প-বিষয়ক। রবীন্দ্র জন্মতিথি সংখ্যা: সাময়িক ১৩২৫, ২৫ বৈশাখ

২৯৩ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ বৈশাখ ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প ॥ রচনাবলী ৩

---

৬১ স্কটিশ চার্চ কলেজের শিল্প প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

৬২ উদয়শঙ্করের নৃত্য উপলক্ষে লেখা।

৬৩ 'বিহার ভূকম্প পীড়িতের সাহায্যার্থে' কলিকাতাস্থ নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে ৬ এপ্রিল ১৯৩৪ অভিনীত রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটকের 'অভিনয় সূচী'তে প্রকাশিত। নাচঘর পত্রিকার ৩০ চৈত্র ১৩৪০ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

৬৪ প্রসন্নকুমার আচার্যের 'মানসারে' গ্রন্থের সমালোচনা।

৬৫ শান্তি পাল -প্রণীত 'সন্তরণ বিজ্ঞান' গ্রন্থের সমালোচনা।

৬৬ শারদীয়া বসুমতী ১৩৫৬ সংখ্যায় 'বোকার ঘটকালি' নামে মুদ্রিত।

২৯৪ শিশুসাহিত্য। প্রবন্ধ। রংমশাল ১৩৪৫ আষাঢ়

২৯৫ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ আশ্বিন॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প। রচনাবলী ৩

২৯৬ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ কার্তিক॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প॥ রচনাবলী ৩

২৯৭ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প॥ রচনাবলী ৩

২৯৮ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ পৌষ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প॥ রচনাবলী ৩

২৯৯ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ ফাল্গুন॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প॥ রচনাবলী ৩

৩০০ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ চৈত্র॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প। রচনাবলী ৩

৩০১ পোড়ালঙ্কার পুঁথি। পুঁথির ভঙ্গিতে রামায়ণের গান, অসম্পূর্ণ। মৌচাক ১৩৪৬, বৈশাখ-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ

৩০২ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৬ বৈশাখ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প॥ রচনাবলী ৩

৩০৩ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প। রচনাবলী ৩

৩০৪ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৬ আষাঢ়॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প। রচনাবলী ৩

৩০৫ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৫ ভাদ্র॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩০৬ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ আশ্বিন॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩০৭ শিল্পীর খেয়াল্। প্রবন্ধ। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৪৬

৩০৮ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ কার্তিক॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩০৯ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩১০ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ পৌষ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩১১ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ মাঘ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩১২ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ ফাল্গুন॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩১৩ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ চৈত্র॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩১৪ বড় জ্যাঠামশায়। স্মৃতিকথা। প্রবাসী ১৩৪৬ চৈত্র॥ রচনাবলী ১

৩১৫ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ বৈশাখ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩১৬ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩১৭ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ শ্রাবণ ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩১৮ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ ভাদ্র ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩১৯ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ আশ্বিন ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩২০ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ কার্তিক ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩২১ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩২২ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ পৌষ ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩২৩ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ মাঘ ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩২৪ চটজলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ ফাল্গুন ॥ চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প

৩২৫ পত্র[৬৭]। পত্র। প্রবাসী ১৩৪৭ ফাল্গুন

৩২৬ আমার ছবি ও বই লিখতে শেখা এবং আমার মাষ্টারি। স্মৃতিকথা। প্রবাসী ১৩৪৮ বৈশাখ ॥ জোড়াসাঁকোর ধারে। রচনাবলী ১

৩২৭ শিশুবিভাগ[৬৮]। স্মৃতিকথা। পঁচিশে বৈশাখ ১৩৪৮ ॥ রচনাবলী ১

৩২৮ রবিকাকার গান। স্মৃতিকথা। কবিতা ১৩৪৮ আষাঢ় ॥ ঘরোয়া। রচনাবলী ১

৩২৯ শিশুদের রবীন্দ্রনাথ। রংমশাল ১৩৪৮ আষাঢ় ॥ রচনাবলী ১

৩৩০ রবীন্দ্রস্মৃতি। স্মৃতিকথা। বঙ্গলক্ষ্মী ১৩৪৮ ভাদ্র

৩৩১ মহাবীরের পুঁথি। পুঁথির ভঙ্গিতে রামায়ণের গল্প। রংমশাল ১৩৪৮ আশ্বিন - ১৩৫০ ভাদ্র ॥ মহাবীরের পুঁথি

৩৩২ আবহাওয়া। স্মৃতিকথা। শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন ॥ অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন ॥ রচনাবলী ১

৩৩৩ ভূতের কেত্তন। পদ্য। সোনালি ফসল ১৩৪৮

৩৩৪ রূপকথার আদিকথা। স্মৃতিকথা। রূপকথা ১৩৪৮ আশ্বিন

৩৩৫ ভাষণ। সরকারী আর্ট স্কুলে অবনীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা, প্রবাসী ১৩৪৮ কার্তিক

৩৩৬ প্রভাত[৬৯]। পদ্য। অলকা ১৩৪৮ কার্তিক-অগ্রহায়ণ

৩৩৭ অবনীন্দ্রনাথের পত্র[৭০]। পত্র। অলকা ১৩৪৮ অগ্রহায়ণ

৩৩৮ আর্ট প্রসঙ্গ। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ শ্রাবণ

৩৩৯ মাসীমা। গল্প। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ শ্রাবণ-ভাদ্র ॥ মাসি

৩৪০ রেনি ডে। গল্প। মধুমেলা ১৩৪৯ আশ্বিন ॥ রং-বেরং ॥ রচনাবলী ৩

৩৪১ উড়ন চণ্ডীর পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৪৯

---

৬৭ মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত -লিখিত 'অবনীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের অন্তর্গত। বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক-চৈত্র ১৩৬৬ অবনীন্দ্র-সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

৬৮ শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী-সম্পাদিত পঁচিশে বৈশাখ সংকলন গ্রন্থে মুদ্রিত।

৬৯ অচিন সাথী ১৩৬১ শারদীয়া সংখ্যা এবং উত্তরসূরী ১৩৬৬ কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

৭০ অসিতকুমার হালদারকে লিখিত।

৩৪২ আমাদের সেকালের পুজো। স্মৃতিকথা। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৪৯ ॥ রচনাবলী ১
৩৪৩ ফার্স্ট্ টু লাষ্ট[১১]। গল্প। শনিবারের চিঠি ১৩৪৯ কার্তিক ॥ রচনাবলী ৩
৩৪৪ পত্র[১২]। পত্র। প্রবাসী ১৩৪৯ কার্তিক
৩৪৫ হারজিত। গল্প। পাঠশালা ১৩৪৯ পৌষ ॥ রচনাবলী ৩
৩৪৬ রাতশেষের গান। পাঠশালা ১৩৪৯ পৌষ
৩৪৭ চিঠি[১৩]। চিঠি। পাঠশালা ১৩৪৯ পৌষ
৩৪৮ চিঠি[১৪]। চিঠি। প্রবাসী ১৩৪৯ পৌষ
৩৪৯ দুই সন্ধানী। প্রবন্ধ। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ মাঘ
৩৫০ বনলতা। গল্প। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ চৈত্র ॥ মাসি
৩৫১ চৈতের মুহূর্ত্ত। গদ্য কবিতা। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ
৩৫২ হাতে খড়ি। গল্প। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ জ্যৈষ্ঠ ॥ মাসি
৩৫৩ ভাষণ[১৫]। প্রবাসী ১৩৫০ জ্যৈষ্ঠ
৩৫৪ বিশ্বভারতী। রংমশাল ১৩৫০ শ্রাবণ
৩৫৫ কথামালার যাত্রার সং। নাটিকা। রূপরেখা ১৩৫০ ॥ লম্বকর্ণ
৩৫৬ মউর ছালের পালা। যাত্রার পালা। দিগন্ত ১৩৫০
৩৫৭ টুকরী বুড়ি। গল্প। শারদীয় আনন্দবাজার ১৩৫০ ॥ অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন ॥ রচনাবলী ৩
৩৫৮ কঞ্জুষের পালা। যাত্রার পালা। রংমশাল ১৩৫০ আশ্বিন-পৌষ
৩৫৯ ভারতীয় চিত্রকলার প্রচারে রামানন্দ। স্মৃতিকথা। প্রবাসী ১৩৫০ পৌষ ॥ রচনাবলী ১
৩৬০ আমাদের পারিবারিক সঙ্গীতচর্চা। স্মৃতিকথা। গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০ মাঘ ॥ রচনাবলী ১
৩৬১ শুভ কামনায়[১৬]। আশীর্বাণী। জয়ন্তী মৌচাক ১৩৫১
৩৬২ শিশু সাহিত্য[১৭]। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩৫১ বৈশাখ
৩৬৩ মৌচাক মেলা। প্রবন্ধ। মৌচাক ১৩৫১ বৈশাখ
৩৬৪ মা গঙ্গা। স্মৃতিকথা। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ বৈশাখ-আষাঢ় ॥ জোড়াসাঁকোর ধারে
৩৬৫ ভূতপতরীর যাত্রা। যাত্রার পালা। রংমশাল ১৩৫১ বৈশাখ-ফাল্গুন ॥ লম্বকর্ণ

---

১১ সম্পাদকের মন্তব্য: 'এই গল্পের গোড়ার দিকের ঘটনা বিশ্বভারতী পত্রিকা ভাদ্র সংখ্যায় [১৩৪৯] মাসি গল্পে দ্রষ্টব্য।'
১২ 'আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ: অবনীন্দ্রনাথের পত্র' এই শিরোনামে প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে পত্রটি উদ্‌ধৃত।
১৩ 'উত্তরা'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত।
১৪ বিনয়িনী দেবীকে লিখিত, প্রতিমা ঠাকুরের 'স্মৃতিচিত্রের কিয়দংশ' প্রবন্ধে উদ্‌ধৃত।
১৫ 'শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ নববর্ষ ও কবিগুরুর জন্মোৎসব'— এই শিরোনামে 'বিবিধ প্রসঙ্গে' মুদ্রিত।
১৬ মৌচাক পত্রিকার পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে লিখিত।
১৭ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে প্রেরিত।

৩৬৬ গজকচ্ছপের পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৫১
৩৬৭ রথোযাত্রা গীতাভিনয়[৭৮]। যাত্রার পালা। অর্চ্চনা ১৩৫১
৩৬৮ বহিত্র। গল্প। দেশের মাটি ১৩৫১ আশ্বিন ॥ রচনাবলী ৩
৩৬৯ অক্রূরদের গান। পদ্য। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৫১
৩৭০ পত্র। নন্দলাল বসু সংখ্যা : নিরীক্ষা ১৩৫১ আশ্বিন
৩৭১ নতুন বছর[৭৯]। লেখ-চিত্র। উদয়াচল ১৩৫২ আষাঢ়
৩৭২ আলিপনা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫২ শ্রাবণ
৩৭৩ সিন্ধবাদ বিবরণ পদ্য। গল্প। সপ্তডিঙা ১৩৫২ ॥ রং-বেরং
৩৭৪ রতনমালার বিয়ে। গল্প। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৫২ ॥ রচনাবলী ৩
৩৭৫ চাঁইদাদার গল্প। গল্প। শারদীয়া দেশ ১৩৫২ ॥ রং-বেরং ॥ রচনাবলী ৩
৩৭৬ নিদ্রাপরী তন্দ্রাপরীর গান। ছড়া। কলরব ১৩৫২ ॥ অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন
৩৭৭ রাবিশ রামায়ণের ভূমিকা। নবমঞ্জরী ১৩৫২
৩৭৮ কাষ্ঠবেড়ালের পুঁথি। গল্প। মৌচাক ১৩৫২ কার্তিক ॥ রচনাবলী ৩
৩৭৯ নেই ও আছে[৮০]। প্রবন্ধ। রংমশাল ১৩৫৩ আষাঢ়
৩৮০ ধোড়াকাক ও বুড়ো শেয়ালের পালা। যাত্রার পালা। আকাশদীপ ১৩৫৩
৩৮১ হারানিধি। স্মৃতিকথা। অঞ্জলি '৩৫৪ ॥ রচনাবলী ১
৩৮২ কলাভবনের কলা। গল্প। শারদীয়া দেশ ১৩৫৪ ॥ রচনাবলী ৩
৩৮৩ রামানন্দজীবনী[৮১]। গ্রন্থ সমালোচনা। প্রবাসী ১৩৫৪ পৌষ
৩৮৪ অবনীন্দ্র ঠাকুরের আশীর্বাণী[৮২]। আশীর্বাণী। বিশ্ববার্ত্তা ১৩৫৫, ২৫ বৈশাখ
৩৮৫ আর্টিষ্ট হেমেন্দ্রকুমার রায়[৮৩]। কেয়া, ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৫৫
৩৮৬ বেণুকুঞ্জের পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৫৫
৩৮৭ সব পেয়েছির আসর। শারদীয় যুগান্তর ১৩৫৫
৩৮৮ পত্রগুচ্ছ[৮৪]। পত্র। জয়শ্রী ১৩৫৪ আশ্বিন
৩৮৯ যুগাবতার পালা। যাত্রা পালা। ছায়াপথ ১৩৫৫
৩৯০ অবনীন্দ্রনাথের বাণী। খামখেয়ালী ১৩৫৬ বৈশাখ

---

৭৮ এই রচনাটি অর্চ্চনার কোন্ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় জানা যায় নি, শুধু আশ্বিন সংখ্যাটি আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয়েছে।

৭৯ বর্ষবাণী ১৩৪২ সংকলনে বর্ষবাণী নামে প্রকাশিত।

৮০ অবনীন্দ্রনাথের সাতাত্ত্র বছরের জন্মদিনে লিখিত।

৮১ 'ভারত-মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা' গ্রন্থ প্রসঙ্গে শ্রীমতী শান্তা দেবীকে লিখিত পত্র।

৮২ রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষে লিখিত।

৮৩ বৈদ্যবাটি যুবকসমিতির বার্ষিক উৎসবে ৭ জানুয়ারি ১৯২৩ তারিখে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।

৮৪ আচার্য নন্দলাল বসুকে লেখা।

৩৯১ লম্বকর্ণ পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৫৬ ॥ লম্বকর্ণ

৩৯২ তালপাতি। পদ্য। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৫৭

৩৯৩ ঋষিযাত্রা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৫৭

৩৯৪ অতীত ও বর্ত্তমান বাংলা। প্রবন্ধ। পুনশ্চ ১৩৫৭ আশ্বিন

৩৯৫ পত্রাবলী। পত্র। কথাসাহিত্য, তৃতীয় বর্ষ ১৩৫৮-১৩৫৯

৩৯৬ আশীর্বাদ। আশীর্বাণী। চয়নিকা ১৩৫৮ বৈশাখ

৩৯৭ 'পুরোনো মানুষ পুরোনো বাড়ির'। হস্তাক্ষরে মুদ্রিত রচনা। সচিত্র ভারত ১৩৫৮, ২৯ অগ্রহায়ণ

৩৯৮ একখানি পত্র। পত্র। অবনীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা : উত্তরা ১৩৫৮ পৌষ

৩৯৯ পত্রাবলী[৮৫]। পত্র। অবনীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা : উত্তরা ১৩৫৮ পৌষ

৪০০ রচনা : হস্তাক্ষরে মুদ্রিত। অবনীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা : উত্তরা ১৩৫৮ পৌষ

৪০১ ছেলেবুড়ো। গদ্যছন্দ। কথাসাহিত্য ১৩৫৮ পৌষ

৪০২ অপ্রকাশিত পত্র[৮৬]। পত্র। চতুষ্কোণ, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৫৮ পৌষ

৪০৩ পত্র[৮৭]। পত্র। বর্ষযাত্রী ১৩৫৯

৪০৪ পত্র[৮৮]। পত্র। স্মৃতিচিত্র : প্রতিমা দেবী ১৩৫৯ আশ্বিন

৪০৫ হংসনামা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৫৯

৪০৬ এসপার ওসপার[৮৯]। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৬০ ॥ লম্বকর্ণ

৪০৭ শান্তিনিকেতনে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ভাষণ[৯০]। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা : সুধীরচন্দ্র কর ১৩৬০ আশ্বিন

৪০৮ শিল্পের খতাখতি। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। শারদীয়া বসুমতী ১৩৬০

৪০৯ হানাবাড়ির কারখানা। উপন্যাস। মৌচাক ১৩৬১ বৈশাখ-কার্তিক ॥ হানাবাড়ির কারখানা ॥ রচনাবলী ৩

৪১০ সূর্য কি করতে এলেন[৯১]। সমকালীন ১৩৬১ শারদীয়

---

৮৫ অসিতকুমার হালদার -লিখিত 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চিঠিপত্রে)' প্রবন্ধে ১৬ খানি পত্র মুদ্রিত। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র ১৩৬৬, অবনীন্দ্র সংখ্যায় কয়েকখানি পুনর্মুদ্রিত।

৮৬ ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের রবীন্দ্রস্মৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে অধ্যাপক সুবোধরঞ্জন রায়কে লিখিত।

৮৭ শ্রীরবীন রায় লিখিত 'রূপের সন্ধানে' প্রবন্ধ -ভুক্ত।

৮৮ বিনয়িনী দেবীকে লিখিত।

৮৯ ভারতী আশ্বিন ১৩৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত নাটক যাত্রার পালায় রূপান্তরিত। অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশনায় ও সুর-সংযোগে জোড়াসাঁকোয় অভিনীত।

৯০ ভাষণের তারিখ সম্ভবত ১৩৪৮ চৈত্র।

৯১ জলে স্থলে নামক গল্পের (বুধবার ১৩২৯, ২৬ পৌষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত এবং প্রাচী ১৩৩০, ভাদ্র সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত) প্রথম খসড়া।

৪১১ উড়ো চিঠি (এয়ার মেল)[৯২]। প্রবন্ধ। সুচিত্রিতা ১৩৬১ শারদীয়

৪১২ বৃক ও মেষ পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া বসুমতী ১৩৬১

৪১৩ জাবালির পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৬১

৪১৪ অবনীন্দ্রনাথের পত্র[৯৩]। পত্র : পদ্যে রচিত। কথাশিল্প ১৩৬১ মাঘ

৪১৫ উড়ো পাখী। স্মৃতিকথা। সমকালীন ১৩৬২ বৈশাখ

৪১৬ এ কার জন্য। পদ্য। ঋতুপত্র ১৩৬২ গ্রীষ্ম সংখ্যা

৪১৭ পরবশ। প্রবন্ধ। সমকালীন ১৩৬২ শারদীয়

৪১৮ গজকচ্ছপের বৃত্তান্ত। গল্প। দেবালয় ১৩৬২ ॥ অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন ॥ রচনাবলী ৩

৪১৯ অবনীন্দ্রনাথের চিঠি[৯৪]। চিঠি। সমকালীন ১৩৬৩ বৈশাখ

৪২০ শ্রীকৃষ্ণ কথা। গল্প : অসম্পূর্ণ। টুকরো কথা ১৩৬৩ শ্রাবণ ॥ রচনাবলী ৩

৪২১ নল-দময়ন্তী। গল্প : অসম্পূর্ণ। টুকরো কথা ১৩৬৩ শ্রাবণ ॥ রচনাবলী ৩

৪২২ দুই পথিক ও ভল্লুকের পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া বসুমতী ১৩৬৩

৪২৩ ফসকান পালা। যাত্রার পালা। জয়যাত্রা ১৩৬৩ ॥ লম্বকর্ণ

৪২৪ কাক ও পনির পালা। যাত্রার পালা। মৌচাক ১৩৬৩ কার্তিক

৪২৫ অবনীন্দ্রনাথের চিঠি[৯৫]। চিঠি। সংযোগ ১৩৬৪ শ্রাবণ-আশ্বিন

৪২৬ অবনীন্দ্রনাথের অসমাপ্ত নাটিকা। সংযোগ ১৩৬৪ শ্রাবণ-আশ্বিন

৪২৭ দোকানীর গীত। পদ্য। রবিবার ১ম বর্ষ, হাতে খড়ি সংখ্যা ১৩৬৪

৪২৮ অবন ঠাকুরের ছড়া। ছড়া। রবিবার ১ম বর্ষ, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৬৪

৪২৯ তুড়ি জুড়ির কথা। রবিবার, ১ বৈশাখ ১৩৬৫

৪৩০ ইচ্ছাময়ী বটিকা। গল্প। রং-বেরং ১৩৬৫ জন্মাষ্টমী। রচনাবলী ৩

৪৩১ হালফ্যাসানে। পল্লীডাক, শারদীয় ১৩৬৫

৪৩২ পুতলীর পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া বসুমতী, ১৩৬৫

৪৩৩ 'বরফ ঢালা উত্তর বাতাস এ'। গদ্যছন্দ। কেয়া, শারদীয়া ১৩৬৫

৪৩৪ ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী পালা। যাত্রার পালা। মৌচাক ১৩৬৫ কার্তিক

৪৩৫ ছড়া। উত্তরসূরী ১৩৬৫ কার্তিক-পৌষ

৪৩৬ অবনীন্দ্রনাথের পত্র। ত্রিধারা, শীতসংকলন ১৩৬৫

৪৩৭ গোল্ডেন গুজ পালা। যাত্রার পালা। দেব দেউল ১৩৬৬

---

৯২ নাচঘর থেকে উদ্‌ধৃত।

৯৩ পৌত্র শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথকে লেখা।

৯৪ আচার্য নন্দলাল বসুকে লেখা।

৯৫ কন্যা সুরূপা দেবীকে লেখা। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র ১৩৬৬ অবনীন্দ্র-সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

৪৩৮ অবনীন্দ্রনাথের একটি কবিতা[৯৬]। রবীন্দ্র-ভারতী পত্রিকা, দীপাবলি সংখ্যা ১৩৬৬

৪৩৯ পত্র : ১[৯৭]। বিশ্বভারতী পত্রিকা, অবনীন্দ্র-সংখ্যা, কার্তিক-চৈত্র ১৩৬৬

৪৪০ পত্র : ১৬[৯৭] বিশ্বভারতী পত্রিকা, অবনীন্দ্র-সংখ্যা, কার্তিক চৈত্র ১৩৬৬

৪৪১ পত্র : ১৯[৯৭] বিশ্বভারতী পত্রিকা, অবনীন্দ্র-সংখ্যা, কার্তিক-চৈত্র ১৩৬৬

৪৪২ আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য। বাল্যরচনা। শারদীয়া বসুমতী ১৩৬৭

৪৪৩ ওল্যানের গ্রাণ্ড টৌটোলজি। শারদীয়া দেশ ১৩৬৭

৪৪৪ অপ্রকাশিত ছড়া। অপরূপা ১৩৬৭

৪৪৫ শ্রীমতী স্বয়ম্বর। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৬৮

৪৪৬ 'যতবার আয়না ধরে'। পদ্য। চতুষ্কোণ, শারদীয়া ১৩৬৮

৪৪৭ কবিতাগুচ্ছ। শারদীয়া অমৃত ১৩৬৮

৪৪৮ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা। গদ্যছন্দ। শারদীয়া যুগান্তর ১৩৬৮

৪৪৯ ঘোড়াহাটের পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া অমৃত ১৩৭০

৪৫০ উপরামায়ণ : হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান। শারদীয়া দেশ ১৩৭০ ॥
রচনাবলী ৩

৪৫১ কথামালার দেশে। পদ্য। শারদীয়া অমৃত ১৩৭১ ॥ রচনাবলী ৩

৪৫২ অরণ্যকাণ্ড পালা। যাত্রার পালা। মাসিক বসুমতী পৌষ ১৩৭২ - বৈশাখ ১৩৭৩

৪৫৩ আশীর্বচন। বিশ্বভারতী পত্রিকা, নন্দলাল বসু সংখ্যা ১৩৭৩

৪৫৪ দুঃসহ পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৭৩

৪৫৫ নীল খাতা মনের কথা[৯৮]। কয়েকটি রচনাংশ।
শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ : শ্রীরানী চন্দ, ১৩৭৯

৪৫৬ পত্রালাপ[৯৯]। পত্র। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ পত্রিকা ১৩৭৯

৪৫৭ পুরাতন লেখা[১০০]। স্মৃতিকথা সংকলন। রচনাবলী ১

৪৫৮ রবিকাকার পুষ্যিপুত্তুর। স্মৃতিকথা। রচনাবলী ১

৪৫৯ অগ্নি-উপাসক[১০১]। অনুবাদ কবিতা ॥ স্মৃতি :
শ্রীবিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, ১৩৭৯ জ্যৈষ্ঠ

---

৯৬ শিল্পী মনীষী দে -অঙ্কিত একটি চিত্রের পিছনে লিখিত। রবীন্দ্র-ভারতী পত্রিকা। সম্পাদক : ১৬ ভেঙ্কটরত্নম্ রোড, মাদ্রাজ ১৮।

৯৭ নন্দলাল বসু, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীমতী উমা দেবীকে লিখিত।

৯৮ শ্রীমতী রানী চন্দের সংগ্রহভুক্ত একটি নীল খাতায় লিখিত।

৯৯ নন্দলাল বসু ও শ্রীধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মাকে লিখিত।

১০০ সুরূপা দেবী -রক্ষিত খাতা থেকে কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনা।

১০১ শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক লিখিত 'অবনীন্দ্রনাথের কবিতা ও অপ্রকাশিত রচনা : অগ্নি-উপাসক' প্রবন্ধে সংকলিত বাল্যরচনা।

৪৬০ অবনীন্দ্রনাথের পত্র[১০২]। অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতি : শ্রীধারা ভট্টাচার্য। প্রবাসী বৈশাখ ১৩৮২

৪৬১ কবিতা[১০৩]। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ : শ্রীসুধা বসু। ১৩৮২ আশ্বিন

৪৬২ অবনীন্দ্রনাথের ছবি ও ছড়া [১০৪]। আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৮৩

৪৬৩ একটি কবিতা : দুটি পাঠ। কবিতা। আনন্দমেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৮৩

৪৬৪ রাবিশ রামায়ণ। আনন্দমেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ ভাদ্র ১৩৮৪

৪৬৫ যাত্রার আসর। কবিতা। সন্দেশ শারদীয়া ১৩৮৪

৪৬৬ রাত যখন বারোটা। ছড়া। আনন্দমেলা শারদীয়া ১৩৮৪

এই রচনাপঞ্জীতে পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত অবনীন্দ্রনাথের
অপ্রকাশিত রচনাগুলি অন্তর্ভুক্ত হল না।

অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সংবলিত গ্রন্থ

১ জেবুন্নিসা বেগম। সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। ১৩০৬

২ বিক্রমোর্ব্বশী নাটক : মূল সংস্কৃতের অনুবাদ। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩০৮

৩ অজন্তা। অসিতকুমার হালদার। ১৩২০

৪ রাজা বাদশা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩২৮

৫ মন্দিরের কথা। গুরুদাস সরকার। ১৩২৮

৬ Dissertation on Painting। Mohendranath Dutta। 1922

৭ ফুলকারী (প্রথম খণ্ড)। নন্দলাল বসু। ১৩৩৬

৮ সীবনী। ইন্দুসুধা ঘোষ। ১৩৩৭

৯ শিরনী, দরজীর শাস্তর। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন। ১৩৪০

১০ মরাল। মৌলভী কাজী কাদের নওয়াজ। ১৩৪৩

---

১০২ পৌত্রী শ্রীমতী ধারা ভট্টাচার্যকে লেখা কয়েকটি স-চিত্র পত্র।

১০৩ স্বহস্তে অঙ্কিত ছবি বা নকশা চিত্র-সহ রচিত।

১০৪ স্বর্গত শিল্পী প্রশান্তকুমার রায়কে উপহৃত তিনটি স-চিত্র ছড়া। শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা-সহ প্রকাশিত।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশের স্থান : ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ৭১

২. প্রকাশের সময়-ব্যবধান : ত্রৈমাসিক

৩. মুদ্রক : শ্রীরণজিৎ রায় (ভারতীয়)
১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ৭১

৪. প্রকাশক : শ্রীরণজিৎ রায় (ভারতীয়)
১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ৭১

৫. সম্পাদক : শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ (ভারতীয়)
উপাচার্য বিশ্বভারতী। শান্তিনিকেতন। বীরভূম

৬. স্বত্বাধিকারী : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
পোঃ শান্তিনিকেতন। বীরভূম। পশ্চিমবঙ্গ

আমি, শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উল্লিখিত তথ্য আমার বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

১০ অক্টোবর ১৯৭৭

স্বাঃ শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ

বর্ষ ২৯ . সংখ্যা ৪

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৪

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

সম্পাদক

শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ

বিশ্বভারতী পত্রিকা

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশের স্থান : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

২. প্রকাশের সময়-ব্যবধান : ত্রৈমাসিক

৩. মুদ্রক : শ্রীরণজিৎ রায় (ভারতীয়)
৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

৪. প্রকাশক : শ্রীরণজিৎ রায় (ভারতীয়)
৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

৫. সম্পাদক : শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ (ভারতীয়)
উপাচার্য বিশ্বভারতী। শান্তিনিকেতন। বীরভূম

৬. স্বত্বাধিকারী : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
পোঃ শান্তিনিকেতন। বীরভূম। পশ্চিমবঙ্গ

আমি, শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উল্লিখিত তথ্য আমার বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

৩১ মে ১৯৭৮ স্বাঃ শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৪ · ১৮৯৯ শক
সম্পাদক শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ ● সহযোগী সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য তিন টাকা

চিত্র　　　　　　　　　　　　　　　　　　শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৪ • বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৪ • ১৮৯৯ শক

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

১

ওঁ

তাজমহল হোটেল
বোম্বে

কল্যাণীয়েষু,

যাত্রারম্ভে টাকারে আমাতে এক গাড়িতে ছিলুম। শেষকালে খড়্গপুরে কুপেখানা দখল করে আরাম পাওয়া গেল। তার স্নানের ঘর প্রভৃতিও অন্য গাড়ির চেয়ে ভালো। পথে ভালোই ছিলুম। এখানে এসে ক্লান্তি বোধ হচ্চে— একটু বিশ্রাম করলেই কেটে যাবে।

তোদের কাছ থেকে কোনো খবর না পেয়ে উদ্বিগ্ন আছি। সুধাকান্তের যাওয়া হবে কিনা বুঝতে পারচি নে। না হলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হবেনা। অপূর্ব্ব চালিয়ে নেবে। সুধীন্দ্র প্যাক করতে নিপুণ। টাকারও বেশ কাজের লোক। এখানে এসে দেখি চাবি নেই। বোধ হয় সুধাকান্তের কাছে রয়েছে। নতুন চাবি করিয়ে নিতে হল।

মহাভারতের[১] নিছক গল্প অংশটুকুকে চিহ্নিত করে দিয়েছি। ওর প্রথম অংশটা বাদ পড়বে। যেখান থেকে পাণ্ডব কৌরবের বাল্যলীলা সুরু হয়েচে সেখান থেকে বই আরম্ভ হবে। পেনসিল দিয়ে ঘেরা অংশগুলো ত্যাগ করতে হবে। শেষের অনেকখানি বাদ। সবসুদ্ধ বোধ হয় ১৫০/২০০ পাতার বেশী হবেনা। খুব আঁট করে দিয়েছি— পড়তে বেশ ভালো লাগবে। এটা স্কুল পাঠ্য হবার বাধা নেই। বইটা যদি আমরা নিজের খরচে ছাপাই তাহলে সংসদওয়ালাদের এর আয়ের ভাগ দিতে হবে

---

১ মহাভারত— সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকলিত 'মহাভারত' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংশোধিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে 'কুরুপাণ্ডব' নামে প্রকাশিত হয়।

না। আমার সেই ইচ্ছে। ইংরেজি সোপানটাও সেইরকম ছাপিয়ে বিদ্যালয়ে চালাবার চেষ্টা করলে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হবে। এইরকম লাভের টাকা নিজের হাতে নিয়ে নিজের ইচ্ছামত আমি খরচ করতে চাই।

বাংলা সহজপাঠ দুইখণ্ড কলাভবনকে দিয়েছি। ছবি নন্দলালেরাই করচে। তার উপর ছাপার খরচ অতি সামান্যই হবে। আমি ইচ্ছা করি এটা নন্দলালেরা কলাভবন থেকে ছাপিয়ে এর উপস্বত্ব সম্পূর্ণ নিজের হাতেই নেন। এর পরিশ্রম সম্পূর্ণ আমার এবং আর্টিস্টদের, অথচ ছাপবার অতি সামান্য খরচের খাতিরে লাভের বড়ো অংশটাই যে সংসদের হাতে পড়ে এ আমি চাইনা।

অম্বালাল এখানে বেশ ভালো ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আগামী কাল বেলা চারটের সময় আমাদের জাহাজ ছাড়বে। আরো একদিন কলকাতায় থাকতে পারতুম। কিন্তু ভালোই হয়েচে। বিদায় নিতে যতই দেরি করা যায় ততই ক্লান্ত করে তোলে।

বাংলা নটীর পূজা এক কপি সঙ্গে থাকা ভালো। ডাকে পাঠিয়ে দিলে আমরা পৌঁছবার আগেই পৌঁছবে।

রাজা ও রাণীর সংশোধিত কপিটা পেলে পথের মধ্যে ওটা তর্জ্জমা করে দিতে পারব। আমার বিশ্বাস ওটা সিনেমাতে গ্রাহ্য হতে পারে।

বিদ্যালয়ের সমস্ত ভারটা নিলে বুঝতে পারবি ওর কোথায় কি অভাব আছে। কিছু কিছু সংশোধনের দরকার হবে। ইংরেজি পড়াবার লোক কমতি পড়েচে— সে কথাটা ভেবে দেখিস্।

বেনোয়াকে শ্রীমতীভবনটা[1] দিতে প্রতিশ্রুত হয়েচি। সে পুপেকে ফরাসী শেখাবার জন্যে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গেই প্রস্তুত। আমি সেইজন্যেই আরো বিশেষ করে রাজি হলুম। আমি জানি ও কাজে লাগবে।

অম্বালাল ছুটির সময়টা গান শেখাবার জন্যে বামনকে চেয়েচেন। তাতে আপত্তির হেতু নেই।

বৌমাকে বলিস্ বিদ্যালয়ের যে কোনো উপলক্ষ্যে ছেলেমেয়েদের নাচ শেখানো যেন চলতে থাকে। নটীর পূজা অভিনয় হতে পারলে ভালোই হবে। অম্বালালরা গরমের ছুটিতে কাশ্মীরে যাবেন। আজ তিনি একটা ডিনারপার্টির আয়োজন করেচেন— সে আর এড়ানো গেল না। কলম্বোতে গিয়ে আশা করি তোদের খবর পাব। ইতি ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাভারত বইখানা অমিয়র নামে রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠানো হল।

---

১ শ্রীমতী ভবন— শ্রীমতী ঠাকুর (হাতি সিং) -এর 'গুর্জ্জরী' নামক গৃহ।

২

P & O, S. N. Co.
S. S.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

রথী, অপূর্ব্বকে মাঝে মাঝে ভূতে পায়। দুতিন দিন থেকে বিনা কারণে ওর মনে দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে সঙ্গী ও সহায়রূপে ওকে আমি অনাবশ্যক মনে করি। অথচ এমন কথা আমি চিন্তাও করিনি, উচ্চারণও করিনি। ওর উপর মুহূর্ত্তের জন্যে আমি বিরক্ত হইনি। ও না এলে আমার চলতই না। যাক্— বোধ হয় ওর হজমের গোলমাল চলেচে। প্রথম কয় দিন সুবিচার করে খায় নি। তবু মাঝে মাঝে আনন্দ প্রকাশ করেচে ওর ট্রাউজারের বেষ্টন কটিদেশের কাছটাতে ঢিলে হয়ে এসেচে। কিন্তু ওর কটিদেশের ভূগোল বৃত্তান্তে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে বলে মনে হয় না— কৃশতাসাধনের তপস্যার কথা মাঝে মাঝে আলোচনা করে কিন্তু যথাসময়ে সেটা ভুলে যায়। আজ আমরা সিঙ্গাপুরে পৌঁছব। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে— দুই এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়েচে। আজ সন্ধ্যাবেলা থেকে কাল সন্ধ্যাবেলা পর্য্যন্ত জাহাজ বন্দরে থাকবে। আজ সমস্ত রাত কয়লা বোঝাই করবে। অতএব ডাঙায় আশ্রয় নেওয়াই শ্রেয় হবে। তার মানে ডাঙার লোকের ভিড়ের মধ্যে এক চোট দুঃখ পেতে হবে। মালয় উপদ্বীপ আমার ভালো লাগে না— সিঙ্গাপুর সহরটা লেশমাত্র মনোরম নয়। কানাডার জন্যে লেকচার একটু একটু করে লিখতে আরম্ভ করেছি— যথেষ্ট এগোয় নি— ক্লান্ত শরীরে লিখ্‌তে ইচ্ছা করে না। জাহাজের কাপ্তেন ও অন্যান্য সকলেই আমাদের যত্ন করচে— এ পর্য্যন্ত কোনো অসুবিধেই হয় নি। সহযাত্রাদের মধ্যে দুই এক জন উচ্চ শ্রেণীর আমেরিকান আছেন— তাঁদের সঙ্গে কথা কয়ে খুসি হয়েছি। তাঁদের দ্বারা আমাদের বিশেষ সাহায্য হবে বলে আশা করা যাচ্চে। আমাদের ভারতীয় সহযাত্রীরা বোধ হয় আমাদের কিছু সাহায্য করবেন। যদি টাকা ওঠে তবে প্রেসিডেন্ট ফণ্ডে জমা করতে হবে— আশু যে সব অভাব আছে দূর করা চাই। মেয়েদের জন্যে যথোচিত পরিমাণে পায়খানা ঘরের ব্যবস্থা করা আবশ্যক— তার কি কিছু আয়োজন হয়েচে— শীঘ্র এই বন্দোবস্ত না হলে ওদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর ও অব্যবস্থাজনক হবে। ইতি ১০ মার্চ্চ ১৯২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

P & O. S. N. Co.
S. S.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

জাহাজে গুড্‌রিচ বলে একজন বড়োদরের আমেরিকান চলেচেন। চীন গবর্মেণ্ট এঁকে ফিনান্‌স সম্বন্ধে পরামর্শদাতারূপে নিমন্ত্রণ করেচেন। বিশ্বভারতীর জন্যে টাকা তোলা নিয়ে এঁর সঙ্গে অনেক আলোচনা হয়ে গেচে। অনেক লোককে ইনি চিঠিপত্র দিয়েচেন— সেগুলি যথাসময়ে কাজে লাগ্‌বে। মোটের উপর এঁর বক্তব্য হচ্চে এই যে একজন ব্যবসায়ী পাকাবুদ্ধি টাকা সংগ্রাহক নিযুক্ত করতে হবে। সে

শতকরা দশটাকা নিজের লাভস্বরূপ নেবে। যত টাকা তুলতে পারে ততই তাদের লাভ। বিজ্ঞাপন ও প্রচার কার্য্যের ভার সেই সম্পূর্ণ নেবে। এই প্ল্যানে আমাকে প্রায় কিছুই করতে হবেনা— কখনো কখনো দৈবাৎ কারো বাড়িতে গিয়ে লাঞ্চ খাওয়া প্রভৃতি সামাজিক কর্ত্তব্য করতে হবে। এদের বিশ্বাস, এই রকম প্রণালীতে খুব বড়ো অঙ্কের টাকা পাওয়া অসম্ভব নয়। গুড্‌রিচ সাহেবের জানা একজন পাকা লোকের নাম তিনি দিয়েচেন— এই লোকটি অনেক য়ুনিভসির্টির জন্যে অনেক টাকা তুলেচে। টাকারও এই শ্রেণীর যোগ্য লোকদের সন্ধান জানে।

এর মধ্যে একটুখানি মুস্কিলের কথা এই যে জুন জুলাই অগষ্ট এই তিন মাস টাকা তোলার পক্ষে সব চেয়ে খারাপ মাস। তাই গুড্‌রিচের পরামর্শ এই যে ঐ তিন মাস য়ুরোপে কাটিয়ে সেপ্টেম্বর অক্টোবর নবেম্বর আমেরিকায় এসে আমাদের অভিযান সুরু করা। বড়ো অঙ্কের টাকা পাবার আশা এতটা বেশি আছে যে, এই দুঃখটুকু স্বীকার না করা অন্যায় হবে। আমেরিকায় পৌছিয়ে কার্য্যকর্ত্তার সঙ্গে পরামর্শ করে এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করতে পারব— এখন নিশ্চিত বলতে পারচিনে। লস এঞ্জেলিসে খুব বেশি কিছু পাব বলে মনে হয়না— অবশ্য চেষ্টা করতে হবে। কানাডায় কি হতে পারে মেজর নী তার পরামর্শ দিলে সেই অনুসারে কাজ করব। এমন হতেও পারে গরমের ঐ তিনমাস কানাডায় কাটালে স্বাস্থ্য ও স্বার্থ দুইয়ের পক্ষেই ভালো হবে। অভিনয়ের সফলতার পরিমাণ কতটা তা আগে থাকতে বলতে পারিনে। আমাদের তারের অপেক্ষা না করেই তোরা যদি আসিস্ তবেই সময়মত এখানে পৌছতেও পারিস। কারণ যদি অভিনয় করতে হয় মে মাসের মধ্যেই করতে হবে। জুনের মাঝামাঝি য়ুনিবর্সিটি বন্ধ হয় এবং বন্ধ হবার আগের দুই হপ্তা সবাই অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে। আসল কথা গ্রীষ্মের সময়টা য়ুরোপে আমেরিকায় উপযুক্ত সময় নয়। আজ রাত্তিরে জাহাজ হংকং পৌছবে— সেখানে গবর্মেণ্ট হৌস থেকে হয়তো যাত্রার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরো কিছু খবর পাওয়া যাবে, তার বিবরণ অপূর্ব্বর কাছ থেকে পাবি। যত উত্তরের দিকে এগোচ্চি ঠাণ্ডা বেড়ে চল্‌চে। জাপানে আরো বেশি শীত পাওয়া যাবে। সমুদ্র শান্ত, শরীর ভালোই। মনে হচ্চে, আর কিছু না হোক্, শরীর সুস্থ করে নিয়ে যেতে পারব। লেকচারটা একটু একটু এগিয়ে চলেচে। ক্যাবিন ভালো, স্টুয়ার্ড ভালো, কাপ্তেন ভালো, যাত্রীরাও ভালোই— জাহাজও ভালোতম জাহাজের মধ্যে একটা। অপূর্ব্ব ফুর্ত্তিতে আছে, সুধীন্দ্রও সবার সঙ্গে বনিয়ে নিয়েচে— টাকারও কোনো উৎপাত করেনা এবং আশা করি কাজে লাগবে। ইতি ১৪ মার্চ্চ ১৯২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

REPULSE BAY HOTEL
HONGKONG

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আজ সকালে ৬টার সময় হংকঙে এসে পৌছলুম। ধোঁয়াতে কুয়াশায় আকাশ আচ্ছন্ন। চারদিকে গোলমাল, নানাপ্রকারের আওয়াজ। ভালো লাগল না। বন্দরে একদল ভারতীয় লোক দাঁড়িয়ে। বুঝলুম আমার উপর জুলুম চল্‌বে। আগের রাত্তিরে এক মার্কনিগ্রাম পাওয়া গেল— রতনজি নামধারী কোন লোক জানিয়েচে যে সে গবর্মেণ্ট হৌসে গিয়ে এভিকংদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এসেচে আমি তার বাড়িতে গিয়ে থাকব। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। কেননা আমার ইচ্ছে ছিল এখানে নমাজির আতিথ্য ভোগ করব। ওরা যখন সবাই জাহাজে উঠে এল তখন রতনজিকে দেখলুম— লোকটি পার্সি,— মদ বিক্রি করে। আরবারে তার দোকানের দোতলায় আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত দুঃখ দিয়েছিল। আমি বল্লুম আমার শরীর ভালো নেই আমি নামবনা। এদিকে নমাজি আমার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেচেন— কিন্তু লোকটি অত্যন্ত ভদ্র বলে একটুও টানাটানির চেষ্টা করলেন না। ঐ পার্সিটা গবর্মেণ্ট হৌসে গিয়ে বলে এসেছিল যে আমি তার বাড়িতেই থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছি, আমি গবর্ণরের আতিথ্য নিতে চাইনে ইত্যাদি। শুনে তখনি অপূর্ব্বকে গবর্মেণ্ট হৌসে পাঠিয়ে দিলুম, এবং নমাজিকে বল্লুম আমি তাঁরই আতিথ্য নেব। এদিকে টেলিফোন যোগে এভিকং আমাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। নমাজিকে সহায় করে সেখানে খেতে গেলুম।— বড়ো ভালো লাগ্‌ল। গবর্ণর অক্‌সফোর্ডের লোক— খুব ভদ্র। তাঁর ওখানে আর একজন লোক ছিলেন, তিনি আমার এমন বই নেই যা পড়েন নি। আমাকে খুবই শ্রদ্ধা করেন, আর আমার লেখা খুব গভীর ভাবে বুঝেচেন। ইনি কেম্‌ব্রিজের। সব সুদ্ধ এখানে নিমন্ত্রণে এসে আমার ভারি ভালো লাগল। এঁদের ইচ্ছা ছিল আসচে মঙ্গলবারে আমাকে একটা বড়ো গোচের নিমন্ত্রণে ডাকেন। কিন্তু কাল সকালেই চলে যাব শুনে তাড়াতাড়ি লাঞ্চের ব্যবস্থা করেচেন। লাঞ্চের পর ওঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হল, খুব আনন্দ পেলুম। লাঞ্চের পর এই হোটেলে এসে আশ্রয় নিয়েচি। বড়ো সুন্দর জায়গা। পাহাড়ের উপরে— সাম্‌নে সমুদ্র— ছবির মতন। নমাজি এইখানেই আমাদের জন্যে জায়গা করেচেন— নিজের বাড়িতে করেন নি পাছে গোলমালে আমাকে ক্লান্ত করে। এদিকে এখানকার ভারতীয় লোক এখানে আমার সঙ্গে দেখা করে কিছু টাকা দেবার আয়োজন করচেন। আজ বিকেলে ছটার সময় যাব। কত টাকা ঠিক জানিনে— যাই পাই প্রেসিডেণ্ট ফাণ্ডে জমা করতে চাই। খুব সম্ভব সাঙ্‌ঘাই ও কোবেতেও কিছু পাওয়া যাবে। দেখব যদি পার্সি অধ্যাপনার জন্যে কিছু জোগাড় করতে পারি। নমাজি হচ্ছেন খাঁটি পারসিক। এণ্ড্রুজের কাছ থেকে আজ খবর পেলুম তিনি ভ্যাঙ্‌কুভরে আমার সঙ্গে এসে মিল্‌বেন। মেজর নে অপূর্ব্বকে সুন্দর একটি চিঠি লিখেচেন— তাঁর ইচ্ছে আমি তিনটে বক্তৃতা করি— আসলে আমাকে নিয়েই ওঁরা কন্‌ফারেন্‌স জমাতে চান। ওখানে গেলে সব অবস্থা ভালো করে বুঝতে পারব। অপূর্ব্বও শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলে এইটে ওঁরা ইচ্ছা করেন। সেই স্লাইডগুলো নিয়ে আমাদের আশ্রম সম্বন্ধে ভালো করে কিছু বল্‌তে পারে ত ভালো হয়। এণ্ড্রুজ নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে কিছু বল্‌বেন। আমাদের সহযাত্রী ডক্‌টর মট্‌ (Y. M. C. A. র Gen. Sec) বলেচেন কানাডার

লোকদের খুব দেবার শক্তি আছে। কাল সন্ধের সময় ছেলেদের বিশেষত মেয়েদের শিক্ষার সম্বন্ধে আমার মত তাঁকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলুম। তিনি বললেন, যদি ঠিক এই কথাগুলিই ঠিক জায়গায় এই মতো করে বলি, তাহলে টাকা পাবার অভাব হবে না। দেখা যাক্।

ওখানকার খবর সব ভালোই, আশা করচি। শিক্ষার ব্যবস্থায় বারম্বার হাত বদল যদি না ঘটে ও ফাঁক না পড়ে তাহলে এখন থেকে ছেলে বাড়তে পারবে। ইংরেজি সহজ শিক্ষা ও বাংলা সহজ পাঠ ছাপতে যেন দেরি না করা হয়। মহাভারতটা ত পেয়েছিস ?

বৌমাকে বলিস্ নাচ শিক্ষাটা যেন কিছুতেই বন্ধ না হয়। ইতি ১৫ মার্চ্চ ১৯২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পত্র সংখ্যা ১

টাকার—Boyd G. Tucker। আমেরিকার মেথডিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত উচ্চশিক্ষিত পাদরি। শান্তি-নিকেতনের কর্মী

সুধাকান্ত—শান্তিনিকেতনের কর্মী ও একদা রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

অপূর্ব—অধ্যাপক অপূর্বকুমার চন্দ

সুধীন্দ্র—কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

নন্দলাল—শিল্পী নন্দলাল বসু

অম্বালাল—গুজরাটি ধনী ব্যবসায়ী অম্বালাল সারাভাই

বামন—ক্ষীরোদকর বামন। শান্তিনিকেতন সংগীতভবনের মারাঠি ছাত্র

বেনোয়া—Fardinand Benoit। শান্তিনিকেতনের ফরাসী অধ্যাপক

পুপে—পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনী দেবী

পত্র সংখ্যা ৪

রতনজি—J. H. Rattanjee

নমাজি—হংকং প্রবাসী ইরানী ব্যবসায়ী মোহম্মদ আলি নামাজি। ১৯২৭ সালে মালয় ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ এঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

গভর্নর—Sir Cecil Clements

সান্ধ্যরবিচ্ছায়া ও দুজন আধুনিক কবি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, শব্দের আভিধানিক অর্থ যুগে যুগে, পাত্রে পাত্রে সমান থাকলেও, প্রধান কবিদের হাতে তার অনুষঙ্গের হেরফের ঘটেছে বারে বারে। হাতের কাছে এর অকাট্য প্রমাণ হিসাবে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 'রক্ত' শব্দের অনুষঙ্গ আর নজরুলের 'রক্ত' শব্দের অনুষঙ্গ এক নয়। দূরের উদাহরণ ইংরেজি 'লিলি'। মধ্য ভিক্টোরীয় যুগে যা ছিল শুভ্র সারল্যের স্মৃতিবহ, প্রি-র‍্যাফেলাইটদের হাতে তা-ই হল নীরক্ততার প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের 'নদী' আর জীবনানন্দের 'নদী' এক অর্থের আকাশ নিয়ে আসে না। এর নানা কারণের মধ্যে অন্যতম একটি বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। যে-কোনো বড়ো কবির স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বকে ঠিকমত বুঝে নেবার একটা বিশেষ পন্থা হল সেই কবির সময়-চেতনাকে ঠিকমত চিনে নেওয়া। সময়ের জটিলতাকে কবি কোন্ দ্বান্দ্বিক সমগ্রতায় উপলব্ধি করেন সেটাই এ প্রসঙ্গে আমাদের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। 'মৃত্যু' এই শব্দটি রবীন্দ্রনাথের জীবনে তিনবার তিনরকমের অনুষঙ্গ বয়ে এনেছে। এটা কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনার পরিবর্তনের ফল নয়, কবির সময় চেতনারও বিশিষ্ট সাক্ষ্য বটে।

সময়ই কবির মৃত্যু-চেতনার পরিমাপক। সুতরাং জীবনচেতনারও পরিমাপক সময়। সময়কে অনন্তের সঙ্গে একীভূত করে নিয়েছিলেন বলেই প্রাচীন ভারতীয়েরা ট্র্যাজেডি লিখলেন না। খণ্ডকালকে আত্যন্তিক বেদনায় এবং বিক্রমে গ্রহণ করে পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি অমরত্ব পেল। সময় সম্বন্ধে এই বোধ যদি পৃথিবীর কোনো দেশে আজও অগৃহীত থাকে, পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির আবেদনে সে সম্যক সাড়া দিতে পারবে না। সময়-চেতনার প্রভেদ কেমনভাবে একই কালে পরিবর্ধিত দুই কবির জীবন-মৃত্যু-চেতনায় পার্থক্য সৃষ্টি করে রিল্‌কে ও রবীন্দ্রনাথ তার প্রমাণ। ডুয়িনো এলেজি'র (১৯২৩) ভাষ্য উপলক্ষে রিল্‌কে বলেছিলেন যে, এলেজিগুলিতে জীবন ও মৃত্যুকে অভিন্ন স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা মেনে নিলে সেই সীমাবদ্ধতায় প্রবেশ করতে হয়, যার মধ্যে আছে সমস্ত অনন্তকে পরিবর্জন। মৃত্যু জীবনের সেই অংশটা যা আমাদের দৃষ্টির বাইরে। রিল্‌কে বলেছেন, আমাদের অস্তিত্বের পূর্ণচেতনা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে— which is the same in two unseparated realms; ইহলোক বলে কিছু নেই, পরলোক বলে কিছু নেই। যা আছে তা এক পরম ঐক্য— great unity। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-চেতনা রিল্‌কে থেকে পৃথক। 'বলাকা' (১৯১৭) পর্বেই তাঁর মৃত্যু-চেতনা পরিণতি পেয়েছে। 'বলাকা' কাব্যে কবিতার সংখ্যা ৪৫, আর 'মৃত্যু' বা 'মরণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৩০ বার। এ মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ জেনেছেন অমৃতময় জীবনকে আত্মীকরণের

---

১ এর পূর্বে 'শান্তিনিকেতন'-গ্রন্থের 'আত্মার প্রকাশ'-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— 'অহং আপনার মৃত্যুর দ্বারাই আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করে'। ঐ প্রবন্ধেই তিনি আরো বলেন যে, জন্মমৃত্যুর দ্বারগুলি আত্মার গতির পরিমাপ করছে মাত্র। এটাই কি সময়ের সঙ্গে ব্যক্তির বোঝা পড়ার প্রশ্ন নয়? বিশেষ আমরা যখন বঙ্গভঙ্গের যুগের সামগ্রিক পটভূমিকায় ব্যাপারটি চিন্তা করি?

একটা পন্থা রূপে। মৃত্যুকে পার হয়ে লাভ করতে হবে অমৃত, ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে সামাজিক মানুষের হয়ে এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বলাকা'য়[১]। 'পূরবী' (১৯২৫) কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বললেন নিজের পক্ষ থেকে আরেক কথা। 'কঙ্কাল' কবিতাটির মূল কথা আমরা এক্ষেত্রে স্মরণ করতে পারি— 'আমার মনের নৃত্য, কতবার জীবনমৃত্যুরে / লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে'। রিল্‌কে জেনেছিলেন— there is neither here, nor a beyond but the great unity, in which those creatures who surpass us, the angels are at home। সেখানে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে কোনো দেবদূত বা ঈশ্বরের কথা বললেন না। 'বলাকা'য় মৃত্যুর বিজয়ী প্রতিযোগী 'অমৃত'। 'পূরবী' থেকে মৃত্যুর বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী 'সুন্দর'। তাঁর 'সুন্দর' জীবন-মৃত্যু-নিরপেক্ষ চিরন্তনত্বের কথা বলে। সঙ্কটাতুর য়ুরোপে রিল্‌কে জানতে চেয়েছিলেন এই জড় বিশ্বে মানুষের ঠিকানা। খুঁজতে খুঁজতে তিনি পেয়ে গেলেন এক পরম পূর্ণকে— যার মধ্যে নশ্বর ও শাশ্বত, জীবন ও মৃত্যু 'অবিচ্ছেদ্য এক অঞ্চল' -রূপে চিরবিদ্যমান। সেই বিশ্বসংকটেরই মধ্যে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ হয়তো ভারতীয় ধ্রুবত্বের কথা বলেছেন, বলেছেন 'চিরন্তন এক'-এর কথা। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সার কথা হল 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ লইনু শরণ'। তাঁর কাছে মৃত্যু জীবনের মাত্রা। এই মৃত্যুমাত্রিক জীবন-ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ অনন্তের মুক্তছন্দে রূপায়িত করে বুঝে নিতে গিয়েছিলেন। 'এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা'— তাই শুধু জন্মদিনের প্রাসঙ্গিক উক্তি মাত্র নয়।

২

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে, কিংবা বলা ভালো, বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভ থেকেই সময় দ্রুতলয় হয়ে ওঠে। সেই জটিল দ্রুতলয়ের ফলে বস্তুবিশ্বের প্রতি অধিকতর মনোযোগের দাবি প্রবলতর পেল, ডাক এল অবচেতনের গভীরে অবতরণের জন্য, আহ্বান অনুভূত হল স্বপ্নলোকের মতো অসংলগ্ন তৎকালীন নানা বিপরীতের মালা গাঁথার— এবং এ-সবই ছিল সেই সময়কে অঙ্গীকারের লক্ষণ। ফর্মের ভাঙাচোরা এই সাক্ষ্যই দেয় যে, রবীন্দ্রনাথ এবং তরুণ কবিরা সকলেই এক নূতন সময়-চেতনার— সুতরাং নূতন জীবন-মৃত্যু-বোধের— অন্তর্বর্তী হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যে নিজেও অনুভব করছিলেন এই জটিল উদ্‌ভ্রান্ত সময়ের চাপ, তার প্রমাণ রয়েছে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত দুখানি পত্রে। ১৯৩৬ সালে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীকে তিনি লিখেছিলেন— 'ক্ষণিকায় আমি ত্রিশবছর বয়সে যে কবিতা লিখেছি, আজ আমি সে কবিতা লিখিনে।' ১৯৩৯ সালে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীকেই তিনি আবার লেখেন— 'বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে। এত রকম চল্‌তি খেয়ালের উপর তার দর যাচাই হয়, খুঁজে পাইনে তার মূল্যের আদর্শ। ঐতিহাসিক এক একটা অপঘাতে সাহিত্য-সেতারের কানে মোচড় লাগায়।'[১] ঐ চিঠিতেই

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড, পৃ ২২৪

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, এতদিনের স্থির পৃথিবীটা 'ভূমিকম্পের পৃথিবী হয়ে উঠেছে— মনোলোকের অবচেতন স্তরে যে আগুন চাপা ছিল সে হয়েছে চঞ্চল—'। 'সাজানো কিছুর উপর শ্রদ্ধা নেই—।' কিন্তু তাই বলে চির অশ্রান্ত শিল্পী রবীন্দ্রনাথ পশ্চাদপসরণ করেন নি ঐ পরিবর্তমান বস্তুজগতের প্রাধান্য বিস্তারের সামনে। বরঞ্চ তিনের দশকে দেখা গেল প্রখর আত্মসচেতনতায় ও বস্তুজ্ঞানে তিনি আয়ত্ত করলেন নব নব ফর্ম-এর জটিল দুরারোহ শৃঙ্গ। ছবি, নৃত্যনাট্য, গদ্যছন্দের কাব্য তাঁর শৈল্পিক অক্লান্ততার নিদর্শন। অবচেতনের রহস্যঘন আলো-আঁধার তাঁর তখনকার কবিতার চিত্রকল্পে, ছবিতে এবং 'শ্যামা' ও 'চিত্রাঙ্গদা'-র মতো নৃত্যনাট্যে প্রকাশ পেয়েছে।

অমিয় চক্রবর্তী সেই-সব আধুনিক কবিদের অন্যতম, যাঁরা সান্ধ্যরবিচ্ছায়ায় আকাশ পটে দেখা দিয়েছেন, এবং রবি-কিরণে স্নাত হতে হতেই নিজ দীপ্তিকে গাঢ় করে তোলার শক্তি ও পটভূমি পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁর কনিষ্ঠ সহযাত্রী হিসাবেই অমিয় চক্রবর্তী জেনেছিলেন—

ক. কবিতার জগৎ ও গদ্যের জগতের মাঝখানের দরজাটি খুলে দিতে হবে ;

খ. মৃত্যু ও বিনষ্টির মধ্যে থেকেও যথাসম্ভব তার দ্বারা অস্পৃষ্ট থাকতে হবে ;

গ. রূপের জগতের কথা বলতে বলতেই আভাস দিতে হবে অধরা অরূপের। রূপ-বিরূপের অচ্ছেদ্য অখণ্ডতা তন্ময় দৃষ্টিতে ধরে নিতে হবে।

কোনো কবির ভূমিকাই সরলীকৃত ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হতে পারে না। অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য সাধনারও কোনো 'সরল-করা' সম্ভব নয়। পূর্ব অনুচ্ছেদে কথিত বৈশিষ্ট্য-সূত্র তিনটির সাহায্যে আমরা শুধু তাঁর কাব্যের চারপাশটা জরিপ করতে পারি। প্রকৃত কবির দেখা পাওয়া যাবে একমাত্র তাঁর কবিতার মধ্যে। অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা-গ্রন্থ 'খসড়া'। 'খসড়া' বিষয়ে ও প্রকাশে নূতন দিগন্তের উন্মোচক। কথ্য স্রোতের টানকে কবিতার পঙ্‌ক্তিতে ধ্বনিত করে— পরিদৃশ্যমান সংসার-ছবিকে পৃথক তুলির টানে এঁকে দিয়ে এই কবি তখন জীবনকেই বুঝতে চেয়েছেন তার নিহিত এবং প্রকাশিত রূপের সমগ্রতায়। দৃশ্য 'খসড়া' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম সম্পদ। কবির কৃতিত্ব সেই দৃশ্যকে চরিত্রবান করে তোলায়। বুদ্ধদেব বসু অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা আলোচনায় বলেছিলেন কবির 'প্রকৃতি-বর্ণনাও পাথরের উপর খোদাই করা কাজের মতো গভীর ও সাকার'[১]। কিন্তু আমাদের মনে হয় অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ভাস্কর্য-প্রতিমা অপেক্ষা চিত্রল বর্ণাভার প্রাধান্য বেশি। তাঁর 'সমুদ্র' কবিতাটিকে এই প্রসঙ্গে আমরা আলোচনার জন্য নিতে পারি। এই কবিতায় বর্ণিত সমুদ্রে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন এক বিরাট অন্তহীন কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত— 'সমুদ্রের নীল কারখানা, লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের চাকা উঠছে পড়ছে, পৃথিবীকে বানিয়ে তোলবার মজুরি চলছে দিনরাত্রি'[২]। 'সমুদ্রের ভিতর পৃথিবী রচিত হচ্ছে'— এ অনুভূতির ইঙ্গিত বাঙালি কবির পাবার কথা হয়তো রবীন্দ্রনাথেরই 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা থেকে। 'পূরবী'-র 'সমুদ্র' কবিতাতেও সমুদ্র কল্পিত হয়েছে এক তরল রঙ্গশালার চিত্রকল্পে। এই ইঙ্গিত দুটি স্মরণে রেখেই অমিয় চক্রবর্তীর সমুদ্র ধারণ করেছে এক আধুনিক কর্মশালার রূপক। সমুদ্র দেখলেই আধুনিক

---

১ 'কবিতা', পৌষ ১৩৪৫

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড, পৃ ৩৭১

কবির 'অশ্রান্ত বিরহী'-র কথা মনে পড়া উচিত নয়— বুদ্ধদেব বসুর এই কটাক্ষ অন্য রোমান্টিক কবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও রবীন্দ্রনাথের বেলায় খাটে না। যদি আমরা অমিয় চক্রবর্তীর সমুদ্র-বর্ণনার এই অংশের :

'নীল জল। লক্ষ লক্ষ চাকা। মর্চে পড়া। শব্দের ভিড়ে'
পুরনো ফ্যাক্টরি ঘোরে।
নিযুত মজুরি খাটে পৃথিবীকে
বালি বানায়, গ্রাস করে মাটি, ছেড়ে দেয়, দ্বীপ রাখে
দ্বীপ ভাঙে ;...

সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' গ্রন্থের 'সমুদ্র' কবিতার এই অংশের ভাবচ্ছবির তুলনা করি :

কত মহাদ্বীপ মহাবন
এ তরল রঙ্গশালে রূপে প্রাণে কত নৃত্যে গানে
দেখা দিয়ে কিছুকাল ডুবে গেছে নেপথ্যের পানে
নিঃশব্দ গভীরে। হারানো সে চিহ্নহারা যুগগুলি
মূর্তিহীন ব্যর্থতায় নিত্য অন্ধ আন্দোলন তুলি
হানিছে তরঙ্গ তব।

তা হলে আমাদের পক্ষে এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয় যে, রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনাগতির মধ্যেও আছে এক চিরকালীন আধুনিকতা। পক্ষান্তরে অমিয় চক্রবর্তী, আলোচ্য কবিতায় অন্তত, অভিনব হবার জন্য পণবদ্ধ। এইভাবে সংকল্প-সম্বদ্ধ হবার জন্য আগ্রহ সেদিনের আধুনিক কবিতারই চারিত্র্য। অমিয় চক্রবর্তীর ছন্দোরীতি, সুধীন্দ্রনাথের শব্দ-সন্ধান আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদের বক্তব্যকেই সমর্থন করে। রবীন্দ্রনাথের শব্দপুঞ্জ রবীন্দ্রনাথের জগতের আবহাওয়া ও অনুষঙ্গকে বহন করে। তাঁর ছন্দের পরিবর্তন ঘটেছে বটে 'পুনশ্চ' পর্যায়ে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শব্দের অনুষঙ্গ পালটায় নি। এদিকে তিরিশের যুগে নূতন কবিদের জীবন-মৃত্যু-চেতনা যখন সময়ের তাগিদে বদলাতে শুরু করল, তখনই তাঁরা নূতন অর্থানুষঙ্গে, নূতন ভাবানুষঙ্গে শব্দের পুনর্জন্ম দাবি করলেন। ছন্দের নবায়ন (অমিয় চক্রবর্তী ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়), বাগ্‌বিন্যাসের নূতন 'চাল' (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে)— এ সবই এই সময়কে অঙ্গীকরণের ফল। সময়ের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রয়াসের পরিণাম। লক্ষ করার বিষয় বাংলা আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ সব থেকে কম ওঠে অমিয় চক্রবর্তীর বেলায়। তিনি তাঁর ছন্দকে নূতনত্ব দিলেন বক্তব্যকে নূতন সুর দেবার জন্য। এই নূতন সুর তাঁর অভিনবত্বের প্রয়াসকে সজীবতা দিয়েছে। তাঁর ভাবনা-পদ্ধতিরই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর আঙ্গিক চিন্তায়। বুদ্ধদেব বসুর 'নতুন পাতা' কাব্যগ্রন্থের আলোচনায়[১] অমিয় চক্রবর্তী একই সমুদ্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, বুদ্ধদেব বসুর কবিতার এই অংশে :

সমুদ্র ধূ-ধূ করছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে
যেন চিরকাল এক বিরাট মুহূর্তে প্রসারিত ;

---

১ 'কবিতা', পৌষ ১৩৪৫

" 'যেন' কথাটা বাদ দিলে নির্দেশ বদলাতো কিন্তু জোর কি বাড়ত না?" এই সংশোধনী প্রস্তাব থেকেই বোঝা যায় অমিয় চক্রবর্তীর কাছে অলংকরণ অপেক্ষা তুলির আঁচড় বা টান বেশি মর্যাদা পেত; ভাষ্যের প্রতি তাঁর ততটা মনোযোগ নেই, যতটা মন চিত্রের প্রতি। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার শব্দ-ভাস্কর্য, বা বিষ্ণু দের কবিতার নাট্যগতি অমিয় চক্রবর্তীর নয়। নাটক অধিগ্রহণ করে কালকে। অমিয় চক্রবর্তীর জগৎ যদিও ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মৃত্যু-আকীর্ণ জগৎ, তবু দেখা যাবে সেই মৃত্যু-আকীর্ণ, সংশয়-সমাকুল, বিনষ্টি-বিধ্বস্ত সময়ের দ্বারা কবি স্পৃষ্ট হয়েছেন কম। তাঁর কবিতায় ধাবমান সময় (time) বা ইতিহাস অপেক্ষা স্থিরদ্যুতি 'স্থান' বা 'দেশ' (space) প্রাধান্য পায়। এই অর্থেই তাঁর কবিতা চিত্রীর কবিতা।

তাঁর চিত্রের, তথা তাঁর কবিতার বিষয় পৃথিবী। পৃথিবীর রূপ ফুটিয়ে তোলা সহজ কথা নয়। তাঁর ভাষাতেই বলি[১], 'ধরণী সহজ বস্তু নয়, ভ্রাম্যমানকে নীল জলে ভাসায়, দুর্গম পাহাড়ে চড়ায়, খাদ গহ্বরে গিয়ে মাথা ঘোরায়— কবিত্ব নিংড়ে নিতে আঙুলের জোর চাই।' তাই তাঁর কবিতার চিত্রপটে বারে বারে রূপায়িত হতে চেয়েছে— বিশ্বরূপ, বিশ্বজন আর বিশ্বমন। কবির চোখে দেখা বিশ্বরূপ :

ক. আফগান চূড়, তাম্র ইরানী, কখনো হিমানী
কখনো খরা,
ঘূর্ণিত ধরা হিন্দুকুশের;
জয়জয়শ্রী হিমালয়রাজ
ধরণীর ধ্যানী কিরীট ঝলে। —'রুদ্রাক্ষর', অভিজ্ঞান বসন্ত

খ. বন্-বন্ ঘুরচে বিশ্বের লাট্টু,
খার্তুম সিক্কিম পেরু টিম্বাক্টু
লেস্তি ব্রহ্মের কোন্‌টা?
ধক্-ধক্ স্বর্যের মনটা। —'উদ্ভট', মাটির দেয়াল

গ. ওপারে বাস্ চলেচে, রাত্রির শহর, কার সময়
অগণ্য ঘরে, দোকানে, দরজায় যায় থামি',
চলে সংসার পথে ঘরে। —'সেইপথ', একমুঠো

ঘ. শান্তি পাবি দেখ্ চেয়ে ঐ সোনার ক্ষেত;
স্তূপ করা ঐ ধানের সোনা
স্তব্ধ মাটির কী সঙ্কেত।
স্তরে স্তরে মাটির সবুজ প্রাণ-আগুনে
ঊর্ধ্বে ওঠে আরেক আলোর মন্ত্র শুনে;··· —'পৃথিবী', দূরযানী

শান্তিনিকেতন, খোয়াই, ভারতবর্ষের নানা মন্দির, কত পথ-প্রান্তর, ন্যুইয়র্কের ঈস্ট রিভার, বে-স্টেট রোড, ওহায়ো, আবার বোধগয়া, উত্তরাপথ হরাপ্পা— বিশ্বপথিক কবি এখানে রবীন্দ্রনাথেরই প্রিয় শিষ্য— তাঁর ঘর কোনো ভৌগোলিক সীমানায় আটকে যায় নি। সে ঘর সব ঠাঁই।

---

১ 'কবিতা', পৌষ ১৩৪৫

তাই ঘরে ঘরে তাঁর পরমাত্মীয়। পরম মমতায় এবং ভালোবাসায় তিনি এঁকে দেন পৃথিবীর নানা দেশের মানুষের জীবন-ছবি, সে-মানুষ রাষ্ট্রিক নয়, সাময়িক নয়— দেশোত্তর এবং কালোত্তর যে মানব-স্বভাব, তাকেই কবি রূপায়িত করেছেন বিশেষ বিশেষ মাটির রঙে :

ক. পৌটলা বিছানা নিয়ে ভিড় উঠ্‌ল
দুপাশে চীনে পাহাড়, চীনে গাছ, অচেনা বাঁকা ছাত-
বাড়িতে আমার আবিষ্ট চোখ,
দৃশ্যে চারিয়ে গেছে সহযাত্রী চাষীর স্নিগ্ধতা— এই বৃদ্ধ লোক ॥

—'চীনে বুড়ো', অভিজ্ঞান বসন্ত

খ. যুদ্ধের খবর পৌছল।
আন্‌লে তুমি বেদনায়
নূতন পৃথিবী চেতনায়
ভান্‌জিগের মেয়ে।
ছবিতে দেখেচি, ওড়া চুল আঁখি ছেয়ে,
কিছুতো জানোনা, শিশুমুখে হাসি, স্কুলে যাও দূরদেশে…

—'যুদ্ধের খবর', একমুঠো

গ. না-দাড়ি-কামানো বুড়ো প্রসন্ন রুক্ষ দৃষ্টিপাতে
দেখে সমুদ্রের জল, হঠাৎ জেটির ভিড়ে পশে
মজ্জায় গভীর তারি পরিচয় :

—'শ্রীমান শ্রীমতী', পারাপার

তাঁর কবিতা ছুঁয়ে আসে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ছাত্রটিকে, সেই ছাত্রীটিকে, ছুঁয়ে আসে 'ইতিহাস' কবিতার নেবুরঙা শার্টপরা সেই মানুষটিকে। সে কবিতার মুকুরে ভেসে ওঠে মণিকর্ণিকার ঘাটের বীণাবাদিনী। অথচ দেশ-বিদেশের এত রঙ, এত বিভিন্ন আলোয় আসলে কবি যা ধরতে চেয়েছেন তা হল বিশ্বমন। এই অর্থে অমিয় চক্রবর্তী বিশ্বমনস্ক আধুনিক কবি। তিনি যে বিশ্বের কথা বলেন সে বিশ্ব আজকের, এই শতাব্দীর— কিন্তু সাম্প্রতিকের ধূলির দাগ তাতে থাকলেও মলিনতাকে তিনি মানেন না। এদিক থেকে বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তাঁর মিল আছে। বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তাঁর অমিলটা হল— বিষ্ণু দে প্রত্যক্ষের মধ্যে যেটুকু চলিষ্ণু সেটুকুকে ধরে নেন। অমিয় চক্রবর্তী প্রত্যক্ষের মধ্যে যেটুকু স্থির সেটাকে অবলম্বন করেন। বিষ্ণু দে নিজে স্থির, কিন্তু তাঁর আবেগ গতিশীলতা আশ্রয়ী। অমিয় চক্রবর্তী নিজে গতিশীল— আগ্রহ তাঁর স্থির চিত্রে। এই স্থির চিত্রের বিষয় বিশ্বমানসের একটুকরো আধটুকরো প্রতিফলন, কখনো উদ্ভাসন। সে উদ্ভাসনে অর্থের নানা বর্ণ :

ঢেউয়ে ঢেউয়ে শাম্পানে জাভানির
প্রলাপীর জল-ছবি অবনীর :
কানে চোখে ঠেকে তবু বুঝি না ॥

—'প্রতীক্ষা', পারাপার

পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো দৃশ্য, কোনো মানুষই তাঁর কাছে বিস্ময়ের বস্তু নয়। এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতার সঙ্গে তাঁর বিশ্ববোধের কোনো মিল নেই। রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' ও 'পৃথিবী' কবিতার মধ্যে যে বিশ্ব-বিস্ময় অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় তার বদলে আছে এক অন্য ভাব। যা-কিছু বিশ্ব-চিত্র তিনি দেখছেন, তা-সবই যেন তাঁর পূর্ব পরিচিত, অন্তত এ কথা সত্য যে, নব পরিচয়ের বিস্ময়কে তিনি কখনো সঞ্চারিত করতে চান নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর বিশ্ব-পরিক্রমার আর-একটি তফাতও নজরে পড়ে। 'সিয়াম' বা 'বোরোবুদুর' -জাতীয় কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়ের সূত্র অনুসরণ করে অতীত-বর্তমান সেতুবন্ধন-প্রয়াসী। অমিয় চক্রবর্তীর দৃষ্টি ততটা অতীতে নয়, ততটা ভবিষ্যতে নয়— যতটা বর্তমানে। এখানে আবার বিষ্ণু দের সঙ্গে তাঁর অমিল। বিষ্ণু দের স্ব-কালে ত্রিকালের মেলামেশা। অমিয় চক্রবর্তীর কাছে যেহেতু কাল অপেক্ষা স্থানই প্রধান বিষয়, তাই তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বিচলিত নন। বর্তমানেরও সেই অংশটায় তাঁর দৃষ্টিপাত, যে অংশ অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। তিনি এক চিরন্তনত্বে বিশ্বাসী আধুনিক কবি।

আধুনিক কবি বলেই এক গতিবেগের চলচ্ছন্দ ফুটে উঠেছে অনেকগুলি কবিতায়। প্লেন থেকে, ট্রেন থেকে, মোটর থেকে দেখা ভূ-চিত্র অথবা বিশ্ব-দৃশ্যের কত স্ন্যাপ-শট ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায়। তারও থেকে বড়ো কথা তাঁর কোনো কোনো কবিতায় গতি নিজেই মূর্তি ধারণ করেছে। প্রসঙ্গত আমরা স্মরণ করতে পারি 'দূরযানী' কাব্যগ্রন্থের 'শঙ্কর অমৃতের মন্দির' কবিতাটি। বাজার বসতির পথ পেরিয়ে শঙ্কর মন্দিরে পৌঁছানো, পুরোহিতের সঙ্গে গর্ভগৃহে প্রবেশ, ফিরে আসা, ফিরতে ফিরতে আবার মন্দিরের দিকে তাকানো— আর কবিতার প্রতি স্তবকের শেষে ধুয়োর মতো শঙ্কর মন্দিরের উল্লেখ— সব মিলিয়ে পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে মন্দ্রিত হয়েছে গতিবেগ। ব্যাপারটি কবির আরো অনেক কবিতাতেই ধরা পড়ে। এমন-কি, তাঁর হপকিন্স-প্রীতি, স্প্রাং-রিদ্‌ম-এর বাংলায় প্রবর্তনার পিছনেও আছে এই গতিময় পথিকের দৃষ্টি-মাধুকরী। পঙ্‌ক্তিগুলির কাটা কাটা বাক্যে যেন সেই ধাবমানতার ছবি। একক শব্দে সম্পূর্ণ বাক্যে গতির ইশারা :

—যাক্। সম্পূর্ণ অজানা আমি। ঘোরা
অজানা শহরে। দেখ্‌তে দাও একবার
হ্যারিসন রোড। স্রোত কোথা গেছে দূর
জাপানী খেলনা, চুড়ি, নিয়ে নতুন হরফে
মার্কা সিগারেট। সস্থ বই। মোড়ে চুপে চুপে
দিঘির ভিড় ঠেলে যাবো না গলিতে, দরজায়
ধাক্কা দেবো না। দুপুরের তোপ ; একটা।···

—'দরজা', একমুঠো

এই গতিবোধকে নিংড়ে নিয়ে তিনি কখনো কখনো গূঢ় কথাও বলেন— সে গূঢ় ভাষণে হয়তো বা অপার্থিবের ইঙ্গিত, হয়তো এক দার্শনিকতা :

ভিতরে কত মিষ্টি ফল, তীক্ষ্ণ স্বাদ ফুলের তীর,
ইচ্ছে ভরা বুনো আঙুর, জামের শাঁস,

ভিতরে কত দ্রুতের ভয়, কখনো বেলা সময়হীন—
বেরিয়ে এলেই নেই।

—'বৈদান্তিক', পারাপার

কিন্তু সেই গূঢ় গভীরতার বাণীতেও লাগে এক দ্রুতগতি পথিকের পথ চলার ছন্দ।

৩

'এজরা পাউণ্ডের বক্তব্য তিনি কবিতায় একত্র স্পষ্ট বলেন নি, পাথরের নুড়ির মতো ছড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর এলোমেলো মনোময় ছন্দের তলে তলে তা প্রত্যক্ষ দেখা শক্ত নয়। ছবির সঙ্গে গাঁথা হয়ে তাঁর মনের অব্যবহিত ধারণা প্রকাশ পায়, প্রকাশ্য ধার্মিকতার প্রয়োজন হয় না'।[১]

হয়তো সব বড়ো কবির সমালোচনাই এমন। অন্য কবিকৃতির আলোচনাকালে দেখা যায়, তিনি আলোচ্য কবির রস গ্রহণের মধ্যে শুরু করেন এক ধরনের আত্মব্যাখ্যা। এজরা পাউণ্ডের কবিত্বের সেই অংশটিই অমিয় চক্রবর্তীকে আকৃষ্ট করেছে যে অংশের সঙ্গে তিনি খুঁজে পান তাঁর ভাবভঙ্গির আত্মীয়তা। এই জাতীয় আত্মব্যাখ্যা ও বীক্ষণ আমরা রবীন্দ্রনাথে পেয়েছি, এলিয়টে পেয়েছি। বস্তুত অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাতে কোনো আরোপিত তত্ত্ব নেই, তাঁর কবিতাও কখনো সূত্রভাষ্য নয়। উজ্জ্বল যত অভিজ্ঞতা বা বস্তুখণ্ড তিনি সংগ্রহ করেন, তা দিয়ে তিনি কোনো স্থাপত্য রচনার কথা ভাবেন নি। অথচ তাঁর ছড়ানো নুড়িগুলির মধ্যে কান পেতে থাকলে এক নাতিপ্রচ্ছন্ন জলের স্বর শোনা যায়। সেই জলেরই অন্য নাম চিরবহতা জীবনধারা। জীবনাতীতের সামনে সে জীবনধারা যে প্রশ্ন করতে চায়, ওই উজ্জ্বল মুহূর্তগুলির মাঝে সে প্রশ্নটিও হারিয়ে যায় না। 'লিরিক' (পারাপার) কবিতাটির শেষ দুই পঙ্‌ক্তির অসামান্য প্রশান্ত প্রশ্নটি আমাদের মনে পড়ে:

পৃথিবীতে লগ্ন ছিল এই মিলনের ঘর,
এসেও ছিলেম দুজনে— তারপর?

রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও ব্যস্ত হন নি উত্তরের জন্য, রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও বিচলিত হন নি বিপরীতের তরঙ্গাঘাতে। হাত বাড়ালে পাওয়া যায় এ কথা সত্য হতে এ জগতে বাধা নেই। সব কিছু শেষে মিলিয়ে যায়, এ কথা জানলেও দুঃখ নেই। 'তার বদলে পেলে'— এ যেমন সত্য, 'বেরিয়ে এলেই নেই'— এও তেমনই সত্য। এ এক অপক্ষপাত নিরাসক্তি, কিন্তু কবির নিরাসক্তি। এর জোরটুকু ছিল বলেই তিনি কোথাও আটকে গেলেন না।

আবার অন্যদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অমিলটুকুও অনুধাবনীয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে যে 'পোড়ো বাড়ি, শূন্যদালান'— তা বোবা স্মৃতির চাপা কাঁদনের অনুষঙ্গ বয়ে আনে,[২] অমিয় চক্রবর্তীকে সেই পোড়ো বাড়ির ভাঙা দরজা খুঁজতে পাঠায় ঝোড়ো হাওয়াকে[৩]। রবীন্দ্রনাথের কাছে বস্তু কল্পনার সিঁড়ি, অমিয় চক্রবর্তীর কাছে বিষয় বা বস্তু তাঁর নিজের কালের সচেতনতার ভাষা। ব্যাপারটি আরো

১ অমিয় চক্রবর্তী, "এজরা পাউণ্ড— কবিতার দরবারে পত্রাঘাত", 'কবিতা', পৌষ ১৩৫৫

২ 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ২৪-সংখ্যক কবিতার প্রথম স্তবক

৩ অমিয় চক্রবর্তীর 'সঙ্গতি' কবিতা

পরিষ্কার হবে তাঁর 'চেতন স্যাকরা' কবিতাটির সাহায্যে। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যের 'বাঁশি' কবিতার কিনু গোয়ালার গলিতে যে-কান্তবাবু থাকে, তার সঙ্গে চেতন স্যাকরার মিল-অমিল দুই-ই আমাদের নজরে পড়ে। কান্তবাবু এবং চেতন স্যাকরা দুজনেই শিল্পী। বীভৎস গলিটার সমস্ত কদর্যতা কান্তবাবু মিথ্যে করে উড়িয়ে দিতে পারেন তাঁর কর্নেটে সিন্ধু বারোয়াঁর তান তুলে। চেতন স্যাকরাও বলে :

> গলিতে, তোমাদের অতীব নোংরা গলিতে,
> সোনার সুন্দর, রূপোর রূপকার, এই নর্দমার দোকান দেহলিতে
> ধ্যান বানাই। এই আমার উত্তর।

কিনু গোয়ালার গলির সঙ্গে চেতন স্যাকরার গলির বাস্তব সাদৃশ্যটিও লক্ষণীয়। দুঃসহ অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে দুটি কবিতাতেই। রবীন্দ্রনাথ গলির বস্তুরূপ ফুটিয়ে তুলতে কোনো 'আইটেম' বাদ দেন নি। উপমা বা চিত্রকল্পেও তিনি দেখিয়েছেন আধুনিক কবির বিষম-সমীকরণ-ক্ষমতার প্রমাণ। বাদলের কালো ছায়ার উপমা, বা আপিসের সাজের উপমা এক্ষেত্রে স্মরণীয়। চেতন স্যাকরার গলিতেও 'ড্রেন, ধুলো, মাছি, মশা, ঘেয়ো কুত্তোর আড়ৎ'; 'বন্দী স্যাঁৎসেঁতে গলির ঘরে ইঁদুর-ভরা'। তথাপি এই সাদৃশ্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্যটিও লক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথের কিনু গোয়ালার গলি নির্মমভাবেই কিনু গোয়ালার গলি। অমিয় চক্রবর্তীর চেতন স্যাকরার গলি যেন অতটা নির্মম হতে রাজি হয় নি। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, গলিটা যতই নির্মম হোক, শেষ পর্যন্ত তো তাঁর হাতে আছেই কান্তবাবু— তাঁর তুরুপের তাস। কান্তবাবুর কর্নেটেই হরিপদ কেরানির অনন্ত গোধূলি লগ্নের স্রষ্টা হয়ে উঠবে। কান্তবাবু গলিটাকে গ্রাহ্যই করেন না। চেতন স্যাকরা কিন্তু গলি সম্বন্ধে, অর্থাৎ তার বাস্তব পরিবেশ সম্বন্ধে, সজাগ। সে গলির জীবনকে সমালোচনা করে। এবং এই সমালোচনার কারণেই চেতন স্যাকরা তার ভূমিকা সম্বন্ধে সজাগ— কান্তবাবু আত্মবিস্মৃত শিল্পী। চেতন স্যাকরা সমাজ-সচেতন ব্যক্তি, কিন্তু শিল্প-সচেতন শিল্পী। অর্থাৎ সে-ও যেন রবীন্দ্রনাথের মতোই বলে ফেলতে পারে— 'আমার মনটা হয়তো সোশিয়লিস্ট, আমার কর্মক্ষেত্রে তা ভিতর থেকে প্রকাশ পেতেও পারে কিন্তু উর্বশী কবিতাকে সে স্পর্শও করে না। শালের কাঠ এবং শালের মঞ্জরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র'[১]। চেতন স্যাকরা নিজেকে 'উদ্ধত বুড়ো' বলেছে। তার এই ঔদ্ধত্যই তার সচেতনতা, তাও এক শিল্পীর বর্ম। 'চেতন' নামটির এবং কান্তবাবুর 'কান্ত' নামটির তাৎপর্যও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। দুই কবি যেন ভেবে চিন্তেই তাঁদের দুজন শিল্পীর নাম এমন রেখেছেন।

আধুনিক কবিদের কবিতায় যে তৃতীয় স্বরের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, 'চেতন স্যাকরা' কবিতাটির চরিত্রে সেই স্বর এক ব্যক্তিত্ব রচনা করেছে। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন'। এখানেও তৃতীয় স্বরের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। এরকম আরো গুটিকতক কবিতার সাক্ষ্যে আমরা বলতে পারি যে, তাঁর কবিতায় আমরা যে তৃতীয় স্বরের উপস্থিতি অনুভব করি তার একটা স্বরূপ হল তারা

---

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র', একাদশ খণ্ড, পৃ ২৯৫

সকলে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি, কিন্তু সাধারণ মানুষ। তারা তাদের সাধারণত্বের মধ্যেই ধারণ করে রেখেছে একটি নাতিপ্রচ্ছন্ন অসাধারণত্ব। কী কী কেড়ে নিতে পারবে না, বড়োবাবুর কাছে সেই ফিরিস্তি দেবার সময় যে-কেরানিটি কথা বলে, সে পৃথিবীর সঙ্গে তার অনাহত সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন। এইখানেই তার স্বাতন্ত্র্য। চেতন স্যাক্রার মতোই সেও একটা বর্মের অধিকারী। এই বর্মের অপর নাম সহজ মানবিকতা। এই মানবিকতার কারণে রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর কোনো কোনো কাব্য-প্রসঙ্গের মিল-অমিলটিও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'আরোগ্য'- 'জন্মদিনে' পর্যায়ের কবিতায় দেখা যায় উর্ধ্ব-আকাশের নিঃশব্দ নীলিমার দিকে ইঙ্গিত করে এমন অনুষঙ্গবাহী নানা প্রসঙ্গের সমাবেশ :

> …বৃদ্ধ মহানিম, / নিবিড় গম্ভীর তার অভিজাত্যচ্ছায়া ॥ অরণ্য তাহারি তলে উর্ধ্বে বাহু মেলি ॥ দিনের পতাকাখানি স্বর্ণকিরণের-রেখা-আঁকা ॥ দূরে দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে / শেষতীর্থমন্দিরের চূড়া ॥ উর্ধ্ব হতে জয়ধ্বনি / অন্তরে দিগন্ত পথে নামিল তখনি ॥ বনশ্রেণী প্রস্থানের দ্বারে / ধরণীর শান্তিমন্ত্র দিক্ মৌন পল্লবসম্ভারে ॥ খুলি পশ্চিমের সিংহদ্বার ॥ হিমাদ্রির হিমশুভ্র পেলব ললাটে ॥ যেমন সুদূর ঐ নক্ষত্রের পথ ॥ শূন্য নীলিমার 'পরে শূন্য নীলিমায় ॥ দক্ষিণমেরুর উর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা ॥ সেথা হতে সন্ধ্যাতারা / রাত্রিরে দেখায়ে আনে পথ ॥

উর্ধ্ব আকাশের দিকে ইঙ্গিত এক মহানিঃশব্দতার দিকে ইঙ্গিতও বটে। এই-সব প্রসঙ্গগুলির সান্নিধ্যে কেবলই মনে হয় আয়ুপ্রান্তবর্তী কবির সামনে এক মহামৌনের যবনিকা দুলছে। অর্ধশায়িত কবির দৃষ্টি প্রিয় মর্ত্যভূমি থেকে সংহৃত হয়ে নিবদ্ধ হয়েছে বারে বারে সেইখানে— 'সেথা হতে সন্ধ্যা-তারা রাত্রিরে দেখায়ে আনে পথ'।

অমিয় চক্রবর্তীর 'পারাপার'-পর্যায়ে এমনই নানা প্রসঙ্গের দেখা মেলে, যাতে পাওয়া যায় উর্ধ্বের ইঙ্গিত :

> ওঙ্কার উঠেছে বাঁকা পাথুরে নিখাদে মুয়েজ্জিন ॥ নয়নীল ছিন্নের শূন্যে ত্রিশূল ॥ খোড়ো শূন্যে দেওদার ॥ গাছের মর্মরে শান্তি থর থর, পর্বতে উঁচু পথ ॥ লাল নীল বিদ্যুৎ অক্ষরে / রাত্রির শূন্যের শীর্ষে চিহ্নমালা জ্বলে মোছে শুধু ॥ মাথা নাড়ে "জানি" "জানি" ক্যাথলিক গির্জা চূড়া স্থির ॥ ধূসর পাথর, দরজা, মধ্যযুগী আধুনিক চূড়া ॥ উজ্জ্বল আকাশ-চেরা গম্ভীর বিরাট উঁচু বাড়ি / তারো উর্ধ্বে স্বচ্ছ আজ নীলান্তিক বসন্তের বেলা ॥ প্রকাণ্ড পিতল-বাঁধা কাঠের তোরণ ॥ গির্জার গম্বুজ চূড়া উর্ধ্বযানী ॥ মেপ্ল-ওকের সারি উঁচু মাথা গাছ ॥ উঠেছে গুরুদ্বার স্বর্ণচূড় মিলিত পুরবিয়া ॥ রাত্রি শেষ হলো প্রার্থনার মন্দিরে মিনারেটে ॥ এই মন্দিরের চূড়া সূর্যলাগা / স্বর্ণনীল জ্যোতির্ভেদী ॥ শেল বিদ্ধ গির্জা-শিরে ধ্বনি স্তরে মেশে নীল রঙ / অক্ষত আলোর স্নিগ্ধতায় ॥

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর এই প্রসঙ্গে অমিলের দিকটিও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। উদ্ধৃত উর্ধ্বতাবাচক প্রসঙ্গগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা দেখি এক শূন্যতার সমাসন্ন মৌনের অনুষঙ্গ। ঠিক ক্লান্তি নয়— এক প্রশান্ত বিরতির অনিবার্যতা সেখানে আসল কথা। পক্ষান্তরে 'পারাপার'-এর কবি কোনো প্রস্থানের কথা বলেন না। তিনি বলেন ঐ উর্ধ্বের পদতলে নিবদ্ধ জীবনের কথা। তাঁর অধিকাংশ উর্ধ্বতাবাচক বস্তুগুলি মানুষের রচনা— তাদের ভাষায় মানুষের কীর্তির গম্ভীর

ব্যঞ্জনা। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের গাছ-মন্দিরচূড়া-গিরিশৃঙ্গ-নক্ষত্র একান্তই মন্ময় দৃষ্টিতে দেখা। অমিয় চক্রবর্তীর এই জাতীয় প্রসঙ্গগুলি নৈর্ব্যক্তিক এবং তন্ময় দৃষ্টির ফল।

৪

'প্রায়', 'যেন', 'মতো' প্রভৃতি উপমা-উৎপ্রেক্ষাবাচক শব্দ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় খুব কম। নেই বললেই হয়। অনেক সময় নিহিত চিত্রকল্পের ভাষা দীপ্তি দেয় তাঁর কবিতাকে। অনেক সময়ে এপিথেটে গড়া চিত্রকল্প তার সহায়। বিস্তৃত বা জটিল চিত্রকল্পের দিকে বা আলংকারিক চিত্রকল্পের প্রতি তাঁর তেমন ঝোঁক নেই। এটা তাঁর শৌখিন আঙ্গিক-রীতি নয় - তিনি এই ভাবে জীবনকেই বুঝতে চেয়েছেন। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় কোনো 'হয়তো' নেই, কোনো 'বোধ হয়' নেই। কেননা, তাঁর কোনো সংশয় নেই, কোনো দ্বিধা নেই। তাঁর মতোই এই শতাব্দীর প্রথম বৎসরে জাত একজন প্রতিনিধিস্থানীয় আধুনিক কবির কথা আমরা বিপরীত দিকে মনে করতে পারি— সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সুধীন্দ্রনাথ জ্ঞানমার্গী। তাই সংশয় তাঁর ছায়াসঙ্গী। পক্ষান্তরে অমিয় চক্রবর্তী বিশ্বাসী— কাজেই জটিলতার তিনি কেউ নন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় এক আত্যয়িক কালের প্রতীক বারবার রূপ পরিগ্রহ করেছে বর্বর দস্যুর। দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে সুধীন্দ্রনাথের বৌদ্ধিক কল্পনায় আনন্দের স্বর্গালোক অপেক্ষা এক সমাসন্ন অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠতে চেয়েছে। সময় বা কাল পরোক্ষে প্রত্যক্ষে সুধীন্দ্রনাথের প্রবল প্রতীকগুলির স্রষ্টা। অর্থসঙ্গতিপূর্ণ বিশ্বসংসার প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে-ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে গেল, টলে গেল অগ্রজের অটল বিশ্বাস, তা সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রতীকিত হয়েছে 'মরু', 'মারী', 'ব্যাধি' ইত্যাদি প্রসঙ্গে। আমরা ভুলে যেতে পারি না তাঁর কবিজীবনের 'ক্রন্দসী' পর্ব পর্যন্ত 'জঞ্জাল' বা 'আবর্জনা'-শব্দের প্রায়শ প্রয়োগ, প্রায়ই তা যুক্ত হয়েছে 'উচ্ছিষ্ট' বিশেষণের সঙ্গে :

> উচ্ছিষ্ট প্রেমের কণা॥ মগ্নতরী জঞ্জালের মতো॥ জমায়েছিলাম শুধু মিথ্যার জঞ্জাল॥ প্রেমের সমাধি স্তূপে মমত্বের জঘন্য জঞ্জাল॥ অতিক্রান্ত উৎসবের উচ্ছিষ্ট জঞ্জাল॥ শুধুই জঞ্জালে তাই ভরিয়াছি প্রাণের পসরা॥ নগরের আবর্জনা জাহ্নবীর পুণ্যস্রোতে ঘুরে॥ শটিত জঞ্জাল কণা॥ অবিমৃষ্ট জন্মের / জঞ্জালে বিষায়ে সংকীর্ণ সৌধ॥

এই জঞ্জাল-চেতনার গূঢ় অর্থে ধূমায়মান কবির কাল-চেতনা। অমিয় চক্রবর্তীর মতো স্থান বা দেশ নয়, সময়ের হাতে লাঞ্ছিত-সত্তা মানুষ বা ব্যক্তির যন্ত্রণাগম্ভীর জীবন সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বিষয়। তাই বিমুখ বর্তমানের নির্জীব ধূসর প্রেতভূমির মাঝখানে সুধীন্দ্রনাথ বারে বারে স্মরণ করেছেন প্রাক্তন প্রেম, অগ্রজের অটল বিশ্বাসের দিন। স্মৃতি সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে অনেকখানি - এক প্রৌঢ় স্মৃতি। তা বর্তমানের অন্ধকার পটে রবীন্দ্রনাথের ছবির মতোই অবচেতনের বার্তাবহ, যা অপেলব, কঠিন অথচ দীর্ঘশ্বাসের মতো বুক ফাটা। পক্ষান্তরে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় স্মৃতি প্রচলিত কাব্যগত অর্থে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করে নি।

প্রসঙ্গত সুধীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর আধুনিকতার স্বরূপটিও অনুধাবনীয়। সুধীন্দ্রনাথের কাছে

তৎকালীন বাস্তবতা ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা। বিশ্বাস বা প্রত্যয় কেবলই মায়ামৃগের মতো দিগন্তে হারিয়ে যায়। হতাশা ব্যক্তিকে— বিশেষ অতীত-সচেতন, ধর্ম-সচেতন ব্যক্তিকে কেবলই গ্রাস করতে চায়। চতুর্দিগ্‌বর্তী মূল্যাবনমনের দিকে তাকিয়ে কিন্তু সে-ব্যক্তি ট্র্যাজেডির চরিত্র হয়ে যায় না, কেননা এখানে তো তার কোনো 'হ্যামারতিয়া' কাজ করছে না। সুধীন্দ্রনাথের নায়ক কাল-নামক নিয়তিকেই দায়ী করে নিজের বিড়ম্বনার ছবি আঁকে এই বলে— 'সামান্যাদের সোহাগ খরিদ ক'রে / চিরন্তনীর অভাব মিটাতে হবে।' ডায়োনিশিয়ান ট্র্যাজেডির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সুধীন্দ্রনাথ এক সক্রেটিক দৃষ্টিকোণের অধিকারী হয়েছেন। জ্ঞানকে তিনি স্থান দিয়েছেন সর্বাগ্রে— তাই কালবৈগুণ্য তাঁকে আঘাত হানলেও লাঞ্ছিত করতে পারবে না। কেননা তাঁর জয় পরাজয় ব্যক্তিগত তো নয়ই— উপরন্তু নিরাসক্ত কবিমন তাদের দিয়েছে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট। তা বলে তিনি নিষ্প্রতিরোধ আত্মসমর্পণেই নিঃশেষিত নন। 'উটপাখী' কবিতার সাক্ষ্যে বলতে পারি যে, তিনি জেনেছিলেন প্রয়োগবাদীর কাছে অভিজ্ঞতা, উটপাখির কাছে বালুর মতো। সেই বালু সতত স্থানান্তরণশীল, সে সত্যকে তার মধ্যে পেতে পারে না। সে শুধু সেখানে একটা কথাই জানতে পারে, অপরিহরণীয় অনিশ্চয়তাই সত্য। 'উটপাখী' কবিতার 'আমি' এবং 'তুমি' কবিসত্তার দুই ভাগ। এক ভাগ, অর্থাৎ 'তুমি' সমাসন্ন বিপদ এড়ানোর জন্য অভিজ্ঞতাকেই আশ্রয় করেছে। কবিতাটির 'আমি' যুক্তিবাদী বা জ্ঞানবাদী। সে সেই পথেই সত্যান্বেষার সন্ধান দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কবিতাটিতে কান্টীয় মীমাংসায় উপসংহার এসেছে। প্রয়োগবাদ ও যুক্তিবাদের সহযোগিতায় পাওয়া যাবে সত্যকে। পাওয়া যাবে না তাদের বিশ্লেষে। সন্দেহ নেই যে, সুধীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ চৈতন্য রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রগৃহে দীক্ষিত। প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করা চলে, সুধীন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথের মতোই অন্তত প্রেমের স্মৃতিবিহারে বাস্তবকে অতিবাস্তবে রূপান্তরিত করেছেন। 'শাশ্বতী' কবিতার শেষ স্তবকে : 'ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,' 'অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি', বা 'সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে' প্রভৃতি উক্তি স্মরণ করিয়ে দিতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'ছবি' কবিতার 'আজি তাই / শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল' প্রভৃতি উক্তি। কিন্তু যে-উর্ধ্বপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের মেলে ধ্যানের নিভৃত অনাহত আনন্দলোক, এই শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে চেতনায় জড়িয়ে যুদ্ধোত্তর বিশ্বের জটিলতার শেকলের বোঝা, সে-উর্ধ্বপ্রয়াণ সুধীন্দ্রনাথের প্রবল আত্মসচেতনতায় সম্ভব ছিল না। তাই এমন-কি 'শাশ্বতী' কবিতারও শেষ কয়েকটি চরণে সহসা ধ্বনিত হয় বর্তমানের বিপুল প্রত্যাখ্যানের স্বীকৃতি— 'কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে'। সমস্ত কবিতাটিতে চিত্রকল্পপুঞ্জ পরস্পর সন্নিপাতে যে তীব্র স্মৃতিবিহারকে মূর্ত করে তুলেছে তা যেন সহসা আরেকটি চিত্রকল্পের ঘাতে ভেঙে গেল— 'স্মৃতি পিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে / অমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা।' যে-অমা-অন্ধকার সুধীন্দ্রনাথের চৈতন্যের জ্যোতির্বিন্দুর চারিদিকে কৃষ্ণবলয়ের সৃষ্টি করেছে, তা যেন এখানেও আত্যন্তিক হয়ে উঠল। সেই সমাসন্ন অন্ধকারের প্রতিমুখে : 'সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে / আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না'— একটি অসহায় আত্মসান্ত্বনা মাত্র।

সুধীন্দ্রনাথের অন্বেষা বিশুদ্ধ চৈতন্য। অমিয় চক্রবর্তীর অন্বিষ্ট বিশুদ্ধ অনুভূতি। তাই সুধীন্দ্রনাথ প্রতীকী। বুদ্ধদেব বসু সুধীন্দ্রনাথকে রোমান্টিক অভিধা প্রদানের পক্ষপাতী[১], কিন্তু সে শুধু প্রতীকীরা

১ 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ', বুদ্ধদেব বসুর ভূমিকা, ভারবী, ১৯৬৬

যে-অর্থে রোমান্টিকদের উত্তরাধিকারী সেই অর্থে। অথচ সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে আধুনিক কবির বিশ্বমনস্কতাও বিপুলভাবে বিদ্যমান। সেই সূত্রেই বলতে সাহস করি, সুধীন্দ্রনাথের আন্তরসত্তার যে-অংশটি রোমান্টিক, সেই অংশটির প্রতি তাঁর কোনো ভাবালু মমতা ছিল না। যথার্থ আধুনিকের মতোই তিনি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে নিজের সেই রোম্যান্টিক সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। জানি না তাঁর বিষয়ে ধূর্জটিপ্রসাদের মন্তব্য 'সুধীন্দ্র জানে যে, তার নিজের বাঁচা মরা চেকোশ্লভাকিয়ার ইতিহাসের ওপরও নির্ভর করে'[১]— কতখানি সত্য। তবে এ কথায় কোনোই সংশয় নেই যে, সুধীন্দ্রনাথের চিত্তে বিশ্বগত জটিলতার মীমাংসা নেই। বরং সুতীব্র জিজ্ঞাসায় সে জটিলতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আত্মমীমাংসায় কখনো কখনো চঞ্চল কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিজের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন এই ভাবে— 'তাঁর আর আমার ধর্ম আকাশ পাতালের মতো পৃথক। তিনি সূর্য, উদয়াস্ত নির্বিকার : আমি অন্ধকারে বদ্ধমূল, আলোর দিকে উঠছি ; সদ্‌গতির আগেই হয়তো তমসায় আবার তলাব'[২]। এই প্রবল অন্ধকার-চেতনা সুধীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই অন্ধকারের মাঝে মাঝে তার কবিতায় ফুটে ওঠে অন্য বর্ণকল্পনা, যথা :

ক. আতুর নয়ন তাই করে অন্বেষণ
কুটিল অমার মধ্যে তব বক্র কেশের মাতন,
অবাধ্য, উৎক্ষিপ্ত বহ্নি-সম ;

—'উদ্‌ভ্রান্তি', অর্কেস্ট্রা

খ. সন্ধ্যার রাগ ছিন্ন মেঘের অন্তরে

—'অর্কেস্ট্রা', অর্কেস্ট্রা

গ. স্তব্ধ রাতে
শোকাবহ শিশিরসম্পাতে
মোর ফণীমনসায় ধরিল যে-অপুষ্পক শীষ

—'কাল', ক্রন্দসী

ঘ. বুঝিলাম বেলা চলে যায়,
দিগন্তের পটে আঁকা অস্থিসার হিম চন্দ্রমায়
সূর্যের অপরিহার্য তেজ
রচে শেষ শেজ ;

—'ভাগ্যগণনা', ক্রন্দসী

এ সমস্ত চিত্রকল্পে প্রতীকে সুধীন্দ্রনাথ যা খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তাকেই খুঁজছিলেন তাঁর ছবিতে, তাঁর নৃত্যনাট্যে। অ-চারু, অস্থিসার, কঠিন রবীন্দ্রনাথের ছবির জগৎ। কথার সৃষ্টিতে যখন তাঁর ঔদাসীন্য জন্মে গিয়েছিল, যখন তিনিও সত্যকে সুন্দর বলে ততটা নয়, যতটা দুঃসহ কঠিন বলে ভালোবেসেছেন, এবং সে-ভালোবাসায় প্রশ্রয় পেল না কোমলতা, পেলবতা, তখনই রবীন্দ্রনাথ

১ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'বক্তব্য', বিদ্যোদয় লাইব্রেরী ১৯৫৭, পৃ ২৫৭

২ 'অর্কেস্ট্রা'-র ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ।

রেখার মাধ্যমে স্বীকার করে নিয়েছেন 'আধুনিকতা'-কে। সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অতি সুদূর সাদৃশ্য মাত্র এইখানে। রবীন্দ্রনাথের ছবির জগতের অর্ধ পরিচিত মুখোশ বা ভঙ্গিমার রহস্যঘনতার সঙ্গেই তুলনা করতে ইচ্ছে করে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার অপেলব, তন্মাত্র চিত্রকল্পের এবং প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে প্রাচীন প্রস্তর খণ্ডের মতো দুরূহ আভিধানিক শব্দপুঞ্জের।

৫

সুধীন্দ্রনাথের জগৎ দ্বিধাবিদীর্ণ। 'মানসীর দিব্য আবির্ভাব সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে / জাগরণে আমরা একাকী'— এই বিদীর্ণতা সুধীন্দ্রনাথের তা কদাচ অমিয় চক্রবর্তীর নয়। তাঁর উত্তরণী মন্ত্র বরঞ্চ এই কথা বলে, 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন।' সুধীন্দ্রনাথের মনস্বিতায় মুক্তি ছিল না। মুক্তি তাঁর অন্বিষ্টও নয়। অমিয় চক্রবর্তী হৃদয়বাদী। মুক্তির জন্য তিনি ব্যস্ত নন। তাৎক্ষণিক নানা মুক্তি বন্ধুর প্রসন্ন হাসির মতো বারে বারে তাঁকে ঘিরে ধরে। অথবা মুক্তি তাঁরও অন্বিষ্ট নয়। তিনিও খুঁজছেন জীবনের প্রতি মুহূর্তের পিছু ডাক। সুধীন্দ্রনাথের 'ইতি'-র চন্দ্র বিন্দু নেতির অন্ধকারের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত। তাই তাঁর কবিতায় প্রাথমিক নাটকীয়তা না থাকলেও, সে কবিতা যেন অধিকাংশ সময়ে পঞ্চমাঙ্ক ট্র্যাজেডির শেষ দৃশ্যের নায়কের উক্তি। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় পাই জীবনের সংযত মাধুর্যের সংক্ষিপ্ত স্বীকারোক্তি। তাঁর অনেক কবিতাই নতুন জগতের কবিতা। এই একান্ত অরাজনৈতিক কবির দৃষ্টিতে বারে বারে উপনিবেশবাদ-বিমুক্ত বিশ্বের নানা ছবি ফুটে উঠেছে। সে-বিশ্বাসের মূলভিত্তিও রবীন্দ্রসম্মত— মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে নেই। রবীন্দ্রনাথ থেকেই এক উত্তরাধিকৃত আস্তিক্য অমিয় চক্রবর্তীকে দিয়েছে পাথেয়। 'পাথেয়' শব্দটি এখানে সর্বার্থে প্রযোজ্য— কেননা সে তো এক পথিক কবিরই পাথেয় বটে। তাঁর আস্তিক্য পথিকতারই আস্তিক্য। পথপ্রান্তবর্তী তীর্থ তাঁরও লক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের মতোই পথের দুধারে তাঁর চোখ মেলা বারে বারে অথবা বিভূতিভূষণের মতোই।

শেষবর্তী রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও জীবনাতীত বা অরূপ অধরা অপেক্ষা বিশ্বাস করেছেন, বিশ্ব সত্য, ততোধিক সত্য মানুষ। এই কথাটি তিনি কখনো পুরানো কথা বলে বাতিল করে দেন নি। কবি রবার্ট ফ্রস্টের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর মিল নেই বললেই হয়, সুতরাং তা দেখানোর উদ্দেশ্যও আমাদের থাকতে পারে না। কিন্তু রবার্ট ফ্রস্টের একটি স্থায়ী উপলব্ধির সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর বিশ্বাসের একটি অনুচ্চারিত সাদৃশ্য যেন কোথায় আছে। 'দি ব্ল্যাক কটেজ' কবিতায় ফ্রস্ট বলেছেন যে 'কেন পরিহার কর একটা বিশ্বাস, তা বাতিল হয়ে গেছে বলে? যথেষ্ট আঁকড়ে ধর তাকে— তা আবার সত্য হয়ে উঠবে।' বলাই বাহুল্য ফ্রস্ট এখানে বিশ্বাসের অপরিবর্তনীয়তার কথা বলছেন না। বলছেন সত্যের কালজয়ী স্বরূপের কথা। অমিয় চক্রবর্তীর বক্তব্যও কতকটা তাই। তাঁর কবিতা মানুষের শাশ্বত মুহূর্ত-গুলির কথা বলে। পটভূমি পাল্টে যায়। চারদিকের উপকরণ বদলে যায়। এক থাকে পটধৃত ব্যক্তির অন্তরের ছবি। এ জন্যই তিনি মানুষের বিচার করেন না এমন নয়— কিন্তু তিনি কখনো দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করেন না। 'ঘরে ফেরার দিন' এবং 'হারানো অর্কিড' এই দুই কাব্যগ্রন্থে তাই বোঝা গেল এই কবি আধুনিক হবার জন্য ব্যস্ত নন, কবিত্বের জন্যও ব্যস্ত নন— এঁর একমাত্র উদ্দেশ্য জীবন-নামক সেই মহৎ চিত্রকরের সঙ্গে সঙ্গে ফেরা, যার কাজ মানব-বিশ্বের চলচ্ছবিকে মুহূর্তে মুহূর্তে ফুটিয়ে তোলা। এর বড়ো

প্রমাণ 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যগ্রন্থের 'দ্বীপাবলী' এবং 'চলতি' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছে। ছোটো কবিতায় অমিয় চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবিদের সমতুল্য কৃতিত্বের অধিকারী। কিন্তু তাঁর ছোটো কবিতায় প্রধানতঃ ফুটে ওঠে একটা কোনো-না-কোনো আলেখ্য। প্রসঙ্গত স্মরণ করি 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যের 'ধর্মতার্কিক ব্রাহ্মণকে একদিন প্রশ্নোত্তরে' কবিতাটি।

যে-আস্তিক্য অমিয় চক্রবর্তীর আধুনিকতাকে নূতন মাত্রা দিয়েছে তার স্বরূপটি এই আলেখ্যগুলির উপরে একটা আলো ফেলে। তাকে কিন্তু মিস্টিকের গূঢ় স্নিগ্ধ আলো বলা চলে না। তিনি ব্যস্তও নন সে ভাবে সেই আলোটিকে প্রতিপন্ন করার জন্য। তাঁর আস্তিক্যের মূল কথা হল— জীবনের প্রতি বিশ্বাস। মানুষের মহৎ কীর্তিতে তাঁর উপেক্ষা নেই। কিন্তু হীরের টুকরো যেমন ওজনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেয়ে বর্ণচ্ছটা প্রতিফলনের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রমাণিত করে— এই কবির কাছে জীবনও ঠিক সেইভাবে প্রতিভাত। কিন্তু তা হলেও তাঁর সম্বন্ধে শেষপর্যন্ত একটা প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে। আত্মসচেতনতা এবং বিশ্বসচেতনতা আধুনিক বাংলা কবিতার একটা প্রধান লক্ষণ। অমিয় চক্রবর্তীর চেতনাকে কি সভ্যতার আধি এবং ব্যাধির যন্ত্রণা কিছুই স্পর্শ করে নি? 'হারানো অর্কিড'-এর ভূমিকায় যে-কবি বলছেন— 'আহত পুড়ন্ত ভিয়েৎনামের অরণ্যে চোখে পড়েছিল অনিন্দ্যসুন্দর বিজয়ী অর্কিড, বর্বর সংঘর্ষের উর্ধ্বে। কোনোদিনই হারাবে না'— সে-কবি সম্বন্ধে এমন কথা বলা যাবে না। 'হারানো অর্কিড' নাম-কবিতাটির ছোট্ট প্রেম কাহিনীর অন্তে কথাটি হল— 'অর্কিড কখনো হারাবে না।' অর্কিড তাঁর হাতে প্রেমের প্রতীকই শুধু নয়— জীবনের প্রতীক। অন্ধকার আছে, থাকবেও— কিন্তু মানুষের বুকের কাছ থেকে অর্কিড হারিয়ে যাবে না— চিরন্তনত্ব ও আধুনিকতার মাঝখানের বেড়াটি খুলে দিতে দিতে অমিয় চক্রবর্তী এই কথাই বলে চলেছেন। বলে চলেছেন মৃত্যুর কথা নয়— পৃথিবীর বৃন্তে ফোটা এ-জীবন ('সাক্ষী', হারানো অর্কিড)-এর কথা। দুঃখের কালো কয়লা নেই— এমন কথা তিনি বলেন না। বলেন— 'বুকভাঙা কালো কয়লা তীব্ররাতে/হীরে হও' ('হীরে', হারানো অর্কিড)। সে কবিতা যতই হয়ে উঠুক না কেন 'নীলমাখা পাখি হাওয়ার একক/গ্রহপারে ওড়া শূন্য সাধক', তবু তার পালকে খুঁজে পাই: 'পৃথিবী দিনের মাটির কণিকা লীনা, / ঠোঁটের কোনায় মহুয়ার কণা লুকোনো / বাংলা ঘরের সবুজ চিহ্ন কোনো, / নখের তলায় জীবনের ধুলো লাগা।' ('পরিচয়', হারানো অর্কিড) এই তাঁর উড়ে চলা, চিরকালের দিকে। 'প্রেমে রঙে শুধু একটি কাহিনী'। তাঁর পর্বের আধুনিকতার প্রধান কথা এই যে, তিনি সত্যকে কখনো বিপন্ন বলে ঘোষণা করলেন না। সত্যকে দিয়ে তিনি কোনো তত্ত্ব নির্মাণ করলেন না।

৬

'একবার ওঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, জীবনের কোনো সময়ে রিল্‌কের কাব্য ওঁকে [জীবনানন্দকে] স্পর্শ করেছিল কিনা'— বললেন, না, রিল্‌কে ওঁর বিশেষ জানা নেই।— বুদ্ধদেব বসুকে এক চিঠিতে[১] অমিয় চক্রবর্তী এ কথা জানিয়েছিলেন। জীবনানন্দের কবিতায় রিল্‌কে যতটা আছেন, অমিয় চক্রবর্তীর

১ 'কবিতা', জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা— পৌষ ১৩৬১, পৃ ১২৭

কবিতায়ও রিলকে পরিমাণে ততটাই আছেন — যদিও বিত্তমানতার প্রকৃতিটা ভিন্ন। জীবনানন্দ এবং অমিয় চক্রবর্তী দুজনেই বলেন রৌদ্রের কথা। দুজনেই বলেন মৃত্যুর কথা। রিল্‌কের মতো কেউই কিন্তু ভাবনালীন হতে চাইতেন না। জীবনানন্দ যদি বা কখনো না কখনো ভাবনার ভারে অবনত —অমিয় চক্রবর্তীর কাছে চৈতন্য কখনো দার্শনিকতায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি। জীবনানন্দের রৌদ্র সব সময়ে অন্ধকারের প্রতিমুখে স্থাপিত। তাই তাঁর রৌদ্রের নানা রঙ। অমিয় চক্রবর্তীর রৌদ্র আপন মহিমায় সত্য। তার নিজেকে প্রমাণ করার জন্য কোনো অন্ধকারের বিরোধী ভূমিকার দরকার নেই। সেখানে আলো এবং অন্ধকার, রাত্রি এবং প্রভাত, জীবন ও মৃত্যু অচ্ছেদ্য অখণ্ডতায় বিরাজিত। মৃত্যু সেখানে জীবনেরই স্মারক। 'সন্ন্যাসীর মৃত্যু' কবিতাতেই শুধু নয়, 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যের 'সাণ্টা মারিয়া দ্বীপে' নামে কবিতাটিও মৃত্যু সম্বন্ধে কবির প্রসন্ন দৃষ্টির নিদর্শন। এই-সব থেকেই বলি, তিনি যতটা আধুনিক তার থেকে অনেক বেশি কবি। এই কবিত্বই তাঁর চেতনার অভিজ্ঞান।

আর্থিক উন্নতির স্বরূপ

ভবতোষ দত্ত

আমাদের দেশে পরিকল্পিত আর্থিক উন্নয়নের সূচনাকাল থেকে আরম্ভ করে আর্থিক উন্নতির সংজ্ঞা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। গত কয়েক বছরে এই আলোচনাতে অনেকগুলি মূল প্রশ্ন আবার তোলা হয়েছে। বিশেষ করে প্রশ্ন উঠেছে আর্থিক উন্নতির মূল বস্তু ঠিক কী কী, উন্নয়নের প্রচেষ্টার ফলে যে-সব পরিবর্তন আসে তার মধ্যে ঠিক কোন্‌গুলিকে সমাজের পক্ষে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা যেতে পারে। দুই-তিন দশক আগে উন্নতির সংজ্ঞা নিয়ে যে-সব আলোচনা হত তাতে প্রধান প্রশ্ন ছিল বিভিন্ন রুচির বহুজন-অধ্যুষিত সমাজে বিভিন্ন আয়শ্রেণী ও বিভিন্নমুখী উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক কোন্ যোগফলটাকে আমরা আর্থিক উন্নতির পরিমাপ বা নির্দেশক বলে গ্রহণ করব। তার উপরেও প্রশ্ন ছিল যে বহুলোকের বহুপ্রকারের স্বাচ্ছন্দ্যবোধকে যোগ করা একেবারেই যায় কি না।

যে-কোনো একজন লোকের একটি বিশেষ জিনিসের ভোগ সম্বন্ধে সহজেই বলা যায় যে আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটা বেশি পরিমাণে পেলেই আর্থিক উন্নতি। জিনিসের সংখ্যা যদি একের বেশি হয় তা হলেই কথা ওঠে যে একটি জিনিসের পরিমাণ যদি বাড়ে এবং অপরটির পরিমাণ যদি কমে তা হলে আমরা উন্নতির যোগফলটা কি ভাবে বার করব। দুটি জিনিসের মধ্যে বিনিময়ের হার অবশ্য একটা পাওয়া যাবে, কিন্তু ব্যক্তির সংখ্যা একের বেশি হলেই দেখব যে বিনিময়ের হার আয়-বণ্টন ইত্যাদি অনেক কিছুর উপরে নির্ভর করে। যদি সমাজের সম্পূর্ণ জনসংখ্যার আর্থিক উন্নতির পরিমাপ করতে যাই, তা হলে সবচেয়ে সহজ উত্তর দেওয়া যায় যখন প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ বেশি করে পায়। যে সমাজে কারো কারো প্রাচুর্য বৃদ্ধি পায় এবং কারো কারো অভাব বাড়ে সে সমাজে আর্থিক উন্নতির সংজ্ঞা দিতে হলে প্রথমেই একটা মূলনীতি গ্রহণ করে নিতে হবে। এই মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতেই উন্নতির গতিপথের বিচার করতে হবে।

ভারতের মতো দেশে একটা সর্বজনগ্রাহ্য মূলনীতি সহজেই নেওয়া যায়। দেশের সব লোকের ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন বাড়ানো সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত হবে না এবং এটাও সবাই নিশ্চয় মেনে নেবেন যে নিম্নতম আয়-ভোগীরও এই-সব জিনিসের প্রয়োজনীয় পরিমাণ সহজেই পাওয়া উচিত। এই লক্ষ্যের বাঞ্ছনীয়তা ভোট নিয়ে প্রমাণ করার সুযোগ নেই, কিন্তু কোনো একটা জায়গায় এসে মূলনীতির উপরে নির্ভর করতেই হয়। এটাও বলা চলে যে ভারতীয় অর্থনীতির ব্যাপক আলোচনাতে লক্ষ্য হিসাবে এই মূলনীতি কেউ অস্বীকার করেন নি। এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে চাই সকলের জন্য কর্ম-সংস্থান— এবং এমন কর্মের সংস্থান যা থেকে একই সঙ্গে আয় সৃষ্টি হয় এবং প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদনও বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রয়োজন যে অভীষ্ট লক্ষ্যের ন্যূনতম স্তরে পৌঁছতে যেন দেরি না হয় এবং ন্যূনতম স্তর থেকে আরো উচ্চতর স্তরে যাবার গতিপথ যেন সুনির্দিষ্ট হয়। উচ্চতম স্তরের কোনো সংজ্ঞা নেই, কিন্তু বণ্টনের দিক থেকে সহজেই বলা যায় যে প্রধান লক্ষ্য হবে সর্ব-প্রকারের অসাম্য দূর করা, সেটা আঞ্চলিক বা শ্রেণীগত বা ব্যক্তিগত যেরকমেরই হোক।

আর্থিক পরিকল্পনার প্রণেতারা কেউই এই সহজ নীতিগুলি অস্বীকার করেন নি। গরীবী হটাও বলে যে কথাটা কয়েক বছর আগে চালু হয়েছিল, প্রথম থেকেই সেটাই ছিল আমাদের আর্থিক পরিকল্পনার মূলমন্ত্র। ব্যাপক এবং শোচনীয় দারিদ্র্য ছিল বলেই বিশদ পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল। সমৃদ্ধ দেশে, এবং বিশেষত যে দেশে নিম্নতম আয়ের লোকেরাও সর্বদা ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সহজে পেয়ে যায়, সেখানে বড়ো ধরনের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার প্রয়োজন কম। যে পথে এ-সব দেশ সমৃদ্ধিতে পৌঁচেছে সে পথ অবলম্বন করবার সুযোগ অন্য দেশের নেই এবং অ-পরিকল্পিত উন্নতিতে যে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে ততটা সময়ও এ-সব দেশের হাতে নেই। বরং বলা যায় যে এক দেশ এবং অন্য দেশের মধ্যে অসাম্য যেখানে বেশি সেখানে দীর্ঘকালীন বিবর্তনের ফলে দরিদ্র দেশ দরিদ্রতর হয়ে যেতে পারে।

এটা সর্বথা স্বীকৃত হলেও দেখতে পাই যে কার্যক্ষেত্রে আমাদের দেশে পঁচিশ বছরেরও অধিক কাল আর্থিক পরিকল্পনার নীতি ও কর্মপন্থা অনুসৃত হবার পরেও দারিদ্র্যের অবসান হয় নি। নিম্ন-আয়ের স্তরে আর্থিক অবস্থা যদি প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের তুলনায় খারাপ না-ও হয়ে থাকে, ঐ স্তরে এখনো জীবনযাত্রা নির্বাহের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলির অভাব আছে এবং যে জনগণ 'দারিদ্র্যসীমা'র নীচে তাদের সংখ্যা শোচনীয় ভাবে বেড়ে গিয়েছে। পাঁচ বছর আগে অধ্যাপক দাণ্ডেকার ও শ্রীরথ একটি হিসাবে দেখিয়েছিলেন যে জীবনযাত্রার জন্য অবশ্যপ্রয়োজন অল্প কয়েকটি জিনিসের ব্যবহারকে যদি দারিদ্র্যের সীমারেখা বলে মেনে নেওয়া যায়, তা হলে ভারতের জনসংখ্যার শতকরা চল্লিশ জন লোক— অর্থাৎ বর্তমানে প্রায় ২২ কোটি মানুষ — এই দারিদ্র্যসীমার নীচে।

এই পরিসংখ্যান নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। ভোগ্যবস্তুর ব্যবহারের কোন্ পর্যায়কে দারিদ্র্য বলে অভিহিত করা যায়। কোনো এক বিগত বছরের জীবনযাত্রার প্রয়োজনের জিনিসগুলির মূল্য-পরিবর্তন দেখেই আমরা এই দারিদ্র্যের মূল্যায়ন করতে পারি কি না, ভোগ্যবস্তুর বণ্টন সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য সত্যিই আছে কি না, এ-সব প্রশ্ন সহজেই ওঠে। কিন্তু এত সূক্ষ্ম তর্কে না গিয়ে বলা যায় যে দারিদ্র্যসীমার নীচের জনসংখ্যা যদি ২২ কোটি না হয়ে ১৫ বা এমন-কি, ১০ কোটিও হয় তা হলেও আমরা সর্বজন-ব্যাপ্ত আর্থিক উন্নতি আনতে ব্যর্থ হয়েছি। এটাও সহজেই দেখানো যায় যে বর্তমানের উৎপাদন-রীতি বজায় রেখে শুধু সরকারী করনীতি ও অনুদানের সহায়তায় যদি আয়বণ্টনে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয় তা হলে তার ফল সামান্যই হবে। দাণ্ডেকার বলেছিলেন যে বিভিন্ন আয়স্তরের মধ্যে উচ্চতম দশ শতাংশের আয় থেকে যদি বছরে ৮০০-১০০০ কোটি টাকা নিম্নতম স্তরে বিতরণ করে দেওয়া যায়, তা হলে সমস্যার অনেকটা লাঘব হবে। কিন্তু আমাদের বর্তমান রাজস্ব ও সরকারী ব্যয়-ব্যবস্থাতে এটা সম্ভব নয়। আর, তা ছাড়া এটা আমাদের মনে থাকে না যে উচ্চতম আয়ের যে দশ শতাংশের কথা বলা হয় তাদের মধ্যে শুধু বড়ো শিল্পপতি, বা ব্যবসায়ীরাই নেই, কারখানার শ্রমিক, ব্যাঙ্কের কেরানি, মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকও আছেন। দেশের দারিদ্র্য কতখানি সেটা এই থেকেই বোঝা যায়— আয়বণ্টনের দিক থেকে শতকরা দশ-দশ করে যদি সমাজকে দশটি ভাগে ভাগ করা যায়, তা হলে স্কুলের শিক্ষকও উচ্চতম দশকের মধ্যেই পড়বেন। যদি উচ্চতম দশ শতাংশ থেকে নিম্নতম দশ শতাংশে আয়ের ও ভোগের স্থানান্তর করতে হয়, তা হলে এমন অনেকের উপরে

আঘাত পড়বে যাদের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটানো অনুচিত। তার পরে মনে রাখতে হয় যে আমাদের দারিদ্র্য ও আর্থিক অসাম্যের সমস্যাটা ৮০০-১০০০ কোটি টাকার সমস্যা নয়, বহু সহস্র কোটি টাকার সমস্যা। উৎপাদনের ব্যবস্থা ও রীতি সম্পূর্ণ বদল না করলে লক্ষ্যে পৌছনো অসম্ভব।

অ-সম আয়কে পুনর্বন্টিত করে সাম্য আনার মানে হল প্রথমে এই অ-সম আয় সৃষ্টি হতে দেওয়া এবং পরে সেটাকে ট্যাক্স ও অনুদানের মাধ্যমে নূতন করে বণ্টন করা। এই পথে যাওয়া যদি সম্ভবও হয় তা হলেও উপকারটা বেশি হবে না এবং এমন অনেকের উপরে চাপ পড়বে যাদের এই চাপ বহন করবার ক্ষমতা নেই। তার চেয়ে বড়ো কথা হল যে যেখানে অ-সম আয়ের সৃষ্টি হয় সেখানে উৎপাদনও অনেকটা এমন-সব জিনিসের হয় যেগুলি উচ্চ আয়ের অধিকারীরাই কিনতে পারেন। টেলিভিশন উৎপাদন করে নূতন আয় সৃষ্টি করলে সেই টেলিভিশনের চাহিদা চাই। এই চাহিদা বেশি ও ক্রমবর্ধমান করতে হলে উঁচু আয়ের লোকের আয় ও তাদের সংখ্যা বাড়া দরকার। অর্থাৎ, আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থাটাই সেক্ষেত্রে এমন হতে হবে যে তার সাফল্যের জন্য অ-সম আয়ই প্রয়োজন।

উৎপাদন বৃদ্ধি আর আয়বণ্টন এই দুটি সমস্যাকে আলাদা করে দেখলেই এজাতীয় সিদ্ধান্তে পৌছুতে হয়। আসলে প্রয়োজন এমন একটা উৎপাদন নীতি, যার মধ্যেই আমাদের কাম্য বণ্টন নীতি নিশ্চিত ভাবে নিহিত থাকবে। গত পঁচিশ বছর ধরে আমাদের যে উৎপাদন নীতি অনুসৃত হয়েছে তাতে সাধারণ খাদ্যদ্রব্য ও নিম্নতম প্রয়োজনের শিল্পজাত জিনিসপত্রের উৎপাদন যে হারে বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি হারে বেড়েছে বিলাস-দ্রব্যের উৎপাদন— নাইলন, টেরিলিন, এয়ার কণ্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদির। সাধারণ লোকের থাকবার উপযুক্ত গৃহ নির্মাণে দেশের মোট-সম্পদের যে অংশ বিনিযুক্ত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে ধনীদের বিলাস-বহুল আবাস নির্মাণে এবং সরকারী-বেসরকারী অফিসের ভবন নির্মাণে।

আমরা যদি দারিদ্র্যের অবলুপ্তি চাই তা হলে দরিদ্রের কর্মসংস্থান ও আয়-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন তাদের ব্যবহার্য জিনিসের উৎপাদন বাড়ানো। বিলাস-দ্রব্যের উৎপাদনে শ্রমিক নিয়োগ অবশ্য বাড়ে এবং তাদের নূতন আয়েরও সৃষ্টি হয়, কিন্তু এই আয় যে-সব জিনিসের উপরে ব্যয়িত হবার কথা সে-সব জিনিসের সরবরাহ বাড়ে না। প্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদা-বৃদ্ধির তুলনায় সরবরাহের স্বল্পতা দেখা দেয় এবং ফলে এ-সব জিনিসের দাম বাড়ে এবং দরিদ্রের ভোগ্যবস্তু ব্যবহার আরো কমে। জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান থেকে এই সবটা চিত্র কখনো পাওয়া যায় না। ১০০ কোটি টাকা দামের বাড়তি খাদ্যশস্য উৎপাদন করলে জাতীয় আয় যতটা বাড়বে, ১০০ কোটি টাকা দামের নাইলনের শাড়ির উৎপাদন করলেও জাতীয় আয় ঠিক ততটাই বাড়বে। যদি সরকারী অফিসে কর্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়ে তাদের ১০০ কোটি টাকা বেশি বেতন দেওয়া হয়, তা হলেও জাতীয় আয় ঐ পরিমাণেই বাড়বে। কোনো বছরে জাতীয় আয় শতকরা পাঁচ ভাগ বেড়েছে এইটুকু শুধু বললে বোঝা যায় না সত্যি সত্যি দেশের কাম্য উন্নতি এসেছে কি না।

আমাদের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মপন্থার জন্য ঠিক কোন্ দিকে উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন তার একটা বিশদ উত্তর দেওয়া শক্ত নয়। একটা সচ্ছল-দেশে উৎপাদনের যে সমস্যা ওঠে সেগুলির উৎপত্তি হয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি মূল অভাব মোচনের পরে। তখন প্রশ্ন ওঠে কোন্

ধরনের মোটর গাড়ি তৈরি হবে, রঙিন টেলিভিশন তৈরি হবে কি না ইত্যাদি। গরিব দেশে এ-সব প্রশ্ন ওঠাই উচিত নয়— যতক্ষণ না সর্বস্তরে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাই আমরা সহজেই বলতে পারি কী কী আমরা চাই। আমরা প্রথমেই চাই যে দারিদ্র্যসীমার নীচের বিরাট জনগণকে উপরে টেনে আনতে— তাদের নিয়োগ বাড়িয়ে এবং তাদের আয় বাড়িয়ে। আয় বাড়ানোটাকে অর্থপূর্ণ করতে হলে চাই সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্রের উৎপাদনের প্রভূত বৃদ্ধি। এর পরে আসে কলকব্জা জাতীয় 'মূলধনী' জিনিস। সমস্ত উৎপাদন রীতির যদি প্রধান উদ্দেশ্য হয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে চলা, অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনের অব্যাহত বৃদ্ধি, তা হলে এমন মূলধনী জিনিস তৈরি করতে হবে যার ব্যবহারে সাধারণ ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন অনতিবিলম্বে এবং দ্রুতগতিতে বাড়ে। কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সেচের ব্যবস্থা, গ্রামীণ শিল্পের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, রাস্তাঘাট তৈরি, মোটর ট্রাক উৎপাদন সবই এই কর্মপন্থার মধ্যে পড়বে। যে যন্ত্র বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে সেই জাতীয় যন্ত্র নির্মাণের সময় আমাদের এখনো আসে নি। এর সঙ্গে সঙ্গে দরকার কিছুটা এমন উৎপাদন (বর্তমান অবস্থায় মোট জাতীয় উৎপাদনের আট শতাংশের মতো) যাতে আমাদের রপ্তানি বাড়ে, যাতে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রার অনেকটা নিজেরাই অর্জন করে নিতে পারি।

এখানে কয়েকটি বিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার। আমরা অনেক সময়ে কোনো যুক্তিসংগত চিন্তাধারাকে গ্রহণ করে নিয়ে সেটাকে রূপ দেবার সময় এমন কর্মনীতি নিয়ে বসি যে সব উদ্দেশ্যই বিফল হয়ে যায়। এর একটা ভালো উদাহরণ, আমদানি কমাবার জন্য বিদেশী জিনিসের বিকল্প দেশে তৈরি করবার কর্মপন্থা। এর পক্ষে যুক্তি অতি সহজ। যে বিদেশী জিনিস আমাদের না হলে চলে না সেগুলিকে চেষ্টা করে যদি দেশেই তৈরি করে নিতে পারি— খানিকটা ক্ষতি স্বীকার করেও— তা হলে বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় হয়, দেশের শিল্পোন্নতি হয়, দেশের কাঁচামাল ও শ্রমশক্তির ব্যবহার বাড়ে এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ ইত্যাদি কারণে হঠাৎ আমদানি বন্ধ হবার অসুবিধার হাত থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। কিন্তু, 'আমদানির বিকল্প' নাম দিয়ে আমরা এমন-সব জিনিস তৈরি করছি যেগুলি গরিব দেশে না হলেও চলত। বিদেশী প্রসাধন দ্রব্যের স্বদেশী বিকল্প আমরা এখন খুব বেশি তৈরি করছি। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী নামেই সেগুলি চলে এবং এদের উৎপাদনের পেছনে বিদেশী মূলধন ও কারিগরি সাহায্য থাকে, যার জন্য অনেক দাম দিতে হয়। আমাদের শিল্পপতিরা আমাদের মূলধন, পরিচালনাশক্তি ও শ্রমশক্তিকে প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদনের দিকে না নিয়ে এই-সব বিলাসদ্রব্যের দিকে নিয়ে যান, কারণ লাভের পরিমাণ এদিকে অনেক বেশি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিলাসদ্রব্যের নির্মাতারা যে পরিমাণ জিনিস তৈরি করবার সরকারী অনুমতি পেয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি জিনিস বাজারে ছাড়ছেন। অথচ, সাধারণ সুতী বস্ত্র বা স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় সস্তা দামের কাগজ যতটা তৈরি করবার ক্ষমতা কারখানাগুলির আছে তার পুরোপুরি ব্যবহার হয় না। আমদানির বিকল্প তৈরি করা ভালো এই ধুয়া তুলে এমন অনেক জিনিস তৈরি হয় যার গরিব দেশে প্রয়োজনই নেই। যে আমদানি আমাদের হতে দেওয়া উচিত নয় তার বিকল্প দেশে উৎপাদনের পক্ষে কোনো যুক্তি নেই।

এইরকম আরেকটি বিষয় হল ক্ষুদ্রায়তন শিল্প। ভারতের আর্থিক উন্নতির কর্মপন্থায় প্রথম স্থান যদি হয় কৃষির, তা হলে দ্বিতীয় স্থান কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের। গত পঁচিশ বছরে বড়ো শিল্পের যে প্রসার আমরা

এনেছি তাতে শ্রম নিয়োগ বেশি বাড়ে নি, গরিবের আয় বাড়ে নি, আর্থিক উন্নতির সুফল গ্রামে গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয় নি, সুদূর পল্লী অঞ্চলের কাঁচামাল ও শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার হয় নি, সর্বসাধারণের ভোগ্যবস্তুর সরবরাহ সর্বত্র সমান ভাবে বাড়ে নি। এক সঙ্গে এই-সব সমস্যার সমাধান হয় পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে ক্ষুদ্র শিল্পের নাম করে আমাদের দেশে অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে। তার চেয়েও আশঙ্কার কথা যে ক্ষুদ্রশিল্পকে সরকার যে-সব সুবিধা দেন, সেগুলি পাবার জন্য অনেক বড়ো শিল্পপতি তাঁদের বড়ো কারখানার অনুষঙ্গী হিসাবে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছেন। এরকম সব ক্ষেত্রে একটাই মাত্র প্রশ্ন, যে উৎপাদন আমরা করতে যাচ্ছি তাতে জনসাধারণের অভাব মোচন হবে কি না। এই প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা পেয়ে যাই, তখন প্রশ্ন ওঠে আমদানির বিকল্পের এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের। অনেক জিনিস আছে যেগুলির জন্য বড়ো শিল্পই প্রয়োজন, যেমন সিমেণ্ট, ইস্পাত বা রাসায়নিক সার। এগুলির যথাসম্ভব প্রসারের পরেও আমাদের অনেক অভাব থেকে যায়, অনেক উৎপাদিকা শক্তি অব্যবহৃত থাকে, অনেক অঞ্চল দরিদ্র থেকে যায়। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান এই সমস্যাবলীর সমাধানে।

কোন্ জিনিসগুলি আমরা তৈরি করব সেটা ঠিক করে নেবার পরে কয়েকটি অন্য প্রশ্ন ওঠে— এর মধ্যে কী কী তৈরি হবে সরকারী মালিকানায় এবং কী কী তৈরি করার ভার বেসরকারী উদ্যোগের উপরে ছেড়ে দেওয়া হবে ; দেশের কোন্ অঞ্চলে কতটা বিনিয়োগ হবে ; উৎপাদনের প্রণালী কী রকম হবে ; আর উৎপাদনের গতিপথ কী হবে। সরকারী উদ্যোগ সম্বন্ধে সহজেই বলা যায় যে কয়েকটি ক্ষেত্র বেসরকারী মালিকানাতে কখনোই উন্নত হবে না, বিশেষত যেগুলিতে প্রভূত পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন, যেগুলিতে বিনিয়োগ এবং উৎপাদনের মধ্যে কাল-পার্থক্য অনেকটা এবং যেগুলিতে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা কম অথচ উৎপাদনটা সমাজের পক্ষে প্রয়োজন। রেলপথ নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি ভারতের মতো দেশে সরকারী উদ্যোগ ছাড়া সুষ্ঠুভাবে কখনো হবে না। আরো বলা যায় যে যদি কোনো উৎপাদন একচেটিয়া ভাবে না করলে কার্যকর হয় না (যেমন টেলিফোন) সে ক্ষত্রে ব্যক্তিগত বা বেসরকারী উদ্যোগকে একচেটিয়া ব্যবসায়ের সুবিধা ভোগ করতে দেওয়া অসংগত। একচেটিয়া উৎপাদন যদি করতেই হয় তা হলে জনসাধারণের পক্ষে সরকারের সেই ভার নেওয়া সবচেয়ে কাম্য।

দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য মোট বিনিয়োগ কী হবে সেটা জানা থাকলে, সে বিনিয়োগের কোন্ অংশ কোন্ দিকে যাবে সেটা একটা বড়ো প্রশ্ন। তারই সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশ্ন হল, মোট বিনিয়োগের কোন্ অংশ কোন্ অঞ্চলে ব্যয় করা হবে। এদিক থেকে আমরা এ পর্যন্ত খুব বেশি রকমের অসাম্য দেখেছি— পঁচিশ বছরের উন্নতির প্রচেষ্টা সব রাজ্যে সমান ভাবে হয় নি, এবং একই রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন জেলায় সমান ভাবে হয় নি। অসাম্যের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ব্যক্তিগত আয়ের তারতম্য, কিন্তু এই সমস্যার মূলে অনেক সময়ে থাকে আঞ্চলিক অসাম্য। এখানে একটি কথা অবশ্য বলে নেওয়া দরকার। কোন্ অঞ্চলে কী পরিমাণ উন্নয়নী বিনিয়োগ হবে সেটা আমাদের দেশে অনেক সময় নির্ণীত হয়েছে রাজনৈতিক চাপে। প্রত্যেক অঞ্চলেই ইস্পাত কারখানা তৈরি করবার জন্য চাপ পড়ে যদিও এটা সহজেই বোঝা যায় যে ইস্পাত ছোটো ছোটো কারখানায় করতে গেলে ব্যয় অত্যন্ত বেশি পড়ে এবং বড়ো কারখানা করা উচিত শুধু সেখানেই যেখানে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, বিদ্যুৎ-শক্তি ইত্যাদি সহজে পাওয়া যায়। নানারকমের চাপে

কয়েক বছর আগে অনেকগুলি 'মিনি-স্টীল' কারখানা স্থাপিত হয়েছিল— অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গিয়েছে যে কতটা অপব্যয় এই কারণে হয়েছে। এরকম উদাহরণ আরো দেওয়া যায়। অথচ অনুন্নত অঞ্চলে একটু বেশি ব্যয় পড়লেও নূতন শিল্প স্থাপন করে স্থানীয় কাঁচামালের উৎপাদককে ও শ্রমিককে উন্নীত করার প্রয়োজন খুব বেশি। আসল কথা, অনুন্নত অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা নিতে হবে দেশের সর্বাঙ্গীণ অবস্থা ও প্রয়োজন বিচার করে, পরিকল্পনার জন্য গৃহীত মূলনীতির সার্থক রূপায়নের জন্য। যে আঞ্চলিক পরিকল্পনা আমাদের বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হবে তার মূলে থাকবে বিজ্ঞানভিত্তিক ও অর্থনীতি-সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি। রাজনৈতিক চাপে গৃহীত আঞ্চলিক পরিকল্পনা অসাম্য না কমিয়ে বাড়াতে পারে এবং সবশুদ্ধ সম্পদের অপব্যবহারের কারণ হতে পারে।

উৎপাদন প্রণালীর প্রশ্নটি সম্বন্ধে উত্তরও ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্নভিন্ন রকমের হবে। এমন অনেক শিল্প আছে যেগুলিতে সর্বাধুনিক বিদেশী উৎপাদন-পন্থা এবং আধুনিকতম যন্ত্রপাতি না ব্যবহার করলে আমরা দাঁড়াতে পারব না। ইলেকট্রনিক যন্ত্রগণক যদি তৈরি করতে যাই তা হলে সবচেয়ে আধুনিক নির্মাণ-পদ্ধতিই দরকার। কিন্তু বোতলবন্দী শীতল পানীয় তৈরি করতেও যে আমাদের আধুনিকতম আমেরিকার বা ইটালির উৎপাদন-পদ্ধতি নিতে হবে তার কোনো সংগত কারণ নেই। সর্বাধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতির কর্ম-সাফল্য অসংশয়ে বেশি, কিন্তু তার জন্য লাগে অনেক মূলধন, যার বেশ বড়ো একটা অংশ বিদেশ থেকে আনতে হয়। আরো লাগে বিদেশী কারিগরি সাহায্য যার জন্য অনেক দাম দিতে হয়। বিদেশী পেটেন্ট নাম ব্যবহার করবার জন্য আবার আলাদা দাম দিতে হয়। এই ব্যয়বহুল উৎপাদন-পন্থা আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে অনেক রকম কারণে। বিদেশী পরামর্শদাতারা তাঁদের জানা পদ্ধতি গ্রহণ করবার জন্য জোর দেন। বিদেশে বা বিদেশী ধরনে শিক্ষিত ভারতীয় বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদেরাও একই রকম মত পোষণ করেন। এঁদের কেউই দেশের সর্বাঙ্গীণ সমস্যার কথা ভাবেন না, নিজেদের সীমিত ক্ষেত্রের কথাই ভাবেন। সমাজের দিক থেকে বড়ো প্রশ্ন হল যে আমাদের সবরকম উৎপাদন-ক্ষমতার সবচেয়ে ফলপ্রসূ ব্যবহার হচ্ছে কি না। আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা বিশেষ কোনো একটা কাজ করতে পারেন কি না সেটা দ্বিতীয় স্তরের প্রশ্ন। সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময় এরকম একটা মনোভাব থাকে যে আমরা পৃথিবীকে দেখাব যে আমরা সবই করতে পারি। এই প্রদর্শন-কামী মনোভাবের জন্য দাম দিতে হয় জনসাধারণকে।

যদি আমাদের প্রয়োজন ও সামর্থ্য -অনুসারে আমরা আমাদের উৎপাদন-পদ্ধতি বেছে নিই, তা হলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো জিনিসটা হয়তো আমরা পাব না, কিন্তু আমাদের কাঁচামাল ও শ্রমশক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার হবে। আধুনিকতম উৎপাদন-পদ্ধতির একটা প্রধান বিশেষত্ব বেশি মূলধনের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্প-সংখ্যক শ্রমিকের সংযোগে উৎপাদন। যে দেশে মূলধন কম এবং শ্রমিকের সংখ্যা বেশি সেখানে সর্বত্র এই জাতীয় বিদেশী উৎপাদন-পন্থার ব্যবহার অপচয়জনক। ভারতীয় অর্থনীতিবিদেরা গত কয়েক বছরে এ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান আলোচনা করেছেন, সরকারী কর্মনীতির প্রকাশিত বিবৃতিতে উপরে যা বলা হল সেটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরিকল্পিত অর্থনীতিতে যে সর্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি দরকার সেটা এখনো পুরোপুরি গৃহীত হয় নি। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যদি আলাদা ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা হলে অপচয়ের সম্ভাবনা বাড়ে।

এই সর্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান কাল থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত করে দেখলে প্রত্যেক উৎপাদন ক্ষেত্রের কী গতিপথ হবে সেটা ঠিক করে নেওয়া দরকার। এই গতিপথগুলি আলাদা করে নির্ণয় করা যায় না, এগুলি পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে সম্পৃক্ত। যদি আমরা স্থির করি যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানো হবে বছরে শতকরা সাত হারে, তা হলে এর সঙ্গে সংযুক্ত প্রয়োজনীয় হারে বাড়াতে হবে সারের উৎপাদন, সেচের জলের ও বিদ্যুতের সরবরাহ। এরই সঙ্গে প্রয়োজন হবে দ্রুত ভূমিসংস্কার। গত কুড়ি পঁচিশ বছরে আমরা অনেকবার দেখেছি যে চাষীর জমিতে জল এসেছে, অথচ সার আসে নি, বা জলের পাম্প এসেছে কিন্তু বিদ্যুৎ আসে নি। বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে কিন্তু তার বিকিরণের জন্য লাইন বসানো হয় নি। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উৎপাদনের গতিপথ এমন ভাবে নির্ণীত এবং কার্যকর করা প্রয়োজন যাতে একটা জিনিসের অভাবে আরেকটা জিনিসের উৎপাদন ব্যাহত না হয়।

উৎপাদনের লক্ষ্য, গতিপথ এবং পদ্ধতির সমস্যাগুলি সবই একত্র সংযুক্ত, এবং বণ্টনের সমস্যার সমাধানও অনেকটা এরই মধ্যে নিহিত আছে। কৃষির উন্নতির জন্য আমরা আধুনিক পন্থায় বড়ো খামারে চাষে উৎসাহ দেব, না ছোটো ছোটো ক্ষেতে এমন ভাবে চাষ হবে যে পুরানো পন্থার মধ্যেই খানিকটা আধুনিকতা আনা যায়, এ প্রশ্নের উত্তর সম্মিলিত ভাবে দেবেন কৃষিবিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদ এবং যন্ত্রশিল্পী। এঁদের গবেষণা থেকেই বোঝা যাবে যে বড়ো খামারে সব শস্যের বেলাতে সত্যি সত্যি ব্যয়ের তুলনায় উৎপাদন বেশি হয় কি না, এঁরাই বলে দেবেন বড়োখামার করলে যদি অসংখ্য ছোটো চাষীর কর্মসংস্থান করা দুরূহ হয়ে পড়ে তা হলে সে সমস্যার সমাধান কী করে করা যায়। আমাদের জানা দরকার যে কৃষির উৎপাদন ও জোগান বাড়ানোর জন্য সেচ-ব্যবস্থা, সাধারণ যন্ত্রপাতি-নির্মাণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তাঘাট ও যানবাহনে কী উন্নতি একযোগে আনতে হবে। পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করলে আমাদের পরিষ্কার ভাবে ঠিক করে নেওয়া দরকার সেগুলি কী জাতীয় হবে, কোথায় কোন্‌টা হবে, সেগুলিকে কে পরিচালনা করবেন। কোথা থেকে কাঁচামাল, উৎপাদন-সম্বন্ধীয় শিক্ষা ও আর্থিক সাহায্য আসবে, কোথায় উৎপন্নদ্রব্য বিক্রি হবে। কাঁচা মালের বিক্রেতা ও উৎপন্ন জিনিসের ক্রেতা যদি একই অঞ্চলের অধিবাসী হয়, তা হলে সমস্যা নেই, কিন্তু সর্বত্র এটা সম্ভব নাও হতে পারে এবং সেজন্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা প্রয়োজন। ক্ষুদ্রশিল্পের উপরে নূতন করে আবার জোর দেওয়া হচ্ছে এটা খুবই আশার কথা। কিন্তু দেশ-বিস্তৃত ছোটো ছোটো উৎপাদন-সংস্থা সফল করতে হলে যে ব্যাপক পরিকল্পনা প্রয়োজন তার উপলব্ধি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

দরিদ্র জনসাধারণের কাছে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ আনবার ব্যবস্থা নানা ভাবে করা যায়। প্রথমত, অনেকটা ভোগ্যবস্তু লোকেরা নিজেই তৈরি করে নিতে পারে, বা বাজারের জন্য তৈরি করলেও অনেকটা নিজেদের জন্য রেখে দিতে পারে। খাদ্যশস্যের বেলা এটা অনেকাংশে ঠিক—আমাদের উৎপাদন যা হয় তার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি বাজারে আসে না, এক-তৃতীয়াংশ চাষীর নিজের ব্যবহারে লাগে। এই নিজস্ব ব্যবহারের পরিমাণ যদি বাড়ে, তা হলে বাজারে সরবরাহ হয়তো কিছু কম হবে, কিন্তু এটা মনে রাখা উচিত যে এতে যারা আগে নিজেরা খাদ্য উৎপাদন করেও খেতে পেত না, তারা খেতে পারছে। উৎপাদন ও বাজারের সরবরাহের মধ্যে তফাৎটা যদি হয় ফাটকাবাজির জন্য তা হলেই আপত্তির কারণ ওঠে— গ্রামের চাষী যদি তার নিজের উৎপাদন পরিবারের জন্য বেশি করে ব্যবহার করে

তা হলে সেটাকে কাম্য বলে মেনে নিয়ে চেষ্টা করা উচিত যাতে মোট উৎপাদনটাই বাড়ে।

এর পরে আসে স্থানীয় উৎপাদনের স্থানীয় ব্যবহার অর্থাৎ একটি সীমিত অঞ্চলের মধ্যে সেখানকার উৎপাদনের পারস্পরিক বিনিময়। গ্রামের তাঁতি তার নিজের ব্যবহারের কাপড় তৈরি করার পরে যেটা উৎপাদন করবে, গ্রামের মধ্যে বা কাছাকাছি গ্রামে যদি তার বাজার থাকে তা হলে তার কাজ অনেক সহজ হয়। এক-একটি গ্রাম-সমষ্টিতে যদি বিভিন্ন জিনিসের উৎপাদকেরা তাদের উৎপন্ন পরস্পরের কাছে বিক্রি করতে পারে তা হলে প্রত্যেক অঞ্চলে একটা অনেকখানি-স্বয়ং-সম্পূর্ণ আর্থিক সংগঠন তৈরি হয়ে যায়, যানবাহনের খরচ কমে, বিপণনের সমস্যা সহজ হয়। মহাত্মা গান্ধী এই সমাধানই চেয়েছিলেন। এটা পুরোপুরি সমাধান নয়, কিন্তু এই পথে যতটা যাওয়া যায় আমাদের কাজ ততটাই সহজ হবে।

গ্রামের উৎপন্ন সব জিনিসই গ্রামে বিক্রি হবে না। কোনো কোনো জিনিসের বেলা উদ্‌বৃত্ত এত বেশি হবে যে বাইরে দূরাঞ্চলে সেটা পাঠানো দরকার হবে, এবং বাইরের চাহিদা মেটানোও একটা সামাজিক প্রয়োজন। আঞ্চলিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা পুরোপুরিভাবে আনবার চেষ্টা করলে প্রধান সমস্যা হবে শহরের লোককে খাদ্য জোটানো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎপন্ন জিনিসটাই এমন যে গ্রামের মধ্যে তার ব্যবহার অতি সামান্য— যেমন, পাট। তা ছাড়া গ্রামের লোকেরাও দূরাঞ্চলের জিনিস চাইবে, যেমন কয়লা কেরোসিন, ওষুধ, বই, বা চাষের যন্ত্রপাতি। আমরা বহুদিন ধরে গ্রামের জিনিসকে শহরে আনা এবং শহরের জিনিসকে গ্রামে আনার ভার ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। এতে জিনিসপত্রের চলাচল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রাথমিক বিক্রেতা ও শেষ পর্যায়ের ক্রেতা— এরা দুই পক্ষই ঠকেছে— লাভবান হয়েছে দালাল ও ব্যবসায়ীরা। পাটচাষী যে দামে তার ক্ষেত থেকে পাট বিক্রি করে তার চতুর্গুণ দামে পাটের কলের কাছে সেটা বিক্রি হয়। চাষী যে দামে তার উৎপন্ন তৈলবীজ বিক্রি করে (উৎপাদন-স্বল্পতার বছরেও) তার চেয়ে অনেক বেশি দাম শেষ পর্যন্ত দিতে হয় তেলের ক্রেতাদের। গ্রামের তাঁতি যে শাড়িটি দশ টাকায় বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়, কলকাতার বাজারে তার দাম হয় পঁচাত্তর টাকা।

ব্যবসায়ীদের কাজ-কারবার তুলে দেবার কথা বলা হচ্ছে না। প্রয়োজন হল এমন একটা সরকারী পরিচালন ও পরিদর্শন ব্যবস্থা যাতে চাষীরা ও কুটিরশিল্পের উৎপাদকেরা তাদের উৎপন্ন জিনিসের সংগত দাম পায়, যাতে তাদের উদ্‌বৃত্ত উৎপন্ন তারা সহজে বিক্রি করতে পারে এবং যাতে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস তারা সহজে কিনতে পারে। সুপরিকল্পিত সমবায় ব্যবস্থায় এ সবই সম্ভব হয়, কিন্তু প্রয়োজন হলে সরকারী সংস্থাকে ক্রয়-বিক্রয়ে নামতে হবে। শহরের লোকের জন্য যদি সরকার চাল, গম, চিনি, ডিম, দুধ কিনতে এবং বিক্রি করতে পারেন, তা হলে এই ব্যবস্থা ব্যাপকতর না করার কোনো সংগত কারণ নেই। এটাও মনে রাখা উচিত যে একটা সরকারী সংস্থা যদি জিনিসের দাম কমে গেলে সেটা কিনে নিতে প্রস্তুত থাকে এবং দাম বেড়ে গেলে বিক্রি করতে এগিয়ে আসে তা হলে দামের খুব বেশি হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে না। এ-সব করতে গেলে বিরাট প্রশাসনিক সমস্যা উঠবে, কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রশাসন ব্যবস্থা না নিয়ে যদি আমরা আমাদের আগেকার অতিক্রান্ত পথ ধরেই আরো এগিয়ে যাবার চেষ্টা করি, তা হলে দারিদ্র্য-অবলুপ্তির সম্ভাবনা দূর-পরাহত হয়ে থাকবে।

সবশেষে বলা প্রয়োজন যে সাধারণ লোকের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় তার যতটা বিনামূল্যে সবাইকে

দেওয়া যায়, ততটাই দারিদ্র্যের বোঝা কমে। যদি দেশশুদ্ধ সবাই বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পায় বা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করতে পারে, তা হলে আমরা সাম্যের দিকে অনেকটা অগ্রসর হই। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, পার্ক ও শিশু-উদ্যান, স্কুল, স্কুলের বই-খাতা, খেলার মাঠ, হাসপাতাল— এগুলির সংখ্যা বা পরিমাণ যত বাড়ে ততটাই আমাদের সর্বাঙ্গীণ আর্থিক উন্নতি। এখানেও প্রশাসনিক সমস্যা আছে, এবং তদুপরি আছে এমন একটা রাজস্বনীতির সমস্যা যাতে সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা যায়। কিন্তু এর কোনোটাই দুঃসাধ্য নয় এবং এটা যদি একবার মেনে নেওয়া যায় যে স্বাচ্ছন্দ্যের কতগুলি মূল উপাদান সকলের কাছে সহজে এবং সমান ভাবে প্রাপ্তব্য না করলে আর্থিক উন্নতি কথাটারই কোনো অর্থ থাকে না, তা হলে কার্যক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি ওঠে সেদিকে উপযুক্ত ভাবে মনোযোগ দেওয়া যায়।

পরিকল্পনার প্রথম দিকে আমরা বড়ো আকারের শিল্পায়নের দিকে বেশি নজর দিয়েছিলাম। এখন দেখতে পাই যে মহাত্মা গান্ধীর নাম অর্থনীতির ক্ষেত্রে আবার উচ্চারিত হচ্ছে। কেউ কেউ চীন দেশের আর্থিক উন্নতির পন্থার মধ্যে গান্ধীবাদের লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন। যে দেশ সম্বন্ধে আমাদের পুরোপুরি জানা নেই, সে দেশের কথায় না গিয়েও বলা যায় যে সুবিখ্যাত 'মহলানবিশ মডেল' আর গ্রামীণ কৃষি ও কুটিরশিল্প সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত পন্থার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। একটা বিরাট দেশে যথাসম্ভব দ্রুত শিল্পায়ন সফল ভাবে করতে পারলেও দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হবে না। সেজন্যই এমন ভাবে আর্থিক উন্নতির কর্মপন্থা স্থির করতে হবে যাতে আমরা প্রত্যেকের কাছে এই উন্নতি অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারি। এটাকে গান্ধী-পন্থা বললে ভুল হবে না। এই পন্থা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দ্রুত আধুনিক ধরনের শিল্পায়নের বিকল্প নয়, এরা পরস্পরের পরিপূরক — একটির অসম্পূর্ণতা থেকে আর-একটির সংগত কারণ পরিস্ফুট হয়। মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'ট্রাস্টি'-দের উপরে যে ভরসা করেছিলেন, বর্তমান জগতে তার কোনো স্থান নেই। মহাত্মা গান্ধী সরকারী উৎপাদন, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ যতটা কম রাখবার চেষ্টা করেছিলেন, ততটা করলে আমাদের উন্নতি বিলম্বিত হবে। যেটা আমাদের প্রয়োজন সেটা হল শিল্পায়নের সঙ্গে গ্রামীণ উন্নতির সংযোগ এবং তার সুফল অনতিবিলম্বে লাভ করা। এবং এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন, আমরা আর্থিক উন্নতি বলতে কী বুঝি সেটাকে স্থির করে নিয়ে দৃঢ় সংকল্প করা যে কাম্য উন্নতি আনবার জন্য যে দিকে যে চেষ্টা প্রয়োজন তার কোনোটাতেই অবহেলা হবে না। পরিব্যাপ্ত কৃষির ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সরকারী পরিচালনা, নির্দেশ, সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণের যে সহযোগ আমাদের কাম্য তার রূপরেখা তৈরি করাই এখন পরিকল্পনাকারীদের প্রধান কাজ।

বাংলার একটি উপভাষা ও লোকসংগীত : কয়েকটি আঞ্চলিক গান

নীহারবালা বড়ুয়া

অবতরণিকা

উত্তরবাংলার কোচরাজবংশী ভাষা স্থানীয় বিভিন্ন জনজাতি (Tribe) বোড়ো, রাভা ইত্যাদি ছাড়া এককালে জাতিধর্মনির্বিশেষে ঐ অঞ্চলের সমগ্র আদি অধিবাসীদেরই কথিত ভাষা ছিল। এই ভাষা বাংলার অন্যান্য উপভাষার অন্যতম একটি উপভাষা বলে স্বীকৃত।

সেই কোচরাজবংশী ভাষীদের লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতির একটি আঞ্চলিক রূপকে নিয়ে এই প্রবন্ধের অবতারণা। এই উপভাষাটি বাংলার অন্যান্য জেলাবাসী স্বল্পসংখ্যক গবেষক এবং উৎসাহী কিছু সংগ্রাহক ছাড়া প্রকৃতই বাংলার অন্য অঞ্চলের অশ্রুত ভাষা। এমন-কি, উত্তরবঙ্গেও শিক্ষার আলোকবিহীন গ্রামবাসী ছাড়া শহরের স্থানীয় আদি অধিবাসীদের মধ্যেও তা অপ্রচলিত ও পরিত্যক্ত।

পূর্ববাংলার উপভাষীদের যেমন বাঙাল বলে উল্লেখ করা হয়, তেমনি পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গে আগত ও বসবাসকারী ভদ্রশ্রেণী এই কোচরাজবংশী ভাষী সম্প্রদায়কে 'বাহে' বলে উল্লেখ করে থাকেন এবং কোচরাজবংশী ভাষাকেও 'বাহে ভাষা' বলেন। কিন্তু এই কথাটির অর্থ সম্বন্ধে সকলে অবহিত নন, তাই এই কথাটি বর্তমানেও নানারূপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে চলেছে। অন্যান্য অঞ্চলে অপরিচিত জনকে সম্বোধনকালে যেমন 'ওহে' 'ওগো' ইত্যাদি বলা হয়, তেমনি কোচরাজবংশী ভাষায় পুরুষদের 'বাবাহে' এবং মেয়েদের 'মাওহে' বলে সম্বোধন করাই রীতি ও ভদ্রতাসূচক। তারই প্রচলিত সংক্ষিপ্ত রূপ 'বাহে' ও 'মাহে'। মনে হয়, এই 'বাহে' কথাটির মধ্যে কিছু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গোক্তি ও অবজ্ঞার আভাস থাকায় হয়তো উত্তরবাংলার শিক্ষিত আদি অধিবাসী সমাজও পশ্চিমবঙ্গে আগত পূর্ববাংলার ভদ্রসমাজের মতোই কালক্রমে এই কথ্যভাষা পরিত্যাগ করেছে।

বর্তমানে দেখা যায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী বাঙালীদের কথিত মিশ্রবাংলাকেই তাঁরা কথ্যভাষারূপে গ্রহণ করেছেন। উত্তরবাংলার একমাত্র কোচবিহার অঞ্চলেই দেখা যায় গ্রাম বা শহরবাসী সর্বস্তরের সর্বসম্প্রদায়ের আদি অধিবাসীবৃন্দ এখনো এই কোচরাজবংশী ভাষাকেই কথ্যভাষারূপে ব্যবহার করে থাকেন। তারও কারণস্বরূপ বলা যায়, কোচরাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং রাজবংশের হিন্দুধর্ম গ্রহণের পর যে সময়কে তার স্বর্ণযুগ বলা হয় সে সময়ে তাঁদের রাজধানীকে কেন্দ্র করে কোচপ্রধান সমগ্র উত্তরবঙ্গেই তার আঞ্চলিকতা নিয়ে এই উপভাষা বিস্তার লাভ করেছিল। সেই ভাষা পরবর্তীকালেও কোচবিহারের রাজপরিবার শেষ পর্যন্তই ব্যবহার করে গিয়েছেন। এই রাজপরিবার পাশ্চাত্যশিক্ষা ও বৈদেশিক আচার ব্যবহারেই অভ্যস্ত ছিলেন, এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁরা এবং তাঁদের বিভিন্ন প্রদেশাগত সহধর্মিনীরাও কথ্য ভাষারূপে এই 'বাহে' ভাষাকে মর্যাদা দিয়ে গিয়েছেন। সেইজন্যই হয়তো স্থানীয় ভদ্রসমাজ ও তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলগুলি বাংলার অন্যান্য উপভাষা ও প্রভাব সত্ত্বেও রাজভাষাকে অবহেলা করার প্রয়োজন বোধ করে নি।

সেই 'কোচরাজবংশী' বা 'বাহেভাষী'দের বিশেষ একটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির রূপ নিয়ে এই প্রবন্ধ। এই অঞ্চলটির একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিচয় আছে। সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে উত্তরবঙ্গের 'রংপুর জেলা'র ব্রহ্মপুত্রের উভয় তীরবর্তী পূর্ব ও উত্তরখণ্ডটিকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং সেই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলটিকে গারোপাহাড়, ভুটান, পূর্বদুয়ার ইত্যাদি সহ কোচবিহারের সঙ্গে কিছুকাল যুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে ঐ বিচ্ছিন্ন অংশটি গোয়ালপাড়া নামে একটি নূতন জেলারূপে প্রথম আসাম প্রদেশে সংযোজিত হয়।

এই শতবর্ষকাল আসামের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও গোয়ালপাড়ার দক্ষিণ ও পশ্চিমের এই উপেক্ষিত খণ্ডটি অতীতের কোচরাজবংশী ভাষা ও তার লোকাচার, লোকসংস্কৃতি থেকে এখন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয় নি। তবে রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার নানা চাপে তার মধ্যে আলোড়নের সূত্রপাত যে হয় নি এ কথাও বলা যায় না। এই অঞ্চলে পুরুষানুক্রমে বসবাসকারী শিক্ষিত অশিক্ষিত, সর্ববর্ণের হিন্দু-মুসলমান সর্বসাধারণেরই কথ্যভাষা এখনো এই কোচরাজবংশী ভাষা।

এই ভাষার মাধ্যমেই এককালে সমগ্র উত্তরবাংলার হিন্দুমুসলমান সর্বসম্প্রদায়ের লোকশিল্পীবৃন্দ বিভিন্ন আখ্যানে উপাখ্যানে প্রবাদে ছড়ায়, বিবিধ লৌকিক পূজাপার্বণে, আর অজস্র গানের মধ্যে তাঁদের জীবন, তাঁদের সমাজ এবং তাঁদের অনুভূতিগুলিকেও তুলে ধরে এই সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করে তুলেছিলেন। এই সংগীত-শিল্পীগোষ্ঠী কেবল অজস্র সংগীত রচনা করেই বিরত থাকেন নি, তার সুর তাল সংযোজনাতেও তাঁরা পশ্চাৎপদ ছিলেন না।

দেখা যায় এই উপভাষায় রচিত সংগীত বিবিধ কারণেই বাংলার লোকসংগীতের আসরে যথোপযুক্ত স্থান করে নিতে সক্ষম হয় নি। তার প্রধান কারণস্বরূপ বলা যায়, উত্তরবাংলার স্বল্পে-সন্তুষ্ট লোক জীবিকার অন্বেষণে তাঁদের অঞ্চল ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাই এই উপভাষা অন্যান্য অঞ্চলে যেমন অপরিচিত ছিল, তেমনি তার সংগীতও ছিল অশ্রুত। কিন্তু পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা বহুকাল থেকেই সারা বাংলায় ছড়িয়ে থাকায় তাঁদের উপভাষা অপরিচিত বা অবোধ্য ছিল না। তাই পরবর্তী-কালে লোকসংগীত যখন অপাঙ্‌ক্তেয় পদ থেকে সমাদৃত হল তখন পূর্ববাংলার লোকসংগীতকে সারা বাংলার হৃদয় জয় করতে কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয় নি। কিন্তু উত্তরবাংলার লোকসংগীতের বিচিত্র ও বিভিন্ন ধারাগুলি এবং তার সুরবৈচিত্র্য আজও অন্যবাংলার লোকসংগীতজ্ঞদের সভায় অজানিতই রয়ে গেল। কারণ এই অশ্রুত ও অবোধ্য ভাষাই অন্তরায়রূপে এখনো তাকে দুর্ভেদ্য করে রেখেছে। কালপ্রবাহে সেই সংস্কৃতি যে আজ অবলুপ্তির সন্ধিক্ষণে এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। আর তা কেবল বাংলার এই বিচ্ছিন্ন অংশেই নয়, সমগ্র উত্তরবাংলা সম্পর্কেই এ কথা এখন বলা যেতে পারে।

সেই কোচরাজবংশী ভাষীদের কিছু লোকসংগীত উৎসাহী সুধীসমাজের দৃষ্টিপথে আনার জন্য এই প্রয়াস। এই-সব গান তার সীমান্তবর্তী কোচবিহার ও বাংলাদেশের রংপুর জেলার গানের সমগোত্র।

উত্তরবাংলার লোকসংগীতের মধ্যে তার ভাষা ছাড়াও— রচনা এবং প্রকাশভঙ্গিতেও তার নিজস্ব একটি বিশিষ্ট ধারার সাক্ষাৎ মেলে, তবে তার সম্যক্ পরিচয় বিস্তৃত আলোচনা ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে এই অঞ্চলের গানের রচনাভঙ্গি ও প্রয়োগবিধির পার্থক্যগুলি— যা সহজেই চোখে পড়ে — দৃষ্টান্তরূপে তারই কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

যেমন পূর্ববাংলার লোকসংগীতে প্রণয়লীলার ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের অগ্রাধিকার, কিন্তু উত্তরবাংলায় রাধাকৃষ্ণ নেই বলাই চলে। কিছু সংখ্যক গানে যেখানে রাধাকৃষ্ণের উপস্থিতি দেখা যায়, তার ভাব ও ভাষায় ভিন্ন অঞ্চলের বা ভিন্নশ্রেণীর প্রভাব সহজেই পরিলক্ষিত হয়। তার পরিবর্তে যে 'কালা'র প্রেমপাত্ররূপে বহুক্ষেত্রে দর্শন মেলে, সে 'কালা'ও বাঁশী বাজায়, গোরু চরায়— কিন্তু আবার তাকে হাল বাইতে মাছ ধরতে মোষ চরাতেও দেখা যায়। তবে তার সঙ্গিনীরূপে রাধার দর্শন মেলে না। রাধা নামে অভিহিতাকে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা যায় না। অধিক ক্ষেত্রে যদিও প্রেমপাত্রকে 'কালা' বা 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করা হয়— কিন্তু তার বিশেষত্ব হল নায়কের বিকল্প রূপে স্থানীয় বিবিধ প্রাণীদের নামের প্রয়োগে। তার মধ্যে যদিও পশু-পতঙ্গরাও বাদ পড়ে নি কিন্তু পক্ষীকুলই তার রূপ ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। যেমন পতঙ্গের মধ্যে কাব্যজগতে দেখা যায় তার চরিত্রগুণে ভ্রমরের স্থান সেইরকম সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে রাজহংসা (রাজহংস), প্রেমিক-প্রবর কইতর (কবুতর) বা শুয়া (শুক), আবার শক্তিমানরূপে চিলা (চিল) বা কুড়ুয়া (কোড়ল— fishing eagle) স্থানলাভ করে।

এর আর-এক বৈশিষ্ট্য এই যে কোনো গানে ভনিতার সাক্ষাৎ মেলে না। পুঁথিপত্রের সংস্পর্শবিহীন এই নামগোত্রহীন গ্রাম্য কবিগণ যাঁরা মানবমনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে নিপুণ শিল্পীর মতোই ধরে রেখে গিয়েছেন, তা তাঁদের নিজেদের পরিচয়ের প্রয়োজনে হয়তো নয়; হয়তো তাদের অন্তরের উচ্ছ্বাসকে রূপায়িত করার অদম্য প্রেরণায়, তাঁদেরই দৈনন্দিন কথিত ভাষায়।

এই গানগুলির ভাবপ্রকাশের রীতিতে সাধারণত দেখা যায় সেগুলি তিনটিরূপে বিভক্ত। প্রথম রূপটির ভাবের প্রকাশ সরল ও সহজ কথায়; সেগুলি বোঝার জন্যে কেবলমাত্র ভাষাজ্ঞানই যথেষ্ট। অধিকাংশ গান এই পর্যায়েই পড়ে। দ্বিতীয় ধরনটি দ্ব্যর্থবোধক। অন্তর্নিহিত অর্থেই তার যথার্থ ভাবমূর্তির প্রকাশ। আর তৃতীয় ধরনটিকে বুঝতে হলে ঐ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির এবং তার ভাবধারা প্রকাশের পদ্ধতি সম্বন্ধেও সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন; তা না হলে অনেকক্ষেত্রে তার অর্থ উদ্ধার করা কেবল দুরূহই নয়, অসাধ্যই বলা চলে। এই ধরনটি উদাহরণ এবং তার ব্যাখ্যা ছাড়া বোঝানো যায় না।

এই অঞ্চলের গানের বিভিন্ন শাখার অন্যতম প্রধান শাখাকে 'ভাওয়াইয়া গান' বলা হয়। এগুলি স্থানীয় সুরবৈশিষ্ট্য নিয়ে 'দোতোরা' বা 'দোত্‌রা' নামক মুগারেশমের চারটি তাঁতের 'লোকযন্ত্র' সহযোগে দীর্ঘলয়ে গাওয়া হয়ে থাকে। এই ভাওয়াইয়া গানগুলির নব্বইভাগই প্রণয়মূলক এবং তার বহুলাংশই সমাজ-ব্যবস্থার বিধিনিষেধ লঙ্ঘিত পরকীয়া প্রেমেরই চিত্র। গানের অধিকাংশই মেয়েদের জবানিতে তাদেরই ব্যথা-বেদনা বিরহ-মিলনকে ঘিরেই রচিত। তবে সেগুলি যে মেয়েদেরই রচনা সে কথা মনে করার কোনো কারণ মেলে না। কিছু ভিন্ন ধরনের ভাওয়াইয়া যাকে 'মেয়েলি ভাওয়াইয়া' বলা হয় এবং যেগুলি কেবলমাত্র মেয়েরাই গান করে থাকেন, সেগুলি ছাড়া ভাওয়াইয়া গায়কগণ সকলেই পুরুষ পক্ষ।

এই ভাওয়াইয়া গানেরও প্রকাশভঙ্গি পূর্বোক্ত ঐ তিনটি রূপেই। এখানে প্রথমেই তার তৃতীয় ধরনটির একটি গান, তার প্রকাশভঙ্গি ও ব্যাখ্যা সহযোগে উপস্থিত করা হচ্ছে। এই গানটি যদিও অতি প্রাচীন, তবুও তার সুরমাধুর্যের জন্তই হয়তো এখনো এটিকে এতদঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত দেখা যায়।

২

চারটি গান

প্রথম গান

এই গানটিকে 'বৈদোরের গান' বলা হয়। 'বৈদোর' অর্থাৎ বৈদ্য, চিকিৎসক। 'বৈদোর' বৈদ্যের কাব্যরূপ। এই 'বৈদোর' কথাটি বাংলার অন্যান্য অঞ্চল বা অন্য কোথাও ব্যবহৃত হয় বলে মনে হয় না।

এখানে 'বৈদোর' নায়িকার স্বামী। স্বামীর নাম করা সমাজে নিষিদ্ধ বলে— স্বামীর উপজীবিকা বা পদ অনুযায়ী স্ত্রীদের উল্লেখ করাই রীতি। যেমন— হালের কাজের কৃষককে 'হালুয়া', স্কুলের শিক্ষককে 'পণ্ডিত' ইত্যাদি বলে স্ত্রীরা উল্লেখ করে থাকে।

নদী না যাইও রে বৈদোর— নদী না যাইও রে—
নদীরে ঘোলা রে ঘোলা পানি।
নদীরে বদলি রে বৈদোর— কুয়ার মদ্যে[১] আছে পানি রে—
বৈদোর মুক্রি[২] সুন্দরী তুলিয়া রে দিম্ তোক্ পানি॥

এক নোটা[৩] তুলিয়া রে বৈদোর— আর নোটা তুলিতে রে—
খসিয়া পইল্ মোর গালারে[৪] চন্দ্রহার।
বাপ নাই মোর ভাবিবেরে[৫] বৈদোর— মাও নাই মোর গুণিবে[৫] রে—
বৈদোর— ভাই নাই মোর পরেয়া রে দিবে মালা॥

বাইর্ গাঙের[৬] ধু ধু বালা[৭] বৈদোর— রাজহংসা পঙ্খী কান্দে[৮] রে—
গালায় তার গজ- রে- মতির মালা[৯]।
রাজহংসার কান্দনে[১০] রে বৈদোর— বাড়ি ঘর মোর না খায় মনে[১১] রে—
বৈদোর— মনটা মোর উরাওং-রে-বাইরাওং[১২] করে[১৩]॥

এই গানটির অর্থ বা তার ব্যাখ্যা সরলভাবে যখন করা যায়, তখন প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক দুটির সঙ্গে শেষের স্তবকটির সঙ্গতি কোথায় তা খুঁজে পাওয়া যায় না। আসলে শেষের স্তবকটির পটভূমিকার উপরেই প্রথমোক্ত স্তবক দুটির উদ্ভব।

---

১ মদ্যে— মধ্যে। ২ মুক্রি— আমি। ৩ নোটা— লোটা, ঘটি। ৪ গালারে— গলার। ৫ ভাবিবে গুণিবে— ভাবনা-চিন্তা করবে। একটি বাক্য— ভাবা-গুণা করবে। ৬ বাইর্ গাঙ্— বড়ো নদী। ৭ বালা— বালি, বালু। ৮ কান্দে— ডাকে, ডাকছে; কান্দে কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (ক) 'কান্দা'— মানুষের ক্ষেত্রে 'ক্রন্দন'। (খ) 'কান্দা'— জীবজগতের ক্ষেত্রে তাদের 'ডাক'। ৯ 'গজ- রে- মতির মালা'— গজমোতির মালা। ১০ কান্দনে— ডাকেতে। ১১ না খায় মনে— মনে ধরে না। ১২ উরাওং- রে- বাইরাওং— উড়ে যেতে বেরিয়ে যেতে। ১৩ করে— ইচ্ছে করে।

গানের আরম্ভকালে দেখা যায়, একটি মেয়ে তার বৈদ্যস্বামীকে নদীতে স্নান করতে যেতে নিষেধ করে বলছে— 'নদীতে যেও না বৈদোর, নদীতে যেও না, নদীর জল ঘোলা ঘোলা। নদীর বদলে, বৈদোর, কুয়াতেই পানি আছে— আমি সুন্দরী তোমাকে পানি তুলে দেবো।'

দ্বিতীয় স্তবকে বেদনাকাতর অন্তরে জানাচ্ছে— 'একঘটি জল তুলে, পরের ঘটি তুলতে গিয়ে বৈদোর, আমার গলার চন্দ্রহারটি ছিঁড়ে পড়ে গেল। আমার তো বাবা নেই যে তার জন্য ভাববে, মাও নেই যে চিন্তা করবে, ভাইও নেই যে আমাকে মালা গড়ে দেবে।'

তার পর তৃতীয় স্তবকের শেষে বলছে— 'বাইরের গাঙের ধারে ধূ ধূ বালু, তাতে রাজহংসা পক্ষীর কলস্বর শোনা যাচ্ছে— গলায় তার গজমোতির মালা। সেই রাজহংসার কলকাকলিতে বৈদোর, বাড়ি ঘর আমার আর মনে ধরছে না, মনটা আমার উড়ে যেতে চাইছে, বেরিয়ে যেতে চাইছে।'

গানের এই শেষ স্তবকে যে রাজহংসার গাঙের ধারের ধূ ধূ বালুতে আবির্ভাব ঘটেছে— যার গলায় গজমোতির মালা, যার কলকাকলিতে বাড়ি ঘরে মন বসছে না— মনটা উড়ে যেতে চায়, বেরিয়ে যেতে চায়— তারই অমঙ্গল আশঙ্কায়, প্রথমেই এই নদীর ঘোলা জলের কাহিনীর অবতারণা। কারণ নদীতে স্নান করতে গিয়ে যদি রাজহংসার সঙ্গে বৈদোরের সাক্ষাৎ ঘটে, তার ফলে কোনো অনর্থের সৃষ্টি হয়— তাই এই নিষেধবাণী।

তার পরের স্তবকে জল তুলতে গিয়ে গলার হার খুলে পড়ে যাওয়ার কাহিনীটিও উদ্দেশ্যমূলক। কারণ তখন যে উদ্বেগের চিহ্নটি তার মুখে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, যাকে আর কোনোমতেই ঢেকে রাখা সম্ভব হচ্ছে না— তখন সেই আশঙ্কায় এই দুঃখের কাল্পনিক কাহিনীটির অবতারণা করে তার ব্যথার বহিঃপ্রকাশের রূপদানের জন্যই এই প্রচেষ্টা, এই ছলনার আশ্রয় গ্রহণ।

এই যে ছলনাটুকুর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে— এইখানেই গানটির মাধুর্য ও সার্থকতা মনে করা হয়।

এই গানটি তার ভাব ও সুরের অপরিবর্তিত রূপ নিয়ে উত্তরবাংলার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এখনো প্রতিষ্ঠিত। তবে এই অলিখিত গানগুলির কথায় ভিন্ন ভিন্ন গায়কের মুখে অল্পবিস্তর পাঠান্তরও পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে দেখা যায় নদীর নামটিকে গায়কগণ তাঁদের নিজের অঞ্চলের নদীর নামে রূপান্তরিত করে নেওয়ার ক্ষেত্রে। কোচবিহারের 'তোর্‌সা' বা 'ধর্‌লা'র ধূ ধূ বালা, গোয়ালপাড়ায় এসে 'গঙ্গাধর' বা 'বাইর্‌গাঙে'র অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের ধূ ধূ বালা বলে উল্লিখিত হয়। তাই এই গানটি কোন্ অঞ্চলের তারও অনুমান করা যায় না।

এখানে আরো উল্লেখযোগ্য— এই অঞ্চলে বিশেষ ধরনের যে পদ্ধতিগুলি গান রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়— তার দুটি ভিন্ন পদ্ধতি এই গানটিতে স্থান পেয়েছে। যেমন— দ্বিতীয় স্তবকে তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'ভাবিবে-গুণিবে' বলে একটি কথাকেই দুটি ভাগ করে— প্রথমে 'বাপ'-এর ক্ষেত্রে 'ভাবিবে' এবং শেষে 'মায়ে'র ক্ষেত্রে 'গুণিবে' হয়েছে। তাতে দুজনের ক্ষেত্রেই একই অর্থ প্রকাশ হয়েছে। আর-একটি হচ্ছে— কোনো একটি বাক্যের মধ্যস্থলে 'রে' প্রয়োগ করার পদ্ধতি। যেমন তৃতীয় স্তবকে 'গজমোতির মালা' না বলে 'গজ-'রে'-মোতির মালা' এবং 'উরাওং বাইরাওং' না বলে উরাওং-'রে'-বাইরাওং বলা হয়েছে। এই 'রে' কেবল গানের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়।

দ্বিতীয় গান

পরবর্তী এই গানের তৃতীয় স্তবকের প্রথম পঙ্‌ক্তিটি দ্ব্যর্থবোধক রূপে রচিত।

কন্যা। ঐ গদাধরের[১] পারে পারে রে, ও মোর মাউতে[২] চরায় হাতি,
কি মায়া নাগাইলেন[৩] মাহুত রে, ও তোর গালায় রসের কাটি[৪]।
কি মায়া নাগাইলেন মাহুত রে ॥

ওরে উচা[৫] করি বান্দেন ছাপোর[৬] রে, ও মুঞি আইস্‌তে যাইতে দেখিম্‌
ওরে উচাকরি বান্দেন মাচা[৭] রে, মুঞি জল ভরিতে দেখিম্‌।
কি মায়া নাগাইলেন মাহুত রে ॥

ঐ দুধ খোয়াইলেন[৮] দই খোয়াইলেন রে, মাহুত না খোয়াইলেন মাটা[৯]
এবার হাতে টুটিয়া গেইলো কি, ঐ তোর আসা যাওয়ার ঘাটা[১০]।
কি মায়া নাগাইলেন মাহুত রে ॥

মাহুত। না-কান্দেন্‌ না-ভাবেন্‌ কন্যা হে, না ভাঙেন্‌ রসের গালা,
এবার যদি ঘুরিয়া আইসোং[১১] রে, ও তোর সোনায় বান্দিম[১২] গালা[১৩]।
এবার যদি বাউরি[১৪] আইসোং রে ॥

কন্যা। 'গদাধর নদীর ধারে ধারে আমার মাহুত হাতি চরায়। মাহুত রে, কি মায়া তুমি লাগালে। তোমার গলায় 'রসের কাটি' (এ কথাটিও অর্থবাহী অর্থাৎ 'রস'-এর পুঁতি)। কি মায়া লাগালে মাহুত রে।' (দ্বিতীয় স্তবক) উঁচু করে তোমার 'ছাপোর' অর্থাৎ ঘরটিকে তুলো— আমি আসতে যেতে তোমার দেখা পাব। উঁচু করে তোমার বসার মাচাটি বেঁধো, জল ভরতে যেতে তোমায় দেখব। মাহুত রে কি মায়া তুমি লাগালে।' তার পর তার এই তৃতীয় স্তবকে দ্বৈত অর্থে বলা হচ্ছে -- 'মাহুত রে, তুমি দুধ খাওয়ালে, দই খাওয়ালে কিন্তু 'মাটা' তো আমাকে খাওয়ালে না।' যার ভাবার্থ— তুমি অনেক দৃশ্যমান সুন্দর সুখদায়ক বস্তু তো দিলে কিন্তু নিভৃতে থিতিয়ে থাকা 'মাটা' অর্থাৎ সারবস্তুটি আমাকে দাও নি। তাই প্রশ্ন— 'তা হলে এবার থেকে তোমার আসা যাওয়ার এই পথটি কি 'টুটিয়া' গেল? কি মায়া লাগালে মাহুতরে।'

---

১ গদাধর— স্থানীয় নদী। ২ মাউতে— 'মাহুতে'র প্রচলিত বাক্য। ৩ নাগাইলেন— লাগালেন। ৪ কাটি— পুঁতি। ৫ উচাকরি— উঁচু করে। ৬ ছাপোর— একচালা ঘর। ৭ মাচা— বাঁশের তৈরি বসার স্থান। ৮ খোয়াইলেন— খাওয়ালে। ৯ মাটা— ঘোলের জলের অংশের নীচে থিতিয়ে থাকা অংশ। ১০ ঘাটা— পথ, রাস্তা। ১১ আইসোং— আসি। ১২ বান্দিম— বাঁধিয়ে দেব। ১৩ গালা— গলা। ১৪ বাউরি— বাহুড়িয়া।

মাহুত। কন্যা হে— তুমি কেন্দো না, তুমি ভেবো না, তোমার এই রসের গলাটি কেন্দে ভেঙো না। আমি যদি এবারে ঘুরে আসি, তোমার এই গলাটিকে সোনায় বান্ধিয়ে রাখব— এবারে যদি 'বাউড়ি' বাহুড়িয়া আসি।

তৃতীয় গান

এই গানটির ভাবের প্রকাশ সহজ রূপে। এর মধ্যে বর্ষাকালে ঐ অঞ্চলের গ্রামের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং তার সঙ্গে তার বিভিন্ন জীবজগতের গতিবিধিও শিল্পীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তাদের কারো ক্লেশ কারো আনন্দের বিবরণও এখানে স্থান পেয়েছে। বর্ষায় নিচু জলাভূমিগুলি যখন বৃষ্টির জলে ও তার সঙ্গে জলজ 'দল' 'দামে' ভরে ওঠে— তখন জলচর পাখিরা এসে সেখানে খাদ্যের অন্বেষণে ও ঘর বাঁধার জন্য ভিড় করে। আর তাদের উত্তেজনা ও আনন্দ -মিশ্রিত কলধ্বনিতে ঐ অঞ্চল মুখর হয়ে ওঠে। আবার বর্ষার প্রকোপে সে সময় বনভূমির শান্তি বিঘ্নিত হয়। নিম্নবনভূমির বন্যপ্রাণীদের আশ্রয়স্থলের চেষ্টায় আহার নিদ্রা পরিত্যক্ত হয়। তৃণভোজীরা স্থান ছাড়ার কালে ডাকাডাকি শুরু করে। আবার গ্রামের আশেপাশের শূন্য মাঠগুলি তখন তৃণগুল্মে ঢাকা পড়ে যায়। তারই অন্তরালের সুযোগে খাদ্যের প্রয়োজনে বাঘেরা সহজলভ্য গোরু ছাগলের আশায় গ্রামের কাছাকাছি ঘোরাফেরা শুরু করে। সে সময় লোকজনও কতকগুলি অঞ্চলকে এড়িয়ে চলে— নিরাপদ মনে করে না। তাই নায়িকা তার প্রেমাস্পদের বিভিন্ন বিপদের সম্ভাবনায় শঙ্কিত। তার সাবধান বাণী নিয়ে এই গানটির শুরু।—

পরশী[১] আপোনার নোয়ায়[২] বান্ধব রে।
ঐ নলের[৩] আগুন তলে-রে-তলে খাগ্‌ড়ার[৪] আগুন জলে,
আর মোর আবাগীর[৫] মনের আগুন-জলে মনের তলে রে॥
ঐ তোমার বাড়ি আমার বাড়ি, মধ্যে ক্ষীরণ[৬] নদী,
ওরে আইস্‌তে যাইতে খুলুৎ-খালাৎ[৭] পাংখা নাই দ্যায় বিধিরে॥
কোড়া[৮] কান্দে, কুড়ী রে কান্দে— কান্দে বালিহাস,
আর বোনেরো হরণী[৯] কান্দে— ছাড়িয়া মুখের ঘাস রে॥
দল্‌বাড়ীখান্[১০] দলো-রে-দলো[১১], তাতে বাগের[১২] ভয়
ওরে তোমরা ক্যানে আইস্‌লেন্ বান্ধব, আমরায় গেইলোং হয় রে॥
ঝরি পড়ে ইমি-রে-ঝিমি[১৩], মলেয়ায় তোলায় বাও[১৪],
ঐনা ছাইন্‌চাৎ[১৫] দোয়্যা আসি রে বান্ধব, খোপায় মোছ পাও রে॥

১ পরশী— পড়শী, প্রতিবেশী। ২ নোয়ায়— নয়। ৩, ৪ নল, খাগ্‌ড়া বা শর গাছ। ৫ আবাগী— অভাগিনী। ৬ ক্ষীরণ— ক্ষীণকায়া। ৭ 'খুলুৎ-খালাৎ'— জলের শব্দ। ৮ কোড়া, কুড়ী ও বালিহাস— জলচর পাখিবিশেষ। ৯ বোনেরো হরণী— বনের হরিণী। ১০ দলবাড়ী— জলজ তৃণদ্বারা ঢাকা অঞ্চল। ১১ দলো-রে-দলো— তলতলে। ১২ বাগের— বাঘের। ১৩ ইমি-রে-ঝিমি— রিমিঝিমি। ১৪ মলেয়ায় তোলায় বাও— মৃদু মলয়বায়ু জোরে বইছে। ১৫ ছাইন্‌চা— ঘরের চালের ঢালু অংশের দ্বারা আবৃত স্থান; ছাঁইচ।

সূত্রপাতে প্রণয়পাত্রকে নায়িকা বলছে—

বান্ধব রে— পড়শীরা কেউ আপন জন নয়। এই সামাজিকনীতি-বিরুদ্ধ কার্যকলাপ তারা সহ্য করবে না।' তার পর প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে বলা হচ্ছে— 'নলের আগুন তার তলায় জ্বলে, খাগড়ার আগুন জ্বলে ওঠে, আর আমার মতো অভাগিনীর মনের আগুন মনের তলদেশেই জ্বলে। তোমার বাড়ি আর আমার বাড়ি— তার মাঝে এক ক্ষীণকায়া নদী। যেতে আসতে 'খুলুৎ-খালাৎ' শব্দ— বিধি ডানা দেয় নি (নিঃশব্দ গমনের জন্য)।' পরবর্তী স্তবক 'কোড়া-কুড়ী, বালিহাঁসরা কলরব করছে বর্ষার আনন্দে। আবার দুর্যোগের তাড়নায় বনের হরিণ ডাকাডাকি করছে মুখের ঘাস পরিত্যাগ করে। 'দলবাড়ী' তল্‌তল করছে (যার উপর দিয়ে চলা নিরাপদ নয়), তার উপর বাঘের ভয়। (এই এত দুর্যোগে) আপনি কেন আসলেন বান্ধব— আমিই তো যেতে পারতাম রে।' শেষের স্তবক— 'ঝরি' (বৃষ্টি) পড়ছে 'ইমিঝিমি' করে, মৃদু-হাওয়া জোরে বইতে শুরু করেছে। 'ছাঁইচ' এর ধার ঘেঁষে এসে— ও বান্ধব, আমার খোঁপায় তোমার পা মুছে নাও।'

চতুর্থ গান

পরবর্তী গানটিকে 'সাদুর গান' বলা হয়। সাদু অর্থে সাধু বা সওদাগর। 'সাদু'র বাণিজ্যে যাওয়ার কালে 'সাদু-পত্নী' বিভিন্ন বিপদের আশঙ্কায় 'সাদু'কে সে বিষয় অবহিত করার চিত্রটিই এই গানে স্থান লাভ করেছে।—

ও মোর সাদু রে— সাদু—
অল্প বয়সে সাদু বাণিজে যান, গহীন নদীর সাদু ভরা বান রে
সাদু— ছাওয়া দেখিয়া ছারেন উজান গাঁও রে।
পুবালো পইছালা বাও, ঘোপা[১] চায়্যা সাদু বান্দেন নাও রে
ডারি[২] মাঝি সাদু রাখেন সাবধানে রে॥

ও মোর সাদু রে— সাদু—
ডারি মাঝি পরার পুত্, খাইতে নিতে সাদু না ছান দুখ্ রে
সাদু— মাইরবে তোমাক্ সাদু বৈটার আগাল দিয়া রে।
মাইরবে সাদু তোমাক্ গুরাতে[৩] বান্দিয়া রে॥

ও মোর সাদু রে— সাদু—
যেই দিগে[৪] সাদু বালুচর, সেই দিগে সাদু বান্দেন ঘর রে
সাদু— আপন হাতে সাদু রান্দিয়া খান ভাত রে।

১ ঘোপা— ঘোঁজ, নদীর বাঁকা স্থান। ২ ডারি— দাঁড়ী। ৩ গুরা— গুড়া, নৌকার উপর পাতা তক্তা। ৪ দিগে— দিকে।

যেই দিগে সাহু সাউদের[১] মেলা, সেই দিগে সাহু বান্দেন ভেলা রে
নিজের হস্তে সাহু করেন ব্যাচা কিনা রে ॥

ও মোর সাহু রে— সাহু—
কোচের কড়ি সাহু না করেন ব্যয়, পরনারী সাহু আপন নয় রে
সাহু— পরনারী সাহু বধিবে পরাণ রে,
সাহু— পরনারী সাহু বধিবে জীবন রে ॥

এ অঞ্চলে এই 'সাহু' নিয়ে বেশ কিছু গানের দর্শন মেলে। এগুলির রচনাকাল সঠিক জানা না গেলেও— এ গানগুলিকে প্রাচীনের পর্যায়ে বোধ হয় ফেলা যেতে পারে। তার কারণ স্বরূপ বলা যায়— এই গানগুলি পূর্বকালের 'জলপথের বাণিজ্য' নিয়েই রচিত।— উপরোক্ত এ ইগানটি পঞ্চাশ বছরেরও পূর্বে শোনা এবং তখনো এই গানটিকে খুব পুরোনো গান বলা হত। এই গানটি সুরের জন্যও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। তারই ফলে বিভিন্ন গায়কের মুখে ঘোরায় গানটির বেশ কিছু ভিন্নপাঠ আছে। এমন-কি, 'মেয়েলী গানেও' এর ভিন্ন পাঠান্তর পাওয়া যায়।

১ সাউদের— সদাগরের।

ভারতের লোকায়ত শিল্প

বিমলকুমার দত্ত

শিল্পই সভ্যতা-বিবর্তন কাহিনীর শাশ্বত স্বাক্ষর। সভ্যতা-বিবর্তনের কাহিনী শিল্প-ইতিহাসের মাধ্যমে দেশে দেশে বিভিন্ন স্রোতোধারায় রূপায়িত। দরবারী ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলার ন্যায় সভ্যতা-বিবর্তনের ইতিহাসে লোকাশ্রিত শিল্পধারার স্থান ও দান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মৃৎশিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাস জনমানসের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি এবং সভ্যতার ইতিহাসে এক বিশেষ গৌরবপূর্ণ অধ্যায়।

প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে মানুষ মূলত প্রয়োজনের তাগিদে দৈনন্দিন ব্যবহারের দ্রব্যাদি, স্ত্রী-লোকের গহনা ও শিশুর পুতুল, খেলনা নরম মাটির ঢেলা লইয়া তৈয়ারি করিয়াছে। ভারতবর্ষে নব্য-প্রস্তর যুগ হইতে মৃৎশিল্পের বিভিন্ন প্রকাশ উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের নদীতটাশ্রিত প্রাচীন জনকেন্দ্রসমূহ হইতে প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহাদিগের মধ্যে মাতৃকামূর্তি, পশুমুখাকৃতি মনুষ্যমূর্তি, জীবজন্তুর মূর্তি ও ব্যবহারের দ্রব্যসামগ্রীই প্রধান। মূর্তিগুলি সাধারণত কাঁচা অবস্থায় আঙুল দিয়া টিপিয়া তৈয়ারি করা হইত এবং ইহাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও স্তন প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতিরিক্ত মৃত্তিকাপিণ্ড চাপিয়া অথবা কাঁচা অবস্থায় তীক্ষ্ণ ফলকের চাপে রেখাপাত করিয়া দেখান হইত। ইহার পর মূর্তিগুলি ও ব্যবহারের দ্রব্যসামগ্রী রোদে শুকাইয়া অথবা আগুনে পোড়াইয়া ব্যবহারযোগ্য করিবার রেওয়াজ ছিল।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কুলী ও ঝোব নামক স্থান হইতে যে-সকল বিভিন্ন আকারের মৃৎপাত্রাদি, মাতৃকামূর্তি, ষাঁড়, মহিষ প্রভৃতি পশুমূর্তি ও নানা প্রকারের ক্রীড়নক আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহারা আমাদের দেশের প্রাগৈতিহাসিক মৃৎশিল্পধারার আদিম ও উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। মাতৃকামূর্তি-গুলির অলংকারপ্রাচুর্য, পরিপূর্ণ স্তন, সম্পূর্ণ গোলাকার চক্ষুদ্বয় এবং উচ্চ মস্তকাভরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ধারাটির কালগত স্বাভাবিক পরিণতরূপ পরবর্তী তাম্রপ্রস্তর বা লৌহযুগে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, লোথাল এবং দক্ষিণ-ভারতের নীলগিরি, নাদুপেট্টা প্রভৃতি স্থান হইতে শিল্প-নিদর্শনের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মাতৃকামূর্তির বিভিন্ন প্রকাশ এই যুগের শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মূর্তিগুলি অধিকাংশ নগ্ন, কেবলমাত্র কোমরে একটি অলংকার জড়ানো। কুলী ও ঝোবের মূর্তিগুলির ন্যায় এখানকার মূর্তিগুলির নিম্নভাগ সমখণ্ডে গঠিত নয়। তাহাদের হস্তপদাদি পৃথকভাবে গঠিত। মস্তকাভরণ সাধারণত ত্রিকোণ পাখার আকারযুক্ত। তাহাদের উন্নত স্তন, প্রাণবন্ত গঠন, অলংকার-প্রাচুর্য, বিভিন্ন প্রকারের শিরোভূষণ ও কেশবিন্যাস পদ্ধতি বিশেষ লক্ষণীয়। বক্ষদেশ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও অলংকারসজ্জা অতিরিক্ত মৃত্তিকাপিণ্ড সংযোজন দ্বারা গঠিত। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও মূর্তিগুলির সজীবতা ও জীবনপ্রাচুর্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট।

দ্বিতীয়ত, পশুমূর্তিগুলির মধ্যে গোরু, মহিষ, ষাঁড়, ভেড়া, জলহস্তী, হস্তী প্রভৃতির প্রকাশভঙ্গিমা অধিকতর বাস্তবধর্মী ও স্বাভাবিক। এই-সকল মূর্তি শিশুদিগের ক্রীড়নক ও ধর্মীয় প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইত।

তৃতীয়ত, পশু ও মনুষ্য -মূর্তি ব্যতীত শিশুদিগের জন্য নানা প্রকার খেলনা পুতুল, স্ত্রীলোকের ব্যবহারের

জন্য গহনা ও দৈনন্দিন ব্যবহারের নানা প্রকার সাজসরঞ্জাম তৈয়ারি করা হইত। খেলনা পুতুলের মধ্যে দু'চাকার গাড়ি, নানা প্রকার পশুপক্ষীর মূর্তি ও অদ্ভুত মুখোশজাতীয় দ্রব্যই প্রধান। শিশুদিগের মধ্যে হাসি ও আনন্দের খোরাক জোগাইবার জন্য কোনো কোনো নিদর্শনের মধ্যে ব্যঙ্গরসেরও পরিবেশন করা হইত।

সামগ্রিকভাবে এই যুগের মৃৎশিল্পের চাতুর্য ও গতিভঙ্গিমা বিশেষ প্রশংসনীয়। মৃৎশৈলীর বিভিন্ন প্রকাশইঙ্গিত, যেমন আজানুলম্বিত বাহু, এক দেহে বহু মস্তক, নাগমূর্তির প্রাধান্য, উন্নত মস্তকাভরণ প্রভৃতি পরবর্তীযুগের ভারতীয় ভাস্কর্যধারাকে নানা আকার ও প্রকারে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত ভারতকলা-বিশেষজ্ঞ ডক্টর স্টেলা ক্রামরিশের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য গভীর অর্থবহ ও ইঙ্গিতময়।

> "Other devices on the seals, sealing and on terracottas are also relevant, if as motifs only, for the future, the centrifugal combination of various figures, on their parts diverging from centre, the many-headed divinity and the standing figures with long arms, so that they touch the knees, the overhigh heads of goddesses which anticipates the *Usnisha* i.e. the excrescence of the head of Buddha images, the mode of sitting ; their part played by the *naga* (serpent) and the alignment of repeated figures, as well as the freely symmetrical arrangement of single figures on the surface of the relief."[১]

হরপ্পা-পরবর্তী ও প্রাক্-মৌর্য কালের (১৫০০ - ৬০০ খ্রীস্টপূর্ব) মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিদর্শনাদির অভাবে এতদিন এই যুগকে মৃৎশিল্পের অন্ধকারময় যুগ নামে অভিহিত করা হইত কিন্তু সম্প্রতি খননকার্যের ফলে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী জিলার কায়থ, নাভদাতোলী প্রভৃতি স্থান হইতে আবিষ্কৃত পশুমূর্তি এবং মহারাষ্ট্রের পুণা জিলার ইনামগাঁও, চান্দোলী প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত স্ত্রী ও পুরুষমূর্তি সকল এই যুগের মৃৎশিল্পশৈলীর উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছে। মূর্তিগুলি সাধারণত পোড়ান নয় এবং প্রাকৃত ধারায় তৈয়ারি। আপাতত দেখিলে মনে হয় যে এই যুগের শিল্পীগণ যেন পূর্বধারা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও যথেষ্ট পরিমাণে অপটু।

আদিকাল হইতে মৃৎশিল্পধারা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত। মহাভারত, বৌদ্ধজাতক, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তদানীন্তনকালেও এই ধারাটি বিশেষভাবে প্রবহমান ছিল। মহাভারতে দেখা যায় যে, একলব্য গুরু দ্রোণের মৃত্তিকামূর্তির সম্মুখে শিক্ষাগ্রহণ করিতেছেন। বনপর্বে মহারাজ অশ্বপতির বাল্যকালে মাটির পশুমূর্তি নির্মাণের বর্ণনা ও ভদন্ত জাতকে রাজপুত্রদের তাহাদের মাতামহের নিকট হইতে মাটির খেলনা গ্রহণ-কাহিনী সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে প্রাক্-মৌর্যযুগে মৃৎশিল্প তাহার আভিজাত্য সম্পূর্ণ হারায় নাই এবং তখনো ধনী ও মানী ব্যক্তিরা ইহার ব্যবহারে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। পুরাণসমূহে নানাপ্রকার মাটির দেবদেবীর মূর্তির বর্ণনাও উল্লেখযোগ্য।

প্রাক্-মৌর্যযুগে মৃৎশিল্পই ছিল সৃজনক্রিয়ার প্রধান অবলম্বন। শিল্পকার্যে অধিকতর প্রস্তর ব্যবহার প্রচলিত হওয়ার ফলে মৃৎশিল্পের আভিজাত্য ও গৌরব ক্রমশ ম্লান হইতে শুরু করে এবং প্রস্তর ও মৃৎশিল্পের

---

১ Stella Kramrish, *Indian Sculpture*, p. 6

কৌলীন্যগত প্রভেদ বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশের অবকাশ পায়। মৌর্যযুগ হইতে দরবারী শিল্পে প্রস্তরের ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং সেই সময় হইতে মৃৎশিল্প জনসাধারণের শিল্পরূপে পরিগণিত হয়। স্বল্প-মূল্য, ক্ষণভঙ্গুর ও সহজপ্রাপ্য হওয়ার জন্য মৃৎশিল্প দরবারী বা অভিজাত শিল্পের সঙ্গে একাসনে বসিবার অধিকার ক্রমশ হারাইয়া ফেলে।

মৌর্যযুগ হইতে ধনী ও মানী ব্যক্তি মূলত প্রস্তরমূর্তির পূজা করিয়াছেন। ধনীর দুলাল মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তর-নির্মিত ক্রীড়নক লইয়া খেলা করিয়াছে, ধনী ও মানী সম্প্রদায়ের গৃহলক্ষ্মীরা স্বর্ণ ও রৌপ্যালংকারের দ্বারা ভূষিত হইয়াছেন কিন্তু দেশের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণ মাটির তৈয়ারি মূর্তির পূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা সস্তা মাটির খেলনা ও পুতুল লইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছে আর গ্রামবধূরা মাটির ও নানা রঙের কাঁচের নির্মিত গহনা দ্বারা দেহবল্লরী সাজাইয়া গৃহপ্রান্তে তুলসীতলায় সকাল সন্ধ্যায় মাটির প্রদীপ জ্বালাইতেন। যদিও পরবর্তীকালের লেখা কবি কালিদাসের ও বাণের কাব্যগ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে কোনো কোনো সময়ে রাজা-মহারাজারাও কৌতূহলবশত স্ব স্ব গৃহ মৃৎশিল্প-নিদর্শনাদির দ্বারা সাজাইয়াছেন বা রাজকুমাররাও মৃৎশিল্পের খেলনা লইয়া খেলিয়াছেন তথাপি এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে মৌর্যযুগ হইতে মৃৎশিল্প তাহার আভিজাত্য ও কৌলীন্য হারাইতে শুরু করে এবং সেই সময় হইতে সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ মৃৎশিল্পকে হীনচোখে দেখিতে আরম্ভ করেন। প্রকৃতপক্ষে মৌর্যযুগ হইতেই মৃৎশিল্পধারা লোকশিল্প বা জনশিল্পরূপে পরিগণিত হইল।

ভারত-শিল্প ইতিহাসে মৌর্যযুগের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ধারা ও তাহার প্রতিক্রিয়া মৃৎশিল্পেও সমানভাবে রূপায়িত। পাটনা শহরের নিকটস্থ কুমারহার, গোলকপুর, ভিকৃনাপরী, বক্সার, নালন্দা ও পশ্চিমবঙ্গের তমলুক, গোকর্ণ নামক স্থানসমূহ হইতে প্রাপ্ত স্ত্রীমূর্তি-সকলের বিপুল মস্তকাভরণ, বিদেশী ক্লোকের ন্যায় পোশাক, অলংকারপ্রাচুর্য ও পূর্ণযৌবনশ্রী বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কমনীয়তা, লালিত্য ও সহজ গতিচ্ছন্দ মূর্তিগুলিকে এক নূতন ছন্দে ও রসে সঞ্জীবিত করিয়াছে। পাটনা জাদুঘরে রক্ষিত হাস্যময় বালকের মুখ দুইটি সরলতা বা প্রাণসত্তার সজীব প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জিলার গোকর্ণ নামক স্থানে এবং তমলুকে প্রাপ্ত দেবীমূর্তি দুইটি অলংকারপ্রাচুর্যে, মস্তকাভরণের বিশালতায় এবং গঠন-ভঙ্গিমার পুষ্টতা ও দৃঢ়তায় এবং শক্তিমত্তার প্রাচুর্যে এই যুগের উল্লেখযোগ্য লোকশিল্প-নিদর্শন। পাটনা জাদুঘরে রক্ষিত বুলন্দিবাগ ও পাটনা হইতে প্রাপ্ত স্ত্রীমূর্তিগুলির পীনপয়োধরার মসৃণ ডৌল, বিদেশীয় প্রশস্ত ঘাঘরা জাতীয় পোশাক, চঞ্চল গতিচ্ছন্দ, বিপুল মস্তকাভরণ এবং স্পর্শকাতর গঠন-ভঙ্গিমা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। তদানীন্তন দরবারী শিল্পধারার নিকট হীনপ্রভ হইলেও মৃৎশিল্পের ইতিহাসে মৌর্যযুগের এই নিদর্শনগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রকাশ। এই যুগের নানাবিধ পশু ও খেলনার নিদর্শন এবং নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীতে উজ্জ্বল ঘন কালো রঙের প্রলেপ দেওয়া হইত। দু'চক্রবিশিষ্ট ভেড়া, গোরু ও মহিষের খেলনার বিশেষ প্রচলন ছিল এবং ইহাদের নিপুণ ও নিখুঁত গঠন মৌর্য মৃৎশিল্পের ধারাটিকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে।

মৌর্য-পরবর্তী যুগে দরবারী শিল্পধারা হীনপ্রভ হইয়া পড়ায় লোকায়ত শিল্পধারা ভীমাবেগে আত্ম-প্রকাশ করে। শুঙ্গ ও কাণ্ব যুগে মৃৎশিল্পের বহুল নিদর্শন কৌশাম্বী, বৈশালী, অহিচ্ছত্র, রাজঘাট, মথুরা, তমলুক, বানগড়, চন্দ্রকেতুগড় ও দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই যুগে

ছাঁচে ঢালা মাটির মূর্তির বিশেষ প্রচলন হয়। এই-সকল ছাঁচ সাধারণত গোলাকার অথবা চতুষ্কোণবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকার পোড়ামাটির টালি। ঝুলাইবার জন্য এই-সকল টালির ঊর্ধ্বভাগে ছিদ্র করা হইত। ইহার উপরে অগভীরভাবে যক্ষযক্ষিনী, দেবদেবী, সমাজচিত্র, জাতক-কাহিনী প্রভৃতি রূপায়িত। পাঞ্জাবের সুগ নামক স্থানে এইরূপ একটি টালির উপর অক্ষর লিখনরত একটি ছাত্রের মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এই মূর্তিটির লিখিত অক্ষরগুলি হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে উহা দ্বিতীয় খ্রীস্টপূর্বাব্দে নির্মিত। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মূর্তিগুলির মধ্যে লৌরীয়নন্দনগড়ে প্রাপ্ত ভূদেবীর মূর্তি, কৌশাম্বীর পক্ষবিশিষ্ট শ্রীদেবী, "পদ্মস্থা পদ্মহস্তা গজোৎক্ষিপ্তঘটপ্লুতা" আকারে গজলক্ষ্মী, সকাম আলিঙ্গনাবদ্ধ মিথুনমূর্তি বিশেষ স্থান অধিকার করে। মূর্তিগুলি অগভীর হইলেও প্রকাশভঙ্গিতে সহজ সরল এবং বেশভূষা, অলংকার ও মস্তকাভরণের ভারে ভারাক্রান্ত। স্ত্রীমূর্তি-সকলের গৌরীপট্ট অতি স্পষ্ট ও পূর্ণরূপে প্রকাশিত। সুঙ্গ ও কাণ্ব যুগের মৃৎশিল্পধারা লোকায়ত শিল্পের সার্থক ও সম্পূর্ণ প্রকাশ। সাঁচী, ভারুত ও বুদ্ধগয়ার শিল্পের রূপবিন্যাসের ধারা এ যুগের মৃৎশিল্পের মধ্যে বিশেষভাবে রূপায়িত।

দক্ষিণ-ভারতে সাতবাহন রাজত্বকালেও মৃৎশিল্পের বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। মহারাষ্ট্রের টের, নৈভাসা, কোলাপুর ও পৈঠান এবং হায়দ্রাবাদের কোন্দাপুর গ্রামে বহু মৃৎশিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। এই-সকল স্থানে নরনারীর মূর্তি ব্যতীত পশুপক্ষীর বহু সজীব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। নেভাসায় প্রাপ্ত হাস্যরত বালক মূর্তিটির সহিত রোমান মৃৎশিল্পধারার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ-ভারতে উত্তর-ভারতের ন্যায় সূক্ষ্ম কাদামাটির অভাব, সেজন্য দানাদার কাওলিন মাটির দ্বারা মূর্তিগুলি নির্মিত।

খ্রীস্টযুগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্যের পত্তন এক নবযুগের সূচনা করে। ইরানীয়, গ্রীক-রোমান ও ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে উত্তর-ভারতে যে নূতন প্রাণবন্ত দরবারী শিল্পস্রোত প্রবাহিত হইতে শুরু করে তাহার ফলে কুষাণযুগের মৃৎশিল্পধারা অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া পড়িলেও নূতন গতিচ্ছন্দ ও অভিনব গঠনকৌশলের মহিমায় এ যুগের মৃৎশিল্পেও প্রাণস্পন্দনের নবতাল শুরু হয়। এ যুগের শিল্পনিদর্শন পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জিলায়, মথুরা, তক্ষশীলা, পাটনা, অহিচ্ছত্র প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গিয়াছে। মধ্য-এশিয়া ও গ্রীক-রোমান প্রভাব কুষাণযুগের মৃৎশিল্পের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রাপ্ত মূর্তিগুলির মধ্যে ইন্দ্র, কুবের, কামদেব, নরনারীর সকাম আলিঙ্গনাবদ্ধ মূর্তি, সূর্য ও বিভিন্ন সমাজচিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মথুরায় প্রাপ্ত মৃৎশিল্প-নিদর্শনের মধ্যে মাতৃকামূর্তি, পূর্ণ যৌবনশ্রীযুক্তা স্ত্রীমূর্তি ও পক্ষীমূর্তির বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়।

তক্ষশীলাকে কেন্দ্র করিয়া এই যুগে গান্ধার অঞ্চলে একটি প্রাণবন্ত মৃৎশিল্প-কেন্দ্র গড়িয়া ওঠে। প্রথম যুগে গ্রীক-রোমান শিল্পধারার প্রভাব এই অঞ্চলের শিল্পপ্রকাশধারাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং ধীরে ধীরে ভারতীয় সংস্কৃতির ও ভাবধারার প্রভাবে তাহা ক্রমশ দূরে সরিয়া যায়। এই অঞ্চলে অসংখ্য বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, গ্রীক-রোমান দেবদেবীর মূর্তি, জাতক-কাহিনীর বিভিন্ন প্রকাশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কুষাণযুগে মৃৎশিল্পধারা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। সম্ভবত বৃহৎ আকারের মূর্তিনির্মাণের প্রচেষ্টার প্রাধান্যই ইহার জন্য দায়ী।

কুষাণযুগের শিল্পধারার কালগত স্বাভাবিক পরিণতি লক্ষ্য করা যায় গুপ্তযুগের শিল্পধারায়। দেহের মার্জিত গঠন, অঙ্গে বসনের ঘনিষ্ঠতা, অলংকারবাহুল্য, সৌম্যভাব প্রকাশ গুপ্তযুগের মৃৎশিল্পের

দেবীমূর্তি : তমলুক, পশ্চিমবঙ্গ

রাজকন্যা ও বিদূষক : মথুরা

বিশেষ দান। মৃৎশিল্পের নিদর্শনগুলি পৃথকভাবে অথবা দেবমন্দিরের অলংকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। মন্দিরের অলংকরণ হিসাবে বড়ো বড়ো টালির বা ফলকের নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে দেবদেবী, মিথুনমূর্তি, পৌরাণিক কাহিনী, তদানীন্তন সমাজচিত্র, কৌতুকময় ঘটনা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিভিন্ন প্রকাশ ও পশুপক্ষীর মূর্তির রূপদান করা হইত। সিন্ধু প্রদেশের মীরপুরখাস, উত্তর প্রদেশের ভিতরগাঁও, কৌশাম্বী, অহিচ্ছত্র, ভিটা, শ্রাবস্তী, রাজঘাট, বাংলাদেশের মহাস্থানগড়, ময়নামতী, পাহাড়পুর, তমলুক প্রভৃতি স্থানে এই যুগের নিদর্শন প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎশিল্প সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, হাসিকান্না, সুখদুঃখের নিখুঁত ছবি। এই-সকল অপূর্ব নিদর্শন সম্বন্ধে প্রখ্যাত শিল্পরসিক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

"ধর্মগত, উচ্চকোটিস্তরের ঐতিহ্যগত শিল্পের কোন স্তরে এমন সুবিস্তৃত সামাজিক পরিবেশ, মানসিক কল্পনা ও অনুভূতির এমন বৈচিত্র্য, প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব ঘটনা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে এমন গভীর সংযোগ, এমন স্বতোচ্ছ্বাসিত ভঙ্গিমা ও চালচলন, প্রকাশের এমন সজীব ও পরিপাটী ছন্দের পরিচয় সুদুর্লভ।"[১]

এ কথা খুবই সত্য যে মৃৎশিল্প এই যুগে লৌকিক জীবনের ধারাটি যেমন সযত্নে প্রকাশ করিয়াছে তেমনি করিয়া কোনো প্রকাশ দরবারী শিল্পে আদৌ দেখা যায় না। এ যুগের মৃৎশিল্প রূপ, রস, সজীবতা ও সরলতার বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

মৃৎশিল্পে রঙের ব্যবহার এই যুগে লক্ষ্য করা যায়। উত্তর প্রদেশের ভিটা নামক স্থানে এই নিদর্শনাদির সন্ধান পাওয়া যায়। এই-সকল নিদর্শনে রঙের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্যার জন মারশাল বলেন—

"Some of the figurines are without slip or paint; others are painted in a monochrome— red or yellow, for instance; and others are coated with a slip and adorned with a variety of colours— red and pink and yellow and white."[২]

ইহা ব্যতীত অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ কাব্যের সপ্তম পর্বে চটকদার রঙ-করা মাটির তৈয়ারি একটি ময়ূর-মূর্তির উল্লেখ উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত করে।

বিকানীর জাদুঘরে রক্ষিত রঙমহল নামক স্থানে আবিষ্কৃত মৃৎশিল্পের ফলকগুলি কৃষ্ণলীলা রূপায়ণের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোবর্ধনধারণ ও দানলীলা ফলকদ্বয়ের শ্রীকৃষ্ণমূর্তি নিখুঁতভাবে রূপায়িত। দানলীলায় শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষের বেশভূষায় ও গোবর্ধনধারণ ফলকে রাজকীয়রূপে দেখান হইয়াছে। গোবর্ধনধারণ ফলকের নিম্নভাগে শ্রীকৃষ্ণের পদপার্শ্বে গোমিথুনের দৃশ্যটি অতি সহজ বাস্তব ভঙ্গিতে চিত্রিত। ইহা ব্যতীত লিঙ্গমূর্তি, শিবযোগী, শিব-পার্বতী, চক্রপুরুষ ও বিষ্ণুমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রঙমহলের পশুমূর্তির মধ্যে উটের মূর্তিটি বেশ অভিনব এবং বিভিন্ন প্রকারের পুষ্পের ছাপের দ্বারা শোভিত।

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ৭৮২

২ *Annual Report of the Archaeological Survey of India*, 1911-12, p. 72

গুপ্তোত্তর যুগে কাশ্মীরে মহারাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের (৭০০-৭৩৬ খ্রীস্টাব্দ) রাজত্বকালে আকনুর, উসকর, বরমূলা প্রভৃতি স্থান হইতে মৃৎশিল্পের যে-সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা গান্ধার ও পরবর্তী গুপ্তশিল্পধারার অনুক্রম মাত্র। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, রাজন্যবর্গ ও সাধারণ মানুষের যে-সকল মাটির প্রতিচ্ছবি পাওয়া গিয়াছে তাহারা বিদেশী শিল্পধারার প্রভাবেই ভরপুর কিন্তু প্রাণসত্তা ও স্বকীয়তায় পূর্ণ সচেতন। উসকরে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির গঠন-কৌশল নিকৃষ্ট ধরনের এবং মূর্তিগুলি ফাঁপা। অনুরূপ ফাঁপা মাটির মূর্তির সন্ধান গান্ধারে সাহারী বাহোল নামক স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং বর্তমানে এগুলি পেশোয়ার জাদুঘরে রক্ষিত।

পাহাড়পুরের মৃৎশিল্পধারার ক্রমবিবর্তনছন্দ অনুসরণ করিলে গুপ্তোত্তর যুগের (৮ম হইতে ১০ম খ্রীস্টাব্দের) বহু নিদর্শন দেখা যায়। সাধারণত দেবদেবীর মূর্তি ব্যতীত জনসাধারণের জীবনযাত্রার ধারা, পশুপক্ষীর বিভিন্ন রূপ ও লোককাহিনীর প্রকাশ এ যুগের শিল্পের মূল বিষয়বস্তু। এই-সকল মৃৎশিল্প নিদর্শনের মধ্যে পূর্বধারার রূপলাবণ্য ও রসধারার উচ্ছ্বাসের একান্ত অভাব। এই-সকল শিল্পধারার গতি ও প্রকৃতি নিম্নগামী হইলেও ইহারা স্বকীয়তার গৌরবে উজ্জ্বল ও নিজস্ব পূর্ব-ভারতীয় সত্তায় ভরপুর।

জাতির রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে তাল রাখিয়া অবিচ্ছিন্ন গতিতে মৃৎশিল্পধারাটি লোকায়ত জীবনের রক্তমাংসের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া প্রবহমান ছিল। দরবারী শিল্পের অত্যুজ্জ্বল প্রভাবে ও প্রসারে কখনো কখনো এই ধারাটি শীর্ণ ও মৃতপ্রায় থাকিলেও সুযোগ বুঝিয়া আবার দুকূল ছাপাইয়া ভীমাবেগে আত্মপ্রকাশ করিত।

এতদিন শিল্প-ইতিহাসে যে সর্বভারতীয় শৈলীধারা ও আদর্শ-অনুসরণের সাধনা চলিয়া আসিতেছিল তাহা মূলত গুপ্তযুগের অবসানকাল হইতে বিলীন হইয়া যায় এবং রাজনৈতিক ধারাক্রম অনুযায়ী শিল্পজগতে প্রাদেশিক ভাবধারা ও আঞ্চলিক শিল্প-শৈলী ও আদর্শের অভ্যুদয় সূচিত হয়। এইরূপ আঞ্চলিক আদর্শে ও গৌরবে উজ্জ্বল মৃৎশিল্পধারার সন্ধান পাই পূর্ব-ভারতের বাংলা ও বিহারে। পাল ও সেন যুগে এবং পরবর্তী নবাবী যুগে বাংলা ও বিহারে এই ধারাটির বেগবতী উৎস সন্ধান করিলে আমরা প্রধানত দুইটি কারণ লক্ষ করি। প্রথমত, বাংলা ও বিহার অঞ্চল নদীমাতৃক ও পলিমাটির দেশ। এখানে প্রস্তরশিল্প অধিকতর ব্যয়সাধ্য, সে-কারণে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাহিরে। দ্বিতীয়ত, সেন রাজাদের কাল হইতেই ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজশক্তি-আশ্রিত ব্রাহ্মণ্যশক্তি ক্রমশ হীনবল ও দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে দরবারী শিল্পের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করে। এই দুইটি কারণকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব-ভারতে লোকাশ্রিত মৃৎশিল্পের প্রভাব ও প্রতিপত্তি শুরু হয় এবং দীর্ঘ দুইশত বৎসর বা ততোধিক কাল বাংলাদেশের সর্বত্র লোকশিল্পের জয়ধ্বজা উড়িতে থাকে।

মৃৎশিল্প-ইতিহাসের ধারাবাহিক আলোচনার ফলে জানা যায় যে, দরবারী শিল্পের ন্যায় মৃৎশিল্পের নিদর্শনগুলিকে কেবলমাত্র গঠনশৈলী, অলংকরণ ও প্রকাশভঙ্গিমার তারতম্য হইতেই তাহাদের কালানুক্রমিক শ্রেণীভাগ করা সম্ভব নহে। ইহারা সত্যই Ageless type বা কালজয়ী বা কালাতীত, কারণ লোকশিল্পীবৃন্দ শিল্পশাস্ত্রের বাঁধা নিয়মকানুন উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন আনন্দ ও স্বতোচ্ছ্বাসিত প্রকাশ-ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া এই-সকল শিল্পসৃষ্টি করিতেন। মূর্তিগুলির গঠনশৈলী, অলংকরণ ও প্রকাশভঙ্গিমার গতি ও প্রকৃতি সময়ের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। রাজনৈতিক শিল্পযুগের সীমারেখাকে অবজ্ঞা করিয়া ইহা

সহজছন্দে প্রবাহিত ও আপন নৃত্যতালে আপনি মুখর এবং আজও ইহারা আমাদের মাটির পুতুল, দেবদেবীর মূর্তি ও ব্যবহারিক দ্রব্যাদির মধ্যে বাঁচিয়া আছে। সে কারণ এই-সকল নিদর্শনকে অন্যান্য ঐতিহাসিক নিদর্শনের সমস্থানিক বা সমগোত্রীয় প্রমাণ করিতে না পারিলে কেবলমাত্র তাহাদের রূপভেদ, গঠনশৈলী ও প্রকাশভঙ্গিমার উপর নির্ভর করিয়া বয়সের সীমারেখা টানা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত হইবে না।

অনেকের ধারণা ভারতের লোকশিল্পধারা পূর্ব ও পশ্চিম দেশসমূহের শিল্পধারা ও সংস্কৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া একান্ত আত্মকেন্দ্রিক সত্তায় বিবর্তিত। কিন্তু এই ধারণা একান্তই ভিত্তিহীন। প্রাগৈতিহাসিক মৃৎশিল্পের নিদর্শনসমূহের বিচার-বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। স্বর্গত চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় উপরোক্ত মন্তব্য সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন—

"There exists a fundamental relationship between the terracotta figurines of the Indus valley age on one hand and the figurines made in clay, stone and other materials of the Near East, particularly the land inhabited by the Sumerians."[১]

ইহা ব্যতীত পরবর্তীকালীন মৌর্য ও সুঙ্গ মৃৎশিল্পে পশ্চিম-এশিয়ার এবং কুষাণযুগের শিল্পে গ্রীক্-রোমান শিল্পের প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ফ্লিনডার্স পেট্রি ও ডি. এইচ. গরডনের মতে কুষাণ ও কুষাণোত্তর যুগে ভূমধ্যসাগর হইতে বাংলাদেশের তৈয়ারি মৃৎশিল্প-নিদর্শনাদির মধ্যে এক গভীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে ডি. এইচ. গরডন বলেন যে—

"A linking of all the terracottas of the Hellenistic period from the Eastern Mediterranean to Bengal is necessary, but before this can be done it is imperative that the terracottas already found at sites such as Dura-Europos should be brought into greater prominence, and that this Hellenistic Parthian culture should be linked up through Bactria and Afganisthan into India and Chinese Turkestan, following the trade routes."[২]

এই-সকল তথ্যাদি ও আলোচনা হইতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতের গণ-সংস্কৃতির আকাশে অন্যান্য প্রতিবেশী সভ্য দেশসমূহের সংস্কৃতির ভাব ও প্রতিচ্ছবি দেওয়া-নেওয়ার এক ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল।

মৃৎশিল্পে মাতৃকা বা স্ত্রীমূর্তির সংখ্যা খুব বেশি। পুরুষমূর্তির দ্বারা সাধারণত যক্ষ, কুবের, দেব, নর প্রভৃতির রূপ পরিবেশন করা হইত কিন্তু ইহারা সংখ্যায় অতি নগণ্য। স্ত্রীমূর্তিগুলির সাজসজ্জা, গঠনশৈলী ও ভাব এবং দেহের প্রকাশভঙ্গিমায় তারতম্য লক্ষ্য করিয়া প্রতীয়মান হয় যে ইহারা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন

---

১ C. C. Dasgupta, *Origin and Evolution of Indian Clay Sculpture*, pp. 116-117

২ *Journal of the Indian Society of Oriental Art*, vol. XI, 1948, p. 179

ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য নির্মিত বা গঠিত হইত। এই-সকল স্ত্রীমূর্তি ধর্মীয় কি সামাজিক কারণে, কামপূজা কি ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহৃত হইত তাহা সঠিক ভাবে জানিবার কোনো উপায় নাই। তবে পৃথিবীর সকল প্রাচীন দেশের শিল্পে মাতৃকামূর্তির অতি প্রচলন হইতে অনুমিত হয় যে শক্তি এবং প্রাচুর্যের দেবী হিসাবে ইহারা ব্যবহৃত হইত। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আলোচনাটি বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য।

"In the early historic period the female figures are of many types. Some of them, specially those of primitive style, were certainly goddesses: though whether they were Mother goddesses, virgin goddesses or just goddesses of love is a matter of speculation··· Some might be deposited at temples as an 'ex veto'··· Some, the very small ones, might be carried about as amuletic charms··· Some might be household deities propitiated during the dangers of childbirth.

"We may conclude that all the nude female figures of an iconographic rather than a secular style can be classed as goddesses, for the purpose of procuring divine assistance in one of the ways just mentioned."[১]

উপরোক্ত আলোচনা হইতে এবং ইহাদের গঠনশৈলী, সাজসজ্জার প্রাচুর্য, যৌবনসমৃদ্ধ দেহভার এবং নানাপ্রকারের আসন হইতে অনুমান করা যায় যে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত নানাভাবে ইহাদের ব্যবহার করা হইত। এখানে ধর্ম ও পরিবেশ-চেতনার দুইটি ধারাই একই সঙ্গে কাজ করিয়া একে অন্যকে সার্থক ও পূর্ণায়ত হইতে সাহায্য করিয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে মৃৎশিল্পে যে-সকল পশু ও পক্ষীর মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে মহিষ, ষাঁড়, সিংহ, হস্তী, উট, বানর, সর্প, নানাপ্রকার পক্ষী ও ময়ূর প্রভৃতি প্রধান। ইহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক পশুপক্ষীর মূর্তি ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহৃত হইত এবং অন্যান্যগুলি তদানীন্তন মানুষের ধর্ম বা সম্প্রদায়-চিহ্ন (Totem) হিসাবে ব্যবহৃত হইত। এই-সকল আদিম কোমগত পূজার প্রতীক বা চিহ্ন পরবর্তীকালে আর্য দেবদেবীর বাহনরূপে মিলিত ও একাঙ্গীভূত হইয়া আর্য-অনার্য সাংস্কৃতিক মিলনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। "প্রমাণ, আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন; দেবীর বাহন সিংহ, কার্তিকের বাহন ময়ূর, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, শিবের বাহন নন্দী, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, সরস্বতীর বাহন হংস, গঙ্গার বাহন মকর, যমুনার বাহন কূর্ম, সমস্তই সেই আদিম পশুপক্ষীর পূজার অবশেষ।"[২]

বিভিন্ন যুগের মূর্তিগুলির অলংকার ও বেশভূষার প্রাচুর্য, দৈন্য, বৈচিত্র্য ও গঠনবিন্যাস লক্ষ করিয়া অনুমান করা শ্রেয় হইবে না যে উহা কোনো বিশেষ যুগের সাধারণ মানুষের অলংকার ও বেশভূষার ধারা। কারণ একই যুগে ও একই স্থানে আবিষ্কৃত মূর্তিগুলির বিভিন্ন ধারার বেশভূষার সন্ধান পাওয়া যায়।

---

১ *Journal of the Indian Society of Oriental Art*, vol. XI, 1948, pp. 178-179

২ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ৫৮০

মৌর্য, সুঙ্গ ও কুষাণযুগের স্ত্রীমূর্তিগুলি কোথাও বেশভূষার ভারে ভারাক্রান্ত আবার কোথাও তাহাদের ঊর্ধ্বাঙ্গ আবরণহীন এবং সুডৌল ও উন্নত স্তনদ্বয় সুপ্রকাশিত। পুরুষদিগের নিম্নাঙ্গ সুচিক্কণ বস্ত্রাবৃত অথচ স্ত্রীমূর্তির নিম্নাঙ্গ অনাবৃত ও যৌনাঙ্গ উদ্ধতভাবে প্রকাশিত। ইহা হইতে ঐ সময়ের জনগণের পোশাক-পরিচ্ছদের ধারা বা মান নির্ণয় করা কি সমীচীন হইবে ?

বস্তুভিত্তিক জীবন, সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রভাব, সমাজ-জীবনের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া শিল্পমানসের উদ্ভব ঘটে। ভারতীয় মৃৎশিল্প-ইতিহাসে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই লোকায়ত শিল্পধারা ভারতীয় সাধারণজনের সামগ্রিক জীবনরসের প্রতিচ্ছবি। এই শিল্পধারার বিবর্তন-ইতিহাসের প্রতিস্তরেই তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজিও রচিত হয় নাই। এতদিন ইতিহাস রচনার যে প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহা দরবারী ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা মাত্র। এই ইতিহাসে ভারতের অসংখ্য জনমানবের ভয়ভাবনা, আশা-নিরাশার, হাসিকান্নার বা দুঃখসুখের পরিপূর্ণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয় নাই অথবা লিপিবদ্ধ করিবার আদৌ কোনো চেষ্টা করা হয় নাই। যতদিন-না সমগ্র দেশবাসীর লোকাশ্রিত সংস্কৃতির ইতিহাস, সমগ্র দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ কাহিনী ও সমগ্র জাতির সকল স্তরের মানুষের আচার-ব্যবহার, ধর্ম কর্ম, শিল্পসাহিত্যের ধারাবাহিক সম্পূর্ণ আলোচনা হইতেছে ততদিন ইতিহাসচর্চার সার্থকতা কোথায় ? সম্পূর্ণ ভারত ইতিহাস রচনার প্রস্তুতি হিসাবে মৌলিক উপাদান সংগ্রহ করা, তাহাদের বিচার-বিশ্লেষণ করা ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহাদের উপর আলোচনা ও গবেষণা করা একান্ত প্রয়োজন। লোকায়ত মৃৎশিল্পের ধারাবিবর্তন-কাহিনী পূর্ণাঙ্গ ভারত-ইতিহাস রচনার জন্য অপরিহার্য। '

ভারতে শিল্পশিক্ষা

কল্পাতি গণপতি সুব্রহ্মণ্যন

শিক্ষাকে মানবিক সংগঠনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে নেওয়া— এটা মানুষের স্বভাবধর্ম। মানুষ কখনোই সম্পূর্ণরূপে তার বংশগতির (Genetic Code) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। স্বাভাবিক ক্ষমতানুসারে সে নিজেকে এবং নিজের পারিপার্শ্বিককে পরিবর্তিত করতে সক্ষম। মানুষের আছে সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন বহুব্যবহারোপযোগী দুটি হাত, এমন একটি মন যা যুক্তিসম্মতভাবে চিন্তা করতে সক্ষম। এ ছাড়াও মানুষের আছে অন্য মানুষের সঙ্গে মিলিত হবার ও ভাব-বিনিময়ের সহজাত প্রবৃত্তি। এর থেকে জন্মে বিভিন্ন মানবিক কুশলতা, মানবিক জ্ঞান, মানবিক যোগাযোগ ও বিচিত্র কর্মের ধারা। পুরুষানুক্রমে মানুষ এই-সব বিদ্যা আয়ত্ত করে, এবং সেই বিদ্যার প্রকৃতি ও পরিধির পরিবর্ধন সাধন করে। অধীত বিদ্যা এবং সেই বিদ্যার প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত যা গড়ে ওঠে, তাকেই আমরা বলি সভ্যতা।

কিন্তু, মানুষের প্রকৃতি এমনই যে তার প্রত্যেক ব্যাবহারিক প্রচেষ্টাই আপাতলক্ষ্যকে অতিক্রম করে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটায়। তাই, প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাই তার জ্ঞানের প্রসার ও কুশলতার উৎকর্ষ সাধন করে। পুরাতন সত্যের উপর আবির্ভাব ঘটে নূতন সত্যের, কুশলতার বৈচিত্র্যসাধন হয় এবং ক্রমাগত পরিবর্তন হয় যোগাযোগ ব্যবস্থার। প্রত্যেকটি ঘটনা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্টতা বাড়ায় এবং তাকে ঠেলে দেয় নূতন এক সম্পর্কজালের মধ্যে। এর ফলে মানুষ প্রশ্ন তোলে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে এবং প্রবৃত্ত হয় বিশ্বজগতে তার নিজের প্রকৃত স্থান খুঁজে নিতে। মানুষের উন্নত কুশলতা, প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি ও বর্ধিত সংশয়ের মাঝে নিজেকে জানার আগ্রহের ফলে অস্তিত্বের গুণগত উৎকর্ষ সাধিত হয়।

সুতরাং শিক্ষা এক দিকে পুরুষানুক্রমে জ্ঞান ও কুশলতার প্রচারের মাধ্যম এবং অপর দিকে তা হল অস্তিত্বের গুণগত উৎকর্ষসাধনের যন্ত্র। যে-কোনো যথার্থ শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন এই দুটি বৈশিষ্ট্যের যুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে গড়ে তোলা।

যদিও বহু প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষা মানব-সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বর্তমান, তবু কোনো যুগেই শিক্ষা (অন্তত তার প্রাথমিক পরিচয়ে) আধুনিক কালের মতো সমাজে একটি বিশেষ কর্মধারা হিসেবে পরিগণিত হয় নি।

কোনো বিশেষ সংগঠনের মধ্যে বিধিবদ্ধ না করেও পিতামাতা, পরিবার, কর্মগোষ্ঠীসমূহ, সমাজ— এরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন স্তরে একটি প্রজন্মের মানুষকে সাধারণভাবে তার ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও মূল্যবোধগুলির সঙ্গে পরিচিত করে দেয়। অপর দিকে, শিক্ষার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য দাবি করে নির্লিপ্ততা, বোধ এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রণালী। স্বাভাবিকভাবেই, কিছু বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই এই দাবি পূরণ করতে পারেন। শিক্ষার প্রথম সাংগঠনিক রূপ সম্ভবত এই কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে ঘিরে গড়ে ওঠা কর্মকেন্দ্রগুলি। এগুলি প্রথমে ছিল ক্ষুদ্রাকার এবং বিচ্ছিন্ন— কতকগুলি শিষ্ট, অর্থাৎ "ভদ্রলোকের" (Elitist) সংগঠন। কিন্তু

লিখিত ভাষার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, এবং গ্রন্থাগারগুলিতে বইয়ের সংগ্রহ বেড়ে যাওয়ায়, শিক্ষার বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল বিভিন্ন স্থানে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি যে তথ্য সরবরাহ করত, তা এত বেশি মাত্রায় বৈচিত্র্যসম্পন্ন ও বিরাট যে, কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে তা আয়ত্ত করা কঠিন হয়ে উঠল। শিক্ষকেরা তাই পরিণত হলেন বিশেষজ্ঞ বাহকে। তাঁরা শুধুমাত্র জ্ঞান বিতরণই করেন না, সে জ্ঞানের সমালোচনা ও পর্যালোচনাও করেন, আরো প্রশ্নের সৃষ্টি করেন এবং সুষম সিদ্ধান্তে উপনীত হন। যে-সমস্ত শিক্ষাপ্রণালীতে লিখিত শব্দের স্থান অল্প— যেমন কারু ও চারু-শিল্প এবং উৎপাদনশীল কারিগরি-বিদ্যা— সেগুলি স্বাভাবিকভাবেই এইসব প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তের বাইরে রইল।

কিন্তু যুগে যুগে শিক্ষাজগতের প্রসার বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। জানা গিয়েছে যে, বিগত তিন হাজার বছর ধরেই পৃথিবীতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্র ও শিক্ষকসমাজ বিদ্যমান আছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্বের ইতিহাসও বেশ কয়েক শতাব্দীর। সংখ্যায় এগুলি ছিল অল্প। এরা সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি অত্যন্ত ছোটো অংশ অধিকার করে ছিল। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত বিস্তার শুরু হয় বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে— বিশেষত ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে। শিল্পবিপ্লবের সৃষ্টি হয় ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের উন্নতির ফলেই, এবং শিল্পবিপ্লবের ফলস্বরূপ 'জ্ঞান' পরিণত হয় 'ক্ষমতায়'। নূতন ব্যবস্থাগুলি মানুষকে গণ্য করে 'মানবসম্পদ' হিসেবে। এবং সেই সম্পদের উন্নতি বিধানের দায়িত্বও সে গ্রহণ করে। রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলি ক্রমে বুঝতে পারে যে, একটি সুসংবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক শাসনের শ্রেষ্ঠ উপায়। অপর দিকে, শিল্পবিপ্লব সমাজের প্রকৃতিতে ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। নূতন সমাজব্যবস্থাগুলি পুরাতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে নিজের কাজ সুসম্পন্ন করতে পারল না। এর প্রথম কারণ, সমাজব্যবস্থাগুলির বৈচিত্র্য ও অস্থায়িত্ব। দ্বিতীয় কারণ, নতুন ধ্যানধারণার আলোকে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, অধিকাংশ ঐতিহ্যগত ধারণাই অযৌক্তিক।

বর্তমান সভ্য জগতে শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হল তার ব্যাপকতা ও সংবদ্ধতা। আগেকার সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান ও কুশলতা সম্পর্কে যে শিক্ষা সাধারণভাবে দেওয়া হত, বর্তমানকালে সেগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের— সে স্কুল অথবা কলেজ যাই হোক-না কেন— বিধিবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীতে পরিণত। আজকের স্কুলগুলি শিশুদের পরিচিত করে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, পারিপার্শ্বিক, এবং জ্ঞান আহরণের প্রাথমিক যন্ত্রগুলির সঙ্গে। এক বিচিত্র গ্রাহকসমাজকে শিক্ষা দেওয়া হয় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হবার জন্য। সেজন্য স্বভাবতই এই প্রণালী অত্যন্ত বৃহৎ ও সাধারণ। এর পরে আমাদের উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রগুলি এবং কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্রদের শিক্ষা দেয় বিভিন্ন বিষয়ে— যেমন কলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি। এই শিক্ষা সামান্য গঠনপ্রণালী থেকে নকশা ও কারিগরি জ্ঞান, সাধারণ গার্হস্থ্যবিদ্যা থেকে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত। এর ফলে, সম্ভবত ধর্ম এবং কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী হস্ত-কুশলতার ক্ষেত্র ছাড়া, ব্যক্তিগত বা সামাজিক শিক্ষাদানের জন্য খুব অল্পই বাকি থাকে। এক দিক থেকে এটি অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানের ক্ষেত্র ও কুশলতার ব্যাপকতা আজ এত বেশি যে, স্বাভাবিক-ভাবেই তার প্রচার সম্ভব হয় কেবলমাত্র কোনো সাংগঠনিক ধারার মাধ্যমেই। একমাত্র এই প্রণালীর দ্বারাই সমগ্র জ্ঞানকে সংগঠিত করা এবং ধ্যানধারণার বিবর্তন ঘটানো সম্ভব। অপর দিকে, এই সাংগঠনিক

কাঠামো সৃষ্টি করে বিশেষীকরণ (Specialisation), যা অনেক সময়েই বাস্তব ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এই শিক্ষাপ্রণালী থেকে উদ্‌ভূত হয় এক সমান্তরাল পারিপার্শ্বিক, যার মধ্যে একমাত্র শিক্ষক ও ছাত্র ছাড়া আর কারোই অস্তিত্ব নেই। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। আজ যে কিছু শিক্ষাবিদ অ-সাংগঠনিক ও বন্ধনহীন শিক্ষার কথা বলছেন, অথবা পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতনতার উপর জোর দিচ্ছেন, তার কারণ উপরোক্ত সমস্যাগুলি। অবশ্য, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমানকালের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সাংগঠনিক শিক্ষাপ্রণালীর সুবিধাগুলি অস্বীকার করতে পারি না কিন্তু একই সঙ্গে পারি না এই প্রণালী প্রয়োগের ফলে যে-সব সমস্যা উদ্‌ভূত হয়, তাদের সমাধানে নিশ্চেষ্ট থাকতে।

এই ভূমিকার প্রয়োজন হল এইজন্য যে বিশেষভাবে শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন। এটা না থাকলে হয়তো আমরা একটা অবাস্তব আদর্শ গড়ে তুলব। এক সময় আমরা এদেশে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে একটা কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রস্তাব করেছিলেন, ঐতিহ্যবাহী 'গুরুকুল' কেন্দ্রগুলিকে এর আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে। এই গুরুকুলগুলি হত গ্রামীণ শিক্ষাকেন্দ্র, নাগরিক সভ্যতার কুফল থেকে মুক্ত, এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। কতকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই আদর্শে গড়ে উঠেছিল ঠিকই। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, এগুলি ঐ রোমান্টিক নামটিই বজায় রেখেছিল; কার্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল কয়েকটি সাধারণ কলেজে। একই দুর্ভাগ্যের ভাগী হয় তিন দশক আগে প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্বেদিক ঔষধের কলেজগুলি, যেগুলি স্থাপিত হয়েছিল ভেষজ ঔষধ প্রচারের সদুদ্দেশ্য নিয়ে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপনের পিছনে যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও, বাস্তব অবস্থার সঠিক মূল্যায়নের অভাবে এগুলো সবই ব্যর্থ হয়ে যায়।

শিল্পশিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আজ অনেকেই অনেকরকম মতামত দেন। বহু সময়ে সেগুলি পরস্পর-বিরোধী। অনেকের মতে শিল্পশিক্ষা হওয়া উচিত শিক্ষকের কড়া অনুশাসনে। অনেকে আবার ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষপাতী। কিছু ব্যক্তি মনে করেন শিল্পশিক্ষা হওয়া দরকার গোঁড়া এবং কঠিন সংগঠনের মাধ্যমে। অন্যেরা উদার ও মুক্ত পরিবেশে শিল্পশিক্ষা দিতে চান। অনেকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ তৈরি করার পক্ষপাতী; আবার অনেকে ছাত্রদের বিস্তারিত প্রভাবের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত রাখতে ইচ্ছুক। কিছু বিশুদ্ধবাদী (Purist) মনে করেন শিল্পশিক্ষা মনের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে। অপর দিকে অন্য অনেকে বিশ্বাস করেন হাত ও শরীরের কুশলতা বৃদ্ধির সঙ্গেই এর প্রধান সম্পর্ক। যে বিষয়ে এঁরা সকলেই একমত, তা হল, এঁরা সকলেই মনে করেন আজকের শিল্পশিক্ষার জগৎ গতযুগের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং গতযুগের তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত। সুতরাং বর্তমানকালের শিল্প-শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রবণতা অনুসারে বাছাইয়ের সুযোগ বেশি। অতএব শিল্পশিক্ষার প্রকরণ যাই হোক-না কেন, এই-সব সুযোগের স্থান সেখানে অবশ্যই রাখা প্রয়োজন।

কিন্তু, মূলত যে-কোনো যথার্থ শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হল সমাজে সৃজনশীলতার বীজ বপন করা – সমাজের ও ব্যক্তির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে। যেহেতু আজকের শিক্ষাব্যবস্থা সমস্ত কর্ম-ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, সেই হেতু শিক্ষাব্যবস্থারই উচিত ঐ কর্মধারা সম্বন্ধে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত গড়ে

তোলা এবং বাস্তবের সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করা। আমাদের শিল্পশিক্ষা-ব্যবস্থাগুলিতে যদি কোনো দুর্বলতা থাকে, তার প্রধান কারণ এই পরিপ্রেক্ষিতের অভাব।

আমাদের দেশে শিল্পকর্মের ধারা অত্যন্ত বিস্তৃত ও বিচিত্র। আমাদের সমস্ত দেশে ছড়িয়ে আছে অপেশাদারী গ্রামীণ শিল্প। সারা দেশে, শহরে ও গ্রামে ছড়িয়ে আছে অত্যন্ত উন্নত ও দক্ষ উপযোগিতা-মূলক শিল্প। আমাদের এখনো আছে কিছু ধর্ম-শিল্পকেন্দ্র, যেখানে বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রতিমা-নির্মাণ, মূর্তিনির্মাণ এবং মিনিয়েচার ও ম্যুরালজাতীয় দেওয়াল-চিত্র তৈরি হয়। আজকের আবহাওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানগুলির টিঁকে থাকা সত্যিই আশ্চর্যজনক। হিসেব নিলে দেখা যাবে এখনো এই শিল্পের অনুশীলনকারীর সংখ্যা লক্ষাধিক। এ ছাড়াও আছেন নতুন শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্রগুলির ফসল সমসাময়িক শিল্পীরা, যাঁরা বর্তমানকালের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন তাঁদের ছবি, মূর্তি বা নকশার মাধ্যমে সৃজনশীল-ভাবে। শিল্পের এই বিশাল বিস্তার ও বৈচিত্র্য সংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ। এই ঐশ্বর্য শিল্পমাধ্যমের উপযোগিতাকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়, এবং এরই ফলে শিল্পের ভাষা লাভ করে অসামান্য গভীরতা।

শিল্পশিক্ষার প্রকৃতি, পরম্পরাগতভাবে কুশলতা জন্মিয়ে দেবার যে ধারাটি বহমান তার প্রকৃতি এবং যে-সব উপাদান শিল্পের পুষ্টিসাধন করে তাদের প্রকৃতি— শিল্পশিক্ষার বিভিন্ন স্তরে এদের মধ্যে অনেক তারতম্য ঘটে। যে-কোনো শিল্পশিক্ষাব্যবস্থায় এগুলিকে বিবেচনা করতে হবে এবং পরিকল্পনা করতে হবে পুনরুজ্জীবনের বীজ বপনের। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বাংলা, উড়িষ্যা, রাজস্থান বা গুজরাটের গ্রামীণ দেওয়ালচিত্র বা মেঝের আলপনা প্রধানত অপেশাদারী। তার জন্য বিশেষ কুশলতার প্রয়োজন হয় না, কেননা তার উপাদানগুলি সরল। কিন্তু, এর গঠনরেখার জটিলতা নির্ভর করে গ্রামবাসীদের চোখে-দেখা জগতের বিস্তৃতির উপরে এবং সেই অভিজ্ঞতাকে সজীবভাবে রূপায়িত করার উপরে। এই কর্মধারার স্থায়িত্বের জন্য এই বিষয়গুলির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যদি কেউ এই শিল্পের রূপ এবং বিষয়বস্তুকে (Form-Content) আরো জটিল করে তোলেন — যার জন্যে খুব বিশেষ ধরনের পাকা হাতের প্রয়োজন— তা হলে এর অনুশীলনকারীর সংখ্যা সীমিত হয়ে পড়বে। যদি কেউ একে অতিরিক্ত নকশা-সচেতন করে তোলেন, তা হলে এটি এর সজীব সাবলীলতা হারিয়ে যন্ত্রের মতো নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে (এইরকমই ঘটেছিল কলাভবনের আলপনা-চর্চার ক্ষেত্রে)। একই অবস্থা হবে আমাদের ঐতিহ্যবাহী কারু ও চারু -কলাগুলির ক্ষেত্রে, যার উপযোগিতার ক্ষেত্র সীমিত এবং গঠনপ্রণালী ও শিল্পভাষাও সীমিত। এই শিল্পগুলি যদিও বেড়ে উঠেছিল আমাদের থেকে ভিন্ন এক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায়, তা হলেও সমন্বয় ও প্রসারের ক্ষেত্রে এরা এখনো যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। অবশ্য যদি আমরা এদের রক্ষা করার পরিকল্পনার সময় এই প্রাথমিক শর্তগুলির সম্পর্কে সচেতন থাকি। অনেক সময়েই দেখা গিয়েছে, বহু ক্ষমতাশালী কারুশিল্পী বিস্তৃততর এবং অধিকতর সুযোগসম্পন্ন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করার ফলে সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁদের যথার্থ স্থানটি হারিয়ে ফেলেছেন।

আজকের শিল্পশিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে নিজেদের স্থান ও কাজের পরিধি স্থির করে নিতে হবে সঠিকভাবে। কি ধরনের ছাত্রদের এরা গ্রহণ করবে? কিভাবে নির্ণীত হবে তাদের উপযোগিতা? কি ধরনের কাজের জন্য তাদের প্রস্তুত করা হবে? এই প্রস্তুতির প্রকৃতি কি হবে? কি ধরনের সংগঠন একে নিয়ন্ত্রণ করবে? এই ধরনের শিক্ষার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কি? এগুলি অসংখ্য প্রশ্নের মধ্যে মাত্র কয়েকটি। নিজেকে এই

প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। যদিও সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন।

এ কথা অবশ্যই ঠিক যে এই প্রশ্নগুলি নতুন নয়। প্রত্যেক শিক্ষাবিদই শুরুতে কতকগুলি লক্ষ্য সামনে রাখেন; কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌছনো নির্ভর করে তাঁদের বাস্তববোধ ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের উপর। ভারতবর্ষের প্রধান শিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

ভারতবর্ষের প্রথম আর্ট স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক শতাব্দীরও আগে। ডক্টর হাণ্টার নামে একজন চিকিৎসক এদেশের শিল্পের বৈচিত্র্য ও প্রসার দেখে বিস্মিত হয়ে ১৮৫০ সালে মাদ্রাজে কারু ও চারু -শিল্পের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি চেয়েছিলেন শিল্পের উন্নতির জন্য তাঁর পুরো সময় দিতে। যথেষ্ট অনুশীলন ও অনুসন্ধানের পরে তিনি এ কাজে প্রবৃত্ত হন। বোম্বাইতে ১৮৫২ সাল নাগাদ তাঁর উদ্যোগের কথা প্রচারিত হল। সেখানকার দুজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী— শেঠজী ফ্রামজী কাওয়াস ও শেঠ জামশেদজী জিজিবয়— আগে থেকেই এইরকম একটা ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করছিলেন। ১৮৫২ সালে ফ্রামজী মারা গেলেন, কিন্তু জামশেদজী এগিয়ে এলেন। তিনি বোম্বাই সরকারকে 'শিল্প ও উৎপাদনের' ('Art and Manufacture') একটি স্কুল খোলার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করলেন। কিছু পরিমাণ অনিশ্চয়তার সঙ্গে সরকার অনুদানটি গ্রহণ করলেন এবং সামান্য ইতস্তত করার পরে ১৮৫৭ সালে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। হাণ্টার এবং জামশেদজী উভয়েরই প্রধান দৃষ্টি ছিল দেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলির উপর, এবং উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল এগুলির পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নতিবিধান করা। এ কথা সকলেই জানেন যে ই. বি. হ্যাভেলের নেতৃত্বে ১৮৯৬ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে কলকাতার কারু ও চারু -কলা বিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করে একই ধরনের আন্দোলন গড়ে ওঠে। মাদ্রাজের পরীক্ষার অভিজ্ঞতা হ্যাভেলের ছিল। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল সাধু, পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে এঁদের জ্ঞানও ছিল গভীর। (হাণ্টার ও হ্যাভেল এই পারিপার্শ্বিককে জেনেছিলেন প্রচুর অনুশীলন করে, কিন্তু জামশেদজী নিজে বয়নশিল্পীর পুত্র ছিলেন বলে হস্তশিল্পের জগৎ ও হস্তশিল্প-ব্যবসায়ীদের চিনতেন সম্যকভাবে)। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও তাঁরা যে প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন করেন, বা স্থাপন করতে উৎসাহ দেন বা পরিচালনা করেন, সেগুলো তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্য পূর্ণ করতে পারল না। সেগুলো বেড়ে উঠল সম্পূর্ণ বিপরীত পথে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কোনোটিই পারল না ঐতিহ্যবাহী চারু ও কারু -শিল্পের জগৎকে পুনরুজ্জীবিত করতে, পারল না ঐ শিল্পের প্রকৃত গঠন-কুশলতা উপলব্ধি করতে। এই-সব ক্ষেত্রে তাদের ছোটোখাটো উদ্যমগুলি বরঞ্চ বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করল।

এরকম হল কেন? আজকের অভিজ্ঞতার ভূমি থেকে তাকিয়ে দেখলে সেদিনের ব্যর্থতার কারণগুলি অনুমান করা কঠিন নয়।

১. ভারতের ঐতিহ্যবাহী চারু ও কারু -শিল্পগুলির ছিল নিজস্ব অন্তরঙ্গ শিক্ষাকেন্দ্র ও নিজস্ব সহজাত শিক্ষাপদ্ধতি। নবীন শিক্ষার্থীরা শিল্পটির সঙ্গে ক্রমান্বয়ে পরিচিত হতেন বহু বছর ধরে শিক্ষকের সঙ্গে কাজ করে। এই পরিচয়ের পর্যায়গুলি ছিল — উপাদান থেকে যন্ত্র, যন্ত্র থেকে সহায়ক প্রক্রিয়াগুলি, তার পর নির্মাণকৌশল ও নকশা— মোটামুটি ধাপগুলি ছিল এইরকম। বর্তমানকালে কোনো বিদ্যালয়ে এই পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রায় অসম্ভব। সেরকম প্রত্যাশাও অবাস্তব। কেননা, সেকালের শিক্ষাপ্রণালী ছিল

যথেষ্ট জটিল, শিক্ষানবিশীর পর্বটিও ছিল দীর্ঘ-বিলম্বিত, তদুপরি সেদিনের কারুকর্মের সজীব পারিপার্শ্বিকটিও ছিল অনন্য।

২. যে-সমস্ত শিক্ষকেরা এই-সব প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন, তাঁদের ভারতের কারুশিল্প সম্পর্কে হয়তো শ্রদ্ধার অভাব ছিল না, কিন্তু এই শিল্পের চরিত্র ও গঠন সম্পর্কে তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি ছিল কম। তাই এই শিল্পের বিশেষ গুণগুলিকেই অনেক সময় তাঁরা ত্রুটি মনে করতেন এবং অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের দ্বারা বরং ক্ষতিসাধনই করতেন।

৩. দেশে যে নতুন ঐতিহ্য-চ্যুট সমাজের উদ্ভব ঘটছিল শহরগুলিকে কেন্দ্র করে, সেই নতুন সমাজ নতুন নতুন শিল্প-চাহিদার জন্ম দিচ্ছিল, যেমন— কাহিনীচিত্রণ (Illustration), খোদাই-কাজ (Engraving), ফোটোর কাজ, পোর্ট্রেট-অঙ্কন ইত্যাদি। ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পীর পক্ষে সে চাহিদা মেটানো সহজে সম্ভব হচ্ছিল না। যে ছাত্রছাত্রীরা এ-সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে এল, স্বভাবতই তারা প্রকাশ ও প্রণালীর নতুন মাধ্যম খুঁজতে লাগল।

সে যাই হোক এই স্কুলগুলি এক শতকের বেশি সময় ধরে দেশে বর্ধিত হয়েছে। নিজের নিজের মতো পথে ও পদ্ধতিতে আধুনিক ভারতের শিল্পজগতে তারা যা দান করেছে, সে দানের পরিমাণ খুব কম নয়। কিন্তু, এদের দানের মূল্যায়ন করতে হবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে— যে বিষয়গুলির কথা মুখবন্ধে আগেই বলা হয়েছে :

—তারা শিল্পকৌশলগুলিকে সজীব রাখতে পেরেছে কিনা, তার ধারাবাহিকতাকে পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত করে দিতে পেরেছে কিনা, তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে এবং তার উপযোগিতা বাড়াতে পেরেছে কিনা ;

—তাদের কর্মসূচী দেশের সমগ্র শিল্প-জগতকে স্পর্শ করতে পেরেছে কিনা এবং দেশের শিল্পবোধের প্রসার ঘটাতে সাহায্য করতে পেরেছে কিনা ;

—তারা আমাদের অস্তিত্বের উৎকর্ষসাধন করতে পেরেছে কিনা।

এই মানদণ্ডে বিচার করলে অধিকাংশ বিদ্যালয়ই অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এদের অধিকাংশের কর্মসূচীই কলাকৌশলের মান তেমন উন্নত করতে পারে নি, আমাদের অস্তিত্বের উৎকর্ষ-সাধনেও বিশেষ যত্নবান হয় নি। এদের অধিকাংশই পেশাদারী কাজের অত্যন্ত সংকীর্ণ এক পরিধিতে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছে। বৃহত্তর শিল্পজগতের সঙ্গে তাদের সংযোগ খুব কম। এমন-কি, তাদের অত্যন্ত নিকটবর্তী পারিপার্শ্বিকের সঙ্গেও তাদের যোগ যৎসামান্য। অধিকাংশ বিদ্যালয়ই তাদের ছাত্রদের মনে শিল্প ও প্রকাশের মূল সমস্যাগুলি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন জাগিয়ে তুলতে উৎসাহ দেয় না। তাদের উদ্যমের প্রধান অংশ ব্যয় হয় শিল্প-পণ্যের বাজারে কতকগুলি চতুর পেশাদারী ব্যক্তি তৈরির কাজে। এ কথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে এর মধ্যেও কিছু শ্রদ্ধেয় ব্যতিক্রম আছে।

একই ভাবে আমরা শিল্পের ক্ষেত্রে অন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠানকে পরীক্ষা করতে পারি, বিশেষত যে বিকল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল ঠাকুরবাড়ির প্রভাবে। (বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আধুনিক চিত্রশিক্ষা' গ্রন্থে অত্যন্ত অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতি -সহকারে এর বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে অনেক তথ্যের জন্য আমি তাঁর উপরেই নির্ভর করেছি।) জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের এই বিকল্প খোঁজার প্রচেষ্টার পিছনে ছিল সমসাময়িক বিদ্যালয়গুলির সম্পর্কে তাঁদের অসন্তুষ্টি। কারু ও চারু -কলার যে বিদ্যালয়গুলির

কথা বলা হল, তারা সকলেই ঝুঁকেছিল ইয়োরোপীয় বিধিবদ্ধ তাত্ত্বিকতার (Academicism) দিকে এবং তাদের শিক্ষাপ্রণালী হয়ে উঠেছিল অনমনীয় ও নৈর্ব্যক্তিক। দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতাও তাদের মধ্যে ক্রমশ কমে এসেছিল। ঐতিহ্যবাহী শিল্পের কেন্দ্রগুলি নিজেরাই ক্ষয়ে আসছিল এবং ক্রমশ অলংকরণ-বাহুল্যকে প্রশ্রয় দিচ্ছিল। ঠাকুররা এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে বিকল্প হিসেবে কোনো একটা দেশজ কর্মধারা গড়ে তুলতে চাইলেন। সে কর্মের প্রকৃত রূপরেখা সম্পর্কে তাঁরা নিজেরাও খুব নিশ্চিত ছিলেন না। তাঁরা শুধুমাত্র একটি বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন— নতুন শিল্পীকে তাঁর দেশের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক অতীত সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং প্রয়োগকৌশল সম্বন্ধে তাঁর অতিরিক্ত মনোযোগী হওয়া চলবে না। এর থেকে বোঝা যায় কেন রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ দুজনের কেউই কোনো সুনির্দিষ্ট এবং বিধিবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী প্রস্তুত করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রমে শিল্পকে একটি বিশেষ স্থান দিতে চেয়েছিলেন, কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন শিল্প হল 'অসীম'কে জানার অন্যতম উপায়। সাধারণভাবেই তিনি ধ্যানের উপর এবং প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগের উপর খুব জোর দিয়েছেন। যদি আমরা তাঁর ছবি সম্বন্ধে তাঁর নিজের মতামত গ্রহণ করি তা হলে দেখব যে, তিনি মনে করতেন ছন্দ ও শৃঙ্খলা প্রত্যেক সৃজনশীল ব্যক্তির সহজাত ধর্ম এবং এর প্রকাশ ঘটে যখন পারিপার্শ্বিক তার সহায়ক হয়। শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে এইরকম পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করতে হবে। অবনীন্দ্রনাথের মতামত এ ব্যাপারে আরো স্পষ্ট। তিনি মনে করেন, ঈশ্বরের ঐশ্বর্যে মানুষের মনে যে সাড়া জাগে তারই নাম শিল্প— শিল্প হল ঈশ্বরের মহিমার সংস্পর্শে মানুষের আপন মহিমার প্রকাশ। প্রত্যেক শিল্পীর পথ হবে নিজস্ব। নিয়মকানুন তার খুবই ছোটো একটা অংশ। শিল্পের বহিঃপ্রকাশ হল 'অবাধ সীমাহীন আনন্দ'। তিনি মনে করতেন, শিল্পীকে তাঁর কাজে এবং অভিজ্ঞতায় গভীরতা ও বোধ সঞ্চার করতে হলে তাঁকে তাঁর নিজের দেশের ঐতিহ্যকে জানতে হবে। তিনি তাঁর ছাত্রদের প্রাচীন মহাকাব্য ও সাহিত্য পাঠ করতে উৎসাহ দিতেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী ছিল না। তিনি তাঁর ছাত্রদের প্রেরণা দিতেন তাঁর বৈচিত্র্যময় ও বহুমুখী ব্যক্তিত্বের দ্বারা। কিন্তু তাদের সিদ্ধির মাপকাঠিকে তিনি সুনির্দিষ্ট করে বেঁধে দেন নি। সুতরাং, যদিও তাঁর প্রথম দিকের ছাত্রেরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিল্পবিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, মাপকাঠির এই অনির্দিষ্টতা তাদের প্রভাবকে কিছুটা দুর্বল করে দিয়েছিল।

যদিও রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ উভয়েই ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন, তা হলেও ভারতের শিল্প-ঐতিহ্যের বিষয়ে তাঁদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। ভারতের শিল্প-ঐতিহ্যের বহু ক্ষেত্র তাঁদের মনে নাড়া দেয় নি। বহু ক্ষেত্র সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। অবশ্য এটা তাঁদের ক্ষেত্রে একটা বড়ো ত্রুটি হয়ে উঠতে পারে নি। তার কারণ তাঁরা শিল্পীর সত্তার উপর এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তার সচেতনতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। সে সচেতনতা রোমান্টিক ধরনের হলেও আপত্তি নেই। ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য সম্পর্কে যথার্থ সচেতনতার সৃষ্টি নন্দলাল বসুর থেকে। তখনকার শিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি আমাদের ঐতিহ্যের সমস্ত স্তর ও সমস্ত ধারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন এবং যথার্থ সংবেদনশীল। তিনিই সর্বপ্রথম যিনি একটি বিকল্প শিল্প-শিক্ষাক্রম উদ্‌ভাবন করেন। যদিও তাঁর জীবনের শেষদিকে সে প্রণালী কিছুটা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এ কাজে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ,

কুমারস্বামী,ওকাকুরা ও গান্ধী তাঁর সামনে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন। এঁদের প্রথম দুজন সৃজনশীলতার সঙ্গে সৃজনশীল ব্যক্তির সম্পর্কের বিষয়ে তাঁর ধারণা স্পষ্ট করে দেন। কুমারস্বামী তাঁকে শিখিয়েছিলেন সৃষ্টিব্যাপারের সামগ্রিক রূপরহস্যকে ধ্যানদৃষ্টিতে ধারণ করতে। গান্ধী তাঁর উৎসাহ জাগিয়ে তোলেন বিভিন্ন গ্রামীণ শিল্পের ভাষাকে বুঝতে এবং সেই শিল্পকে চিনতে— প্রচলিত অর্থে যা শিল্প বলেই স্বীকৃত নয়। ওকাকুরা তাঁর কাছে উপস্থাপন করেন এমন এক শিক্ষাপ্রণালী যাতে ঐতিহ্য সম্পর্কে অনুশীলন, প্রকৃতির অনুশীলন এবং ব্যক্তিত্বের প্রকাশ একটি ত্রিভুজাকার সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত। নন্দবাবুর শিক্ষা-দর্শন ওকাকুরার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তিনি ওকাকুরার মতোই বিশ্বাস করতেন, ঐতিহ্যের অনুশীলন ব্যতীত শিল্প অপরিপক্ক ও মূল্যহীন হবে; প্রকৃতির অনুশীলন ব্যতীত হবে একঘেয়ে ও অনুকরণ-প্রবণ; বিশ্বাস করতেন যে, শিল্পদৃষ্টির স্বকীয়তা ব্যতীত শিল্প তার মৌল সত্যতা থেকে ভ্রষ্ট হবে।

গোড়ার দিকে নন্দবাবুর দিগন্ত ছিল প্রসারিত। তিনি ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন তাদের নিজ নিজ প্রবণতা অনুযায়ী কাজ করতে। ত্রিশের দশকে তাঁর ছাত্র বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্কর বেইজ কলাভবনে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন। বিনোদবাবুর ছিল তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণধর্মী মননশক্তি এবং কিঙ্করবাবুর ছিল উত্তপ্ত রোমান্টিক উদ্‌বেজনা। এবং উভয়ে তাঁরা একত্রে কলাভবনের সুনামের প্রধান স্রষ্টা।

যে-সব জায়গায় অবনীন্দ্রনাথের ছাত্ররা শিল্প-শিক্ষক হিসেবে গেলেন, সেখানে কেন তাঁরা যথার্থ প্রভাবের ক্ষেত্র গড়ে তুলতে পারলেন না? তার বদলে সে-সব জায়গায় কেন তাঁরা ঢিলে-ঢালা অপেশাদারী কাঁচা রোমান্টিক ধরনের ছবির প্রচলন ঘটালেন? কলাভবনের শিক্ষাদর্শ ছিল নির্ভুল, তার শিক্ষাপরিবেশ ছিল উন্মুক্ত, এমন যা একালের যে-কোনো শিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গৌরবজনক বলে গণ্য হতে পারে, তা সত্ত্বেও কেন কলাভবন তার গৌরবময় দিনগুলোতেও নিজেকে একটি আদর্শ বিকল্প-প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলতে পারল না— যদিও কিছু খ্যাতিমান ছাত্র এখান থেকে বেরিয়েছিল ঠিকই— এ-সব সত্ত্বেও কেন কলাভবন আদর্শ একটি বিকল্প-প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারল না? এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না। অবনীন্দ্রনাথের ছিল বহুমুখী প্রতিভা— তিনি ছিলেন ক্ষমতাবান লেখক, শিল্পী, অভিনেতা, চিন্তাশীল এবং মজলিশী ব্যক্তি। তা হলেও তিনি তাঁর ছাত্রদের কোনো নির্দিষ্ট পথ বাৎলে দিয়ে যান নি কাজ করার। তাঁর ছাত্রদের তাঁর মতো বহুমুখিতা ছিল না। তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিও ছিল তাঁর তুলনায় অনেক কম। তার ফলে যখন তাঁরা তাঁর প্রভাব থেকে দূরে গেলেন, তখন অবধারিত ভাবেই তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়লেন। নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য না থাকায় তাঁরা রোমান্টিক কল্পনাবিলাসের জগতে বিচরণ করতে লাগলেন। তাঁরা ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের কোনো অংশের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখেন নি এবং স্বভাবতই এর ফলে তাঁরা বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পারেন নি। (ওকাকুরার সাবধান বাণী এ ক্ষেত্রে অতি সত্য)। যেহেতু তাঁদের অধিকাংশই কাজ করতেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে, তাঁরা অনেক সময় প্রভাবিত হতেন সেখানকার সুযোগ্য শিক্ষকদের দক্ষতার দ্বারা এবং ঐ-সব বিশেষ ক্ষেত্রে প্রবেশ করার খানিকটা চেষ্টাও তাঁরা করতেন। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী বা সমসাময়িক

যাই হোক্-না কেন, পেশাদারী শিল্পের জগতে তাঁদের অধিকার ছিল অত্যন্ত কম। কাজেই এ-সব ক্ষেত্রে তাঁদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত সীমিত।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব কিছুটা জটিল। শিল্পী হিসেবে নন্দবাবুর স্থান বিতর্কের উর্ধ্বে। স্বল্পভাষী হলেও তিনি ছিলেন গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, এবং অত্যন্ত সজীব একটি মনের অধিকারী। সরলই হোক আর জটিলই হোক, শিল্পের সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে ছিল তাঁর অদম্য কৌতূহল, এবং প্রতিটি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ছিল তাঁর অসীম ক্ষমতা। এবং, আগেই বলা হয়েছে, তাঁর যোগাযোগ ছিল তৎকালীন পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল মানুষের সঙ্গে। যেমন— রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, কুমারস্বামী, ওকাকুরা ও গান্ধী। বিনোদবাবু নিশ্চয়ই মনে করতে পারেন যে, এই আপাত সুবিধাগুলি তাঁর পক্ষে অসুবিধাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁকে বিভক্ত হতে হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের আদর্শের টানে, বিভিন্ন ধরনের আদর্শের কাছে আনুগত্য স্বীকার করার ফলে, যেমন রবীন্দ্রনাথের, অবনীন্দ্রনাথের, কুমারস্বামীর ও গান্ধীর আদর্শ। তিনি আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন প্রথম দুজনের সর্বজনীন ও উদারনৈতিক আদর্শের কাছে, আবার আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন কুমারস্বামীর একান্তভাবে ঐতিহ্যবাদী আদর্শের কাছে, এবং সেইসঙ্গে গান্ধীর জাতীয়তাবাদী আদর্শের কাছেও। এগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী। নন্দলাল প্রতিটি মতকেই সমান আকর্ষণীয় মনে করতেন, এবং এগুলির উৎকর্ষের ক্রমনির্ণয় করতে গিয়ে নিজের স্বাভাবিক উদারদৃষ্টিকে খর্ব ও সীমিত করে আনেন। তাঁর শিক্ষাপ্রণালীতে প্রথম দিকে যে উন্মুক্ততা ছিল তা ক্রমে দেশজ কারু ও চারু-শিল্পের গতানুগতিক জপমালায় পরিণত হল।

এর একটি প্রধান কারণ নিহিত ছিল তাঁকে ও তাঁর সহকর্মীদের যে-ধরনের ছাত্রদের নিয়ে কাজ করতে হত, তারই মধ্যে। প্রথম দিকে শান্তিনিকেতন ছিল গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত, অতিমাত্রায় প্রচলিত রীতিনীতির বিরোধী, কবির কল্পনাপ্রসূত একটি প্রতিষ্ঠান। তা শুধু বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ছাত্রদেরই আকৃষ্ট করত, এরা হল সেই জাতের ছাত্র যারা অন্যান্য বিদ্যালয়ের নৈর্ব্যক্তিক শিক্ষাপ্রণালী যৎপরোনাস্তি অপছন্দ করত। যারা সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী চলতে চাইত। এরা এমন একটি স্থান খুঁজত যেখানে তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করবে এবং সংস্কৃতি বিষয়ে তাদের বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র প্রশ্নসমূহের সমাধান মিলবে। কিন্তু কলাভবনের সুনাম যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল, এবং ক্রমে যতই সকলে বুঝতে পারল যে, এটি ছিটগ্রস্ত তাত্ত্বিকদের একটি নিভৃত আখড়া নয়, ততই বিভিন্ন-রকমের ক্ষমতাসম্পন্ন ছাত্ররা এখানে আকৃষ্ট হতে লাগল। নবীন শিক্ষার্থীরা এখানে এল এখানকার স্বাধীন, উন্মুক্ত পরিবেশকে উপভোগ করতে এবং সাধারণ ভাবে সংস্কৃতিসম্পন্ন হয়ে উঠবার আকাঙ্ক্ষায়। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে আগ্রহ, উদ্যম ও ক্ষমতার তারতম্য ছিল। যদিও কিছুসংখ্যক ছাত্রের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও দায়িত্ববোধ যথেষ্টই ছিল, তা হলেও অধিকাংশই ছিল অন্যের দ্বারা পরিচালিত হবার মতো। এর ফলে কার্যক্রমের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠল। আগেকার ব্যক্তিগত উন্মুক্ত কার্যক্রমের পরিবর্তে সৃষ্টি হল নৈর্ব্যক্তিক ছকে-বাঁধা শিক্ষাপ্রণালীর। এই সবকিছুর মূলে ছিল ছাত্রভর্তির ব্যাপারে কোনোরকম শিক্ষাগত যোগ্যতা পরীক্ষার অভাব। নন্দবাবুর কেমন একটা রোমান্টিক বিশ্বাস ছিল যে, শিক্ষিত ছাত্ররা শিল্পী হিসেবে ততটা ভালো হবে না, যতটা হবে অশিক্ষিতরা, কেননা শিক্ষিতরা— তিনি মনে করতেন— হয়তো ইতিমধ্যেই যান্ত্রিক চিন্তা ও তাত্ত্বিক জড়তার শিকার হয়ে পড়েছে। তাঁর এই

বিশ্বাস যদি গ্রামীণ প্রতিভাকে আকৃষ্ট করে নিয়ে আসতে পারত, তা হলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু তা তো হলই না, উপরন্তু তিনি যে কারুশিল্প শিক্ষার কোর্স চালু করলেন, তাও দেশের সজীব কারুশিল্প ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারল না। সাধারণ মধ্যবিত্ত তার অবসরবিনোদনের জন্য যে ধরনের ও যে মানের কারুশিল্পের চর্চা করে, এই ছাত্রদের কাজের মান তার থেকে বিশেষ উঁচু হল না। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অবদমন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবের ফলে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে শিল্প-ঐতিহ্য ও শিল্প-সমস্যা সম্বন্ধে গভীর কৌতূহলের ও আগ্রহের উদ্রেক ঘটল না।

এ ছাড়া, সমস্ত রাবীন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানই প্রধানত ব্যাপৃত ছিল জ্ঞান ও তার আদান-প্রদানের চূড়ান্ত বিকাশের কাজে। এই আলোকে কলাভবনও প্রথমে গড়ে উঠেছিল সৃজনশীল শিল্পীর জন্য এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়ে। এখানে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও বিদ্যালয়ের সাহায্যে কালক্রমে সে নিজেকে খুঁজে নিতে পারবে। পেশাদারী শিল্পী হওয়াটা লক্ষ্য ছিল না। বিশ্বাস ছিল, যে-শিল্পী নিজেকে যথার্থ খুঁজে পেয়েছে, সে যে-কোনো পেশাদারী কাজ সন্তোষজনকভাবে করতে পারবে, বেশি অসুবিধা ঘটবে না। কিন্তু বিভিন্ন শিল্পের (Visual এবং Performing— দুরকমই) ব্যাপার এমনই যে সেখানে ব্যক্তিগত সৃজনশীলতা ও পেশাদারী দক্ষতা একত্রে মেলানো। নন্দবাবু এই সত্যটি জানতেন বলেই মনে হয়; তাঁর শিক্ষা-চিন্তায় কোথাও এর স্থান নিশ্চয়ই ছিল। তিনি একে কোনো পরিণতি দেন নি। খাঁটি পেশাদার যিনি, তাঁর তো কতকগুলি মৌল কুশলতা থাকতেই হবে, কাজের সম্পর্কে কতকগুলি শৃঙ্খলা ও বিধি-বিধানও তাঁকে রাখতেই হবে। কলাভবনে এ ব্যাপারে কিছুই করা হল না। লক্ষ্য-সচেতন ছাত্ররা তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারাই সমস্ত প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হবে এই ভরসায় সব-কিছু তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু সময়ের দ্বারা সীমিত একটি কার্যক্রমে লক্ষ্য-সচেতন ছাত্রদের পক্ষেও এটা খুব অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াল। এ ক্ষেত্রে যারা তেমন লক্ষ্য-সচেতন নয়, সেই-সব সাধারণ ছাত্রদের কাছ থেকে কি আর আশা করা যাবে!

এটি একটি দুঃখজনক পরিস্থিতি। নন্দবাবুর মৌলিক শিক্ষাভাবনা আজও সমান সজীব এবং সমান উপযোগী আছে। ডিগ্রি-ডিপ্লোমা ও পরীক্ষাব্যবস্থার কড়া নিয়মকানুনকে বাতিল করে দিয়ে যে স্বাধীন ও উন্মুক্ত পরিবেশ তিনি এখানে সৃষ্টি করেছিলেন, তা যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আজও আদর্শস্বরূপ।

যে ত্রুটিগুলির কথা বলা হল সে-সব সত্ত্বেও, ভারতীয় শিল্প-শিক্ষাজগতে কলাভবনের দান কম নয়। কলাভবন খুব বড়ো একটা কাজ করেছে— কতকগুলি রুদ্ধ দ্বার সে খুলে দিয়েছে। শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে কলাভবন এক বৃহত্তর দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছে। কলাভবন সৃজনশীল চিন্তাকে জাগ্রত করে দিয়েছে।

যে-সব ছাত্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা কলাভবনের পূর্বকথিত সীমাবদ্ধতাগুলিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল, তাদের উপর কলাভবনের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সুতরাং ১৯৪৯ সালে যখন বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও বিশ্ববিদ্যালয় কারু ও চারু -কলাবিভাগ খোলার পরিকল্পনা করলেন, তখন তাঁর সামনে ছিল কলাভবনের উদাহরণ। ভারতবর্ষের একটি গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর মধ্যে একটি পেশাদারী শিল্প-শিক্ষার কর্মসূচী এই প্রথম চালু হল। এই কর্মসূচীর পরিকল্পনা করা হয়েছিল মৌলিক শিল্পকুশলতায় ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার এবং পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্প-ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের পরিচিত করার লক্ষ্য

সামনে রেখে। এইসব শিল্প-ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা দেওয়া হত শিল্প-ইতিহাস ও শিল্প-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে। কিন্তু ছাত্রদের স্বাধীনতা দেওয়া হত তাদের ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুযায়ী নিজের নিজের পথ খুঁজে নিতে। আবার সেইসঙ্গে এও আশা করা হত যে, ছাত্ররা তাদের পথ-নির্বাচন সম্পর্কে যুক্তিসংগত কারণ দেখাতে পারবে। এই কর্মসূচীতে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সচেতনতার উপর জোর দেওয়া হয় এবং চেষ্টা করা হয় যাতে প্রাচীন অর্থাৎ ঐতিহ্যবাহী শিল্পী এবং আধুনিক শিল্পী— এই দুই গোত্রের শিল্পীরাই বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে ফিল্ড সার্ভের মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে তাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ হিসেবে এই বিদ্যালয়ের গঠন ছিল গতানুগতিক। কিন্তু যাতে এর আসল কাজকর্মের দিকগুলি বেশ খোলামেলা ও স্থিতিস্থাপক থাকে, সে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। শিক্ষাসমিতি (Board of Studies) প্রতি বছর এর শিক্ষাক্রমগুলি (Courses) পর্যালোচনা করে তার উপযোগিতা নির্ণয় করত এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও নূতন প্রণালীর সঙ্গে পরিচয় ঘটাত। এই শিক্ষাসমিতি প্রত্যেক শিক্ষককে সুযোগ দিত নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে নিজের পছন্দমত শিক্ষাপ্রণালী স্থির করতে। ছাত্রভর্তির ব্যাপারে যোগ্যতা বাছাই করা হত। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে নিকট সম্পর্ক যাতে গড়ে ওঠে তার সুযোগ দেওয়া হত। ছাত্রদের পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল সহজ ও উদার এবং যথাসম্ভব নির্দোষ।

এই-সব ব্যবস্থা বা দৃষ্টিভঙ্গির কিছুই নতুন নয়। এর অধিকাংশই কলাভবনের প্রথম যুগে প্রবর্তিত হয়েছিল। যেমন, প্রাচীন ও সমসাময়িকের মধ্যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা। কলাভবনের সঙ্গে প্রধান পার্থক্য ছিল বোধ করি এইখানে যে, বরোদায় শিল্প-ইতিহাস ও শিল্প-প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দেওয়া হত এমন একটি কোর্সে, যেখানে পেশাদারী ও সৃজনশীল ধারা একই সঙ্গে প্রবহমাণ থাকবে (এই আশায় যে, সে ক্ষেত্রে, পেশাদারী ধারাগুলি অতিরিক্ত সমস্যাকেন্দ্রিক হতে পারবে না। আবার সৃজনশীল ধারাগুলিও অতিরিক্ত ব্যক্তিগত ও কূপমণ্ডুক হয়ে উঠবে না); এবং এমন একটি শিক্ষা-পরিবেশ গড়ে উঠবে যা স্বাধীনতাকে দায়িত্ববোধের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবে।

এই প্রণালী কার্যকর হয়েছে এবং কিছু পরিমাণে সার্থকও হয়েছে; এবং বিশ্বভারতী সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চারু ও কারু -কলাবিভাগের কার্যক্রম-পরিকল্পনায় এর কিছুটা প্রভাবও পড়েছে।

কিন্তু প্রত্যেক ব্যবস্থারই ক্রমাগত সমীক্ষা ও পর্যালোচনা প্রয়োজন। শিল্পশিক্ষা সম্পর্কে এক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিনোদবাবু যে কথা বলেছেন তা তাঁর অস্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচয় দেয়। তিনি এ বিষয়ে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, বরোদায় যে-শিক্ষাপ্রণালী সার্থক হয়েছে, অন্যত্র চালু হলে তা সহজেই কঠিন ও অনমনীয় হয়ে পড়তে পারে।

এরকম অবশ্যই ঘটতে পারে। সব ব্যবস্থাই ফল-কেন্দ্রিক (Result-oriented) হয়ে পড়তে চায় সময় ও কার্য -সূচীর চাপে। আজকের দিনের প্রতিযোগিতামূলক শিল্প-জগৎ এই প্রবণতাকেই প্রশ্রয় দেয়। আজকের প্রতিযোগিতামূলক শিল্পজগতে যথার্থ অনুসন্ধান ও আন্তরিক প্রচেষ্টার চেয়ে বস্তুর চমক-লাগানো নতুনত্বকেই বেশি বাহবা দেওয়া হয়। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকরা নতুন পথ অনুসন্ধানের চেয়ে ছাত্রদের গতানুগতিক পথে চলতেই বেশি উৎসাহ দিয়ে থাকেন। অধিকাংশ ছাত্রই অপরের কাছ থেকে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করাকেই সহজতর পথ বলে মনে করে। যে-কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই সতর্ক হতে

হয় যাতে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এই নিষ্ক্রিয়তা গজিয়ে উঠতে না পারে। বিশেষত শিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, যেখানে ব্যক্তিগত সচেতনতা ও সৃজনশীলতার স্থান এত বেশি, সেইখানেই এটা বিশেষ জরুরি। এটা করার সর্বাপেক্ষা কার্যকর উপায় হল শিক্ষাদান ও বিদ্যাকে যতদূর সম্ভব ব্যক্তিকেন্দ্রিক করা এবং এইভাবে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই উদ্যোগ ও কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা। একই সঙ্গে নজর রাখা যাতে ছাত্ররা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং কুশলতাও অর্জন করে। যথাযথ ফল পেতে হলে এর জন্য প্রয়োজন হবে আরো সুচিন্তিত শিক্ষাদান-পরিকল্পনা, গবেষণার ক্ষেত্রে এবং শিল্পশিক্ষার হাতে-কলমে কাজ শেখার ক্ষেত্রে বিস্তৃততর সুযোগ সুবিধা।

কিন্তু সমস্ত কিছুর আগে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল (যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে) সমাজে সৃজনশীলতার বীজ বপন করা, যাতে সমাজের সমস্ত কর্মকাণ্ড সজীব ও বর্ধিত হয় গুণে ও পরিমাণে। এর জন্য দরকার এমন একটি বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতের যার মধ্যে গোটা অবস্থা এবং প্রতিটি বিভাগের চেহারা একসঙ্গে ধরা পড়ে। সমস্ত কর্মকাণ্ড যদি সরাসরি এই শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় না পড়ে তা হলেও এটা দরকার। আজকের দিনে শিল্পের পরিধির মধ্যে পড়ে সেই-সব পেশাদারী ক্ষেত্র, যেগুলি সব উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রেই কারু ও চারু-কলার শিক্ষাক্রমে বর্তমান। যেমন, ১. সৃজনশীল শিল্প (চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, গ্রাফিক-শিল্প এবং এদের বিভিন্ন উপ-বিভাগ); ২. নকশা ও যোগাযোগের শিল্প (গ্রাফিক-নকশা, বই-নকশা, দৃষ্টিনির্ভর যোগাযোগের নকশা, ফিল্ম, উৎপাদনের নকশা, পরিবেশ-নকশা ইত্যাদি) এবং এ ছাড়াও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নকশা; ৩. কারুশিল্প, হস্তশিল্প ও ঐতিহ্যগত শিল্প, এবং ৪. গ্রামীণ ও উপজাতির শিল্প। আমাদের মতো যে দেশ নিতান্ত আংশিকভাবেই যন্ত্র-সভ্যতার আওতায় পড়ে, সে দেশে শেষ দুটির উপস্থিতি যে উল্লেখযোগ্য হবে এটা স্বাভাবিক। বস্তুত এটা সন্তোষজনকও। কেননা এগুলির মধ্যে থেকেই জন্মায় দক্ষ কারিগরি কুশলতা, যা হল সমস্ত শিল্পের একেবারে গোড়ার ধাপ, এবং যা শিল্পের ভাষাকে দান করে গাম্ভীর্য ও গভীরতা। বর্তমানকালের আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মসূচীতে হয়তো সরাসরিভাবে এগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। (কি কারণে তা আগেই বলা হয়েছে)। কিন্তু এগুলির সঙ্গে সংযোগ রাখলে তাদের প্রভূত উপকার হবে। এই সংযোগ গড়ে তোলা যাবে পর্যবেক্ষণ, ডকুমেন্ট-রচনার কাজ, স্থানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওয়ার্কশপ-পরিকল্পনা এবং গবেষণার সাহায্যে। গবেষণা করতে হবে এদের কর্মপ্রণালী, সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং সহনশীলতা সম্বন্ধে। এর ফলে শুধুমাত্র বর্তমান শিক্ষার্থীরাই উপকৃত হবেন না, উপকৃত হবেন এই-সব শিল্পের কারিগররাও এবং শিল্পের কেন্দ্রসমূহও, বজায় থাকবে এদের গুণগত বৈশিষ্ট্য, অটুট থাকবে এদের মৌল সত্যতা। প্রথম দুটি বিভাগ আজকাল অধিকাংশ শিল্প-বিদ্যালয়েই শিক্ষা-ক্রমে স্থান পেয়েছে (যদিও এখনো নিতান্ত আংশিকভাবেই)। এ ছাড়া, শিল্প-শিক্ষাদান— অথবা ছোটোদের, যুবক-যুবতীদের ও সাধারণ মানুষকে শিল্প-প্রক্রিয়ায় দীক্ষিত করা ও শিল্পবোধ সম্পর্কে সচেতন করা— এই হবে কাজের প্রধান ক্ষেত্র। শিল্প-ইতিহাস ও বিশ্লেষণ হবে এই ব্যবস্থার সাহায্যকারী হিসেবে প্রত্যেক বিভাগের পক্ষে সহগামী শিক্ষণীয় বিষয়।

যে-কোনো সঠিক শিল্পশিক্ষা-পরিকল্পনাকে এই সমস্ত বিভাগের প্রত্যেকটিকেই যথাসম্ভব সংযুক্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। এ অন্তর্ভুক্তি স্থানীয় অবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে।

পরিকল্পনাটি এইভাবে করা যেতে পারে :

স্জনশীল শিল্পের যে-কোনো কর্মসূচীতে থাকবে—

ক. পূর্ববর্তী শিল্পকলা সম্পর্কে শিক্ষা ;

খ. পারিপার্শ্বিক থেকে শিক্ষা ;

গ. শিল্প-মাধ্যম সম্পর্কে শিক্ষা।

এদের প্রত্যেকটিকেই যুক্ত করতে হবে ছাত্রদের ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতার সঙ্গে, এবং এ-সমস্তকে সম্পূরণ করবে শিল্প-ইতিহাস ও বিশ্লেষণ, সাধারণ শিল্প-পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে অনুশীলন ও জ্ঞান। একই ভাবে, যোগাযোগের শিল্প-শাখাগুলির (Communication Arts) কর্মসূচীতে থাকবে—

ক. দৃষ্টির ভাষা সম্পর্কে শিক্ষা ;

খ. পারিপার্শ্বিক থেকে শিক্ষা ;

গ. মাধ্যম-নক্শা (Media Design) ও মাধ্যম-কারিগরি (Media Technique) সম্পর্কে শিক্ষা।

এই কর্মসূচীর সম্পূরণ হবে শিল্প-ইতিহাস, শিল্প-পরিবেশ ও স্জনশীল শিল্প সম্পর্কে শিক্ষার দ্বারা।

নক্শা-সংক্রান্ত যে-কোনো কর্মসূচীতে থাকবে—

ক. পারিপার্শ্বিক থেকে শিক্ষা ;

খ. ব্যাবহারিকতা-বিশ্লেষণ (Function-analysis), কর্মপ্রণালী, কর্মসংগঠন, প্রযুক্তি ও কারিগরি কুশলতার বিশ্লেষণ ও তৎসম্পর্কিত জ্ঞানলাভ ;

গ. শিল্প-বিষয়ে আমাদের চাওয়া এবং তার পরিতৃপ্তির সম্পর্কে জ্ঞানলাভ।

এই কর্মসূচীর সম্পূরণ হবে স্জনশীল শিল্প, শিল্প-ইতিহাস ও শিল্প-পরিবেশ সম্বন্ধে অনুশীলনের দ্বারা।

ছাত্রদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকেও উৎসাহ দিয়ে তাদের রুচি ও প্রবণতাকে স্থান দেবার জন্য এই কর্মসূচীগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে :

১. মূল বা কেন্দ্রীয় কর্মসূচী (The Core Project)— এর জন্য ছাত্রকে তার শিক্ষকের সঙ্গে বসে নিজের পছন্দমত পথ বেছে নিতে হবে এবং সে পথে চলবার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কুশলতা অর্জন করে নিতে হবে। এর ফলে যে কাজের সৃষ্টি হবে, সেটাই হবে তার শিক্ষার ভিত বা আকর। এরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে তার নিজের মৌলিক সৃষ্টি কর্ম ও তৎসহ ঐতিহ্যবাহী আদর্শ বা পরম্পরাগত মডেল থেকে শিক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ ও কারিগরি-কুশলতা সম্পর্কে অনুশীলন।

২. আনুষঙ্গিক বিষয়ের কুশলতা-শিক্ষা— এগুলির উদ্দেশ্য হল ছাত্রদের কাজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার বাড়িয়ে তোলা এবং তাদের পেশাদারী দক্ষতার উন্নতি সাধন করা। এর মধ্যে কতকগুলি হয়তো কেন্দ্রীয় কর্মসূচী থেকে উদ্ভূত হতে পারবে। যদি তা নাও হয়, তা হলেও ছাত্রদের গড়ে তুলতে হবে বিভিন্নরকম গ্রাফিক, কারিগরি ও দৃষ্টিকেন্দ্রিক কাজের দক্ষতা।

৩. উপাদান-উপকরণ সম্পর্কিত শিক্ষা— এগুলির উদ্দেশ্য ছাত্রদের দৃষ্টির, তাদের পরিপ্রেক্ষিতের প্রসার সাধন এবং শিল্প পরিবেশ সম্পর্কে, কি ঐতিহ্যবাহী শিল্প, কি সমসাময়িক শিল্প— দুয়েরই উপাদান-উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান বাড়িয়ে তোলা। এর মধ্যে থাকবে— সাধারণ শিক্ষা, শিল্প-ইতিহাস শিক্ষা, শিল্পের মৌল প্রত্যয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞান, হাতে-কলমে কাজের মধ্যে দিয়ে গবেষণা, লেখার অভ্যাস, আলোচনা, এবং

অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পরিচিতি।

এর পূর্বশর্ত হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, আজকের শিল্পশিক্ষার্থী দুই রাজ্যের মধ্যবর্তী একটি প্রদেশে অবস্থান করছে। তার এক দিকে আছে গত কালের শিল্প-পরিবেশ (ঐতিহ্যবাহী ধারণা, প্রণালী, প্রযুক্তি) এবং অন্য দিকে আছে আজকের দিনের শিল্প-পরিবেশ (আজকের কর্মকাণ্ড এবং অন্যান্য সংযুক্ত বিষয়)। এই দুটিকেই তার সমান ভালো করে জানা প্রয়োজন। তার হয়ে-ওঠা এবং তার সৃজনশীলতা, দুইই নির্ভর করবে তার খোলা মনের গ্রহণশীলতার উপর, রূপজগৎ এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সম্পর্কে তার সচেতনতার উপর। আরো নির্ভর করবে, কি পরিমাণে, কতখানি দক্ষতা ও বুদ্ধির সঙ্গে সে এগুলির সদ্‌ব্যবহার করতে পারছে, তার উপর।

এই ধরনের কর্মসূচী স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের উপরেই অধিকতর দায়িত্ব ন্যস্ত করবে। এর কার্যকারিতার জন্য বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামোর কিছু পরিবর্তন ঘটাতে হবে। শিল্প-শাখাকে সৌভ্রাত্রের বন্ধনে আবদ্ধ একটি ঘন-সান্নিধ্য সংস্থায় পরিণত হতে হবে— বিশেষীকরণের ক্ষেত্রে অথবা হাতে-কলমে কাজের ক্ষেত্রে যতই ভাগাভাগি থাকুক না কেন। আজকের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগগুলি বিচ্ছিন্ন দুর্গের মতো হয়ে যায়, তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো সম্পর্কই থাকে না। প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঘন-সন্নিবদ্ধ করতে হলে তার জন্য প্রয়োজন উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা ও কৃতিত্ব-পরীক্ষার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি, এবং এমন শিক্ষক যাঁরা সচেতন ও বহুমুখী কর্মক্ষমতা-সম্পন্ন। তার জন্য আরো প্রয়োজন বৃহত্তর গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা এবং ধারাবাহিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের সুযোগ-সুবিধা।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানই হোক আর শিক্ষাপ্রণালীই হোক, এ-সবই শিক্ষাব্যবস্থার বাহ্যিক অবলম্বন। এগুলি জীবন্ত হয় তখনই, যখন এর চার দিকে থাকে সজীব মানুষ। যে-কোনো সুপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষাক্রমের প্রধান গুণই হল এই সজীবতা। এই ধরনের সজীব মানুষেরা যখন কোনো প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে থাকেন, তখন তা আপনা থেকেই সেই প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে কাজ করতে সাহায্য করে এবং তা আপনা থেকেই গড়ে তোলে এমন একটি পরিবেশ যা অনেক সময় তাঁদের অবর্তমানেও কিছুকাল বজায় থেকে যায় (এবং এইভাবে তা এই ব্যবস্থার আয়ু বাড়ায়)। যথার্থ পরিকল্পনাহীন অথবা কুপরিকল্পিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষাক্রম অত্যন্ত সজীব মানুষদের আন্তরিক প্রচেষ্টাকেও বিনষ্ট করতে পারে, সমস্ত প্রয়াসকে নিষ্ফল করে দিতে পারে (অবশ্য দু একটি বৃহদায়তন বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হয়তো এর কিছুটা ব্যতিক্রম হতেও পারে)। কিন্তু, এমন-কি, সুপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানেরও অনেক অভাব থাকে; ঠিক যেমনটি দরকার, সব তেমনটি থাকে না— তারও দরকার হয় উদারতা ও স্থিতিস্থাপকতার; দরকার হয় আদর্শ ও লক্ষ্যের পরিবর্তন অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতার; দরকার হয়— কাজ যখন ঠিকমত চলছে তখন নিজেকে সম্পূর্ণ নেপথ্যে সরিয়ে রাখবার ক্ষমতার। কোনো প্রতিষ্ঠানে যখন এই গুণগুলির অভাব ঘটে, বুঝতে হবে তখন নতুন করে ভাববার, নতুন করে গড়বার সময় এসেছে।

অনুবাদ: মহাশ্বেতা সিংহ ও সত্যেন্দ্রনাথ রায়

U. G. C. সেমিনার উপলক্ষে ৭ই ও ৮ই নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখে শান্তিনিকেতন কলাভবনে পঠিত।

অবনীন্দ্রনাথ

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনার লক্ষ্য ছিল ভাবের পথে জীবনের উপলব্ধি।

এ'দিক দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বিমূর্তবাদী আধুনিক শিল্পীদের থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সামাজিক বা নৈতিক আদর্শ অপেক্ষা 'অহেতুক' তাঁর শিল্প-প্রেরণাকে সজীব রেখেছিল ও সক্রিয় রেখেছিল। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই অহেতুক ইচ্ছার দ্বারাই তিনি চালিত হয়েছিলেন। পারিপার্শ্বিক প্রভাব অপেক্ষা অবনীন্দ্রনাথের মানসিক লক্ষণ বারংবার তাঁর শিল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। এই কারণে বলা চলে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প শিল্পীর ব্যক্তিত্বের দ্বারা যতটা প্রভাবান্বিত সমাজের দ্বারা ততটা নয়।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ও সাহিত্য প্রায় একই সময় আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই কারণে উভয় দিকের মধ্যে একটি যোগসূত্র থাকা স্বাভাবিক। সম্বন্ধ থাকলেও অবনীন্দ্রনাথ কখনো সাহিত্যের উপাদান শিল্পে অথবা শিল্পের উপাদান সাহিত্যে প্রবর্তিত করবার ব্যর্থ প্রয়াস করেন নি।

অবনীন্দ্রনাথ কখনোই বস্তু সাদৃশ্যকে অস্বীকার করেন নি। সাদৃশ্য লাবণ্য এই দুই গুণের সাহায্যে তিনি বাস্তবতার রূপান্তর ঘটাতে প্রয়াস করেছিলেন। অনুভূতি প্রকাশ (Expression) একমাত্র লক্ষ্য ছিল বলেই অবনীন্দ্রনাথের রচনাতে বিচার বুদ্ধির প্রভাব গৌণ।

শিশুসুলভ মনের স্বচ্ছতা ও তদনুরূপ উল্লাস নিয়ে তিনি ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনা গ্রহণে সক্ষম ছিলেন। বিচিত্র ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের শৈশবকাল কিভাবে কেটেছিল তার উজ্জ্বল প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর আত্মচরিতে। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো, লাল চটিজুতো, দেওয়ালের গায়ে পান্নাদাসীর ছায়া, আয়নায় প্রতিফলিত শ্বেতপাথরের ফুল, ভারী নরম হাতের স্পর্শ এই হল অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীমনের প্রথম ও সর্বপ্রধান পাথেয়।

জোড়াসাঁকোর বাড়ি ও সংলগ্ন বাগানের গাছ, সকাল সন্ধ্যায় আলো, অন্য দিকে ভিতর মহলে বৃহৎ পরিবার। বা'রমহলে দেশীবিদেশী গুণী জ্ঞানীর সমাগম পরিণত জীবনের পাথেয় জুগিয়েছে। কলকাতা শহরের অলিগলি শহরের জনতার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের শৈশবকাল থেকেই ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এই প্রত্যক্ষ পরিচয়ের রূপান্তর ঘটেছে তাঁর শিল্পে ও সাহিত্যে। অপর দিকে মুসৌরী দার্জিলিং ডালহৌসি পাহাড়ে ভ্রমণ করেছেন, দেখেছেন পুরীর সমুদ্র, দেবদাসীর নৃত্য, কোনারকের মন্দির। সাহাজাদপুরের নদী, গ্রাম, ফসলের ক্ষেত। তার পর বসেছেন তাঁর বিস্তৃত দক্ষিণের বারান্দায় এবং ছবি এঁকেছেন, গল্প লিখেছেন, শিল্পশাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, শিষ্যমণ্ডলীকে শিখিয়েছেন ও দেখিয়েছেন, তাঁর মূল্যবান শিল্পসংগ্রহ থেকে আঙ্গিকের উপাদান সংগ্রহ করেছেন নিজের প্রয়োজনমত।

অবনীন্দ্রনাথের জীবনের প্রায় ষাট বৎসর কেটেছে এইভাবে। তার পর জীবনের নূতন অধ্যায় শুরু হল

বিশেষ অবনীন্দ্র-সংখ্যায় (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ২৯ সংখ্যা ২, ৩) প্রকাশিত 'অবনীন্দ্রনাথের ছবি' প্রবন্ধের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ।

যখন তিনি বৃদ্ধ। জীবনের স্মৃতিজড়িত আভিজাত্যের সমারোহ শেষ হল। অবনীন্দ্রনাথ কলকাতার উপকণ্ঠে নূতন বাড়িতে অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে গিয়ে নূতন জীবন শুরু করলেন।

জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর শিল্পজীবনের সমগ্রতা অনুসরণ করলে লক্ষ্য করা যাবে যে বিষয়, ভাব, গঠন অতিক্রম করে তাঁর শিল্প বিমূর্ত নির্মিতিতে এসে পৌঁচেছে। এই বিবর্তনের ধারা কোথাও আবর্তে পরিণত হতে দেখা যায় না। নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের কারণে তাঁর শিল্পের মধ্যে যোগসূত্র কোথাও বিচ্ছিন্ন হতে দেখা যায় নি। গভীরতম রস-সৌন্দর্য তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন উপলব্ধির পথে। এই কারণে ধারণামূলক রূপ ও বর্ণ তাঁর রচনাতে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্য, অভিনয়, সংগীত, সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজি -চর্চার পথে তাঁর সহজাত শিল্পবৃত্তি যখন কিছুটা বিক্ষিপ্ত এমন এক মুহূর্তে অবনীন্দ্রনাথ কায়মনে শিল্পচর্চা শুরু করলেন ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ইউরোপীয় শিক্ষকের কাছে। একখানি দিল্লীকলমের অ্যালবাম সামান্য কয়খানি আইরিশ ইল্যুমিনেশনের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের মুহূর্তেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভা অগ্নিশিখার মতো জলে উঠল। মনের দোলায়মান অবস্থা কাটিয়ে উঠলেন তিনি। শিল্পীর উপলব্ধি নিয়ে শিল্প রচনা শুরু করলেন।

বিলাতী ধরনের শৌখিনতা, সোনালী ফ্রেমে বাঁধা বিলাতী ছবি দিয়ে সাজানো পরিবেশে যাঁর জীবন কেটেছিল এবং ইউরোপীয় শিল্পের আঙ্গিক আয়ত্ত করতে যিনি প্রয়াস করেছিলেন, তিনি কী পেয়েছিলেন এই যৎকিঞ্চিৎ ছবি কয়খানিতে? এই প্রশ্নের জবাব অবনীন্দ্রনাথের উক্তি থেকেই কিছুটা পাওয়া যায়। তাঁর উক্তির সাক্ষ্য থেকে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর মনের গতি-প্রকৃতি মূর্ত করে তোলার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন এই ছবিগুলি থেকে। অবনীন্দ্রনাথ রঙে, রেখায়, আকারভঙ্গিতে দেশী ছবির উপাদান ও ইউরোপীয় আঙ্গিকের দক্ষতা নিজের মতি মেজাজ অনুযায়ী প্রয়োগ করেছিলেন তাঁর 'রাধাকৃষ্ণ' চিত্রাবলীতে।

রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে অতীতের পরম্পরা অপেক্ষা আধুনিক মনের প্রকাশ হওয়ার কারণেই এই রচনা থেকেই ভারতীয় শিল্পের সূচনা এবং এই দিক দিয়েই ছবিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য। রাধাকৃষ্ণ চিত্রাবলীতে আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা অপেক্ষা চিত্র নির্মাণের তাগিদ যে প্রধান তা উক্ত ছবিগুলির সাক্ষ্য থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে। পৌরাণিক বিষয়াশ্রিত হলেও ছবিগুলিতে মানবীয় চেতনা প্রকাশিত হয়েছে নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে। এই ছবিগুলিতে নাটকীয় পরিবেশের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেটি অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-মনের বৈশিষ্ট্য এবং এই নাটকীয় উপাদান তাঁর পরবর্তী সকল রচনার একটি বিশেষ লক্ষণ।

ই. বি. হ্যাভেলের সংস্পর্শে এসে অবনীন্দ্রনাথ অতীত শিল্পের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে ভারতীয় চিত্রের বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করার প্রয়াস করলেন। মোগলচিত্রের আঙ্গিকগত দক্ষতা যেমন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল তেমনি মোগলচিত্রে নরনারী চিত্রণে প্রাণহীনতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। ইতিমধ্যে ওকাকুরার সংস্পর্শে অবনীন্দ্রনাথ সুদূর প্রাচ্যের শিল্পপরম্পরা ও সে দেশের নানান আদর্শ চিনলেন ও জানলেন। ক্রমে জাপানী শিল্পীরা এলেন অবনীন্দ্রনাথের বাসগৃহে, তাঁরা ছবি আঁকলেন। সকল প্রকার শিল্প সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় পরবর্তী কয় বৎসরের রচনাতে।

বিভিন্ন আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বহু দৃষ্টান্ত 'রাধাকৃষ্ণ' চিত্রাবলীর পরের রচনাতে পাওয়া যায়।

'ঋতু-সংহার' 'বজ্রমুকুট' যেমন ভারতীয় পরম্পরার উপাদানে গঠিত তেমনি নিজস্ব ভঙ্গিতে রচিত হয়েছিল 'কচ ও দেবযানী' (Fresco)। কচ ও দেবযানী যেমন আকারনিষ্ঠ, তেমনি পাওয়া যাবে জাপানী আঙ্গিকের অনুকরণে 'ভারতমাতা' অপর দিকে 'সাজাহানের মৃত্যু' (Oil Painting), আঙ্গিকগত পরীক্ষার ক্ষেত্রে আকার অপেক্ষা বর্ণের বাস্তব আবেদন (আলো-ছায়া) অপর দিকে বর্ণের মণ্ডনধর্মীগুণ উভয় দিকের সংযোগের পথ অনুসন্ধানই অবনীন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রধান লক্ষ্য। আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তিনি পৌঁচেছিলেন 'ওমর খৈয়াম' চিত্রাবলীর রচনাকালে। মোগলচিত্রের আঙ্গিকগত উপাদান এই সময়ের রচনাতে যেমন তিনি নিজের মতো করে প্রয়োগ করেছেন তেমনি ইউরোপীয় জলরঙের আঙ্গিক প্রয়োগ করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। স্টাইলের নির্দিষ্ট গতি অবনীন্দ্রনাথের রচনাতে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করল 'ওমর খৈয়াম' চিত্রাবলীর বিশেষ কতকগুলি রচনাতে। ওমর খৈয়াম চিত্রাবলীর অনেকগুলি ছবি যেমন বর্ণোজ্জ্বল তেমনি কতকগুলিতে আছে ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার বর্ণ সংঘাত। বর্ণোজ্জ্বলতা ও বর্ণ সংঘাত এই দুই ভিন্নমুখীর গতি সমন্বয়ের চেষ্টা দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের রচনাতে লক্ষ্য করা যায়। 'ওমর খৈয়াম' চিত্রাবলী শেষ করার পর ধারাবাহিকভাবে কোনো বিষয় চিত্রিত করার চেষ্টা অবনীন্দ্রনাথের রচনাতে পাওয়া যায় না দীর্ঘকাল পর্যন্ত। একান্তে শিল্প-সাধনার দিন শেষ হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ক্রমে বৃহত্তর সমাজের সামনে উপস্থিত হলেন জাতীয় আন্দোলনের মুহূর্তে (১৯০৫)।

তাঁর পরবর্তী রচনাতে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে চিত্র রচনার প্রয়াসের মূলে যুগপৎ জাতীয়তাবোধ এবং হ্যাভেলের প্রভাব মেনে নিতে হয়। জাতীয় শিল্পীর দায়িত্ব হ্যাভেলের কাছে অবনীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। এই দায়িত্ববোধ থেকেই অবনীন্দ্রনাথের রচনাতে ঐতিহাসিক পৌরাণিক বিষয়াশ্রিত চিত্র রচনার প্রয়াস দেখা যায়। তাঁর অহেতুক আনন্দ অপেক্ষা উদ্‌বেগপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই শ্রেণীর চিত্রে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের রচিত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক চিত্রগুলি বিচার করলে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায় যে অতীতের গৌরব অপেক্ষা নাটকীয় পরিবেশ ও গীতিধর্মী ভাব তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। এই কারণেই জীবনের ক্ষেত্রে অনুরূপ ভাব অনুসরণ করবার সুযোগ যখনই পেয়েছেন তখনই তিনি অতীত অপেক্ষা বর্তমান থেকে উদ্দীপনা গ্রহণের প্রয়াস করেছেন।

উড়িষ্যা ভ্রমণ অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত। ভারতীয় মূর্তিশিল্পের অনবদ্য রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন কোনারকের মন্দিরের সামনে উপস্থিত হয়ে। ভারতীয় মূর্তিশিল্পের এমন আবেগপূর্ণ আন্তরিক প্রশংসা অবনীন্দ্রনাথ জীবনে আর কখনো করেন নি। কোনারকের মন্দির যে তাঁকে কত গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল তার পরিচয় নিম্নের উদ্‌ধৃতিতে পাওয়া যাবে—

> "এখানে কিছুই নীরব নাই, নিশ্চল নাই, অনুর্বর নাই! পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান অশ্বের মতো বেগে রথ টানিয়া, উর্বর পাথর ফুটিয়াছে নিরন্তর পুষ্পিত কুঞ্জলতার মতো শ্যাম-সুন্দর আলিঙ্গনের সহস্র বন্ধে চারি দিক বেড়িয়া! ইহারই শিখরে, এই শব্দায়মান, চলায়মান উর্বরতার চিত্রবিচিত্র শৃঙ্গারবেশের চূড়ায়, শোভা পাইতেছে কোণার্কের দ্বাদশ-শত শিল্পীর মানস শতদল— সকল গোপনতার সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, নির্ভীক, সতেজ, আলোকের দিকে উন্মুখ।"[১]

---

১ পথে বিপথে (১৩১৮ সং), পৃ ১১১

প্রাচীন মূর্তির পটভূমিতে তিনি দেখলেন উড়িষ্যার নরনারীর জীবনযাত্রা এবং উৎকীর্ণ মূর্তির মধ্যে তিনি পেলেন জীবনের গতিপ্রবাহ। সম্ভ্রান্ত পরিবেশ ও নাগরিক জীবনের তুলনায় স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা, উৎসব অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-মনকে যে কতটা অভিভূত করেছিল তার বহু সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাঁর উড়িষ্যা-ভ্রমণের পরের রচনাতে। কাজরী নৃত্য, দেবদাসী, নটনটী ইত্যাদি চিত্রের ব্যঞ্জনা অনতিকাল পূর্বের রচনা থেকে যে কতটা ভিন্ন তা তুলনার সাহায্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হবেন।

১৯১৬ সাল পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের রচনাতে দুটি ভিন্নমুখী গতি লক্ষ্য করা যায়। এক দিকে মোগল-চিত্রের আঙ্গিক ও ভারতীয় প্রাচীন ভাবধারার অনুসরণ, অন্য দিকে বাস্তব উদ্দীপনা পারিপার্শ্বিক সবল রিয়ালিস্টিক আঙ্গিকের প্রবর্তন। এই দুই ভিন্নমুখী গতির সংযোগ অনুসন্ধানের প্রয়াস অবনীন্দ্রনাথ বারংবার করেছিলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে। উড়িষ্যার মূর্তিশিল্প তাঁর বাস্তব উদ্দীপনাকে প্রকাশ করবার সহায় হয়েছিল। এইজন্যই উড়িষ্যা ভ্রমণের পরের রচনাতে মূর্তিধর্মী গুণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে অবনীন্দ্রনাথের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব চিত্রধর্মী রচনাতে। বর্ণই তাঁর রচনার সর্বপ্রধান আবেদন। কাজেই আকারগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েই তাঁর সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচার সম্ভব নয়। উড়িষ্যা-ভ্রমণের পর যে জীবজন্তুর ছবি তিনি করেছিলেন সেগুলির সাক্ষ্য থেকে তাঁর বাস্তব উদ্দীপনার আবেদন সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা করা যেতে পারে।

অবনীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম গীতিধর্মী মন অনেকবারই রূপকধর্মী নামের সাহায্যে চিত্রের বাস্তব উদ্দীপনার লক্ষণকে রূপক চিত্রের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করবার চেষ্টা করেছেন, দৃষ্টান্ত 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি'। স্পষ্টই ধরা পড়ে যে এখানেই একটি প্রতিকৃতিমূলক চিত্র। নারীর অনবদ্য মুখের আকার হাতের সাবলীলতা উভয়ক্ষেত্রে রূপকধর্মী ভাবপ্রকাশের কোনো ইঙ্গিত নেই এবং নামের সাহায্যে চিত্রের সার্থক আবেদনকে আচ্ছন্ন করেছিলেন শিল্পী। রূপক চিত্রের সুস্পষ্ট প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর 'পদ্মপত্রে অশ্রু' নামাঙ্কিত চিত্রে। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির ইতিহাসে এই ছবিটি একটি ব্যতিক্রম। হাতে ধরা পদ্মপাতাটি ঢেকে দিলে স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করে একটি বিশিষ্ট নারীমূর্তি।

বাস্তব উদ্দীপনার কষ্ট-কল্পিত বিকৃত চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে যদিও অবনীন্দ্রনাথ আর কখনো চেষ্টা করেন নি কিন্তু নামের সাহায্যে চিত্রের স্বভাবানুগত লক্ষণকে ভিন্ন পথে চালিত করার চেষ্টা করেছেন তিনি অনেকবার।

'অরুণিমা' 'আঁখিপাখি' 'প্রভাতের শিশিরবিন্দু' ইত্যাদি রচনা প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা চলে না বলেই রূপকধর্মী হলেও এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

অবনীন্দ্রপ্রতিভা সম্বন্ধে চূড়ান্ত মতামত যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পের ভারতীয়ত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। অপর দিকে প্রি-র‍্যাফেলাইট স্কুলের সঙ্গে অবনীন্দ্র-গোষ্ঠীর তুলনা, জাতীয়তার প্রকাশ তথা রিভাইভালিস্ট রূপে দেখবার চেষ্টার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার সম্বন্ধ যে অতি ক্ষীণ তার সাক্ষ্য তাঁর পরবর্তী রচনা। প্রসঙ্গক্রমে এইমাত্র বলা চলে যে অবনীন্দ্রনাথের সহজাত প্রতিভার দিকে অধিকাংশেরই দৃষ্টি পড়ে নি। বিশেষভাবে তাঁর পরিণত জীবনের রচনার পূর্বে যে মতামত দিয়েছিলেন হ্যাভেল বা কুমারস্বামী সেইটিকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়ার কারণে অবনীন্দ্রপ্রতিভার উপযুক্ত বিচার হয় নি। 'ভারতমাতা', 'গণেশজননী', 'দারার-ছিন্নমুণ্ড' ইত্যাদি ছবির সাহায্যে অবনীন্দ্রনাথ

পরিচিত হয়েছিলেন কিন্তু এই-সব রচনা যে সাময়িক পরিবেশের দ্বারা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত সে-কথা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর শিল্পজীবনের বিবর্তনের সঙ্গে এই শ্রেণীর ছবির বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নেই। অপর দিকে পরবর্তী রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 'ওমর খৈয়াম' উড়িষ্যা-ভ্রমণের পরের রচনা 'ফাল্গুনী', 'ড্রইং' ইত্যাদি।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-বিবর্তনের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায় 'দাসখত' নামাঙ্কিত চিত্রে। মোগল ও ইউরোপীয় আঙ্গিকের সার্থক সংযোগ এই চিত্রের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য। নরনারীর আকার-প্রকারের সংযোগ একটি চিরন্তন ভাবকে রূপায়িত করেছে চিত্রের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে লঙ্ঘন না করে। ময়ূরপুচ্ছের আকারে গাছের প্রক্ষিপ্ত অংশ পরিবেশ সৃষ্টির সহায়করূপে প্রবর্তন করেছেন শিল্পী। Space ও Surface এই দুই বিরুদ্ধমুখী আদর্শের দ্বন্দ্ব এ ক্ষেত্রে শিল্পী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। স্বাভাবিকতার দিকে যদিও শিল্পীর প্রবণতা তৎসত্ত্বেও 'দাসখত' চিত্রের ধারণামূলক রূপ নির্মাণ ও অন্তর্মুখী গতি সুস্পষ্ট। এই যে বৈশিষ্ট্যগুলি এই চিত্রে লক্ষ্য করা যায় তারই স্পষ্টতর প্রকাশ লক্ষ্য করা যাবে তাঁর পরবর্তী কালের রচনাতে।

১৯২০ সাল থেকে অবনীন্দ্রনাথের রচনার বিষয় আঙ্গিক বর্ণবিন্যাস নূতন পথে চালিত হতে দেখা যায়। গাঢ় বাদামী বর্ণ আলোছায়ার সংঘাত অতঃপর কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। Space-এর আবেদন অপেক্ষা বর্ণের স্বর-বিন্যাস সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ যে একটি আদর্শ অনুসরণ করেছেন তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় (১৯২০-৩০) এই সময়ের প্রায় সকল রচনাতেই।

সাহিত্যগত ভাব ঐতিহাসিক পৌরাণিক বিষয় বা মোগল আঙ্গিকের অনুসরণ করার লক্ষণ অবনীন্দ্রনাথের এই সময়ের রচনাতে প্রধান হয়ে ওঠে নি। মনে হয় অবনীন্দ্রনাথ নিজের সহজ শিল্পবোধ ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য করেন নি। যদিও পরবর্তী দশ বছরের রচনার মধ্যে কোনো বিষয়কে ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত করার প্রয়াস নেই। তৎসত্ত্বেও এই কয় বৎসরের রচনার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ধারা সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

এই সময় চরিত্র-চিত্রণ ও Still Life-এর গুণ যুগপৎ দুই লক্ষণ অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের প্রধান অবলম্বন বলা চলে। অর্থাৎ বিষয় অপেক্ষা বস্তুগত গুণপ্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন শিল্পী। বর্ণের তরলতা অপেক্ষা গাঢ়তা এবং বর্ণের গতি অপেক্ষা স্থিতিশীলতা এই সময়ের চিত্রের সাধারণ গুণ। বস্তুর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তীব্র অনুভূতি যতটা অনায়াসে এই সময়ের রচনাতে প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন শিল্পী তার তুলনা পূর্বের রচনাতে দৈবাৎ পাওয়া যাবে।

'ত্রয়ী' (রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, অ্যাণ্ডুজ), 'আলমগীর' ইত্যাদি ছবিতে চরিত্রগত ভাব সর্বপ্রধান লক্ষ্য। অপর দিকে 'Flute Player', 'উমা', 'মালিনী', 'নূরজাহান' ও অনুরূপ বহু চিত্রে যে চরিত্রচিত্রণের ভাব সুস্পষ্ট এ বিষয় সন্দেহের অবকাশ নেই।

খাদি কাপড়ের উপর করা 'নূরজাহান' ছবিতে আকার ও নির্মাণের সরলতা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মুখমণ্ডলের স্মৃতি প্রকাশিত হয়েছে 'নূরজাহান' চিত্রে, (এই ছবি প্রথম প্রদর্শিত হয় 'মমতাজ বিবি' নামে)। মুখে আভিজাত্য সুস্পষ্ট, গড়গড়ায় সটকা হাত সর্বসমেত যে আবেদন তার তীব্রতা আরো স্পষ্ট হয়েছে বর্ণের সংযম ও contrast-এর প্রয়োগে। খাদি কাপড়ের উপর আঁকা এই

ছবিটিতে শীতল শ্যামলতা যেমন দূরত্বের আভাস দেয় তেমনি এগিয়ে আনে গাঢ় রঙ ও হাতের ভঙ্গি। এই প্রসঙ্গে 'সুরঙ্গমা' নামে চিহ্নিত ছবিখানির উল্লেখ করা যেতে পারে। শীতল বর্ণ ও contrast প্রয়োগ কৌশলের প্রায় একই রকম। পাশ ফেরা অবস্থায় কুর্সির উপর উপবিষ্ট একটি নারীর এই প্রতিকৃতি। মনে হয় যেন একই মুখ একবার সামনে থেকে ও একবার পাশ থেকে দেখানো হয়েছে।

উপরোক্ত ছবিতে চিত্রনির্মাণের যে রীতি অনুসরণ করেছেন শিল্পী তারই সঙ্গে তুলনা করা চলে 'পুরানো খেলনা' ছবিটি। নির্মাণ রীতির (Composition) সরলতা লক্ষ্য করতে অসুবিধা হয় না। গাঢ় বাদামী রঙের পৃষ্ঠভূমির সঙ্গে অন্যান্য বর্ণের সংযোগ লাল ও সবুজের সংঘাত চিত্রের নির্মাণ-রীতিকেই অনুসরণ করেছে। বস্তুর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের লক্ষণগুলি শিল্পী প্রকাশ করেছেন Still Life-এর আদর্শ অনুযায়ী। মুখমণ্ডলের আকার প্রকার অন্যান্য বস্তুর সংঘাতের দিক দিয়ে যতটা সক্রিয়, ভাব ও ভাবনার সঙ্গে সম্বন্ধ তেমন নয়। নামের মিল আকারগত, গুণের বৈচিত্র্য ও চিত্রের বাঁধুনিকে দৃঢ়তর করেছে। সংক্ষেপে উল্লিখিত ছবি দুইখানিতে ভাবুকতা প্রকাশ অপেক্ষা আকারগত গুণ নির্মাণ যে শিল্পীর লক্ষ্য তারই সাক্ষ্য-রূপে গ্রহণ করা চলে।

'নূরজাহান' নামে দ্বিতীয় চিত্রে (পদ্মফুল হাতে নারী মূর্তি) গীতিধর্মীভাব তাঁর পূর্বের রচনার সগোত্রীয়। এই সময়ের রচনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মুহূর্তেই দর্শক অনুভব করবেন যে অবনীন্দ্রনাথের রচনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ধারণার দ্বারা চালিত হয়েছে। কোনো বিশিষ্ট পরম্পরা অনুসরণের চেষ্টা নেই। শিল্পীর মানসিক গঠন ও চিত্তবৃত্তি পৌরাণিক ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিষয়ের চাপে যে কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল সে-কথা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। নূতন চেষ্টার পথে অবনীন্দ্রনাথ সে আড়ষ্টতা সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠেছিলেন এবং প্রত্যক্ষভাবে নিজের প্রতিভা অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ যে সময় বিশেষভাবে ভারতীয় আঙ্গিক অনুসরণের প্রয়াস করেছিলেন সে সময় প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল দৈবাৎ। হিমালয় পাহাড়ে ভ্রমণের কালে জলরঙে ছাপ ছোপে ছোটো আয়তনের Sketch গুলিতে তাঁর আলোছায়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ধরা পড়ে। অপর দিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে তাঁর দৃশ্যচিত্রের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেগুলিতে প্রধানত আলোকধর্মী (Visional)। দৃশ্য-চিত্রের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গতা লক্ষ্য করা যায় ধারাবাহিকভাবে রচিত বাংলার দৃশ্যচিত্রে।

শাহাজাদপুর ভ্রমণের পর কলকাতায় বসে অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন এই ছবিগুলি। সমকালীন অন্যান্য চিত্রের মতোই তাঁর এই দৃশ্যচিত্রে নির্মাণ-রীতির নূতন লক্ষণ সুস্পষ্ট। আলোকে ঝলমল বাংলার এই দৃশ্যচিত্রগুলিতে প্রকৃতির যে রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সে ক্ষেত্রে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা একটি শাশ্বত প্রাকৃতিক আবেদন সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন, স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল বর্ণের সমন্বয় ও সংঘাতের সাহায্যে। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের লক্ষণ সত্ত্বেও কোনো দিক দিয়েই বাংলার দৃশ্যচিত্রে বাহুল্য লক্ষ্য করা যায় না।

ধারাবাহিক বাংলার দৃশ্যচিত্রগুলির সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় এই সময়ের পশুপক্ষী অবলম্বনে রচিত চিত্র। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য জীবজন্তু-বিষয়ক চিত্র 'শেষ বোঝা', অথবা ১৯১৬ সালের রচনার সঙ্গে এই সময়ের পশুপক্ষী চিত্রের তুলনা করলে সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে ভাব অথবা নিছক উদ্দীপনা অপেক্ষা সমকালীন অন্যান্য চিত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য দেওয়াই শিল্পীর লক্ষ্য। 'ছাগল ও বানর' এই চিত্রে আইডিয়া অপেক্ষা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গভীর অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। উপরোক্ত আলোচনা

থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে অবনীন্দ্রনাথ বর্ণোজ্জ্বল আকারনিষ্ঠ চিত্রনির্মাণের প্রয়াস করেছিলেন। বস্তু-আশ্রিত আকারের দৃঢ়তা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ কতটা সচেতন হয়েছিলেন তাঁর রচিত 'Mask Drawing' তার প্রমাণ। ইতস্তত রঙের আমেজ (Tint) থাকলেও অধিকাংশ ড্রইং-এ বর্ণপ্রয়োগ শিল্পী করেন নি। পরিণত বয়সের বিশুদ্ধ ড্রইং সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার একমাত্র নিদর্শন তাঁর এই Mask Drawing।

বাংলার জাতীয় আন্দোলনের মুহূর্তে অবনীন্দ্রনাথ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ক্রমে জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পাওয়া ও অনুবর্তীদের জনপ্রিয় হওয়ার কারণে অবনীন্দ্রনাথ অনেক পরিমাণে জনতার থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম এবং প্রথম জীবনের কিছু ছবি ভারতের সর্বত্র আদর্শরূপে স্বীকৃত হলেও প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব তাঁর প্রথম অনুবর্তীদের হাতে তিনি অনায়াসে সমর্পণ করেছিলেন। এইজন্যই ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের মুহূর্তে অবনীন্দ্রনাথকে সক্রিয়ভাবে শিল্পী সমাজের নেতা রূপে আমরা দেখি না। বলা যেতে পারে এই সময় অবনীন্দ্রনাথ অনেক পরিমাণে নিঃসঙ্গ, তৎসত্ত্বেও শিল্পের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে নূতন কাল উপস্থিত সে বিষয় তিনি প্রত্যক্ষভাবে সচেতন ছিলেন। কারণ তাঁর অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতিমধ্যে ইউরোপের বিমূর্ত শিল্পরীতির চর্চা শুরু করেছেন। এই নিঃসঙ্গ অবস্থার মধ্যে রচিত হয়েছে তাঁর আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলী। আভিজাত্যের পরিবেশে আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলী তাঁর শেষ রচনা।

রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলী অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার যে বৈশিষ্ট্য তারই চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভবত হয়েছে এই চিত্রাবলীর মধ্য দিয়ে। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিভিন্ন আয়তন সংযত রূপ এই ছবিগুলিতে পাওয়া যেতে পারে। আশ্চর্যভাবে শিল্পী তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব এই ছবিগুলির সাহায্যে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও উপলক্ষ আরব্য উপন্যাস কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা। শহুরে জীবনের অভিজ্ঞতাকে বোগদাদের লৌকিক, অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন এমন ভাবে যে কালের ব্যবধান মুছে গিয়েছে সেক্ষেত্রে। উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতা শহরের জনস্রোত ও বিচিত্র কর্মজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা আরব্য উপন্যাসের কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। এটিকে আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলী না বলে তাঁর মৌলিক কলিকাতা নগরের কাহিনী বলা অসংগত নয়। অতীত ও বর্তমানের মিশ্রণ, অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা এবং অবাস্তবকে বাস্তবের জগতে পৌঁছে দেওয়ার অসাধারণ প্রতিভা অবনীন্দ্রনাথের রচিত সাহিত্যে বারংবার লক্ষ্য করা যায়। চিত্রের ভাষায় সেই প্রতিভা প্রত্যক্ষ করি আমরা আরব্য উপন্যাস চিত্রে। অবনীন্দ্রনাথের কল্পনার সৃষ্টি এই রচনাগুলির সার্থকতা অনুসরণ করতে হলে আঙ্গিকের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আরব্য উপন্যাসের প্রতিটি চিত্রই নির্মিত হয়েছে ইমারতের মতো কঠিন করে। জীবজন্তু, মানুষ, সেলাইয়ের কল, হ্যারিকেন লণ্ঠন, হোটেলের নাম লেখা সুটকেশ সব কিছুই ছবির ইমারতী বাঁধনকে দৃঢ়তর করেছে। কোথাও অসংলগ্ন বা বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায় না। নির্মিতির দিক দিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যেমন উপাদান সংগ্রহ করেছেন তেমনি পরম্পরা থেকে অনুরূপ উপাদান আত্মসাৎ করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। নির্মাণধর্মী গুণ যথেষ্ট থাকলেও বর্ণ-ব্যঞ্জনাই এই চিত্রাবলীর সর্বপ্রধান সম্পদ। আতপ্ত বর্ণকে আশ্রয় করে প্রতিটি আকার দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। Tone, Hue ইত্যাদি ইউরোপীয় বর্ণ-রীতির গুণ, অপর দিকে তীব্র বর্ণের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সংঘাত শব্দের ওঠা নামার মতো চিত্রের প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান।

জীবনের প্রাণময় রূপ যেমন আমরা অনুভব করি আলোর সাহায্যে তেমনি অবনীন্দ্রনাথের আরব্য উপন্যাসের চিত্রিত জীবনপ্রবাহকে আমরা অনুভব করি বর্ণোজ্জ্বল আলোকের পথে। যে আভিজাত্যের পরিবেশ এ পর্যন্ত তাঁর রচনায় প্রকাশিত হয়েছিল তার পরিবর্তন যেমন দেখা দিয়েছিল জীবনে তেমনি দেখা দিল নূতন যুগ।

'কৃষ্ণমঙ্গল' সিরিজ 'কবিকঙ্কণ' সিরিজ যখন রচনা করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, তখন ভাবলোক থেকে কঠিন আকার সম্বন্ধে শিল্পী অনেক বেশি সচেতন। মনে হয় যেন, শিল্পীর সকল উপলব্ধি দৃঢ়বদ্ধ রঞ্জিত আকারে রূপান্তরিত হয়েছে। উজ্জ্বল সংঘাতপূর্ণ বর্ণের প্রয়োগে এই সময়ের চিত্র রঞ্জিত মূর্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। পশুপক্ষী, মানুষ, গাছ একত্রিত হয়ে প্রাণময় গতিপ্রবাহ এই সময়ের রচনার সর্বপ্রধান আবেদন। এই গতিপ্রবাহকে উজ্জ্বল করে তোলা প্রয়োজন অথবা শিল্পীর তৎকালীন মানসিক অবস্থার কারণে এই চিত্রাবলীর নানা স্থানে লড়াইয়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে বহুবার। এই চিত্রাবলী রচনার কালে অবনীন্দ্রনাথ আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করেন নি। মেজাজ অনুযায়ী জলরঙ, প্যাস্টেল, চারকোল মিশিয়ে দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। এ রচনাবলীর সর্বপ্রধান আবেদন আকার। এই কারণেই আকারগত লক্ষণ সম্বন্ধে আরো একটু আলোচনার প্রয়োজন।

এই-সব রচনাতে আকারের যে সরলতা সেটি বিশ্লেষণের দ্বারা আবিষ্কৃত নয়। অপর দিকে ভাব প্রকাশের অবলম্বন রূপেও এই আকার নির্মিত হয় নি। এইজন্য এই সময়ের রচনাকে ধারণামূলক সৃষ্টি বলেই চিহ্নিত করা সংগত। অবনীন্দ্রনাথের রূপসৃষ্টিতে এই ধারণামূলক উপলব্ধি নানা কারণে আচ্ছন্ন হয়েছে এবং প্রেরণার পথে সেটি উদ্ধার করেছেন শিল্পী। তাঁর নিজের উদ্ভাবিত স্টাইলের সঙ্গে এই-সব রচনার পার্থক্য সুস্পষ্ট। এই-সব চিত্র রচনাকালে অবনীন্দ্রনাথ যে অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে ক্ষেত্রে বিষয়াশ্রিত বস্তু, ভাব অপেক্ষা ভঙ্গি, বর্ণের তরলতা অপেক্ষা কঠিনতা, মাধুর্য অপেক্ষা গাম্ভীর্য দর্শকের মনে যে ভাব জাগায় সে ক্ষেত্রে আবেগ সর্বপ্রধান।

সারাজীবনের স্মৃতিজড়িত জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে অপরিচিত জীবন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে অবনীন্দ্রনাথ ছবি ছেড়ে খেলনা তৈরিতে মন দেন। তার পর বরানগরের বাড়িতে অথবা বিশ্বভারতীর আচার্যপদের দায়িত্বের মধ্যে খেলনা তৈরির কাজ তাঁর বন্ধ হয় নি। বলা যেতে পারে জীবনের শেষ দশ বৎসর তাঁর প্রধান সৃষ্টি খেলনা। বাড়ির বাগানে অথবা শান্তিনিকেতনের মাঠে প্রাতঃভ্রমণকালে তিনি সংগ্রহ করতেন খেলনা তৈরির উপকরণ। গাছের শুকনো ডাল, ফলের বীজ, কাঠের টুকরো এমনি বিভিন্ন উপকরণের সংযোগে ঘরে বসে নির্মাণ করতেন বিচিত্র আকার। বিচিত্র বস্তুর সংযোগে ও ভঙ্গুর লক্ষণ থেকেই সম্ভবত অবনীন্দ্রনাথ এগুলিকে খেলনা বলেছেন এবং নাম দিয়েছিলেন 'কাটুম কুটুম'।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে বিচারবুদ্ধি-বর্জিত শিশুসুলভ আনন্দের প্রকাশ শিল্পের ক্ষেত্রে কমে এসেছে। অবনীন্দ্রনাথের এই খেলনাগুলির মধ্যে সেই লুপ্তপ্রায় শিশুজনোচিত অহেতুক আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। এদিক দিয়ে তাঁর মানসিক গঠনের সঙ্গে এগুলির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এগুলির ইমারতী বাহার ও অনবদ্য তাল মান বিচিত্র ভঙ্গি ও অপ্রত্যাশিত কারিগরী-সুলভ দক্ষতা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের সাক্ষ্য পাওয়া যাবে এই খেলনাগুলির প্রতি অংশে। ভঙ্গুর উপাদান এবং নির্মিত রূপের স্থিতিশীলতা উভয় দিকের সংযোগে যে চাপা উত্তেজনা (Tension) প্রকাশ পেয়েছে সেটিকে এই খেলনার অন্তর্নিহিত গুণ বলা যেতে পারে।

অবনীন্দ্রনাথ ভঙ্গুর উপাদানের সাহায্যে যখন এই খেলনাগুলি তৈরি করেছিলেন তখন এইগুলির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ নিশ্চয় ছিল না। উপাদানের ভঙ্গুরতা সত্ত্বেও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার বিশিষ্ট অবদান রূপেই 'কাটুম কুটুম' খেলনা স্মরণীয়।

খেলনা তৈরির ফাঁকে ফাঁকে অবনীন্দ্রনাথ খেলার ছলেই যে-সব ছবি করেছিলেন সে ক্ষেত্রে অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি কিছু কিছু থাকলেও বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনার অভাব নেই। বিশেষ ভাবে উপাচার্যরূপে যখন তিনি শান্তিনিকেতনে বাস করছিলেন সেই সময় তিনি বহু ছবি এঁকেছেন। এ-সব ছবিতে কোথাও কোথাও প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রথম জীবনের ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাব, মোগল শৈলীর প্রভাব। অটোগ্রাফের মতো এইগুলি রচিত হয়েছিল এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে তিনি এই-সব ছবি বিতরণ করেছিলেন। এই সময়ের অনেকগুলি রচনার মধ্যে আঙ্গিকের খেলাই প্রধান। অপর দিকে 'কবিকঙ্কণ', 'কৃষ্ণমঙ্গল' সিরিজের অনুরূপ রচনা পাওয়া যাবে যথেষ্ট। 'Deer and the Crow', 'The Donkey', 'Procession', 'The Lost Child' ইত্যাদি ছবিতে অবনীন্দ্রনাথের তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গি অনায়াসে অনুসরণ করা যায়। কোনো সমস্যা সমাধানের ইচ্ছা নিয়েই যে ছবিগুলি রচিত হয় নি তা বলাই বাহুল্য। ভঙ্গি ও গতির ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যাবে এই-সব ছবিতে। এই সময় করা Pastel প্রতিকৃতিগুলি তাঁর পূর্বের Pastel ড্রইং-এর স্বগোত্রীয় বলা চলে। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ দরকার।

অবনীন্দ্রনাথ প্রতিকৃতি অঙ্কনের অভ্যাস কোনোদিনই ত্যাগ করেন নি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি প্রথম জীবনের Pastel ড্রইং থেকে শুরু করে শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর রচিত প্রতিকৃতির সংখ্যা কম নয়। যে-কোনো কারণেই হোক অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত Pastel ড্রইংগুলিকে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেন নি। প্রতিকৃতি-শিল্পী রূপে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় যেমন এই Pastel ড্রইংগুলিতে পাওয়া যায় তেমনি তাঁর মৌখিক রচনার সঙ্গে এই প্রতিকৃতিগুলির এই সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, কারণ Pastel প্রতিকৃতির অভিজ্ঞতা তিনি বারংবার প্রয়োগ করেছেন মুখমণ্ডলের আকার প্রকার প্রবর্তনের ফলে। মানবীয় ভাব অবনীন্দ্রনাথের জীবনে প্রধান অবলম্বন ছিল বলেই সম্ভবত মুখমণ্ডলের আবেদন তাঁর কাছে এত তীব্র ছিল। আঙ্গিকের দিক দিয়ে Pastel রঙের স্তর ভেদ অপেক্ষা ঘষে কাজ করার লক্ষণ অধিকাংশ Pastel ড্রইং-এর বৈশিষ্ট্য। 'Kamini', 'My Grandson' পরবর্তীকালের এই দুই রচনার সাহায্যে অবনীন্দ্রনাথের pastel ব্যবহারের রীতি-পদ্ধতি বুঝতে অসুবিধে হয় না। লক্ষ করবার বিষয় এই যে তাঁর আঙ্গিকের বিবর্তন নানা সময় দেখা দিয়েছে। কেবল pastel ড্রইং-এর ক্ষেত্রে আঙ্গিকগত বিবর্তন দৈবাৎ লক্ষ করা যায়। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শিল্পীর ধ্যান চোখ চেয়ে, চোখ বন্ধ করে নয়।" তাঁর এই উক্তি-সমর্থক রূপে গ্রহণ করা চলে তাঁর pastel প্রতিকৃতিগুলি।

শিল্পের ভাষাগত উপাদানের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে শিল্পরূপ। এইজন্যই ভাষাগত উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা বাদ দিয়ে শিল্পরূপের সম্পূর্ণ পরিচয় সম্ভব নয়। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সেই ভাষাগত উপাদানের সংযোগ ঘটে ভিন্ন ভিন্ন পথে এবং আত্মপ্রকাশ করে শিল্পের নূতন নূতন রূপ। যে শ্রেণীর শিল্পী পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ গ্রহণ করেন তাঁদের আঙ্গিকের জটিলতা একটি বিশেষ লক্ষণ রূপে প্রকাশ পায়। অপর দিকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির পথে যে শিল্পী এগিয়ে চলতে চান তাঁর ক্ষেত্রে আঙ্গিক অপেক্ষাকৃত সরল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। লক্ষ করলে দেখা যাবে অবনীন্দ্রনাথের ভাষা সরল ও সাবলীল। অবনীন্দ্রনাথ

রূপ-সাদৃশ্যকে সকল সময়েই স্বীকার করেছিলেন, অপর দিকে বস্তু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তিনি গ্রহণ করেন নি। ভাবব্যঞ্জক গতিভঙ্গি তাঁর রূপ-নির্মাণের সর্বপ্রধান উপাদান। ভারতীয় পরম্পরা থেকে রূপ-ছন্দের উপাদান যেমন তিনি গ্রহণ করেছিলেন তেমনি বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেই উপাদানগুলিকে একটি অভিনবত্ব দিতে তিনি প্রয়াস করেছিলেন। বর্ণ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় শিল্পের উপাদান তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষভাবে তাঁর প্রবর্তিত 'ওয়াশ' পদ্ধতিতে ইউরোপীয় বর্ণ-প্রয়োগ রীতির ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। উজ্জ্বল বর্ণের স্তর-বিন্যাসের পর স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ রঙের আচ্ছাদন দেওয়া এবং মোছার কাজ তিনি যে ভাবে করতেন তার সঙ্গে Oil Painting-এর Glazing-এর তুলনা সংগত। বর্ণ-প্রয়োগের এই স্টাইল শিল্পীর মতি মেজাজ অনুযায়ী এতই পরিবর্তিত হত যে অপরের পক্ষে সেটি যথাযথ অনুসরণ করা সম্ভব হয় নি। অবনীন্দ্রনাথের বর্ণযুক্ত রেখা পরিমাণে রীতিধর্মী। প্রধানত মোগলচিত্রের পরম্পরা থেকেই তিনি রেখাত্মক গুণ গ্রহণ করেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অনুবর্তীদের আত্মিক যোগ অতি ঘনিষ্ঠ থাকলেও প্রথম অনুবর্তীদের রচনার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পার্থক্য যথেষ্ট। এই পার্থক্যের সর্বপ্রধান কারণ অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি। শিখিয়ে পড়িয়ে শিল্পী তৈরি হয় না, শিল্প-দৃষ্টি অনুযায়ী শিল্পী নিজের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে নেবে, এই ধারণা থাকার কারণে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। আঙ্গিকগত শিক্ষার বাঁধা পথ তিনি অনুসরণ করেন নি। অবনীন্দ্রনাথ নিজে যেমন একান্তভাবে কোনো পরম্পরাকে আঁকড়ে থাকেন নি তেমনি তিনি তাঁর অনুবর্তীদের পরম্পরা অপেক্ষা অন্তরের উপলব্ধিকে অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর এই উদার শিক্ষানীতির প্রভাবে অতি অল্পকালের মধ্যে ভারতের সর্বত্র শিল্প-জাগরণ সম্ভব হয়েছিল। ভারতীয় পরম্পরার পুনঃপ্রবর্তন অপেক্ষা শিল্পী-মনকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব সবচেয়ে শক্তিশালী। অবনীন্দ্রনাথের অনুবর্তীদের মধ্যে আঙ্গিকগত দক্ষতা অর্জনের প্রয়াস যেমন আছে, তেমনি লক্ষ করা যাবে আঙ্গিক সম্বন্ধে অহেতুক উদাসীনতা। এই দুই লক্ষণ থেকে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত শিক্ষানীতির প্রভাব।

অবনীন্দ্রনাথ শিল্পসাধনার পথে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতারই আর-একটি প্রক্ষেপ তাঁর শিক্ষানীতি। অনুরূপ প্রক্ষেপ পাওয়া যায় তাঁর শিল্প-চিন্তার ক্ষেত্রে। অবনীন্দ্র-প্রতিভার এই তিন আয়তনের সর্বত্র তাঁর প্রতিভার দ্বারাই তিনি চালিত হয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথ শিল্পসৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করে যখন দেখেছিলেন, সেই সময় জাতীয়তাবাদী তাঁর মন তাঁর সেই আদর্শকে জাতীয়তার ও পরম্পরার দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। অবনীন্দ্র প্রভাবের উপরোক্ত দুই প্রকাশ ও তার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে ভারতীয় শিল্পের নব-জাগরণের ইতিহাস।

কলোনিয়ান আর্টের প্রভাবে ভারতবর্ষ যে সময় আচ্ছন্ন ছিল সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ শিল্পজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। অবনীন্দ্রনাথ যখন শিল্পের ভাষা ও ভাবের সমন্বয়ে শিল্পের অন্তর্লোক থেকে অনুসন্ধানের প্রয়াস করেছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই ইউরোপের শিল্পধারা চলেছিল সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। অবনীন্দ্রনাথ যখন ভেবেছেন ভাব-সাদৃশ্যের লাবণ্যের কথা তখন ইউরোপের শিল্পী ঠিক সেই সেই গুণ-গুলিকেই বর্জন করে বিমূর্ত বিশুদ্ধ শিল্পরূপ নির্মাণের প্রয়াস করেছিলেন। ইউরোপের এই প্রয়াস

Expression-মূলক শিল্পচেষ্টা মাত্রকেই সার্থক শিল্পসৃষ্টির প্রতিবন্ধক বলে মনে করেছিল। কাজেই বলা যেতে পারে অবনীন্দ্রনাথ যখন শিল্পের জগতে আত্মপ্রকাশ করলেন ঠিক সেই সময় স্থূল বাস্তবতা ও বিমূর্ত শিল্পরীতির দ্বন্দ্ব চলেছে সর্বত্র। অবনীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ বিমূর্ত রূপ নির্মাণ অপেক্ষা বহু উপাদানে মিশ্রিত শিল্পরূপ নির্মাণের প্রয়াস করেছিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পথে যেমন জীবনের অখণ্ডতার উপলব্ধি হয়ে থাকে তেমনি অবনীন্দ্রনাথের শিল্প বহুবিধ পরিচিত উপাদানের সাহায্যে মনের গভীর উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝখানে আলোক-উজ্জ্বল জীবনের লীলা অবনীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন, সম্ভবত এই কারণে তাঁর রচনাতে ধারাবাহিকতার লক্ষণ বারংবার আত্মপ্রকাশ করেছে। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মনোভাবের সঙ্গে উপরোক্ত লক্ষণের সম্বন্ধ যে ঘনিষ্ঠ এ বিষয় সন্দেহ নেই।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের জীবন ভারতের সহজিয়া সাধকদের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কারণ তাঁর শিল্প ও শিল্পচিন্তা অনায়াসে আত্মপ্রকাশ করেছে। তথ্যের ভারে তাঁর জীবনের কোনো অংশই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি। তাঁর প্রতিভার এই সহজ গতি আধুনিককালের ইতিহাসে দৈবাৎ লক্ষ করা যাবে।

রবীন্দ্র-রচনা-সংকলনের ইতিহাস

বারিদবরণ ঘোষ

রবীন্দ্র-রচনাবলী সাহিত্যের অপার বিস্ময়-সমুদ্র; বিবিধ রত্নে মহার্ঘ। তার থেকে একশ্রেণীর রত্নাবলী আমি বেছে নিয়েছি। এগুলি হল রবীন্দ্র-রচনাসমূহের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সংহিতা বা সংকলন-গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলি সম্পর্কে তথ্যাদি ইতস্তত বিবৃত হলেও সামগ্রিকভাবে বিষয়টি সম্পর্কে ইতোপূর্বে কেউ মনোযোগ দেন নি। অথচ এর ইতিহাস সংকলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ষষ্টিতমাধিক বৎসর ব্যাপ্ত রবীন্দ্র-রচনা দ্বারা বঙ্গভাষা ও বিশ্বসাহিত্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। তাঁর মহাপ্রয়াণের পরও 'বিশ্বভারতী'-কর্তৃক তাঁর বিবিধ রচনা ক্রমাগত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ১৯৪১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত গ্রন্থসংখ্যা প্রায় তিনশতের কাছাকাছি। বিভিন্ন সময়ে এই-সব গ্রন্থ অথবা রচনা, বিভিন্ন রচনা-সংগ্রহ-ধর্মী সংহিতায় একত্রিত আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে প্রকাশিত এই-সব সংকলন-গ্রন্থ বা গ্রন্থাবলীর একটি বিষয়ানুক্রমিক পরিচয় নথিভুক্ত করার চেষ্টা করছি।

বিষয়ভাগটি নিম্নপ্রকারের: এক. গান, দুই. কাব্য; এবং এগুলি ছাড়া অন্যান্য রচনাবিষয়ক সংকলন-গ্রন্থ। খুব সূক্ষ্মভাবে এই বিভাগ-নির্দেশ সম্ভব নয়। প্রতিটি বিভাগ অবশ্যই কালানুক্রমে বিন্যস্ত হয়েছে। অন্যান্য রচনাবলী বলতে গল্প, নাট্য, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিষয়কে বোঝানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনা (বিশেষ করে গান) একত্রিত করে প্রথম প্রকাশের উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে, কবির তেইশ বছর বয়সের সময়ে, যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রের উদ্যোগে।[১] কবি নিজেও এই সংকলনকার্যে সহায়তা করেছিলেন।

এই ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে 'শৈশব সংগীত' নামে ১৪৯ পৃষ্ঠার একটি পুস্তকে কবির তেরো থেকে আঠারো বছর বয়সে রচিত কবিতাগুলি সংগৃহীত হয়েছিল— তবে সম্পূর্ণ সংগ্রহ নয়। যোগেন্দ্রনারায়ণ-কৃত সংকলন-গ্রন্থেই কবি প্রথম কবিতা বা গান নির্বাচন ব্যাপারে কঠোর নির্বাচন-রীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে 'গুণহীন' রচনাগুলি পরিত্যক্ত হয়েছিল। কবি বরাবরই আপন রচনার নির্মম সমালোচক ছিলেন।[২]

২

প্রথম পর্যায়ে আমরা গান-সম্বন্ধীয় সংকলন-গ্রন্থগুলির পরিচয় প্রদান করছি।

'পদরত্নাবলী' সংকলনের সময় কবির কাছে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ছাড়া আরো আসতেন প্রিয়নাথ সেন

---

১ এক হিসেবে ২১টি গীতের সংকলন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১২৯১ বঙ্গাব্দ) কবির গানের প্রথম সংকলন-গ্রন্থ। বহু আলোচিত এই গীতগ্রন্থের আলোচনা এখানে করি নি।

২ এর সমসাময়িককালে আরো একটি সংকলন-গ্রন্থ সম্পাদনায় কবি অভিজ্ঞতাপুষ্ট হন— শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগে বৈষ্ণবপদ-সংহিতা 'পদরত্নাবলী' সংকলন-সূত্রে (বৈশাখ ১২৯২)। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের মতে কবি এই পদগুলির নির্বাচক ছিলেন, ভূমিকা রচনা করেছিলেন শ্রীশচন্দ্র।

এবং তৎকালে সিটি স্কুলের শিক্ষক ও 'আদিম রবিভক্ত' যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র। সাহিত্যরসিক এই শেষোক্ত ব্যক্তিটি তৎকালাবধি প্রকাশিত কবির গানগুলি একত্রিত করে প্রকাশের জন্য কবির অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সমবয়সী এই তরুণ গুণগ্রাহীর দাবি তরুণ কবি পূরণ করলেন। বন্ধুভাগ্য চিরকালই কবিকে বিবিধ আনুকূল্য দান করেছে, যদিও কবি তাঁর গানের প্রথম গ্রন্থিক সম্পর্কে কোথাও কোনো মন্তব্য করেন নি ভূমিকা ছাড়া।

'রবিচ্ছায়া' প্রকাশের তারিখ ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস।[১] ১২৯১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস পর্যন্ত কবি যতগুলি গান লিখেছিলেন, তার অধিকাংশই 'রবিচ্ছায়া'য় সংকলিত। এই কার্যে কবির প্রত্যক্ষ সহায়তা ছিল। যদিও তাঁর মতে, "অনেক কারণে গান ছাপানো নিষ্ফল বোধ হয়। সুর সঙ্গে না থাকিলে গানের কথাগুলি নিতান্ত অসম্পূর্ণ। তা ছাড়া গানের কবিতা সকল সময়ে পাঠ্য হয় না, কারণ সুরে ও কথায় মিলিয়া তবে গানের কবিতা গঠিত হয়।"

সংকলন-কর্ম সমাপ্ত হলে যোগেন্দ্রনারায়ণ গ্রন্থের নামকরণের জন্য কবিকে একটি চিঠি লেখেন—

রবিবাবু,

…বোধহয়, আবার 'ছায়া-আলোক' ভাল শুনায় না। কি করিব অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিন। 'ছায়া' মানে হৃদয়ের প্রতিবিম্ব বুঝাইতে পারে, তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের ছায়া না বুঝাইতেও পারে, ঐ এক কথার মধ্যে আলোক আঁধার দুই থাকিতে পারে। যে নামটি ভাল বোধ হয় এই লোকের নিকট অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিবেন। নামটি একটু poetic হওয়া আবশ্যক।

২০সে ডিসেম্বর ৮৪ শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র

২ নং বেনেটোলা লেন

কলেজ স্কোয়ার

—কবি সেই পত্রেরই পৃষ্ঠায় কপালটুকিতে একই তারিখে জবাব দিলেন— "আলো ছায়া বললে কেমন হয়? আর 'রবিচ্ছায়া' যদি বলেন সে আপনাদের অনুগ্রহ। নামকরণের ভার আপনার উপরে— যখন আপনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন তখন তার গোত্র ও নাম আপনারি দাতব্য। আমার সঙ্গে এর আর কোন সম্পর্ক নাই।"

এই সংকলনের শেষ গান ১২৯১-এর চৈত্রে রচিত ('১২৯১ সালের / সনে শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রবাবু যতগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই এই পুস্তকে দেওয়া গেল'— 'প্রকাশকের বক্তব্য')। নিজের দেওয়া সুরে প্রথম গান রচিত হয়েছিল কবির সতেরো বছর বয়সে আমেদাবাদ বাসকালে। জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে এই গানের চার চরণের মাত্র উল্লেখ ছিল। পরে 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থে সমগ্রটি উদ্ধৃত হয় ('নীরব রজনী দেখ মগ্ন জ্যোছনায়')। 'রবিচ্ছায়া' প্রকাশের কালে কবি তাঁর এই গানটি পরিবর্তিত

---

১ আখ্যাপত্র : রবিচ্ছায়া। / (সঙ্গীত) / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। / শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র কর্তৃক / প্রকাশিত। / কলিকাতা। / ৪৫ নং বেনেটোলা লেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। / বৈশাখ ১২৯২।

বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগে যে ২য়া জুন ১৮৮৫ তারিখটি লেখা আছে, তা ভুল। কারণ ২রা জুন হ'লে মধ্য-জ্যৈষ্ঠ মাস হয়।

আকারে প্রকাশ করে দেন। এই ঈষৎ-পরিবর্তিত রূপ 'গীতবিতানে' বিধৃত। অন্য কোনো পরিবর্তন নয়— গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে নাট্যগীতি পর্যায়ের ৩-সংখ্যক গানের (তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ৭৬৮) চতুর্থ পঙ্‌ক্তির পর মূলগানে আরো চার পঙ্‌ক্তি ছিল—

নিশীথের সুনীরব শিশিরের সম
নিশীথের সুনীরব সমীরের সম
নিশীথের সুনীরব জ্যোছনা সমান
অতি— অতি— অতিধীরে কর সখি গান!

—এই গানের প্রসঙ্গে রচয়িতা আরো লিখেছেন— "ইহার বাকি অংশ পরে ভদ্রছন্দে বাঁধিয়া পরিবর্তিত করিয়া তখনকার গানের বহিতে ছাপাইয়াছিলাম…"। এই 'গানের বহি' হল 'রবিচ্ছায়া' এবং এটিই 'রবিচ্ছায়া'র প্রথম গান।

স্বভাবতই কৌতূহল জাগে এই সংকলনে মুদ্রিত গানগুলি— যা কবির ১৭ থেকে ২৩ বছর বয়স পর্যন্ত রচিত— তাদের পরিচয় জানতে। ১৭১ পৃষ্ঠার (+১৵০) এই গ্রন্থে মোট গীতসংখ্যা ২০১টি— বিবিধ সংগীত পর্যায়ে ১১৬, ব্রহ্মসংগীত ৭৪, জাতীয় সংগীত ৭ এবং পরিশিষ্টে ৪টি। পরিশিষ্ট ব্যতীত প্রতিটি গানের শেষে গীতের ক্রমসংখ্যা মুদ্রিত আছে। পরিশিষ্ট-অংশ সূচীপত্রে মুদ্রিত নেই। কৌতূহলীদের জন্য কয়েকটি পরিচিত গানের মাত্র উল্লেখ করছি—

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা; মহাসিংহাসনে বসি; বড়ো আশা করে এসেছি; আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে; এ কী সুগন্ধহিল্লোল বহিল; আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্বাদ; বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি; আঁখিজল মুছাইলে, জননী; মাঝে মাঝে তব দেখা পাই; এ পরবাসে রবে কে; প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে কবি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে বৃত হন। উপরোক্ত গানের সবগুলিই ব্রহ্মসংগীত। 'অনেকগুলি গানে রাগরাগিণীর নাম লেখা নাই। সে গানগুলিতে এখনও সুর বসানো হয় নাই।' এই ধরনের সুরবিহীন কবিতাগুলি বস্তুতপক্ষে গান নয়। যেমন, কে আমার সংশয় মিটায়, ছেলেখেলা কোরো না দয়াময়, মায়ের বিমল যশে, প্রভৃতি। পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থের সর্বশেষ গান, বেহাগ রাগিণী ও একতালে নিবদ্ধ 'আজি কাঁদে কারা ওই শুনা যায়'— "বর্ধমান দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রচিত।"

'রচয়িতার নিবেদনে' রবীন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন—

"এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেকগুলি গান আমার দাদা— পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুরের অনুসারে লিখিত হয়। অনেকগুলি গানে আমি নিজে সুর বসাইয়াছি এবং কতকগুলি গান হিন্দুস্থানী গানের সুরে বসান হয়।"

রবীন্দ্রসদনে ইন্দিরাদেবী-সংশোধিত একটি কপি আছে— তাতে গানগুলি সম্পর্কে বিবিধ তথ্য নিবদ্ধ আছে।

'প্রকাশকের নিবেদন' থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশের আরো একটি কারণ অবগত হতে পারি—

"…গুরুজনের নিকট গান করিতে অনেকেই সংকোচ বোধ করেন। তাহার কারণ সচরাচর

দুইটি,— সামাজিক শিক্ষার অভাব, আর ভাল গানের অভাব,— শেষোক্ত কারণটি কতক পরিমাণে দূরীকরণ করা এই পুস্তকের একটি উদ্দেশ্য।"

এই সংকলনকাল অবধি 'রবীন্দ্রসংগীত' সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য 'রচয়িতার নিবেদনে' নথিভুক্ত আছে। আপন সংগীতচিন্তার প্রাথমিক স্তরের ভাবনা এতে বিধৃত— "অনেকগুলি গানে ·· এখনও সুর বসান হয় নাই। সঙ্গীতজ্ঞ পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে সে অভাব পূরণ করিয়া লইতে পারেন।"

গ্রন্থ প্রকাশের পর এটি পাঠকগণ-কর্তৃক সম্বর্ধিত হয়েছিল। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা (২০ বৈশাখ ১২৯২) এর সমালোচনা প্রসঙ্গে একে "এক অপূর্ব সৃষ্টি" বলে অভিহিত করে "রবিবাবু ও যোগেন্দ্রবাবু উভয়কেই" ধন্যবাদ দিয়েছেন। গ্রন্থটির প্রথমে মূল্য ছিল বারো আনা। ঐ 'সঞ্জীবনী'তেই (২১ অগ্রহায়ণ ১২৯২ থেকে পর পর তিন সপ্তাহ) আবার দেখি 'বিজ্ঞাপন' অংশে গ্রন্থটির মূল্য হ্রাসের কথা— বারো আনা থেকে আট আনা। গানের এই প্রথম সংকলনটি (মুদ্রণ-সংখ্যা ১০০০) আট বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যায়।

৩

গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা

৮ বৈশাখ ১৮১৫ শকাব্দ, ইংরেজি ২০ এপ্রিল ১৮৯৩ খৃস্টাব্দ, ১৩০০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্র-রচনার এই দ্বিতীয় সংকলন-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কবি অবশ্য ভূমিকা লেখেন ১০ চৈত্র ১২৯৯ তারিখে। সংক্ষেপে এটি 'গানের বহি' নামেই পরিচিত। "নানা খাতা পত্র হইতে উদ্ধার করিয়া" যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র 'রবিচ্ছায়া' প্রকাশ করেছিলেন। কবি এজন্য যোগেন্দ্রের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে 'বিজ্ঞাপন' অংশে লিখেছেন—

"রবিচ্ছায়া···গ্রন্থ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং ইতিমধ্যে অনেকগুলি গান নূতন রচিত হইয়াছে। এই কারণে নূতন পুরাতন সমস্ত গান লইয়া বর্তমান গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম।"

১৮৮১ খৃস্টাব্দে কবির তৃতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ 'বাল্মীকিপ্রতিভা' গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়েছিল। এই দ্বিতীয় সংকলন-গ্রন্থের সঙ্গে সেটিও সংযুক্ত হয়ে মোট ৪০৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হল। 'রবিচ্ছায়া' প্রকাশের পর কড়ি ও কোমল এবং মানসী কাব্যগ্রন্থ, রাজর্ষি, মায়ার খেলা, রাজা ও রানী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা এবং গোড়ায় গলদ শীর্ষক নাট্যধর্মী রচনাগুলি এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

বইটি আকারে পকেট-বইয়ের মতো। মায়ার খেলার গানগুলি সংলাপের মধ্যেই নাট্যাকারে নিবদ্ধ ছিল। এই সংকলনে সেগুলি গীতাকারেই প্রকাশিত হয়েছে। ১২৯৯ সালের শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র-রচিত গীতসংখ্যা সাড়ে তিন শতের মতো। নাটক ইত্যাদির গান সমেত এই সংকলনে মোট ৪১৩টি গান সংকলিত হয়েছে। গানগুলি রাগরাগিণী-সংযুক্ত।

এ-ধরনের সংকলন-গ্রন্থগুলিতে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। সংকলন-কালে সংকলন-কর্তারা অবশ্যই কবির সহায়তা পেতেন। এতদ্‌সত্ত্বেও এগুলিতে এমন বহু গান স্থান পেয়েছে, যেগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনা নয়। বর্তমান সংহিতা গ্রন্থে এমন একটি উদাহরণ 'ডাকি তোমারে কাতরে' শীর্ষক গানটি। এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সংকলনটি সাজাবার সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

কবিকে নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন। গ্রন্থপ্রকাশের তারিখটি লক্ষণীয়— ৮ বৈশাখ ১৩০০ সন— কবির প্রিয় বউঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর দশম বৎসরারম্ভ দিন।

এই সংহিতা-গ্রন্থে যে সূচী-সংকেত আছে, তা যথেষ্ট মূল্যবান। কারণ, রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের কোন্ কোন্ গানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বরারোপ করেছিলেন তা এই সূচী থেকে জানা যায়। এই শ্রেণীর কয়েকটি প্রখ্যাত গানের নাম উল্লেখ করি— প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন ; সমুখেতে বহিছে তটিনী ; সহে না যাতনা ; হাসি কেন নাই ও নয়নে প্রভৃতি। এই ধরনের ২১-২২টি গানে অন্তত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বরসংযোগ করেছিলেন। এ ছাড়া হিন্দী গানের রাগ-ভিত্তিক গানের সংখ্যাও প্রায় একশো। বস্তুত 'কালমৃগয়া' এবং 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র বহু গানে আবার ইংরেজি, স্কচ এবং আইরিশ মেলোডির নানা প্রভাব বর্তমান।

এই সংগ্রহের সঙ্গে (অর্থাৎ 'গানের বহি'র সঙ্গে) 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নাট্যরচনা সংযোগের কৈফিয়ৎ হিসাবে কবি 'বিজ্ঞাপন' অংশে লিখেছেন—

"ইহার সহিত "বাল্মীকিপ্রতিভা"-নামক একটি গীতিনাট্য সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া গেল। কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের রচিত "সারদামঙ্গল" নামক কাব্যপাঠ করিয়া উক্ত গীতিনাট্যের ভাব আমার মনে উদয় হয়। এমন-কি দুই একটি গানে সারদামঙ্গলের অনেকগুলি পদ প্রায় অবিকৃত-ভাবেই রক্ষিত হইয়াছে, এজন্য বিহারীবাবুর নিকট আমি ঋণী আছি। ১০ চৈত্র ১২৯৯।"

গ্রন্থটির বিক্রয়মূল্য ছিল এক টাকা বারো আনা।

গান— ১৯০৮। যোগীন্দ্রনাথ সরকার -প্রকাশিত

'রবিচ্ছায়া', 'গানের বহি', এবং 'কাব্যগ্রন্থ' অষ্টম ভাগ (গান)[১] -এর পর শুদ্ধ গানের সংকলন গ্রন্থ 'গান'[২] প্রকাশ করলেন শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, ১৯০৮ খৃস্টাব্দে, পূজার ঠিক আগে। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। এই 'গান' নামে রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি গীত-সংগ্রহ গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা যথাসময়ে সেগুলির ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করব।

বর্তমানের 'গান' বইটির ৬টি বিভাগে মোট ৫১৮টি গান চারশো পৃষ্ঠার মধ্যে সংকলিত হয়েছে। বিভাগ ছ'টি এবং তাদের গীতসংখ্যা নিম্নরূপ :

বিবিধ সংগীত— ১৩৩ জাতীয় সংগীত— ১৪
মায়ার খেলা— ৬৮ বাউল— ২০
বাল্মীকিপ্রতিভা—৫৩ ব্রহ্মসংগীত— ২৫০

প্র মে বিভাগগুলির বিষয়ানুযায়ী সাজিয়ে তার বর্ণানুক্রমিক সূচী আছে। গানগুলি রাগ-তাল-নির্দেশ-যুক্ত। এতে সংকলিত 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রাগিণীসমেত মুদ্রিত। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে বাল্মীকিপ্রতিভা রাগ-তাল-সমেত মুদ্রিত নয়।

---

১ 'কাব্যগ্রন্থ'এর আলোচনার জন্য দ্বিতীয় পর্যায় দ্রষ্টব্য।

২ আখ্যাপত্র : গান / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। / কলিকাতা / সিটী বুক সোসাইটী, / ৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট। / প্রকাশক— শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার।

'বাউল' বিভাগের গানগুলির মধ্যে তেরোটি নামাঙ্কিত। গানের এমন নামকরণ অন্যত্র দুর্লভ। সে-কারণে নীচে উল্লেখ করছি—

নাম	গান
সার্থক জনম	সার্থক জনম আমার
পথের গান	আমরা পথে পথে
সোনার বাংলা	আমার সোনার বাংলা
দেশের মাটি	ও আমার দেশের মাটি
দ্বিধা	বুক বেঁধে তুই দাঁড়া
অভয়	আমি ভয় করব না
হবেই হবে	নিশি-দিন ভরসা রাখিস
বান	এবার তোর মরা গাঙে
একা	যদি তোর ডাক শুনে কেউ
মাতৃমূর্তি	আজি বাংলা দেশের
মাতৃগৃহ	মা কি তুই পরের
প্রয়াস	তোর আপন জনে
বিলাপী	ছি ছি চোখের জলে

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, এই গীতসংকলন প্রকাশের ঠিক পাঁচ বছর আগে ১৯০৫ খৃস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর —বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাক্কালে— বত্রিশ পৃষ্ঠার 'বাউল' নামে জাতীয় সংগীতের গীত-সংকলন প্রকাশিত হয়। সেই গানগুলিই এই সংগ্রহে 'বাউল' বিভাগে গৃহীত হয়েছে।[১]

প্রসঙ্গত, এক সময়ে কবি যোগীন্দ্রনাথ সরকারের কাছে 'গদ্য-গ্রন্থাবলী' প্রকাশের প্রস্তাব করেছিলেন। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার এই ভার গ্রহণ করায় তিনি "যোগীন সরকারকে জবাব দিয়া পত্র" লিখেছিলেন।

---

১ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী'র দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৫৫ সং, পৃ. ১৭৫-১৭৬) এই 'গান' গ্রন্থ থেকে যে তালিকা সংযুক্ত করেছেন— তা প্রমাদপূর্ণ। পাঠকদের বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য এখানে একটু বিস্তৃত আলোচনা করছি। শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন,— "প্রায়শ্চিত্তের যে গানগুলিকে গীতাঞ্জলির অগ্রদূত বলিতে চাহি তাহার তালিকা আমরা এইখানে দিলাম ; এই গানগুলি 'গান' গ্রন্থে (১৩১৫) ছিল :

১. আমরা বসব তোমার সনে
২. আমাকে যে বাঁধবে ধরে
৩. কে বলেছে তোমায় বঁধু
৪. বলো ভাই ধন্য হরি (বাঁচান বাঁচি মারেন মরি)
৫. নয়ন মেলে দেখি, আমায়
৬. আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে
৭. রইল বলে রাখলে কারে
৮. ওরে আগুন আমার ভাই
৯. ওরে শিকল তোমার কোলে
১০. সকল ভয়ের ভয় যে তারে
১১. আরো আরো প্রভু আরো

ইহার অন্য গানগুলি—

১. বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ
৭. না বলে যেয়ো না চলে

গান— ১৯০৯

যোগীন্দ্রনাথ সরকার -সম্পাদিত 'গান' প্রকাশের এক বছরের মাথায় অন্য একটি প্রকাশন-সংস্থা থেকে (ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস) একই নামীয় পৃথক একটি গ্রন্থ প্রকাশ থেকে এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, রবীন্দ্রনাথের 'গান' ইতোমধ্যেই অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সম্ভবত ১৯০৮-সংস্করণ 'গান' নিঃশেষিত হওয়ায় এই ধরনের একটি গীত-সংকলন প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। 'গান'-এর বর্তমান সংস্করণ এবং পূর্ববর্তী সংস্করণের মাঝখানের বছরটিতে 'শারদোৎসব' নাটকের কয়েকটি গান, কয়েকটি ব্রহ্মসংগীত এবং অব্যবহিত পূর্বে আলোচিত 'চয়নিকা' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এখন বর্তমান " 'গান' (১৯০৯)-গ্রন্থে কবির কিশোরকালের সকল শ্রেষ্ঠ-গান হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত যত গান রচনা হইয়াছে সমস্ত প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।" প্রকাশকের 'নিবেদন'-এ অবশ্য আরো বলা হয়েছে, এ চেষ্টায় তিনি 'সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে' পারেন নাই।

প্রকাশক হলেন ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের পক্ষে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।[১] ইনি পাঠকদের "সুবিধার জন্য ··· গানগুলিকে ভাব বা বিষয়ের সমতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুঞ্জিত করিবার চেষ্টা" করেছেন। অর্থাৎ প্রকৃতি-সংগীত, ঋতু-সংগীত, ভাবপ্রধান-সংগীত পর্যায়ে গানগুলি সজ্জিত। "বিভাগ সম্পূর্ণ করিবার জন্য বাল্মীকিপ্রতিভা ও মায়ার খেলার গান গুটিকয়েক বিবিধ-সংগীতের মধ্যে দ্বিতীয়বার সন্নিবেশিত" হয়েছে।

ছু টাকা মূল্যের এই গ্রন্থটির বিষয়ানুক্রমিক সূচীপত্রটি আমি এখানে তুলে দিচ্ছি :

	পৃষ্ঠাঙ্ক
বাল্মীকিপ্রতিভা—	১
মায়ার খেলা—	২৫
বিবিধ সঙ্গীত—	৫৯

---

২. ওর মানের এ বাঁধ
৩. আজ তোমারে দেখতে এলেম
৪. মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
৫. সারা বরষ দেখি নে মা
৬. হাসিরে কি লুকাবি লাজে
৮. ও যে মানে না মানা
৯. ওকে ধরিলে তো ধরা
১০. গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির
১১. আমি ফিরব না রে

এই গানগুলি 'গান' খণ্ডে আছে, প্রায়শ্চিত্তে আছে, 'গান'-এ নাই সেরূপ গান একটি মাত্র 'মলিন মুখে ফুটুক হাসি।'

···এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার সিটি বুক সোসাইটী হইতে।"

—এই তথ্যের সংশোধন করি : শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রদত্ত প্রথম তালিকার একটিও গান 'গান' (১৯০৮)-এ নেই। দ্বিতীয় তালিকার মাত্র ১, ৫ এবং ৬নং —এই তিনটি গান 'গান' গ্রন্থের যথাক্রমে ৪৫, ৮২ এবং ৪৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। অন্যগুলি নেই। 'মলিন মুখে ফুটুক হাসি' গানটি শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মতে 'গান'-এ নেই। এ গান আংশিকভাবে 'গান'-এ আছে— ৪৬ পৃষ্ঠায়। এই ভ্রম আশু সংশোধিতব্য মনে করি।

১ 'গান' (১৯০৯)-এর আখ্যাপত্র : গান / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, / ১৯০৯

পরপৃষ্ঠায় : প্রকাশক / শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ., / এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস / কলিকাতা— ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস, / ২২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্ / এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেসে, শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

জাতীয় সঙ্গীত — ২১৬

ব্রহ্মসঙ্গীত— ২৫০

অনুষ্ঠান সঙ্গীত— ৪০১

এই অনুষ্ঠান সংগীত সমাপ্ত হয়েছে ৪০৬ পৃষ্ঠায়।

সূচীপত্র এই ৪০৬ পৃষ্ঠার উল্লেখেই সমাপ্ত হয়েছে।[১] কিন্তু সূচীপত্রে সংযুক্ত না থাকলেও (যেমন 'রবিচ্ছায়া'র পরিশিষ্টে লক্ষ্য করেছি) 'অনুষ্ঠান সঙ্গীত'-এর শেষে ৪০৭ পৃষ্ঠা থেকে ৪১২ পৃষ্ঠায় কয়েকটি গান 'নূতন গান' বিভাগে সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে মোট ৭২৭টি গান আছে বলা হয়েছে। এই হিসেব ধরলে যোগীন্দ্রনাথের 'গান'-এর চেয়ে এতে ২০৯টি গান অতিরিক্ত সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু এই হিসাব সর্বথা পরিত্যাজ্য— গানের সংখ্যা বস্তুত আরো কম। কারণ 'গান'-এর এই দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯০৯) যেমন 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'মায়ার খেলা' -র অনেক গান দুবার করে গৃহীত হয়েছে, তেমনি এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রহস্য লুকিয়ে আছে। সূচীপত্র বা ভূমিকা দেখে সেই রহস্য অনুধাবন করা যাবে না। সূচীপত্রসহ সমস্ত 'গান' যখন ছাপানো শেষ হয়ে যায়, তখন কবির নির্দেশে বহু গান বর্জন করতে হয় এবং তৎস্থলে নূতন গান সংযোগ করতে হয়। সেজন্য সূচীপত্রের নির্দেশ অনুসারে কোনো বিশেষ গানের সন্ধান করতে গিয়ে পাঠক গান এবং পৃষ্ঠা-সংখ্যা দুই-এরই ধাঁধায় পড়েন। অবশ্য সূচীপত্র দ্বিতীয়বার ছাপা হল কিন্তু বর্জিত গানের অনেকগুলিই দ্বিতীয়বার মুদ্রিত সূচীপত্রে রয়ে গেল। এই বর্জনের কারণ ছিল— এগুলির অধিকাংশই অন্যের রচনা— মুদ্রণকর্ম সমাপ্ত হলে ধরা পড়ে। এই 'বর্জিত গান'-এর তালিকায় ' + ' চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। সংকলিত এমন অন্য-রচিত দু-একটি গানের উল্লেখ করছি— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -রচিত 'এ কী মোহের ছলনা' অথবা ইন্দিরাদেবী-কৃত 'আমি সকলি দিনু' শীর্ষক গান। আবার গান নয় কবিতা— এমন রচনাও গৃহীত হয়েছে। যেমন— 'নির্ঝর মিশিছে তটিনীর'। বেশির ভাগ গানই রাগ-তাল-সমন্বিত। যেগুলিতে নেই, সেগুলি সাধারণভাবে 'গান' নামে উল্লিখিত হয়েছে।

গান—১৯১৪

ধর্মসংগীত—১৯১৪

রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের জীবন যেন গানে গানে পূর্ণ। গীতালি-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের বরণডালা নিয়ে কবি অপরূপের পূজা সাজিয়েছেন। বিবিধ সংগীতের মাঝে ব্রহ্মসংগীত বা ধর্মসংগীত তাঁর কাছে ভিন্নতর আবেদন নিয়ে উপস্থিত। ১৯০৮ বা ১৯০৯ -সংস্করণ 'গান', গানের বিচিত্র সংগ্রহ। ধর্মসংগীতকে এর থেকে স্বতন্ত্র করার প্রয়োজন হল। ১৯০৯-সংস্করণ 'গান' ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি এবারে দুটি পৃথক খণ্ডে প্রকাশিত হল 'গান' ও 'ধর্মসঙ্গীত' নামে। 'গান'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে ২৫০ পৃষ্ঠা থেকে ৪০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'ব্রহ্মসঙ্গীত' অধ্যায়ে ধর্মসংগীতগুলি গ্রথিত ছিল। 'গান'[২]

---

১ এই সূচীপত্র দেখেই সম্ভবত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'রবীন্দ্রগ্রন্থ-পরিচয়' গ্রন্থে 'গান'-এর মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪০৬ বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুতপক্ষে গান শেষ হয়েছে ৪১২ পৃষ্ঠা + ক-ঢ বর্ণানুক্রমিক সূচী-পৃষ্ঠায়।

২ এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩২৪ সালে (১৯১৭)। এর আখ্যাপত্র: গান / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রকাশক / ইণ্ডিয়ান প্রেস— এলাহাবাদ / ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট / কলিকাতা / ১৩২৪ / মূল্য ১৷৽ এক টাকা আট আনা।

১৯১৪ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে এবং 'ধর্মসঙ্গীত'[১] এর দু'মাস পরে প্রকাশিত হয় ঐ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে ১৯০৯-সংস্করণ 'গান'-এর দু'টি খণ্ড মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ 'গান' থেকে বিবিধ কারণে ভিন্নতর।

'গান' (১৯১৪)-এর প্রথম সংস্করণে বিবিধ সংগীতগুলি— যার সংখ্যা ছিল ২৪৩— মুদ্রিত হয়েছিল। "দ্বিতীয় সংস্করণ 'গান' খণ্ডে বাল্মীকিপ্রতিভা ও মায়ার খেলা নামক গীতিনাট্য দুইটিও সংযোজিত" হয়েছিল। ফলে গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা বেড়ে ১৬৮ থেকে ২৪৪ হয়েছিল এবং গ্রন্থশেষে একটি ॥৴০ আনার বর্ণানুক্রমিক ('বিবিধ সঙ্গীতের') সূচীপত্র সংযুক্ত আছে। 'বিষয়ানুক্রমিক সূচীপত্র' নিম্নরূপ :

১। বাল্মীকি প্রতিভা— ১
২। মায়ার খেলা— ২৯
৩। বিবিধ সঙ্গীত— ৬৭
৪। জাতীয় সঙ্গীত— ২০৯

'গান'-শীর্ষক সংহিতা গ্রন্থগুলি থেকে ('গানের বহি' থেকে আরম্ভ করে) একটি বিষয় লক্ষণীয়— 'বাল্মীকিপ্রতিভা' প্রথম দিকের রচনা হওয়া সত্ত্বেও এর সম্পর্কে কবির একটা বিশেষ মমত্ববোধ ছিল।

'ধর্মসঙ্গীত' গ্রন্থের সূচনায় লেখা ছিল, "এই সংস্করণে 'গান' গ্রন্থের সঙ্গীতগুলি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই পৃথক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। বিবিধ সঙ্গীতের খণ্ডটির নাম হইয়াছে 'গান'। প্রকাশক।"

২০১ পৃষ্ঠার (+ সূচীপত্র ৵৴০) এই সংকলনটিতে মোট ৩২৪টি গান স্থান পেয়েছে। বেশ সুন্দর করে প্রতিটি গান সাজানো।

১০১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে' গানের সূচনায় তারকা-চিহ্ন আছে। পাদটীকায় সে কারণে লেখা আছে— "এই গানের প্রথম শ্লোকটি একটি পাঞ্জাবী গানের অনুবাদ।"[২]

এই দুটি খণ্ডে মোট ২৪৩+৩২৪টি অর্থাৎ মোট ৫৬৭টি গান মুদ্রিত আছে। গান ১৯০৯-সংস্করণে প্রকাশক যে দাবি করেছিলেন ৭২৭টি গান আছে এবং যার সম্পর্কে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম, তার যৌক্তিকতা এখানে প্রমাণিত হয়ে গেল। অবশ্য এই হিসাবে গীতিনাট্যদ্বয়ের গানের হিসাব (১৯১৪ সং) ধরা হয় নি। পক্ষান্তরে ১৯০৯ সংস্করণে একই গান একাধিক মুদ্রিত হয়েছিল।

'প্রবাহিণী', 'গীতিচর্চা' প্রভৃতি গীতসংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে 'গীতবিতান' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত 'গান'-এর এই বিভিন্ন সংস্করণই তৎকালাবধি কবি-রচিত গানের বৃহৎ সংকলন হিসাবে আদরণীয় হয়েছিল।

প্রবাহিণী

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রতিষ্ঠার (১৯২৩) পর থেকেই কবির গ্রন্থগুলিকে সুমুদ্রিত-রূপ দেবার চেষ্টা

---

১ প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র : ধর্মসঙ্গীত / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা।

২ 'গান' খণ্ডের আলোচনার পূর্বে গীতিমাল্য ও গীতাঞ্জলির আলোচনার প্রয়োজন। যেমন 'ধর্মসঙ্গীত'-এর আলোচনার পূর্বে 'গীতালি' আলোচনার দরকার। এগুলি বিভিন্ন গানের একত্রিত রূপ হলেও বিস্তৃত অর্থে এগুলিকে সংকলন-গ্রন্থ বলা যায় না, সেজন্য আলোচনায় বিরত থেকেছি।

করে আসছিলেন। 'পূরবী' এমন একটি সৌষ্ঠব-সমন্বিত গ্রন্থ। 'পূরবী' প্রকাশের চার মাসের মধ্যেই আর-একটি নয়নমনোহর গীতিসংকলন গ্রন্থ এখান থেকে প্রকাশিত হল— যার নাম 'প্রবাহিণী'। এটি ১৩৩২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত 'গান' ও 'ধর্মসঙ্গীত' একাল পর্যন্ত কবির গানের শেষ সংগ্রহ-গ্রন্থ। কাজেই আরো একটি নতুন গীতসংকলন গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-পরবর্তী যুগের বহু এবং বিচিত্র রবীন্দ্রগীতের সুপরিকল্পিত সংকলন" গ্রন্থ এই 'প্রবাহিণী'।[১] এর কাব্যমূল্যও অপরিসীম। বহু গানের সঠিক পাঠ এই 'প্রবাহিণী' থেকে নির্ধারিত হয়েছে। যেমন, ১৩৩০ ভাদ্র মাসে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়ে গীত 'কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি, আঁধার তোমার সবই মিছে' শীর্ষক গানটি।

সুন্দর মলাটে আগে গ্রন্থের ও পরে গ্রন্থকারের নাম রবীন্দ্র-লেখাঙ্কনে মুদ্রিত হল। এই রীতি পরে অন্যান্য রবীন্দ্রগ্রন্থে বহুল পরিমাণে অনুসৃত হয়ে এসেছে।

কবি ভূমিকায় লিখেছিলেন—

"প্রবাহিণীতে যে-সমস্ত রচনা প্রকাশ করা হইল তাহার সবগুলিই গান, সুরে বসানো। এই কারণে কোনো কোনো পদে ছন্দের বাঁধন নাই। তৎসত্ত্বেও এগুলিকে গীতিকাব্যরূপে পড়া যাইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

গানগুলি গীতগান, প্রত্যাশা, পূজা, অবসান, বিবিধ এবং ঋতুচক্র— এই ছ'টি বিভাগে বিন্যস্ত। প্রতি পর্যায়ের গান-সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫, ৩৩, ৩০, ২১, ৩৩ ও ৮৩— মোট ২৩৫টি গান। প্রথম গানটি হল— 'আকাশ হ'তে আকাশ পথে' এবং সমাপ্ত হয়েছে 'চৈত্র পবনে' দিয়ে। এর বিক্রয়মূল্য ছিল চতুর্বিধ— ১৷৷, বাঁধাই ২৲; মোটা-এন্টিক কাগজে ২৲ এবং আড়াই টাকা। মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা— ১৮০।

গীতিচর্চা

'প্রবাহিণী'র অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রগীতের আরো একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'গীতিচর্চা' নামে। এটি আসলে একটি ছাত্র-গেয় রবীন্দ্র-গীতি-সংকলন। 'প্রকাশকের নিবেদন'-এ বলা হয়েছে,

"গীতিচর্চ্চার গানগুলি পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিভিন্ন সময়ের রচিত গান হইতে সংগ্রহ করিয়া বিশেষভাবে আশ্রমবাসী ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য প্রকাশ করা হইল। আশ্রমের ছাত্র ও ছাত্রীগণ প্রতিদিন সকালে ক্লাশ আরম্ভের পূর্ব্বে, রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে, বিভিন্ন ঋতুতে, উৎসব ও অনুষ্ঠানবিশেষে যে-সকল গান গাহিয়া থাকে কেবলমাত্র সেই-সকল গানই এই পুস্তকে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এইজন্য পূজনীয় ৺ মহর্ষি দেবের, পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দুইটি গান, তিনটি বেদগান-ও এইস্থানে সন্নিবেশিত করা হইল। গানগুলি বাছাই করিবার সময় সুর ও কথাতে যাহাতে প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।"

১ আখ্যাপত্র : প্রবাহিণী / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / কলিকাতা।

এই সংস্করণ সম্পাদনা করেন কবির 'সকল গানের ভাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মোট ২০০টি গান এতে সংকলিত। অবশ্য ২০০-সংখ্যক গানের পরে একটি অতিরিক্ত গান এতে মুদ্রিত হয়েছিল সূচীপত্রের বাইরে— 'আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে' গানটি। এতে প্রথম যে গানটি মুদ্রিত, সেটি বহুশ্রুত— 'আমাদের শান্তিনিকেতন'। একটি মুদ্রণপ্রমাদ লক্ষ্য করেছি— ১৪২-সংখ্যক গানটি ছাপা হয় নি।

পৌষ ১৩৩২ তারিখে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় -প্রকাশিত এই প্রথম সংস্করণের মূল্য ছিল বারো আনা— এণ্টিক কাগজে এক টাকা।

গীতবিতান

রবীন্দ্রগীতের প্রথম সংগ্রহ 'রবিচ্ছায়া' থেকে গানের বহি, কাব্য-গ্রন্থাবলী, কাব্যগ্রন্থ, গান, চয়নিকা, বাউল, প্রবাহিণী, গীতিচর্চা প্রভৃতি সংকলন-গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন উপায়ে কবির নতুন ও পুরাতন গানগুলি কী ভাবে স্থান পেয়ে আসছিল তা আমরা লক্ষ্য করেছি। এগুলি ছাড়া বর্ষামঙ্গল, শেষ বর্ষণ, বসন্ত, নবীন, বিভিন্ন স্বরলিপি-গ্রন্থ (গীতপঞ্চাশিকা—১৯১৮, গীতপত্র, কাব্যগীতি প্রভৃতি) ইত্যাদি গ্রন্থের অন্তর্গত বহুবিধ গানও রচিত হয়ে আসছিল। এগুলি সব একত্রে সমাহৃত করার প্রয়োজন কবি অনুভব করছিলেন। এ-সব গানের সংখ্যা প্রায় সার্ধসহস্রাধিক। 'গীতবিতান'-নামক গ্রন্থের তিনটি খণ্ডে এগুলি সংকলিত হতে থাকে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে 'কৈশোরক' পর্যায়ের গান থেকে আরম্ভ করে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের প্রথম গ্রন্থ ১৯২৩ সালে প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতিনাট্য পর্যন্ত মোট ১১২৮টি গান সংগৃহীত হয়। এই দুটি খণ্ড ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (৩৬৪+৩০৫) মোট ৬৬৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। পর বৎসর ১৩৩৯ সনের শ্রাবণ মাসে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। ৬৬৯ থেকে ৮৬৪ অর্থাৎ ১৯৫ পৃষ্ঠা-সংখ্যায়; তিন খণ্ডে মোট ৮৬৪ পৃষ্ঠায়। তৃতীয় খণ্ডে গানের সংখ্যা ৩৫৭। অর্থাৎ তিন খণ্ডে মুদ্রিত মোট গীতসংখ্যা ১৪৮৫। গানগুলি গীতবিতানের প্রথম সংস্করণে সাজানো হয়েছিল গ্রন্থানুক্রমে অর্থাৎ প্রায় রচনার কালানুযায়ী। কবির ইচ্ছা অবশ্য ছিল কালানুসারে না সাজিয়ে বিষয়ানুসারে সাজাতে। কিন্তু শুভানুধ্যায়ীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন গীতসংকলনটি দ্রুত প্রকাশের জন্য। কবির স্বাস্থ্য মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। অথচ ব্যস্ততার মধ্যে শেষ করার কাজও নয়। এতগুলি গান বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো-ছিটানো। সেগুলি সংগ্রহ করা সময়সাপেক্ষ। প্রায় এক বছর ধরে কাজ চলল এই সংগ্রহের। কবির নির্দেশে এবং শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর পরামর্শক্রমে এর সম্পাদনা করলেন সুধীরচন্দ্র কর। মাঝখানে তাঁকে একবার কারারুদ্ধ হতে হয়— তখন মুদ্রণ-কার্যে বিভ্রাট ঘটে।[১]

যদিও কবির ইচ্ছা ছিল 'গীতবিতানে' সকল গান সমাহৃত করার, কিন্তু তা হয়ে ওঠে নি। তা ছাড়া অন্যের রচিত কিছু গানও রবীন্দ্র-রচিত বলে গীতবিতানের প্রথম সংস্করণে প্রমাদবশত গৃহীত হয়েছিল। এই ভুল দীর্ঘকালবাহিত। এগুলি কবির দৃষ্টিগোচর হলে 'গীতবিতান'-এর প্রথম সংস্করণের তৃতীয় খণ্ডে (পৃ ৮৫৭-৬৪) একটি পরিশিষ্ট 'বাদ দেওয়া গানের তালিকা' নামে সংযুক্ত হয়েছিল। এতে যে-গানগুলি কবির নয় বলে স্থির হয়েছিল, সেগুলি তারকাচিহ্নিত হয়েছিল। যেমন, 'আমি সকলি দিনু'

---

১ কবির পত্র, শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা, তারিখ ৯ জুলাই ১৯৩০— "সুধীর কর জেলখানায়, আমার বই ছাপানো সম্প্রতি লবণাশ্রুজলে পরিপ্লাবিত।"

শীর্ষক গান এবং 'এ কী মোহের ছলনা' গান-দুটি যথাক্রমে ইন্দিরাদেবী এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। এই প্রমাদের মূল কারণ — এগুলি ১৯০৯ সালে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত 'গান' গ্রন্থ থেকে ভ্রমক্রমে গৃহীত হয়ে আসছিল।

'গীতবিতান' গ্রন্থের এই বিবিধ ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য কবি এর একটি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য পুনরায় ব্যগ্র হলেন। এবারে গানগুলি পূর্বেচ্ছানুসারে বিষয়ানুযায়ী বিন্যস্ত করলেন। এই নতুন সংস্করণ গীতবিতানের 'বিজ্ঞাপন'-এ তিনি লিখলেন—

"গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলন কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেন নি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেইজন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে, সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।"

—গীতিমূল্যের সঙ্গে কাব্যমূল্যও উচ্চারিত হল সমমর্যাদায়।

গীতবিতানের এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের দশ বছর পরে প্রকাশিত হয়। এইকালের মধ্যে কবির যাবতীয় রচনা সমাপ্তপ্রায়। বস্তুতপক্ষে সমাপ্ত। কারণ দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণকর্ম যখন সমাপ্ত, প্রকাশ আসন্ন, তখন কবি মৃত্যুশয্যায়। নতুন সংস্করণের সম্পূর্ণ ফাইল-কপি দেখে গেলেন মৃত্যুর পূর্বে ; কিন্তু তখনও তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। মুদ্রিত দু'টি খণ্ডের মধ্যে একটি খণ্ড চোখে দেখলেন— প্রকাশিত হল কবি-প্রয়াণের ছ'মাস পরে— ১৩৪৮ সনের মাঘ মাসে। (গীতবিতান আলোচনার সঙ্গে আমি প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটাচ্ছি)।

এই দেড় হাজার গানের বিষয়ানুযায়ী নির্বাচন ও বিন্যাসের প্রচণ্ড পরিশ্রম কবিকে ভোগ করতে হয়েছিল ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে। এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী ও গীতবিতানের প্রথম সংস্করণের সম্পাদক সুধীরচন্দ্র কর -এর সাক্ষ্য উদ্ধার করি—

"গানগুলোর বিষয়ভাগ করা··· গানের খুঁটিনাটি বিচার ক'রে কত রকম ঢালাই-সাজাই করে দেখা,— এতে কী যে পরিশ্রম! দিনের পর দিন সকাল-বেলায় বাঁধা সময় করে সব ঝক্কিটা এক রকম তিনি নিজেই পুইয়ে গেলেন।"[১]

একটি চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ সুধীরচন্দ্রকে লিখেছিলেন—

"অন্য সকল বইয়ের মধ্যে গীতবিতানের দিকেই আমার মনটা সবচেয়ে বেশি তাড়া লাগাচ্ছে— নতুন ধারায় ও একটা নতুন সৃষ্টিরূপেই প্রকাশ পাবে।"— ২৩ বৈশাখ, ১৩৪৫।[২]

বিষয়ানুযায়ী বিন্যাসের ক্রমটি নিম্নপ্রকার— পূজা, পরিণয়, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র, আনুষ্ঠানিক এই সাতটি হল প্রথম বিভাগ। প্রত্যেকটি বিভাগের আবার উপ-বিভাগ নিম্নরূপ—

---

১ সুধীরচন্দ্র কর, কবি-কথা, পৃ ৫৩।

২ তদেব, পৃ ৫৫।

ক. 'পূজা' বিভাগে মোট গানের সংখ্যা ৬১৭, এর উপ-বিভাগগুলি হল গান (৩২), বন্ধু (৫৯), প্রার্থনা (৩৬), বিরহ (৪৭), সাধনা ও সংকল্প (১৭), দুঃখ (৪৯), আশ্বাস (১২), অন্তর্মুখে (৬), আত্মবোধন (৫), জাগরণ (২৬), নিঃসংশয় (১০), সাধক (২), উৎসব (৭), আনন্দ (২৫), বিশ্ব (৩৯), বিবিধ (১৪৩), সুন্দর (৩০), বাউল (১৩), পথ (২৫), শেষ (৩৪)। মোট কুড়িটি উপ-বিভাগ এই পর্যায়ে।

খ. পরিণয়— মোট গান ৯, উপ-বিভাগ নেই।

গ. স্বদেশ— গীতসংখ্যা ৪৬, উপ-বিভাগ অনুপস্থিত।

ঘ. প্রেম বিভাগে মোট গান ৩৯৫, এর উপ-বিভাগ দু'টি— গান (২৭) এবং প্রেম-বৈচিত্র্য (৩৬৮)।

ঙ. প্রকৃতি বিভাগে গানের সংখ্যা ২৮৩— এর উপ-বিভাগ সাতটি (ছ'টি ঋতু-অনুসারী ও একটি সাধারণ)— সাধারণ (৯), গ্রীষ্ম (১৬), বর্ষা (১১৫), শরৎ (৩০), হেমন্ত (৫), শীত (১২), বসন্ত (৯৬)।

চ. বিচিত্র বিভাগ— ১৩৮ এবং,

ছ. আনুষ্ঠানিক বিভাগে ৯টি গান সংকলিত।

শেষ দু'টি বিভাগের কোনো উপ-বিভাগ নেই। দ্বিতীয় সংস্করণের কবি-নির্বাচিত মোট গীতসংখ্যা ১৫০০। প্রতিটি পর্যায়ের গান সংখ্যাত।[১]

পরিশিষ্ট অংশে ২টি গান ('বারে বারে ফিরে ফিরে তোমার পানে' এবং 'রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা') মুদ্রণকর্ম সমাপ্ত হবার পর রচিত (রচনাকাল ভাদ্র ১৩৪৬); সে কারণে পরিশিষ্টে মুদ্রিত। একটি প্রশ্ন এখানে স্বতঃই মনে জাগে। গীতবিতানের এই দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদনার কাজ কবি মৃত্যুর অন্তত তিন বছর পূর্বে আরম্ভ করেছিলেন। সেইমত নির্বাচন শেষে মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হয় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। অথচ কবির মৃত্যুর (শ্রাবণ ১৩৪৮)আগে এটি প্রকাশিত হল না। কেন এই বিলম্ব?

এই মুদ্রণকার্য (পরিশিষ্টসহ) সমাপ্ত হওয়ার পরও কবি-রচিত আরো কিছু গান অবশ্য বাদ থেকে যায়। সে-কারণে 'বিজ্ঞপ্তি'-তে বলা হয়—

"গীতবিতান দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া যাওয়ার পর কবি আরও অনেকগুলি গান রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গান তৃতীয় খণ্ডে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। অনবধানবশত প্রথম দুই খণ্ডে কতকগুলি গান বাদ পড়িয়াছে; তৃতীয় খণ্ডে ঐ সকল গান সংযোজিত হইবে।"

— এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই তৃতীয় খণ্ড কবির জীবৎকালে প্রকাশিত হয় নাই; কবির মৃত্যুর ন'বছর পর ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়।

আরো একটি প্রশ্ন আমার মনে জাগে। প্রথম সংস্করণ গীতবিতানে গানের সংখ্যা ছিল ১৪৮৫। দ্বিতীয় সংস্করণের গীতসংখ্যা ১৫০০। তবে কি কবি দুই সংস্করণের মধ্যবর্তী দশ বছরে (১৩৩৮-৪৮, ১৩৪৬-এ মুদ্রণকর্ম সমাপ্ত ধরলে আট বছরে) মাত্র পনেরোটি গান রচনা করেছিলেন? না, তা নয়। মনে রাখতে হবে, কবি-কৃত এই দ্বিতীয় সংস্করণেও কবি-রচিত সমস্ত গান স্থান পায় নি; পেয়েছিল

১ "প্রত্যেক পর্যায়ের গান সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করতে বলেছি।"— রবীন্দ্রনাথ, দ্র. সুধীরচন্দ্র কর, কবি-কথা, পৃ. ৫৪

নির্বাচিত দেড় হাজার গান। না হলে নৃত্যনাট্যাদি-সহ তাঁর গানের সংখ্যা প্রায় দু হাজারের মতো— যা পরবর্তীকালের (বর্তমানে প্রচারিত) 'গীতবিতান'-এর সংস্করণে গৃহীত।

কবি-সম্পাদিত 'গীতবিতান'-এর নামপত্রে একটি কবিতা মুদ্রিত ছিল। কবিতাটির আরম্ভ এইপ্রকার —'প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে / প্রথম দিনের উষা নেমে এল যবে'···ইত্যাকার। কালিম্পং বাসকালে কবি এটি তাঁর ৭৮তম জন্মদিনে (২৫ বৈশাখ ১৩৪৫) রচনা করেন। পরে এটি তাঁর 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থে 'উদ্বোধন' নামে সংকলিত হয়। মূল কবিতাটি তিন স্তবকের। শেষ স্তবকটি পরিত্যাগ করে কবি প্রথম দুটি স্তবক গীতবিতানের প্রথম খণ্ডের আদিতে সংযুক্ত করলেন। এটিই তাঁর 'গীতময় জীবনের গীতাবলীর ভূমিকা'।

গ্রন্থপঞ্জী ॥

মূল গ্রন্থাদি চিঠিপত্র, বিভিন্ন খণ্ড— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম খণ্ড, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
কবি-কথা— সুধীরচন্দ্র কর
রবীন্দ্রগ্রন্থ-পরিচয়— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র গ্রন্থ-পঞ্জী— শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, 'রবীন্দ্রনাথ'— শ্রীসুকুমার সেন
সাহিত্যসাধক চরিতমালা, 'শ্রীশচন্দ্র মজুমদার' — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান— শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার
জীবনস্মৃতি— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি — বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ— শ্রীসুশীল রায়
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পঞ্চাশৎবর্ষ-পরিক্রমা— বিশ্বভারতী
মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৫৭, কালিদাস নাগের প্রবন্ধ
বিশ্বভারতী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা
দেশ— সাহিত্য সংখ্যা, কয়েক খণ্ড
প্রবাসী— বিভিন্ন সংখ্যা।

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে প্রকাশিত পূর্বযুগের লেখিকাদের রচনাবলী

স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলী।
গিরিবালা দেবীর রচনাবলী।
জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনাবলী।
সম্পাদিকা— বাণী রায়।
প্রকাশক— রামায়ণী প্রকাশ ভবন।
মূল্য— প্রত্যেকটি আঠারো টাকা।

ভারতবর্ষে নারী মুক্তির অন্যতমা নেত্রী রমাবাঈ-এর একটি বক্তৃতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেন 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায়। নারী সব ক্ষেত্রেই পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে— রমাবাঈ-এর এই বক্তব্যের প্রতিবাদই সে আলোচনার মূল বিষয়। তাঁর মতামত চুপ করে মেনে নেন নি তাঁর জ্যেষ্ঠা সহোদরা স্বর্ণকুমারী দেবী, 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদিকা। 'রমাবাঈ'-নামে নিবন্ধে তিনি লেখেন— "...লেখক যত সহজে কথাটা হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন— তত সহজে তাহা হাসিয়া উড়ান যায় না। স্ত্রীলোকের একরকম গ্রহণশক্তি ও ধারণাশক্তি আছে, কিন্তু সৃজন শক্তি নাই, এ কথা লেখক কিরূপে স্থির করিলেন তাহা তো বুঝিতে পারি না। ইয়োরোপে স্ত্রী-শিক্ষা আরম্ভ কত অল্প দিন হইয়াছে, ইহার মধ্যেই কত উচ্চ উৎকৃষ্ট উপন্যাস স্ত্রীলোকের লেখনী-নির্গত হইয়াছে, তাহা লেখক ভুলিলেন কেন?"— দৃষ্টান্তের জন্য স্বর্ণকুমারীকে ইয়োরোপের নজিরই টানতে হয়েছিল সে-সময়, কিন্তু আজ আমরা নিজেদের দেশের সাহিত্য থেকেও তাঁকে সমর্থন জানাতে পারি। স্বর্ণকুমারী নিজেই প্রথম, এবং ঐতিহাসিক বলেন: "এই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে আমরা এমন কতকগুলি মহিলা-সাহিত্যিকের দর্শন পাই, যাঁহারা সাহিত্যে বিশিষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন।" কিন্তু ইতিহাসে যাঁদের নাম জানি, তাঁদের অনেকের লেখাই আমাদের হাতে এসে পৌছয় না, লেখক অথবা লেখিকা— উভয়ের ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের কল্যাণে গত যুগের কয়েকজন লেখিকার রচনাবলী যে আমাদের হাতে এসে পৌছতে পারল, তার জন্য শ্রীমতী বাণী রায়কে, তথা আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ রাজ্যস্তর সমিতিকে ধন্যবাদ জানাই।

কিন্তু শ্রীমতী বাণী রায় ঠিক কী ভাবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন এই লেখিকাদের তা খুব স্পষ্ট হয় না তাঁর লেখায়— স্বর্ণকুমারী দেবীর জীবনী ও সাহিত্যকৃতি যে-ভাবে রচনা করেন তিনি। "লেখিকাদের রচনা বাঁচাবার উপায় কি?"— এই প্রশ্ন তুলে উত্তরে তিনি লিখেছেন— "সমষ্টিগত ভাবে যে অমরত্ব তাঁরা অর্জন করবেন, একত্রে বিধৃত হলে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে তাঁদের যে স্বতন্ত্র মূল্যায়ন হবে, সে বিষয়ে তাঁরা অবহিত নন। ঐক্যে যে উৎকর্ষ, সে কথা তাঁরা ভেবে দেখেন না।" সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা যে মহিলা-সাহিত্যিকদের জন্য পৃথক অধ্যায় নির্দিষ্ট করে থাকেন, শ্রীমতী বাণী রায় তা

উল্লেখ করেন নিজের বক্তব্য সমর্থনের জন্য। এই যদি তাঁর মত, তবে কেন তাঁকে বলতে হয়— "নারী নয়, নয় নয় স্বর্ণকুমারী একজন অসামান্য লেখক ছিলেন, এই তাঁর একমাত্র সংজ্ঞা ?" অভিপ্রায়ের স্পষ্টতা নেই বলেই অত্যন্ত যত্ন ও অধ্যবসায়ে -রচিত স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যকৃতির পরিচয় তাঁর সাহিত্যিক চরিত্র উপস্থাপিত করে না পাঠকের সামনে। বিশেষত, সব চেয়ে অভাব বোধ করি রচনাবলীতে তাঁর প্রবন্ধ এবং সে-জাতীয় অন্যান্য গদ্য-নিবন্ধের অনুপস্থিতিতে। স্বর্ণকুমারী দেবীর মনন-দীপ্তি ও তেজস্বিতা এ-সব লেখাতেই বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে দু-একটি গদ্যাংশ উপস্থিত করছি— ক. "এইরূপ উদারতাগুণেই ইংরাজগণ ভারতকে রুষদিগের নিকট হইতে রক্ষা করিতেছেন, ব্রহ্মদেশকে আশ্রয় দিয়াছেন,— এইরূপ উদারতাগুণেই তাঁহারা ইলবার্ট বিলের সৃষ্টি করিয়াছেন, হীন নেটিভদিগকে অবিরত পিঠ থাপড়াইয়া নীচু স্থানে বসাইয়া রাখিতেছেন, উচ্চে দাঁড়াইবার সামান্য কষ্টটুকু পর্য্যন্ত তাহারা যেন না পায়! আর এই উদারতাগুণেই প্রতিদিন ইংরাজী পত্রে বাঙ্গালীদিগের উপর অজস্র মিথ্যার বর্ষণ দেখা যাইতেছে।" খ. "পদ্য প্রভৃতির কল্পনা আর বিজ্ঞানের কল্পনা এই দুয়ে একটি প্রধান প্রভেদ এই যে বিজ্ঞানের সাধারণতঃ দ্রব্যগুণের সামান্য-গুণগুলি অর্থাৎ যে সকল গুণ ঐ দ্রব্যগুলি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া কল্পনা করিতে হয়, আর কবিতা প্রভৃতিতে (সত্য, ন্যায়, বীরত্ব ইত্যাদি কোন বিশেষের চিত্র অঙ্কিত করার অভিপ্রায় থাকিলেও) তাহা উদাহরণে দেখাইবার নিমিত্ত আমরা রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদি সর্ব গুণ-বিশিষ্ট কোন বিশেষ দ্রব্যের কল্পনা করি।" এর প্রথম অংশটির সূক্ষ্ম অথচ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ এবং দ্বিতীয় অংশে প্রকাশিত সামান্য উক্তি করার ক্ষমতা যে-কোনো প্রথম সারির লেখকের সঙ্গে তুলনীয়। এই-সব লেখা থেকে বোঝা যায় সাহিত্যের ইতিহাসে স্ত্রী-সাহিত্যিকদের জন্য পৃথক অধ্যায় কতটা নিষ্প্রয়োজন।

স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরিবালা দেবী এবং জ্যোতির্ময়ী দেবী— এই তিনজনের রচনাবলী আমরা হাতে পেয়েছি। তিনটি গ্রন্থের সূচনাতেই লেখিকাদের জীবনী এবং সামগ্রিক সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে মনোজ্ঞ এবং তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা আছে। কিন্তু তাঁদের সামগ্রিক সাহিত্যের সঙ্গে গৃহীত রচনাবলীর সম্বন্ধের সূত্রটি কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। কেন যে কোনটি গ্রহণ করা হল তা না জানতে পারলে পাঠকের পক্ষে অংশ থেকে সমগ্রের ধারণা করা সম্ভব নয়। জ্যোতির্ময়ী দেবীর সাহিত্যকৃতি আলোচনা অংশে যে-সব ছোটোগল্পের উল্লেখ, তার অনেকগুলিই বইতে আছে, আবার কোনো-কোনোটি নেই। আলোচনা থেকে যে-গল্পটি পড়তে খুব আগ্রহ হয়, সূচীপত্র উলটে সেটির আর দেখা মেলে না। গল্পগুলি কোনটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত— সে বিষয়েও কোনো নির্দেশ দেওয়া নেই। ফলে পাঠকের কৌতূহল জাগে বটে কিন্তু তার পর আর পথ পায় না।

কিন্তু যা পাই নি তার থেকে যা পেয়েছি তা অনেক বড়ো। দুর্লভ এই গল্প-উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে চমক লাগে, এতদিন এঁদের কথা তেমন করে জানা ছিল না ভেবে লজ্জা পাই। স্বর্ণকুমারী দেবী সম্বন্ধে যদিও সম্পাদিকা যথার্থই মন্তব্য করেছেন— তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির 'রংএ বর্তমানের রং মিলবে না,' কিন্তু গিরিবালা দেবী কিংবা জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা আজকের পরিপ্রেক্ষিতেও প্রাসঙ্গিক, উপভোগ্য। গিরিবালা দেবীর মূল্যবোধ হয়তো প্রাচীন, গ্রাম-বাংলার যে আনন্দময় জীবন-যাত্রার চিত্র রচনা করেছেন তিনি, তা হয়তো আজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, আনন্দহীন; তবু তার দাম আছে যে-কোনো বাঙালির কাছে।

রায়বাড়ী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড বিষয়ে যে দাবি করেছেন সম্পাদিকা— "এই খণ্ডে অন্যান্য উৎসব, বাংলার প্রবাদ-প্রবচন বিধৃত হইয়া গ্রন্থখানি আকরগ্রন্থ ও লোকসাহিত্যের মর্যাদা পাইল"— তা গ্রাহ্য করার মতোই। শুধু তাই-ই নয়, তাঁর সহজ অনাড়ম্বর গদ্য কোথাও কোথাও আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে, দু-একটি বাক্য উল্লেখ করা যায়— 'সরম তাহার শরম রাখিতে দীঘির নীল জলে ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল' কিংবা 'আহার ভুলিয়া নিদ্রা ভুলিয়া শ্যামল সুন্দর বসুন্ধরার পানে চাহিয়া রহিলাম'। গিরিবালা দেবীর গল্পগুলি সরল, কিন্তু হাল্কা নয়।

এই তিনজন লেখিকার মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবীই আধুনিক পাঠকের কাছে সব চেয়ে গ্রহণযোগ্য। তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয়-বৈচিত্র্য আজকের লেখকদের তুলনায় কিছু কম নয়; নগর জীবনের, নাগর-সমাজের জটিলতাকে তিনি রূপ দিয়েছেন। যখন সবে ঘর থেকে বাইরের কর্মক্ষেত্রে পা বাড়িয়েছে মেয়েরা, সেই ক্রান্তিকালে মেয়েদের অন্তর-বাহিরের নানাবিধ বাধা ও সমস্যাকে তিনি ধরতে চেয়েছেন সাহিত্যে। মেয়েদের অধিকারবোধ-এর প্রশ্ন তিনি খুব সচেতনভাবে তুলেছেন। ভূমিকায় শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সিংহ এ-বিষয়ে মন্তব্য করেছেন "সে প্রগতি বিরোধী পরিবেশে, নারী জীবনে— 'অধিকারবাদ', 'অধিকার বোধ' ও 'অধিকার প্রতিষ্ঠা'— এই তিনটি কথাকে সত্যে পরিণত করতে গিয়ে, কত যে সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে, সেই বোধটুকু তিনি যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর বিভিন্ন রচনায়।" কিন্তু শুধু সেদিনের "প্রগতি বিরোধী পরিবেশে" নয়, জ্যোতির্ময়ী দেবীর উত্থাপিত প্রশ্নগুলি আজকের পরিবেশেও উত্তরহীন। 'অনৃতভাষিণী' গল্পের নায়িকার মুখে এ-রকম এক প্রশ্ন তুলেছেন লেখিকা— "এইজন্য কি ছোটতে বিয়ের ব্যবস্থা ছিল। বুদ্ধি পরিণত হ'ত না, সাহস থাকৃত না। স্বার্থও হ'ত এক। তোমাদের তৈরী আদর্শ ও সত্য-মিথ্যা নিয়ে আমরা দেবী হতাম, রাণী হতাম, পথের ধারেও দাঁড়াতাম! 'হতাম' কেন হই। আর চিরকালের স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে সুখের দায়ে মূঢ় ভয়ে অসত্যের বোঝা বয়ে আদর্শ মেয়ে হয়ে থাকি।... চিরদিন মিথ্যে শুনি, বলি, আর তা আদর্শ বলে বিশ্বাসও করি।" 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' উপন্যাসে বীণা নামে একটি চরিত্র, কলেজে অধ্যাপনা করে যে, সে প্রশ্ন করেছে— "মেয়েদের দাম শুধু তাকে একজন মানুষের দরকারে? সমস্ত সম্পর্ক অতিক্রম করে মানুষ হিসেবে তার মূল্য নেই? দরকার নেই? পৃথিবীর কোনোখানে চিরদিনের ইতিহাসে একদিনো সে মানুষ হিসেবে পরিচিত হল না কেন?"

অথচ জ্যোতির্ময়ীর রচনারীতি খুবই সাদাসিধে, কোনো প্রসঙ্গেই কোনো উত্তেজনা প্রকাশ করেন নি, কিন্তু সত্যকথা স্পষ্ট করে বলতে পেরেছেন, সামান্য ইঙ্গিতে অনেকখানি বলতে পেরেছেন। 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'-এ একটি বঞ্চিতা মেয়ের কথা এইভাবে বলেছেন তিনি— "টুলু এবারে যেন নিজেকে ভুলে যেতে লাগল।— যদি মানুষ নিজেকে ভুলতে পারে।" চিত্রকল্পের মাধ্যমও কোথাও কোথাও ব্যবহার করেছেন লেখিকা, সেরকম একটি পঙ্‌ক্তি— "মনের এক পাশে দাঁড়ায় আকাশভরা তারা, অন্য ধারে পৃথিবীজোড়া অন্ধকার।"

সমাজের পরিবারের একশো রকমের বাধা-বন্ধনের মধ্যেই জীবন কেটেছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর মতো লেখিকাদের। বাইরের দিক থেকে মুক্তির স্বাদে তাঁরা বঞ্চিতই ছিলেন। কিন্তু ভিতরের দিকে চৈতন্যের মুক্তি তাঁদের যে ঘটেছিল, তা তাঁদের লেখা পড়ে বুঝতে পারি, যদিও সচেতন ভাবে কোনো

নারী-মুক্তি আন্দোলনে এঁরা শামিল হন নি। আজ, আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের সঙ্গে এঁদের নামও যে যুক্ত হল— সেদিক থেকেও তা তাৎপর্য পায়।

সুতপা ভট্টাচার্য

স্বরলিপি

এসেছে হাওয়া বাণীতে দোল-দোলানো, এসেছে পথ-ভোলানো—
এসেছে ডাক ঘরের-দ্বার-খোলানো।
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয়—
রঙের ধারা ওই-যে বহে যায় যে ॥

উদয়রবি যে রাঙা রঙ রাঙায়ে পূর্বাচলের দিয়েছে ঘুম ভাঙায়ে
অস্তরবি সে রাঙা রসে রসিল—
চিরপ্রাণের বিজয়বাণী ঘোষিল।
অরুণবীণা যে সুর দিল রণিয়া সন্ধ্যাকাশে যে সুর ওঠে ঘনিয়া
নীরব নিশীথিনীর বুকে নিখিল ধ্বনি ধ্বনিয়া।
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে—
বাঁধন-হারা রঙের ধারা ওই-যে বহে যায় যে ॥[১]

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II র্সনা র্সর্গা র্গা | র্গর্ঋা -া র্সা I না র্সা র্ঋা | র্ঋা -র্সা র্সণা I
এ ৹ সে ৹ ছে হা ৹ ও য়া বা ণী তে দো ল্ দো৹

I ণা -া -দা | দা -পা -গা I পা পমা মা | মা -া মা I
লা ৹ ৹ নো ৹ ৹ এ সে৹ ছে প থ্ ভো

I মা -গা -পা | মা -া -া I সমা মা মা | মা -পা -গা I
লা ৹ ৹ নো ৹ ৹ এ৹ সে ছে ডা ৹ ক্

I গা গা -া | গা -পা গা I গা -ঋা -া | সা -া -া I
ঘ রে র্ দ্বা র্ খো লা ৹ ৹ নো ৹ ৹

I না -র্সা ধা | না র্সা -র্রা I না -র্সা ধা | না র্সা -র্রা I
আ য়্ রে তো রা ৹ আ য়্ রে তো রা ৹

* ‖

I না -র্সা -ধা | না -র্সা -ধা I না -র্সা -া | -া -া -া I

আ • য়্ আ • য়্ আ • য়্ • • •

I র্সা র্গা র্গা | র্ঋা র্সা -া I না -া র্সা | র্ঋা র্সা -া I

র ঙে র ধা রা • ও ই যে ব হে •

*

I না -দা -া | -পমা -গপা -া I মা -া -া | -া -া -া I

যা • • •• •• য়্ যে • • • • •

I র্সা র্সর্গা র্গা | র্গা র্গা -র্পা I র্পর্গা র্গা র্গা | র্গা -া -া I

উ দ• য় র বি • যে• রা ঙা র • ঙ্

I র্গা র্গর্ঋা -া | র্সা -া -া I না -া র্সা | র্ঋা র্সা -া I

রা ঙা• • য়ে • • পূ র্ বা চ লে র্

I না র্সা র্সণা | ণা -দা দপা I পা -মা -া | মা -া -া I

দি য়ে ছে• ঘু ম্ ভা• ঙা • • য়ে • •

I সা -মা মা | মা মা -া I সমা মা মা | মা মা ন্ I

অ স্ ত র বি • সে• রা ঙা র সে •

I মা মগা -পা | মা -া -া I সমা মা মা | মা -পা গা I

র সি• • ল • • চি• র প্রা ণে • র

I গা পা পা | পা পা -গা I গা গা -ঋা | সা -া -া I

বি জ য় বা ণী • ঘো ষি • ল • •

I সা সা ঋা | গা গা -পা I পা পা পন্ধা | পন্ধা পা -া I

অ রু ণ বী ণা • যে সু র• দি• ল •

পা পজ্ঝা -গমা | গা -া -া I জ্ঝা -পা পা | পর্সা র্সা -া I
র ণি • • • য়া • • স ন্ ধ্যা কা • শে •

I পা পদা দা | পজ্ঝা গা -পা I গা ঋা -া | সা -া -ঋন্া I
সে সু • র ও • ঠে • ঘ নি • য়া • • •

I সা সা ঋা | গা -পা -া I পা -া -া | -া -া -া I
অ রু ণ বী • • ণা ০ • • • •

I না র্সা ধা | না র্সা -া I র্ঋা র্ঋা র্সা | না র্সা -া I
নী র ব নি শী • থি নী র বু কে •

I না র্সা র্ঋা | র্ঋা র্সা -ণা I ণা ণদা -া | দা -পা -া I
নি খি ল ধ্ব নি • ধ্ব নি ০ • য়া ০ ০

I পা -মা মা | মা মা -া I সমা -া মা | মা মা -া I
আ য়্ রে তো রা • আ ০ য়্ রে তো রা ০

*

I সা -মা -া | -মগা -পা -া I মা -া -া | -া -া -া I
আ • • • ০ • য়্ রে • • • • •

I ন্না মা মা | মা মগা -পা I গা গপা পা | পগা গা -া I
বাঁ • ধ ন হা রা • • র ঙে • র ধা • রা •

I গা -পা পা | পগা গা -া I গা -ঋা -া | সা -া -া II II
ও ই যে ব ০ হে • যা • য়্ যে • •

* দাদরা তালে মেলাবার জন্য চিহ্নিত তিনটি স্থলে তিন মাত্রা করে টানতে হয়েছে, মূল-গীতরূপে ছিল না।— স্বরলিপিকার

—

১ 'সন্ন্যাসী যে জাগিল ওই জাগিল' গানের শেষাংশ। প্রথমাংশ স্বরলিপিসহ এই পত্রিকার ১৩৮৩ শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ • সহযোগী সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়
উনত্রিংশ বর্ষ • শ্রাবণ ১৩৮৩ - আষাঢ় ১৩৮৪

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

APRIL-JUNE 1977 Regd. No R. N. 2700/57 Registered with Registrar of Newspapers

গোপন প্রেমের গোপন চাঁপা
উঠল আকাশে।
কোন্-ফাগুনের চাঁদের আলোর
সুধায় মাখা সে॥
কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে
ঢেকেছিল ঘাসের পারে
কোন্ সুদূরের পল্লবে
ছিল ঢাকা সে॥

দখিন হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল
গোপন রেণুকা।
গন্ধে তারি ছন্দে মাতে
কবির বেণুকা।
কোমল প্রাণের পাতে পাতে
লাগল যে রঙ পূর্ণিমাতে,
আমার গানের সুরে সুরে
রইল আঁকা সে॥

রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার সংকলন-'রাখী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

বিশ্বভারতী
৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭